Writings in Bengali and Sanskrit

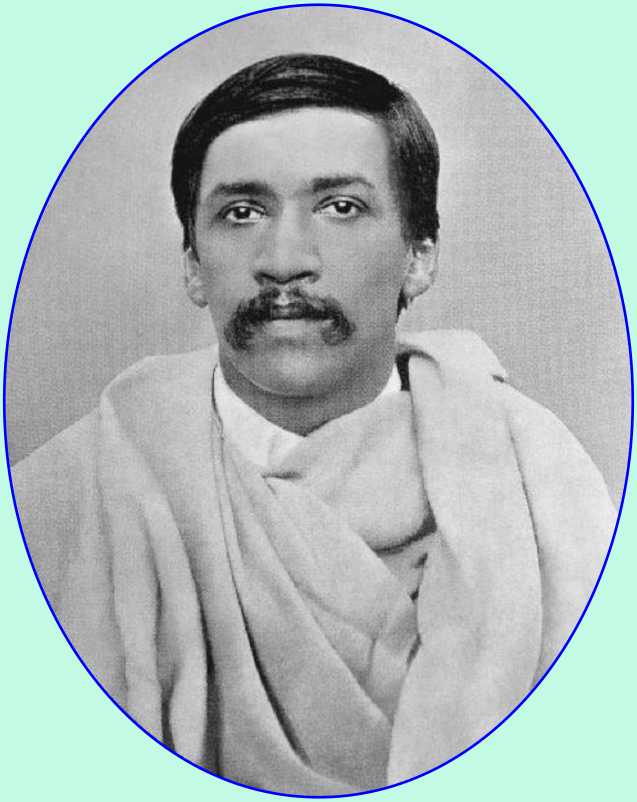

Sri Aurobindo

VOLUME 9
THE COMPLETE WORKS OF SRI AUROBINDO
© Sri Aurobindo Ashram Trust 2017
Published by Sri Aurobindo Ashram Publication Department
Printed at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry
PRINTED IN INDIA

Writings in Bengali and Sanskrit

Publisher's Note

Writings in Bengali and Sanskrit comprises prose and poetry written by Sri Aurobindo in Bengali and a much smaller body of writing in Sanskrit. Both are reproduced in the original languages. All the items in this volume are related to material in English published in other volumes of THE COMPLETE WORKS OF SRI AUROBINDO. While the contents of those volumes are defined by subject, period or form, the main criterion for the inclusion of a piece in the present volume is the language in which it was written.

The contents of this volume are divided by language into two parts. The Bengali writings constitute most of the volume. They are subdivided under several headings, some of which are the titles of collections of essays published during the author's lifetime. The Sanskrit writings form a single series, which has been arranged as far as possible in chronological order.

Some of the material in Bengali and all of that in Sanskrit remained unpublished during Sri Aurobindo's lifetime and has been reproduced from his manuscripts. More detailed information is given in the notes at the end of each of the two parts of the book.

CONTENTS

বাংলা রচনা

দুর্গা-স্তোত্র ... ১
শ্রীমায়ের একটি প্রার্থনা ... ৩

কারাকাহিনী

কারাকাহিনী ... ৭
কারাগৃহ ও স্বাধীনতা ... ৫৪
আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয় ... ৬২
নবজন্ম ... ৭১

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা

ধর্ম্ম

আমাদের ধর্ম্ম ... ৭৭
মায়া ... ৮০
অহঙ্কার ... ৮৪
নিবৃত্তি ... ৮৬
প্রাকাম্য ... ৮৮
স্তবস্তোত্র ... ৯২

জাতীয়তা

আমাদের রাজনীতিক আদর্শ ... ৯৫
মিথ্যার পূজা ... ১০১
আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা ... ১০৩
জাতীয় উত্থান ... ১০৬
অতীতের সমস্যা ... ১১০
স্বাধীনতার অর্থ ... ১১৬
হিরোবুমি ইতো ... ১১৮
কোরিয়া ও জাপান ... ১২০
দেশ ও জাতীয়তা ... ১২৪
আমাদের আশা ... ১২৭

আমাদের নিরাশা ... ১৩০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... ১৩২
ভ্রাতৃত্ব ... ১৩৬
ভারতীয় চিত্রবিদ্যা ... ১৪০

‘ধর্ম্ম’ পত্রিকার সম্পাদকীয়

... ১৪৩

বিবিধ রচনা

পুরাতন ও নূতন ... ২৪৩
পূর্ণতা ... ২৪৪
পূর্ণযোগের মুখ্য লক্ষণ ... ২৪৫
মানবসমাজের তিন ক্রম ... ২৪৮
সমাজের কথা ... ২৫১
জগন্নাথের রথ ... ২৫২

গীতা

গীতার ধর্ম্ম ... ২৫৯
সন্ন্যাস ও ত্যাগ ... ২৬২
বিশ্বরূপ দর্শন ... ২৬৬
গীতার ভূমিকা ... ২৭০

বেদ ও উপনিষদ

উপনিষদ ... ৩২৭
পুরাণ ... ৩২৯
ঈশা উপনিষদ ... ৩৩১
উপনিষদে পূর্ণযোগ ... ৩৩৪
ঈশ উপনিষদ ... ৩৩৬
বেদরহস্য ... ৩৪১
ঋগ্বেদ ... ৩৪৭

পত্রাবলী

মৃণালিনীদেবীকে লিখিত ... ৩৭৯
বারিনকে লিখিত ... ৩৯২
"প্রবর্ত্তক" উদ্দেশ্যে লিখিত ... ৪০৪
সাধনাবিষয়ক পত্রাবলী
"ন"কে লিখিত ... ৪১৮
"স"কে লিখিত ... ৫১২
"এ"কে লিখিত ... ৫৫০

কাহিনী ও কবিতা

(কাহিনী)
স্বপ্ন ... ৫৫৯
ক্ষমার আদর্শ ... ৫৬৬
(কবিতা)
অস্ফুট ... ৫৬৯
মহাকাল ... ৫৭০
জীবন্ত জড় ... ৫৭৫
সবাই পাগল তোরা ঘুরি' ধরাতল ... ৫৭৯
দৈত্য ... ৫৮০
কতশত ছন্দোবন্ধে... ... ৫৮২
পরাজিত রাবণ ... ৫৮৩
একটি কবিতা ... ৫৮৭
সাবিত্রী ... ৫৯০
জাগিল জননী ... ৫৯২
উষাহরণ কাব্য ... ৫৯৫

পরিশিষ্ট

ছিন্নাংশ ... ৬৪৭
'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীর পৃষ্ঠাসংখ্যা ... ৬৬৩
তথ্যপঞ্জী ... ৬৬৫

संस्कृतरचनाः

विविधाः श्लोकाः	…	685
प्राण इदं सर्वं	…	686
भवानी भारती	…	687
तान्त्रिकसिद्धिप्रकरणम्	…	694
सप्तचतुष्टयम्	…	696
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म	…	699
कैवल्योपनिषद्	…	701
ऋग्वेदः	…	704
सा सर्वा	…	707
मन्त्राः	…	708
Note on the Texts	…	711

Sri Aurobindo at Amraoti, January 1908

বাংলা রচনা

দুর্গা-স্তোত্র

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি সর্ব্বশক্তিদায়িনি মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি, — শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যাই। এইবারও জন্মিয়া তোমারই কার্য্যে ব্রতী আমরা, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, সহায় হও॥

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি, ত্রিশূলধারিণি, বর্ম্ম-আবৃত-সুন্দর-শরীরে মাতঃ জয়দায়িনি! তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে উৎসুক। শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণি ভীমে, সৌম্য-রৌদ্র-রূপিণি! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান॥

মাতঃ দুর্গে! জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি, মাতঃ, গগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমিরবিনাশী আভায় ঊষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর॥

মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা সর্ব্বসৌন্দর্য্য-অলঙ্কৃতা জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি, এতদিন শক্তিসংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে, এস, মাতঃ, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে, তোমার প্রভাবে, মহৎ কার্য্যের মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা, বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয়॥

মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণি, নৃমুণ্ডমালিনি দিগম্বরি, কৃপাণপাণি দেবি অসুর-বিনাশিনি! ক্রূর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, মাতঃ, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎপ্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই॥

মাতঃ দুর্গে! যোগশক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্য্য-সন্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশক্তি, ভক্তিশ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য সত্যজ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গতিনাশিনি জগদম্বে, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের বাধাবিঘ্ন নির্ম্মূল কর। বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে, গগন-সহচর পর্ব্বততলে, পূতসলিলা নদীতীরে একতায় প্রেমে, সত্যে শক্তিতে, শিল্পে সাহিত্যে, বিক্রমে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব, অশুভবিনাশী তরবারি তব, অজ্ঞানবিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ-হন্ত্রী হইয়া তরবারি ঘুরাও, জ্ঞানদীপ্তিপ্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জ্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও॥

বীরমার্গপ্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জ্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, ঊর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥

শ্রীমায়ের একটি প্রার্থনার অনুবাদ

প্রভু, এস! পূর্ণ হোক তোমার ইচ্ছা, সিদ্ধ হোক তোমার কার্য্য, দৃঢ় করিয়া দাও আমাদের ভক্তি, পূর্ণতর কর আমাদের আত্মসমর্পণ। আমাদের অন্ধকার পথ আলোকিত কর। আমরা তোমাকে সত্তার অধীশ্বররূপে ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এই আশায় যে তুমি এই সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া প্রকাশ হও।

ভাষা আমাদের এখনও অজ্ঞানে ভরা, জ্ঞানে উদ্ভাসিত কর।

হৃদয়াকাঙ্ক্ষা আমাদের অপূর্ণতায় মলিন, শুদ্ধ করিয়া দাও।

কর্ম্ম আমাদের দুর্ব্বল অক্ষম, সবল সফল করিয়া তোল।

পৃথিবী যন্ত্রণায় অস্থির, হাহাকারে বিধ্বস্ত, — জগৎ যেন বিশৃঙ্খলতার বাসস্থান। এত নিবিড় গাঢ় অন্ধকার একমাত্র তুমিই অপনোদন করিতে পার।

এস, প্রকটিত কর তোমার মহিমা, তোমার কার্য্য সাধিত হোক।

শ্রীঅরবিন্দ

(শ্রীমা রচিত Prières et Méditations গ্রন্থের Le 25 août 1914 তারিখের ধ্যানলিপির অনুবাদ)

কারাকাহিনী

কারাকাহিনী

১৯০৮ সনের শুক্রবার ১লা মে আমি ‘‘বন্দেমাতরম্’’ অফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটী টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুটী য়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের ‘‘এম্পায়ার’’ কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিস কমিশনার বলিয়াছেন আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখনও যে আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা। জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটী নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে। বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম, উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্ম্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ — শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই — শত্রুই অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্টই হইল। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম। কারাগৃহবাসে আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কয়েকটী বাহ্যিক ঘটনা মাত্র বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যাহা কারাবাসের মুখ্য ভাব তাহা

প্রবন্ধের প্রারম্ভে একবার উল্লেখ করা ভাল বিবেচনা করিলাম। নতুবা পাঠকগণ মনে করিবেন যে, কষ্টই কারাবাসের সার। কষ্ট যে ছিল না তাহা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশকাল আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে।

শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র ঘরটী সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্ত্তি, আর কয়েকজন ইন্‌স্‌পেক্টার, লালপাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামানসহ একটী সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটী শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি?’’ আমি বলিলাম, ‘‘আমিই অরবিন্দ ঘোষ’’। অমনি একজন পুলিসকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটী অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইল। আমি খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। ওয়ারেণ্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না আমার বাড়িতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই body warrant-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি। প্রায় আধঘণ্টার পর কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়। ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট আইনভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদ বাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘আপনি নাকি বি-এ পাশ করিয়াছেন? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটীতে

শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জা-জনক নহে?'' আমি বলিলাম, ''আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।'' সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, ''তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?'' দেশহিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্যব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূল-বুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।

এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়। বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায়, কিছুই এই সর্ব্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না। খানাতল্লাসীর সাক্ষীদের মধ্যে রক্ষিত মহাশয় যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ; পরে অনেক বিলাপ করিয়া তিনি আমাকে জানাইলেন, পুলিস তাঁহাকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ ধরিয়া লইয়া আসে, তিনি আদবে খবর পান নাই যে, তাঁহাকে এমন ঘৃণিত কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। রক্ষিত মহাশয় অতি করুণভাবে এই হরণকাণ্ড বর্ণনা করেন। অপর সাক্ষী সমরনাথের ভাব অন্যরূপ, তিনি বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকৃত রাজভক্তের ন্যায় এই খানাতল্লাসীর কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, যেন to the manner born। খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটী রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটী ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। আমি খানাতল্লাসীতে বাক্স খোলা ভিন্ন আর কোন কার্য্যে যোগদান করি নাই। আমাকে কোন কাগজ বা চিঠি দেখান বা পড়িয়া শোনান হয় নাই, মাত্র অলকধারীর একখানা চিঠি ক্রেগান সাহেব নিজের মনোরঞ্জনার্থ উচ্চৈঃস্বরে পড়েন। বন্ধুবর বিনোদ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক ললিত পদবিন্যাসে ঘর কম্পিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, শেল্‌ফ হইতে বা আর কোথা হইতে কাগজ বা চিঠি বাহির করেন, মাঝে মাঝে ''অতি প্রয়োজনীয়, অতি প্রয়োজনীয়'' বলিয়া তাহা ক্রেগানকে সমর্পণ করেন। এই প্রয়োজনীয় কাগজগুলি কি তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সেই বিষয়ে কৌতূহলও ছিল না, কারণ আমি জানিতাম যে, আমার বাড়ীতে বিস্ফোরক পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কোনও কাগজ থাকা অসম্ভব।

আমার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পর পুলিস পাশের ঘরে আমাদের লইয়া যায়। ক্রেগান আমার ছোট মাসীর বাক্স খুলেন, একবার দুইবার চিঠিতে দৃষ্টিপাত করেন মাত্র, তৎপরে মেয়েদের চিঠি নিয়ে দরকার নাই, এই বলিয়া তাহা ছাড়িয়া যান। তারপর একতলায় পুলিস মহাত্মাদের আবির্ভাব। একতলায় বসিয়া ক্রেগান চা পান করেন, আমি এক পেয়ালা কোকো ও রুটী খাই, সেই সুযোগে সাহেব তাঁহার রাজনৈতিক মতগুলি যুক্তিতর্ক দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন — আমি অবিচলিতচিত্তে এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলাম। তবে জিজ্ঞাসা করি, না হয় শরীরের উপর অত্যাচার করা পুলিসের সনাতন প্রথা, মনের উপরও এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা কি unwritten law-এর চতুঃসীমার মধ্যে আসে? আশা করি আমাদের পরম মান্য দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন।

নীচের ঘরগুলি ও ‘‘নবশক্তি’’ আফিসের খানাতল্লাসীর পর পুলিস ‘‘নবশক্তি’’র একটী লোহার সিন্দুক খুলিতে আবার দোতালায় যায়। আধঘণ্টা চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল তখন তাহা থানায় লইয়া যাওয়াই ঠিক হইল। এইবার একজন পুলিস সাহেব একটী দ্বিচক্রযান আবিষ্কার করেন, তাহার উপর রেলের লেবেলে কুষ্ঠিয়ার নাম ছিল। অমনি কুষ্ঠিয়ায় সাহেবকে যে গুলি করে তাহারই বাহন বলিয়া এই গুরুতর প্রমাণ সানন্দে লইয়া যান।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। ফটকের বাহিরে আমার মেসো মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু গাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। মেসো মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে?’’ আমি বলিলাম, ‘‘আমি কিছুই জানি না, ইহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াই গ্রেপ্তার করেন, আমার হাতে হাতকড়ি দেন, বডি ওয়ারেণ্ট দেখান নাই।’’ মেসো মহাশয় হাতকড়ি হাতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিনোদ বাবু বলিলেন, ‘‘মহাশয়, আমার অপরাধ নাই, অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমিই সাহেবকে বলিয়া হাতকড়ি খুলাইয়া নিলাম।’’ ভূপেন বাবু অপরাধ জিজ্ঞাসা করায় গুপ্ত মহাশয় নরহত্যার ধারা দেখাইলেন; ইহা শুনিয়া ভূপেন বাবু স্তম্ভিত হইলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। পরে শুনিলাম, আমার সলিসিটর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়া খানাতল্লাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়।

আমাদের তিনজনকে থানায় লইয়া যাওয়া বিনোদ বাবুর ভার। থানায় তিনি

আমাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। সেইখানেই স্নান ও আহার করিয়া লালবাজারে রওনা হইলাম। লালবাজারে কয়েক ঘণ্টা বসাইয়া রয়ড্ ষ্ট্রীটে লইয়া যায়, সেই শুভ স্থানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইলাম। রয়ড্ ষ্ট্রীটে ডিটেক্টিভ পুঙ্গব মৌলবী শাম্স-উল-আলমের সহিত আমার প্রথম আলাপ ও প্রীতি স্থাপন হয়। মৌলবী সাহেবের তখন তত প্রভাব ও উৎসাহোদ্যম হয় নাই, বোমার মামলার প্রধান অন্বেষণকারী কিম্বা নর্টন সাহেবের prompter বা জীবন্ত স্মরণশক্তিরূপে তিনি তখন বিরাজ করেন নাই, রামসদয় বাবুই তখন এই মামলার প্রধান পাণ্ডা। মৌলবী সাহেব আমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় সরস বক্তৃতা শুনাইলেন। হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্লাম ধর্ম্মের একই মূলমন্ত্র, হিন্দুদের ওঙ্কারের ত্রিমাত্রা অ উ ম, কোরাণের প্রথম তিন অক্ষর অ ল ম, ভাষাতত্ত্বের নিয়মে ‘ল’-এর বদলে ‘উ’ ব্যবহার হয়, অতএব হিন্দু ও মুসলমানের একই মন্ত্র। তথাপি নিজের ধর্ম্মের পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, মুসলমানের সঙ্গে আহার করা হিন্দুর পক্ষে নিন্দনীয়। সত্যবাদী হওয়াও ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। সাহেবরা বলেন অরবিন্দ ঘোষ হত্যাকারী দলের নেতা, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা, তবে সত্যবাদিতা রক্ষা করিতে পারিলে situation saved হয়। মৌলবীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের ন্যায় উচ্চচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাই করিয়া থাকুন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজের মত ছাড়িলেন না। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রবল ধর্ম্মভাব দেখিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত ও প্রীত হইলাম। নিজে বেশী কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র বিবেচনা করিয়া নম্রভাবে তাঁহার অমূল্য উপদেশ শুনিয়া লইলাম এবং তাহা সযত্নে হৃদয়ে অঙ্কিত করিলাম। এত ধর্ম্মভাবে মাতোয়ারা হইয়াও মৌলবী সাহেব ডিটেক্টিভগিরি ছাড়েন নাই। একবার বলিলেন, “আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটী ছাড়িয়া দিলেন, বড় ভুল করিলেন, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।” তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া আমি একটু হাসিলাম; বলিলাম, “মহাশয়, বাগান যেমন আমার, তেমনি আমার ভাইয়ের, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িলাম, এ খবর কোথায় পাইলেন?” মৌলবী সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “না না, আমি বলিতেছি যদি তাহা করিয়া থাকেন।” এই মহাত্মা নিজের জীবনচরিতের একটী পাতা আমাকে খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন, “আমার জীবনে যত নৈতিক বা আর্থিক উন্নতি হইয়াছে,

আমার বাপের একটী অতিশয় মূল্যবান উপদেশই তাহার মূল কারণ। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, সম্মুখের অন্ন কখনও ছাড়িতে নাই। এই মহাবাক্য আমার জীবনের মূলমন্ত্র, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়াছি বলিয়া আমার এই উন্নতি।'' ইহা বলিবার সময় মৌলবী সাহেব যে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল যেন আমিই তাঁহার সম্মুখের অন্ন। সন্ধ্যাবেলায় স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তিনি আমার উপর অত্যন্ত দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, সকলকে আমার আহার ও শয্যা সম্বন্ধে যত্ন করিতে বলিলেন। পর মুহূর্ত্তে কয়েকজন আসিয়া আমাকে ও শৈলেন্দ্রকে লইয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লালবাজার হাজতে লইয়া যায়। রামসদয়ের সহিত এই একবার মাত্র আমার আলাপ হয়। বুঝিতে পারিলাম লোকটী বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, স্বর, চলন সবই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক, সর্ব্বদা যেন তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন। এইরূপ এক একজন আছে যাহাদের শরীর, বাক্য, চেষ্টা যেন অনৃতের অবতার। তাহারা কাঁচা মনকে ভুলাইতে মজবুত, কিন্তু যাহারা মনুষ্য চরিত্রে অভিজ্ঞ বা অনেক দিন লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের নিকট প্রথম পরিচয়েই তাহারা ধরা পড়ে।

লালবাজারে দোতালায় একটী বড় ঘরে আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে রাখা হইল। আহার হইল অল্পমাত্র জলখাবার। অল্পক্ষণ পরে দুইজন ইংরাজ ঘরে প্রবেশ করেন, পরে শুনিলাম একজন স্বয়ং পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব। দুইজনে একসঙ্গে আছি দেখিয়া হ্যালিডে সার্জ্জেণ্টের উপর চটিয়া উঠিলেন, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, খবরদার এই লোকটীর সঙ্গে যেন কেহই না থাকে বা কথা বলে। সেই মুহূর্ত্তেই শৈলেনকে অন্য ঘরে সরাইয়া বন্ধ করে। আর সকলে যখন চলিয়া যায়, হ্যালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ''এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপানার কি লজ্জা করে না?'' আমি বলিলাম, ''আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?'' উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন, ''আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।'' আমি বলিলাম, ''কি জানেন বা না জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি।'' হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।

সেই রাত্রে আমার আর কয়েকজন দর্শক আসে, ইহারাও পুলিস। ইহাদের আসার মধ্যে এক রহস্য নিহিত ছিল, সে রহস্য আমি আজ পর্য্যন্ত তলাইতে

পারি নাই। গ্রেপ্তারের দেড় মাস আগে একটী অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি বলেন, "মহাশয় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নাই, তবে আপনার উপর ভক্তি আছে বলিয়া আপনাকে সতর্ক করিতে আসিলাম, আর জানিতে চাই আপনার কোন্নগরের কোনও লোকের সঙ্গে কি আলাপ আছে, সেইখানে কখন কি গিয়াছিলেন বা সেখানে বাড়ী আছে কি?" আমি বলিলাম, "বাড়ী নাই, কোন্নগরে একবার গিয়াছিলাম, কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও আছে।" তিনি বলিলেন, "আর কিছু বলিব না তবে ইহার পর কোন্নগরের কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, আপনার ও আপনার ভাই বারীন্দ্রের বিরুদ্ধে দুষ্টেরা ষড়যন্ত্র করিতেছে, শীঘ্রই আপনাদিগকে তাহারা বিপদে ফেলিবে। আর আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" আমি বলিলাম, "মহাশয় এই অসম্পূর্ণ সংবাদে আমার কি উপকার হইল আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে উপকার করিতে আসিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ। আমি আর কিছু জানিতে চাই না। ভগবানের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তিনিই সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে নিজে চেষ্টা করা বা সতর্ক হওয়া নিষ্প্রয়োজন।" তাহার পরে এই সম্বন্ধে আর কোনও খবর পাই নাই। এই আমার অপরিচিত হিতৈষী যে মিথ্যা কল্পনা করেন নাই, এই রাত্রে তাহার প্রমাণ পাইলাম। একজন ইন্‌স্পেক্টার আর কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া কোন্নগরের সমস্ত কথা জানিয়া লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কোন্নগরে কি আপনার আদি স্থান? সেখানে বাড়ী আছে কি? সেইখানে কখনও গিয়াছিলেন? কবে গিয়াছিলেন? কেন গিয়াছিলেন? বারীন্দ্রের কোন্নগরে সম্পত্তি আছে কি?" — এইরূপ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপারটা কি ইহা বুঝিবার জন্য আমি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলাম না, তবে প্রশ্নগুলির ও পুলিসের কথার ধরণে বোঝা গেল যে পুলিসে কি খবর পাইয়াছে তাহা সত্য কি মিথ্যা এই অনুসন্ধান চলিতেছে। অনুমান করিলাম যেমন তাই-মহারাজের মোকদ্দমায় তিলককে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও অত্যাচারী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টায় বোম্বে গবর্ণমেণ্ট যোগদান করিয়া প্রজার অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন, — তেমনই এস্থলেও কয়েকজন আমাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

রবিবার সমস্তদিন হাজতে কাটিয়া গেল। আমার ঘরের সম্মুখে সিঁড়ি ছিল। সকালে দেখিলাম কয়েকজন অল্পবয়স্ক বালক সিঁড়িতে নামিতেছে। মুখ চিনি না কিন্তু আন্দাজে বুঝিলাম ইহারাও এই মোকদ্দমায় ধৃত, পরে জানিতে পারিলাম

ইহারা মানিকতলার বাগানের ছেলে। এক মাস পরে জেলে তাহাদের সঙ্গে আলাপ হয়। অল্পক্ষণ পরে হাত-মুখ ধুইতে আমাকেও নীচে লইয়া যায় — স্নানের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই স্নান করিলাম না। সেই দিন সকালে আহারের মধ্যে ডাল ভাত সিদ্ধ, কয়েক গ্রাস জোর করিয়া উদরস্থ করিলাম, তাহার পর তাহা ত্যাগ করিতে হইল। বিকাল বেলা মুড়ি। তিন দিন ইহাই আমাদের আহার ছিল। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে সোমবারে সার্জ্জেণ্ট আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা ও রুটী খাইতে দিলেন।

পরে শুনিলাম আমার উকিল কমিশনারের নিকট বাড়ী হইতে আহার দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, হ্যালিডে সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাও শুনিলাম যে, আসামীদের সঙ্গে উকিল বা এটর্ণীর দেখা করা নিষিদ্ধ। জানি না এই নিষেধ আইনসঙ্গত কিনা? উকিলের পরামর্শ পাইলে আমার যদিও সুবিধা হইত, তবে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকের মোকদ্দমার ক্ষতি হইয়াছে। সোমবারে কমিশনারদের নিকট আমাদের হাজির করে। আমার সঙ্গে অবিনাশ ও শৈলেন ছিল। সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দল করিয়া লইয়া যায়। আমরা তিনজনই পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম এবং আইনের জটিলতা কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়া তিনজনই কমিশনারের নিকট কোনও কথা বলিতে অস্বীকৃত হই। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট থর্ণহিলের কোর্টে আমাদের লইয়া যায়। এই সময় শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ম্যানুয়েল সাহেব আর আমার একজন আত্মীয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ম্যানুয়েল সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘পুলিসে বলে আপনার বাড়ীতে অনেক সন্দেহজনক লেখা পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ চিঠি বা কাগজ কি ছিল?’’ আমি বলিলাম, ‘‘নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ছিল না, থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।’’ অবশ্য তখন মিষ্টান্ন পত্র (‘sweets letter’) বা ‘scribbling’এর কথা জানিতাম না। আমার আত্মীয়কে বলিলাম, ‘‘বাড়ীতে ব’ল কোন ভয় যেন করে না, আমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।’’ আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা হইবেই। প্রথম নির্জ্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয় কিন্তু তিন দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চলা শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।

থর্ণহিল সাহেবের এজলাস হইতে আমাদের আলিপুরে গাড়ী করিয়া লইয়া যায়। এই দলে ছিল নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাসকে চিনিতাম, একবার মেদিনীপুরে তাঁহার বাড়ীতে উঠি। কে তখন

জানিত যে এইরূপ বন্দীভাবে জেলের পথে তাঁহার সহিত দেখা হইবে। আলিপুরে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কতক্ষণ থাকিতে হইল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আমাদের হাজির করা হয় নাই, কেবল ভিতর হইতে তাহার হুকুম লিখাইয়া আনে। আমরা আবার গাড়ীতে উঠিলাম, তখন একটী ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "শুনিতেছি ইহারা আপনার নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, হুকুম লেখা হইতেছে। হয়ত কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দিবে না। এইবার যদি বাড়ীর লোককে কিছু বলিতে চান, আমি সংবাদ পৌঁছাইয়া দিব।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু যাহা বলিবার ছিল, তাহা আমার আত্মীয়ের দ্বারা জানান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে আর কিছু বলিলাম না। আমার উপর দেশের লোকের সহানুভূতি ও অযাচিত অনুগ্রহের দৃষ্টান্তরূপে এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। তৎপরে কোর্ট হইতে আমরা জেলে গিয়া জেলের কর্ম্মচারীগণের হাতে সমর্পিত হই। জেলে ঢুকিবার আগে আমাদের স্নান করায়, জেলের পোষাক পরাইয়া পিরাণ, ধুতি, জামা সংশোধিত করিবার জন্য লইয়া যায়। চারি দিন পরে আমরা স্নান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। স্নানের পর তাহারা সকলকে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়, আমিও আমার নির্জ্জন কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পরবৎসর ৬ই মে নিষ্কৃতি পাই।

আমার নির্জ্জন কারাগৃহটী নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল। ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটী ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্রে, দরজা বন্ধ হইলে শান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টী ঘর পাশাপাশি, সেইগুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর — বিচারপতি বা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমে যাহাদের নির্জ্জন কারাবাসের দণ্ড নির্দ্ধারিত হয় তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকিতে হয়। এই নির্জ্জন কারাবাসেরও কম বেশী আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা হয়, তাহাদের উঠানের দরজা বন্ধ থাকে; মনুষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া শান্ত্রীর চক্ষু ও পরিবেশনকারী কয়েদীর দুবেলায় আগমন তাহাদের

জগতের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ। আমা হইতেও হেমচন্দ্র দাস সি. আই. ডি.-র আতঙ্কস্থল বলিয়া তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইল। এই সাজার উপরও সাজা আছে, — হাতে-পায়ে হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়া নির্জ্জন কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি কেবল জেলের শান্তিভঙ্গ করা বা মারামারির জন্য নয়, বার বার খাটুনিতে ত্রুটী হইলেও এই শাস্তি হয়। নির্জ্জন কারাবাসের মোকদ্দমার আসামীকে শাস্তিস্বরূপ এইরূপ কষ্ট দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ, তবে স্বদেশী বা 'বন্দে-মাতরম্'-কয়েদী নিয়মের বাহিরে, পুলিসের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও সুবন্দোবস্ত হয়।

আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষ আতিথ্য সৎকারের ত্রুটী করেন নাই। একখানা থালা ও একটী বাটী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্ব্বস্বস্বরূপ থালা-বাটীর এমন রূপার ন্যায় চাক্‌চিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দ্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে 'স্বর্গজাত' নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙ্গুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণ্যমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্টান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটীটীই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিষ ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্ব্বকার্য্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্ত্তা, পুলিস, শুল্কবিভাগের কর্ত্তা, মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবামাত্র হইতে পারে, — যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগকর্ত্তা, পুলিস বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষে কৌন্‌সিলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতিসম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটীরও তদ্রূপ। বাটীর জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটীতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটীতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটীতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটীতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্ব্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটী আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগসাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও

উপদেষ্টা কোথায় পাইব? নির্জ্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়, — কর্ত্তৃপক্ষেরা শৌচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাসকালে এতদ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ হইল। শৌচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত। বলা হইয়াছে, নির্জ্জন কারাবাস বিশেষ শাস্তির মধ্যে গণ্য এবং সেই শাস্তির মূলতত্ত্ব যথাসাধ্য মনুষ্য সংসর্গ ও মুক্ত আকাশ সেবা বর্জ্জন। বাহিরে শৌচের ব্যবস্থা হইলে এই তত্ত্ব ভঙ্গ হয় বলিয়া ঘরের ভিতরেই দুইখানা আল্কাতরা মাখান টুকরী দেওয়া হইত। সকালে ও বিকাল বেলায় মেথর আসিয়া তাহা পরিষ্কার করিত, তীব্র আন্দোলন ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলে অন্য সময়েও পরিষ্কার করা হইত, কিন্তু অসময়ে পায়খানায় গেলে প্রায়ই প্রায়শ্চিত্তরূপে কয়েক ঘণ্টা দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত। নির্জ্জন কারাবাসের দ্বিতীয় পালায় এই সম্বন্ধে কতকটা রিফরম্ হয়, কিন্তু ইংরাজের রিফরম্ হইতেছে পুরাতন আমলের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া শাসনপ্রণালী সংশোধন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র ঘরে এমন ব্যবস্থা থাকায় সর্ব্বদা, বিশেষতঃ আহারের সময় এবং রাত্রিতে বিশেষ অসোয়াস্তি ভোগ করিতে হইত। জানি, শোবার ঘরের পার্শ্বে পায়খানা রাখা, স্থানে স্থানে বিলাতী সভ্যতার অঙ্গবিশেষ, কিন্তু একটী ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানা — ইহাকেই too much of a good thing বলে। আমরা কু-অভ্যাসগ্রস্ত ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পৌঁছা আমাদের পক্ষে কষ্টকর।

গৃহসামগ্রীর মধ্যে আরও ছিল একটী স্নানের বাল্তী, জল রাখিবার একটী টিনের নলাকার বাল্তী এবং দুটী জেলের কম্বল। স্নানের বাল্তী উঠানে রাখা হইত, সেইখানে স্নান করিতাম। আমার ভাগ্যে প্রথমতঃ জলকষ্ট ছিল না কিন্তু তাহা পরে ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ পার্শ্বের গোয়াল ঘরের কয়েদী স্নানের সময় আমার ইচ্ছামত বাল্তীতে জল ভরিয়া দিত, সেইজন্য স্নানের সময়ই জেলের তপস্যার মধ্যে প্রত্যহ গৃহস্থের বিলাসবৃত্তি ও সুখপ্রিয়তাকে তৃপ্ত করিবার অবসর। অপর আসামীদের ভাগ্যে ইহাও ঘটে নাই, এক বাল্তীর জলেই তাহাদিগকে শৌচক্রিয়া, বাসন মাজা ও স্নান সম্পন্ন করিতে হইত। মোকদ্দমার আসামী বলিয়া এই অতিমাত্র বিলাস করিতে দেওয়া হইত, কয়েদীদের দুই-চারি বাটী জলে স্নান হইত। ইংরাজেরা বলে ভগবৎ প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুর্লভ সদ্গুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ

অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছাজনিত তপস্যায় রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আসামীরা কর্ত্তৃপক্ষদের এই দয়াকে কাকের স্নান বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। মানুষমাত্রই অসন্তোষপ্রিয়। স্নানের ব্যবস্থা হইতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। তখন গ্রীষ্মকাল, আমার ক্ষুদ্র ঘরে বাতাসের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মে মাসের উগ্র ও প্রখর রৌদ্র অবাধে প্রবেশ করিত। ঘরটী উত্তপ্ত উনুনের মত হইয়া উঠিত। এই উনুনে সিদ্ধ হইতে হইতে অদম্য জলতৃষ্ণা লাঘব করিবার উপায় ওই টিনের বাল্‌তীর অর্দ্ধ-উষ্ণ জল। বার বার তাহা পান করিতাম, তৃষ্ণা ত যাইতই না বরং স্বেদ নির্গমন এবং অল্পক্ষণে নবীভূত তৃষ্ণাই লাভ হইত। তবে এক একজনের উঠানে মাটীর কলসী রাখা ছিল, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যা স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিতেন। ইহাতে ঘোর পুরুষার্থবাদীকেও অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইতে হয়, কাহারও ভাগ্যে ঠাণ্ডা জল জুটিত, কাহারও ভাগ্যে তৃষ্ণা লাগিয়াই থাকিত, সব কপালের জোর। কর্ত্তৃপক্ষেরা কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া কলসী বা টিন বিতরণ করিতেন। এই যদৃচ্ছা লাভে আমি সন্তুষ্ট হইলে বা না হইলেও আমার জলকষ্ট জেলের সহৃদয় ডাক্তারবাবুর অসহ্য হয়। তিনি কলসী যোগাড় করিতে উদ্যোগী হন, কিন্তু এই সব বন্দোবস্তে তাঁহার হাত নাই বলিয়া তিনি অনেক দিন তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, শেষে তাঁহারই কথায় মুখ্য জমাদার কোথা হইতে কলসী আবিষ্কার করিল। তাহার আগেই আমি তৃষ্ণার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে পিপাসামুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই তপ্ত গৃহে আবার জেলে তৈয়ারী করা দুইটী মোটা কম্বলই আমাদের বিছানা। বালিস নাই, কাজেই একটী কম্বল পাতিয়া আর একটী কম্বল পাট করিয়া বালিস বানাইয়া শুইতাম। যখন গরমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটীতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ করিতাম। মাতা বসুন্ধরার শীতল উৎসঙ্গ স্পর্শের কি সুখ, তাহা তখন বুঝিতাম। তবে জেলে সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ বড় কোমল নয়, তদ্দ্বারা নিদ্রার আগমন বাধা-প্রাপ্ত হইত বলিয়া কম্বলের শরণ লইতে হইত। যে দিন বৃষ্টি হইত সেদিন বড় আনন্দের দিন হইত। ইহাতেও একটী এই অসুবিধা ছিল যে, ঝড়বৃষ্টি হইলেই ধূলা, পাতা ও তৃণসঙ্কুল প্রভঞ্জনের তাণ্ডব নৃত্যের পর আমার খাঁচার মধ্যে ছোটখাট একটী জলপ্লাবন হইত। তাহার পরে রাত্রিতে ভিজা কম্বল লইয়া ঘরের কোণে পলায়ন ভিন্ন উপায় ছিল না। প্রকৃতির এই লীলা বিশেষ সাঙ্গ হইলেও জলপ্লাবিত মাটী যতক্ষণ না শুকাইত ততক্ষণ নিদ্রার আশা পরিত্যাগ

পূর্ব্বক চিন্তার আশ্রয় লইতে হইত, কেননা শৌচক্রিয়ার সামগ্রীর নিকটই একমাত্র শুষ্কস্থল থাকিত কিন্তু সেই দিকে কম্বল পাতিতে প্রবৃত্তি হইত না। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও ঝড়ের দিনে ভিতরে প্রচুর বাতাস আসিত এবং ঘরের সেই তপ্ত উনুন-তাত বিদূরিত হইত বলিয়া ঝড়বৃষ্টিকে সাদরে স্বাগত করিতাম।

আলিপুর গবর্ণমেণ্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম, এবং ভবিষ্যতে আরও করিব, তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়; — সুসভ্য বৃটিশ রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, নির্দ্দোষীর দীর্ঘকালব্যাপী কি যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব কষ্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া দৃষ্টি ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে — কি উপায়ে তাহা পরে বলিব — মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। যখন সর্ব্বপ্রথম জেলের বিচিত্র পোষাক পরিয়া আমার পিঞ্জরে ঢুকিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম, তখন এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগে বুঝিয়া লইয়াছিলাম; সেইজন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম না। সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় অনুদার ও নিন্দনীয়। আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে জমিদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকের সমকক্ষ। আমরা যে অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন চুরি ডাকাতি নয়; দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ-চেষ্টা করা বা সমরোদ্যোগের ষড়যন্ত্র। তাহাতেও অনেকের দোষের সম্বন্ধে প্রমাণের নিতান্ত অভাব, পুলিসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র কারণ। এইরূপ স্থলে সামান্য চোর-ডাকাতদের মত রাখা — চোর-ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ান, জলকষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করান, ইহাতে বৃটিশ রাজপুরুষদের ও বৃটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রগত দোষ। ইংরাজদের দেহে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলেও শত্রু বা বিরুদ্ধাচরণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাঁহারা ষোল-আনা বেনে। আমার কিন্তু তখনও বিরক্তি-ভাব মনে স্থান পায় নাই, বরং আমার ও

দেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই দেখিয়া একটু আনন্দিত হইয়াছিলাম, অধিকন্তু এই ব্যবস্থা মাতৃভক্তির প্রেমভাবে আহুতি দান করিল। একে বুঝিলাম যোগ শিক্ষা ও দ্বন্দ্বজয়ে অপূর্ব্ব উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি চরমপন্থী দলের একজন, যাহাদের মতে প্রজাতন্ত্র এবং ধনী-দরিদ্রে সাম্য জাতীয় ভাবের একটী প্রধান অঙ্গ। মনে পড়িল সেই মতকে কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য বলিয়া সুরাট যাত্রার সময় সকলে এক সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম, ক্যাম্পে নেতারা নিজেদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না করিয়া সকলের সঙ্গে একভাবে এক ঘরে শুইতাম। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, বাঙ্গালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক সঙ্গে থাকিতাম, শুইতাম, খাইতাম। মাটীতে শয্যা, ডাল ভাত দহিই আহার, সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী ধরণের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বে সহরের বিলাত-ফেরত ও মাদ্রাজের তিলক কাটা ব্রাহ্মণসন্তান এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী, আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম-বাগ্‌দীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মানমর্য্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম সর্ব্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবনব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। যেদিন জন্মভূমিরূপিণী জগজ্জননীর পবিত্র মণ্ডপে দেশের সর্ব্ব শ্রেণী ভ্রাতৃভাবে একপ্রাণ হইয়া জগতের সম্মুখে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইবেন, সহবাসী আসামী ও কয়েদীদের প্রেমপূর্ণ আচরণে এবং রাজপুরুষদের এই সাম্যভাবে এই কারাবাসে হৃদয়ের মধ্যে সেই শুভদিনের পূর্ব্বাভাস লাভ করিয়া কতবার হর্ষান্বিত ও পুলকিত হইতাম। সেদিন দেখিলাম পুনার "Indian Social Reformer" আমার একটী সহজ বোধগম্য উক্তি লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, "জেলে ভগবৎ-সান্নিধ্যের বড় ছড়াছড়ি হইল দেখিতেছি!" হায়, মানসম্ভ্রমান্বেষী অল্প বিদ্যায়, অল্প সদ্‌গুণে গর্ব্বিত মানুষের অহঙ্কার ও অল্পতা! জেলে, কুটীরে, আশ্রমে, দুঃখীর হৃদয়ে ভগবৎ-প্রকাশ না হইয়া বুঝি ধনীর বিলাস-মন্দিরে বা সুখান্বেষী স্বার্থান্ধ সংসারীর আরাম-শয্যায় তাহা সম্ভব? ভগবান বিদ্যা, সম্ভ্রম, লোকমান্যতা, লোকপ্রশংসা, বাহ্যিক স্বচ্ছন্দতা ও সভ্যতা দেখেন না। তিনি দুঃখীর নিকটেই দয়াময়ী মাতৃরূপ প্রকাশ করেন। যিনি মানবমাত্রে, জাতিতে, স্বদেশে, দুঃখী গরীব পতিত পাপীতে নারায়ণকে দেখিয়া সেই নারায়ণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন তাঁহারই হৃদয়ে নারায়ণ আসিয়া বসেন। আর উত্থানোদ্যত পতিত জাতির মধ্যে দেশসেবকের

নির্জ্জন কারাগারেই ভগবৎ-সান্নিধ্যের ছড়াছড়ি সম্ভব।

জেলর আসিয়া কম্বল ও থালা-বাটীর বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলে পর আমি কম্বলের উপরে বসিয়া জেলের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এই নির্জ্জন কারাবাস লালবাজার হাজত হইতে অনেক ভাল বোধ হইল। সেখানে সেই প্রকাণ্ড ঘরের নির্জ্জনতা যেন বিশাল বপু ছড়াইবার অবকাশ পাইয়া আরও নির্জ্জনতা বৃদ্ধি করে। এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ যেন নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। সেইখানে দোতালার ঘরের অতি উচ্চ জানালা দিয়া বাহিরের আকাশও দেখা যায় না, এই জগতে গাছপালা, মানুষ, পশু-পক্ষী, বাড়ী-ঘর যে আছে তাহা অনেকবার কল্পনা করা কঠিন হয়। এই স্থানে উঠানের দরজা খোলা থাকায় গরাদের নিকটে বসিলে বাহিরে জেলের খোলা জায়গা ও কয়েদীদের যাতায়াত দেখা যায়। উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটী বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিক্রীর ছয়টী ঘরের সামনে যে শান্ত্রী ঘুরিয়া থাকে, তাহার মুখ ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জ্জন কারাবাসে অপূর্ব্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যেও আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশু-পক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেমস্রোত প্রায় বহিত না। মনে আছে রবি বাবুর একটী কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দেখিয়াছিলাম। এখন পড়িলে তাহা অন্য চক্ষে দেখিতাম। আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্ব্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু, পাখী, পিপীলিকা পর্য্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে।

কারাবাসের প্রথম দিন শান্তিতে কাটিয়া গেল। সবই নূতন, তাহাতে মনে স্ফূর্ত্তি হইল। লালবাজার হাজতের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই অবস্থাতেই প্রীতিলাভ করিলাম এবং ভগবানের উপর নির্ভর ছিল বলিয়া এখানে নির্জ্জনতা বোধ হয় নাই। জেলের আহারের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়াও এই ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কত প্রকার

মশলা দেওয়া, — স্বাদহীন ডালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাস-পাতা শুদ্ধ শাক। মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন ও নিঃসার হইতে পারে, তাহা আমি আগে জানিতাম না। এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জ্জন করিলাম। সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারী জোটে, এবং একবার কোন প্রকার তরকারী আরম্ভ হইলে তাহা অনন্তকাল চলিতে থাকে। এই সময় শাকের রাজত্ব ছিল। দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, কিন্তু দুবেলা শাকের তরকারী, ঐ ডাল, ঐ ভাত। জিনিষটা বদলান দূরের কথা, চেহারারও লেশমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহার ঐ নিত্য সনাতন অনাদ্যনন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ। দুই সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েদীকে এই নশ্বর মায়াজগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবে। এই বিষয়েও অন্য আসামী হইতে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তাহাও ডাক্তারবাবুর দয়ায়। তিনি আমার জন্য হাসপাতাল হইতে দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদ্দারা কয়েকদিন শাক-দর্শন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

সেই রাত্রে সকাল সকাল ঘুমাইলাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত নিদ্রাভোগ করা নির্জ্জন কারাবাসের নিয়ম নয়, তাহাতে কয়েদীর সুখপ্রিয়তা জাগিতে পারে। সেই জন্য এই নিয়ম আছে যে, যতবার পাহারা বদলায়, ততবার কয়েদীকে ডাক হাঁক করিয়া উঠাইতে হয়, সাড়া না দিলে ছাড়িতে নাই। যাঁহারা যাঁহারা ছয় ডিক্রীতে পাহারা দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ ছিলেন, — সিপাহীদের মধ্যে প্রায়ই কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতির ভাব অধিক ছিল, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদের স্বভাব এইরূপ। কয়েকজন কিন্তু ছাড়ে নাই। তাহারা আমাদিগকে এইরূপে উঠাইয়া এই কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত, "বাবু ভাল আছেন ত?" এই অসময় রহস্য সব সময় প্রীতিকর হইত না, তবে বুঝিলাম যাহারা এইরূপ করিতেছে তাহারা সরলভাবে নিয়ম বলিয়া আমাদিগকে উঠাইতেছে। কয়েকদিন বিরক্ত হইয়াও ইহা সহ্য করিলাম, শেষে নিদ্রা রক্ষার জন্য ধমক দিতে হইল। দুই চারিবার ধমক দিবার পরে দেখিলাম, রাত্রে কুশল সংবাদ নেওয়া প্রথা আপনিই উঠিয়া গেল।

পরদিন সকালে চারিটা বাজিয়া পনের মিনিটে জেলের ঘণ্টা বাজিল। কয়েদীদের উঠাইবার জন্য এই প্রথম ঘণ্টা। কয়েক মিনিট পর আবার ঘণ্টা বাজে, তাহার পর কয়েদীরা ফাইলে বাহিরে আসে, হাত মুখ ধুইয়া লফ্সী খাইয়া খাটুনি আরম্ভ করে। এত ঘণ্টা বাজানোর মধ্যে ঘুম হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া আমিও উঠিলাম।

৫টার সময় গরাদ খোলা হয়, আমি হাত-মুখ ধুইয়া আবার ঘরে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে লফ্‌সী আমার দরজায় হাজির হইল কিন্তু সেই দিন তাহা খাই নাই, কেবল তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইল। ইহার কয়েকদিন পরে প্রথমবার এই পরমান্ন ভোগ হয়। লফ্‌সীর অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফ্‌সীর ত্রিমূর্ত্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফ্‌সীর প্রাজ্ঞভাব, অমিশ্রিত মূলপদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্রমূর্ত্তি। দ্বিতীয় দিন লফ্‌সীর হিরণ্যগর্ভ, ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে লফ্‌সীর বিরাট মূর্ত্তি অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ, কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যের ব্যবহার যোগ্য। আমি প্রাজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ সেবন সাধারণ মর্ত্য মনুষ্যের অতীত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, এক একবার বিরাটের দুগ্রাস উদরস্থ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের নানা সদ্‌গুণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ দরের humanitarianism ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইতাম। বলা উচিত লফ্‌সীই বাঙ্গালী কয়েদীর একমাত্র পুষ্টিকর আহার, আর সবই সারশূন্য। তাহা হইলেও বা কি হইবে? তাহার যেরূপ স্বাদ, তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই খাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়।

সেদিন সাড়ে এগারটার সময় স্নান করিলাম। প্রথম চারি পাঁচ দিন বাড়ী হইতে যাহা পরিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই পরিয়া থাকিতে হইল। তবে স্নানের সময় যে গোয়ালঘরের বৃদ্ধ কয়েদী ওয়ার্ডার আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি একটী এণ্ডির দেড় হাত চওড়া কাপড় যোগাড় করিয়াছিলেন, আমার একমাত্র বস্ত্র শুকান পর্য্যন্ত ইহা পরিয়া বসিয়া থাকিতাম। আমায় কাপড় কাচিতে বা বাসন মাজিতে হইত না, গোয়ালঘরের একজন কয়েদী ইহা করিত। এগারটার সময় খাওয়া। ঘরে চুপড়ীর সান্নিধ্য বর্জ্জন করিবার জন্য গ্রীষ্মের রৌদ্র সহ্য করিয়া প্রায়ই উঠানে খাইতাম। শান্ত্রীও ইহাতে বাধা দিতেন না। সন্ধ্যার খাওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটার সময় হইত। তাহার পর আর গরাদ খোলা নিষিদ্ধ ছিল। সাতটার সময় সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজে। মুখ্য জমাদার কয়েদী ওয়ার্ডারদের একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম পড়িয়া যান, তাহার পরে সকলে স্ব স্ব স্থানে যায়। শ্রান্ত কয়েদী নিদ্রার শরণ লইয়া জেলের সেই একমাত্র সুখ অনুভব করে। এই সময় দুর্ব্বলচেতা নিজের দুর্ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ জেলদুঃখ ভাবিয়া কাঁদে। ভগবদ্ভক্ত, নীরব রাত্রিতে ঈশ্বর-সান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রার্থনায় বা ধ্যানে আনন্দ ভোগ করেন। রাত্রিতে এই দুর্ভাগ্য-পতিত সমাজ-পীড়িত তিন সহস্র ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীর

সেই আলিপুর জেল স্বরূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রণাগৃহ বিশাল নীরবতায় মগ্ন হয়।

যাঁহারা আমার সঙ্গে এক অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁহাদের সঙ্গে জেলে প্রায়ই দেখা হইত না। তাঁহারা স্বতন্ত্র স্থানে রক্ষিত ছিলেন। ছয় ডিক্রীর পশ্চাদ্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের দুটী লাইন ছিল, এই দুটী লাইনে সব শুদ্ধ চুয়াল্লিশটী ঘর, সেই জন্য ইহাকে চুয়াল্লিশ ডিক্রী বলে। এই ডিক্রীর একটী লাইনে অধিকাংশ আসামীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা cell-এ আবদ্ধ হইয়াও নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করেন নাই, কেন না এক ঘরে তিনজন করিয়া থাকিতেন। জেলের অন্য দিকে আর একটী ডিক্রী ছিল, তাহাতে কয়েকটী বড় ঘর ছিল; এক একটী ঘরে বারজন পর্য্যন্ত থাকিতে পারিত। যাঁহাদের ভাগ্যে এই ডিক্রী পড়িত, তাঁহারা অধিক সুখে থাকিতেন। এই ডিক্রীতে অনেকে এক ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা রাত দিন গল্প করিবার অবসর ও মনুষ্য-সংসর্গ লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে একজন এই সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ইনি হেমচন্দ্র দাস। জানি না কেন ইঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ ভয় অথবা ক্রোধ ছিল, এত লোকের মধ্যে নির্জ্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের নিজের ধারণা ছিল যে, পুলিস অশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দোষ স্বীকার করাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার উপর এই ক্রোধ। তাঁহাকে এই ডিক্রীর একটী অতি ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখা হইত। বলিয়াছি, ইহাই এই বিশেষ সাজার চরম অবস্থা। মাঝে মাঝে পুলিস নানা জাতির, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির সাক্ষী আনাইয়া identification প্রহসন অভিনয় করাইত। তখন আমাদের সকলকে আফিসের সম্মুখে এক দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইত। জেলের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের সঙ্গে জেলের অন্য অন্য মোকদ্দমার আসামী মিশাইয়া তাহাদিগকে দেখাইতেন। ইহা কিন্তু নামের জন্য। এই আসামীদের মধ্যে শিক্ষিত বা ভদ্রলোক একজনও ছিল না, যখন তাহাদের সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতাম, তখন এই দুই প্রকার আসামীবর্গের এত অমিল থাকিত যে, এক দিকে বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত বালকদের তেজস্বী তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকাশক মুখের ভাব ও গঠন এবং অন্যদিকে সাধারণ আসামীর মলিন পোষাক ও নিস্তেজ মুখের চেহারা দেখিয়া কে কোন শ্রেণীর লোক তাহা যিনি নির্ণয় করিতে না পারিতেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ কেন, নিকৃষ্ট মনুষ্যবুদ্ধিরহিত বলিতে হয়। এই identification প্যারেড আসামীদের অপ্রিয়

ছিল না। এতদ্বারা জেলের একঘেয়ে জীবনে একটী বৈচিত্র্য হইত, এবং পরস্পরকে দুটী কথাও বলিবার অবকাশ পাওয়া যাইত। গ্রেপ্তারের পর এইরূপ একটী প্যারেডে আমার ভাই বারীন্দ্রকে প্রথম দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে তখন কথা হয় নাই। প্রায়ই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই আমার পার্শ্বে দাঁড়াইতেন, সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে তখন এই সময়ে আলাপ একটু অধিক হইয়াছিল। গোঁসাই অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, ফরসা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায় কিন্তু তাঁহার চোখের ভাব কুবৃত্তি প্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমত্তার কোন লক্ষণ পাই নাই। এই বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ প্রভেদ ছিল। তাঁহাদের মুখে প্রায়ই উচ্চ ও পবিত্র ভাব অধিক এবং কথায় প্রখর বুদ্ধি, জ্ঞানলিপ্সা ও মহৎ স্বার্থহীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইত। গোঁসাইয়ের কথা নির্ব্বোধ ও লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খালাস পাইবেন। তিনি বলিতেন, "আমার বাবা মোকদ্দমার কীট, তাঁহার সঙ্গে পুলিস কখনও পারিবে না। আমার এজাহারও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না, প্রমাণিত হইবে পুলিস আমাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি পুলিসের হাতে ছিলে। সাক্ষী কোথায়?" গোঁসাই অম্লানবদনে বলিলেন, "আমার বাবা কত শত মোকদ্দমা করিয়াছেন, ও সব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব হইবে না।" এইরূপ লোকই Approver হয়।

ইতিপূর্ব্বে আসামীর অনর্থক অসুবিধা ও নানা কষ্টের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ইহাও বলা উচিত যে এই সকলই জেলের প্রণালীর দোষ; এই সকল কষ্ট জেলের কাহারও ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা বা মনুষ্যোচিত গুণের অভাবে হয় নাই। বরং আলিপুর জেলে যাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল, তাঁহারা সকলেই অতিশয় ভদ্র, দয়াবান এবং ন্যায়পরায়ণ। যদি কোন জেলে কয়েদীর যন্ত্রণার কম হয়, য়ুরোপীয় জেল প্রণালীর অমানুষিক বর্ব্বরতা দয়ায় ও ন্যায়পরায়ণতায় লঘুকৃত হয়, তবে আলিপুর জেলে ও এমারসন সাহেবের রাজত্বে সেই মন্দের ভাল ঘটিয়াছে। এই ভাল হইবার দুটী প্রধান কারণ জেলের ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এমারসন সাহেব ও বাঙ্গালী হাসপাতাল আসিষ্টাণ্ট ডাক্তার বৈদ্যনাথ চাটার্জ্জীর অসাধারণ গুণ। ইঁহাদের মধ্যে একজন য়ুরোপের লুপ্তপ্রায় খৃষ্টান আদর্শের অবতার, অপরটী হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম দয়া ও পরোপকারের জীবন্ত মূর্ত্তি। এমারসন সাহেবের মত ইংরাজ আর এই দেশে বড় আসে না, বিলাতেও আর বড় জন্মায় না। তাঁহার শরীরে খৃষ্টান gentleman-এর যে সকল গুণ হওয়া উচিত, সকলই এক

সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি শান্তিপ্রিয়, বিচারশীল, দয়াদাক্ষিণ্যে অতুলনীয়, ন্যায়বান; ভদ্র ব্যবহার ভিন্ন অধমের প্রতিও অভদ্রতা প্রকাশ করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম, সরল, অকপট, সংযমী। দোষের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও উদ্যম কম ছিল, জেলরের উপর সমুদয় কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। ইহাতে যে বড় বেশী ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় না। জেলর যোগেন্দ্র বাবু দক্ষ ও যোগ্য পুরুষ ছিলেন, বহুমূত্র রোগে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াও স্বয়ং কার্য্য দেখিতেন এবং সাহেবের স্বভাব চিনিতেন বলিয়া জেলে ন্যায়নিষ্ঠা ও ক্রূরতার অভাবই রক্ষা করিতেন। তবে তিনি এমারসনের মত মহাত্মা লোক ছিলেন না, সামান্য বাঙ্গালী সরকারী ভৃত্য মাত্র, সাহেবের মন রাখিতে জানিতেন, দক্ষতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত কর্ম্ম করিতেন, স্বাভাবিক ভদ্রতা ও শান্তভাবের সহিত লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, ইহা ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোন বিশেষ গুণ লক্ষ্য করি নাই। চাকরীর উপর তাঁহার প্রবল মায়া ছিল। বিশেষতঃ তখন মে মাস, পেনশন নিবার সময় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, জানুয়ারীতে পেনশন নিয়া দীর্ঘ পরিশ্রমোপার্জ্জিত বিশ্রাম ভোগ করিবার আশা তখন বর্ত্তমান ছিল। আলিপুরের বোমার মোকদ্দমার আসামীর আবির্ভাব দেখিয়া আমাদের জেলর মহাশয় নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। এই সকল উগ্রস্বভাব তেজস্বী বাঙ্গালী বালক কোন্ দিনে কি কাণ্ড করিয়া বসিবেন, এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন, তালগাছে চড়িতে আর দেড় ইঞ্চি বাকী। কিন্তু সেই দেড় ইঞ্চির অর্দ্ধেকটা মাত্র তিনি চড়িতে পারিয়াছিলেন। আগস্ট মাসের শেষেই বোকানন সাহেব জেলে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। জেলর মহাশয় আনন্দে বলিলেন, ''আমার কর্ম্মকালে এই সাহেবের শেষ আসা, আর পেনশনের ভয় নাই।'' হায়, মানুষ মাত্রের অন্ধতা! কবি যথার্থই বলিয়াছেন, বিধি দুঃখী মনুষ্যের দুটী পরম উপকার করিয়াছেন। প্রথম, ভবিষ্যৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, দ্বিতীয়, তাহার একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনাস্থল স্বরূপ অন্ধ আশা তাহাকে দিয়াছেন। এই উক্তির চার পাঁচদিন পরেই নরেন গোঁসাই কানাইয়ের হস্তে হত হইলেন, বোকাননের জেলে ঘন ঘন আসা আরম্ভ হইল। তাহার ফলে যোগেন্দ্র বাবুর অকালে কর্ম্ম গেল এবং শোক ও রোগের মিলিত আক্রমণে তাঁহার দেহত্যাগও ঘটিল। এইরূপ কর্ম্মচারীর উপর সম্পূর্ণ ভার না দিয়া এমারসন সাহেব যদি স্বয়ং সব কার্য্য দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকালে আলিপুর জেলের অধিক সংস্কার ও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ছিল।

তিনি যতটুকু দেখিতেন, তাহা সুসম্পন্নও করিতেন, তাঁহার চরিত্রগত গুণেও জেলটী নরক না হইয়া মানুষের কঠোর শাস্তির স্থানই হইয়া রহিয়াছিল। তিনি অন্যত্র গেলেও তাঁহার সাধুতার ফল সম্পূর্ণ ঘুচে নাই, এখনও পরবর্ত্তী কর্ম্মচারীগণ তাঁহার সাধুতা দশ আনা বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

যেমন জেলের অন্যান্য বিভাগে বাঙ্গালী যোগেন বাবু হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন, তেমনই হাসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তার বৈদ্যনাথ বাবু সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী ডাক্তার ডেলি, এমারসন সাহেবের ন্যায় দয়াবান না হইয়াও অতিশয় ভদ্রলোক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালকদের শান্ত আচরণ, প্রফুল্লতা ও বাধ্যতা দেখিয়া অশেষ প্রশংসা করিতেন এবং অল্প বয়স্কদের সহিত হাসিতামাসা ও অপর আসামীদের সহিত রাজনীতি, ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক চর্চ্চা করিতেন। ডাক্তার সাহেব আইরিশ বংশজাত, সেই উদার ও ভাবপ্রবণ জাতির অনেক গুণ তাঁহার শরীরে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তাঁহার লেশমাত্র ক্রূরতা ছিল না, এক একবার ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া রূঢ় কথা বা কঠোর আচরণ করিতেন কিন্তু প্রায়ই উপকার করাই তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি জেলের কয়েদীদের চাতুরী ও কৃত্রিম রোগ দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এমনও হইত যে প্রকৃত রোগীকেও এই কৃত্রিমতার ভয়ে উপেক্ষা করিতেন, তবে প্রকৃত রোগ বুঝিতে পারিলে অতি যত্ন ও দয়ার সহিত রোগীর ব্যবস্থা করিতেন। আমার একবার সামান্য জ্বর হয়। তখন বর্ষাকাল, অনেক বাতায়নযুক্ত প্রকাণ্ড দালানে জলসিক্ত মুক্ত বায়ু খেলা করিত, তথাপি আমি হাসপাতালে যাইতে বা ঔষধ খাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং ঔষধ সেবনে আমার আর বড় আস্থা ছিল না, রোগ কঠোর না হইলে প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়াতেই স্বাস্থ্যলাভ হইবে, এই বিশ্বাস ছিল। বর্ষার বাতাস স্পর্শে যাহা অনিষ্ট হওয়া সম্ভব, তাহা যোগবলে দমন করিয়া নিজের তর্কবুদ্ধির নিকট আমার যোগশিক্ষাগত ক্রিয়া সকলের যাথার্থ্য ও সফলতা প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা ছিল। ডাক্তার সাহেব কিন্তু আমার জন্য মহা চিন্তিত ছিলেন, বড় আগ্রহের সহিত তিনি হাসপাতালে যাইবার প্রয়োজনীয়তা আমাকে বুঝাইলেন। সেইস্থানে গমন করিলে যতদূর সম্ভব নিজের বাড়ীর মত থাকিবার খাইবার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সাদরে রাখিলেন। পাছে ওয়ার্ডে থাকিলে বর্ষার জন্য আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এইজন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমাকে অনেকদিন এই সুখে রাখেন। কিন্তু আমি

জোর করিয়া ওয়ার্ডে ফিরিয়া গেলাম, আর হাসপাতালে থাকিতে অসম্মত হইলাম। তাঁহার সকলের উপর সমান অনুগ্রহ ছিল না, বিশেষতঃ যাঁহারা পুষ্টশরীর ও বলবান ছিলেন, তাঁহাদের রোগ হইলেও হাসপাতালে রাখিতে ভয় করিতেন। তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে যদি জেলে কোনও কাণ্ড হয় তাহা সবল ও চঞ্চল বালকদের দ্বারা হইবে। শেষে ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইল, হাসপাতালে যে কাণ্ড ঘটিল, তাহা ব্যাধিগ্রস্ত, বিশীর্ণ, শুষ্ককায় সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং রোগক্লিষ্ট ধীরপ্রকৃতি অল্পভাষী কানাইলাল ঘটাইলেন। ডাক্তার ডেলির এই সকল গুণ থাকিলেও বৈদ্যনাথ বাবুই তাঁহার অধিকাংশ সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক ও প্রেরণাদায়ক ছিলেন। বাস্তবিক বৈদ্যনাথ বাবুর ন্যায় হৃদয়বান লোক আমি আগেও দেখি নাই, পরেও দেখিবার আশা করি না, তিনি যেন দয়া ও উপকার করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোনও দুঃখ কাহিনী অবগত হওয়া এবং তাহা লাঘব করিবার জন্য ধাবিত হওয়া তাঁহার চরিত্রে যেন স্বাভাবিক কারণ ও অবশ্যম্ভাবী কার্য্য হইয়াছিল। তিনি এই যন্ত্রণাপূর্ণ দুঃখালয়ে যেন নরকের প্রাণী সকলকে স্বর্গের সযত্ন সঞ্চিত নন্দনবারি বিতরণ করিতেন। কোনও অভাব, অন্যায় বা অনর্থক কষ্ট অপনোদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাহা ডাক্তারবাবুর কর্ণে পৌঁছাইয়া দেওয়া। তাহা অপনোদন করা তাঁহার ক্ষমতার ভিতরে থাকিলে তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে ছাড়িতেন না। বৈদ্যনাথ বাবু হৃদয়ে গভীর দেশভক্তি পোষণ করিতেন কিন্তু সরকারী চাকর বলিয়া সেই প্রাণের ভাবকে চরিতার্থ করিতে অক্ষম ছিলেন। তাঁহার একমাত্র দোষ অতিরিক্ত সহানুভূতি। কিন্তু সেই ভাব জেলের কর্ম্মচারীর পক্ষে দোষ হইলেও উচ্চ নীতির অনুসারে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ এবং ভগবানের প্রিয়তম গুণ বলা যায়। সাধারণ কয়েদী ও ''বন্দেমাতরম্'' কয়েদীতে তাঁহার পক্ষে কোনও ভেদ ছিল না; পীড়িত দেখিলে সকলকেই যত্ন করিয়া হাসপাতালে রাখিতেন এবং সম্পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেন না। এই দোষই তাঁহার পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ। গোঁসাইয়ের হত্যার পরে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এই আচরণে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে অন্যায় ভাবে কর্ম্মচ্যুত করেন।

এই সকল কর্ম্মচারীদের দয়া ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার বর্ণনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জেলে আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং ইহার পরেও বৃটিশ জেলপ্রণালীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। পাছে কোনও পাঠক এই

নিষ্ঠুরতা কর্ম্মচারীদের চরিত্রের কুফল বলিয়া মনে করেন, সেইজন্য মুখ্য কর্ম্মচারীদের গুণ বর্ণনা করিলাম। কারাবাসের প্রথম অবস্থার বিবরণে তাঁহাদের এই সকল গুণের আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

নির্জ্জন কারাবাসে প্রথম দিনের মনের ভাব বর্ণনা করিয়াছি। এই নির্জ্জন কারাবাসে কালযাপনের উপায় স্বরূপ পুস্তক বা অন্য কোন বস্তু ব্যতীত কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছিল। পরে এমারসন সাহেব আসিয়া আমাকে বাড়ী হইতে ধুতি জামা ও পড়িবার বই আনাইবার অনুমতি দিয়া যান। আমি কর্ম্মচারীদের নিকট কালি কলম ও জেলের ছাপান চিঠির কাগজ আনাইয়া আমার পূজনীয় মেসো মহাশয় সঞ্জীবনীর সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদককে ধুতি জামা এবং পড়িবার বইর মধ্যে গীতা ও উপনিষদ পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই পুস্তকদ্বয় আমার হাতে পৌঁছিতে দুই চারিদিন লাগে। তাহার পূর্ব্বে নির্জ্জন কারাবাসের মহত্ত্ব বুঝিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলাম। কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিরও ধ্বংস হয় এবং তাহা অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাও বুঝিতে পারিলাম এবং সেই অবস্থায়ই ভগবানের অসীম দয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার কি দুর্লভ সুবিধা হয় তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল। কারাবাসের পূর্ব্বে আমার সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জ্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্র-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত ও এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনও মতে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত। প্রথম নানা চিন্তা লইয়া থাকিতাম। তাহার পরে সেই মানুষের আলাপরহিত চিন্তার বিষয়শূন্য অসহনীয় অকর্ম্মণ্যতায় মন ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি রহিত হইতে লাগিল। এমন অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ; দুয়েকটী প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াও সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম। প্রকৃতির শোভায় চিত্তবৃত্তি স্নিগ্ধ হইবার এবং তপ্ত মন সান্ত্বনা পাইবার আশায় বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সেই একমাত্র বৃক্ষ, নীল আকাশের পরিমিত খণ্ডটুকু এবং সেই জেলের নিরানন্দ দৃশ্যে কতক্ষণ মানুষের এই অবস্থাপ্রাপ্ত মন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে? দেওয়ালের দিকে চাহিলাম। জেলের ঘরের সেই নির্জ্জীব সাদা

দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া মস্তিষ্ক পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্ম্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, শেষে মাটীতে কয়েকটী বড় বড় কাল পিপীলিকা গর্ত্তের নিকট বেড়াইতেছে দেখিলাম, তাহাদের গতিবিধি ও চেষ্টা চরিত্র নিরীক্ষণ করিতে সময় কাটিয়া গেল। তাহার পরে দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল পিপীলিকা বেড়াইতেছে। কালতে লালে বড় ঝগড়া, কালগুলি লালকে পাইয়া দংশন করিতে করিতে প্রাণবধ করিতে লাগিল। অত্যাচার পীড়িত লাল পিপীলিকার উপর বড় দয়া ও সহানুভূতি হইল। আমি কালগুলিকে তাড়াইয়া তাহাদের বাঁচাইতে লাগিলাম। ইহাতে একটী কার্য্য জুটিল, চিন্তার বিষয়ও পাওয়া গেল, পিপীলিকা-গুলির সাহায্যে এই কয়েকদিন কাটান গেল। তথাপি দীর্ঘ দিনার্দ্ধ যাপন করিবার উপায় আর জুটিতেছিল না। মনকে বুঝাইয়া দিলাম, জোর করিয়া চিন্তা আনিলাম, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল। কাল যেন তাহার উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত। আমি এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সত্য বটে, আমি কখন অকর্মণ্য বা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসি নাই, তবে কতবার একাকী থাকিয়া চিন্তায় কালযাপন করিয়াছি, এক্ষণে এতই কি মনের দুর্ব্বলতা হইয়াছে যে অল্পদিনের নির্জ্জনতায় এত আকুল হইয়া পড়িতেছি? ভাবিতে লাগিলাম, হয়ত সেই স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত নির্জ্জনতা ও এই পরেচ্ছাপ্রাপ্ত নির্জ্জনতায় অনেক প্রভেদ আছে। বাড়ীতে বসিয়া একাকী থাকা এক কথা, আর পরের ইচ্ছায় কারাগৃহে এই নির্জ্জনবাস স্বতন্ত্র কথা। সেখানে যখন ইচ্ছা হয় মানুষের আশ্রয় লইতে পারি, পুস্তকগত জ্ঞান ও ভাষালালিত্যে, বন্ধুবান্ধবের প্রিয় সম্ভাষণে, রাস্তার কোলাহলে, জগতের বিবিধ দৃশ্যে মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া প্রাণকে শীতল করিতে পারি। কিন্তু এখানে কঠিন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া পরের ইচ্ছায় সর্ব্বসংস্রব রহিত হইয়া থাকিতে হইবে। কথা আছে, যে নির্জ্জনতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু, এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না, এখন বুঝিলাম সত্য সত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়। ইতালীর রাজহত্যাকারী ব্রেশীর ভীষণ পরিণাম মনে পড়িল। তাঁহার নিষ্ঠুর

বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া সপ্ত বৎসরের নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। এক বৎসরও অতিবাহিত না হইতেই ব্রেশী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এতদিন সহ্য করিলেন ত! আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম? তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটী প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথমতঃ, কিরূপ মনের গতিতে নির্জ্জন কারাবাসের কয়েদী উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে য়ুরোপীয় জেলপ্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন, এবং যাহাতে আমার সাধ্যমত আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্ব্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেলপ্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন। মনে পড়ে আমি পনের বৎসর আগে বিলাত হইতে দেশে আসিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধগুলির ফল হইতেছে দেখিয়া তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবামাত্র আমাকে আধঘণ্টা পর্য্যন্ত এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি আমার উপর জেলপ্রণালী সংশোধনের ভার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। রাণাডের এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং সেই ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে ইহা সুদূর ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস মাত্র এবং একদিন স্বয়ং ভগবান আমাকে জেলে একবৎসর কাল রাখিয়া সেই প্রণালীর ক্রূরতা ও ব্যর্থতা এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবেন। এক্ষণে বুঝিলাম অদ্যকার রাজনৈতিক অবস্থায় এই জেলপ্রণালীর সংশোধনের সম্ভাবনা নাই, তবে, স্ব-অধিকার প্রাপ্ত ভারতে যাহাতে বিদেশী সভ্যতার এই নারকীয় অংশ গৃহীত না হয়, তাহা প্রচার করিতে ও তৎসম্বন্ধে যুক্তি দেখাইতে জেলে বসিয়া আমার অন্তরাত্মার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্ব্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জ্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধ হয় দশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। মঙ্গলময় অমঙ্গল দ্বারাও পরম মঙ্গল ঘটান। তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে

আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তি সিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্য্যে লাগান আমার যোগলিপ্সার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেদিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনাসকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য্য অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি। এমন ঘটনা নাই, — সেই ঘটনা মহান্ হৌক বা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হৌক, — যাহার দ্বারা কোনও মঙ্গল সম্পাদিত হয় না। প্রায়ই তিনি এক কার্য্য দ্বারা দুই চারি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। আমরা জগতে অনেকবার অন্ধশক্তির খেলা দেখি, অপব্যয়ই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতাকে অস্বীকার করিয়া ঐশ্বরিক বুদ্ধির দোষ দিই। সে অভিযোগ অমূলক। ঐশী শক্তি কখনও অন্ধ ভাবে কার্য্য করেন না, তাঁহার শক্তির বিন্দুমাত্র অপব্যয় হইতে পারে না, বরং তিনি এমন সংযত ভাবে অল্প ব্যয়ে বহু ফল উৎপাদন করেন যে তাহা মানুষের কল্পনার অতীত।

এইরূপ ভাবে মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হইয়া কয়েক দিন কষ্টে কালযাপন করিলাম। একদিন অপরাহ্নে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তা সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত বা এক মুহূর্ত্তও ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততা-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে পূর্ব্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থার অশান্তি, নির্জ্জন কারাবাস ও কর্ম্মহীনতায় মনের অসোয়াস্তি, শারীরিক ক্লেশ বা ব্যাধি, যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু সে দিনে ভগবান এক মুহূর্ত্তে অন্তরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে এই সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন হইতে

চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ বোধ হইত। তাহার পরে যখন পুস্তক আসিল, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বই না আসিলেও আমি থাকিতে পারিতাম। যদিও আমার আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য নয়, তথাপি এই ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরে দীর্ঘকাল নির্জ্জন কারাবাসে কেমন করিয়া আনন্দে থাকা সম্ভব হইল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে। এই কারণেই ভগবান সেই অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্ততা না ঘটাইয়া নির্জ্জন কারাবাসে উন্মত্ততার ক্রমবিকাশের প্রণালী আমার মনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচলিত দর্শকরূপে বসাইয়া রাখিলেন। তাহাতে আমি শক্তি পাইলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতায় অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তিদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাড়িল এবং প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

আমার নির্জ্জন কারাবাসের সময় ডাক্তার ডেলি ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রায় রোজ আমার ঘরে আসিয়া দুই চারিটী গল্প করিয়া যাইতেন। জানি না কেন, আমি প্রথম হইতে তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহ ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। আমি উঁহাদের সহিত বিশেষ কোন কথা কহিতাম না, তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার উত্তর দিতাম। যে বিষয় উত্থাপন করিতেন, তাহা হয় নীরবে শুনিতাম, না হয় দু'একটী সামান্য কথা মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতাম। তথাপি তাঁহারা আমার নিকট আসিতে ছাড়িতেন না। একদিন ডেলি সাহেব আমাকে বলিলেন, আমি সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়া বড় সাহেবকে সম্মত করাইতে পারিয়াছি যে তুমি প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ডিক্রীর সামনে বেড়াইতে পারিবে। তুমি যে সমস্ত দিন এক ক্ষুদ্র কুঠরীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, ইহা আমার ভাল লাগে না, ইহাতে মন খারাপ হয় এবং শরীরও খারাপ হয়। সেই দিন হইতে আমি সকালে বিকালে ডিক্রীর সম্মুখে খোলা জায়গায় বেড়াইতাম। বিকালে দশ মিনিট, পনর মিনিট, কুড়ি মিনিট, বেড়াইতাম, কিন্তু সকালে এক ঘণ্টা, এক একদিন দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিতাম, সময়ের কোনও নিয়ম ছিল না। এই সময় বড় ভাল লাগিত। একদিকে জেলের কারখানা, অপরদিকে গোয়ালঘর — আমার স্বাধীন রাজ্যের এই দুই সীমা ছিল। কারখানা হইতে

গোয়ালঘর, গোয়ালঘর হইতে কারখানা, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে হয় উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিতাম, না হয় কয়েদীদের কার্য্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতাম। বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, সেই লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্য্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বলিতেছে, অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে এক মহান্ নির্ম্মল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান্ সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন; এবং সেই মাধুর্য্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্ব্বদা বোধ হইতে লাগিল, যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাববিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্ম্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্ব্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল। প্রেমের সহিত দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নির্ম্মল শান্তিভাব গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল, এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আনিয়াছেন, নিশ্চয় কারামুক্তি ও অভিযোগখণ্ডন হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল। ইহার পরে অনেক দিন আমার জেলের কোনও কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।

এই অবস্থা ঘনীভূত হইতে কয়েকদিন লাগিল, তাহারই মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। নির্জ্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহির্জ্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল,

সাধনার স্থৈর্য্যভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘণ্টাকাল মোকদ্দমার নীরস ও বিরক্তিকর কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বসিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত, গোলের মধ্যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইত, পরে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এবং সমীপবর্ত্তী শব্দ দৃশ্য মনের বহির্ভূত করিয়া সমস্ত চিন্তাশক্তি অন্তর্মুখী করিবার শক্তি জন্মাইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা ঘটে নাই, তখন ধ্যানধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণে এই বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম, অবশিষ্ট সময় বিপদকালের সঙ্গীদের কথা ও তাহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম, অন্য চিন্তা করিতাম, অথবা কখনও নর্টন সাহেবের শ্রবণযোগ্য কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম। দেখিলাম নির্জ্জন কারাগৃহে যেমন সময় কাটান সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে, জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর মোকদ্দমার জীবনমরণের খেলার মধ্যে সময় কাটান তেমন সহজ নয়। অভিযুক্ত বালকদের হাসি তামাসা ও আমোদ প্রমোদ শুনিতে ও দেখিতে বড় ভাল লাগিত, নচেৎ আদালতের সময় কেবলই বিরক্তিকর বোধ হইত। সাড়ে চারটা বাজিলে সানন্দে কয়েদীদের গাড়ীতে উঠিয়া জেলে ফিরিয়া যাইতাম।

পনের ষোল দিনের বন্দী অবস্থার পরে স্বাধীন মনুষ্য-জীবনের সংসর্গ ও পরস্পরের মুখ দর্শনে অন্যান্য কয়েদীদের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়াই তাহাদের হাসি ও কথার ফোয়ারা খুলিয়া যাইত এবং যে দশ মিনিটকাল তাহাদিগকে গাড়ীতে থাকিতে হইত, তাহার এক মুহূর্ত্তও সেই স্রোত থামিত না। প্রথম দিন আমাদের খুব সম্মানের সহিত আদালতে লইয়া যায়। আমাদের সঙ্গেই য়ুরোপীয়ান সার্জ্জেণ্টের ক্ষুদ্র পল্টন এবং তাহাদের নিকট আবার গুলিভরা পিস্তল ছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় একদল সশস্ত্র পুলিস আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত এবং গাড়ীর পশ্চাতে কুচকাওয়াজ করিত, নামিবার সময়ও তদ্রূপ আয়োজন ছিল। এই সাজসজ্জা দেখিয়া কোন কোন অনভিজ্ঞ দর্শক নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন যে, এই হাস্যপ্রিয় অল্পবয়স্ক বালকগণ না জানি কি দুঃসাহসিক বিখ্যাত মহাযোদ্ধার দল। না জানি তাহাদের প্রাণে ও শরীরে কত সাহস ও বল যে খালি হাতে শত পুলিস ও গোরার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করিতেও সক্ষম। সেইজন্য বোধ হয় অতি সম্মানের সহিত তাহাদিগকে এইরূপে লইয়া গেল। কয়েক দিন এইরূপ ঠাট চলিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল, শেষে দুই

চারিজন সার্জ্জেণ্ট আমাদের লইয়া যাইত ও লইয়া আসিত। নামিবার সময় তাহারা বড় দেখিত না, আমরা কি ভাবে জেলে ঢুকি; আমরা যেন স্বাধীন ভাবে বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, সেইরূপে জেলে ঢুকিতাম। এইরূপ অযত্ন ও শিথিলতা দেখিয়া পুলিস কমিশনার সাহেব ও কয়েকজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চটিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, ‘‘প্রথম দিন পঁচিশ ত্রিশজন সার্জ্জেণ্টের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আজকাল দেখিতেছি, চার পাঁচজনও আসে না।’’ তাঁহারা সার্জ্জেণ্ট-দের তিরস্কার করিতেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর ব্যবস্থা করিতেন, তাহার পর দুদিন হয় ত আর দুইজন সার্জ্জেণ্ট আসিত, তাহার পর পূর্ব্বেকার শিথিলতা আবার আরম্ভ হইত। সার্জ্জেণ্টগণ দেখিলেন যে, এই বোমার ভক্তগণ বড় নিরীহ ও শান্ত লোক, তাহাদের পলায়নের কোন উদ্যোগ নাই, কাহাকেও আক্রমণ করিবার, হত্যা করিবার মৎলবও নাই, তাঁহারা ভাবিলেন আমরা কেন অমূল্য সময় এই বিরক্তিকর কার্য্যে নষ্ট করি। প্রথমে আদালতে ঢুকিবার ও বাহির হইবার সময় আমাদিগকে তল্লাস করিত, তাহাতে সার্জ্জেণ্টদের কোমল করস্পর্শ-সুখ অনুভব করিতাম, ইহা ভিন্ন এই তল্লাসে কাহারও লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। বেশ বোঝা গেল যে, এই তল্লাসের প্রয়োজনীয়তায় আমাদের রক্ষকদের গভীর অনাস্থা ছিল। দুই চারিদিন পরে ইহাও বন্ধ হইল। আমরা নির্ব্বিঘ্নে বই, রুটী, চিনি যাহা ইচ্ছা আদালতের ভিতরে লইয়া যাইতাম। প্রথম লুকাইয়া, তাহার পরে প্রকাশ্য ভাবে লইয়া যাইতাম। আমরা বোমা বা পিস্তল ছুঁড়িতে যাইব না, সেই বিশ্বাস তাঁহাদের শীঘ্র দূর হইল। কিন্তু দেখিলাম একমাত্র ভয় সার্জ্জেণ্টদের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। কে জানে কাহার মনে কবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মহিমান্বিত মস্তকে পাদুকা নিক্ষেপ করিবার বদ মৎলব ঢুকিবে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। সেই জন্য জুতা লইয়া ভিতরে যাইবার সবিশেষ নিষেধ ছিল এবং সেই বিষয়ে সার্জ্জেণ্টগণ সর্ব্বদা সতর্ক ছিলেন। আর কোনরূপ সাবধানতার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য দেখি নাই।

মোকদ্দমার স্বরূপ একটু বিচিত্র ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট, কৌন্সিলী, সাক্ষী, সাক্ষ্য, Exihibits, আসামী, সকলই বিচিত্র। দিন দিন সেই সাক্ষী ও Exihibits-এর অবিরাম স্রোত, সেই কৌন্সিলীর নাটকোচিত অভিনয়, সেই বালকস্বভাব ম্যাজিষ্ট্রেটের বালকোচিত চপলতা ও লঘুতা, সেই অপূর্ব্ব আসামীদের অপূর্ব্বভাব দেখিতে দেখিতে অনেকবার এই কল্পনা মনে উদয় হইত যে আমরা বৃটিশ বিচারালয়ে

না বসিয়া কোন নাটগৃহের রঙ্গমঞ্চে বা কোন কল্পনাপূর্ণ ঔপন্যাসিক রাজ্যে বসিয়া আছি। এক্ষণে সেই রাজ্যের বিচিত্র জীবসকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি।

এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌন্সিলী নর্টন সাহেব ছিলেন। তিনি প্রধান অভিনেতা কেন, এই নাটকের রচয়িতা, সূত্রধর (stage manager) এবং সাক্ষীর স্মারক (prompter) ছিলেন, — এমন বৈচিত্র্যময় প্রতিভা জগতে বিরল। কৌন্সিলী নর্টন মাদ্রাজী সাহেব, সেইজন্য বোধ হয় বঙ্গদেশীয় ব্যারিষ্টার মণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রতায় অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ। তিনি এক সময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন, সেইজন্য বোধ হয় বিরুদ্ধাচরণ ও প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধাচারীকে শাসন করিতে অভ্যস্ত। এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে সিংহস্বভাব বলে। নর্টন সাহেব কখন মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কি না, বলিতে পারি না, তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন-অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন — সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত। কিন্তু বক্তৃতার অনর্গল স্রোতে, কথার পারিপাট্যে, কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অদ্ভুত ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায়, সাক্ষী ও জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের উপর তম্বীতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনোমোহিনী শক্তিতে নর্টন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত। শ্রেষ্ঠ কৌন্সিলীর মধ্যে তিন শ্রেণী আছে, — যাঁহারা আইন-পাণ্ডিত্যে এবং যথার্থ ব্যাখ্যায় ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জজের মনে প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, যাঁহারা চতুর ভাবে সাক্ষীর নিকট সত্য কথা বাহির করিয়া ও মোকদ্দমার বিষয়ীভূত ঘটনা ও বিবেচ্য বিষয় দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়া জজ বা জুরির মন নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং যাঁহারা কথার জোরে, বিভীষিকা প্রদর্শনে, বক্তৃতার স্রোতে সাক্ষীকে হতবুদ্ধি করিয়া, মোকদ্দমার বিষয়ের দিব্য গোলমাল করিয়া, গলার জোরে জজ বা জুরির বুদ্ধি স্থানচ্যুত করিয়া মোকদ্দমায় জিতিতে পারেন। নর্টন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য। ইহা দোষের কথা নহে। কৌন্সিলী ব্যবসায়ী মানুষ, টাকা নেন, যে টাকা দেয় তাহার অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন বৃটিশ আইন প্রণালী দ্বারা সত্য কথা বাহির করা বাদী প্রতিবাদীর আসল উদ্দেশ্য নহে, কোনও উপায়ে মোকদ্দমায় জয় লাভ করাই উদ্দেশ্য। অতএব কৌন্সিলী সেই চেষ্টা করিবেন, নচেৎ তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। ভগবান অন্য গুণ না দিয়া থাকিলে যে গুণ আছে, তাহার জোরেই মোকদ্দমায় জিতিতে হইবে, সুতরাং নর্টন সাহেব স্বধর্ম্ম পালনই

করিতেছিলেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রোজ হাজার টাকা দিতেন। এই অর্থব্যয় বৃথা হইলে সরকার বাহাদুরের ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি যাহাতে না হয় নর্টন সাহেব প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিয়াছেন। তবে যে মোকদ্দমা রাজনীতি সংক্রান্ত, তাহাতে বিশেষ উদার ভাবে আসামীকে সুবিধা দেওয়া এবং সন্দেহজনক বা অনিশ্চিত প্রমাণের উপর জোর না করা বৃটিশ আইন পদ্ধতির নিয়ম। নর্টন সাহেব যদি এই নিয়ম সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন তবে আমার বোধ হয় না যে তাঁহার কেসের কোন হানি হইত। অপর দিকে কয়েকজন নির্দ্দোষী লোককে নির্জ্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না এবং নিরীহ অশোক নন্দী প্রাণে বাঁচিতেও পারিতেন। কৌন্সিলী সাহেবের সিংহপ্রকৃতি বোধ হয় এই দোষের মূল। হলিংশেদ হল ও প্লুটার্ক যেমন সেক্সপিয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুলিস তেমনি এই মোকদ্দমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্সপিয়র ছিলেন, নর্টন সাহেব। তবে সেক্সপিয়রে নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। সেক্সপিয়র সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন, নর্টন সাহেব ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন অণোঃ অণীয়ান্, মহতো মহীয়ান যাহা পাইতেন একটীও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর plot রচনা করিয়াছিলেন যে সেক্সপিয়র, ডেফো ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নিন্দুক বলিতে পারেন যে যেমন ফলষ্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মদ্যের সমাবেশ ছিল, তেমনই নর্টনের plot-এ এক রতি প্রমাণের সঙ্গে দশমন অনুমান ও suggestion ছিল। কিন্তু নিন্দুকও plot-এর পারিপাট্য ও রচনাকৌশল প্রশংসা করিতে বাধ্য। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lost-এর সয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man। আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পাতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহারপ্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃ-স্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ। আন্দোলনের বৈধ অবৈধ যত সুশৃঙ্খলিত অঙ্গ বা অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরবিন্দ ঘোষের সৃষ্টি, এবং যখন অরবিন্দের সৃষ্টি

তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে নিহিত। তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ধরা না পড়িলে বোধ হয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আমার নাম কোনও ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নর্টন মহা খুসি হইতেন, এবং সাদরে এই পরম মূল্যবান প্রমাণ ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন। দুঃখের কথা, আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, নচেৎ আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভক্তি ও অনবরত আমার ধ্যানে নর্টন সাহেব নিশ্চয় তখনই মুক্তিলাভ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কারাবাসের সময় ও গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় উভয়ই সঙ্কুচিত হইত। সেশন্‌স্ আদালতে আমি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নর্টন কৃত plot-এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বীচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন। সমালোচককে যদি কাব্য পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে এরূপ দুর্দ্দশা হইবে না কেন? নর্টন সাহেবের আর এক দুঃখ ছিল যে, কয়েক জন সাক্ষীও এইরূপ বেরসিক ছিল যে, তাঁহার রচিত plot-এর অনুযায়ী সাক্ষ্য দিতে তাহারা সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়াছিল। নর্টন সাহেব ইহাতে চটিয়া লাল হইতেন, সিংহ গর্জ্জনে সাক্ষীর প্রাণ বিকম্পিত করিয়া তাহাকে শাসাইয়া দিতেন। স্বরচিত কথার অন্যথা প্রকাশে কবির এবং স্বদত্ত শিক্ষাবিরুদ্ধে অভিনেতার আবৃত্তি, স্বর বা অঙ্গভঙ্গীতে নাটকের সূত্রধরের যে ন্যায়সঙ্গত ও অদমনীয় ক্রোধ হয়, নর্টন সাহেবের সেই ক্রোধ হইত। ব্যারিষ্টার ভুবন চাটার্জ্জীর সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই সাত্ত্বিক ক্রোধই তাহার কারণ। চাটার্জ্জী মহাশয়ের ন্যায় এরূপ রসানভিজ্ঞ লোক ত দেখি নাই। তাঁহার সময় অসময় জ্ঞান আদবে ছিল না। নর্টন সাহেব যখন সংলগ্ন অসংলগ্নের বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কবিত্বের খাতিরে যে সে প্রমাণ ঢুকাইয়া দিতেছিলেন, তখন চাটার্জ্জী মহাশয় উঠিয়া অসংলগ্ন বা inadmissible বলিয়া আপত্তি করিতেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সংলগ্ন বা আইনসঙ্গত প্রমাণ বলিয়া নয়, নর্টন কৃত নাটকের উপযোগী হইতে পারে বলিয়া সেই সাক্ষ্যগুলি রুজু হইতেছে। এই অসঙ্গত ব্যবহারে নর্টন কেন, বার্লি সাহেব পর্য্যন্ত চটিয়া উঠিতেন। একবার বার্লি সাহেব চাটার্জ্জী মহাশয়কে করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন, "Mr. Chatterji, we were getting on very nicely before you came" (আপনি যখন আসেন নাই, আমরা নির্ব্বিঘ্নে মোকদ্দমা চালাইতেছিলাম)। তাহা বটে, নাটকের রচনার সময়ে কথায় কথায় আপত্তি তুলিলে নাটকও অগ্রসর হয় না, দর্শকবৃন্দেরও রসভঙ্গ হয়।

নর্টন সাহেব যদি নাটকের রচয়িতা, প্রধান অভিনেতা ও সূত্রধর হন, ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লিকে নাটককারের পৃষ্ঠপোষক বা patron বলিয়া অভিহিত করা যায়। বার্লি সাহেব বোধ হয়, স্কচ জাতির গৌরব। তাঁহার চেহারা স্কটলণ্ডের স্মারকচিহ্ন। অতি সাদা, অতি লম্বা, অতি রোগা, দীর্ঘ দেহযষ্টির উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী অক্টারলোনী মনুমেন্টের উপর ক্ষুদ্র অক্টারলোনী বসিয়া আছেন, বা ক্লিয়পাত্রার obelisk-এর চূড়ায় একটী পাকা নারিকেল বসান রহিয়াছে। তাঁহার চুল ধূলার বর্ণ (sandy haired) এবং স্কটলণ্ডের সমস্ত হিম ও বরফ তাঁহার মুখের ভাবে জমিয়া রহিয়াছে। যাঁহার এত দীর্ঘ দেহ, তাঁহার বুদ্ধিও তদ্রূপ হওয়া চাই। নচেৎ প্রকৃতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বার্লি-সৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি দেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি মারলো এই মিতব্যয়িতা infinite riches in a little room (ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বার্লি দর্শনে কবির বর্ণনার বিপরীত ভাব মনে উদয় হয়, infinite room-A little riches। বাস্তবিক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া দুঃখ হইত এবং এই ধরণের অল্পসংখ্যক শাসনকর্ত্তা দ্বারা ত্রিশ কোটী ভারতবাসী শাসিত হইয়া রহিয়াছে স্মরণ করিয়া ইংরাজের মহিমা ও ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত। বার্লি সাহেবের বিদ্যা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর জেরার সময় প্রকাশ হইয়াছিল। স্বয়ং কবে মোকদ্দমা স্বীয় করকমলে গ্রহণ করিয়াছিলেন বা কি করিয়া মোকদ্দমা গ্রহণ সম্পন্ন হয়, এত বৎসরের ম্যাজিষ্ট্রেট-গিরির পরে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বার্লির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্যার মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চক্রবর্ত্তী সাহেবের উপর সেই ভার দিয়া সাহেব নিষ্কৃতি পাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও বার্লি কবে মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্ন মোকদ্দমার অতি জটিল সমস্যার মধ্যে গণ্য। চাটার্জ্জী মহাশয়ের নিকট যে করুণ নিবেদনের উল্লেখ করিলাম, তাহাতেও সাহেবের বিচার প্রণালীর কতকটা অনুমান করা যায়। প্রথম হইতে তিনি নর্টন সাহেবের পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় মন্ত্র মুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার বশ হইয়াছিলেন। এমন বিনীতভাবে নর্টনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেন, নর্টনের মতে মত দিতেন, নর্টনের হাসিতে হাসিতেন, নর্টনের রাগে রাগিতেন যে, এই সরল শিশুর আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রবল স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব মনে আবির্ভূত হইত। বার্লি নিতান্ত বালকস্বভাব। কখন তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া ভাবিতে পারি নাই, বোধ হইত যেন স্কুলের ছাত্র হঠাৎ

স্কুলের শিক্ষক হইয়া শিক্ষকের উচ্চ মঞ্চে আসীন হইয়াছেন। সেই ভাবে তিনি কোর্টের কার্য্য চালাইতেন। কেহ তাঁহার প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিলে স্কুলের শিক্ষকের ন্যায় শাসন করিতেন। আমাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ মোকদ্দমা প্রহসনে বিরক্ত হইয়া পরস্পরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতেন, বার্লি সাহেব স্কুলমাষ্টারী ধরণে বকিয়া উঠিতেন, না শুনিলে সকলকে দাঁড়াইবার হুকুম করিতেন, তাহাও তৎক্ষণাৎ না শুনিলে প্রহরীকে দাঁড় করাইতে বলিতেন। আমরা এই স্কুলমাষ্টারী ধরণ প্রত্যক্ষ করিতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম যে যখন বার্লিতে ও চাটার্জ্জী মহাশয়ে ঝগড়া লাগিয়া গিয়াছিল, আমরা তখন প্রতিক্ষণে এই প্রত্যাশায় ছিলাম যে ব্যারিষ্টার মহাশয়ের উপর এবার দাঁড়াইবার শাস্তি প্রচারিত হইবে। বার্লি সাহেব কিন্তু উল্টা উপায় ধরিলেন, চীৎকার করিয়া "Sit down Mr. Chatterji" বলিয়া তাঁহার আলিপুর স্কুলের এই নবাগত দুরন্ত ছাত্রকে বসাইয়া দিলেন। যেমন এক একজন মাষ্টার, ছাত্র কোন প্রশ্ন করিলে বা পড়ার সময় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাহিলে, বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইয়া দেন, বার্লিও আসামীর উকিল আপত্তি করিলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইতেন। কোন কোন সাক্ষী নর্টনকে ব্যতিব্যস্ত করিত। নর্টন বাহির করিতে চাহিতেন যে অমুক লেখা অমুক আসামীর হস্তাক্ষর, সাক্ষী যদি বলিতেন, না, এ ত ঠিক সেই লেখার মত লেখা নয়, তবে হইতে পারে, বলা যায় না, — অনেক সাক্ষী এইরূপ উত্তর দিতেন, নর্টন ইহাতে অধীর হইতেন। বকিয়া ঝকিয়া, চেঁচাইয়া শাসাইয়া কোন উপায়ে অভীপ্সিত উত্তর বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার শেষ প্রশ্ন হইত, "What is your belief?" তুমি কি মনে কর, হাঁ কি না। সাক্ষী হাঁ-ও বলিতে পারিতেন না, না-ও বলিতে পারিতেন না, বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই উত্তরই করিতেন। নর্টনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে তাঁহার কোনও belief নাই, তিনি সন্দেহে দোলায়মান। কিন্তু নর্টন সেই উত্তর চাহিতেন না, বারবার মেঘগর্জ্জনের রবে সেই সাংঘাতিক প্রশ্নে সাক্ষীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িত, "Come, sir, what is your belief?" নর্টনের রাগে বার্লি রাগিয়া উপর হইতে গর্জ্জন করিতেন, "টোমার বিস্ওয়াস কি আছে?" বেচারা সাক্ষী মহা ফাঁপরে পড়িতেন। তাঁহার কোন বিস্ওয়াস নাই, অথচ একদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট, অপর দিকে নর্টন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার নাড়ী ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া সেই অমূল্য অপ্রাপ্য বিস্ওয়াস বাহির করিতে কৃতোদ্যম হইয়া দুইদিক হইতে ভীষণ গর্জ্জন করিতেছেন। প্রায়ই বিস্ওয়াস বাহির হইত না, সাক্ষী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঘূর্ণ্যমান বুদ্ধিতে তাঁহার যন্ত্রণাস্থান

হইতে প্রাণ লইয়া পালাইয়া যাইতেন। এক একজন বিস্‌ওয়াসের অপেক্ষা প্রাণই প্রিয় জিনিস বলিয়া কৃত্রিম বিস্‌ওয়াস নর্টন সাহেবের চরণকমলে উপহার দিয়া বাঁচিতেন, নর্টন অতি সন্তুষ্ট হইয়া বাকী জেরা স্নেহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ কৌন্সিলীর সঙ্গে এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট জুটিয়াছিলেন বলিয়া মোকদ্দমা আরও নাটকের আকার ধারণ করিয়াছিল।

কয়েকজন সাক্ষী এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও অধিকাংশই নর্টন সাহেবের প্রশ্নের অনুকূল উত্তর দিতেন। ইহাদের মধ্যে চেনা মুখ অতি অল্পই ছিল। এক একজন কিন্তু পরিচিত ছিলেন। দেবদাস করণ মহাশয় আমাদের বিরক্তি দূর করিয়া খুব হাসাইয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। এই সত্যবাদী সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, যখন মেদিনীপুর সম্মিলনীর সময় সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার ছাত্রের নিকটে গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অরবিন্দ বাবু তখন বলিয়া উঠিয়াছিলেন "দ্রোণ কি করিলেন?" ইহা শুনিয়া নর্টন সাহেবের আগ্রহ ও কৌতূহলের সীমা ছিল না, তিনি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন দ্রোণ কোন বোমার ভক্ত বা রাজনৈতিক হত্যাকারী, অথবা মানিকতলা বাগান বা ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত। নর্টন মনে করিয়াছিলেন এই বাক্যের অর্থ বোধ হয় যে অরবিন্দ ঘোষ সুরেন্দ্র বাবুকে গুরুভক্তির বদলে বোমারূপ পুরস্কার দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা হইলে মোকদ্দমার অনেক সুবিধা হইতে পারে। অতএব তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দ্রোণ কি করিলেন?" প্রথমতঃ সাক্ষী কিছুতেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহা লইয়া পাঁচ মিনিট টানাটানি হয়, শেষে করণ মহাশয় দুই হাত আকাশে নিক্ষেপ করিয়া নর্টনকে জানাইলেন, "দ্রোণ অনেক অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন।" ইহাতে নর্টন সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন না। দ্রোণের বোমার অনুসন্ধান না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন কেন? আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেক কাণ্ড আবার কি? বিশেষ কি করিলেন বলুন?" সাক্ষী ইহার অনেক উত্তর করিলেন, কিন্তু একটীতেও দ্রোণাচার্য্যের জীবনময় এই গুপ্ত রহস্য ভেদ হয় নাই। নর্টন সাহেব চটিলেন, গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। সাক্ষীও চিৎকার আরম্ভ করিলেন। একজন উকিল হাসিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে, সাক্ষী বোধ হয় জানেন না, দ্রোণ কি করিলেন। করণ মহাশয় ইহাতে ক্রোধে অভিমানে আগুন হইলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি? আমি? আমি জানি না দ্রোণ কি করিলেন? বাঃ, আমি কি আদ্যোপান্ত মহাভারত বৃথা পড়িয়াছি?" আধঘণ্টা দ্রোণাচার্য্যের মৃতদেহ লইয়া করণে নর্টনে মহাযুদ্ধ চলিল। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর

নর্টন আলিপুর বিচারালয় কম্পিত করিয়া তাঁহার প্রশ্ন ঘোষণা করিতে লাগিলেন, ''Out with it, Mr. Editor! What did Dron do?'' সম্পাদক মহাশয় উত্তরে এক লম্বা রামকাহিনী আরম্ভ করিলেন, তাহাতে দ্রোণ কি করিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল না। সমস্ত আদালত হাসির মহা রোলে প্রতিধ্বনিত হইল। শেষে টিফিনের সময়ে করণ মহাশয় মাথা ঠাণ্ডা করিয়া একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্যার এই মীমাংসা জানাইলেন যে, বেচারা দ্রোণ কিছুই করেন নাই, বৃথাই আধ ঘণ্টাকাল তাঁহার পরলোকগত আত্মা লইয়া টানাটানি হইয়াছে, অর্জ্জুনই গুরু দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের এই মিথ্যা অপবাদে দ্রোণাচার্য্য অব্যাহতি পাইয়া কৈলাসে সদাশিবকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন যে, করণ মহাশয়ের সাক্ষ্যে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল না। সম্পাদক মহাশয়ের এক কথায় সহজে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইত। কিন্তু আশুতোষ সদাশিব তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন। পুলিস ও গোয়েন্দা, পুলিসের প্রেমে আবদ্ধ নিম্নশ্রেণীর লোক ও ভদ্রলোক এবং স্বদোষে পুলিসের প্রেমে বঞ্চিত, অনিচ্ছায় আগত সাক্ষীচয়। প্রত্যেক শ্রেণীর সাক্ষ্য দিবার প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। পুলিস মহোদয়গণ প্রফুল্লভাবে অম্লানবদনে তাঁহাদের পূর্ব্বজ্ঞাত বক্তব্য মনের মত বলিয়া যাইতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, চিনিয়া লইতেন, কোনও সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই, ভুলচুক নাই। পুলিসের বন্ধুসকল অতিশয় আগ্রহের সহিত সাক্ষ্য দিতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, তাহাকেও চিনিয়া লইতেন, যাহাকে চিনিতে হয় না, তাহাকেও অনেকবার অতিমাত্র আগ্রহের চোটে চিনিয়া লইতেন। অনিচ্ছায় আগত যাঁহারা, তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহা বলিতেন, কিন্তু তাহা অতি অল্প হইত; নর্টন সাহেব তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষীর পেটে অশেষ মূল্যবান ও সন্দেহনাশক প্রমাণ আছে ভাবিয়া জেরার জোরে পেট চিরিয়া তাহা বাহির করিবার বিস্তর চেষ্টা করিতেন। ইহাতে সাক্ষীগণ মহা বিপদে পড়িতেন। এক দিকে নর্টন সাহেবের গর্জ্জন ও বার্লি সাহেবের আরক্ত চক্ষু, অপর দিকে মিথ্যা সাক্ষ্যে দেশবাসীকে দ্বীপান্তরে পাঠাইবার মহাপাপ। নর্টন ও বার্লিকে সন্তুষ্ট করিবেন, না ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবেন, সাক্ষীর পক্ষে এই প্রশ্ন গুরুতর হইয়া উঠিত। একদিকে মানুষের ক্রোধে ক্ষণস্থায়ী বিপদ, অপর দিকে পাপের শাস্তি

নরক ও পরজন্মে দুঃখ। কিন্তু তিনি ভাবিতেন, নরক ও পরজন্ম এখনও দূরবর্ত্তী অথচ মনুষ্যকৃত বিপদ পরমুহূর্ত্তে গ্রাস করিতে পারে। কবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে ধৃত হইবেন, সেই ভয় অনেকের মনে বিদ্যমান থাকিবার কথা, কারণ এইরূপ স্থলে এইরূপ পরিণামের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব এই শ্রেণীর সাক্ষীর পক্ষে তাঁহারা যতক্ষণ সাক্ষীর কাঠগড়ায় অতিবাহিত করিতেন, ততক্ষণ বিলক্ষণ ভীতি ও যন্ত্রণার সময় হইত। জেরা শেষ হইলে অর্দ্ধনির্গত প্রাণ আবার ধড়ে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে যন্ত্রণামুক্ত করিত। কয়েকজন সাহসের সহিত সাক্ষ্য দিয়া নর্টনের গর্জ্জনের ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, ইংরাজ কৌন্সিলীও তাহা দেখিয়া জাতীয় প্রথা অনুসরণ পূর্ব্বক নরম হইয়া পড়িতেন। এইরূপ কত সাক্ষী আসিয়া কত প্রকার সাক্ষ্য দিয়া গেলেন, কিন্তু একজনও পুলিসের উল্লেখযোগ্য কোন সুবিধা করেন নাই। একজন স্পষ্ট বলিলেন, আমি কিছুই জানি না, কেন পুলিস আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা বুঝি না! এইরূপ মোকদ্দমা করিবার প্রথা বোধ হয়, ভারতেই হইতে পারে, অন্য দেশ হইলে জজ ইহাতে চটিয়া উঠিতেন ও পুলিসকে তীব্র গঞ্জনার সহিত শিক্ষা দিতেন। বিনা অনুসন্ধানে দোষী ও নির্দ্দোষী নির্ব্বিচারে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া আন্দাজে শত শত সাক্ষী আনিয়া দেশের টাকা নষ্ট করা এবং নিরর্থক আসামীদিগকে কারাযন্ত্রণার মধ্যে দীর্ঘকাল রাখা, এই দেশেরই পুলিসের পক্ষে শোভা পায়। কিন্তু বেচারা পুলিস কি করিবে? তাঁহারা নামে গোয়েন্দা কিন্তু সেইরূপ ক্ষমতা যখন তাঁহাদের নাই, তখন এইরূপে সাক্ষীর জন্য বিশাল জাল ফেলিয়া উত্তম মধ্যম অধম সাক্ষী যোগাড় করিয়া আন্দাজে কাঠগড়ায় উপস্থিত করাই একমাত্র উপায়। কে জানে, তাহারা কিছু জানিতেও পারে, কিছু প্রমাণ দিতেও পারে।

আসামী চিনিবার ব্যবস্থাও অতি রহস্যময় ছিল। প্রথমতঃ, সাক্ষীকে বলা হইত, তুমি কি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারিবে? সাক্ষী যদি বলিতেন, হ্যাঁ, চিনিতে পারি, তৎক্ষণাৎ নর্টন সাহেব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কাঠগড়ায় identification parade-এর ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাকে সেইখানে তাঁহার স্মরণশক্তি চরিতার্থ করিবার আদেশ দিতেন। যদি তিনি বলিতেন, জানি না, হয়ত চিনিতেও পারি, তিনি একটু বিমর্ষ হইয়া বলিতেন, আচ্ছা যাও, চেষ্টা কর। যদি কেহ বলিতেন, না, পারিব না, তাহাদের দেখি নাই অথবা লক্ষ্য করি নাই; তথাপি নর্টন সাহেব তাঁহাকে ছাড়িতেন না। যদি এতগুলি মুখ দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের কোনও স্মৃতি জাগ্রত হয়, সেই জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পাঠাইতেন। সাক্ষীর তেমন

যোগশক্তি ছিল না। হয় ত পূর্ব্বজন্মবাদে আস্থাও নাই, তিনি আসামীদের দীর্ঘ দুই শ্রেণীর আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সার্জ্জেণ্টের নেতৃত্বের অধীনে গম্ভীর ভাবে কুচ করিয়া আমাদের মুখের দিকে না চাহিয়াও মাথা নাড়িয়া বলিতেন, না, চিনি না। নর্টন নিরাশ হৃদয়ে এই মৎস্যশূন্য জীবন্ত জাল ফিরাইয়া লইতেন। এই মোকদ্দমায় মনুষ্যের স্মরণশক্তি কতদূর প্রখর ও অভ্রান্ত হইতে পারে, তাহার অপূর্ব্ব প্রমাণ পাওয়া গেল। ত্রিশ চল্লিশ জন দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের নাম জানা নাই, তাঁহাদের সহিত কোন জন্মে একবারও আলাপ হয় নাই, অথচ দুইমাস পূর্ব্বে কাহাকে দেখিয়াছি, কাহাকে দেখি নাই, অমুককে অমুক তিন স্থানে দেখিয়াছি, অমুক দুইস্থানে দেখি নাই; — উহাকে দাঁত মাজিতে একবার দেখিয়াছি অতএব তাঁহার চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তর মত অঙ্কিত হইয়া রহিল। ইহাকে কবে দেখিলাম কি করিতেছিলেন, কে সঙ্গে ছিলেন, না একাকী ছিলেন, কিছুই মনে নাই, অথচ তাঁহারও চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল; হরিকে দশবার দেখিয়াছি সুতরাং তাঁহাকে ভুলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, শ্যামকে একবার মোটে আধ মিনিটের জন্য দেখিলাম, কিন্তু তাহাকেও মরণের অন্তিম দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিব না, কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই, — এইরূপ স্মরণশক্তি এই অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতিতে, এই তমাভিভূত মর্ত্ত্যধামে সচরাচর দেখা যায় না। অথচ একজনের নহে, দুই জনের নহে, প্রত্যেক পুলিস পুঙ্গবের এইরূপ বিচিত্র নির্ভুল অভ্রান্ত স্মরণশক্তি দেখা গেল। এতদ্দ্বারা সী, আই, ডী,-র উপর আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল। দুঃখের কথা, সেশন্স কোর্টে এই ভক্তি কমাইতে হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যে দুই একবার সন্দেহ হয় নাই, তাহাও নয়। যখন লেখা সাক্ষ্যে দেখিলাম যে, শিশির ঘোষ এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে ছিলেন অথচ কয়েকজন পুলিস পুঙ্গব ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে স্কটস্ লেনে ও হ্যারিসন রোডে দেখিয়াছিলেন, তখন একটু সন্দেহ হইল বটে। যখন শ্রীহট্টবাসী বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন স্থূল শরীরে বানিয়াচঙ্গে পিতৃভবনে থাকিয়াও বাগানে ও স্কটস্ লেনে — যে স্কটস্ লেনের ঠিকানা বীরেন্দ্র জানিতেন না, ইহার অকাট্য প্রমাণ লেখা সাক্ষ্যে পাওয়া গেল — তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর সী, আই, ডী,-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তখন আরও সন্দেহ হইল। বিশেষতঃ যাঁহারা স্কটস্ লেনে কখনও পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা যখন শুনিলেন যে সেখানে পুলিস তাঁহাদিগকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তখন একটু সন্দেহের উদ্রেক হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। একজন মেদিনীপুরের সাক্ষী বলিলেন যে তিনি

— মেদিনীপুরের আসামীরা বলিলেন যে তিনিই গোয়েন্দা — শ্রীহট্টের হেমচন্দ্র সেনকে তমলুকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র স্থূলচক্ষে কখন তমলুক দেখেন নাই, অথচ তাঁহার ছায়াময় শরীর দূর শ্রীহট্ট হইতে তমলুকে ছুটিয়া তেজস্বী ও রাজদ্রোহপূর্ণ স্বদেশী বক্তৃতা করিয়া গোয়েন্দা মহাশয়ের চক্ষুতৃপ্তি এবং কর্ণতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ের ছায়াময় শরীর মাণিকতলায় উপস্থিত হইয়া আরও রহস্যময় কাণ্ড করিয়াছিল। দুই জন পুলিস কর্ম্মচারী শপথ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অমুক দিনে অমুক সময়ে চারু বাবুকে শ্যামবাজারে দেখিয়াছিলেন, তিনি শ্যামবাজার হইতে একজন মুখ্য ষড়যন্ত্রকারীর সহিত মাণিকতলা বাগানে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি নিকট হইতে দেখিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন; ভুল হইবার কথা নাই। উকিলের জেরায় সাক্ষীদ্বয় টলেন নাই। ব্যাসস্য বচনং সত্যং, পুলিসের সাক্ষ্যও অন্যরূপ হইতে পারে না। দিন ও সময় সম্বন্ধেও তাঁহাদের ভুল হইবার কথা নহে, কারণ ঠিক সেই দিনে সেই সময়ে চারু বাবু কলেজ হইতে ছুটি লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন, চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষের সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ঠিক সেই দিনে সেই সময়ে চারু বাবু হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে চন্দননগরের মেয়র তার্দিভাল, তার্দিভালের স্ত্রী, চন্দননগরের গবর্ণর ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে পায়চারি করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলে সেই কথা স্মরণ করিয়া চারু বাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় পুলিস চারুবাবুকে মুক্তি দেওয়ায় বিচারালয়ে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন হয় নাই। চারু বাবুকে এই পরামর্শ প্রদান করিতেছি যে তিনি এই প্রমাণ সকল Psychical Research Society-র নিকট পাঠাইয়া মনুষ্যজাতির জ্ঞানসঞ্চয়ের সাহায্য করুন। পুলিসের সাক্ষ্য মিথ্যা হইতে পারে না, — বিশেষতঃ সী, আই, ডী-র — অতএব থিয়সফির আশ্রয় ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। মোটের উপর বৃটিশ আইন প্রণালীতে কত সহজে নির্দ্দোষীর কারাদণ্ড, কালাপানি ও ফাঁসি পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই মোকদ্দমায় পদে পদে পাইলাম। নিজে কাঠগড়ায় না দাঁড়াইলে পাশ্চাত্য বিচারপ্রণালীর মায়াবী অসত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। য়ুরোপের এই প্রণালী জুয়াখেলা বিশেষ; ইহা মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, তাঁহার ও তাঁহার পরিবার ও আত্মীয়-বন্ধুর জীবনব্যাপী যন্ত্রণা, অপমান, জীবন্ত মৃত্যু লইয়া জুয়াখেলা। ইহাতে কত দোষী বাঁচে, কত

নির্দ্দোষী মরে, তাহার ইয়ত্তা নাই। য়ুরোপে কেন Socialism C Anarchism-এর এত প্রচার ও প্রভাব হইয়াছে, এই জুয়াখেলার মধ্যে একবার আসিলে, এই নিষ্ঠুর নির্ব্বিচার সমাজরক্ষক পেষণযন্ত্রের মধ্যে একবার পড়িলে তাহা প্রথম বোধগম্য হয়। এমত অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে, যে অনেক উদারচেতা দয়ালু লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই সমাজ ভাঙ্গিয়া দাও, চুরমার কর; এত পাপ, এত দুঃখ, এত নির্দ্দোষীর তপ্ত নিঃশ্বাসে ও হৃদয়ের শোণিতে যদি সমাজ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে একমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সাক্ষ্য। সেই ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমার বিপদের সঙ্গী বালক আসামীদের কথা বলি। কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে, নূতন সন্ততি মায়ের কোলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেকালের বাঙ্গালীর ছেলে দুই প্রকার ছিল, হয় শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ, সচ্চরিত্র, ভীরু, আত্মসম্মান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা শূন্য, নয়ত দুশ্চরিত্র, দুর্দ্দান্ত, অস্থির, ঠগ, সংযম ও সততাশূন্য! এই দুই চরমাবস্থার মধ্যস্থলে নানারূপ জীব বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আট দশজন অসাধারণ প্রতিভাবান শক্তিমান ভবিষ্যৎকালের পথপ্রদর্শক ভিন্ন এই দুই শ্রেণীর অতীত তেজস্বী আর্য্যসন্তান প্রায়ই দেখা যাইত না। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ছিল, মেধাশক্তি ছিল, কিন্তু শক্তি ও মনুষ্যত্ব ছিল না। কিন্তু এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্য কালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দ্দান্ত তেজস্বী পুরুষ সকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক, সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা ভাবনা বা সন্তাপের অভাব সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির, নূতন কর্ম্মস্রোতের লক্ষণ। ইঁহারা যদি হত্যাকারী হন, তবে বলিতে হয় যে, হত্যার রক্তময় ছায়া তাঁহাদের স্বভাবে পড়ে নাই, ক্রূরতা, উন্মত্ততা, পাশবিক ভাব তাঁহাদের মধ্যে আদবে ছিল না। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিন বালকের আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়া-শুনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্র জেলের কর্ম্মচারী, সিপাহী, কয়েদী, য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট, ডিটেকটিভ, কোর্টের কর্ম্মচারী, সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলেন এবং শত্রু মিত্র বড়

ছোট বিচার না করিয়া সকলের সঙ্গে আমোদ গল্প ও উপহাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোর্টের সময় তাঁহাদের পক্ষে অতি বিরক্তিকর ছিল, কারণ মোকদ্দমা প্রহসনে রস অতি অল্প ছিল। এই সময় কাটাইবার জন্য তাঁহাদের পড়িবার বই ছিল না, কথা কহিবার অনুমতিও ছিল না। যাঁহারা যোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখনও গণ্ডগোলের মধ্যে ধ্যান করিতে শেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সময় কাটান বড় কঠিন হইয়া উঠিত। প্রথমতঃ দুই চারিজন পড়িবার বই ভিতরে আনিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দেখাদেখি আর সকলে সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। তাহার পরে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাইত যে, মোকদ্দমা চলিতেছে, ত্রিশ চল্লিশ জন আসামীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লইয়া টানাটানি হইতেছে, তাহার ফল ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে, অথচ সেই আসামীগণ সেই দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কেহ বঙ্কিমের উপন্যাস, কেহ বিবেকানন্দের রাজযোগ বা Science of Religions, কেহ গীতা, কেহ পুরাণ, কেহ য়ুরোপীয় দর্শন একাগ্রমনে পড়িতেছেন। ইংরাজ সার্জ্জেণ্ট বা দেশী সিপাহী কেহই তাঁহাদের এই আচরণে বাধা দিত না। তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন, ইহাতেই যদি এতগুলি পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র শান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদেরও কার্য্য লঘু হয়; অধিকন্তু ইহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু একদিন বার্লি সাহেবের দৃষ্টি এই দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল, এই আচরণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অসহ্য হইয়া উঠিল। দুই দিন তিনি কিছু বলেন নাই, পরে আর থাকিতে পারিলেন না, বইয়ের আমদানি বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। বাস্তবিক বার্লি এমন সুন্দর বিচার করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোথায় সকলে আনন্দ লাভ করিবেন, না সকলে বই পড়িতেন। ইহাতে বার্লির গৌরব ও বৃটিশ জষ্টিসের মহিমার প্রতি ঘোর অসম্মান প্রদর্শন করা হইত সন্দেহ নাই।

আমরা যতদিন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন কেবল গাড়ীতে, ম্যাজিষ্ট্রেট আসিবার পূর্ব্বের একঘণ্টা বা আধঘণ্টাকাল এবং টিফিনের সময় কতকটা আলাপ করিবার অবসর পাইতাম। যাঁহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয় বা আলাপ ছিল, তাঁহারা এই সময়ে cell-এর নীরবতা ও নির্জ্জনতার শোধ লইতেন, হাসি, আমোদ ও নানা বিষয়ের আলোচনায় সময় কাটাইতেন। কিন্তু এইরূপ অবসরে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপের সুবিধা হয় না, সেইজন্য আমার ভাই বারীন্দ্র ও অবিনাশ ভিন্ন আমি আর কাহারও সহিত অধিক আলাপ করিতাম না, তাঁহাদের হাসি ও গল্প শুনিতাম, স্বয়ং তাহাতে যোগ দিতাম না।

কিন্তু একজন আমার কাছে মাঝে মাঝে ঘেঁসিয়া আসিতেন, তিনি ভাবী approver নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট স্বভাব ছিল না, তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায়, কর্ম্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার কালে নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগল্‌ভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। তিনি জমিদারের ছেলে সুতরাং সুখে, বিলাসে, দুর্নীতিতে লালিত হইয়া কারাগৃহের কঠোর সংযম ও তপস্যায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, আর সেই ভাব সকলের নিকট প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যে কোন উপায়ে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার উৎকট বাসনা তাঁহার মনে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রথম তাঁহার এই আশা ছিল যে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন যে পুলিস তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া দোষ স্বীকার করাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা সেইরূপ মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই আর এক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও একজন মোক্তার তাঁহার নিকট জেলে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, শেষে ডিটেক্‌টিভ শামসুল আলমও তাঁহার নিকট আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ গোঁসাইয়ের কৌতূহল ও প্রশ্ন করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারতবর্ষে বড় বড় লোকের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না, গুপ্ত সমিতিকে কে কে আর্থিক সাহায্য দিয়া তাহা পোষণ করিয়াছিলেন, সমিতির লোক বাহিরে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কে কে ছিল, কাহারা এখন সমিতির কার্য্য চালাইবেন, কোথায় শাখা সমিতি রহিয়াছে ইত্যাদি অনেক ছোট বড় প্রশ্ন বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রকে করিতেন। গোঁসাইয়ের এই জ্ঞানতৃষ্ণার কথা অচিরাৎ সকলের কর্ণগোচর হইল এবং শামসুল আলমের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথাও আর গোপনীয় প্রেমালাপ না হইয়া open secret হইয়া উঠিল। ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হয় এবং কেহ কেহ ইহাও লক্ষ্য করে যে এইরূপ পুলিস দর্শনের পরই সর্ব্বদা নব নব প্রশ্ন গোঁসাইয়ের মনে জুটিত। বলা বাহুল্য তিনি এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। যখন প্রথম এই কথা আসামীদের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, তখন গোঁসাই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুলিস তাঁহার নিকট আসিয়া ‘‘রাজার সাক্ষী’’ হইবার জন্য তাঁহাকে নানা উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আমাকে কোর্টে

একবার এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ''আপনি কি উত্তর দিয়াছেন?'' তিনি বলিলেন, ''আমি কি শুনিব! আর শুনিলেও আমি কি জানি যে তাঁহাদের মনের মত সাক্ষ্য দিব?'' তাহার কিয়ৎদিন পরে আবার যখন এই কথা উল্লেখ করিলেন, তখন দেখিলাম, ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াইয়াছে। জেলে Identification parade-এর সময় আমার পার্শ্বে গোঁসাই দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, ''পুলিস কেবলই আমার নিকট আসেন।'' আমি উপহাস করিয়া বলিলাম, ''আপনি এই কথা বলুন না কেন যে সার আন্দ্রু ফ্রেজার গুপ্ত সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।'' গোঁসাই বলিলেন, ''সেই ধরণের কথা বলিয়াছি বটে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী আমাদের head এবং তাঁহাকে একবার বোমা দেখাইয়াছি।'' আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ''এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল?'' গোঁসাই বলিলেন, ''আমি —দের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িব। সেই ধরণের আরও অনেক খবর দিয়াছি। বেটারা corroboration খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরুক। কে জানে, এই উপায়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইতেও পারে।'' ইহার উত্তরে আমি কেবল বলিয়াছিলাম, ''এই নষ্টামি ছাড়িয়া দিন। উহাদের সঙ্গে চালাকী করিতে গেলে নিজে ঠকিবেন।'' জানি না, গোঁসাইয়ের এই কথা কতদূর সত্য ছিল। আর সকল আসামীদের এই মত ছিল যে আমাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, আমার বোধ হয় যে তখনও গোঁসাই approver হইতে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হন নাই, তাঁহার মন সেই দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পুলিসকে ঠকাইয়া তাঁহাদের কেস মাটী করিবার আশাও তাঁহার ছিল। চালাকী ও অসদুপায়ে কার্য্যসিদ্ধি দুষ্প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণা। তখন হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, গোঁসাই পুলিসের বশ হইয়া সত্য মিথ্যা তাহাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিয়া নিজে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবেন। একটী নীচ স্বভাবের আরও নিম্নতর দুষ্কর্ম্মের দিকে অধঃপতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাটকের মত অভিনীত হইতে লাগিল। আমি দিন দিন দেখিলাম, গোঁসাইয়ের মন কিরূপে বদলাইয়া যাইতেছে, তাহার মুখ, ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তারও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের সর্ব্বনাশ করিবার যোগাড় করিতেছিলেন, তাহার সমর্থন জন্য ক্রমে ক্রমে নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি বাহির করিতে লাগিলেন। এমন interesting psychological study প্রায়ই হাতের নিকট পাওয়া যায় না।

প্রথম কেহই গোঁসাইকে জানিতে দিলেন না যে সকলে তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনিও এমন নির্ব্বোধ যে অনেক দিন ইহার কিছু বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি খুব গোপনে পুলিসের সাহায্য করিতেছি। কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন হুকুম হইল যে, আর আমাদের নির্জ্জন কারাবাসে না রাখিয়া একসঙ্গে রাখা হইবে, তখন সেই নূতন ব্যবস্থায় পরস্পরের সহিত রাত-দিন দেখা ও কথাবার্ত্তা হওয়ায় আর বেশী দিন কিছুই লুকাইয়া রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে দুই একজন বালকের সঙ্গে গোঁসাইয়ের ঝগড়া হয়, তাহাদের কথায় ও সকলের অপ্রীতিকর ব্যবহারে গোঁসাই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অভিসন্ধি কাহারও অজ্ঞাত নহে। যখন গোঁসাই সাক্ষ্য দেন, তখন কয়েকটী ইংরাজী কাগজে এই খবর বাহির হয় যে, আসামীগণ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চমৎকৃত ও উত্তেজিত হইলেন। বলা বাহুল্য ইহা নিতান্ত রিপোর্টারদেরই কল্পনা। অনেক দিন আগেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই প্রকার সাক্ষ্য দেওয়া হইবে। এমন কি, যে দিনে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছিল। এই সময়ে একজন আসামী গোঁসাইয়ের নিকট গিয়া বলিলেন — দেখ ভাই, আর সহ্য হয় না, আমিও approver হইব, তুমি শামসুল আলমকে বল আমারও যেন খালাস পাইবার ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই সম্মত হইলেন, কয়েক দিন পরে তাঁহাকে বলিলেন যে এই অর্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে চিঠি আসিয়াছে যে, সেই আসামীর নিবেদনের অনুকূল নির্ণয় (favourable consideration) হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া গোঁসাই তাহাকে উপেন প্রভৃতির নিকট হইতে এইরূপ কয়েকটী আবশ্যকীয় কথা বাহির করিতে বলিলেন, যেমন কোথায় গুপ্ত সমিতির শাখা সমিতি ছিল, কাহারা তাহার নেতা, ইত্যাদি। নকল approver আমোদ-প্রিয় ও রসিক লোক ছিলেন, তিনি উপেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া গোঁসাইকে কয়েকটী কল্পিত নাম জানাইয়া বলিলেন যে, মাদ্রাজে বিশ্বম্ভর পিলে, সাতারায় পুরুষোত্তম নাটেকর, বোম্বাইতে প্রোফেসার ভট্ট এবং বরোদায় কৃষ্ণাজীরাও ভাও এই গুপ্ত সমিতির শাখার নেতা ছিলেন। গোঁসাই আনন্দিত হইয়া এই বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পুলিসকে জানাইলেন। পুলিসও মাদ্রাজ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, অনেক ছোট বড় পিলেকে পাইলেন, কিন্তু একটীও পিলে বিশ্বম্ভর বা অর্দ্ধ বিশ্বম্ভরও পাইলেন না, সাতারার পুরুষোত্তম নাটেকরও তাঁহার অস্তিত্ব ঘন অন্ধকারে গুপ্ত রাখিয়া রহিলেন, বোম্বাইয়ে একজন প্রোফেসার ভট্ট পাওয়া গেলেন, কিন্তু তিনি নিরীহ রাজভক্ত ভদ্রলোক, তাঁহার পিছনে কোন গুপ্ত সমিতি

থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ সাক্ষ্য দিবার সময় গোঁসাই পূর্ব্বকালে উপেনের নিকট শোনা কথা বলিয়া কল্পনারাজ্য নিবাসী বিশ্বম্ভর পিলে ইত্যাদি ষড়যন্ত্রের মহারথীগণকে নর্টনের শ্রীচরণে বলি দিয়া তাঁহার অদ্ভুত prosecution theory পুষ্ট করিলেন। বীর কৃষ্ণাজীরাও ভাও লইয়া পুলিস আর একটী রহস্য করিলেন। তাঁহারা বাগান হইতে বরোদার কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডের নামে কোনও ''ঘোষ'' দ্বারা প্রেরিত টেলিগ্রামের নকল বাহির করিলেন। সেইরূপ নামের কোন লোক ছিল কি না, বরোদাবাসী তাহার কোন সন্ধান পান নাই, কিন্তু যখন সত্যবাদী গোঁসাই বরোদাবাসী কৃষ্ণাজীরাও ভাওয়ের কথা বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও ভাও ও কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে একই। আর কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে থাকুন বা না থাকুন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেশবরাও দেশপাণ্ডের নাম চিঠিপত্রে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও ভাও, কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে এবং কেশবরাও দেশপাণ্ডে একই লোক। ইহাতে প্রমাণিত হল যে, কেশবরাও দেশপাণ্ডে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান পাণ্ডা। এইরূপ অসাধারণ অনুমান সকলের উপর নর্টন সাহেবের সেই বিখ্যাত theory প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গোঁসাইয়ের কথা বিশ্বাস করিলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাঁহারই কথায় আমাদের নির্জ্জন কারাবাস ঘুচিয়া যায় এবং আমাদের একত্র বাসের হুকুম হয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুলিস তাঁহাকে সকলের মধ্যে রাখিয়া ষড়-যন্ত্রের গুপ্ত কথা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই জানিতেন না যে সকলে পূর্ব্বেই তাঁহার নূতন ব্যবসার কথা জানিতে পারিয়াছেন, সেইজন্য কাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কোথায় শাখা সমিতি, কে টাকা দিতেন বা সাহায্য করিতেন, কে এখন গুপ্ত সমিতির কার্য্য চালাইবেন, এইরূপ অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রশ্নের কিরূপ উত্তর লাভ করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত উপরে দিয়াছি। কিন্তু গোঁসাইয়ের অধিকাংশ কথাই মিথ্যা। ডাক্তার ডেলি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনিই এমারসন সাহেবকে বলিয়া কহিয়া এই পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ডেলির কথাই সত্য, তাহার পরে হয়ত পুলিস নূতন ব্যবস্থার কথা অবগত হইয়া তাহা হইতে এইরূপ লাভের কল্পনা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই পরিবর্ত্তনে আমা ভিন্ন সকলের পরম আনন্দ হইল, আমি তখন লোকের সঙ্গে মিশিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, সেই সময়ে আমার সাধন খুব জোরে চলিতেছিল। সমতা, নিষ্কামতা ও শান্তির কতক কতক আস্বাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও সেই ভাব দৃঢ় হয় নাই। লোকের সঙ্গে মিশিলে, পরের চিন্তাস্রোতের আঘাত আমার

অপক্ক নবীন চিন্তার উপর পড়িলেই এই নব ভাব হ্রাস পাইতে পারে, ভাসিয়া যাইতেও পারে। বাস্তবিক তাহাই হইল। তখন বুঝিতাম না যে আমার সাধনের পূর্ণতার জন্য বিপরীত ভাবের উদ্রেক আবশ্যক ছিল, সেইজন্য অন্তর্য্যামী আমাকে হঠাৎ আমার প্রিয় নির্জ্জনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া উদ্দাম রজোগুণের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। আর সকলেই আনন্দে অধীর হইলেন। সেই রাত্রিতে যে ঘরে হেমচন্দ্র দাস, শচীন্দ্র সেন ইত্যাদি গায়ক ছিলেন সেই ঘর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, অধিকাংশ আসামী সেইখানে একত্র হইয়াছিলেন, এবং দুটা তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ ঘুমাইতে পারেন নাই। সারা রাত হাসির রোল, গানের অবিরাম স্রোত, এতদিনের রুদ্ধ গল্প বর্ষাকালের বন্যার মত বহিতে থাকায় নীরব কারাগার কোলাহলে ধ্বনিত হইল। আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম কিন্তু যতবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ততবারই শুনিলাম সেই হাসি, সেই গান, সেই গল্প সমান বেগে চলিতেছে। শেষ রাত্রে এই স্রোত ক্ষীণ হইয়া গেল, গায়কেরাও ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমাদের ওয়ার্ড নীরব হইল।

কারাগৃহ ও স্বাধীনতা

মনুষ্যমাত্রেই প্রায় বাহ্য অবস্থার দাস, স্থূলজগতের অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। মানসিক ক্রিয়াসকল সেই বাহ্যিক অনুভূতিকেই আশ্রয় করে, বুদ্ধিও স্থূলের সঙ্কীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম; প্রাণের সুখদুঃখ বাহ্য ঘটনার প্রতিধ্বনি মাত্র। এই দাসত্ব শরীরের আধিপত্যজনিত। উপনিষদে বলা হইয়াছে, ''জগৎস্রষ্টা স্বয়ম্ভূ শরীরের দ্বারসকল বহির্ম্মুখীন করিয়া গড়িয়াছেন বলিয়া সকলের দৃষ্টি বহির্জ্জগতে আবদ্ধ, অন্তরাত্মাকে কেহও দেখে না। সেই ধীরপ্রকৃতি মহাত্মা বিরল যিনি অমৃতের বাসনায় ভিতরে চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন।'' আমরা সাধারণতঃ যে বহির্ম্মুখীন স্থূলদৃষ্টিতে মনুষ্যজাতির জীবন দেখি, সেই দৃষ্টিতে শরীরই আমাদের মুখ্য সম্বল। য়ুরোপকে যতই না জড়বাদী বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যমাত্রই জড়বাদী। শরীর ধর্ম্ম সাধনের উপায়, আমাদের বহু-অশ্বযুক্ত রথ, যে দেহ-রথে আরোহণ করিয়া আমরা সংসার পথে ধাবিত হই। আমরা কিন্তু দেহের অযথার্থ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া দেহাত্মকবুদ্ধিকে এমন প্রশ্রয় দিই যে বাহ্যিক কর্ম্ম ও বাহ্যিক শুভাশুভ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই অজ্ঞানের ফল জীবনব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতা। সুখদুঃখ শুভাশুভ সম্পদবিপদ আমাদের মানসিক অবস্থাকে নিজের অনুযায়ী করিতে সচেষ্ট ত হয়ই, আমরাও কামনার ধ্যানে সেই স্রোতে ভাসিয়া যাই। সুখলালসায় দুঃখভয়ে পরের আশ্রিত হই, পরের দত্ত সুখ, পরের দত্ত দুঃখ গ্রহণ করিয়া অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করি। কেন না, প্রকৃতি হৌক বা মনুষ্য হৌক, যে আমাদের শরীরের উপর কিঞ্চিন্মাত্র আধিপত্য করিতে পারে কিম্বা নিজ শক্তির অধিকারক্ষেত্রে আনিতে পারে, তাহারই প্রভাবের অধীন হইতে হয়। ইহার চরম দৃষ্টান্ত শত্রুগ্রস্ত বা কারাবদ্ধের অবস্থা। কিন্তু যিনি বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশে বিচরণ করেন, কারাবদ্ধের ন্যায় তাঁহারও এই দুর্দ্দশা। শরীরই কারাগৃহ, দেহাত্মকবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা কারারূপ শত্রু।

এই কারাবাস মনুষ্যজাতির চিরন্তন অবস্থা। অপরপক্ষে সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মনুষ্যজাতির স্বাধীনতালাভার্থ অদমনীয় উচ্ছ্বাস ও প্রয়াস দেখিতে পাই। যেমন রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে যুগে যুগে এই চেষ্টা। আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, সুখদুঃখবর্জ্জন, Stoicism, Epicureanism, Asceticism, বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, রাজযোগ,

হঠযোগ, গীতা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্ম্মমার্গ, — নানা পন্থা একই গম্যস্থান। উদ্দেশ্য শরীর জয়, স্থূলের আধিপত্য বর্জ্জন, আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে স্থূলজগৎ ভিন্ন অন্য জগৎ নাই, স্থূলের উপর সূক্ষ্ম প্রতিষ্ঠিত, সূক্ষ্ম অনুভব স্থূল অনুভবের প্রতিকৃতি মাত্র, মনুষ্যের স্বাধীনতা-প্রয়াস ব্যর্থ; ধর্ম্মদর্শন বেদান্ত অলীক কল্পনা, সম্পূর্ণ ভূতপ্রকৃতি-আবদ্ধ আমাদের সেই বন্ধনমোচনে বা ভূতপ্রকৃতির সীমা উলঙ্ঘনে মিথ্যা চেষ্টা। কিন্তু মানবহৃদয়ের এমন গূঢ়তর স্তরে এই আকাঙ্ক্ষা নিহিত যে সহস্র যুক্তিও তাহা উন্মূলন করিতে অসমর্থ। মনুষ্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। চিরকাল মনুষ্য অস্পষ্ট রূপে অনুভব করিয়া আসিতেছেন যে স্থূলজয়ে সমর্থ সূক্ষ্মবস্তু তাহার অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান, সূক্ষ্মময় অধিষ্ঠাতা নিত্যমুক্ত আনন্দময় পুরুষ আছেন। সেই নিত্যমুক্তি ও নির্ম্মল আনন্দলাভ করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই বিজ্ঞানকল্পিত evolution-এরও উদ্দেশ্য। বিচারশক্তি ও তাহার অভাব পশু ও মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ নহে। পশুর বিচারশক্তি আছে, কিন্তু পশুদেহে তাহার উৎকর্ষ হয় না। পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ এই যে শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থা, শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনতার চেষ্টাই মনুষ্যত্ব বিকাশ। এই স্বাধীনতাই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাকেই মুক্তি বলে। এই মুক্ত্যর্থে আমরা অন্তঃকরণস্থ মনোময় প্রাণশরীরনেতাকে জ্ঞানদ্বারা চিনিতে কিম্বা কর্ম্মভক্তিদ্বারা প্রাণ মন শরীর অর্পণ করিতে সচেষ্ট হই। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" বলিয়া গীতার যে প্রধান উপদেশ এই স্বাধীনতাই সেই গীতোক্ত যোগ। আন্তরিক সুখদুঃখ যখন বাহ্যিক শুভাশুভ সম্পদবিপদকে আশ্রয় না করিয়া স্বয়ংজাত, স্বয়ংপ্রেরিত, স্বসীমাবদ্ধ হয়, তখন মনুষ্যের সাধারণ অবস্থার বিপরীত অবস্থা হয়, বাহ্যিক জীবন আন্তরিক জীবনের অনুযায়ী করা যায়, কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়। গীতার আদর্শ পুরুষ কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে কর্ম্মসন্ন্যাস করেন। তিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" আন্তরিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া আত্মরতি ও আত্মসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় সুখলালসায় দুঃখভয়ে কাহারও আশ্রিত হন না, পরের দত্ত সুখদুঃখ গ্রহণ করেন না, অথচ কর্ম্মভোগ করেন না। বরং মহাসংযমী মহাপ্রতাপান্বিত দেবাসুর যুদ্ধে রাগ ভয় ক্রোধাতীত মহারথী হইয়া ভগবৎপ্রেরিত যে কর্ম্মযোগী রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লব অথবা প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধর্ম্ম সমাজ রক্ষা করিয়া নিষ্কাম ভাবে ভগবৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন, তিনি গীতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

আধুনিক যুগে আমরা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। মানুষ বরাবরই তাঁহার গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হইতেছেন, সময় সময়ে সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া উচ্চে আরোহণ করিতে হয়, এবং সেইরূপ আরোহণ সময়ে রাজ্যে সমাজে ধর্ম্মে জ্ঞানে বিপ্লব হয়। বর্ত্তমানকালে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আরোহণ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থূলজগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও নিয়ম নির্দ্ধারণ করায় আরোহণমার্গের চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে। সূক্ষ্মজগতের বিশাল রাজ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানীদিগের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে, অনেকের মন সেই রাজ্য জয়ের আশায় প্রলুব্ধ। ইহা ভিন্ন অন্য অন্য লক্ষণ দেখা যাইতেছে — যেমন অল্প দিনে থিয়সফির বিস্তার, আমেরিকায় বেদান্তের আদর, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ও চিন্তাপ্রণালীতে ভারতবর্ষের পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ আধিপত্য ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ভারতের আকস্মিক ও আশাতীত উত্থান। ভারতবাসী জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিতে উঠিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইলে পাশ্চাত্যগণ উন্নতি-চেষ্টায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। যেমন আন্তরিক জীবনবিকাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান ও যোগাভ্যাসে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ উৎকর্ষলাভ করে নাই, তেমনই মনুষ্যজাতির প্রয়োজনীয় চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মতেজ তপঃক্ষমতা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগশিক্ষা ভারতেরই সম্পত্তি। বাহ্য সুখদুঃখকে তাচ্ছিল্য করিয়া আন্তরিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ভারতবাসীরই সাধ্য, নিষ্কাম কর্ম্মে ভারতবাসীই সমর্থ, অহঙ্কার-বর্জ্জন ও কর্ম্মে নির্লিপ্ততা তাঁহারই শিক্ষা ও সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জাতীয় চরিত্রে বীজরূপে নিহিত।

এই কথার যাথার্থ্য প্রথম আলিপুর জেলে অনুভব করিলাম। এই জেলে প্রায়ই চোর ডাকাত হত্যাকারী থাকে। যদিও কয়েদীর সঙ্গে আমাদের কথা কহা নিষিদ্ধ, তথাপি কার্য্যতঃ এই নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা হইত না, তাহা ছাড়া রাঁধুনী পানিওয়ালা ঝাড়ুদার মেহতর প্রভৃতি, যাহাদের সংস্রবে না আসিলে নয়, তাহাদের সঙ্গে অনেক সময় অবাধে বাক্যালাপ হইত। যাঁহারা আমার এক অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত, তাঁহারাও নৃশংস হত্যাকারীর দল প্রভৃতি দুঃশ্রাব্য বিশেষণে কলঙ্কিত ও নিন্দিত। যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোন অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান, আলিপুরে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা। আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বার মাস কাটাইলাম। এই বার মাস

অনুভবের ফলে, ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, মনুষ্য চরিত্রের উপর দ্বিগুণ ভক্তি এবং স্বদেশের ও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও কল্যাণের দশগুণ আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা আমার স্বভাবজাত optimism অথবা অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল নহে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে ইহা অনুভব করিয়া আসিয়াছিলেন, আলিপুর জেলের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ডেলি সাহেবও ইহা সমর্থন করিতেন। ডেলি সাহেব মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ সহৃদয় ও বিচক্ষণ লোক, মনুষ্য চরিত্রের নিকৃষ্ট ও জঘন্য বৃত্তি সকল প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান, অথচ তিনি আমাকে বলিতেন, "ভারতের ভদ্রলোক বা ছোটলোক, সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা জেলের কয়েদী যতই দেখি ও শুনি, আমার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে চরিত্রে ও গুণে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের উঁচু। এই দেশের কয়েদী ও য়ুরোপের কয়েদীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই ছেলেদের দেখে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। এদের আচরণ চরিত্র ও নানা সদ্‌গুণ দেখে কে কল্পনা করতে পারে যে এরা Anarchist বা হত্যাকারী। তাদের মধ্যে ক্রূরতা উদ্দামভাব অধীরতা বা ধৃষ্টতা কিছুমাত্র না দেখে সব উল্টাগুণই দেখি।" অবশ্যই জেলে চোর ডাকাত সাধুসন্ন্যাসী হয় না। ইংরাজের জেল চরিত্র শুধরাইবার স্থান নহে, বরং সাধারণ কয়েদীর পক্ষে চরিত্রহানি ও মনুষ্যত্বনাশের উপায়মাত্র। তাহারা যে চোর ডাকাত খুনী ছিল, সেই চোর ডাকাত খুনীই থাকে, জেলে চুরি করে, শক্ত নিয়মের মধ্যেও নেশা করে, জুয়াচুরি করে। তাহা হইলে কি হইবে, ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব গিয়াও যায় না। সামাজিক অবনতিতে পতিত, মনুষ্যত্বনাশের ফলে নিষ্পেষিত, বাহিরে কালিমা কদর্য্যভাব কলঙ্ক বিকৃতি, তথাপি ভিতরে সেই লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব ভারতবাসীর মজ্জাগত সদ্‌গুণে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে, পুনঃ পুনঃ কথায় ও আচরণে তাহা প্রকাশ পায়। যাঁহারা উপরের কাদাটুকু দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে ইহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যিনি সাধুতার অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নিজ সহজসাধ্য স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তিনি এই মতে কখনও মত দিবেন না। ছয় মাস কারাবাসের পরে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে চোর ডাকাতের মধ্যেই সর্ব্বঘটে নারায়ণকে দর্শন করিয়া উত্তরপাড়ার সভায় মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমিও আলিপুর জেলেই হিন্দুধর্ম্মের এই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, চোর ডাকাত খুনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য দেহে নারায়ণকে উপলব্ধি করিলাম।

এই দেশে কত শত নিরপরাধ ব্যক্তি দীর্ঘকাল জেলরূপ নরকবাস ভোগ দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কর্ম্মফল লাঘব করিয়া তাঁহাদের স্বর্গপথ পরিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীগণ যাঁহারা ধর্ম্মভাব দ্বারা পূত ও দেবভাবাপন্ন নহেন, তাঁহারা এইরূপ পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ হন, যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশে রহিয়াছেন বা পাশ্চাত্য চরিত্র-প্রকাশক সাহিত্য পড়িয়াছেন, তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারেন। এরূপ স্থলে হয়ত তাঁহাদের নিরাশাপীড়িত, ক্রোধ ও দুঃখের অশ্রুজলপ্লুত হৃদয় পার্থিব নরকের ঘোর অন্ধকারে এবং সহবাসীদের সংস্রবে পড়িয়া তাহাদেরই ক্রূরতা ও নীচবৃত্তি আশ্রয় করে; — নয়ত দুর্ব্বলতার নিরতিশয় নিষ্পেষণে বল বুদ্ধি হীন হইয়া তাহাতে মনুষ্যের নষ্টাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এ ব্যক্তি ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্ম্মসম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আর্য্যশিক্ষাসুলভ ধৈর্য্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্ব্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্ব্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় সময় নিরপরাধে কষ্টভোগের কথা পাড়েন, স্ত্রীছেলেদের কথা বলেন, কবে ভগবান কারামুক্তি দিয়া স্ত্রীছেলেদের মুখদর্শন করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কৃপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। বৃদ্ধের যত চেষ্টা ও ভাবনা নিজের জন্যে নহে, পরের সুখসুবিধা সংক্রান্ত। দয়া ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্ম। নম্রতায় এই সকল সদ্‌গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমা হইতে সহস্রগুণ উচ্চ হৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্ব্বদা লজ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সংকোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ব্বদা আমার সুখ-সোয়াস্তির জন্যে চিন্তিত। যেমন আমার উপর তেমনই সকলের উপর — বিশেষ নিরপরাধ ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁহার দয়াদৃষ্টি বিনীত সেবাসম্মান আরো অধিক। অথচ মুখে ও আচরণে কেমন একটী স্বাভাবিক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রকাশিত। দেশের প্রতিও ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এই বৃদ্ধ কয়েদীর দয়াদাক্ষিণ্যপূর্ণ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যমূর্ত্তি চিরকাল আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। এই অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষার মধ্যে — আমরা যাহাদের অশিক্ষিত ছোটলোক বলি, — তাহাদের মধ্যে এইরূপ

হিন্দুসন্তান পাওয়া যায়, ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব, আর্য্যশিক্ষার অতুল গুণপ্রকাশ এবং ইহাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাজনক। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটী শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠিত হইবে।

উপরে একটী অশিক্ষিত চাষার কথা বলিলাম, এখন দুইজন শিক্ষিত যুবকের কথা বলি। ইঁহারা হ্যারিসন রোড়ের কবিরাজদ্বয়, নগেন্দ্রনাথ ও ধরণী। ইঁহারা সাত বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইঁহারাও যেরূপ শান্তভাবে, যেরূপ সন্তুষ্টমনে, এই আকস্মিক বিপত্তি, এই অন্যায় রাজদণ্ড সহ্য করিতেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইত। কখনও তাঁহাদের মুখে ক্রোধদুষ্ট বা অসহিষ্ণুতা-প্রকাশক একটীও কথা শুনি নাই। যাঁহাদের দোষে জেলরূপ নরকে যৌবনকাল কাটাইতে হইল, তাঁহাদের প্রতি যে লেশমাত্র ক্রোধ তিরস্কার ভাব বা বিরক্তি পর্য্যন্ত আছে, তাহার কোন লক্ষণ কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার গৌরবস্থল পাশ্চাত্যভাষায় ও পাশ্চাত্যবিদ্যায় অভিজ্ঞতা-বঞ্চিত, মাতৃভাষাই ইঁহাদের সম্বল, কিন্তু ইংরাজীশিক্ষালব্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য কম লোক দেখিয়াছি। দুইজনেই মানুষের নিকট আক্ষেপ কিম্বা বিধাতার নিকট নালিশ না করিয়া সহাস্য মুখে নতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। দুটী ভাইই সাধক কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। নগেন্দ্র ধীর প্রকৃতি, গম্ভীর, বুদ্ধিমান। হরিকথা ও ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যখন আমাদিগকে নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হইল তখন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ জেলের খাটুনি সমাপ্তে আমাদিগকে বই পড়িবার অনুমতি দিলেন। নগেন্দ্র ভগবদ্‌গীতা পড়িতে চাহিয়া বাইবেল পাইয়াছিলেন। বাইবেল পড়িয়া তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় বসিয়া আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিতেন। নগেন্দ্র গীতা পড়েন নাই, তথাপি আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম বাইবেলের কথা না বলিয়া গীতার শ্লোকার্থ বলিতেছেন — এমনকি এক একবার মনে হইত যে ভগবদ্‌গুণাত্মক মহৎ উক্তিসকল কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত উক্তিগুলি সেই বাসুদেব মুখপদ্ম হইতে এই আলিপুরের কাঠগড়ায় আবার নিঃসৃত হইতেছে। গীতা না পড়িয়া বাইবেলে গীতার সমতাবাদ, কর্ম্মফলত্যাগ, সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে। ধরণী নগেন্দ্রর ন্যায় বুদ্ধিমান নন, কিন্তু বিনীত ও কোমল প্রকৃতি, স্বভাবতঃই ভক্ত। তিনি সর্ব্বদা মাতৃধ্যানে বিভোর, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া

পড়িত। ইঁহাদের দেখিয়া কে বলিতে পারে বাঙ্গালী হীন অধম? এই শক্তি এই মনুষ্যত্ব এই পবিত্র অগ্নি ভস্মরাশিতে লুক্কায়িত আছে মাত্র।

ইঁহারা উভয়েই নিরপরাধ। বিনা দোষে কারাবদ্ধ হইয়াও নিজগুণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সুখদুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অপরাধী, তাঁহাদের মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের সদ্‌গুণ বিকাশ পাইত। বার মাস আলিপুরে ছিলাম, দুয়েকজন ভিন্ন যত কয়েদী, যত চোর ডাকাত খুনীর সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ঘটিয়াছিল, সকলের নিকটেই আমরা সদ্ব্যবহার ও অনুকূলতা পাইতাম। আধুনিক-শিক্ষা-দূষিত আমাদের মধ্যে বরঞ্চ এসকল গুণের অভাব দেখা যায়। আধুনিক শিক্ষার অনেক গুণ থাকিতে পারে কিন্তু সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা সেই গুণের মধ্যগত নহে। যে দয়া সহানুভূতি আর্য্যশিক্ষার মূল্যবান অঙ্গ, তাহা এই চোর-ডাকাতের মধ্যেও দেখিতাম। মেহতর ঝাড়ুদার পানিওয়ালাকে বিনা দোষে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখকষ্ট কতকপরিমাণে অনুভব করিতে হইত, কিন্তু তাহাতে একজনও আমাদের উপর অসন্তুষ্টি বা ক্রোধ প্রকাশ করে নাই। দেশী জেলরক্ষকদের নিকট তাহারা মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিত বটে কিন্তু প্রসন্নমুখে আমাদের কার্য্য করিয়া যাইত, এবং ভগবানের নিকট আমাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিত। একজন মুসলমান কয়েদী অভিযুক্তদিগকে নিজের ছেলেদের ন্যায় ভালবাসিতেন, বিদায় লইবার সময় তিনি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দেশের জন্যে এই লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগ বলিয়া অন্য সকলকে দেখাইয়া দুঃখ করিতেন, "দেখ, ইহারা ভদ্রলোক, ধনী লোকের সন্তান, গরীবদুঃখীকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া ইহাদের এই দুর্দ্দশা।" যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডের জেলে নিম্নশ্রেণীর কয়েদী চোর ডাকাত খুনীর এইরূপ আত্মসংযম দয়াদাক্ষিণ্য কৃতজ্ঞতা পরার্থে ভগবদ্ভক্তি কি দেখা যায়! প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপ ভোক্তৃভূমি, ভারত দাতৃভূমি। দেব ও অসুর বলিয়া গীতায় দুই শ্রেণীর জীব বর্ণিত আছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃ দেবপ্রকৃতি, পাশ্চাত্যগণ স্বভাবতঃ অসুরপ্রকৃতি। কিন্তু এই ঘোর কলিতে পড়িয়া তমোভাবের প্রাধান্যবশতঃ আর্য্যশিক্ষার অবলোপে দেশের অবনতি, সমাজের অবনতি ও ব্যক্তিগত অবনতিতে, আমরা নিকৃষ্ট আসুরিকবৃত্তি সঞ্চয় করিতেছি আর পাশ্চাত্যগণ অন্যদিকে জাতীয় উন্নতি ও মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের গুণে দেবভাব অর্জ্জন করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের দেবভাবে কতকটা অসুরত্ব এবং আমাদের আসুরিক ভাবের মধ্যেও দেবভাব অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাহাদের

মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সেও অসুরত্ব সম্পূর্ণ হারায় না। নিকৃষ্টে নিকৃষ্টে যখন তুলনা করি, ইহার যথার্থতা তখন অতি স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।

এই সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার আছে, প্রবন্ধের অতিদীর্ঘতার ভয়ে লিখিলাম না। তবে জেলে যাঁহাদের আচরণে এই আন্তরিক স্বাধীনতা দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা এই দেবভাবের চরম দৃষ্টান্ত। এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়

"কারাগৃহ ও স্বাধীনতা"-শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কয়েকজন নিরপরাধী কয়েদীর মানসিক ভাব বর্ণনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আর্য্যশিক্ষার গুণে কারাবাসেও ভারতবাসীর আন্তরিক-স্বাধীনতারূপ মহামূল্য পৈতৃকসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না — উপরন্তু ঘোর অপরাধীর মধ্যেও সেই সহস্রবর্ষ সঞ্চিত আর্য্যচরিত্র-গত দেবভাবও ভগ্নাবশিষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে। আর্য্যশিক্ষার মূলমন্ত্র সাত্ত্বিকভাব। যে সাত্ত্বিক, সে বিশুদ্ধ। সাধারণতঃ মনুষ্যমাত্রেই অশুদ্ধ। রজোগুণের প্রাবল্যে, তমোগুণের ঘোর নিবিড়তায় এই অশুদ্ধি পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। মনের মালিন্য দুই প্রকার, — জড়তা, বা অপ্রবৃত্তিজনিত মালিন্য; ইহা তমোগুণপ্রসূত। দ্বিতীয়, — উত্তেজনা বা কুপ্রবৃত্তিজনিত মালিন্য; ইহা রজোগুণপ্রসূত। তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞানমোহ, বুদ্ধির স্থূলতা, চিন্তার অসংলগ্নতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, কর্ম্মে আলস্যজনিত বিরক্তি, নিরাশা, বিষাদ, ভয়, এক কথায় যাহা কিছু নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক তাহাই। জড়তা ও অপ্রবৃত্তি অজ্ঞানের ফল, উত্তেজনা ও কুপ্রবৃত্তি ভ্রান্তজ্ঞানসম্ভূত। কিন্তু তমোমালিন্য অপনোদন করিতে হইলে রজোগুণের উদ্রেক দ্বারাই তাহা দূর করিতে হয়। রজোগুণই প্রবৃত্তির কারণ এবং প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রথম সোপান। যে জড়, সে নিবৃত্ত নয়, — জড়ভাব জ্ঞানশূন্য, আর জ্ঞানই নিবৃত্তির মার্গ। কামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিবৃত্ত; কর্ম্মত্যাগ নিবৃত্তি নয়। সেই জন্য ভারতের ঘোর তামসিক অবস্থা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "রজোগুণ চাই, দেশে কর্ম্মবীর চাই, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড স্রোত বহুক। তাহাতে যদি পাপও আসিয়া পড়ে, তাহাও এই তামসিক নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল।"

সত্যই আমরা ঘোর তমোমধ্যে নিমগ্ন হইয়া সত্ত্বগুণের দোহাই দিয়া মহাসাত্ত্বিক সাজিয়া বড়াই করিতেছি। অনেকের এই মত দেখিতে পাই যে, আমরা সাত্ত্বিক বলিয়াই রাজসিক জাতিসকল দ্বারা পরাজিত, সাত্ত্বিক বলিয়া এইরূপ অবনত ও অধঃপতিত। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। খৃষ্টানজাতি প্রত্যক্ষফলবাদী, তাঁহারা ধর্ম্মের ঐহিক ফল দেখাইয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা বলেন — খৃষ্টানজাতিই জগতে প্রবল, অতএব খৃষ্টান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আর আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন — ইহা ভ্রম; ঐহিক ফল দেখিয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা যায়

না, পারলৌকিক ফল দেখিতে হয়; হিন্দুরা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া, অসুরপ্রকৃতি বলবান পাশ্চাত্যজাতির অধীন হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে আর্য্যজ্ঞানবিরোধী ঘোর ভ্রম নিহিত। সত্ত্বগুণ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না। এমনকি সত্ত্বপ্রধান জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতেজই সত্ত্বগুণের মুখ্যফল, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের ভিত্তি। আঘাত পাইলে শান্ত ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষত্রতেজের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে ব্রহ্মতেজ টিকিতে পারে না। দেশে যদি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে একশ ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সত্ত্বগুণের আতিশয্য নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য। রজোগুণের অভাবে আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব ম্লান হইয়া তমোমধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িল। আলস্য, মোহ, অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, নিরাশা, বিষাদ, নিশ্চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা অবনতিও বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই মেঘ প্রথমে লঘু ও বিরল ছিল, কালের গতিতে ক্রমশঃ এতদূর নিবিড়তর হইয়া পড়িল, অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া আমরা এমন নিশ্চেষ্ট ও মহদাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া পড়িলাম যে, ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণের উদয়েও সেই অন্ধকার পূর্ণ তিরোহিত হইল না। তখন সূর্য্য-ভগবান রজোগুণজনিত প্রবৃত্তি দ্বারা দেশরক্ষার সঙ্কল্প করিলেন।

জাগ্রত রজঃশক্তি প্রচণ্ডভাবে কার্য্যকরী হইলে তমঃ পলায়নোদ্যত হয় বটে কিন্তু অন্যদিকে স্বেচ্ছাচার, কুপ্রবৃত্তি ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি আসুরিক ভাব আসিবার আশঙ্কা। রজঃশক্তি যদি স্ব স্ব প্রেরণায় উন্মত্ততার বিশাল প্রবৃত্তির উদরপূরণকেই লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও আছে। রজোগুণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে স্বপথগামী হইলে অধিককাল টিকিতে পারে না, ক্লান্তি আসে, তমঃ আসে, প্রচণ্ড ঝটিকার পরে আকাশ নির্ম্মল পরিষ্কার না হইয়া মেঘাচ্ছন্ন বায়ুস্পন্দনরহিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে ফ্রান্সের এই পরিণাম হইয়াছে। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবে রজোগুণের ভীষণ প্রাদুর্ভাব, বিপ্লবান্তে তামসিকতার অল্পাধিক পুনরুত্থান, আবার রাষ্ট্রবিপ্লব, আবার ক্লান্তি, শক্তিহীনতা, নৈতিক অবনতি, ইহাই গত শতবর্ষে ফ্রান্সের ইতিহাস। যতবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতারূপ আদর্শ-জনিত সাত্ত্বিক প্রেরণা ফ্রান্সের প্রাণে জাগিয়াছে, ততবারই ক্রমশঃ রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্বসেবাবিমুখ আসুরিকভাবে পরিণতি লাভ করিয়া স্বপ্রবৃত্তিপূরণে যত্নবান হইয়াছে। ফলতঃ, তমোগুণের পুনরাবির্ভাবে ফ্রান্স তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত মহাশক্তি হারাইয়া ম্রিয়মাণ বিষম অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মত না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরিণাম এড়াইবার একমাত্র উপায় প্রবল রজঃশক্তিকে সত্ত্ব-সেবায় নিযুক্ত করা। যদি সাত্ত্বিকভাব জাগ্রত হইয়া রজঃশক্তির চালক হয়, তাহা হইলে তমোগুণের পুনঃ প্রাদুর্ভাবের ভয়ও নাই, উদ্দাম শক্তিও শৃঙ্খলিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া উচ্চ আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। সত্ত্বোদ্রেকের উপায় ধর্ম্মভাব — স্বার্থকে ডুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শক্তি অর্পণ — ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনকে এক মহা ও পবিত্র যজ্ঞে পরিণত করা। গীতায় কথিত আছে, সত্ত্বরজঃ উভয়ে তমঃ নাশ করে; একা সত্ত্ব কখন তমঃকে পরাজয় করিতে পারে না। সেইজন্য ভগবান অধুনা ধর্ম্মের পুনরুত্থান করাইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মাগণ সত্ত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মজগতে যেমন জাগরণ হইয়াছিল, রাজনীতি বা সমাজে তেমন হয় নাই। কারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না, সেইজন্য প্রচুর বীজ বপিত হইয়াও শস্য দেখা দেয় নাই। ইহাতেও ভারতবর্ষের উপর ভগবানের দয়া ও প্রসন্নতা বুঝা যায়। রাজসিক ভাবপ্রসূত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণ কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে জাতির অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য এতদিন রজঃশক্তির স্রোত রুদ্ধ ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিকভাব পূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা দিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্ত্বিকের খেলা; এ খেলায় যাহা কিছু উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব তাহা অচিরে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইবেই। বাহ্যশক্তির দ্বারা নহে, ভিতরে যে ব্রহ্মতেজ, যে সাত্ত্বিকভাব, তাহা দ্বারাই ইহা বশীভূত ও নিয়মিত হইবে। ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়া আমরা সেই ব্রহ্মতেজ ও সাত্ত্বিকভাবের পোষকতা করিতে পারি মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরার্থে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বোদ্রেকের এক উপায়। আর আমাদের রাজনীতিক জাগরণে এই ভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভাব রক্ষা করা কঠিন। যেমন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন জাতির পক্ষে আরও কঠিন। পরার্থের মধ্যে স্বার্থ অলক্ষিতভাবে ছুটিয়া আসে এবং যদি আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হয়, এমন ভ্রমে পতিত হইতে পারি যে আমরা পরার্থের দোহাই দিয়া স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া পরহিত, দেশহিত, মনুষ্যজাতির হিত ডুবাইব অথচ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিব না। ভগবৎসেবা সত্ত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু সেই পথেও হিতে বিপরীত হইতে পারে, ভগবৎসান্নিধ্যরূপ আনন্দ পাইয়া আমাদের সাত্ত্বিক-

নিশ্চেষ্টতা জন্মিতে পারে, সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে দুঃখকাতর দেশের প্রতি ও মানবজাতির সেবায় পশ্চাদ্‌মুখ হইতে পারি। ইহাই সাত্ত্বিকভাবের বন্ধন। যেমন রাজসিক অহঙ্কার আছে, তেমনি সাত্ত্বিক অহঙ্কারও আছে। যেমন পাপ মনুষ্যকে বদ্ধ করে, তেমনি পুণ্যও বদ্ধ করে। সম্পূর্ণ বাসনাশূন্য হইয়া অহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক ভগবানকে আত্মসমর্পণ না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। এই দুটী অনিষ্ট ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম বিশুদ্ধ বুদ্ধির দরকার। দেহাত্মক বুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া মানসিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করাই বুদ্ধি-শোধনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। মন স্বাধীন হইলে জীবের আয়ত্ত হয়, পরে মনকে জয় করিয়া বুদ্ধির আশ্রয়ে মানুষ স্বার্থের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাতেও স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে আমাদিগকে ত্যাগ করে না। শেষ স্বার্থ মুমুক্ষুত্ব, পরদুঃখকে ভুলিয়া নিজের আনন্দে ভোর হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্বভূতে নারায়ণকে উপলব্ধি করিয়া সেই সর্ব্বভূতস্থ নারায়ণের সেবা ইহার ঔষধ; ইহাই সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা। ইহা হইতেও উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহা সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া গুণাতীত হইয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে আশ্রয় করা। গুণাতীত্যের বর্ণনা গীতায় কথিত আছে, যেমন —

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

"যখন জীব সাক্ষী হইয়া গুণত্রয় অর্থাৎ ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তিকেই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া দেখে এবং এই গুণত্রয়েরও উপর শক্তির প্রেরক ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে-ই ভগবৎ-সাধর্ম্ম্য লাভ করে। তখন দেহস্থ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার দেহসম্ভূত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু জরাদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমরত্ব ভোগ করে। সত্ত্বজনিত জ্ঞান, রজোজনিত প্রবৃত্তি বা তমোজনিত নিদ্রা নিশ্চেষ্টা ভ্রমস্বরূপ মোহ আসিলে বিরক্ত হয় না, এই গুণত্রয়ের আগমন নির্গমনে সমান ভাব রাখিয়া উদাসীনের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে, গুণগ্রাম তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, এই সবই গুণের স্বধর্ম্মজাত বৃত্তি বলিয়া দৃঢ় থাকে। যাহার পক্ষে সুখদুঃখ সমান, প্রিয়াপ্রিয় সমান, নিন্দাস্তুতি সমান, কাঞ্চন লোষ্ট্র উভয়ই প্রস্তরের তুল্য, যে ধীরস্থির, নিজের মধ্যে অটল, যাহার নিকট মান-অপমান একই, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ সমান প্রিয়, যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্যারম্ভ করে না, সকল কর্ম্ম ভগবানকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় কর্ম্ম করে, তাহাকেই গুণাতীত বলে। যে আমাকে নির্দ্দোষ ভক্তিযোগে সেবা করে, সে-ই এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়।"

এই গুণাতীত অবস্থা লাভ সকলের সাধ্য না হইলেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা লাভ সত্ত্বপ্রধান পুরুষের অসাধ্য নহে। সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে ত্যাগ করিয়া জগতের সকল কার্য্যে ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তির লীলা দেখা ইহার সর্ব্বপ্রথম উপক্রম। ইহা বুঝিয়া সাত্ত্বিক কর্ত্তা কর্ত্তৃত্ব-অভিমান ত্যাগে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন।

গুণত্রয় ও গুণাতীত্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা গীতার মূল কথা। কিন্তু এই শিক্ষা সাধারণতঃ গৃহীত হয় নাই, আজ পর্য্যন্ত যাহাকে আমরা আর্য্যশিক্ষা বলি, তাহা প্রায় সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয় জাতির লোপে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তিরও নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গীতার দিকে লোকের মন আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্য্যশিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, প্রবৃত্তিমার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। এই ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য জাতির মন কিরূপে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। এখনও স্রোত নির্ম্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু

অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত, তাহার নিখুঁত কার্য্য হইবে।

যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া দণ্ডিত। মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধের গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পড়িলে মনে যেন রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রূরতার সঞ্চার হয়। ক্রূরতা বর্ব্বরোচিত গুণ, মনুষ্য উন্নতির ক্রমবিকাশে যে সকল গুণ হইতে অল্পে অল্পে বর্জ্জিত হইতেছে, সেই সকলের মধ্যে ক্রূরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারিলে মানবজাতির উন্নতির পথে একটী বিঘ্নকর কণ্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আসামীর দোষ ধরিয়া লইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইহা রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। তাহাদের মধ্যে এমন সাত্ত্বিক শক্তি নিহিত যে এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা দেশের স্থায়ী অমঙ্গল সাধিত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

অন্তরের যে স্বাধীনতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার সঙ্গীগণের সে স্বাধীনতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যে কয়েকদিন আমরা একসঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়স্ক, অনেকে অল্পবয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ তাহাতে দৃঢ়মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইঁহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী ও লেখাসাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে, নির্দ্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্ণতার পরিবর্ত্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্ম্মের ও দেশের কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকটে দুই-চারিখানি বই থাকায় একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরী জমিয়াছিল। এই লাইব্রেরীর অধিকাংশই ধর্ম্মের বই, গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জীবনচরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি। অন্য পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী,

স্বদেশীগানের অনেক বই, আর য়ুরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক অল্পস্বল্প পুস্তক। সকালে কেহ কেহ সাধনা করিতে বসিত, কেহ কেহ বই পড়িত, কেহ কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তিময় নীরবতায় মাঝে মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। ''কাচেরী'' না থাকিলে কেহ কেহ ঘুমাইত, কেহ কেহ খেলা করিত — যে দিন যে খেলা জোটে, আসক্তি কাহারও নাই। কোন দিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শান্ত খেলা — কোন দিন বা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি। দিনকতক ফুটবল চলিল, ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব্ব উপকরণে গঠিত। দিনকতক কানামাছিই চলিল, এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া একদিকে জুজুৎসু শিক্ষা অন্যদিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ আর একদিকে drafts বা দশপঁচিশ। দুই চারিজন গম্ভীর প্রৌঢ় লোক ভিন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরও বালস্বভাব। সন্ধ্যাবেলায় গানের মজলিস জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেমদাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারিদিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্ম্মের গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক একদিন কেবল আমোদ করিবার ইচ্ছায় উল্লাসকর হাসির গান, অভিনয়, Ventriloquism অনুকরণ বা গেঁজেলের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত। উল্লাসকরের ন্যায় অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ও অপূর্ব্ব চরিত্র লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছিলাম বটে এমন লোক মাঝে মাঝে জন্মায় যাহার অন্তরাত্মায় মায়ার প্রভাব এত শিথিল যে সামান্য দেহের ধর্ম্ম ব্যতীত তাহার অন্য কোন বন্ধন নাই। ''লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা''। এই উক্তির যাথার্থ্য ও প্রকৃত মর্ম্ম এবার উল্লাসকরের আচরণে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলাম। সামান্য মানুষের ন্যায় কর্ম্ম করেন, হাসেন, গল্প করেন, খেলেন, ভুল করেন, ন্যায় করেন, অন্যায় করেন, অথচ ভিতরে সেই নির্ম্মল দেবভাব। গায় হাজার কাদা পড়িলেও তাহা গায় লাগিয়া থাকে না। আমাদের রাগ সুখ দুঃখ ভয় স্বার্থ হিংসা দ্বেষ তাঁহার জন্যে সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার আছে প্রেম, আনন্দ, হাস্য, পরোপকার, পরসেবা, ফুলের স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছতা ও প্রফুল্লতা। উল্লাসকর এই প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক। তাঁহার মধ্যে আমি কখনও লেশমাত্র ক্রোধ, দুঃখ, দৈন্য, বিকার, বিষণ্ণতা দেখি নাই। কিছুতেই আসক্তি নাই। তাঁহার নিকট যে যাহা চাহিত তাহা তাহাকে বিলাইয়া দিতেন, নিজের যেন কিছুই নহে। কোনও ভাবেও তিনি বদ্ধ নন। এইমাত্র সকলের মনোরঞ্জনার্থ হাসি তামাসা করিতেছিলেন, পরমুহূর্ত্তে দেখিলাম হঠাৎ ধ্যানমগ্ন হইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

কেহ ধ্যানভঙ্গ করিলেও তাঁহার আসে যায় না। হাসিমুখে তাহার আবদার সহ্য করিতেন। সবই তাঁহার পক্ষে লীলা, যেমন সংসার, তেমনই জেল, যেমন নিবৃত্তি তেমনই প্রবৃত্তি। ভেদ নাই, বিকার নাই। এতদূর সাত্ত্বিক স্বাধীন ভাব অন্য সকলের মধ্যে না থাকিলেও প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর ছিল। মোকদ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্ম্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত। এই নিশ্চিন্ত ভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাহাদের মধ্যে কাঠিন্য, ক্রূরতা, কুক্রিয়াসক্তি, কুটিলতা লেশমাত্র ছিল না। কি হাস্য কি কথা কি খেলা তাহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।

এই মানসিক স্বাধীনতার ফল অচিরে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ ক্ষেত্রেই ধর্ম্মবীজ বপন হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফল সম্ভবে। যীশু কয়েকজন বালককে দেখাইয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা এই বালকদের তুল্য, তাঁহারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" জ্ঞান ও আনন্দ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত ও প্রফুল্লিত, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। জেলে রাজসিক ভাব প্রশ্রয় পায় না, আর নির্জ্জন কারাগারে প্রবৃত্তির পরিপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন চিরাভ্যস্ত রজঃশক্তির উপকরণের অভাবে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিজেকে নাশ করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে Eating one's own heart বলেন, সেই অবস্থা ঘটে। ভারতবাসীর মন সেই নির্জ্জনতায়, সেই বাহ্যিক কষ্টের মধ্যে চিরন্তন টানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট ছুটিয়া যায়। আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। জানি না কোথা হইতে একটী স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল। আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন হইয়া পড়িল। অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু'চারি মাসের সাধনায় তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা কি দেখ্‌ছ — ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আসছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে সিদ্ধি পাবে।" এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। ইহারা যেন সেই প্রত্যাশিত ধর্ম্মপ্রবাহের মূর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপরিচয়; এই সাত্ত্বিকভাবের তরঙ্গ কাঠগড়া বাহিয়া চারপাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলের হৃদয় মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিত। ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না এবং কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এই সাত্ত্বিকভাবই

দেশের উন্নতির আশা। ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্য্যে প্রকাশ পায়, আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই তমোবর্জ্জন, রজোদমন, সত্ত্বপ্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্য ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।

নবজন্ম

গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহারা যোগপথে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে স্খলিতপদ ও যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের কি গতি হয়? তাঁহারা কি ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ফলে বঞ্চিত হইয়া বায়ুখণ্ডিত মেঘের মত বিনষ্ট হন?" উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ইহলোকে বা পরলোকে সেই-রূপ ব্যক্তির বিনাশ অসম্ভব। কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতিপ্রাপ্ত হন না। পুণ্যলোক-সকলে তাঁহার গতি হয়, সেখানে অনেক কাল বাস করিয়া শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষদের গৃহে অথবা যোগযুক্ত মহাপুরুষদের কুলে দুর্লভ জন্ম হয়, সেই জন্মে পূর্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সাচালিত হইয়া সিদ্ধির জন্য আরও চেষ্টা করেন, শেষে অনেক জন্মের অভ্যাসে পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করেন।" যে পূর্ব্বজন্মবাদ চিরকাল আর্য্য-ধর্ম্মের যোগলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গবিশেষ, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার পরে বেদান্তশিক্ষা প্রচারে ও গীতার অধ্যয়নে সেই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থূলজগতে যেমন heredity প্রধান সত্য, সূক্ষ্মজগতে তেমনই পূর্ব্বজন্মবাদ প্রধান সত্য। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দুইটী সত্য নিহিত আছে। যোগভ্রষ্ট পুরুষ তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানের সংস্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, সেই সংস্কার দ্বারা বায়ুচালিত তরণীর ন্যায় যোগপথে চালিত হন। কিন্তু কর্ম্মফল প্রাপ্তির যোগ্য শরীর উৎপাদনার্থ উপযুক্ত কুলে জন্মলাভ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট heredity যোগশরীরের উৎপাদক। শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষদের গৃহে জন্ম হইলে শুদ্ধ সবল শরীর উৎপাদন সম্ভব, যোগীকুলে জন্মগ্রহণে উৎকৃষ্ট মন ও প্রাণ গঠিত হয় এবং সেইরূপ শিক্ষা ও মানসিক গতিলাভও হয়।

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যেন একটী নূতন জাতি পুরাতন তমঃ অভিভূত জাতির মধ্যে সৃষ্ট হইতেছে। ভারতমাতার পুরাতন সন্ততি ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সেইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অল্পায়ু, ক্ষুদ্রাশয়, স্বার্থপরায়ণ, সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক তেজস্বী মহাত্মা দেহপ্রাপ্ত হইয়া এই বিষম বিপৎকালে জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভার উপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া কেবল জাতির ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য ও বিশাল কর্ম্মের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই পুণ্যবলে নব উষার কিরণমালা চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। ভারতজননীর নূতন সন্ততি পিতামাতার গুণপ্রাপ্ত না হইয়া সাহসী, তেজস্বী, উচ্চাশয়, উদার,

স্বার্থত্যাগী, পরার্থে ও দেশহিতসাধনে উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আজকাল পিতামাতার বশ না হইয়া যুবকগণ স্বপথে পথিক হইতেছে, বৃদ্ধে-তরুণে মতের অনৈক্য ও কার্য্যকালে বিরোধ উপস্থিত হয়। বৃদ্ধগণ এই দেবাংশসম্ভূত তরুণ সত্যযুগ-প্রবর্ত্তকগণকে স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন, না বুঝিয়া কলির সাহায্য করিতেছেন। যুবকগণ মহাশক্তি-সৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গঠিতে উদ্যত, তাঁহারা পিতৃভক্তি ও বাধ্যতা রক্ষা করিতে অক্ষম। এই অনর্থের উপশম ভগবানই করিতে পারেন। তবে মহাশক্তির ইচ্ছা বিফল হইতে পারে না, এই নবীন সন্ততি যাহা করিতে আসিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া যাইবেন না। এই নূতনের মধ্যেও পুরাতনের প্রভাব আছে। অপকৃষ্ট heredity-র দোষে, আসুরিক শিক্ষার দোষে অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যাঁহারা নবযুগ-প্রবর্ত্তনে আদিষ্ট তাঁহারাও অন্তর্নিহিত তেজ ও শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছেন না। নবীনদিগের মধ্যে সত্যযুগ প্রকাশের একটী পূর্ব্বলক্ষণ, ধর্ম্মে মতি ও অনেকের হৃদয়ে যোগলিপ্সা ও অর্দ্ধবিকশিত যোগশক্তি।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত অশোক নন্দী শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন। বলা হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, তাঁহারা কেহ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন যে, ইনি কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি অল্প ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি অন্য যুবকগণের ন্যায় প্রবল দেশসেবার আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত হন নাই। বুদ্ধিতে, চরিত্রে, প্রাণে তিনি সম্পূর্ণ যোগী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, তাঁহার পিতাও যোগপ্রাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ। গীতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। অল্পবয়সে তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগশক্তির লক্ষণ এক-একবার প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবনকালে মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট, অতএব বিদ্যালাভে ও সাংসারিক জীবনের পূর্ব্ব আয়োজনে তাঁহার মন বসে নাই, তথাপি পিতার পরামর্শে পূর্ব্বজ্ঞাত অসিদ্ধি উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া তাহাই করিতেছিলেন এবং যোগপথেও আরূঢ় হইয়াছিলেন। এমন সময়ে তিনি অকস্মাৎ বিনা কারণে ধৃত হইলেন। এই কর্ম্মফলপ্রাপ্ত বিপদে বিচলিত না হইয়া অশোক জেলে যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই মোকদ্দমায় আসামীদের মধ্যে অনেকে এই পথ অবলম্বন

করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য না হইলেও অন্যতম ছিলেন। তিনি ভক্তি ও প্রেমে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁহার উদার চরিত্র, গম্ভীর ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় সকলের পক্ষে মুগ্ধকর ছিল। গোঁসাই-এর হত্যার সময়ে তিনি হাসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের পূর্ব্বেই নির্জ্জন কারাবাসে রক্ষিত হইয়া তিনি বার বার জ্বরভোগ করিতে লাগিলেন। সেই জ্বরা-বস্থাতেই মুক্তকক্ষে হিমে রাত্রি যাপন করিতে হইত। ইহাতে ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থায়, যখন প্রাণরক্ষার আর আশা নাই, তখন বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি আবার সেই মৃত্যু-আগারে রক্ষিত ছিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাসের আবেদনে তাঁহাকে হাসপাতালে লইবার ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু জামিনে মুক্তিদান করা হইল না। শেষে ছোটলাটের সহৃদয়তায় তিনি স্বগৃহে স্বজনের সেবা পাইয়া মরিবার অনুমতি পাইলেন। আপীলে মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ভগবান তাঁহাকে দেহকারাবাস হইতে মুক্তি দিলেন। শেষকালে অশোকের যোগশক্তি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর দিন বিষ্ণুশক্তিতে অভিভূত হইয়া সকলকে ভগবানের মুক্তিদায়ক নাম ও উপদেশ বিতরণ করিয়া নামোচ্চারণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুঃখফল ক্ষয় করিতে অশোক নন্দীর জন্ম হইয়াছিল, সেইজন্য এই অনর্থক কষ্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। সত্যযুগ প্রবর্ত্তনে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি তাঁহার শরীরে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক যোগশক্তির প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মের গতি এইরূপই হয়। পুণ্যবান পাপফল ক্ষয় করিতে অল্পকাল পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত হইয়া দুষ্টদেহ ত্যাগ ও অন্যদেহ গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ ও জীবের হিতসম্পাদন করিতে আসেন।

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা

আমাদের ধৰ্ম্ম

আমাদের ধৰ্ম্ম সনাতন ধৰ্ম্ম। এই ধৰ্ম্ম ত্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, ত্রিকৰ্ম্মরত। আমাদের ধৰ্ম্ম ত্রিবিধ। ভগবান অন্তরাত্মায়, মানসিক জগতে, স্থূল জগতে — এই ত্রিধামে প্রকৃতিসৃষ্ট মহাশক্তিচালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই ত্রিধামে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা সনাতন ধৰ্ম্মের ত্রিবিধত্ব। আমাদের ধৰ্ম্ম ত্রিমার্গগামী। জ্ঞান, ভক্তি, কৰ্ম্ম — এই তিনটি স্বতন্ত্র বা মিলিত উপায়ে সেই যুক্তাবস্থা মানুষের সাধ্য। এই তিন উপায়ে আত্মশুদ্ধি করিয়া ভগবানের সহিত যোগলিপ্সা সনাতন ধৰ্ম্মের ত্রিমার্গগামী গতি। আমাদের ধৰ্ম্ম ত্রিকৰ্ম্মরত। মানুষের প্রধান বৃত্তিসকলের মধ্যে তিনটি ঊর্ধ্বগামিনী, ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বলদায়িনী — সত্য, প্রেম ও শক্তি। এই তিন বৃত্তির বিকাশে মানবজাতির ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। সত্য, প্রেম ও শক্তি দ্বারা ত্রিমার্গে অগ্রসর হওয়া সনাতন ধৰ্ম্মের ত্রিকৰ্ম্ম।

সনাতন ধৰ্ম্মের মধ্যে অনেক গৌণ ধৰ্ম্ম নিহিত; সনাতনকে অবলম্বন করিয়া পরিবর্তনশীল মহান্, ক্ষুদ্র নানাবিধ ধৰ্ম্ম স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সৰ্ব্বপ্রকার ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম স্বভাবসৃষ্ট। সনাতন ধৰ্ম্ম জগতের সনাতন স্বভাব আশ্রিত, এই নানাবিধ ধৰ্ম্ম নানাবিধ আধারগত স্বভাবের ফল। ব্যক্তিগত ধৰ্ম্ম, জাতিধৰ্ম্ম, বর্ণাশ্রিত ধৰ্ম্ম, যুগধৰ্ম্ম ইত্যাদি নানা ধৰ্ম্ম আছে। অনিত্য বলিয়া সেইগুলি উপেক্ষণীয় বা বৰ্জ্জনীয় নয়, বরং এই অনিত্য পরিবর্তনশীল ধৰ্ম্ম দ্বারাই সনাতন ধৰ্ম্ম বিকশিত ও অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত ধৰ্ম্ম, জাতিধৰ্ম্ম, বর্ণাশ্রিত ধৰ্ম্ম, যুগধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সনাতন ধৰ্ম্মের পুষ্টি না হইয়া অধৰ্ম্মই বৰ্দ্ধিত হয় এবং গীতায় যাহাকে সঙ্কর বলে, অর্থাৎ সনাতন প্রণালী ভঙ্গ ও ক্রমোন্নতির বিপরীত গতি বসুন্ধরাকে পাপে ও অত্যাচারে দগ্ধ করে। যখন সেই পাপের ও অত্যাচারের অতিরিক্ত মাত্রায় মানুষের উন্নতির বিরোধিনী ধৰ্ম্মদলনী আসুরিক শক্তিসকল স্ফীত ও বলযুক্ত হইয়া স্বার্থ, ক্রূরতা ও অহঙ্কারে দশদিক আচ্ছন্ন করে, অনীশ্বর জগতে ঈশ্বর সাজিতে আরম্ভ করে, তখন ভারাৰ্ত্ত পৃথিবীর দুঃখলাঘব করিবার মানসে ভগবানের অবতার কিম্বা বিভূতি মানবদেহে প্রকাশ হইয়া আবার ধৰ্ম্মপথ নিষ্কণ্টক করেন।

সনাতন ধৰ্ম্মের যথার্থ পালনের জন্য ব্যক্তিগত ধৰ্ম্ম, জাতিধৰ্ম্ম, বর্ণাশ্রিত ধৰ্ম্ম ও যুগধৰ্ম্মের আচরণ সৰ্ব্বদা রক্ষণীয়। কিন্তু এই নানাবিধ ধৰ্ম্মের মধ্যে ক্ষুদ্র

ও মহান্ দুই রূপ আছে। মহান্ ধর্ম্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র ধর্ম্ম মিলাইয়া ও সংশোধন করিয়া অনুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম জাতিধর্ম্মের অঙ্কাশ্রিত করিয়া আচরণ না করিলে জাতি ভাঙ্গিয়া যায় এবং জাতিধর্ম্ম লুপ্ত হইলে ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ক্ষেত্র ও সুযোগ নষ্ট হয়। ইহাও ধর্ম্মসঙ্কর — যে ধর্ম্মসঙ্করের প্রভাবে জাতি ও সঙ্করকারীগণ উভয়ে অতল নরকে নিমগ্ন হয়। জাতিকে আগে রক্ষা করিতে হয়, তবেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি নিরাপদে করা যায়। বর্ণাশ্রিত ধর্ম্মকেও যুগধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে না পারিলে মহান্ যুগধর্ম্মের প্রতিকূল গতিতে বর্ণাশ্রিত ধর্ম্ম চূর্ণ ও বিনষ্ট হইয়া সমাজও চূর্ণ ও বিনষ্ট হয়। ক্ষুদ্র সর্ব্বদা মহতের অংশ বা সহায়স্বরূপ, এই সম্বন্ধের বিপরীত অবস্থায় ধর্ম্মসঙ্করসম্ভূত মহান্ অনিষ্ট ঘটে। ক্ষুদ্র ধর্ম্মে ও মহান্ ধর্ম্মে বিরোধ হইলে ক্ষুদ্র ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহান্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান মঙ্গলপ্রদ।

আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও সনাতন-ধর্ম্মাশ্রিত জাতিধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আর্য্যজাতির বংশধর, আর্য্যশিক্ষা ও আর্য্যনীতির অধিকারী। এই আর্য্যভাবই আমাদের কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম আর্য্যশিক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য্যচরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্য্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্ম্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্ম্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য্যশিক্ষা ও নীতিহারা। আমরা আর্য্যজাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধর্ম্মরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবলপদদলিত ও দুঃখ-পরম্পরা-প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। জাতিরক্ষার উপায় আর্য্যচরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, বিশেষতঃ যুবকসম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ ও আর্য্যভাব-উদ্দীপক কর্ম্মপ্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কার্য্যে কৃতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মপ্রচার ঊষর ক্ষেত্রে বীজবপন মাত্র।

জাতিধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যুগধর্ম্মসেবা সহজসাধ্য হইবে। এই যুগ শক্তি ও প্রেমের যুগ। যখন কলির আরম্ভ হয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির অধীন ও সাহায্যকারী হইয়া

স্ব স্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সত্য ও শক্তি প্রেমকে আশ্রয় করিয়া মানবজাতির মধ্যে প্রেমবিকাশ করিতে সচেষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মৈত্রী ও দয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেমশিক্ষা, মুসলমান ধর্ম্মের সাম্য ও ভ্রাতৃভাব, পৌরাণিক ধর্ম্মের ভক্তি ও প্রেমভাব এই চেষ্টার ফলস্বরূপ। কলিযুগে সনাতন ধর্ম্ম মৈত্রী, কর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের সাহায্য লইয়া মানব-কল্যাণ সাধিত করে। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম গঠিত আর্য্যধর্ম্মে এই শক্তিসকল প্রবিষ্ট ও বিকশিত হইয়া বিস্তার ও স্বপ্রবৃত্তিপূরণের পথ খুঁজিতেছে। শক্তিস্ফুরণের লক্ষণ কঠিন তপস্যা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহৎ কর্ম্ম। যখন এই জাতি তপস্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মহৎ কর্ম্মপ্রয়াসী হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, জগতের উন্নতির দিন আরব্ধ হইয়াছে, ধর্ম্মবিরোধিনী আসুরিক শক্তির সঙ্কোচ ও দেবশক্তির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। অতএব এইরূপ শিক্ষাও বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়।

যুগধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম সাধিত হইলে জগৎময় সনাতন ধর্ম্ম অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বকাল হইতে যাহা বিধাতা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উক্তি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাও কার্য্যে অনুভূত হইবে। সমস্ত জগৎ আর্য্যদেশসম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া ভারতভূমিকে তীর্থ মানিয়া অবনত মস্তকে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে। সেইদিন আনয়নের জন্য ভারতবাসীর জাগরণ, আর্য্য ভাবের নবোত্থান।

মায়া

আমাদের পুরাতন দার্শনিকগণ যখন জগতের মূলতত্ত্বগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা এই প্রপঞ্চের মূলে একটী অনশ্বর ব্যাপক বস্তুর অস্তিত্ব অবগত হইলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুকালের অনুসন্ধানে বাহ্য-জগতেও এই অনশ্বর সর্ব্বব্যাপী একত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তাঁহারা আকাশকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতের পুরাতন দার্শনিকগণও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আকাশই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূল তাহা হইতে আর সকল ভৌতিক অবস্থা প্রাকৃতিক পরিণাম দ্বারা উদ্ভূত হয়। তবে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা যোগবলে সূক্ষ্মজগতে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, স্থূল ভৌতিক প্রপঞ্চের পশ্চাতে একটী সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ আছে, এই প্রপঞ্চের মূল ভৌতিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম আকাশ। এই আকাশও শেষ বস্তু নহে, তাঁহারা শেষ বস্তুকে প্রধান বলিতেন। প্রকৃতি বা জগন্ময়ী ক্রিয়াশক্তি তাঁহার সর্ব্বব্যাপী স্পন্দনে এই প্রধান সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে কোটী কোটী অণু উৎপাদন করেন এবং এই অণু দ্বারা সূক্ষ্মভূত গঠিত হয়। প্রকৃতি বা ক্রিয়াশক্তি আপনার জন্য কিছুই করেন না; যাঁহার শক্তি, তাঁহারই তুষ্টিসম্পাদনার্থ এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি ও নানাবিধ গতি। আত্মা বা পুরুষ এই প্রকৃতির ক্রীড়ায় অধ্যক্ষ ও সাক্ষী। পুরুষ ও প্রকৃতি যাহার স্বরূপ ও ক্রিয়া, সেই অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্ম জগতের অনশ্বর অদ্বিতীয় মূল সত্য। মুখ্য মুখ্য উপনিষদে আর্য্য ঋষিগণের তত্ত্ব-অনুসন্ধানে যে সত্যগুলির আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহাদের কেন্দ্রস্বরূপ এই ব্রহ্মবাদ ও পুরুষ-প্রকৃতিবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে। তত্ত্বদর্শিগণ এই মূল সত্যগুলি লইয়া নানা তর্ক ও বাদবিবাদে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী সৃষ্টি করিলেন। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা বেদান্ত দর্শনের প্রবর্ত্তক; যাঁহারা প্রকৃতিবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা সাঙ্খ্যদর্শন প্রচার করিলেন। তাহা ভিন্ন অনেকে পরমাণুকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বতন্ত্র পথের পথিক হইলেন। এইরূপ নানা পন্থা আবিষ্কৃত হইবার পর, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই সকল চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্যাসদেবের মুখে উপনিষদের সত্যগুলি পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিলেন। পুরাণকর্ত্তাগণও ব্যাসদেবের রচিত পুরাণকে আধার করিয়া সেই সত্যগুলির নানা ব্যাখ্যা — উপন্যাস ও রূপকচ্ছলে সাধারণ লোকের নিকট উপস্থিত করিলেন। ইহাতে বিদ্বানমণ্ডলীর বাদবিবাদ বন্ধ হইল

না, তাঁহারা স্ব স্ব মত প্রকাশপূর্ব্বক বিশদরূপে দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সিদ্ধান্তসকল তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের ষড়্দর্শনের আধুনিক স্বরূপ এই পরবর্ত্তী চিন্তার ফল। শেষে শঙ্করাচার্য্য দেশময় বেদান্ত প্রচারের অপূর্ব্ব ও স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদান্তের আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন। তাহার পরে আর পাঁচটী দর্শন অল্পসংখ্যক বিদ্বানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহাদের আধিপত্য ও প্রভাব চিন্তা-জগৎ হইতে প্রায় তিরোহিত হইল। সর্ব্বজনসম্মত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে মতভেদ উৎপন্ন হইয়া তিনটী মুখ্য শাখা ও অনেক গৌণ শাখা স্থাপিত হইল। জ্ঞানপ্রধান অদ্বৈতবাদ এবং ভক্তিপ্রধান বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিরোধ এখনও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমান। জ্ঞানমার্গী, ভক্তের উদ্দাম প্রেম ও ভাবপ্রবণতাকে উন্মাদলক্ষণ বলিয়া উড়াইয়া দেন; ভক্ত, জ্ঞানমার্গীর তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহাকে শুষ্ক তর্ক বলিয়া উপেক্ষা করেন। উভয় মতই ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ। ভক্তিশূন্য তত্ত্বজ্ঞানে অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া মুক্তিপথ অবরুদ্ধ থাকে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রমসঙ্কুল তামসিকতা উৎপাদন করে। প্রকৃত উপনিষদ-দর্শিত ধর্ম্মপথে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য ও পরস্পর সহায়তা রক্ষিত হইয়াছে।

যদি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজনসম্মত আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত আর্য্যজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্র চিরকাল একপক্ষ-প্রকাশক ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত জগৎ এক সঙ্কীর্ণ মতের অনুযায়ী তর্ক দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে গেলে সত্যের একদিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু অপরদিকের অপলাপ হয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মায়াবাদ এইরূপ অপলাপের দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র যে জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রাবল্যপ্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, সংসারে জাতবিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক অজ্ঞ অপ্রবৃত্তি-মুগ্ধ অকর্ম্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন সর্ব্বচেষ্টা নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন অনেক প্রবল ও উপযোগী বৃত্তি ক্রীড়া করিতেছে, সেই সকলের উপেক্ষায় কোনও জাতি টিকিতে পারে না। এই অনর্থের ভয়ে শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক ও ব্যবহারিক বলিয়া জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ দেখাইয়া

অধিকারভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি সেই যুগের ক্রিয়াসঙ্কুল কর্ম্মমার্গের তীব্র প্রতিবাদ করায় বিপরীত ফল ফলিয়াছে। শঙ্করের প্রভাবে সেই কর্ম্মমার্গ লুপ্তপ্রায় হইল, বৈদিক ক্রিয়াসকল তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে জগৎ মায়াসৃষ্ট, কর্ম্ম অজ্ঞানপ্রসূত ও মুক্তির বিরোধী, অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের কারণ ইত্যাদি তমঃ-প্রবর্ত্তক মত এমন দৃঢ়রূপে বসিয়া গেল যে, রজঃশক্তির পুনঃপ্রকাশ অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির রক্ষার্থ ভগবান পুরাণ ও তন্ত্রপ্রচারে মায়াবাদের প্রতিরোধ করিলেন। পুরাণে উপনিষদপ্রসূত আর্য্যধর্ম্মের নানাদিক কতকটা রক্ষিত হইল, তন্ত্র শক্তি-উপাসনায় মুক্তি ও ভক্তি রূপ দ্বিবিধ-ফল-প্রাপ্ত্যর্থ লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন। প্রায়ই যাঁহারা জাতিরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায় প্রভৃতি প্রায় সকলেই শক্তি-উপাসক বা তান্ত্রিক যোগীর শিষ্য ছিলেন। তমঃপ্রসূত অনর্থের নিষেধ করিবার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসন্ন্যাসের বিরোধী উপদেশ দিয়াছেন।

মায়াবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর পরম মায়াবী, তাঁহার মায়া দ্বারা দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। একই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম জগতের মূল সত্য, সমস্ত প্রপঞ্চ তাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র, স্বয়ং পরিণামশীল ও নশ্বর। যদি ব্রহ্ম একই সনাতন সত্য হয়, ভেদ ও বহুত্ব কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন, এই প্রশ্ন অনিবার্য্য। ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে ব্রহ্ম হইতেই ভেদ ও বহুত্ব প্রসূত, ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মের কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা উৎপন্ন, ইহাই উপনিষদের উত্তর। সেই শক্তিকে কোথাও মায়াবীর মায়া, কোথাও পুরুষ-অধিষ্ঠিত প্রকৃতি, কোথাও ঈশ্বরের বিদ্যা-অবিদ্যাময়ী ইচ্ছাশক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে তার্কিকের মন সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই; কিরূপে এক বহু হয়, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় নাই। শেষে একটী সহজ উত্তর মনে উদয় হইল, এক বহু হয় না, সনাতন অভেদে ভেদ উৎপন্ন হইতে পারে না, বহু মিথ্যা, ভেদ অলীক, সনাতন অদ্বিতীয় আত্মার মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ভাসমান মায়া মাত্র, আত্মাই সত্য, আত্মাই সনাতন। ইহাতেও গোল, মায়া আবার কি, মায়া কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন হয়? শঙ্কর উত্তর করিলেন, মায়া কি তাহা বলা যায় না, মায়া অনির্ব্বচনীয়, মায়া প্রসূত হয় না, মায়া চিরকাল আছে অথচ নাই। গোল মিটিল না, সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। এই

তর্কে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে আর-একটী সনাতন অনির্ব্বচনীয় বস্তু প্রতিষ্ঠিত হইল, একত্ব রক্ষিত হইল না।

শঙ্করের যুক্তি হইতে উপনিষদের যুক্তি উৎকৃষ্ট। ভগবানের প্রকৃতি জগতের মূল, সেই প্রকৃতি শক্তি, সচ্চিদানন্দের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। আত্মার পক্ষে ভগবান পরমাত্মা, জগতের পক্ষে পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তিময়ী; সেই ইচ্ছার দ্বারাই এক হইতে বহু, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়। পরমার্থের হিসাবে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, পরামায়াপ্রসূত, কারণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। দেশকালের মধ্যেই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব, ব্রহ্মের দেশকালাতীত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মের মধ্যে প্রপঞ্চযুক্ত দেশকাল; ব্রহ্ম দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রসূত, ব্রহ্মের মধ্যে বর্ত্তমান, সনাতন অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মে আদ্যন্তবিশিষ্ট জগতের প্রতিষ্ঠা, তত্র ব্রহ্মের বিদ্যা-অবিদ্যাময়ী শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। যেমন মানুষের মধ্যে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি ব্যতীত কল্পনা দ্বারা অলীক বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি বিদ্যমান, তেমনি ব্রহ্মের মধ্যেও বিদ্যা ও অবিদ্যা, সত্য ও অনৃত আছে। তবে অনৃত দেশকালের সৃষ্টি। যেমন মানুষের কল্পনা দেশকালের গতিতে সত্যে পরিণত হয়, তেমনই যাহাকে আমরা অনৃত বলি, তাহা সর্ব্বথা অনৃত নহে, সত্যের অননুভূত দিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বং সত্যং; দেশকালাতীত অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু আমরা দেশকালাতীত নহি, আমরা জগৎ মিথ্যা বলিবার অধিকারী নহি। দেশকালের মধ্যে জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ সত্য। যখন দেশকালাতীত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইবার সময় আসিবে ও শক্তি উৎপন্ন হইবে, তখন আমরা জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিব, অনধিকারী বলিলে মিথ্যাচার ও ধর্ম্মের বিপরীত গতি হয়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলা অপেক্ষা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ব্রহ্ম বলা উচিত। ইহাই উপনিষদের উপদেশ, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই সত্যের উপর আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।

অহঙ্কার

আমাদের ভাষায় অহঙ্কার শব্দটীর এমন বিকৃত অর্থ হইয়া গিয়াছে যে, আর্য্যধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্ব বুঝাইতে অনেক সময় গোল হইয়া পড়ে। গর্ব্ব রাজসিক অহঙ্কারের একটা বিশেষ পরিণাম মাত্র, অথচ সাধারণতঃ অহঙ্কার শব্দের এই অর্থই বোঝা যায় যে, অহঙ্কার ত্যাগের কথা বলিতে গর্ব্ব পরিত্যাগ বা রাজসিক অহঙ্কার বর্জ্জনের কথা মনে উঠে। প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞান মাত্রই অহঙ্কার। অহংবুদ্ধি মানবের বিজ্ঞানময় আত্মার মধ্যে সৃষ্ট হয় এবং প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি গুণের ক্রীড়ায় তাহার তিন প্রকার বৃত্তি বিকশিত হয়, সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার জ্ঞানপ্রধান ও সুখপ্রধান। আমার জ্ঞান হইতেছে, আমার আনন্দ হইতেছে, এই ভাবগুলি সাত্ত্বিক অহঙ্কারের ক্রিয়া। সাধকের অহং, ভক্তের অহং, জ্ঞানীর অহং, নিষ্কাম কর্ম্মীর অহং সত্ত্বপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান, সুখপ্রধান। রাজসিক অহঙ্কার কর্ম্মপ্রধান। আমি কর্ম্ম করিতেছি, আমি জয় করিতেছি, পরাজিত হইতেছি, চেষ্টা করিতেছি, আমারই কার্য্যসিদ্ধি, আমারই অসিদ্ধি, আমি বলবান, আমি সিদ্ধ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এই সকল ভাব রজঃপ্রধান, কর্ম্মপ্রধান, প্রবৃত্তিজনক। তামসিক অহঙ্কার অজ্ঞতা ও নিশ্চেষ্টতায় পূর্ণ। আমি অধম, আমি নিরুপায়, আমি অলস, অক্ষম, হীন, আমার কোনও আশা নাই, প্রকৃতিতে লীন হইতেছি, লীন হওয়াই আমার গতি, এই সকল ভাব তমঃপ্রধান অপ্রবৃত্তি ও অপ্রকাশজনক। যাঁহারা তামসিক অহঙ্কারে ক্লিষ্ট, তাঁহাদের গর্ব্ব নাই, অথচ অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় আছে, কিন্তু সেই অহঙ্কার অধোগতি, নাশ ও শূন্যব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু। যেমন গর্ব্বের অহঙ্কার আছে তেমনই নম্রতার অহঙ্কারও আছে, যেমন বলের অহঙ্কার আছে, তেমনই দুর্ব্বলতার অহঙ্কারও আছে। যাঁহারা তামসিকভাবে গর্ব্বহীন, তাঁহারা অধম, দুর্ব্বল, ভয়ে ও নিরাশায় পরপদানত। তামসিক নম্রতা, তামসিক ক্ষমা, তামসিক সহিষ্ণুতার কোনও মূল্য নাই ও কোনও সুফল নাই। যিনি সর্ব্বত্র নারায়ণকে দর্শন করিয়া সকলের নিকট নম্র, সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান্ হন, তাঁহারই পুণ্য হয়। যিনি এই সকল অহঙ্কৃত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াকে অতিক্রম করেন, তাঁহার গর্ব্বও নাই, নম্রতাও নাই, ভগবানের জগন্ময়ী শক্তি তাঁহার মনপ্রাণরূপ আধারে যে ভাব দেন, তিনি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট, অনাসক্ত ও অটল শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তামসিক অহঙ্কার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

রাজসিক অহঙ্কারকে জাগাইয়া সত্ত্ব-প্রসূত জ্ঞানের সাহায্যে তাহা নির্ম্মূল করা উন্নতির প্রথম সোপান। রাজসিক অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিকাশ। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি বলেন না যে, আমি সুখী; তিনি বলেন, আমার প্রাণে সুখবিকাশ হইতেছে, তিনি বলেন না যে, আমি জ্ঞানী; তিনি বলেন, আমার মধ্যে জ্ঞানসঞ্চার হইতেছে। তিনি জানেন যে, সেই সুখ ও জ্ঞান তাঁহার নহে, জগন্মাতার। অথচ সর্ব্বপ্রকার অনুভবের সহিত যখন আনন্দসম্ভোগের জন্য লিপ্ততা থাকে তখন সেই জ্ঞানী বা ভক্তের ভাব অহঙ্কৃত। "আমার হইতেছে", যখন বলা হয় তখন অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করা হইল না। গুণাতীত ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অহঙ্কারজয়ী। তিনি জানেন, জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, পুরুষোত্তম অনুমন্তা, প্রকৃতি কর্ত্তা, ইহার মধ্যে "আমি" নাই, সবই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের বিদ্যা-বিদ্যাময়ী শক্তির লীলা। অহংজ্ঞান জীব-অধিষ্ঠিত প্রকৃতির মধ্যে একটী মায়াপ্রসূত ভাবমাত্র। এই অহংজ্ঞানরহিত ভাবের শেষ অবস্থা সচ্চিদানন্দে লয়। কিন্তু যিনি গুণাতীত হইয়াও পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় লীলা-মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি পুরুষোত্তম ও জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আপনাকে প্রকৃতিবিশিষ্ট ভগবদংশ বুঝিয়া লীলার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ভাবকে অহঙ্কার বলা যায় না। এই ভাব পরমেশ্বরেরও আছে, তাঁহার মধ্যে অজ্ঞান ও লিপ্ততা নাই, কিন্তু আনন্দময় অবস্থা স্বস্থ না হইয়া জগন্মুখী হয়। যাঁহার এই ভাব, তিনিই জীবন্মুক্ত। লয়-রূপ মুক্তি দেহপাতে লাভ করা যায়। জীবন্মুক্তদশা দেহেই অনুভূত হয়।

নিবৃত্তি

আমাদের দেশে ধৰ্ম্মের কখনও সঙ্কীর্ণ ও জীবনের মহৎ কর্ম্মের বিরোধী ব্যাখ্যা মনীষিগণের মধ্যে গৃহীত হইত না। সমস্ত জীবনই ধৰ্ম্মক্ষেত্র, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষার মূলে এই মহৎ ও গভীর তত্ত্ব নিহিত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্শে কলুষিত হইয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিকৃত ও অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছে। আমরা প্রায়ই এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হই যে, সন্ন্যাস, ভক্তি, ও সাত্ত্বিক ভাব ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ এই সঙ্কীর্ণ ধারণা লইয়া ধৰ্ম্মালোচনা করেন। হিন্দুরা ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম এই দুই ভাগে জীবনের যত কাৰ্য্য বিভক্ত করিতেন; পাশ্চাত্য জগতে ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মাধর্ম্মের বহির্ভূত জীবনের অধিকাংশ ক্রিয়া ও বৃত্তির অনুশীলন, এই তিন ভাগ করা হইয়াছে। ভগবানের প্রশংসা, প্রার্থনা, সংকীৰ্ত্তন, গির্জ্জায় পাদ্রীর বক্তৃতা শ্রবণ ইত্যাদি কৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম বা religion বলে, morality বা সৎকাৰ্য্য ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, তাহা স্বতন্ত্র, তবে অনেকেই religion ও morality দুইটাই ধর্ম্মের গৌণ অঙ্গ বলিয়া স্বীকারও করেন। গির্জ্জায় না যাওয়া, নাস্তিকবাদ বা সংশয়বাদ এবং religionএর নিন্দা বা তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্যকে অধৰ্ম্ম (irreligion) বলে, কুকাৰ্য্যকে immorality বলে, পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে তাহাও অধর্ম্মের অঙ্গ। কিন্তু অধিকাংশ কৰ্ম্ম ও বৃত্তি ধৰ্ম্মাধর্ম্মের বহির্ভূত। Religion ও life, ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম স্বতন্ত্র। আমাদের মধ্যে অনেকে ধৰ্ম্ম শব্দের এইরূপ বিকৃত অর্থ করেন। সাধুসন্ন্যাসীর কথা, ভগবানের কথা, দেবদেবীর কথা, সংসারবর্জ্জনের কথাকে তাঁহারা ধৰ্ম্ম নামে অভিহিত করেন; কিন্তু আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাঁহারা বলেন, ইহা সংসারের কথা, ধর্ম্মের কথা নহে। তাঁহাদের মনে পাশ্চাত্য religionএর ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ধৰ্ম্ম শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র religionএর কথা মনে উদয় হয়, নিজের অজ্ঞাতসারেও সেই অর্থে ধৰ্ম্ম শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের স্বদেশী কথায় এইরূপ বিদেশী ভাব প্রবেশ করাইলে আমরা উদার ও সনাতন আৰ্য্যভাব ও শিক্ষা হইতে ভ্রষ্ট হই। সমস্ত জীবন ধৰ্ম্মক্ষেত্র, সংসারও ধৰ্ম্ম, কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোচনা ও ভক্তির ভাব ধৰ্ম্ম নহে, কৰ্ম্মও ধৰ্ম্ম। আমাদের সমস্ত সাহিত্য ব্যাপ্ত করিয়া এই মহতী শিক্ষা সনাতনভাবে রহিয়াছে — এষ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ।

অনেকের ধারণা যে কৰ্ম্ম ধর্ম্মের অঙ্গ বটে, কিন্তু সর্ব্ববিধ কৰ্ম্ম নহে; কেবল

যেগুলি সাত্বিকভাবাপন্ন, নিবৃত্তির অনুকূল, সেইগুলি এই নামের যোগ্য। ইহাও ভ্রান্ত ধারণা। যেমন সাত্বিক-কর্ম্ম ধর্ম্ম, তেমনই রাজসিক-কর্ম্মও ধর্ম্ম। যেমন জীবের উপর দয়া করা ধর্ম্ম, তেমনই ধর্ম্মযুদ্ধে দেশের শত্রুকে হনন করাও ধর্ম্ম। যেমন পরোপকারার্থে নিজের সুখ, ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেওয়া ধর্ম্ম, তেমনই ধর্ম্মের সাধন শরীরকে উচিতভাবে রক্ষা করাও ধর্ম্ম। রাজনীতিও ধর্ম্ম, কাব্যরচনাও ধর্ম্ম, চিত্রলিখনও ধর্ম্ম, মধুর গানে পরের মনোরঞ্জন সম্পাদনও ধর্ম্ম। যাহার মধ্যে স্বার্থ নাই, তাহাই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্ম বড় হউক, ছোট হউক। ছোট বড় আমরা হিসাব করিয়া দেখি, ভগবানের নিকট ছোট বড় নাই, কোন্ ভাবে মানুষ নিজ স্বভাবোচিত বা অদৃষ্টদত্ত কর্ম্ম আচরণ করে, তিনি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। উচ্চ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই, যে-কর্ম্মই করি, তাহা তাঁহারই চরণে অর্পণ করা, যজ্ঞ বলিয়া করা, তাঁহার প্রকৃতিদ্বারা কৃত বলিয়া সমভাবে স্বীকার করা।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

অর্থাৎ যাহা দেখি, যাহা করি, যাহা ভাবি, সবই তাঁহার মধ্যে দেখা, তাঁহার চিন্তায় যেন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইল শ্রেষ্ঠ পথ, সেই আবরণকে পাপ ও অধর্ম্ম ভেদ করিতে অসমর্থ। মনের মধ্যে সকল কর্ম্মে বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কিছু না কামনা করিয়া কর্ম্মের স্রোতে যাহা পাই, তাহা ভোগ করিব, সকল কর্ম্ম করিব, দেহ রক্ষা করিব, ইহাই ভগবানের প্রিয় আচরণ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত নিবৃত্তি। বুদ্ধিই নিবৃত্তির স্থান, প্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে প্রবৃত্তির ক্ষেত্র। বুদ্ধি প্রবৃত্তি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় বলিয়া যত গোল। বুদ্ধি নির্লিপ্তভাবে সাক্ষী ও ভগবানের prophet বা spokesman হইয়া থাকিবে, নিষ্কাম হইয়া তাঁহার অনুমোদিত প্রেরণা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে জ্ঞাপন করিয়া দিবে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় তদনুসারে স্ব স্ব কর্ম্ম করিবে। কর্ম্ম ত্যাগ অতি ক্ষুদ্র, কামনার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ। শরীরের নিবৃত্তি নিবৃত্তি নহে, বুদ্ধির নির্লিপ্ততাই প্রকৃত নিবৃত্তি।

প্রাকাম্য

১

লোকে যখন অষ্টসিদ্ধির কথা বলে, তখন অলৌকিক যোগপ্রাপ্ত কয়েকটী অপূৰ্ব্ব শক্তির কথা ভাবে। অবশ্য অষ্টসিদ্ধির পূর্ণবিকাশ যোগীরই হয়, কিন্তু এই শক্তিসকল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বর্হিভূত নহে, বরং আমরা যাহাকে প্রকৃতির নিয়ম বলি, তাহা অষ্টসিদ্ধির সমাবেশ।

অষ্টসিদ্ধির নাম মহিমা, লঘিমা, অণিমা, প্রাকাম্য, ব্যাপ্তি, ঐশ্বৰ্য্য, বশিতা, ঈশিতা। এইগুলিই পরমেশ্বরের অষ্ট স্বভাবসিদ্ধ শক্তি বলিয়া পরিচিত। প্রাকাম্য ধর, — প্রাকাম্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ ক্রিয়া। বাস্তবিক, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের সকল ক্রিয়া প্রাকাম্যের অন্তর্গত। প্রাকাম্যের বলে চক্ষুতে দেখে, কাণে শোনে, নাকে আঘ্রাণ লয়, ত্বকে স্পর্শ অনুভব করে, রসনায় রসাস্বাদন করে, মনে বাহ্যস্পর্শসকল আদায় করে। সাধারণ লোকে ভাবে, স্থূল ইন্দ্রিয়েই জ্ঞানধারণের শক্তি; তত্ত্ববিদ্ জানে চোখ দেখে না, মন দেখে, কাণ শোনে না, মন শোনে, নাক আঘ্রাণ করে না, মন আঘ্রাণ করে। যাঁহারা আরও তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা জানেন মনও দেখে না, শোনে না, আঘ্রাণ করে না, জীব দেখে, শোনে, আঘ্রাণ করে। জীবই জ্ঞাতা। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অংশ। ভগবানের অষ্টসিদ্ধি জীবেরও অষ্টসিদ্ধি।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥

আমার সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়া মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় প্রকৃতির মধ্যে পাইয়া আকর্ষণ করে (নিজ উপযোগে লাগায় ও ভোগের জন্য আয়ত্ত করে)। যখন জীবরূপে ঈশ্বর শরীরলাভ করেন বা শরীর হইতে নির্গমন করেন,

তখন যেমন বায়ু গন্ধকে ফুল ইত্যাদি হইতে লইয়া যায়, তেমনই শরীর হইতে ইন্দ্রিয়সকল লইয়া যান। শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শ, আস্বাদ, ঘ্রাণ ও মন অধিষ্ঠান করিয়া এই ঈশ্বর বিষয় ভোগ করেন। দৃষ্টি, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, মনন এইগুলিই প্রাকাম্যের ক্রিয়া। ভগবানের সনাতন অংশ জীব এই প্রকৃতির ক্রিয়া লইয়া প্রকৃতির বিকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সূক্ষ্মশরীরে বিকাশ করেন, স্থূলশরীর লাভ করিবার সময় এই ষড়িন্দ্রিয় লইয়া প্রবেশ করেন, মৃত্যুকালে এই ষড়িন্দ্রিয় লইয়া নির্গমন করেন। সূক্ষ্মদেহেই হউক, স্থূলদেহেই হউক, তিনি এই ষড়িন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়সকল ভোগ করেন।

কারণদেহে সম্পূর্ণ প্রাকাম্য থাকে, সেই শক্তি সূক্ষ্মদেহে বিকাশলাভ করে, পরে স্থূলদেহে বিকশিত হয়। কিন্তু প্রথম হইতে স্থূলে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, জগতের ক্রমবিকাশে ইন্দ্রিয়সকল ক্রমে বিকশিত হয়, শেষে কয়েকটী পশুর মধ্যে মানুষের উপযোগী বিকাশ ও প্রাখর্য্য লাভ করে। মানুষের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় অল্প নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কারণ আমরা মন ও বুদ্ধির বিকাশে অধিক শক্তি প্রয়োগ করি। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রাকাম্য বিকাশের শেষ অবস্থা নয়। যোগ দ্বারা সূক্ষ্মদেহে যত প্রাকাম্য বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্থূলদেহেও প্রকাশ পায়। ইহাকেই যোগপ্রাপ্ত প্রাকাম্য সিদ্ধি বলে।

২

পরমেশ্বর অনন্ত ও অপরাহত-পরাক্রম, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তিরও ক্ষেত্র অনন্ত ও ক্রিয়া অপরাহত। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অংশ, সূক্ষ্মদেহে ও স্থূলদেহে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐশ্বরিক শক্তি বিকাশ করিতেছেন। স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয়সকল বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ, মানুষ যতদিন স্থূলদেহের শক্তিদ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততদিন বুদ্ধিবিকাশেই সে পশুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নচেৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাখর্য্যে এবং মনের অভ্রান্ত ক্রিয়াতে — এক কথায়, প্রাকাম্য সিদ্ধিতে — পশুই উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যাহাকে instinct বলে, তাহা এই প্রাকাম্য। পশুর মধ্যে বুদ্ধির অত্যল্প বিকাশ হইয়াছে, অথচ এই জগতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন বৃত্তির দরকার যে পথপ্রদর্শক হইয়া সর্ব্বকার্য্যে কি অনুষ্ঠেয়, কি বর্জ্জনীয়, তাহা দেখাইয়া দিবে। পশুর মনই এই কার্য্য করে। মানুষের মন কিছু নির্ণয় করে না, বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মক, বুদ্ধিই নির্ণয় করে, মন কেবল সংস্কারসৃষ্টির

যন্ত্র। আমরা যাহা দেখি, শুনি, বোধ করি, তাহা মনে সংস্কাররূপে পরিণত হয়, বুদ্ধি সেই সংস্কারগুলি গ্রহণ করে, প্রত্যাখ্যান করে, চিন্তা সৃষ্টি করে। পশুর বুদ্ধি এই নির্ণয়কর্ম্মে অপারগ; বুদ্ধি দ্বারা নহে, মন দ্বারা পশু বুঝে, চিন্তা করে। মনের এক অদ্ভুত শক্তি আছে, অন্য মনে যাহা হইতেছে, তাহা এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারে, বিচার না করিয়া যাহা প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া লয় এবং কর্ম্মের উপযুক্ত প্রণালী ঠিক করে। আমরা কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেখি নাই, অথচ জানি যেন কে ঘরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে; কোন ভয়ের কারণ নাই, অথচ আশঙ্কিত হইয়া থাকি, কোথা হইতে যেন গুপ্ত ভয়ের কারণ রহিয়াছে; বন্ধু এক কথাও বলে নাই, অথচ বলিবার পূর্ব্বেও কি বলিবে, তাহা বুঝিয়া লইলাম, ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়; সকলই মনের শক্তি, একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবাধ ক্রিয়া। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্ব কার্য্য করিতে আমরা এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে, এই ক্রিয়া, এই প্রাকাম্য আমাদের মধ্যে প্রায় লোপ পাইয়াছে। পশু এই প্রাকাম্যকে আশ্রয় না করিলে দুদিনে মরিয়া যাইবে। কি পথ্য, কি অপথ্য, কে মিত্র, কে শত্রু, কোথায় ভয়, কোথায় নিরাপদ, প্রাকাম্যই এই সকল জ্ঞান পশুকে দেয়। এই প্রাকাম্য দ্বারা কুকুর প্রভুর ভাষা না বুঝিয়াও তাহার কথার অর্থ বা মনের ভাব বুঝিতে পারে। এই প্রাকাম্য দ্বারা ঘোড়া যে পথে একবার গিয়াছে, সেই পথ চিনিয়া রাখে। এই সকল প্রাকাম্যক্রিয়া মনের। কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিতেও পশু মানুষকে হারাইয়া দেয়। কোন্ মানুষ কুক্কুরের ন্যায় শুধু গন্ধ অনুসরণ করিয়া একশত মাইল আর সকলের পথ ত্যাগ করিয়া একটী বিশিষ্ট জন্তুর পশ্চাৎ অভ্রান্তভাবে অনুসরণ করিতে সমর্থ? বা পশুর ন্যায় অন্ধকারে দেখিতে পায়? বা কেবল শ্রবণ দ্বারা গুপ্ত শব্দকারীকে বাহির করিতে পারে? Telepathy বা দূরের চিন্তাগ্রহণ সিদ্ধির কথা বলিয়া কোন এক ইংরাজী সংবাদ-পত্র বলিয়াছে, telepathy মনের প্রক্রিয়া, পশুর সেই সিদ্ধি আছে, মানুষের নাই, অতএব telepathyর বিকাশে মনুষ্যের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবে। স্থূলবুদ্ধি বৃটনের উপযুক্ত তর্ক বটে! অবশ্য মানুষ বুদ্ধিবিকাশের জন্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে, নচেৎ প্রয়োজনের অভাবে তাহার বুদ্ধিবিকাশ এত শীঘ্র হইত না। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ ও নিখুঁত বুদ্ধিবিকাশ হইয়াছে, তখন একাদশ ইন্দ্রিয়ের পুনর্ব্বিকাশ করা মানবজাতির কর্ত্তব্য। ইহাতে বুদ্ধির বিচার্য্য জ্ঞান বিস্তারিত হইবে, মনুষ্যও মন ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনুশীলনে অন্তর্নিহিত দেবত্বপ্রকাশের উপযুক্ত পাত্র হইবে। কোনও

শক্তিবিকাশ অবনতির কারণ হইতে পারে না — কেবল শক্তির অবৈধ প্রয়োগে, মিথ্যা ব্যবহারে, অসামঞ্জস্য দোষে অবনতি সম্ভব। অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে যাহাতে বোঝা যায় যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের পুনর্ব্বিকাশ, প্রাকাম্যের বৃদ্ধি আরম্ভ করিবার দিন আসিয়াছে।

স্তবস্তোত্র

সাধক, সাধন ও সাধ্য, এই তিন অঙ্গ লইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন সাধন আদিষ্ট হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যও অনুসৃত হয়। কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে নানা সাধ্য থাকিলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে সকল সাধকের সাধ্য এক — সেই সাধ্য আত্মতুষ্টি। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বুঝাইলেন যে, আত্মার জন্য সব, আত্মার জন্য স্ত্রী, আত্মার জন্য ধন, আত্মার জন্য প্রেম, আত্মার জন্য সুখ, আত্মার জন্য দুঃখ, আত্মার জন্য জীবন, আত্মার জন্য মরণ। সেইজন্য আত্মা কি এই প্রশ্নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

অনেক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন আত্মজ্ঞান লইয়া এত বৃথা মাথা ঘামান কেন? এই সব সূক্ষ্মবিচারে সময় নষ্ট করা বাতুলতা, সংসারের প্রয়োজনীয় বিষয় ও মানবজাতির কল্যাণচেষ্টা লইয়া থাক। কিন্তু সংসারের কি কি বিষয় প্রয়োজনীয় এবং মানবজাতির কল্যাণ কিসে হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসাও আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন আমার জ্ঞান তেমনই আমার সাধ্য। আমি যদি নিজ দেহকে আত্মা বুঝি, তাহার তুষ্টি সাধনার্থ আর সকল বিচার ও বিবেচনাকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বার্থপর নরপিশাচ হইয়া থাকিব। যদি স্ত্রীকেই আত্মবৎ দেখি, আত্মবৎ ভালবাসি, স্ত্রৈণ হইয়া ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া তাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব, পরকে কষ্ট দিয়া তাহারই সুখ করিব, পরের অনিষ্ট করিয়া তাহারই ইষ্ট সিদ্ধ করিব। যদি দেশকেই আত্মবৎ দেখি, আমি খুব বড় এক দেশহিতৈষী হইব, হয়তো ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইব, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরদেশের অনিষ্ট, ধনলুণ্ঠন, স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারি। যদি ভগবানকে আত্মা বুঝি অথবা আত্মবৎ ভালবাসি — সে একই কথা, কেননা প্রেম হইল চরম দৃষ্টি — আমি ভক্ত, যোগী, নিষ্কাম কর্ম্মী হইয়া সাধারণ মনুষ্যের অপ্রাপ্য শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দ ভোগ করিতে পারি। যদি নির্গুণ পরব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জানি, পরম শান্তি ও লয় প্রাপ্ত হইতে পারি। যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ, — যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইরূপই হয়। মানবজাতি চিরকাল সাধন করিয়া আসিতেছে, প্রথম ক্ষুদ্র, পরে অপেক্ষাকৃত বড়, শেষে সর্ব্বোচ্চ পরাৎপর সাধ্য সাধন করিয়া গন্তব্যস্থান শ্রীহরির পরমধাম প্রাপ্ত হইতে চলিতেছে। এক যুগ ছিল, মানবজাতি কেবল শরীর সাধন করিত,

শরীর সাধন সেই কালের যুগধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মকে খাট করিয়াও তখন শরীর সাধন করা শ্রেয়ঃ পথ ছিল। কারণ, তাহা না হইলে শরীর, যে শরীর ধর্ম্মসাধনের উপায় ও প্রতিষ্ঠা, উৎকর্ষ লাভ করিত না। সেইরূপ আর-এক যুগে স্ত্রী-পরিবার, আর-এক যুগে কুল, আর-এক যুগে — যেমন আধুনিক যুগে — জাতিই সাধ্য। সর্ব্বোচ্চ পরাৎপর সাধ্য পরমেশ্বর, ভগবান। ভগবানই সকলের প্রকৃত ও পরম আত্মা, অতএব প্রকৃত ও পরম সাধ্য। সেইজন্য গীতায় বলে, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, আমাকেই শরণ কর। ভগবানের মধ্যে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হয়, তাঁহাকে সাধন করিলে তিনিই আমাদের ভার লইয়া আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া স্ত্রী, পরিবার, কুল, জাতি, মানবসমষ্টির পরম তুষ্টি ও পরম কল্যাণ সাধন করিবেন।

এক সাধ্যের নানা সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় নানা সাধনও হয়। ভগবৎ-সাধনের এক প্রধান উপায় স্তবস্তোত্র। স্তবস্তোত্র সকলের উপযোগী সাধন নহে। জ্ঞানীর পক্ষে ধ্যান ও সমাধি, কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মসমর্পণ শ্রেষ্ঠ উপায়; স্তবস্তোত্র ভক্তির অঙ্গ — শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নহে বটে, কেননা অহৈতুক প্রেম ভক্তির চরম উৎকর্ষ, সেই প্রেম ভগবানের স্বরূপ স্তবস্তোত্র দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তাহার পরে স্তবস্তোত্রের প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করিয়া সেই স্বরূপ ভোগে লীন হইয়া যায়; তথাপি এমন ভক্ত নাই যে স্তবস্তোত্র না করিয়া থাকিতে পারে, যখন আর সাধনের আবশ্যকতা থাকে না, তখনও স্তবস্তোত্রে প্রাণের উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠে। কেবল স্মরণ করিতে হয় যে সাধন সাধ্য নহে, আমার যে সাধন, সে পরের সাধন না-ও হইতে পারে। অনেক ভক্তের এই ধারণা দেখা যায় যে, যিনি ভগবানের স্তবস্তোত্র করেন না, স্তোত্র শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন না, তিনি ধার্ম্মিক নহেন। ইহা ভ্রান্তি ও সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ। বুদ্ধ স্তবস্তোত্র করিতেন না, তথাপি কে বুদ্ধকে অধার্ম্মিক বলিবে? ভক্তিমার্গ সাধনের জন্য স্তবস্তোত্রের সৃষ্টি।

ভক্তও নানপ্রকার, স্তবস্তোত্রেরও নানা প্রয়োগ হয়। আর্ত্ত ভক্ত দুঃখের সময়ে ভগবানের নিকট কাঁদিবার জন্য, সাহায্য প্রার্থনার জন্য, উদ্ধারের আশায় স্তবস্তোত্র করেন, অর্থার্থী ভক্ত কোনও অর্থসিদ্ধির আশায়, ধন মান সুখ ঐশ্বর্য্য জয় কল্যাণ ভুক্তি মুক্তি ইত্যাদি উদ্দেশ্য সঙ্কল্প করিয়া স্তবস্তোত্র করেন। এই শ্রেণীর ভক্ত অনেকবার ভগবানকে প্রলোভন দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতে যান, এক-একজন অভীষ্টসিদ্ধি না পাইয়া পরমেশ্বরের উপর ভারি চটিয়া উঠেন, তাঁহাকে নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক ইত্যাদি গালাগালি দিয়া বলেন, আর ভগবানকে পূজা করিব না, মুখ দেখিব না, কিছুতেই মানিব না। অনেকে হতাশ হইয়া নাস্তিক হন, এই সিদ্ধান্ত

করেন যে, এই জগৎ দুঃখের রাজ্য, অন্যায় অত্যাচারের রাজ্য, ভগবান নাই। এই দুইপ্রকার ভক্তি, অজ্ঞ ভক্তি, তাই বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে, ক্ষুদ্র হইতেই মহতে উঠে। অবিদ্যা সাধন বিদ্যার প্রথম সোপান। বালকও অজ্ঞ, কিন্তু বালকের অজ্ঞতায় মাধুর্য্য আছে, বালকও মায়ের নিকট কাঁদিতে আসে, দুঃখের প্রতিকার চায়, নানারূপ সুখ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছুটিয়া আসে, সাধে, কান্নাকাটি করে, না পাইলে চটিয়াও উঠে, দৌরাত্ম্য করে। জগজ্জননীও হাস্যমুখে অজ্ঞভক্তের সকল আব্দার ও দৌরাত্ম্য সহ্য করেন।

জিজ্ঞাসু ভক্ত কোন অর্থসিদ্ধির জন্য বা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্তবস্তোত্র করেন না, তাঁহার পক্ষে স্তবস্তোত্র শুদ্ধ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির এবং স্বীয় ভাবপুষ্টির উপায়। জ্ঞানী ভক্তের পক্ষে সেই প্রয়োজনও থাকে না, কেননা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, তাঁহার ভাব সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য স্তবস্তোত্রের প্রয়োজন। গীতায় বলে, এই চারিশ্রেণীর ভক্ত সকলেই উদার, কেহ উপেক্ষণীয় নহে, সকলে ভগবানের প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানী ও ভগবান একাত্ম। ভগবান ভক্তের সাধ্য, অর্থাৎ আত্মরূপে জ্ঞাতব্য ও প্রাপ্য, জ্ঞানী ভক্তে ও ভগবানে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধ হয়, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম — এই তিন সূত্রে আত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরে আবদ্ধ। কর্ম্ম আছে, সেই কর্ম্ম ভগবদ্দত্ত, তাহার মধ্যে কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই, প্রার্থনীয় কিছুই নাই; প্রেম আছে, সেই প্রেম কলহ ও অভিমানশূন্য — নিঃস্বার্থ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল; জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান শুষ্ক ও ভাবরহিত নহে, গভীর, তীব্র আনন্দ ও প্রেমে পূর্ণ। সাধ্য এক হইলেও যেমন সাধক তেমনই সাধন, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন সাধকের এক সাধনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ।

আমাদের রাজনীতিক আদর্শ

নিরীহো নাশ্নুতে মহৎ

যে দেশেই হউক, বা যে জাতিরই হউক, জাতীয় অভ্যুত্থানের উদ্যোগ যখন আরম্ভ হয়, তখন তজ্জন্য একটী বৃহৎ ও উদার রাজনীতিক আদর্শ চাই। মহাত্মা রুসোর সাম্যনীতি প্রচার না হইলে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের আবেগময়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্দ্ধমৃত ফ্রান্সকে জাগাইয়া সমস্ত ইয়োরোপখণ্ডকে প্লাবিত করিতে পারিত না। মনুষ্যমাত্রের স্বভাবজাত স্বত্ব প্রাপ্তির জন্য আমেরিকা লালায়িত না হইলে মার্কিন যুক্তরাজ্য কখনও সৃষ্ট হইত না। ঋষিতুল্য ম্যাজিনি উচ্চ আশা ও উদার আদর্শ নব্য ইতালীর হৃদয়ে সঞ্চারিত না করিলে সেই পতিত জাতি কখনও চিরদাসত্বের বন্ধন কাটিতে পারিত না। অনুচ্চ ও সঙ্কীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ সাবধানতা ও ভীরুতা এবং অদূরদর্শী ও সাহসপরাঙ্মুখ নেতাদল, — এ সকল হেয় উপাদান কখনও জাতীয় শক্তি গড়িবার উপযুক্ত সামগ্রী হইতে পারে না। এরূপ ক্ষুদ্র উপাদান লইয়া কোনও জাতি কোনও কালে মহত্ত্বের উচ্চ সোপানে উঠে নাই। নিরীহো নাশ্নুতে মহৎ, — যাহার আশা ক্ষুদ্র, সে কখনও মহত্ত্ব ভোগ করে না, — মহাভারতের এই উক্তি রাজনীতিবিদদের সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত।

ছেলেমানুষী ও গোলামির অভ্যাস

আমরা শতাব্দীকাল ক্রমাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষণে পড়িয়া জাতীয় উন্নতি ও রাজনীতিক স্বত্বপ্রাপ্তির চর্চ্চা করিতেছি। কার্য্যে কিন্তু উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইয়াছে। রাজনীতিক স্বত্বপ্রাপ্তি দূরের কথা, আমাদের রাজনীতিক জীবন, বাণিজ্য, বিদ্যা, চিন্তাশক্তি ও ধর্ম্মভাব সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অন্নের জন্য, পরিধেয় বস্ত্রের জন্য, শিক্ষার জন্য, রাজনীতিক স্বত্বের জন্য এবং বুদ্ধিবিকাশ ও চিন্তাপ্রণালীর জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী। ইংরাজ আমাদিগকে কয়েকটী খেলনা দিয়াছে বলিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। যে জাতির মন ও শরীর উভয়ই পরাধীন, সে জাতির পক্ষে রেল, টেলিগ্রাফ, ইলেক্‌ট্রিসিটি,

ম্যুনিসিপালিটি, বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার, এবং পাশ্চাত্য রাজনীতিক জীবনের যত সামগ্রী, সবই খেলনা মাত্র। লর্ড রিপণ বা মিঃ মরলী আমাদিগকে যতই স্বত্ব দিন না কেন তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। সেগুলিও খেলনা বই আর কিছুই নহে; **যাহা স্বপ্রয়াসলব্ধ তাহাই স্বত্ব; পরের দান স্বত্ব নহে।** অতএব এই স্বত্বগুলি প্রকৃত স্বত্ব নহে, তাহাদের উপর আমাদের কোন স্থায়ী অধিকার নাই; আজ রিপণ দিল, কাল কার্জ্জন কাড়িয়া লইবে। আর আমরা 'হায়! আমাদের খেলনা গেল, কি ঘোর অন্যায়!' বলিয়া সহস্র সভাসমিতিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিব। ছেলেমানুষী আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক জীবনের একটী মুখ্য লক্ষণ। আর একটী লক্ষণ দাসত্বের অভ্যাস। আমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেও গোলাম, সিভিলিয়ান জজ, ম্যুনিসিপাল কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিক, ব্যবস্থাপক সভার সভাসদ, সকলেই শৃঙ্খল পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন। তবে আমরা এমন ক্ষুদ্রাশয় হইয়াছি যে, সেই শৃঙ্খল স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত বলিয়া গর্ব্ব করিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় না। গোলামি প্রগাঢ় কুয়াসার মত আমাদের সমস্ত জীবন ছাইয়া ফেলিয়াছে। সুখের কথা এই যে, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এখন চক্ষু খুলিয়া আমাদের হীনাবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। এই সর্ব্বব্যাপী পরাধীনতা আর সহ্য হয় না, যে উপায়েই হউক শিক্ষায়, বাণিজ্যে ও রাজনীতিক জীবনে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে, এই ভাব ক্রমে দেশময় সঞ্চারিত হইতেছে। ইহাই ভবিষ্যতের আশা। ইহাতে বুঝিলাম আমরা জাগিয়াছি, আর সেই ঘুম-পাড়ান গান শুনিব না, আর কোন প্রতিবন্ধক বা কাহারও নিষেধ মানিব না, আমরা উঠিবই উঠিব।

জাতীয় মহাসমিতির ক্ষুদ্রাশয়তা

শতাব্দীকালের চেষ্টায় এমন পরিণাম হইল কেন? জাপান ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবৃন্দের সমকক্ষ মহৎ জাতি হইতে পারিল, আমরা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম, এই বৈষম্যের কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আমাদের **রাজনীতিক আদর্শের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা**। যে জাতীয় মহাসমিতি আমাদের রাজনীতিক জীবনের চরম উৎকর্ষ বলিয়া গৃহীত, সে মহাসমিতির উদ্দেশ্য তলাইয়া বুঝিতে যাইলেও এই ক্ষুদ্রতারই পরিচয় পাই।

গোলামের জ্যাঠামি

জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য কি? অনেকে জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের নাম দিয়া এই কথা প্রচার করিতেছেন, "ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেশকে উত্তমরূপে শাসন করিতেছেন। তবে তাঁহারা বিদেশী বলিয়া ভারতবাসীর মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, সেইজন্য শাসনের অল্পস্বল্প দোষ আছে। আমরা প্রতি বৎসর ভারতবাসীর আবেদন তাঁহাদের নিকট জানাইয়া শাসনকার্য্যে সহায়তা করিব, তাহা হইলেই বৃটিশ শাসন নির্দ্দোষ হইবে।" রাজপুরুষগণ কিন্তু আমাদের এই অযাচিত সাহায্য দান গ্রহণ করেন না, বরং গোলামের ধৃষ্টতা ও অপক্কবুদ্ধির জ্যাঠামি বলিয়া অবমাননা করেন; কংগ্রেস প্রতি বৎসরে অনাহূতভাবে রাজপুরুষদিগের নিকট সাহায্য করিতে উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া ফিরিয়া আসে। তাহাতেও আমাদের ধৈর্য্য ভঙ্গ হয় না। আমরা বলি সম্প্রতি অনাহূত হইয়া যাই, হয়ত রাজপুরুষগণ একদিন দয়া করিয়া আমাদের সহায়তা স্বীকার করিবেন। যাহারা এইরূপ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লইয়া রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করে, তাহারা কি কখনও এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরার একটী সুমহৎ জাতি হইতে পারে?

চিরস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

কেহ কেহ আবার বলেন জাতীয় মহাসমিতি His Majesty's permanent opposition; যেমন বৃটিশ পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের শাসন সময়ে উদারনীতিক দল তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে থাকে, আমরাও এ দেশে বৃটিশ রাজপুরুষগণের সেইরূপ স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী। এইরূপ চিরস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আমাদের আদর্শ। ইংরাজ গুরুদিগের নিকট যে কয়েকটী বুলি শিখিয়াছি, সেই সকলের মধ্যে ইহাও একটী বুলিমাত্র; যেমন constitution নাই, তথাপি constitutional আন্দোলন করিতে যাই, তেমনই পার্লামেণ্ট নাই, তথাপি পার্লামেণ্টের নিরর্থক অনুকরণকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করি। স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থ নিষ্ফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বর্ত্তমান রাজপুরুষগণকে বহিষ্কৃত করিয়া স্বয়ং শাসন করা এবং বর্ত্তমান নীতির বদলে স্বকল্পিত নীতি প্রচলিত করা, ইহাই পার্লামেণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিতে জাতীয় মহাসমিতির শক্তিও নাই, সাধ্যও নাই; যে

কার্য্যে সফলতার আশা নাই, নিতান্ত উন্মত্ত না হইলে কেহ সজ্ঞান অবস্থায় সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব এই আদর্শ নিতান্ত অসার ও অসঙ্গত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ

আমাদের নেতাগণ এইরূপ অতিক্ষুদ্র ও অসার উদ্দেশ্য লইয়া যদি সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসমিতি একদিনও টিকিত না। কিন্তু মহাসমিতিতে অন্য ধরণের লোকও আছেন, তাঁহারা ইহার অপেক্ষা কিছু উচ্চেও উঠিতে পারেন। ইঁহাদের আদর্শ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ লইয়া গঠিত, যেমন সমকালীন পরীক্ষা, ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সভাসদের প্রবেশ, হোম চার্জ্জ কমাইবার জন্য অধিকাংশ উচ্চ বেতনের চাক্‌রী ভারতবাসীকে দান ইত্যাদি। আমরা বলি, মহাসমিতির সকল দাবীই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া কখনও কি এমন বিরাট রাজনীতিক আদর্শ গঠিত হইতে পারে, যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষকে মাতাইতে পারিবে? এইগুলি লইয়া কখনও কি এক মহৎ জাতীয় ভাব দেশময় সঞ্চারিত হইবে?

কৃষ্ণবর্ণ দাস ও বাগ্মিতায় বাহবা

ভারতবাসী সিভিলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে দেশের লাভ কি? দেশের ত্রিশ কোটী লোক ত গোলামই রহিয়া গেল। যাহারা সিভিলিয়ান হইবে, তাহারা স্বজাতির প্রভু হইলেও বিদেশীর গোলাম, রাজপুরুষদিগের আদেশ পাইলেই স্বজাতির অনিষ্ট করিতে বাধ্য। ভারতবাসীকে দাসত্বে ডুবাইয়া রাখিবার পুণ্যকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের কয়েকটী কৃষ্ণবর্ণ দাস জুটিবে বই ত নয়। কিম্বা যদি ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের নির্ব্বাচিত সভাসদ প্রবেশ করে, তাহাতেই বা কি সুফল হইল? বাগ্মিতা ও রাজনীতিক দক্ষতা দেখান এবং রাজপুরুষগণের ও লোকসাধারণের বাহবা পাওয়ার পক্ষে ব্যক্তিবিশেষের তাহাতে যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের একবিন্দুও উপকার হয় না; হইবেই বা কেন? এই সকল দাসত্বের কারখানায় আমরা বড় বড় মিস্ত্রি হইলে কারখানার প্রভুরা তাহাদের ব্যবসায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, এই অদ্ভুত যুক্তি রাজনীতিক অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

দরিদ্রতার প্রতিকার

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখার ফল এই হয় যে, ভুল পথ অনুসরণ করিতে যাইয়া দেশের প্রকৃত কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। ভারতের ভীষণ দারিদ্র্যের কথা ধর। হোম চার্জ্জ যদি কমান হয়, তাহা হইলে দারিদ্র্যের কতকটা লাঘব হইবে, একথা স্বীকার করি। কিন্তু দারিদ্র্যের অল্পমাত্রায় লাঘব করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্য মোচনই উদ্দেশ্য। সেই দারিদ্র্য মোচনের দুইটী উপায় আছে, কৃষি সম্বন্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ করা এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে সংরক্ষিত বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করা। এ অবস্থায় অনন্যচিন্ত্য হইয়া সেই দুইটী দাবীই সর্ব্বাগ্রে রাজপুরুষদিগের নিকট আদায় করিবার চেষ্টা কংগ্রেসের প্রথম কর্ত্তব্য ছিল। রাজপুরুষগণ কিন্তু কখনও সে দাবী শুনিবেন না। সুতরাং উপায়ান্তর স্বাবলম্বন। দেশময় বৃটিশ বাণিজ্যের বয়কট প্রচার কর, ভারতের কোটী কোটী কৃষিজীবীকে নিজেদের দুরবস্থার কারণ ও মুক্তির উপায় বুঝাইয়া দাও। দেখি রাজপুরুষগণ কত দিন একটী মহৎ জাতির দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু জাতীয় মহাসমিতি বয়কটের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠে, এমন কি স্বদেশী সম্বন্ধেও কোন প্রস্তাব করিতে চাহে না, পাছে ইংরাজের কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে।

উচ্চ আদর্শের মত্ততা

দাসত্বশৃঙ্খল অটুট রাখিয়া তাহাতে লৌহের ভাগ কমান এবং সোনা রূপার ভাগ বাড়ান, ইহাই মহাসমিতির আদর্শ। কয়েকজন শান্তি ও সুখপ্রিয় মধ্যবিত্ত লোক লইয়া যদি আমাদের রাজনীতিক জীবন গড়িলেই হইত, তাহা হইলে তজ্জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে এ ক্ষুদ্র ও নগণ্য আদর্শ অতিক্রম করা উচিত। এরূপ আদর্শের জন্য কে কবে স্বদেশানুরাগে মাতিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃত স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, কিম্বা সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা ও প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্যপথে মহাবেগে অগ্রসর হইয়াছে? পক্ষান্তরে দেখ, যখন তোমরা একবার জননীর চিত্তপ্রমোদিনী মূর্ত্তি দেখাইলে, তখন সে মুখ সন্দর্শনে, সে নামে আমরা সকলে মাতিয়া গেলাম, সহর্ষে স্বার্থত্যাগ করিয়া জাতীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, সহাস্যমুখে দলে দলে জেলে যাইতে লাগিলাম।

ইহাতেও নেতাদের জ্ঞান হইবে না কি? ইহাতেও তাঁহারা বুঝিবেন না কি কোন্ দিকে ভারতের নবজীবনের বালসূর্য্য গগনমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া উদয় হইতেছে?

সোনার শিকল কাট

স্বর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্খলের মোহ কাটিতে হইবে। ইংরাজের অনুকরণ ও ইংরাজের নেতৃত্ব বর্জ্জন করিয়া আমাদের জাতীয় স্বভাব ও দেশের অবস্থা বুঝিয়া অভীষ্ট-সিদ্ধির উপযুক্ত উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। আর নবোত্থিত ভারতবর্ষকে মহৎ আদর্শ দেখাইয়া নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। এই পথই মুক্তির পথ, অন্যথা বন্ধনই সার।

মিথ্যার পূজা

ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে দিয়া ফিরিঙ্গী সরকার ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা যুগান্তরের উত্থানশক্তি একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুগান্তর আবার বাহির হইল। মরিল না ত বটেই, অধিকন্তু আবার ভবিষ্যতে যে মরিবে তাহার আশা পর্য্যন্ত দিল না। ইহাতে সরকারের ত রাগ হইবারই কথা!

ইংলিশম্যান ও ডেলি নিউজ 'হা হুতাশ' করিয়া শেষে আশা দিল — "ভয় নাই; ছোটলাট আবার যুগান্তর সম্পাদককে জেলে দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।" ছোটলাট নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি যুগান্তরের কতগুলা সম্পাদক আছে একবার দেখিয়া লইবেন; সব কটাকে জেলে পাঠাইবেন।

যুগান্তরের আবার সম্পাদক কে? যুগান্তর ত জাতীয় ভাবসমষ্টি মাত্র। লোকের প্রাণের ভিতর দিয়া যে ভাবস্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণা মাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাক্কা লাগে। সম্পাদক ত তাহা অভিব্যক্তির যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রকে ধরিলে যন্ত্রী ত ধরা পড়ে না; যন্ত্রী যে অশরীরী। ঐ যে পালে পালে উন্মাদ বালকের দল "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, ঐ যাহারা নৃমুণ্ড মালিনীর খর্পর তলে আত্মবলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক — তাহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে; তাহারাই যুগান্তরের সম্পাদক। গর্ব্বস্ফীত অন্ধ! তাহাদের সংখ্যা জানিতে চাও! একদিন জানিবে। তাহাদের সকলকে কারাগারে পুরিতে পার এতবড় কারাগার ত আজও তোমরা গাঁথিয়া তুলিতে পার নাই।

আপনাকে আপনি যে গোলাম না সাজায়, তাহাকে গোলাম সাজাইতে পারে এতবড় বীর এ ত্রিভুবনে কেহ নাই। তুমি আমায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তোমার অধীনতা স্বীকার করাইবে; আমি যদি 'এ দুঃখ নয় মা দয়া তোমার' বলিয়া সহাস্য মুখে কারাগৃহে প্রবেশ করি — তবেই ত তোমার দমনের চেষ্টা ব্যর্থ! তুমি আমায় ফাঁসীকাঠে ঝুলাইবে? — আমি মরিবার সময়েও ক্ষমতা তুচ্ছ করিয়া মরিব। একদিকে মাতৃমন্ত্র অপরদিকে ইংরাজের পরাধীনতা স্বীকার করাইতে চাও! মোগল সম্রাট যখন একদিন তোমাদেরই মত মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া শিখগুরুকে ধর্ম্মত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তখন শিখগুরু হাসিতে হাসিতে আপনার মাথা দিয়াছিলেন; ধর্ম্ম দেন নাই। আমরাও তাহাই করিব। ভারতে আবার ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। মোগল সিংহাসন যেখানে ভাসিয়া গিয়াছিল, তোমার পলাশীতে কুড়ান সিংহাসন সেখানে ভাসিয়া যাইবে। আমরা রাখি বলিয়া তোমরা আছ,

বাঁচাই বলিয়া তোমরা বাঁচ। আমরা তোমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিই বলিয়াই তোমরা আমাদের অনশনক্লিষ্ট করিতে পার; আমরা নির্জ্জীব সাজিয়া থাকি বলিয়াই তোমরা আমাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সাহসী হও; আমরা তোমাদের মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই তোমরা সত্যই মাথার মণি; যেদিন নিষ্ঠীবনের মত তোমাদের ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিব — সেদিন তোমরা নিষ্ঠীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহ। আমরা ভ্রান্তির ঘোরে মিথ্যার পূজায় প্রবৃত্ত বলিয়াই মিথ্যা আজ সত্যের আসনে বসিতে সাহস পাইয়াছে। পরমহংসদেব বলিতেন — মায়াকে মায়া বলিয়া চিনিলে মায়া পলাইয়া যায়। যেদিন আমরা বুঝিব যে আমরা কতগুলো অন্নদাস, ভবঘুরেকে ধরিয়া স্বহস্তে তাহাদের কপালে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছি, যে দিন বুঝিব আমরা বাস্তবিক কাণা নহি, শুধু স্বেচ্ছায় চোখ বুজিয়া অন্ধকার দেখিতেছি মাত্র, যেদিন বুঝিব আমরা দুর্ব্বল নহি, অপারগ নহি, শুধু আলস্যের ঘোরে, অজ্ঞানের ঘোরে পড়িয়া আছি মাত্র — সেইদিন আমাদের দুর্দ্দশার নিবৃত্তি। সে দিন আর "আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত নহি" বলিয়া জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইতে ছুটিব না। অনন্ত শক্তির আধারভূতা, রন্ধ্রে রন্ধ্রে চৈতন্যময়ী আমাদের জননী — আমরা আবার কাহার দাস?

প্রতিজ্ঞা কর দেখি আর মিথ্যার সংস্পর্শে আসিব না, ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়-রূপ যাদুগৃহে পাণ্ডিত্যের তক্‌মা পাইয়া ভেড়া বনিয়া থাকিব না; ছোটলাট বড়লাট বাহির হইলে অভিনন্দন পত্র লইয়া চিরদাসত্ব স্বীকার করিবার জন্য তাহাদের পিছু পিছু ছুটিব না — তখন মায়ের যথার্থ স্বরূপ বুঝিবে; দেখিবে মা চিরস্বাধীনা। একবার চোখের ঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের অভয়পদ দেখ দেখি; বুঝিতে পারিবে এ ইংরাজ রাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা মায়াপুরী।

একথা বলিলে ইংরাজ রাগিয়া উঠিবে; কিন্তু আমাদের সহিত ইংরাজের মিলনের ত কোন সম্ভাবনাই নাই। একস্থানে বসিয়া সত্য মিথ্যা উভয়ে ত নির্ব্বিবাদে ঘর করিতে পারে না। ইংরাজের বিরোধ ধর্ম্মের সহিত — সত্যের সহিত। আর যাহার সত্যের সহিত বিরোধ তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা

কোনও দেশে কোনও মহৎ পরিবর্ত্তন আরদ্ধ হইলে রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম্মের বাহ্যিক আকার, শিক্ষা, নীতি ইত্যাদি মানবজীবনের যতই প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ থাকে, সকলের মধ্যে সেই পরিবর্ত্তনের পরিণাম অতি শীঘ্রই লক্ষিত হয়। সমস্ত দেশ ক্ষুব্ধ মহাসাগরের মত আলোড়িত হয়। যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা ভগ্ন হইয়া ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হয়, যাহা নবজাত ও অপূর্ণ তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার আয়োজন চারিদিকে আরম্ভ হয়। প্রথম সেই আয়োজনের কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী স্থির করা কঠিন। কোথা হইতে কোন্ আশাতীত প্রেরণা অস্ফুট বা অলক্ষিত ভাবে অল্প সংখ্যক লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণে সঞ্চারিত হয় এবং প্রথম আবেশে কয়েকটি মহৎ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ মাত্র করাইয়া যেন শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তরঙ্গের গায়ে তরঙ্গ উঠে, মানব সমুদ্রের শান্তিময় ও পরিচিত দৃশ্য ঘুচিয়া দিগন্তব্যাপী ঝঞ্জন ও কোলাহলে পরিণত হয়। মতির একতা নাই, গতির স্থিরতা নাই। সাহসীর উৎসাহ বাক্য, দুঃসাহসীর উদ্দাম কৃত্য, বিশ্বের ব্যর্থ বিজ্ঞতায়, ভীরুর নিশ্চেষ্টতাপোষক পরামর্শে দেশবাসীর বুদ্ধি বিব্রত হইয়া পড়ে। নেতাদের ঐক্য দূরের কথা, প্রত্যেকের মতের মধ্যে অস্থিরতা ও অনৈক্য প্রকাশ পায়। যিনি প্রারম্ভে শূর ও উৎসাহী, তিনিই মধ্যপথে ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া "থাম, ফিরিয়া যাই" বলিয়া বৃথা ডাকাডাকি আরম্ভ করেন। কাল যিনি দৌড়াইতে জানিতেন, আজ তিনি মন্দগতির পক্ষপাতী, শীঘ্র একপার্শ্বে সরিয়া বসিয়া পড়িবার লক্ষণ দেখান। অগ্রগামী পশ্চাদ্‌গামী, বিপ্লববাদী শান্তিপ্রিয়, তেজস্বী নিস্তেজ হয়। রাজনীতিক আকাশে নব নব নক্ষত্র উদিত হয়, খসিয়া পড়ে; কিন্তু নক্ষত্রের অভাব হয় না। সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে তরঙ্গ টুটে; কিন্তু সেই বিশাল আলোড়িত মহাসাগরের বিক্ষিপ্ত সংক্ষুব্ধ সহস্র তরঙ্গশ্রেণীর ন্যূনতা হয় না। যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ তরঙ্গের চূড়ায় আরূঢ়, তাঁহাদের এমন শক্তি থাকে না যে সেই নবোত্থানের কোলাহলকে নিবারিত করেন, অভীষ্ট পথে চালান বা সুশৃঙ্খলিত করেন। তাঁহারা তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিতেছেন, তরঙ্গ চালাইতেছেন না। সেই উদ্বেলিত শক্তিই বিপ্লবের একমাত্র নেতা ও কর্ত্তা। এমন সময়ও আসে যখন সকলের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা হয় যে, বুঝি কোলাহল চিরকালের জন্য নিস্তব্ধ হইল ঝটিকা থামিয়া গেল, দেবতা নির্ম্মল আকাশ প্রকট করিতে উদ্যত হইলেন; সমুদ্রের পুরাতন অধিকারী বরুণদেব বিক্ষিপ্ত তরঙ্গমালা হইতে তাঁহার মহিমান্বিত সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া

হয় বিভীষিকা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই কোলাহল থামিল, নয় বিভীষিকার বিফলতা বুঝিয়া নির্ব্বাসন-পাশ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কয়েকজন ভাসমান নেতাকে আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রের অতলগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং উদ্ধত বায়ুকুলকে আইন-কানুন নিগড়াবদ্ধ গুহাগহ্বরে নিগৃহীত করিয়াছেন। অতএব আর ভয় নাই, শীঘ্র পুরাতন শান্তি ও নিশ্চেষ্টতা ফিরিয়া আসিবে। এমন সময়ে এই প্রত্যাশা নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু সর্ব্বদা শান্তিপ্রয়াসীগণ ব্যর্থমনোরথ হয়। যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গোল থামিবার নয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ইহাতে মানুষের হাত নাই। যেমন সেই বিশাল সমুদ্রস্পন্দন মানবসৃষ্ট নয়, তেমনই তাহা অকালে শান্ত করা মানবশক্তির অতীত। আমাদের দেশে এই-রূপ পরিবর্ত্তন পাঁচ বৎসর হইতে চলিতেছে, এইরূপ অনিবার্য্য অশান্তি রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষানীতিকে আন্দোলিত ও বিক্ষুব্ধ করিতেছে, এইরূপ ক্ষণিক তরঙ্গনিগ্রহ ও মিথ্যা শান্তির প্রত্যাশার সময় আসিয়াছে। যাঁহার ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করিয়া নিগ্রহকেই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্মরণ করুন, যে কখনও কোন ইতিহাসে এরূপ বিপ্লব নিগ্রহ দ্বারা চিরকাল স্থগিত হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। স্রোত নিগৃহীত হইলে সর্ব্ব বন্ধন ভাঙ্গিয়া দশগুণ বেগে বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করিয়া বহে। তাহা শান্ত করিবার একই উপায় সেই পরিবর্ত্তনের পথ সুগম ও বাধারহিত করা। যাঁহারা এই ক্ষণিক তরঙ্গ-নিগ্রহে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া পুরাতন স্থিতির পুনরানয়ন সঙ্কল্প করেন, তাঁহারাও মনে করুন যে, যাঁহারা দেশের নেতা সাজিয়া এইরূপ বিফল প্রয়াস আরম্ভ করিয়াছেন, ইতিহাসে সর্ব্বদা দেখা গিয়াছে, তরঙ্গগুলি তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া নিরুদ্দেশে ভাসাইয়া অকীর্ত্তি সাগরে মগ্ন করিয়াছে। আর যাঁহারা এই ক্ষণিক বাধায় ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন, তাঁহাদেরও বলি যে, ইহাও প্রকৃতির নিয়ম। বিধাতা যখন পুরাতনকে ডুবাইয়া মহতী নব আশাকে সফল করিতে সকাম হন, তখন প্রথম পুরাতনের সম্পূর্ণ বিস্তার করিয়া, সর্ব্ব আশা লুপ্ত করিয়া, তাহার পরে অকস্মাৎ নূতনের মহাস্রোতে পুরাতনকে ভাসান। আবার পুরাতনকে কতক আশা দিয়া, নূতনের তেজ কতক প্রত্যাহার করিয়া আবার অকস্মাৎ দ্বিগুণ বেগে স্রোত চালিত করেন। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে, জয়-পরাজয়ে নূতন শক্তি বলান্বিত, বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত হয়, পুরাতনের তেজ বারবার বিফল শক্তিক্ষয়ে বিলীন হয়। আমরা বিব্রত না হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে শক্তির ক্রীড়ায় যোগ দিবার সুযোগ অপেক্ষা করি, শক্তিসঞ্চয় করি, যাহা লব্ধ তাহা রক্ষা করিবার দৃঢ় চেষ্টা করি। এই সময় অগ্রসর হইবার

দিন নহে, আত্মরক্ষার দিন। যেন উদ্দাম আচরণে বিপক্ষকে সুযোগ দান না করি কিম্বা ভীরুতা-প্রকাশে নিগ্রহ-নীতিকে সফল না করি। স্বাধিকারে দাঁড়াইয়া লব্ধ ভূমি রক্ষা করিতে করিতে শক্তিদায়িনী-ধ্যানে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রোচ্চারণে দেবতাকে শরীরে আনিয়া রাখি। সঞ্চিত শক্তি ব্যয়ের দিন আসিবে।

জাতীয় উত্থান

আমাদের প্রতিপক্ষীয় ইংরাজগণ বর্ত্তমান মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী আন্দোলনকে আরম্ভাবধি বিদ্বেষজাত বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণপ্রিয় কয়েকজন ভারতবাসীও এই মতের পুনরাবৃত্তি করিতে ত্রুটি করেন না। আমরা ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত, জাতীয় উত্থানস্বরূপ আন্দোলন ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাহাতে শক্তিব্যয় করিতেছি। এই আন্দোলন যদি বিদ্বেষজাত হয়, তাহা হইলে আমরা ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া কখনও প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। বিরোধ, যুদ্ধ, হত্যা পর্য্যন্ত ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণা ধর্ম্মের বহির্ভূত; বিদ্বেষ ও ঘৃণা জগতের ক্রমোন্নতির বিকাশে বর্জ্জনীয় হয়, অতএব যাঁহারা স্বয়ং এই বৃত্তিগুলি পোষণ করেন কিংবা জাতির মধ্যে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা অজ্ঞানের মোহে পতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই আন্দোলনের মধ্যে কখনও যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন এক পক্ষ বিদ্বেষ ও ঘৃণা করে, তখন অপর পক্ষেও তাহার প্রতিঘাতস্বরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রসূত হওয়া অনিবার্য্য। এইরূপ পাপসৃষ্টির জন্য বঙ্গদেশের কয়েকটী ইংরাজ সংবাদপত্র ও উদ্ধতস্বভাব অত্যাচারী ব্যক্তিবিশেষের আচরণ দায়ী। সংবাদপত্রে প্রতিদিন উপেক্ষা, ঘৃণা ও বিদ্বেষসূচক তিরস্কার এবং রেলে, রাস্তায়, হাটে, ঘাটে গালাগালি, অপমান ও প্রহার পর্য্যন্ত অনেকদিন সহ্য করিয়া শেষে এই উপদ্রব-সহিষ্ণু ও ধীরপ্রকৃতি ভারতবাসীরও অসহ্য হয় এবং গালির বদলে গালি ও প্রহারের বদলে প্রহারের প্রতিদান আরম্ভ হয়। অনেক ইংরাজও তাঁহাদের দেশভাইদের এই দোষ ও অশুভসৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপরন্তু রাজপুরুষগণ দারুণ ভ্রমবশতঃ অনেক দিন হইতে প্রজার স্বার্থবিরোধী, অসন্তোষজনক ও মর্ম্মবেদনাদায়ক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মানুষের স্বভাব ক্রোধপ্রবণ, স্বার্থে আঘাত পড়ায়, অপ্রিয় আচরণে কিম্বা প্রাণের প্রিয় বস্তু বা ভাবের উপর দৌরাত্ম্য করায় সেই সর্ব্বপ্রাণীনিহিত ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠে, ক্রোধের আতিশয্যে ও অন্ধগতিতে বিদ্বেষ ও বিদ্বেষজাত আচরণও উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীর প্রাণে বহুকাল হইতে ইংরাজ ব্যক্তিবিশেষের অন্যায় আচরণে ও উদ্ধত কথায় এবং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে প্রজার কোনও প্রকৃত অধিকার বা ক্ষমতা না থাকায় ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষে লর্ড কার্জ্জনের শাসনসময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিয়া

বঙ্গভঙ্গজাত অসহ্য মর্ম্মবেদনায় অসাধারণ ক্রোধ দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়া রাজপুরুষদিগের নিগ্রহ-নীতির ফলে বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। ইহাও স্বীকার করি যে, অনেকে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই বিদ্বেষাগ্নিতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃতাহুতি দিয়াছেন। ভগবানের লীলা অতি বিচিত্র, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বে জগতের ক্রমোন্নতি পরিচালিত অথচ অশুভ প্রায়ই শুভের সহায়তা করে, ভগবানের অভীপ্সিত মঙ্গলময় ফল উৎপাদন করে। এই পরম অশুভের যে বিদ্বেষ সৃষ্টি, তাহারও এই শুভ ফল হইল যে, তমঃ-অভিভূত ভারতবাসীর মধ্যে রাজসিক শক্তি জাগরণের উপযোগী উৎকৃষ্ট রাজসিক প্রেরণা উৎপন্ন হইল। তাহা বলিয়া আমরা অশুভের বা অশুভকারীর প্রশংসা করিতে পারি না। যিনি রাজসিক অহঙ্কারের বশে অশুভ কার্য্য করেন, তাঁহার কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট শুভফলের সহায়তা হয় বলিয়া তাঁহার দায়িত্ব ও ফলভোগরূপ বন্ধন কিছুমাত্র ঘুচে না। যাঁহারা জাতিগত বিদ্বেষ প্রচার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; বিদ্বেষপ্রচারে যে ফল হয়, নিঃস্বার্থ ধর্ম্মপ্রচারে তাহার দশগুণ ফল হয় এবং তাহাতে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মজাত পাপফল ভোগ না হইয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও অমিশ্র পুণ্যের সৃষ্টি হয়। আমরা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণাজনক কথা লিখিব না, অপরকেও সেইরূপ অনর্থ-সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিব। জাতিতে জাতিতে স্বার্থবিরোধ উৎপন্ন হইলে, বা বর্ত্তমান অবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ হইলে, আমরা পরজাতির স্বার্থনাশে ও স্বজাতি-স্বার্থসাধনে আইনে ও ধর্ম্মনীতিতে অধিকারী। অত্যাচার বা অন্যায় কার্য্য ঘটিলে আমরা তাহার তীব্র উল্লেখে এবং জাতীয় শক্তির সংঘাত ও সর্ব্ববিধ বৈধ উপায় ও বৈধ প্রতিরোধ দ্বারা তাহার অপনোদনে আইনে ও ধর্ম্মনীতিতে অধিকারী। কোনও ব্যক্তিবিশেষ, তিনি রাজপুরুষই হউন বা দেশবাসীই হউন, অমঙ্গলজনক অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্য্য বা মত প্রকাশ করিলে আমরা ভদ্রসমাজোচিত আচারের অবিরোধী বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়া সেই কার্য্য বা সেই মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডনে অধিকারী। কিন্তু কোনও জাতি বা ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ বা সৃজনে আমরা অধিকারী নহি। অতীতে যদি এইরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে, সে অতীতের কথা; ভবিষ্যতে যাহাতে এই দোষ না ঘটে আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ জাতীয় পক্ষের সংবাদপত্র ও কার্য্যক্ষম যুবকবৃন্দকে এই উপদেশ দিতেছি।

আর্য্যজ্ঞান, আর্য্যশিক্ষা, আর্য্য-আদর্শ জড়জ্ঞানবাদী রাজসিক ভোগপরায়ণ পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। যুরোপীয়দের মতে স্বার্থ

ও সুখান্বেষণের অভাবে কর্ম্ম অনাচরণীয়, বিদ্বেষের অভাবে বিরোধ ও যুদ্ধ অসম্ভব। হয় সকাম কর্ম্ম করিতে হয়, নচেৎ কামনাহীন সন্ন্যাসী হইয়া বসিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত, ইহাই তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। আর্য্যগণ যেদিন উত্তরকুরু হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিয়া পঞ্চনদভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে এই সনাতন শিক্ষা লাভ করিয়া জগতে সনাতন প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছেন যে, এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম, সত্য ও শক্তি বিকাশের জন্য সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ স্থাবর জঙ্গমে, মনুষ্য পশু কীটপতঙ্গে, সাধু পাপীতে, শত্রু মিত্রে, দেব অসুরে প্রকাশ হইয়া জগৎ-ময় ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ার জন্য সুখ, ক্রীড়ার জন্য দুঃখ, ক্রীড়ার জন্য পাপ, ক্রীড়ার জন্য পুণ্য, ক্রীড়ার জন্য বন্ধুত্ব, ক্রীড়ার জন্য শত্রুতা, ক্রীড়ার জন্য দেবত্ব, ক্রীড়ার জন্য অসুরত্ব। মিত্র শত্রু সকলই ক্রীড়ার সহচর, দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আর্য্য মিত্রকে রক্ষা করেন, শত্রুকে দমন করেন, কিন্তু তাঁহার আসক্তি নাই। তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্ব ভূতে, সর্ব্ব বস্তুতে, সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব ফলে নারায়ণকে দর্শন করিয়া ইষ্টানিষ্টে, শত্রুমিত্রে, সুখদুঃখে, পাপপুণ্যে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন। ইহার এই অর্থ নহে যে সর্ব্ব পরিণাম তাঁহার ইষ্ট, সর্ব্ব জন তাঁহার মিত্র, সর্ব্ব ঘটনা তাঁহার সুখদায়ক, সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁহার আচরণীয়, সর্ব্ব ফল তাঁহার বাঞ্ছনীয়। সম্পূর্ণ যোগপ্রাপ্তি না হইলে দ্বন্দ্ব ঘুচে না, সেই অবস্থা অল্পজনপ্রাপ্য, কিন্তু আর্য্যশিক্ষা সাধারণ আর্য্যের সম্পত্তি। আর্য্য ইষ্টসাধনে ও অনিষ্টবর্জ্জনে সচেষ্ট হয়েন কিন্তু ইষ্টলাভে জয়মদে মত্ত হন না, অনিষ্টসম্পাদনে ভীত হন না। মিত্রের সাহায্য, শত্রুর পরাজয় তাঁহার চেষ্টার উদ্দেশ্য হয়, কিন্তু তিনি শত্রুকে বিদ্বেষ ও মিত্রকে অন্যায় পক্ষপাত করেন না, কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বজন-সংহারও করিতে পারেন, বিপক্ষের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। সুখ তাঁহার প্রিয়, দুঃখ তাঁহার অপ্রিয় হয়, কিন্তু তিনি সুখে অধীর হন না, দুঃখেও তাঁহার ধৈর্য্য ও প্রীতভাব অবিচলিত হইয়া থাকে। তিনি পাপবর্জ্জন ও পুণ্যসঞ্চয় করেন, কিন্তু পুণ্যকর্ম্মে গর্ব্বিত হয়েন না, পাপে পতিত হইলে দুর্ব্বল বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেন না, হাসিতে হাসিতে পঙ্ক হইতে উঠিয়া কর্দ্দমাক্ত শরীরকে মুছিয়া পরিষ্কার ও শুদ্ধ করিয়া পুনরায় আত্মোন্নতিতে সচেষ্ট হয়েন। আর্য্য কর্ম্মসিদ্ধির জন্য বিপুল প্রয়াস করেন, সহস্র পরাজয়েও বিরত হন না, কিন্তু অসিদ্ধিতে দুঃখিত, বিমর্ষ বা বিরক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে অধর্ম্ম। অবশ্য যখন কেহ যোগারূঢ় হইয়া

গুণাতীতভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার পক্ষে দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে, জগন্মাতা যে কার্য্য দেন, তিনি বিনাবিচারে তাহাই করেন, যে ফল দেন, সানন্দে তাহা ভোগ করেন, স্বপক্ষ বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করেন, তাঁহাকে লইয়া মায়ের কার্য্য সাধন করেন, বিপক্ষ বলিয়া যাঁহাকে দেখান, তাঁহাকে আদেশমত দমন বা সংহার করেন। এই শিক্ষাই আর্য্যশিক্ষা। এই শিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণার স্থান নাই। নারায়ণ সর্ব্বত্র। কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘৃণা করিব? আমরা যদি পাশ্চাত্য ভাবে রাজনীতিক আন্দোলন করি, তাহা হইলে বিদ্বেষ ও ঘৃণা অনিবার্য্য হয় এবং পাশ্চাত্য মতে নিন্দনীয় নহে, কেননা স্বার্থের বিরোধ আছে, একপক্ষে উত্থান, অন্যপক্ষে দমন চলিতেছে। কিন্তু আমাদের উত্থান কেবল আর্য্যজাতির উত্থান নহে — আর্য্যচরিত্র, আর্য্যশিক্ষা, আর্য্যধর্ম্মের উত্থান। আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রভাব বড় প্রবল ছিল, তথাপি প্রথম অবস্থায়ও এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছে; মাতৃপূজা, মাতৃপ্রেম, আর্য্য অভিমানের তীব্র অনুভবে ধর্ম্ম-প্রধান দ্বিতীয় অবস্থা প্রস্তুত হইয়াছে। রাজনীতি ধর্ম্মের অঙ্গ, কিন্তু তাহা আর্য্যভাবে, আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত উপায়ে আচরণ করিতে হয়। আমরা ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ যুবকদিগকে বলি, যদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরে উন্মূলিত কর। বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় ক্ষণিক রজঃপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। যাঁহারা দেশোদ্ধারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃত-প্রাণ তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ভ্রাতৃভাব, কঠোর উদ্যম, লৌহসম দৃঢ়তা ও জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য তেজ সঞ্চার কর, সেই শক্তিতে আমরা অটুটবলান্বিত ও চিরজয়ী হইব।

অতীতের সমস্যা

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় শতবর্ষ কাল পাশ্চাত্য ভাবের সম্পূর্ণ আধিপত্যে ভারতবাসী আর্য্যজ্ঞানে ও আর্য্যভাবে বঞ্চিত হইয়া শক্তিহীন, পরাশ্রয়প্রবণ ও অনুকরণপ্রিয় হইয়া রহিয়াছিল। এই তামসিক ভাব এখন অপনোদিত হইতেছে। কেন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা একবার মীমাংসা করা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তামসিক অজ্ঞান ও ঘোর রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল, দেশে সহস্র স্বার্থপর, কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ, দেশদ্রোহী, শক্তিমান অসুরপ্রকৃতি লোক জন্মগ্রহণ করিয়া পরাধীনতার অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই সময়ে ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পাদনার্থ ভারতে দূর দ্বীপান্তরবাসী ইংরাজ বণিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাপভারার্ত্ত ভারতবর্ষ অনায়াসে বিদেশীর করতলগত হইল। এই অদ্ভুত কাণ্ড ভাবিয়া এখনও জগৎ আশ্চর্য্যান্বিত। ইহার কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে না পারিয়া সকলেই ইংরাজ জাতির গুণের অশেষ প্রশংসা করিতেছে। ইংরাজ জাতির অনেক গুণ আছে; না থাকিলে তাঁহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী জাতি হইতে পারিতেন না। কিন্তু যাঁহারা বলেন ভারতবাসীর নিকৃষ্টতা, ইংরাজের শ্রেষ্ঠতা, ভারতবাসীর পাপ, ইংরাজের পুণ্য এই অদ্ভুত ঘটনার একমাত্র কারণ তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত না হইয়াও লোকের মনে কয়েকটী ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানপূর্ব্বক নির্ভুল মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাউক। অতীতের সূক্ষ্ম সন্ধানের অভাবে ভবিষ্যতের গতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ইংরাজের ভারত-বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। এই বৃহৎ দেশ যদি অসভ্য, দুর্ব্বল বা নির্ব্বোধ ও অক্ষম জাতির বাসস্থান হইত, তাহা হইলে এইরূপ কথা বলা যাইত না। কিন্তু ভারতবর্ষ রাজপুত, মারাঠা, শিখ, পাঠান, মোগল প্রভৃতির বাসভূমি; তীক্ষ্মবুদ্ধি বাঙ্গালী, চিন্তাশীল মাদ্রাজী, রাজনীতিজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতজননীর সন্তান। ইংরাজের বিজয়ের সময়ে নানা ফড়নবীসের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, মাধোজী সিন্ধিয়ার ন্যায় যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি, হায়দর আলি ও রঞ্জিত সিংহের ন্যায় তেজস্বী ও প্রতিভাশালী রাজ্য-নির্মাতা প্রদেশে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসী তেজে, শৌর্য্যে, বুদ্ধিতে কোনও জাতির অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সরস্বতীর মন্দির, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, শক্তির ক্রীড়াস্থান ছিল। অথচ যে-দেশ

প্রবল ও বর্দ্ধনশীল মুসলমান শত শত বর্ষব্যাপী প্রয়াসে অতিকষ্টে জয় করিয়া কখনও নির্ব্বিঘ্নে শাসন করিতে পারেন নাই, সেই দেশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের আধিপত্য স্বীকার করিল, শতবৎসরের মধ্যে তাঁহাদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের ছায়ায় নিশ্চেষ্টভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িল! বলিবে একতার অভাব এই পরিণামের কারণ। স্বীকার করিলাম, একতার অভাব আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে কোনও কালেও একতা ছিল না। মহাভারতের সময়েও একতা ছিল না, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময়েও ছিল না, মুসলমানের ভারতবিজয়কালেও ছিল না, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ছিল না। একতার অভাব এই অদ্ভুত ঘটনার একমাত্র কারণ হইতে পারে না। যদি বল, ইংরাজদিগের পুণ্য ইহার কারণ, জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা সেই সময়ের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা কি বলিতে সাহসী হইবেন যে, সেইকালের ইংরাজ বণিক সেইকালের ভারতবাসীর অপেক্ষা গুণে ও পুণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? যে ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংস্ প্রমুখ ইংরাজ বণিক ও দস্যুগণ ভারতভূমি জয় ও লুণ্ঠন করিয়া জগতে অতুলনীয় সাহস, উদ্যম ও আত্মম্ভরিতা এবং জগতে অতুলনীয় দুর্গুণেরও দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, শক্তিমান অসুরগণের পুণ্যের কথা শ্রবণ করিলে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর। সাহস, উদ্যম ও আত্মম্ভরিতা অসুরের গুণ, অসুরের পুণ্য, সেই পুণ্য ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরাজগণের ছিল। কিন্তু তাহাদের পাপ ভারতবাসীর পাপ অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না। অতএব ইংরাজের পুণ্যে এই অঘটন ঘটন হয় নাই।

ইংরাজও অসুর ছিলেন, ভারতবাসীও অসুর ছিলেন, তখন দেবে অসুরে যুদ্ধ হয় নাই, অসুরে অসুরে যুদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য অসুরে এমন কি মহৎ গুণ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্য্য ও বুদ্ধি সফল হইল, ভারতবাসী অসুরে এমন কি সাংঘাতিক দোষ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্য্য ও বুদ্ধি বিফল হইল? প্রথম উত্তর এই, ভারতবাসী আর সকল গুণে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয়ভাবরহিত ছিলেন, ইংরাজের মধ্যে সেই গুণের পূর্ণ বিকাশ ছিল। এই কথায় যেন কেহ না বুঝেন যে, ইংরাজগণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন; স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় ভারতে বিপুল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্র বৃত্তি। স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশের সেবাভাবে উন্মত্ত, সর্ব্বত্র স্বদেশকে দেখেন, সকল কার্য্য স্বদেশকে ইষ্টদেবতা বলিয়া যজ্ঞরূপে সমর্পণ করিয়া দেশের হিতের জন্যই করেন, দেশের স্বার্থে আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দেন। অষ্টাদশ

শতাব্দীর ইংরাজগণের সেই ভাব ছিল না; সেই ভাব কোন জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতির প্রাণে স্থায়ীরূপে থাকিতে পারে না। ইংরাজগণ স্বদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই, স্বদেশের হিতার্থে ভারতবিজয় করেন নাই, তাঁহারা বাণিজ্যার্থ, নিজ নিজ আর্থিক লাভার্থ আসিয়াছিলেন; স্বদেশের হিতার্থে ভারতবিজয় ও লুণ্ঠন করেন নাই, অনেকটা নিজ স্বার্থ সিদ্ধ্যর্থে জয় ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক না হইয়াও তাঁহারা জাতীয়ভাবাপন্ন ছিলেন। আমার দেশ শ্রেষ্ঠ, আমার জাতির আচার, বিচার, ধর্ম্ম, চরিত্র, নীতি, বল, বিক্রম, বুদ্ধি, মত, কর্ম্ম উৎকৃষ্ট, অতুল্য এবং অন্য জাতির পক্ষে দুর্লভ — এই অভিমান; আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশ-ভাইয়ের বৃদ্ধিতে আমি বর্দ্ধিত — এই বিশ্বাস; কেবল আমার স্বার্থসাধন না করিয়া তাহার সহিত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করিব, দেশের মান, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য, আবশ্যক হইলে সেই যুদ্ধে নির্ভয়ে প্রাণবিসর্জ্জন করা বীরের ধর্ম্ম, এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাতীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ। জাতীয় ভাব রাজসিক ভাব, স্বদেশপ্রেম সাত্ত্বিক। যিনি নিজের ‘‘অহং’’ দেশের ‘‘অহং’’-এ বিলীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক, যিনি নিজের ‘‘অহং’’ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার দ্বারা দেশের ‘‘অহং’’ বর্দ্ধিত করেন তিনি জাতীয়ভাবাপন্ন। সেই কালের ভারতবাসীরা জাতীয়ভাবশূন্য ছিলেন। তাঁহারা যে কখনও জাতির হিত দেখিতেন না, এমন কথা বলি না, কিন্তু জাতির ও আপনার হিতের মধ্যে লেশমাত্র বিরোধ থাকিলে প্রায়ই জাতির হিত বিসর্জ্জন করিয়া নিজ হিত সম্পাদন করিতেন। একতার অভাব অপেক্ষা এই জাতীয়তার অভাব আমাদের মতে মারাত্মক দোষ। পূর্ণ জাতীয় ভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইলে এই নানা ভেদসঙ্কুল দেশেও একতা সম্ভব; কেবল একতা চাই, একতা চাই বলিলে একতা সাধিত হয় না; ইহাই ইংরাজের ভারতবিজয়ের প্রধান কারণ। অসুরে অসুরে সংঘর্ষ হইল, জাতীয়ভাবাপন্ন একতাপ্রাপ্ত অসুরগণ জাতীয়ভাবশূন্য একতাশূন্য সমানগুণবিশিষ্ট অসুরগণকে পরাজিত করিলেন। বিধাতার এই নিয়ম, যিনি দক্ষ ও শক্তিমান তিনিই কুস্তিতে জয়ী হয়েন; যিনি ক্ষিপ্রগতি ও সহিষ্ণু তিনিই দৌড়ে প্রথম গন্তব্যস্থানে পৌঁছেন। সচ্চরিত্র বা পুণ্যবান বলিয়া কেহ দৌড়ে বা কুস্তিতে জয়ী হন নাই, উপযুক্ত শক্তি আবশ্যক। তেমনই জাতীয়ভাবের বিকাশে দুর্ব্বৃত্ত ও আসুরিক জাতিও সাম্রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হয়, জাতীয়ভাবের অভাবে সচ্চরিত্র ও গুণসম্পন্ন জাতিও পরাধীন হইয়া শেষে চরিত্র ও গুণ হারাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

রাজনীতির দিক দেখিলে ইহাই ভারত-বিজয়ের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা; কিন্তু ইহার মধ্যে আরও গভীর সত্য নিহিত আছে। বলিয়াছি, তামসিক অজ্ঞান ও রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতে অতি প্রবল হইয়াছিল। এই অবস্থা পতনের অগ্রগামী অবস্থা। রজোগুণসেবায় রাজসিক শক্তির বিকাশ হয়; কিন্তু অমিশ্র রজঃ শীঘ্র তমোমুখী হয়, উদ্ধত শৃঙ্খলাবিহীন রাজসিক চেষ্টা অতি শীঘ্র অবসন্ন ও শ্রান্ত হইয়া অপ্রবৃত্তি, শক্তিহীনতা, বিষাদ ও নিশ্চেষ্টতায় পরিণত হয়। সত্ত্বমুখী হইলেই রজঃশক্তি স্থায়ী হয়। সাত্ত্বিক ভাব যদিও না থাকে, সাত্ত্বিক আদর্শ আবশ্যক; সেই আদর্শ দ্বারা রজঃশক্তি শৃঙ্খলিত ও স্থায়ী-বলপ্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতা ও সুশৃঙ্খলতা ইংরাজের এই দুই মহান সাত্ত্বিক আদর্শ চিরকাল ছিল, তাহার বলে ইংরাজ জগতে প্রধান ও চিরজয়ী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরোপকারলিপ্সাও জাতির মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার বলে ইংলণ্ড জাতীয় মহত্ত্বের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। উপরন্তু য়ুরোপে যে জ্ঞানতৃষ্ণার প্রবল প্রেরণায় পাশ্চাত্য জাতি শত শত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন, কণামাত্র জ্ঞানলাভের জন্য শত শত লোক প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হন, সেই বলীয়সী সাত্ত্বিক জ্ঞানতৃষ্ণা ইংরাজ জাতির মধ্যে বিকশিত ছিল। এই সাত্ত্বিক শক্তিতে ইংরাজ বলবান ছিলেন, এই সাত্ত্বিক শক্তি ক্ষীণ হইতেছে বলিয়া ইংরাজের প্রাধান্য, তেজ ও বিক্রম ক্ষীণ হইয়া ভয়, বিষাদ ও আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে। সাত্ত্বিক লক্ষ্যভ্রষ্ট রজঃশক্তি তমোমুখী হইতেছে। অপরপক্ষে ভারতবাসীগণ মহান সাত্ত্বিক জাতি ছিলেন; সেই সাত্ত্বিক বলে জ্ঞানে, শৌর্য্যে, তেজে, বলে তাঁহারা অতুলনীয় হইয়াছিলেন এবং একতাবিহীন হইয়াও সহস্র বর্ষকাল ধরিয়া বিদেশীর আক্রমণের প্রতিরোধ ও দমনে সমর্থ ছিলেন। শেষে রজোবৃদ্ধি ও সত্ত্বের হ্রাস হইতে লাগিল। মুসলমানের আগমনকালে জ্ঞানের বিস্তার সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন রজঃপ্রধান রাজপুতজাতি ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ়; উত্তর ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ আত্মকলহের প্রাধান্য; বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিতে তামসিকভাব প্রবল। অধ্যাত্মজ্ঞান দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল; সেই সত্ত্ববলে দক্ষিণ ভারত অনেকদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জ্ঞানতৃষ্ণা এবং জ্ঞানের উন্নতি বন্ধ হইতে চলিল, তাহার স্থানে পাণ্ডিত্যের মান ও গৌরব বর্দ্ধিত হইল; আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যোগশক্তি বিকাশ ও আভ্যন্তরিক উপলব্ধির স্থানে তামসিক পূজা ও সকাম রাজসিক ব্রতোদ্‌যাপনের বাহুল্য হইতে লাগিল, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লুপ্ত হইলে লোকে বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়া অধিক মূল্যবান ভাবিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ জাতিধর্ম্ম লোপেই গ্রীস, রোম,

মিসর, আসিরিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু সনাতন ধৰ্ম্মাবলম্বী আৰ্য্যজাতির মধ্যে সেই সনাতন উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে সঞ্জীবনী সুধাধারা নির্গত হইয়া জাতির প্রাণরক্ষা করিত। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, নানক, রামদাস, তুকারাম সেই অমৃতসিঞ্চন করিয়া মরণাহত ভারতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। অথচ রজঃ ও তমঃ স্রোতের এমন বল ছিল যে সেই টানে উত্তমও অধমে পরিণত হইল; সাধারণ লোকে শঙ্করদত্ত জ্ঞান দ্বারা তামসিক ভাবের সমর্থন করিতে লাগিল, চৈতন্যের প্রেমধৰ্ম্ম ঘোর তামসিক নিশ্চেষ্টতার আশ্রয়ে পরিণত হইল, রামদাসের শিক্ষাপ্রাপ্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ মহারাষ্ট্রধৰ্ম্ম বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসাধনে ও আত্মকলহে শক্তির অপব্যবহার করিয়া শিবাজী ও বাজীরাওয়ের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্রোতের পূর্ণ বেগ দেখা গেল। সমাজ ও ধৰ্ম্ম তখন কয়েকজন আধুনিক বিধানকৰ্ত্তার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়ার আড়ম্বর ধৰ্ম্ম নামে অভিহিত, আৰ্য্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়, আৰ্য্যচরিত্র বিনষ্টপ্রায়, সনাতন ধৰ্ম্ম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর অরণ্যবাসে ও ভক্তের হৃদয়ে লুকাইয়া রহিল। ভারত তখন ঘোর তমঃ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ প্রচণ্ড রাজসিক প্রবৃত্তি বাহ্যিক ধৰ্ম্মের আবরণে স্বার্থ, পাপ, দেশের অকল্যাণ, পরের অনিষ্ট পূর্ণবেগে সাধন করিতেছিল। দেশে শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু আৰ্য্যধৰ্ম্মলোপে, সত্ত্বলোপে সেই শক্তি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আত্মবিনাশ করিল। শেষে ইংরাজের আসুরিক শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া ভারতের আসুরিক শক্তি শৃঙ্খলিত ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িল। ভারত পূর্ণ তমোভাবের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞান, অকৰ্ম্মণ্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্মসম্মান বিসৰ্জ্জন, দাসত্বপ্রিয়তা, পরধৰ্ম্মসেবা, পরের অনুকরণ, পরাশ্রয়ে আত্মোন্নতি চেষ্টা, বিষাদ, আত্মনিন্দা, ক্ষুদ্রাশয়তা, আলস্য ইত্যাদি সকলই তমোভাবপ্রকাশক গুণ। এই সকলের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কোনটির অভাব ছিল? সেই শতাব্দীর সৰ্ব্ব চেষ্টা এই গুণসকলের প্রাবল্যে তমঃশক্তির চিহ্নে সৰ্ব্বত্র চিহ্নিত।

ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয়ভাবের উদ্দীপনার জ্বালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহার সহিত স্বদেশপ্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্যজাতি নহি, আমরা আসিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী, আমরা আৰ্য্য। আমরা জাতীয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের

সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয়ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান, এই বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটী বঙ্গবাসী, এই ত্রিংশকোটী ভারতবাসীর সমষ্টি সর্ব্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ; এই ত্রিংশকোটীর আশ্রয়, শক্তিস্বরূপিণী, বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারত-জননী ভগবানের একটী শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহবিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমূর্ত্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি?

তাহার পরে আর্য্যজাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার। প্রথম আর্য্যচরিত্র ও শিক্ষা, দ্বিতীয় যোগশক্তির পুনর্ব্বিকাশ, তৃতীয় আর্য্যোচিত জ্ঞানতৃষ্ণা ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা নবযুগের আবশ্যক সামগ্রী সঞ্চয় এবং এই কয় বর্ষের উন্মাদিনী উত্তেজনা শৃঙ্খলিত ও স্থিরলক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া মাতৃকার্য্যোদ্ধার। এখন যে-সব যুবকবৃন্দ দেশময় পথান্বেষণ ও কর্ম্মান্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া কিছুদিন শক্তি আনয়নের পথ খুঁজিয়া লউন। যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই। তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদের শিক্ষায় যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শক্তি অঘটনঘটনপটীয়সী। সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য্য সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ স্তম্ভিত হইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃমূর্ত্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ, এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্য্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্ত্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলেন, অনেকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুণ্ণ আনন্দকে স্বারাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একমাত্র অঙ্গ — তাহার দুইদিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীর শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। যতদিন পরের শাসন বা রাজত্ব থাকে, ততদিন কোন জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতি বলে না। যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য।

এই আকাঙ্ক্ষার কারণ সংক্ষেপে বলিব। জাতির পক্ষে পরাধীনতা মৃত্যুর দূত ও আজ্ঞাবাহক, স্বাধীনতায়ই জীবনরক্ষা, স্বাধীনতায়ই উন্নতির সম্ভাবনা। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাবনিয়ত জাতীয় কর্ম্ম ও চেষ্টা জাতীয় উন্নতির একমাত্র পন্থা। বিদেশী যদি দেশ অধিকার করিয়া অতি দয়ালু ও হিতৈষীও হন, তাহা হইলেও আমাদের মস্তকে পরধর্ম্মের ভার চাপাইতে ছাড়িবেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল হউক মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের অহিত ভিন্ন হিত হইবে না। পরের স্বভাবনিয়ত পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই, সেই পথে গেলে আমরা অতি সুন্দররূপে পরের অনুকরণ করিতে পারি, পরের উন্নতির লক্ষণ ও বেশভূষায় অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় অবনতি আচ্ছাদন করিতে পারি, কিন্তু পরীক্ষাকালে আমাদের পরধর্ম্মসেবাসম্ভূত দুর্ব্বলতা ও অসারতা বিকাশ পাইবে। আমরাও সেই অসারতার ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইব। রোমের আধিপত্যভুক্ত, রোমের সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন য়ুরোপীয় জাতিসকল অনেকদিন সুখস্বচ্ছন্দে কাটাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শেষ অবস্থা অতি ভয়ানক হইল, মনুষ্যত্ব বিনাশে তাঁহাদের যে ঘোর দুর্দ্দশা হইল, প্রত্যেক পরাধীনতাপরায়ণ জাতির সেই মনুষ্যত্ব-বিনাশ ও ঘোর দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। পরাধীনতার প্রধান ভিত্তি জাতির স্বধর্ম্মনাশ ও পরধর্ম্মসেবা। যদি পরাধীন অবস্থায় স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে বা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, পরাধীনতার বন্ধন আপনি খসিয়া পড়িবে, ইহা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব কোন জাতি যদি

নিজদোষে পরাধীনতায় পতিত হয়, অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওযা উচিত। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যদি বিনা সর্ত্তে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং জাতি আদর্শভ্রষ্ট ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হয়, স্বরাজের অনুকূল ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে পারে বটে। এখন কথা উঠিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে স্বাধীনতার আশা পোষণ করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক ও রাজদ্রোহসূচক, যাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা নিশ্চয় রাজদ্রোহী, রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ও সর্ব্ববিধ রাজনীতিক কার্য্যে বর্জ্জনীয়। কিন্তু সেইরূপ আশা বা আদর্শের সহিত রাজদ্রোহের কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে বড় বড় ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ বলিয়া আসিতেছেন যে, এইরূপ স্বাধীনতা ইংরাজ রাজপুরুষদেরও লক্ষ্য, এখনও ইংরাজ বিচারকগণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে, স্বাধীনতা আদর্শের প্রচার ও স্বাধীনতালাভের বৈধ চেষ্টা আইনসঙ্গত ও দোষশূন্য। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্গত বা অন্তর্গত হইবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা জাতীয় পক্ষ কখন আবশ্যক মনে করে নাই। আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যদি বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্বরাজ সম্ভব হয়, আপত্তি কি? আমরা ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না, দেশরক্ষার জন্য করিতেছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি।

হিরোবূমি ইতো

মানবজাতির মধ্যে দুই প্রকার জীব জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা আস্তে আস্তে ক্রমবিকাশের স্রোতে অগ্রসর হইয়া অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য। যাঁহারা সেই ক্রমবিকাশের সাহায্যার্থ বিভূতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যে জাতির মধ্যে ও যে যুগে অবতরণ করেন, সেই জাতির চরিত্র ও আচার, সেই যুগের ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ঐশ্বরিক শক্তি ও স্বভাবের বলে সাধারণ মানবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়া জগতের গতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ইতিহাসে অমর নাম রাখিয়া স্বলোকগমন করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম ও চরিত্র মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার অতীত। প্রশংসা করি বা নিন্দা করি, তাঁহারা ভগবদ্দত্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সেই কার্য্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে খরস্রোতে বহিবে। সিজার, নেপোলিয়ন, আকবর, শিবাজী এইরূপ বিভূতি। জাপানের মহাপুরুষ হিরোবূমি ইতোও এই শ্রেণীর ভুক্ত এবং যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম তাঁহাদের একজনও গুণে, প্রতিভায় বা কর্ম্মের মহত্ত্বে ও ভবিষ্যৎ ফলে ইতোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। ইতোর ইতিহাসে ও জাপানের অভ্যুদয়ে, তাঁহার প্রধান স্থান সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু সকলেই না-ও জানিতে পারেন যে, ইতোই সেই অভ্যুদয়ের ক্রম, উপায় ও উদ্দেশ্য উদ্ভাবন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একা এই মহৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, জাপানের আর সকল মহাপুরুষ তাঁহার হস্তের যন্ত্র মাত্র। ইতোই জাপানের ঐক্য, জাপানের স্বাধীনতা, জাপানের বিদ্যাবল, সৈন্যবল, নৌসেনাবল, অর্থবল, বাণিজ্য, রাজনীতি মনে কল্পনা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনিই ভাবী জাপানের সাম্রাজ্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। যাহা করিয়াছেন, প্রায়ই অন্তরালে দাঁড়াইয়া করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর কাইসার ওয়িলহেম বা বিলাতের লয়েড জর্জ্জ যাহা করিতেছেন, যাহা ভাবিতেছেন, সমস্ত জগৎ তখনই তাহা জানিতে পারে। ইতো যাহা ভাবিতেছিলেন, যাহা করিতেছিলেন, কেহ জানিত না — যখন তাঁহার নিভৃত কল্পনা ও চেষ্টা ফলীভূত হইল, তখন জগৎ বিস্মিত হইয়া বুঝিতে পারিল, ইহাই এতদিন প্রস্তুত হইতেছিল। অথচ কি প্রকাণ্ড কার্য্য! কি অদ্ভুত প্রতিভা সেই কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে! যদি ইতো নিজে মনের কল্পনা প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইতেন, সমস্ত জগৎ পদে পদে তাঁহাকে উন্মত্ত অসাধ্যসাধন-প্রয়াসী ও ব্যর্থ-স্বপ্নের অনুরক্ত Idealist বলিয়া উপহাস করিত। কে বিশ্বাস করিত যে, পঞ্চাশ

বৎসরের মধ্যে জাপান দুর্লভ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা আয়ত্ত করিবে, ইংলণ্ড জার্ম্মাণী ফ্রান্সের সমকক্ষ প্রবল পরাক্রমশালী জাতি হইবে, চীনকে পরাভূত করিবে, রুশকে পরাভূত করিবে, দূর দেশ-বিদেশে জাপানী বাণিজ্য, জাপানী চিত্রকলা, জাপানী বুদ্ধির প্রশংসা ও জাপানী সাহসের ভয় বিস্তার করিবে, কোরিয়া অধিকার করিবে, ফরমোজা অধিকার করিবে, বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিবে, একতা, স্বাধীনতা, সাম্য, জাতীয় শিক্ষার চরম উন্নতি সাধিত করিবে। নেপোলিয়ন বলিতেন, আমার শব্দকোষে অসাধ্য কথা বাদ দিয়াছি। ইতো সেই কথা বলেন নাই, কিন্তু কার্য্যে তাহাই করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের কার্য্য অপেক্ষা ইতোর কার্য্য বড়। এইরূপ মহাপুরুষ হত্যাকারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন, ইহাতে কাহারও দুঃখ হইবার কারণ নাই। যিনি জাপানের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, জাপানই যাঁহার চিন্তা, জাপানই যাঁহার উপাস্য দেবতা, তিনি জাপানের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বড় সুখের কথা, সৌভাগ্যের কথা, গৌরবের কথা। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। হিরোবূমি ইতোর ভাগ্যে এই দুইটী পরম ফল এক জীবনবৃক্ষে পাওয়া গেল।

কোরিয়া ও জাপান

স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সমস্ত আসিয়াখণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া অপূর্ব্ব লীলা করিতেছে। অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তির পক্ষে কিছুই অসাধ্য, কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা যাহাকে অসাধ্য বলি, মহাশক্তির প্রেরণায়, মহাশক্তির অভ্রান্ত উপায়-প্রয়োগে তাহা সহজসাধ্য হয়। আমরা যাহাকে অসম্ভব বলি, মহাশক্তির ইচ্ছায় তাহা সম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী হয়। দুর্ব্বল পারস্য দুই প্রকাণ্ড আসুরিক শক্তির পেষণে পড়িয়াও সহসা উঠিয়াছে, অসংখ্য বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীর নিশ্চয় গতিতে বল সংগ্রহ করিতেছে। মুমূর্ষু তুর্ক কোথা হইতে সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া নূতন বলে বলীয়ান, নূতন যৌবনাবেগে প্রফুল্ল, য়ুরোপের বিস্ময় ও ভয়ের কারণ হইতেছে। প্রাচীন চীনের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র আপনি আগ্রহ করিয়া প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইতেছে। আরবিস্তানে, তুর্কিস্তানে, ভারতে, যে সকল আসিয়া-বাসী পরাধীন, সে সকল দেশে দেশে স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া দেশকে আলোড়িত করিতেছে। আফগানিস্তানেও অশান্তির প্রথম চিহ্ন দেখা দিয়াছে। একমাত্র ব্রহ্মদেশে ও শ্যামদেশে এই স্রোত এখনও বহিতে আরম্ভ করে নাই। সমস্ত আসিয়াখণ্ড জীবিত, জাগ্রত, স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লিপ্সু।

দুঃখের কথা, এই উত্থানের মধ্যেই আসিয়াবাসীতে আসিয়াবাসীতে বিরোধ উপস্থিত। তুর্কসাম্রাজ্যে যে অশান্তি বর্ত্তমান, তাহা সুলতান আবদুল হামিদের পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে নূতন প্রজাতন্ত্রকে ভোগ করিতে হইয়াছে; সেই প্রজাতন্ত্রের উদার, প্রতিভাশালী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিবিদ্ নেতাগণ যে এই অশান্তি শীঘ্র প্রশমিত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্ব আসিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সায় ও বাণিজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় যে বিরোধ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার নির্ব্বাণোপায় তত সহজ নহে। সম্প্রতি জাপানের প্রধান ও পূজ্যতম নেতা, নব্য জাপানের স্রষ্টা, পাতা ও বিস্তারকর্ত্তা হিরোবূমি ইতো পরাধীন কোরিয়াবাসীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে জাতি পরের স্বাধীনতায় হস্তার্পণ করে, সে যে মহাপাপ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সমস্ত আসিয়ার আবশ্যকীয় হিতকার্য্যের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় জাপান কোরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে এবং যতদিন তাহার আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, ততদিন কোরিয়ার সহস্র চেষ্টায় এই বন্ধন ঘুচিবে না। সেই উদ্দেশ্য রুশের হস্ত হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব আসিয়ার পরিত্রাণ। এই উদ্দেশ্য কোরিয়া দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, জাপানকেই ভগবান সেই উদ্দেশ্য সাধনের

উপযোগী শক্তি, সামর্থ্য, জনবল, ধনবল ও উপকরণ দিয়াছেন। অথচ কোরিয়াই উত্তর আসিয়ার কেল্লা — যে কোরিয়া অধিকার করিতে পারিবে, সে উত্তর আসিয়ার প্রভু হইয়া বিরাজ করিবে। রুশ যদি কোরিয়ায় প্রবেশ করে — রুশ-জাপানের যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশ প্রবেশ করিয়াছিল — জাপানের স্বাধীনতা দুই দিনও স্থায়ী হইবে না। এই অবস্থায় কোরিয়া অধিকার করা জাপানের আত্মরক্ষার আবশ্যক উপায়; ইহাকে পাপকার্য্য বলা যায় না। কেবল আত্মরক্ষা নহে, ইহা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট পুণ্যকার্য্যের আবশ্যক অঙ্গ। যতদিন সাইবীরিয়া আবার আসিয়াবাসীর করতলগত না হয়, যতদিন ক্রূর, অত্যাচারী ও পরস্বাপহারী রুশ-রাজ্য সেই প্রদেশে বিনষ্ট না হয়, ততদিন আসিয়াখণ্ডের স্বাধীনতা কখন নিরাপদ হইতে পারে না। সাইবীরিয়া জাপানের প্রাপ্য, জাপানই রুশকে সাইবীরিয়া হইতে হটাইতে পারে। কোরিয়া অধিকার না করিলে খারবিন ও ব্লাডিবস্তক অধিকার করা যায় না। অতএব ভগবানের ইচ্ছায় এবং তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোরিয়ায় জাপানীর আবির্ভাব হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য বিফল হইবার নহে। যতদিন ব্লডিবস্তক জাপানীর হস্তগত না হয়, ততদিন কোরিয়ার স্বাধীনতালিপ্সা ও চেষ্টা বিফল হইবে।

কিন্তু এই আবশ্যক কার্য্যে জাপানীরা অনাবশ্যক কঠোরতা ও অত্যাচার প্রয়োগ করিয়াছে — সে যে কতকটা কোরিয়াবাসীর দোষে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ কোরিয়াবাসীর নহে। নীচশ্রেণীর, নীচপ্রকৃতি জাপানীদের লোভ, জয়মত্ততা ও পাশবিক প্রবৃত্তি তাহার কারণ। যখন এই অত্যাচারে কোরিয়াবাসীর ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তখন জাপানের নেতা হিরোবূমি ইতো স্বয়ং কোরিয়ায় গিয়া এই কঠিন ও বিপজ্জনক মহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ব্যক্তিগত অত্যাচার বন্ধ করিলেন, কিন্তু স্বয়ং কোরিয়াবাসীর উপর আরও ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কোরিয়ার স্বতন্ত্র জীবন, স্বতন্ত্র শিক্ষা, স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রত্যেক চিহ্ন দৃঢ় নির্দ্দয় পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কোরিয়াকে জাপানের অন্তর্গত প্রদেশ করিয়া জাপানী শিক্ষা, জাপানী সভ্যতা, জাপানী আচার ব্যবহার, জাপানী কর্ম্মদক্ষতা, কর্ম্মপ্রণালী ও শৃঙ্খলা, জাপানী মন্ত্র, জাপানী তন্ত্র, কোরিয়াবাসীর মনে প্রাণে শরীরে অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ইতো সামান্য রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না, তাঁহার তুল্য মহাপুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। নেপোলিয়নের পরে তাঁহাকেই জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর বলা যায়। এইরূপ ব্যক্তি কেন এই-

রূপ নৃশংস উপায়ে এই কঠোর কার্য্য সমাধান করিবার চেষ্টা করিলেন? কতক পরিমাণে অতিরিক্ত দেশহিতৈষিতায় ও সাম্রাজ্যলিপ্সায়। ভগবানের বিভূতিও মানবশরীরে অবতরণ করিলে মানব স্বভাব নিজ নির্ম্মল বুদ্ধির উপর আরোপ করিয়া জগতের কার্য্য করেন। ইতো জাপানী, যেমন জাপানীর গুণ তেমনই জাপানীর দোষ তাঁহার শরীরে বিদ্যমান ছিল। কোরিয়া যদি চিরকাল জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জাপানের গৌরব ও বলবৃদ্ধি হইবে এবং উত্তর আসিয়ায় তাহার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক হইবে। কিন্তু আর এক কারণ নির্ণয় করা যায় — স্বকৃত পাপের ফলে কোরিয়াবাসীকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল। যখন বিজাতীয় বিদেশীয় বিধর্ম্মী রুশরাজ্য কোরিয়ায় তাহার সর্ব্বনাশী বিস্তার আরম্ভ করিল, তখন কোরিয়াবাসীর স্বাধীনতালিপ্সা জাগে নাই, তাহারা স্বাধীনতানাশের ভয়ে আশঙ্কিত হয় নাই, বরং চীনের বিদ্বেষে, জাপানের বিদ্বেষে রুশের সহিত সন্ধি ও সখ্যস্থাপন পূর্ব্বক নিজের বিনাশ, জাপানের বিনাশ, চীনের বিনাশ, সমস্ত আসিয়াখণ্ডের স্বাধীনতার বিনাশে জানিয়া বুঝিয়া সাহায্য করিতেছিল। এই পাপ সামান্য পাপ নহে; কতকাল কোরিয়াকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভুগিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার যখন জাপান আসিয়ার রক্ষক ও পরিত্রাতা হইয়া কোরিয়ায় অবতরণ করিল, রুশকে উত্তর আসিয়ার কেল্লা হইতে অল্পদিনে বিদূরিত করিল, কোরিয়াবাসী তাহার শ্বেতবর্ণ বন্ধুর দুঃখে দুঃখী হইয়া জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করিল। শেষে যখন জাপানের অত্যাচারে অধীর হইল, তখনও স্বীয় মনুষ্যত্ব বলে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া প্রথম রুশের সহিত ষড়যন্ত্র, পরে তাহাতেও বিফলমনোরথ হইয়া য়ুরোপের দ্বারে কাঁদিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশে প্রতিনিধি পাঠাইল। কি আশ্চর্য্য প্রভেদ! শত্রুনিপীড়িত হইয়া জাপান ও চীন যখন য়ুরোপে প্রতিনিধিসঙ্ঘ (Commission) পাঠাইল, সে কি উদ্দেশ্যে গেল? শত্রুর মধ্যে কি বিদ্যা, কি গুণ, কি প্রণালী ও শৃঙ্খলা আছে যাহার দ্বারা তাহারা অজেয় ও দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমশালী হইয়াছে, তাহা জানিয়া স্বদেশে সেই বিদ্যা, গুণ, প্রণালী ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা ও শত্রুর বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই প্রতিনিধিসঙ্ঘ পাঠাইবার উদ্দেশ্য। আর সেই অবস্থায় কোরিয়াবাসীর প্রতিনিধিসঙ্ঘ কেন য়ুরোপে ছুটিল? অর্থলোলুপ, পরদেশলোলুপ পাশ্চাত্য জাতির নিকট কাঁদিয়া তাহাদিগকে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য সেই ভিক্ষুকযাত্রার উদ্দেশ্য। মূর্খও জানে যে কৃতকার্য্য হইলে জাপানের সর্ব্বনাশ হইত, কিন্তু কোরিয়ার স্বাধীনতালাভ হইত না। এই

নীচতা, এই বারবার মহাপাতক আচরণের ফলে কোরিয়াবাসী এখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইতেছে। হিরোবূমি ইতো দেখিলেন যে কোরিয়াবাসী জাপানী হইতে স্বতন্ত্র থাকিলে এই দুর্ব্বলের স্বাধীনতা-চেষ্টায় একদিন পাশ্চাত্য শত্রু জাপানের, আসিয়াখণ্ডের বিনাশ করিবার সুবিধালাভ করিবেনই, পলাশীর কাণ্ড পূর্ব্ব আসিয়ায় পুনরভিনীত হইবে, সেই জন্য কোরিয়ার স্বাতন্ত্র্য বিনাশ করা আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। একবার কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম্মবীর আর নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে টলেন না। ইতো তাঁহার সমস্ত শক্তি, প্রতিভা, বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া নীরব নিষ্পেষণ দ্বারা কোরিয়ার স্বাতন্ত্র্যবিনাশে নিযুক্ত হইলেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবেই। আবার পাপের মধ্যে দুই পাপ বিশেষ ঘৃণ্য ও অমার্জ্জনীয়, ক্রূরতা ও নীচতা। জাপানের ক্রূরতার ফলে নব্য জাপানের নির্ম্মাতা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ইতো হত্যাকারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। কোরিয়ার নীচতায় তাহার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। এই হত্যায় কোরিয়ার স্বাধীনতা লাভের কোনও সুবিধা হইবে না। জাপানী মৃত্যুভয় জানে না, দৃঢ়ভাবে ইতোর রাজনীতি শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিবে। কোরিয়ার স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইবে। ভারতবাসীর পক্ষে কোরিয়ার পরিণামে এক আবশ্যক শিক্ষালাভ হয়। যে পাতকে কোরিয়া বিনাশোন্মুখ হইয়াছে, আমরা সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই পাপ করিয়া আসিতেছি, তাহার ফলও ভুগিতেছি। অথচ এখনও জ্ঞানোদয় হয় নাই। পরের উপর নির্ভর করিলে কোনও জাতির কল্যাণ হইতে পারে না, ভ্রাতৃবিরোধে পরের আশ্রয় গ্রহণে নিজের বিনাশ, ভ্রাতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই নিয়মই জাতীয়তার প্রথম নিয়ম যে স্ববলে বলীয়ান্ হওয়া আবশ্যক। ভিতরের বিরোধ ভিতরেই সমাধা করিব, যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, নরমপন্থী হউক, চরমপন্থী হউক, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবেই।

দেশ ও জাতীয়তা

দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধৰ্ম্ম নহে, আর-কিছুই নহে, কেবল দেশ। আর-সকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও উপকারী, দেশই মুখ্য ও আবশ্যক। অনেক পরস্পরবিরোধী জাতি এক দেশে নিবাস করে, কখনও সদ্ভাব, একতা, মৈত্রী ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যখন এক দেশ, এক মা — একদিন একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান অজেয় জাতিই হইবে। ধৰ্ম্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চিরবিরোধ, মিল নাই, মিলের আশাও নাই, তথাপি ভয় নাই, একদিন স্বদেশমূর্ত্তিধারিণী মায়ের প্রবল টানে ছলে বলে, সামে দণ্ডে দানে মিল হইবেই হইবে, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ভ্রাতৃভাবে মাতৃপ্রেমে ডুবিয়া যাইবে। এক দেশে নানা ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতিকষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই; এক দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে, প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবেই হইবে, হয় বৰ্ত্তমান একটী ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নতুন ভাষার সৃষ্টি হইবে, মায়ের মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে। এই সকল বাধায় চিরকাল আটকায় না, মায়ের প্রয়োজন, মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা বিফল হয় না, তাহা সকল বাধা সকল বিরোধ অতিক্রম করে, বিনষ্ট করে, জয়ী হয়। এক মায়ের গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস করি, এক মায়ের পঞ্চভূতে মিশিয়া যাই, আন্তরিক সহস্র বিবাদ সত্ত্বেও মায়ের ডাকে মিলিত হইব। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, সৰ্ব্ব দেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই, দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অব্যর্থ, স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই। অপর পক্ষে এক দেশ যদি না থাকে, জাতি, ধৰ্ম্ম, ভাষা এক হউক, তাহাতে কোনও ফল নাই, একদিন স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইবেই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ সংযুক্ত করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য করা যায়, এক বৃহৎ জাতি হয় না। সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আবার স্বতন্ত্র জাতি হয়, অনেকবার সেই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতাই সাম্রাজ্যনাশের কারণ হয়।

কিন্তু এই ফল অবশ্যম্ভাবী হইলেও মানুষের চেষ্টায়, মানুষের বুদ্ধিতে বা বুদ্ধির অভাবে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক ক্রিয়া সত্বরে বা বিলম্বে ফলবতী হয়।

আমাদের দেশে কখনও একতা হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার দিকে টান ছিল, স্রোত ছিল, আমাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ এক করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক চেষ্টার কয়েকটী প্রধান অন্তরায় ছিল, প্রথম প্রাদেশিক বিভিন্নতা, দ্বিতীয় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, তৃতীয় মাতৃদর্শনের অভাব। দেশের বৃহৎ আকার, যাতায়াতের আয়াস ও বিলম্ব, ভাষার বিভিন্নতা প্রাদেশিক অনৈক্যের মুখ্য সহায়। শেষোক্ত অন্তরায় ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সুবিধা দ্বারা আর-সকল অন্তরায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সত্ত্বেও আকবর ভারতকে এক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঔরংজেব নিকৃষ্ট রাজনীতিক বুদ্ধির বশ না হইলে কালের মাহাত্ম্যে, অভ্যাসের বশে, বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে, যেমন ইংলণ্ডে কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট, তেমনই ভারতে হিন্দু ও মুসলমান চিরকালের জন্য এক হইয়া যাইত। তাঁহার বুদ্ধির দোষে বর্ত্তমান কূটবুদ্ধি কয়েকজন ইংরাজ রাজনীতিবিদের প্ররোচনায় সেই বিরোধ প্রজ্বলিত হইয়া আর নির্ব্বাপিত হইতে চায় না। কিন্তু প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আমাদের রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা গুরুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। শিবাজী ও বাজীরাও ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুর মাতা দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিবিদ্ মহারাষ্ট্র-মাতা দেখিয়াছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম — সেই দর্শন অখণ্ডদর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ডমূর্ত্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে যে ভারতমাতার পূজা নানারূপ স্তবস্তোত্রে করিতাম, সে কল্পিত, ইংরাজের সহচরী ও প্রিয় দাসী, ম্লেচ্ছ বেশভূষাসজ্জিত দানবী মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা নিবিড় অস্পষ্ট আলোকে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেন। যেদিন অখণ্ডস্বরূপ পূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিব, তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব, সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। ভাষার ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও সাধারণ ভাষা-রূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া সেই অন্তরায় বিনষ্ট করিব।* হিন্দুমুসলমান-ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ভাবন করিতে পারিব। মাতৃদর্শনের অভাবে সেই

* পরবর্ত্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণ ভাষারূপে হিন্দীর স্থানে সংস্কৃত ভাষার কথা বলেন। — স

অন্তরায়নাশের বলবতী ইচ্ছা নাই বলিয়া উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অখণ্ডস্বরূপ চাই, যদি হিন্দুর মাতা, হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন ভ্রমে পতিত হইয়া জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশে বঞ্চিত হইব।

আমাদের আশা

আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, রাজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত য়ুরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধন করিতে প্রয়াসী হই? পণ্ডিত ও বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন, ইহা বালকের উদ্দাম দুরাশা, উচ্চ আদর্শের মদে উন্মত্ত অবিবেকী লোকের শূন্য স্বপ্ন, যুদ্ধই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পন্থা, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। স্বীকার করিলাম, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না। কিন্তু ইহা কি সত্যকথা যে বাহুবলই শক্তির আধার, না শক্তি আরও গূঢ়, গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়? সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য যে কেবলমাত্র বাহুবলে কোন বিরাট কার্য্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। যদি দুই পরস্পরবিরোধী সমান বলশালী শক্তির সংঘর্ষ হয়, যাহার নৈতিক ও মানসিক বল অধিক, যাহার ঐক্য, সাহস, অধ্যবসায়, উৎসাহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, স্বার্থত্যাগ উৎকৃষ্ট, যাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দূরদর্শিতা, উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি বিকশিত, তাহারই জয় নিশ্চয় হইবে। এমন কি বাহুবলে, সংখ্যায়, উপকরণে যে অপেক্ষাকৃত হীন, সে-ও নৈতিক ও মানসিক বলের উৎকর্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। তবে বলিতে পার যে, বাহুবল অপেক্ষা নৈতিক ও মানসিক বলের গুরুত্ব আছে, কিন্তু বাহুবল না থাকিলে নৈতিক বল ও মানসিক বলকে কে রক্ষা করিবে? যথার্থ কথা। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে দুই চিন্তাপ্রণালী, দুই সম্প্রদায়, দুই পরস্পরবিরোধী সভ্যতার সংঘর্ষে যে-পক্ষের দিকে বাহুবল, রাজশক্তি, যুদ্ধের উপকরণ প্রভৃতি উপায় পূর্ণমাত্রায় ছিল, তাহার পরাজয় হইয়াছে, যে-পক্ষের দিকে এই সকল উপায় আদবে ছিল না, তাহার জয় হইয়াছে। এই ফলের বৈপরীত্য কেন হয়? যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ, কিন্তু ধর্ম্মের পিছনে শক্তি চাই, নচেৎ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের গ্লানি স্থায়ী থাকিবার কথা। বিনা কারণে কার্য্য হয় না। জয়ের কারণ শক্তি। কোন্ শক্তিতে দুর্ব্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল পক্ষের শক্তি পরাজিত বা বিনষ্ট হয়? আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসকল পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিই বাহুবলকে তুচ্ছ করিয়া মানবজাতিকে জানায় যে এই জগৎ ভগবানের রাজ্য, অন্ধ স্থূলপ্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নহে। শুদ্ধ আত্মা শক্তির উৎস, যে আদ্যাপ্রকৃতি গগনে অযুত সূর্য্য

ঘুরাইতে থাকে, অঙ্গুলিস্পর্শে পৃথিবী দোলাইয়া মানবের সৃষ্ট পূর্ব্বগৌরবের চিহ্নসকল ধ্বংস করে, সেই আদ্যাপ্রকৃতি শুদ্ধ আত্মার অধীন। সেই প্রকৃতি অসম্ভবকে সম্ভব করে, মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি দেয়। সমস্ত জগৎ সেই শক্তির সৃষ্টি। যাহার আধ্যাত্মিক বল বিকশিত তাহার জয়ের উপকরণ আপনিই সৃষ্ট হয়, বাধাবিপত্তি আপনি সরিয়া গিয়া অনুকূল অবস্থা আনায়, কার্য্য করিবার ক্ষমতা আপনিই ফুটিয়া তেজস্বিনী ও ক্ষিপ্রগতি হয়। য়ুরোপ আজকাল এই soul-force বা আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবিষ্কার করিতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তাহার ভরসায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। যতবার ভারতজাতির বিনাশকাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত উৎস হইতে উগ্রস্রোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও সৃজন করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।

কিন্তু স্থূলজগতের সকল শক্তির বিকাশ সময়সাপেক্ষ, অবস্থার উপযুক্ত ক্রমে সমুদ্রের ভাটা ও জোয়ারের ন্যায় কমিয়া-বাড়িয়া শেষে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয়। আমাদের মধ্যেও তাহাই হইতেছে। এখন সম্পূর্ণ ভাটা, জোয়ারের মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় রহিয়াছি। মহাপুরুষদের তপস্যা, স্বার্থত্যাগীর কষ্টস্বীকার, সাহসীর আত্মবিসর্জ্জন, যোগীর যোগশক্তি, জ্ঞানীর জ্ঞানসঞ্চার, সাধুর শুদ্ধতা, আধ্যাত্মিক বলের উৎস। একবার এই নানাবিধ পুণ্য ভারতকে সঞ্জীবনী সুধায় ভাসাইয়া মৃত জাতিকে জীবিত, বলিষ্ঠ, তেজস্বী করিয়া তুলিয়াছিল, আবার সেই তপোবল নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া অদম্য, অজেয় হইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছে। কয়েক বৎসরের নিপীড়ন, দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিতেছে। বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভাসমিতির ভাবসঞ্চারিণী শক্তি নহে, সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলিত অভ্রান্ত শুদ্ধ সুখদুঃখজয়ী পাপপুণ্যবর্জ্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই মহাসৃষ্টিকারিণী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই সহস্র তেজের সংযোজনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবে। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার

শক্তিপ্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার। আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, সভাসমিতির বলে, বক্তৃতার জোরে, বাহুবলে, স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্যভাবযুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্মুখী শক্তিকে অন্তর্মুখী করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন, শক্তিকে অন্তর্মুখী কর, কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে। যখন আবার বহির্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।

আমাদের নিরাশা

সেইদিন আমাদের আশা কি, তাহা লিখিয়াছিলাম; আজ আমাদের নিরাশার কথা লিখিতে হইল। আমাদের আশা, ভগবানের কৃপায়, আধ্যাত্মিক বলের বৃদ্ধিতে আমরা বলবান, তেজীয়ান, সহায়বান হইয়া জাতীয় উৎকর্ষ, স্বাধীনতা, মহত্ত্ব লাভ করিব। আমাদের নিরাশা, যে পন্থা ও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম তাহার সাম্প্রত ফলবত্তা সম্বন্ধে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, বৈধ ও নির্দ্দোষ উপায় অবলম্বন করিয়া, সাহস, দৃঢ়তা, শান্ততার সহিত জাতীয় আন্দোলন আবার জাগাইয়া ও সুপথে চালাইয়া আমরা দুই অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব। প্রথম, লোকের মনে বৈধ উপায়ের শ্রেষ্ঠতায় ও ফলবত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া এখন যে গুপ্তহত্যা ও বলপ্রয়োগের দিকে যুবকদের মনের আকর্ষণ হইতেছে, তাহা বন্ধ করিতে পারিব। দ্বিতীয়ত, রাজপুরুষগণকে বৈধ প্রতিরোধের বলে সভ্য উপায়ে দুই জাতির হিতের সংঘর্ষজনিত যুদ্ধ চালাইবার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেশের উন্নতি সাধন করিব এবং দেশের স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে আদায় করিব। আমাদের এখনও বিশ্বাস যে এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে দুইটাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সেই উপায় অবলম্বন করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

প্রথম অন্তরায়, লোকের অনাস্থা ও উৎসাহের অভাব। বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিব, প্রৌঢ়লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে, — মধ্যপন্থীর অনুমোদিত উপায়ের উপর হইতে সকলের আস্থা উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও কি হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে দিবেন না। তাহাদের হাতে যখন আইন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস তাঁহাদেরই চাকর, দেশবাসীর প্রভু, তখন কোনও বৈধ আন্দোলন করা অসম্ভব। আমরা দেখিয়াছি, এই মতের এত প্রাবল্য হইতেছে যে বৈধ আন্দোলন ও বৈধ প্রতিরোধ আর চলে না। লোকের আস্থা নাই, শ্রদ্ধা নাই, — শ্রদ্ধারহিত কর্ম্ম বৃথা, তাহার ফল 'ন চৈবামুত্র নো ইহ'। বৈধ আন্দোলনের পক্ষে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, নচেৎ আন্দোলন হইতে পারে না। সভাসমিতির স্বাধীন অধিকার চাই, তাহা সভা বন্ধ আইনের ঘোষণায় অপহৃত হইয়াছে, — সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার চাই, তাহা নূতন রাজদ্রোহ আইনে সত্বর অপহৃত হইবে — স্থায়ী সভা সংঘটনে ও সেই সভার কর্ম্মতৎপরতায় স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠার অধিকার চাই, তাহা বিনা কারণে

সভা-সমিতি বন্ধ করিবার আইন থাকায় অপহৃত হইয়াছে। রহিল কি? মনে মনে স্বাধীন চিন্তা পোষণ করাও বিপজ্জনক, কেননা বিনা কারণে খানাতল্লাসী, অমূলক সন্দেহে গ্রেপ্তার এবং বিনা অভিযোগে নির্ব্বাসন, প্রত্যেক স্বাধীনতা লিপ্সুর পথে এই তিন বিপদ সর্ব্বদা গ্রাস করিতে উদ্যত। এই অবস্থায় আন্দোলন করা এক প্রকার আইনে নিষিদ্ধ। নির্জ্জীব আন্দোলন নিরর্থক, সজীব আন্দোলন অবৈধ। কাজেই লোকে আর আন্দোলন করিতে অনিচ্ছুক।

দ্বিতীয় অন্তরায়, বিপ্লবকারীর অদমনীয় উদ্দাম চেষ্টা। যাহাতে আমরা দমিয়া যাই, তাহাতে বিপ্লবকারীর তেজ ও উৎসাহ জাগিয়া উঠে। যত নিপীড়ন কর সে তত হত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ছুটিয়া আসে। আশু বিশ্বাসের হত্যার পরে সেই অশান্তি প্রায় নিবিয়া গিয়াছিল। নূতন চীফ জষ্টিসের সুবিচারে, রিফর্ম্মের কোলাহলে, হুগলীতে জাতীয় পক্ষের পুনরুত্থানে লোকের মনে আশা উৎপন্ন হইয়াছিল যে আবার বুঝি বৈধভাবে জাতীয় জাগরণকে উদ্দেশ্যের দিকে চালাইবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। সেই আশার আলোক নিবিড়তর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। এদিকে রাজনীতিক ডাকাইতির জন্য দেশময় ধরপাকড় ও খানাতল্লাসীতে বিপ্লবকারীদের তেজ ও আশা উদ্দীপিত হইয়াছে। নাসিকে খুন, পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়েতে গুলি চালান, হাইকোর্টে সামসুল আলমের হত্যা, এইরূপে দিন দিন নূতন ঘটনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার শেষ কোথায়? প্রথম ফল, রাজপুরুষগণ সমস্ত দেশের উপর চটিয়াছেন, আন্দোলনের অবশিষ্ট ক্ষীণ বহ্নিটুকু নিবাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নিগ্রহের বৃদ্ধিতে গুপ্তহত্যার বৃদ্ধি, গুপ্তহত্যার বৃদ্ধিতে নিগ্রহের বৃদ্ধি, এইরূপ ক্রমের শেষ কোথায়? রাজপুরুষদের বিবেচনারহিত ক্রোধ, বিপ্লবকারীর বিবেচনারহিত উন্মত্ততা, এই দুই শক্তির সংঘর্ষে, নিষ্পেষণে পড়িয়া আমাদের আন্দোলন মরিয়া যাইতেছে।

এ অবস্থায় করিব কি? যখন গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা যে আমরা চুপ করিয়া থাকি, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি, যখন দেশবাসী আর রব করিতে চায় না, চেষ্টা করিতে চায় না, তখন নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়ঃ। ইংরাজ বলে জাতীয় পক্ষের সংবাদপত্র ও বক্তাই দায়ী, তাঁহাদিগকে যদি থামাইতে পারি, বিপ্লবকারীর চেষ্টা আপনি থামিয়া যাইবে। তবে তাহাই হউক। আমরা থামিয়া গেলাম, নীরব, নিশ্চেষ্ট হইলাম, দেখি তোমাদের অভিযোগ সত্য না মিথ্যা। রাজনীতি চর্চ্চা কয়েকদিন পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি, ভারতের চিন্তার গভীরতা কর্ম্মক্ষেত্রে আনাইবার চেষ্টা করি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমাদের দেশে ও য়ুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের জীবন অন্তর্ম্মুখী, য়ুরোপের জীবন বহির্ম্মুখী। আমরা ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করি, য়ুরোপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করে। আমরা ভগবানকে অন্তর্যামী ও আত্মস্থ বুঝিয়া অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, য়ুরোপ ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাঁহাকে দেখে ও উপাসনা করে। য়ুরোপের স্বর্গ স্থূলজগতে, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, ভোগ-বিলাস তাঁহাদের আদরণীয় ও মৃগ্য; যদি অন্য স্বর্গ কল্পনা করেন, তাহা এই পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ভোগ-বিলাসের প্রতিকৃতি, তাঁহাদের ভগবান আমাদের ইন্দ্রের সমান, পার্থিব রাজার ন্যায় রত্নময় সিংহাসনে আসীন হইয়া সহস্র বন্দনাকারী দ্বারা স্তবস্তুতিতে স্ফীত হইয়া বিশ্বসাম্রাজ্য চালান। আমাদের শিব পরমেশ্বর, অথচ ভিক্ষুক, পাগল, ভোলানাথ, আমাদের কৃষ্ণ বালক, হাস্যপ্রিয়, রঙ্গময়, প্রেমময়, ক্রীড়া করা তাঁহার ধর্ম্ম। য়ুরোপের ভগবান কখন হাসেন না, ক্রীড়া করেন না, তাহাতে তাঁহার গৌরব নষ্ট হয়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর থাকে না। সেই বহির্ম্মুখী ভাব ইহার কারণ — ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা, চিহ্ন না দেখিলে তাঁহারা জিনিষটী দেখিতে পান না, তাঁহাদের দিব্যচক্ষু নাই, সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই, সবই স্থূল। আমাদের শিব ভিক্ষুক, কিন্তু ত্রিলোকের সমস্ত ধন ও ঐশ্বর্য্য অল্পেতে সাধককে দান করেন ভোলানাথ, কিন্তু জ্ঞানীর অপ্রাপ্য জ্ঞান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সম্পত্তি। আমাদের প্রেমময় রঙ্গপ্রিয় শ্যামসুন্দর কুরুক্ষেত্রের নায়ক, জগতের পাতা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সখা ও সুহৃদ। ভারতের বিরাট জ্ঞান, তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মদৃষ্টি, অপ্রতিহত দিব্যচক্ষু স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া আত্মস্থ ভাব, আসল সত্য, অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব বাহির করিয়া আনে।

*

পাপপুণ্য সম্বন্ধেও সেই ক্রম লক্ষিত হয়। আমরা অন্তরের ভাব দেখি। নিন্দিত কর্ম্মের মধ্যে পবিত্র ভাব, বাহ্যিক পুণ্যের মধ্যে পাপিষ্ঠের স্বার্থ লুক্কায়িত থাকিতে পারে; পাপপুণ্য, সুখদুঃখ মনের ধর্ম্ম, কর্ম্ম আবরণ মাত্র। আমরা ইহা জানি; সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্য আমরা বাহ্যিক পাপপুণ্যকে কর্ম্মের প্রমাণ

বলিয়া মান্য করি, কিন্তু অন্তরের ভাবই আমাদের আদরণীয়। যে সন্ন্যাসী আচার-বিচার, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, পাপপুণ্যের অতীত, মদোন্নত্ত-পিশাচবৎ আচরণ করেন, সেই সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী পুরুষকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলি। পাশ্চাত্য বুদ্ধি এই তত্ত্বগ্রহণে অসমর্থ; যে জড়বৎ আচরণ করে, তাহাকে জড় বুঝে, যে উন্মত্তবৎ আচরণ করে, তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বুঝে, যে পিশাচবৎ আচরণ করে, তাহাকে ঘৃণ্য অনাচারী পিশাচ বুঝে; কেননা সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই, তাহারা অন্তরের ভাব দেখিতে অসমর্থ।

*

সেইরূপ বাহ্যদৃষ্টিপরবশ হইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতে প্রজা-তন্ত্র কোনও যুগে ছিল না। প্রজাতন্ত্রসূচক কোনও কথা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, আধুনিক পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় কোন আইন-ব্যবস্থাপক সভাও ছিল না, প্রজাতন্ত্রের বাহ্যচিহ্নের অভাবে প্রজাতন্ত্রের অভাব প্রতিপন্ন হয়। আমরাও এই পাশ্চাত্য যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রাচীন আর্য্যরাজ্যে প্রজাতন্ত্রের অভাব ছিল না; প্রজাতন্ত্রের বাহ্যিক উপকরণ অসম্পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ভাব আমাদের সমস্ত সমাজ ও শাসনতন্ত্রের অন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রজার সুখ ও দেশের উন্নতি রক্ষা করিত। প্রথমতঃ, প্রত্যেক গ্রামে সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র ছিল, গ্রামের লোক সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের পরামর্শে বৃদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় পুরুষদের অধীনে গ্রামের ব্যবস্থা, সমাজের ব্যবস্থা করিতেন; এই গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র মুসলমানদের আমলে অক্ষুণ্ণ রহিল, বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নিষ্পেষণে সেইদিন নষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও, যেখানে সর্ব্বসাধারণকে সম্মিলিত করিবার সুবিধা ছিল, সেইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল; বৌদ্ধ সাহিত্যে, গ্রীক ইতিহাসে, মহাভারতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, বড় বড় রাজ্যে, যেখানে এইরূপ বাহ্যিক উপকরণ থাকা অসম্ভব, প্রজাতন্ত্রের ভাব রাজ-তন্ত্রকে পরিচালিত করিত। প্রজার আইন-ব্যবস্থাপক সভা ছিল না, কিন্তু রাজারও আইন করিবার বা প্রবর্ত্তিত আইন পরিবর্ত্তন করিবার লেশমাত্র অধিকার ছিল না। প্রজারা যে আচারব্যবহার রীতিনীতি আইনকানুন মানিয়া আসিতেছিল, তাহার রক্ষাকর্ত্তা রাজা। ব্রাহ্মণগণ আধুনিক উকিল ও জজদের ন্যায় সেই প্রজা-অনুষ্ঠিত নিয়মসকল রাজাকে বুঝাইতেন, সংশয়স্থলে নির্ণয় করিতেন, ক্রমে ক্রমে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেন, তাহা লিখিতশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন। শাসনের ভার

রাজারই ছিল, কিন্তু সেই ক্ষমতাও আইনের কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ; তাহা ভিন্ন রাজা প্রজার অনুমোদিত কার্য্যই করিবেন, প্রজার অসন্তোষ যাহাতে হয়, তাহা কখন করিবেন না, এই রাজনীতিক নিয়ম সকলেই মানিয়া চলিত। রাজা তাহার ব্যতিক্রম করিলে, প্রজারা আর রাজাকে মান্য করিতে বাধ্য ছিল না।

*

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধর্ম্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। প্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ্য অঙ্গ। বহির্জ্জগৎ অন্তর্জ্জগতে প্রতিষ্ঠিত, অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ভাব ও শ্রদ্ধা শক্তি ও কর্ম্মের উৎস, ভাব ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তিপ্রয়োগে ও কর্ম্মের বাহ্যিক আকারে ও উপকরণে আসক্ত হইতে নাই। পাশ্চাত্যেরা প্রজাতন্ত্রের বাহ্যিক আকার ও উপকরণ লইয়া ব্যস্ত। ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য বাহ্যিক আকার ও উপকরণ; ভাব আকারকে গঠন করে, শ্রদ্ধা উপকরণ সৃজন করে। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা আকারে ও উপকরণে এমন আসক্ত যে, সেই বহিঃপ্রকাশের মধ্যে ভাব ও শ্রদ্ধা মরিয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। আজকাল প্রাচ্য দেশে প্রজাতন্ত্রের ভাব ও শ্রদ্ধা প্রবলবেগে পরিস্ফুট হইয়া বাহ্য উপকরণ সৃজন করিতেছে, বাহ্য আকার গঠন করিতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সেই ভাব ম্লান হইতেছে, সেই শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইতেছে। প্রাচ্য প্রভাতোন্মুখ, আলোকের দিকে ধাবিত — পাশ্চাত্য তিমিরগামী রাত্রির দিকে ফিরিয়া যাইতেছে।

*

ইহার কারণ, সেই বাহ্য আকার ও উপকরণে আসক্তির ফলে প্রজাতন্ত্রের দুষ্পরিণাম। প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুকূল শাসনতন্ত্র সৃজন করিয়া আমেরিকা এতদিন গর্ব্ব করিতেছিল যে আমেরিকার তুল্য স্বাধীন দেশ জগতে আর নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেণ্ট ও কর্ম্মচারীগণ কংগ্রেসের সাহায্যে স্বেচ্ছায় শাসন করেন, ধনীর অন্যায়, অবিচার ও সর্ব্বগ্রাসী লোভকে আশ্রয় দেন, নিজেরাও ক্ষমতার অপব্যবহারে ধনী হন। একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময়ে প্রজারা স্বাধীন,

তখনও ধনীসকল প্রচুর অর্থব্যয়ে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন, পরেও প্রজার প্রতিনিধিগণকে কিনিয়া স্বেচ্ছায় অর্থশোষণ করেন, আধিপত্য করেন। ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্মভূমি, কিন্তু যে কর্ম্মচারীবর্গ ও পুলিস প্রজার ইচ্ছায় প্রত্যেক শাসনকার্য্য চালাইবার যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা এখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাচারী রাজা হইয়া বসিয়াছে, প্রজারা তাহাদের ভয়ে কাতর। ইংলণ্ডে এইরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য বিপদ পরিস্ফুট হইতেছে। চঞ্চলমতি অর্দ্ধশিক্ষিত প্রজার প্রত্যেক মতপরিবর্ত্তনে শাসনকার্য্য ও রাজনীতি আলোড়িত হয় বলিয়া বৃটিশজাতি পুরাতন রাজনীতিক কুশলতা হারাইয়া বাহিরে অন্তরে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তব্যজ্ঞানরহিত, নিজ স্বার্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য নির্ব্বাচকবর্গকে প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, ভুল বুঝাইয়া বৃটিশজাতির বুদ্ধি বিকৃত করিতেছেন, মতির অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যবর্দ্ধন করিতেছেন। এই সকল কারণবশতঃ একদিকে প্রজাতন্ত্রবাদ ভ্রান্ত বলিয়া একদল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে আনার্কিষ্ট, সোশালিষ্ট, বিপ্লবকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ ইংলণ্ডে চলিতেছে — রাজনীতিক্ষেত্রে; আমেরিকায় — শ্রমজীবী ও লক্ষপতির বিরোধে; জর্ম্মণীতে — মত-সংগঠনে; ফ্রান্সে — সৈন্যে ও নৌ-সৈন্যে; রুশে — পুলিস ও হত্যাকারীর সংগ্রামে — সর্ব্বত্র গণ্ডগোল, চঞ্চলতা, অশান্তি।

*

বহির্ম্মুখী দৃষ্টির এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। কয়েকদিন রাজসিক তেজে তেজস্বী হইয়া অসুর মহান্ শ্রীসম্পন্ন, অজেয় হয়, তাহার পরে অন্তর্নিহিত দোষ বাহির হয়, সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সজ্ঞান কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম যে দেশে শিক্ষার মূলমন্ত্র, সেই দেশেই অন্তর ও বাহির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা কার্য্যতঃ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সেই মীমাংসা করিতে পারিব না। প্রাচ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পাশ্চাত্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্তরে প্রতিষ্ঠা, বাহিরে প্রকাশ। ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত হইব, নিজ স্বভাব ও প্রাচ্যবুদ্ধির উপযুক্ত উপকরণ সৃজন করিতে হইবে।

ভ্রাতৃত্ব

আধুনিক সভ্যতার যে তিন আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ এই তিন তত্ত্ব — স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে fraternity বলে, তাহা মৈত্রী নহে। মৈত্রী মনের ভাব; যে সর্ব্বভূতের কল্যাণেচ্ছা করে, কাহারও অনিষ্ট করে না, সেই দয়াবান, অহিংসাপরায়ণ, সর্ব্বভূতহিতরত পুরুষকে "মিত্র" বলে, মৈত্রী তাহার মনের ভাব। এইরূপ ভাব ব্যক্তির মানসিক সম্পত্তি, — ব্যক্তির জীবন ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; এই ভাব রাজনীতিক বা সামাজিক শৃঙ্খলার মুখ্য বন্ধন হওয়া অসম্ভব। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের তিন তত্ত্ব ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক নিয়ম নহে, সমাজ ও দেশের ব্যবস্থার নবগঠনোপযোগী সূত্রত্রয়, সমাজের, দেশের বাহ্য অবস্থিতিতে প্রকাশোন্মুখ প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব। fraternityর অর্থ ভ্রাতৃত্ব।

ফরাসী বিপ্লবকারীগণ রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন, ভ্রাতৃত্বের উপর তাঁহাদের দৃঢ়লক্ষ্য ছিল না, ভ্রাতৃত্বের অভাব ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অসম্পূর্ণতার কারণ। সেই অপূর্ব্ব উত্থানে রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজনীতিক সাম্যও কতক পরিমাণে কয়েক দেশে শাসনতন্ত্র ও আইনপদ্ধতিকে অধিকার করে। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের অভাবে সামাজিক সাম্য অসম্ভব, ভ্রাতৃত্বের অভাবে য়ুরোপ সামাজিক সাম্যে বঞ্চিত হয়। এই তিন মূলতত্ত্বের পূর্ণবিকাশ পরস্পরের বিকাশের উপর নির্ভর করে; সাম্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সাম্যের অবর্ত্তমানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃত্ব সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্বের অবর্ত্তমানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃভাব থাকিলে ভ্রাতৃত্ব। য়ুরোপে ভ্রাতৃভাব নাই, য়ুরোপে সাম্য ও স্বাধীনতা কলুষিত, অপ্রতিষ্ঠিত, অসম্পূর্ণ — এইজন্য য়ুরোপে গণ্ডগোল ও বিপ্লব নিত্য অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গণ্ডগোল ও বিপ্লবকে য়ুরোপ সগর্ব্বে progress বা উন্নতি বলে।

য়ুরোপের যেটুকু ভ্রাতৃভাব, তাহা দেশ লইয়া — একদেশের লোক, হিতাহিত এক, একতায় জাতীয় স্বাধীনতা নিরাপদ থাকে — এই জ্ঞান য়ুরোপের একত্বের হেতু। তাহার বিরুদ্ধে আর-একটী জ্ঞান দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে এই — আমরা সকলে মানুষ, মানুষ সকলে এক হওয়া উচিত, মানুষে মানুষে ভেদ অজ্ঞানপ্রসূত, অনিষ্টকর; জাতীয়তা ভেদের কারণ, জাতীয়তা অজ্ঞানপ্রসূত, অনিষ্টকারক, অতএব

জাতীয়তাকে বর্জ্জন করিয়া মনুষ্যজাতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করি। বিশেষতঃ যে ফ্রান্সে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বরূপ মহান্ আদর্শ প্রথম প্রচারিত হয়, সেই ভাবপ্রবণ দেশে এই দুই পরস্পরবিরোধী জ্ঞানের সংঘর্ষ চলিতেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই দুই জ্ঞান ও ভাব পরস্পরবিরোধী নহে। জাতীয়তাও সত্য, মানবজাতির একতাও সত্য, দুই সত্যের সামঞ্জস্যেই মানবজাতির কল্যাণ; যদি আমাদের বুদ্ধি এই সামঞ্জস্যে অসমর্থ হয়, অবিরোধী তত্ত্বের বিরোধে আসক্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে ভ্রান্ত রাজসিক বুদ্ধি বলিতে হয়।

সাম্যশূন্য রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর বিতৃষ্ণ হইয়া য়ুরোপ এখন সোশিয়ালিজমের দিকে ধাবিত হইয়াছে। দুই দল হইয়াছে, আনার্কিষ্ট ও সোশালিষ্ট; আনার্কিষ্ট বলে, — এই রাজনীতিক স্বাধীনতা মায়া, গবর্ণমেণ্ট বলিয়া বড় লোকের অত্যাচারের যন্ত্র স্থাপন করিয়া রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দলন করা এই মায়ার লক্ষণ, অতএব সর্ব্বপ্রকার গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দাও, প্রকৃত স্বাধীনতা স্থাপন কর। গবর্ণমেণ্টের অবর্ত্তমানে কে স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা করিবে, বলবানের অত্যাচার নিবারণ করিবে, এই আপত্তির উত্তরে আনার্কিষ্ট বলে, শিক্ষাবিস্তারে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব বিস্তার কর, জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা করিবে, যদি কেহ ভ্রাতৃভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যাচার করে, তাহাকে যে-সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে। সোশালিষ্ট এই কথা বলে না; সে বলে, গবর্ণমেণ্ট থাকুক, গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সমাজ ও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করি, এখন যে সমাজের ও শাসনতন্ত্রের দোষ আছে, সেই সকল সংশোধিত হইবে, মানবজাতি সম্পূর্ণ সুখী, স্বাধীন ও ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইবে। সেইজন্য সোশালিষ্ট সমাজকে এক করিতে চায়; ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিয়া সমাজের সম্পত্তি যদি থাকে, — যেমন একান্নবর্ত্তী পরিবারের সম্পত্তি কোন ব্যক্তির নহে, পরিবারের, পরিবারই দেহ, ব্যক্তি সে দেহের অঙ্গ, — তাহা হইলে সমাজে ভেদ থাকিবে না, সমাজ এক হইবে।

আনার্কিষ্টের ভুল, ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বিনাশের চেষ্টা। সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব হইবার অনেক বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্র উঠানর নিশ্চিত ফল ঘোর অরাজকতায় পশুভাবের আধিপত্য। রাজা সমাজের কেন্দ্র, শাসনতন্ত্র স্থাপনে মনুষ্য পশুভাব এড়াইতে সক্ষম। যখন সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবে, তখন ভগবান, কোনও পার্থিব প্রতিনিধি নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং পৃথিবীতে রাজ্য করিয়া সকলের হৃদয়ে সিংহাসন পাতিয়া বসিবেন, খৃষ্টানদের Reign of the

Saints সাধুদের রাজ্য, আমাদের সত্যযুগ স্থাপিত হইবে। মনুষ্যজাতি এত উন্নতি লাভ করে নাই যে এই অবস্থা শীঘ্র হইতে পারে, কেবল এই অবস্থার আংশিক উপলব্ধি সম্ভব।

সোশালিষ্টের ভুল ভ্রাতৃত্বের উপর সাম্য প্রতিষ্ঠিত না করিয়া সাম্যের উপর ভ্রাতৃত্বপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। সাম্যহীন ভ্রাতৃত্ব সম্ভব; ভ্রাতৃত্বহীন সাম্য টিকিতে পারে না, মতভেদে, কলহে, আধিপত্যের উদ্দাম লালসায় বিনষ্ট হইবে। প্রথম সম্পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব, পরে সম্পূর্ণ সাম্য।

ভ্রাতৃত্ব বাহিরের অবস্থা — ভ্রাতৃভাবে যদি থাকি, সকলের এক সম্পত্তি, এক হিত, এক চেষ্টা যদি থাকে, তাহাকেই ভ্রাতৃত্ব বলে। বাহিরের অবস্থা অন্তরের ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভ্রাতৃপ্রেমে ভ্রাতৃত্ব সজীব ও সত্য হয়। সেই ভ্রাতৃপ্রেমেরও প্রতিষ্ঠা চাই। আমরা এক মায়ের সন্তান, দেশভাই, এই ভাব একরূপ ভ্রাতৃপ্রেমের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেই ভাব রাজনীতিক একতার বন্ধন হয়, তাহাতে সামাজিক একতা হয় না। আরও গভীর স্থানে প্রবেশ করিতে হয়, যেমন নিজের মাকে অতিক্রম করিয়া সকলে দেশ-মাকে* উপাসনা করি, সেইরূপ দেশকে অতিক্রম করিয়া জগজ্জননীকে উপলব্ধি করিতে হয়। খণ্ড শক্তিকে অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছিতে হয়। কিন্তু যেমন ভারতজননীর উপাসনায় শরীরের জননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্মৃত হই না, তেমনই জগজ্জননীর উপাসনায় ভারতজননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্মৃত হইব না। তিনিও কালী, তিনিও মা।

ধর্ম্মই ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। সকল ধর্ম্ম এই কথা বলে যে, আমরা এক, ভেদ অজ্ঞানপ্রসূত, দ্বেষপ্রসূত, পাপপ্রসূত। প্রেম সকল ধর্ম্মের মূল শিক্ষা। আমাদের ধর্ম্মও বলে, আমরা সকলে এক, ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের লক্ষণ, জ্ঞানী সকলকে সমান চক্ষে দেখিবেন, সকলের মধ্যে এক আত্মা, সমভাবে প্রতিষ্ঠিত এক নারায়ণ দর্শন করিবেন। এই ভক্তিপূর্ণ সমতা হইতে বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই জ্ঞান মানবজাতির পরম গন্তব্যস্থান, আমাদের শেষ অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী হইবে; ইতিমধ্যে তাহার আংশিক উপলব্ধি করিতে হয়, অন্তরে, বাহিরে, পরিবারে, সমাজে, দেশে, সর্ব্বভূতে। মানবজাতি পরিবার, কুল, দেশ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া শাস্ত্র বা নিয়মের বন্ধনে দৃঢ় করিয়া এই ভ্রাতৃত্বের স্থায়ী আধার গঠন করিতে চিরকাল প্রয়াসী। এই পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা আছে,

* "ধর্ম্ম" পত্রিকায় মুদ্রিত আছে 'দেশভাইয়ের মাকে'। — স

আধার আছে, কিন্তু ভ্রাতৃত্বের প্রাণরক্ষক অক্ষয় কোন শক্তি চাই যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ, সেই আধার চিরস্থায়ী বা নিত্য নূতন হইয়া থাকে। ভগবান এখনও সেই শক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কঠোর স্বার্থপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের উপযুক্ত পাত্র হইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। কবে সেই দিন আসিবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন?

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা

আমাদের এই ভারতজননী যে জ্ঞানের, ধর্ম্মের, সাহিত্যের শিল্পের অক্ষয় আকর ছিল, তাহা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল জাতিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে য়ুরোপের এই ধারণা ছিল যে, আমাদের যেমন উচ্চ দরের সাহিত্য ও শিল্প ছিল, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না, বরং সে জঘন্য সৌন্দর্যহীন ছিল। আমরাও পাশ্চাত্য জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া চোখে য়ুরোপীয় চশমা পরিয়া ভারতীয় চিত্র ও স্থাপত্য দর্শনে নাক সিট্‌কাইয়া নিজ মার্জ্জিত বুদ্ধি ও নির্দ্দোষ রুচির পরিচয় দিতাম। আমাদের ধনীদের গৃহ গ্রীক প্রতিমা ও ইংরাজী ছবির castএ বা নির্জ্জীব অনুকরণে ভরিয়া গেল, সাধারণ লোকের বাড়ীর দেওয়াল জঘন্য তৈলচিত্রে শোভিত হইতে লাগিল। যে ভারতজাতির রুচি ও শিল্পচাতুর্য্য জগতে অপ্রতিম ছিল, বর্ণ ও রূপ গ্রহণে যে ভারতজাতির রুচি স্বভাবতঃ নির্ভুল ছিল, সেই জাতির চোখ অন্ধ, বুদ্ধি ভাবগ্রহণে অক্ষম, রুচি ইতালীয় কুলী-মজুরের রুচি হইতে অধম হইল। রাজা রবিবর্ম্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিলেন। সম্প্রতি কয়েকজন রসজ্ঞ ব্যক্তির উদ্যমে ভারতবাসীর চোখ খুলিতেছে, নিজের ক্ষমতা, নিজের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহার পরে আশা করা যায় যে, ভারত ইংরাজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যার উপর পাশ্চাত্যের বিতৃষ্ণার দুই কারণ আছে। তাঁহারা বলেন, ভারতীয় চিত্রকরগণ natureএর অনুকরণ করিতে অক্ষম, ঠিক মানুষের মত মানুষ, ঘোড়ার মত ঘোড়া, গাছের মত গাছ না আঁকিয়া বিকৃত মূর্ত্তি করেন, তাঁহাদের perspective নাই, ছবিগুলো চ্যাপ্টা ও অস্বাভাবিক বোধ হয়। দ্বিতীয় আপত্তি, এই সকল ছবিতে সুন্দর ভাব ও সুন্দর রূপের নিতান্ত অভাব। শেষোক্ত আপত্তি আর য়ুরোপীয়ের মুখে শুনা যায় না। আমাদের পুরাতন বুদ্ধমূর্ত্তির অতুলনীয় শান্তভাব, আমাদের পুরাতন দুর্গামূর্ত্তিতে অপার্থিব শক্তির প্রকাশ দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ প্রীত ও স্তম্ভিত হন। যাঁহারা বিলাতে শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া বিখ্যাত

তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় চিত্রকর য়ুরোপের perspective না জানুন, ভারতের যে perspectiveএর নিয়ম তাহা অতি সুন্দর, সম্পূর্ণ ও সঙ্গত। ভারতীয় চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পী যে ঠিক বাহ্য জগতের অনুকরণ করেন না, ইহা সত্য। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাহ্য দৃশ্য ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অন্তঃস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ করা। বাহ্য আকৃতি এই আন্তরিক সত্যের আবরণ, ছদ্মবেশ — সেই ছদ্মবেশের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া আমরা যাহা ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব ভারতীয় চিত্রকরগণ ইচ্ছা করিয়া বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া আন্তরিক সত্য প্রকাশ করিবার উপযোগী করিলেন। তাঁহারা কি সুন্দরভাবে প্রত্যেক অঙ্গে এবং চতুর্দ্দিকের দৃশ্যে, আসনে, বেশে, মানসিক ভাব বা ঘটনার অন্তর্গত সত্য প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাই ভারতীয় চিত্রের প্রধান গুণ, চরম উৎকর্ষ।

পাশ্চাত্য বাহিরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত; প্রাচ্য ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করেন, আমরা নিত্যের ভক্ত। পাশ্চাত্য শরীরের উপাসক, আমরা আত্মার উপাসক। পাশ্চাত্য নাম-রূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্যবস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে — তেমনই চিত্রবিদ্যায় ও স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়।

‘‘ধর্ম্ম’’ পত্রিকার সম্পাদকীয়

Registered No. C. 550

ধৰ্ম্ম

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

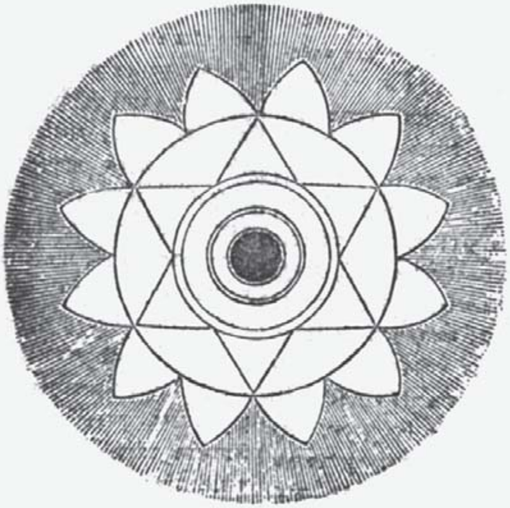

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

সাপ্তাহিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ।

১ম বর্ষ] সোমবার ১৮ই মাঘ ১৩১৬ সাল। [২২শ সংখ্যা]

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীতা

ধর্ম্ম, ১ম সংখ্যা, ৭ই ভাদ্র, ১৩১৬

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন আগতপ্রায়। গতবৎসর পাবনার অধিবেশনে বঙ্গদেশের সমবেত প্রতিনিধিগণ বোম্বে-নীতি বর্জ্জন করিয়া বঙ্গদেশে ঐক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস হুগলীর অধিবেশনেও সেই শুভপথ অনুসরণ করা হইবে। শুনিয়া সুখী হইলাম, হুগলীর অভ্যর্থনা সমিতি পাবনার প্রস্তাব-সকলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বিশেষ আবশ্যক বিষয় দুইটীই আছে। আজকাল রাজনীতিক বয়কট বর্জ্জন করিয়া নুন চিনির বয়কটই বজায় রাখিবার বিশেষ আগ্রহ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মনে জন্মিয়াছে। আশা করি এই বিজ্ঞতা বঙ্গদেশের প্রতিনিধিবর্গের প্রিয় না হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইবে। দ্বিতীয় আবশ্যক বিষয় জাতীয় মহাসভা। পাবনায় এই সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সে প্রস্তাবই হইয়া রহিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার লেশমাত্র চেষ্টা হয় নাই। এইবার সমগ্র বঙ্গদেশের মত ও আকাঙ্ক্ষা যাহাতে উপেক্ষিত না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য।

অশোক নন্দীর পরলোক প্রাপ্তি

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত যুবক অশোক নন্দী ক্ষয়রোগে দেহ-মুক্ত হইয়াছেন। জেলের কষ্ট ক্ষয়রোগের একমাত্র কারণ। যাঁহারা এই যুবককে চিনিতেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, কোনও হত্যাকাণ্ডে বা ষড়যন্ত্রে অশোক নন্দীর পক্ষে সংলিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি অতিশয় শান্ত, নিরীহ, ধার্ম্মিক ও প্রেমধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি জেলে যোগপথে অনেক অগ্রসর হইয়া মৃত্যুসময়ে যোগারূঢ় অবস্থায়ই ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার কতক পরিচয় বারান্তরে দেওয়া হইবে।

হেয়ার ষ্ট্রীটে সরলতা

আমাদের হেয়ার ষ্ট্রীট নিবাসী সহযোগীর সরলতা দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম। সহযোগীর মতপ্রকাশে লুকোচুরির অভ্যাস নাই। সত্যকথা বলিতে হইলে সরল বালকের ন্যায় বলিয়া ফেলে; মিথ্যাকথার যদি প্রয়োজন হয় সত্য মিথ্যা মিশ্রিত না করিয়া বালকের মত উদারভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা উদ্গীরণ করে। কিচেনারের সৈন্যসংস্কারের সম্বন্ধে সেইদিন পার্লামেণ্টে বাদবিবাদ হইয়াছিল; সেই উপলক্ষ্যে স্বনামধন্য সার এডওয়িন কলিন এই মত ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই সৈন্যসংস্কারে যে ভারতের জাতীয় সেনা সৃষ্ট ও গঠিত হইতেছে, তাহাতে ভারতের জাতীয় দলের উদ্দেশ্যের সাহায্য ও পোষকতা করা হইয়াছে। ইংলিশম্যানও এই মতে মত দিয়াছে। এই পর্যন্ত সৈন্যগঠনে ভেদনীতি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, যাহাতে পল্টনে পল্টনে সহানুভূতি ও একতা না হয়, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির হৃদয়ে একপ্রাণতা না আসে, সেই চেষ্টা ও লক্ষ্য কখনও পরিবর্জ্জিত হয় নাই। লর্ড কিচেনার এই সকল ভেদ বিনাশ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ উল্টাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে সহযোগী স্বীকার করিয়াছেন যে, এখনকার স্বেচ্ছাতন্ত্র ভারতের জাতীয় একতার প্রতিকূল ও বিরোধী ছিল। একতার অভাবে ভারতের উন্নতির পথ হয় নাই। অতএব যে স্বেচ্ছাতন্ত্র তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের কথায় দেশের উন্নতির প্রতিকূল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই স্বেচ্ছাতন্ত্রকে বৈধ উপায়ে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা ভারতবাসীর পক্ষে দোষাবহ না হইয়া স্বাভাবিক, অনিবার্য্য এবং যেমন ভারত তেমনই বিলাতের মঙ্গলপ্রদ প্রতিপন্ন করা হইল।

বিলাত-যাত্রায় লাভ

আমাদের পরমপূজনীয় দেশনায়ক ও শ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই সম্মানলাভে আমরাও প্রীত হইলাম। আমাদের একজন বক্তা ইংরাজী ভাষায় বিলাতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীসকলের সমান প্রতিভা, ভাষালালিত্য ও ওজস্বিতা দেখাইয়া বিপক্ষেরও প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের গৌরবও বৃদ্ধি হইল, বাঙ্গালীর বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতাও প্রমাণিত হইল। তথাপি এত পরিশ্রমের ফল যদি ব্যক্তিগত সম্মানেই সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সুরেন্দ্রবাবুর বিলাত যাত্রা ব্যক্তির পক্ষে সন্তোষজনক হইলেও

দেশের পক্ষে বিফল চেষ্টা বলিতে হয়। আমরা ইংরাজের নিকট বুদ্ধির প্রশংসা ও বাগ্মিতার আদর অর্জ্জন করিতে ব্যগ্র নহি, জাতির অধিকার সকল আদায় করিতে চাহিতেছি। সুরেন্দ্রবাবুর তিন মাস প্রবাসে ও ঘন ঘন বক্তৃতায় ইংরাজ জাতি যে এই উদ্দেশ্যের কিঞ্চিন্মাত্র অনুকূল হইয়াছে, তাহার কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না। উহারা মধ্যপন্থী দলের রাজভক্তির সম্বন্ধে কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন মাত্র। ইহাতে সুরেন্দ্রবাবু মধ্যপন্থী দলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিলাতে দেশের প্রভূত সেবা ও উপকার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া যে অজুহাতে তাঁহার সম্মাননা হইতেছে তাহা অমূলক। সুরেন্দ্রবাবু পূজার্হ ও সম্মাননীয় বলিয়া বিদেশ হইতে পুনরাগমনকালে তাঁহাকে পূজা ও সম্মান করা স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়; অন্য অলীক কারণ দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। দেশসেবার মধ্যে তিনি বিলাতে আমাদের রাজনীতিক অধিকারের দাবী জানাইয়া আসিয়াছেন। উপকারের মধ্যে আন্দোলনের সম্বন্ধে কয়েকজনের ব্যক্তিগত মত অল্পমাত্র সংশোধিত হইতেও পারে। আমরা এই অল্পলাভে আমাদের রাজনীতির উদ্দেশ্যের দিকে এক পদও অগ্রসর হই নাই।

লণ্ডনে জাতীয় মহাসভা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ যৌবনকাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর নিবেদন-প্রধান কাতর রাজনীতিতে অভ্যস্ত, স্থানে স্থানে ইংরাজদের "জয়জয়কার" শ্রবণ করিয়া আবার সেই বিফল নীতিতে বিশ্বাসস্থাপন ও নিবেদন-প্রবণতাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে এই বিদেশযাত্রার অনিবার্য্য ফল। এখন জিজ্ঞাস্য এই, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ যাহাই করুন, দেশবাসী এবং বিশেষতঃ বঙ্গবাসী, তাঁহার এই বৃথা চেষ্টায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত কি? কোনও ব্যক্তিগত মত দ্বারা এই জাতি আর পরিচালিত হইতে পারে না। উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও যুক্তি দেখিয়া দেশের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, রাজনীতিক্ষেত্রে যাহা সিদ্ধিদায়ক, শক্তি ও অর্থব্যয়ের তুলনায় যাহার ফল সন্তোষজনক, তাহাই আমাদের অনুষ্ঠেয়। সুরেন্দ্রবাবু যে "জয়জয়কারে" ভুল বিশ্বাস করিয়া পুরাতন পথে ফিরিয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, সে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার প্রশংসা; তাঁহার রাজনীতিক মতের সমর্থন অথবা রাজনীতিক দাবীর অনুকূলতা-প্রকাশক নয়। যাঁহারা ভারতের উন্নতির প্রধান বিরুদ্ধাচারী, তাঁহারাও এই "জয়জয়কারে" উচ্চকণ্ঠে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে কি বোঝা গেল

যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে আমাদের স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার অনুকূল আচরণ করিবেন? ইহা কখনও সম্ভব নয়। এই বাগ্মিতাপ্রভাবে তাঁহাদের মত ও আচরণ কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যদি সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় কোন বিশেষ বা স্থায়ী ফল হইল না, তবে কি গোখলে, মেহতা, মালবিয়া, কৃষ্ণস্বামীর মিলিত বক্তৃতাস্রোতে ইংরাজের কঠিন মন এতই ভিজিবার আশা আছে যে এই ভূতশ্রাদ্ধে আমরা অজস্র টাকা ঢালিতে বাধ্য? ইংরাজ জাতি কার্য্যপটু ও বিচক্ষণ, কেবলমাত্র বক্তৃতায় ভুলে না, স্বার্থ ও দেশের হিত দেখিয়া রাজনীতিক পন্থা নির্দ্ধারণ করে। আমরা আগে জানিতাম উহাদের নিকট ভারতের দুঃখ, কর্ম্মচারীদের অত্যাচার জ্ঞাপন করিতে পারিলে বৃটিশ প্রজাতন্ত্রের এক কথায়ই আকাশ হইতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। সেই ভ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়াছে, আবার কেহ যেন সেই পুরাতন মোহ উৎপাদন করিবার প্রয়াস না পান, পাইলেও দেশ শুনিবে না। ইংরাজ জাতিকে এমন বৃহৎ কি স্বার্থ দেখাইতে পারি যাহাতে তাঁহারা জাতীয় গর্ব্ব, লাভ ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ জাতির হস্তে বিজিত দেশের সমস্ত শাসনভার ছাড়িতে পারে এবং কোন্ উপায়ে সেই বৃহৎ স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, ইহাই বিবেচ্য। সাম্রাজ্যরক্ষা ভিন্ন এমন কোন বৃহৎ স্বার্থ নাই। সাম্রাজ্যরক্ষার আশায় স্বায়ত্তশাসন দেওয়া ইংরাজ রাজনীতিতে নূতন পন্থা নয় তবে এই উপায়ের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট প্রকৃত উপকারের আশা অসঙ্গত। তাঁহাদের মনে সেই জ্ঞান জন্মাইবার একই পথ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

ধর্ম্ম, ২য় সংখ্যা, ১৪ই ভাদ্র, ১৩১৬

জাতীয় মহাসভা

যে দিন সুরাটে জাতীয় মহাসভার বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, জাতীয়দলের সম্মিলনীর অধিবেশনে শ্রীযুত তিলক মহাসভার জাতীয়তা রক্ষা করিয়া ঐক্য স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন ও মহাসভার কার্য্য ও উদ্দেশ্য রক্ষার্থ কমিটী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাব অনুসারে কমিটী গঠনও হইল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হয় নাই। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীযুত বোডাস এই

কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ইহাই নির্ণয় করিলেন যে, এই বিভ্রাট সম্বন্ধে জাতীয়দলের দোষক্ষালন করা ও প্রাদেশিক সমিতি সকলের অধিবেশনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশবাসীর অভিমত জানা প্রথম কর্ত্তব্য, তৎপূর্ব্বে কমিটী আহ্বান করা বৃথা। এই গুরুতর বিষয়ে দেশবাসীর মত উপেক্ষা করিয়া পরামর্শ করা কোনও মতে বিধেয় বা যুক্তিসঙ্গত নয়। দুইটী প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে জানা গেল যে, বঙ্গদেশের ও মহারাষ্ট্রের মতে ঐক্য স্থাপনই শ্রেয়স্কর এবং মহাসভার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রণালী ও কলিকাতার অধিবেশনে গৃহীত চারিটী মুখ্য প্রস্তাব সর্ব্বথা রক্ষণীয়। এলাহাবাদে কনভেনসনের কমিটী এই মত অগ্রাহ্য করিয়া ঐক্য স্থাপনের পথ বন্ধ করিল। তাহার পরেই আলিপুরে বোমার মোকদ্দমায় শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ধৃত ও অভিযুক্ত হইলেন। মহামতি তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, শ্রীযুত খাপার্দ্দে ও শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে প্রস্থান করিলেন, বঙ্গদেশীয় জাতীয় দলের প্রধান প্রধান নেতাগণ নির্ব্বাসিত হইলেন। দেশময় প্রবল নিগ্রহনীতিরূপ ঝটিকা বহিতে লাগিল। জাতীয় দলের নেতাগণের মধ্যে নাগপুর নিবাসী ডাক্তার মুঞ্জী, কলিকাতার শ্রীযুত রসুল এবং মধ্যস্থগণের মধ্যে পঞ্জাবের লালা লাজপত রায় ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত মতিলাল ঘোষই রহিলেন। ডাক্তার মুঞ্জী প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়া ঐক্যস্থাপনের অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মধ্যপন্থীর প্রতিবাদে তাঁহাদের প্রস্তাবসকল প্রত্যাখ্যাত হইল। জাতীয় দলের নেতাগণ বিফলমনোরথ হইয়া নাগপুরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহাও রাজপুরুষদের আজ্ঞায় স্থগিত হইল। এই অনুকূল অবস্থায় কন্‌ভেন্‌সন্ কমিটীর নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারে মাদ্রাজে কন্‌ভেন্‌সন্ সম্মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসভা নাম ধারণ পূর্ব্বক বয়কট বর্জ্জন দ্বারা বঙ্গদেশের মুখে চুণকালি মাখাইল, বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতাগণও নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সহ্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এই বৎসর লাহোরে এই কৃত্রিম মহাসভার অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজনে শ্রীযুত নন্দী, লালা হরকিসনলাল ও পণ্ডিত রামভুজদত্ত চৌধুরী ত্রিমূর্ত্তি সাজিয়া, অসৎ হইতে সৎ সৃষ্টি করিয়া ঐশী শক্তির লক্ষ্য প্রকাশ করিতেছেন। পঞ্জাবের প্রভাবশালী হিন্দুসভা সেই প্রদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে এই কৃত্রিম মরলীর ভেদনীতির পক্ষপাতী জাতীয় মহাসভার জাতীয়তা অস্বীকার করিতে আহ্বান করিতেছেন; লালা লাজপত রায়, লালা মুরলীধর, লালা দ্বারকাদাস প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত নেতাগণ এই আয়োজনের প্রতিবাদ করিয়াছেন,

মুসলমান সম্প্রদায়ও এই রাজ-অনুগ্রহ-লালিত মহাসভায় যোগ দিতেছেন না। অতএব এই আয়োজনের সফলতা সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায় না। এই অবস্থায় ঐক্য স্থাপনের একমাত্র আশাস্থল হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধি-বেশন। এই অধিবেশনে যদি ঐক্যস্থাপনের প্রকৃত প্রণালী নির্দ্ধারিত হয় এবং বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ গোখলে-মেহেতার আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া দেশের মুখের দিকে চাহিয়া স্বপন্থা নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসভার সম্বন্ধে সন্তোষজনক উপায় উদ্ভাবন করিয়া একতার পথ নিষ্কণ্টক করা যাইবে। গোখলে মহাশয় পুণার বক্তৃতায় যে দেশদ্রোহিতা করিয়াছেন, তাহার পরে তাঁহার কথায় দেশের অহিত-সাধন বঙ্গদেশীয় নেতাদিগের পক্ষে অতিশয় লজ্জাজনক হইবে। বোম্বাইয়ের নেতাগণ যে বয়কট ও বৈধ প্রতিরোধকে দমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া-ছেন, তাহার সম্বন্ধে আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে? সুরেন্দ্রবাবু বিলাতে বয়কট সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া বোম্বাইয়ের নেতৃবৃন্দ এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, বিলাত হইতে পুনরাগমনকালে শ্রীযুত ওয়াচা ভিন্ন একজন সুপ্রসিদ্ধ মধ্যপন্থীও সুরেন্দ্রবাবুকে অভ্যর্থনা করিতে যান নাই। তাঁহারা নাকি বয়কট নীতির সহিত তাঁহাদের সহানুভূতির অভাব ঘোষণার্থ এইরূপে বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতাকে অপদস্থ করিয়াছিলেন। লাহোরের সভা জাতীয় মহাসভাও নয়, মধ্যপন্থীদলের মহাসভাও নয়, বয়কট-বিরোধী রাজপুরুষভক্তের মহাসভা। যাহা হউক, জাতীয় দল হুগলীর অধিবেশন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তাহার পরে আপনাদের গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিবেন। আমরা আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব না।

হিন্দু ও মুসলমান

শাসন সংস্কারে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়া বিরোধ বদ্ধমূল করিবার চেষ্টায় অনিষ্টের মধ্যে এই হিতও সাধিত হইয়াছে যে, নির্জ্জীব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন-স্পন্দন হইয়াছে। তাঁহারা রাজপুরুষদের উপর দাবী করিতে এবং অসাধ্যসাধনের আশা পোষণ করিতে শিখিতেছেন। ইহাতেই দেশের পরম মঙ্গল। উঁহাদের আশা যে ব্যর্থ হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইতিমধ্যে তাহা রাজপুরুষদের আচরণে বুঝা গেল। তাঁহারা যেমন অপর দেশবাসীদিগকে ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন অধিকার দান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়কেও সেইরূপ ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন অধিকারমাত্র দান করিয়া প্রকৃত শক্তি-

বিকাশের উপায় দিতে অসম্মত হইবেন। পৃষ্ঠপোষক ও সহানুভূতি-প্রকাশক ইংরাজ আমাদিগকে আশা দিয়া যেমন নিবেদন-নীতিপ্রিয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সেইরূপ পৃষ্ঠপোষক ও সহানুভূতি-প্রকাশক জুটিবেন। শেষে মুসলমান ভ্রাতৃগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই নিবেদননীতি ফলপ্রসূ নয় এবং উঁহাদের প্রকৃত উপকার করিবার সামর্থ্য ইংরাজ পৃষ্ঠপোষকগণের নাই। আমরা যদি এই শাসনপ্রণালীতে যোগদান করিতে অসম্মত হই, তবেই জাগরণের দিন শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে। যদি এই ভেদনীতিমূলক শাসনপ্রণালীতে যোগদান করিয়া মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা যে অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখাইলাম তাহা নিশ্চয়ই ফলিবে। যদিও আমরা কাহারও প্রতিকূলতা ভয় করি না, তথাপি বিপক্ষের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করা মূর্খতা মাত্র। আমরা কখনও মুসলমান ভ্রাতৃগণের তোষামোদ করি নাই, করিবও না, সরলমনে এক প্রাণ হইয়া তাঁহাদিগকে জাতি সংগঠন কার্য্যে ব্রতী হইতে আহ্বান করিয়াছি। সেই আহ্বান শ্রবণ করিয়া নিজের হিত ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের বুদ্ধি, ভাগ্য ও সাধুতার উপর নির্ভর করে। আমরা বিরোধ সৃষ্টি করিতে যাইব না ও বিপক্ষের বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টায় সাহায্য করিব না।

পুলিস বিল

সার এডওয়ার্ড বেকার পুলিস বিল স্থগিত করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছেন। এই বিল আইনবদ্ধ হইলে যে অশান্তি ও অনর্থ ঘটিত, সংবাদপত্রে প্রতিবাদে ও বক্তৃতায় কতক পরিমাণে ও অস্পষ্টভাবে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। স্রোত ফিরিয়াছে। আমরা ৭ই আগষ্ট ভয় ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়া বুঝি ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। কুদিন অবসান হইতে যাইতেছে, সুদিন ফিরিয়া আসিতেছে। আশা করিতে পারি যে, ইহার পরে জাতীয় শক্তির জয় ভিন্ন পরাজয় হইবে না। সেই শক্তির পুনর্ব্বিকাশ, লোকমতের জয় ও চেষ্টার মঙ্গলময় পরিণামের পূর্ব্বলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান ছোটলাটের মত প্রজাতন্ত্রের পক্ষেই আছে, ইহা জানা কথা, কিন্তু তাহার কার্য্য ও প্রকাশ্য কথা প্রজাতন্ত্রের প্রতিকূল হইয়াছে ও হইবে। তিনি লর্ড মরলীর আজ্ঞাবাহক ভৃত্য মাত্র, কেরাণীতন্ত্র (Bureaucracy)র প্রধান কেরাণী মাত্র, স্বতন্ত্র মত কার্য্যে পরিণত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার নাই। তথাপি পুলিস

বিল স্থগিত হওয়ায় তাঁহার মন হইতে একটা চিন্তার ভার অপনীত হইবার কথা। আমাদের বিশ্বাস, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই অনিষ্টকর বিল রুজু করেন নাই, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্থগিতও করেন নাই। বিলটী স্বর্গরাজ ইন্দ্রের বজ্রপাত নয়, আরও উচ্চ শৈলশিখরারূঢ় কখন সৌম্যমূর্ত্তি কখন রুদ্রমূর্ত্তি কোন সদাশিবের আদেশ-প্রসূত মহাস্ত্র। আমাদের অনুমান যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নিগ্রহনীতির জন্মস্থানে নিগ্রহমুদ্রা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ইহা কি cooperation আকাঙ্ক্ষার ফল? কেহ যেন এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী না হন যে, আমরা এত অল্পে ভুলিব। রাজনীতি প্রেমের মান মিলনের খেলা নয়; রাজনীতি বাজার, ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। সেই বাজারে cooperationএর মূল্য control। অল্প মূল্যে বহুমূল্য বস্তু ক্রয় করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে।

জাতীয় রিসলী সারকুলার

আমরা জাতীয় শিক্ষাপরিষদকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা ৭ই আগষ্টে পরিষদের অধীন স্কুলসকলের ছাত্রবৃন্দকে বয়কট উৎসবে যোগদান করিতে নিষেধ করায় মফঃস্বলে অতিশয় কুফল ফলিতেছে। সাধারণ লোকের মন ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছে; যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার সাহায্য করিতেন, তাঁহারা অনেকে সাহায্য বন্ধ করিতেছেন; এবং এই মত প্রচারিত হইতেছে যে, জাতীয় স্কুল কলেজে ও সরকারী স্কুল কলেজে নামমাত্র প্রভেদ বর্তমান। শুনিয়াছি পরিষদের একজন বিখ্যাত সভ্য ছাত্রগণকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, যাঁহারা দেশের কার্য্যে যোগদান করিতে চান, তাঁহারা সরকারী কলেজের আশ্রয় গ্রহণ করুন। পরিষদের ইহাও মত হইতে পারে যে, মফঃস্বলের স্কুল সকল বন্ধ হউক, সাধারণ লোক সাহায্য বন্ধ করুন, আমরা বড় বড় লোকের অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় একটীমাত্র কলেজ চালাইয়া নিষ্কৃতি পাইব। যদি তাহাই হয় তবে সব ল্যাঠা চুকিয়া গেল। অন্যথা এই জাতীয় রিসলী সারকুলার প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

গুপ্ত চেষ্টা

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে যাহাতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কোনও জেলা-সমিতি দ্বারা হুগলীর অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত না হন কয়জন পরম দেশহিতৈষী সেজন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছে। এই জঘন্য নীতি এখনও আমাদের

রাজনীতিতে স্থান পায়, ইহা বড় দুঃখের কথা। অরবিন্দ বাবুকে যদি বয়কটই করিতে হয়, করুন। তাঁহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, তিনি দুঃখিত হইবেন না, দেশের কার্য্যে পশ্চাৎপদও হইবেন না। তিনি কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করেন নাই, পূর্ব্বে অনেকদিন স্বপথে একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও যদি একাকী যাইতে হয়, যাইতে ভয় করিবেন না। কিন্তু যদি এই মতই গৃহীত হয় যে, দেশের হিতের জন্য বা আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অরবিন্দ বাবুর সংস্রব বর্জ্জনীয়, প্রকাশ্যে দেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই মত প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন কেন? এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা আপনাদের বা দেশের কি হিত সাধিত হইবে, তাহা বুঝা যায় না। ইতিমধ্যেই ডায়মণ্ডহারবার হইতে অরবিন্দ বাবু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তোমাদের কনভেন্সন নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে হুগলীর অধিবেশন হইতেছে না, যে কোন সভা যে কোন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে। ফলতঃ গুপ্তনীতি যেমন জঘন্য তেমনই নিষ্ফল। কপটতার অভাব ইংরাজ-দিগের রাজনীতিক জীবনের একটা মহান গুণ; তাহারা যাহা করিতে হয় তাহা সাহসের সহিত সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে, আর্য্যভাবে করে। ভারতের রাজ-নীতিক জীবনে এই মহান গুণের অবতারণা করিতে হইবে। চাণক্যনীতি রাজতন্ত্রে পোষায়, প্রজাতন্ত্রে কেবল ভীরুতা ও স্বাধীনতারক্ষণের অযোগ্যতা আনয়ন করে।

মরলীর ভেদনীতি

শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদনীতিবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, লর্ড মরলী তাহা রোপণ করিয়াছেন, দেশহিতৈষী গোখলে মহাশয় জলসিঞ্চন করিয়া সযত্নে পালন করিতেছেন। কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' স্বীকার করিয়াছেন যে, ভেদনীতিই ভারতীয় সৈন্য সংগঠনের মূলতত্ত্ব। ভেদনীতিই অনেক ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের মতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায়। লর্ড মরলীর নীতিও ভেদনীতি-প্রধান। তাঁহার প্রথম চেষ্টা, মধ্যপন্থী দলকে রাজপুরুষদিগের হস্তগত করিয়া ও জাতীয় দলকে দলন করিয়া ভারতের নবোত্থান বিনষ্ট বা স্থগিত করিবার বিফল প্রয়াস। সুরাট অধিবেশনের সময় এই বিষবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের নেতাগণ ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ, শক্তি বা ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে কখনও উদার মত বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নাই। তাঁহারা অতি অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন। বঙ্গদেশের উত্থান ও বয়কট প্রচারের প্রভাবে তাঁহাদের আশাতীত শাসন-সংস্কার হইয়াছে।

তাঁহারা সেই নবোত্থানের ফল স্বায়ত্ত করিয়া বয়কট ও বৈধ প্রতিরোধ বিনষ্ট করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। সুরাট অধিবেশনের পূর্ব্বে এই সংস্কারের সম্ভাবনা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে বয়কট-বর্জ্জন ও চরমপন্থী দলের বহিষ্কার করিতে না পারিলে এই সুস্বাদু ফল তাঁহাদের মুখবিবরে পতিত হইবে না। এই দুই উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নাগপুর হইতে সুরাটে মহাসভা আনীত হইয়াছিল এবং মহাসভার কার্য্যপ্রণালীর সংশোধন প্রস্তাব হইয়াছিল: উদ্দেশ্য — জাতীয় দল আপনি মহাসভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। সভাপতি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতাও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল। মহামতি তিলক, শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতাগণ এই গুপ্ত অভিসন্ধি অবগত হইয়া মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ ও বয়কট-নীতি রক্ষার জন্যে চেষ্টা করিতেছিলেন। সুরাটের তুমুলকাণ্ডে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সার ফেরোজ শাহ মেহতাই জয়ী হইলেন। আত্মদোষ-ক্ষালনের সময়ে জাতীয় দলের নেতাগণ বোম্বাইয়ের মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু মধ্যপন্থীচালিত অসংখ্য পত্রিকায় গালাগালির এমন রোল উঠিল যে, সত্যের ক্ষীণ ধ্বনি সেই কোলাহলে ভাসিয়া গেল। এখন সকল দেশবাসীকে বলিতে পারি, মেহেতা-গোখলের কার্য্যকলাপ দেখুন, বুঝুন আমরা ভ্রান্ত ছিলাম, কি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম; না বাস্তবিক তাঁহাদের ওইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। এই ভেদনীতি বোম্বাইয়ের মধ্যপন্থীগণকে অনায়াসে উদ্‌ভ্রান্ত করিল। বঙ্গ-দেশের নেতাগণ সেই কুপথের পথিক হন নাই, তাঁহারা বয়কট-রক্ষা করিয়াছেন। ৭ই আগষ্ট স্বয়ং শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু রাজপুরুষদের মিনতি ও ভয় প্রদর্শন তেজের সহিত উপেক্ষা করিয়া বয়কট উৎসবের সভাপতি হইয়াছিলেন। আবার 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বয়কট নাম প্রচার হইয়া আমাদের আনন্দ ও আশা উৎপাদন করিয়াছে। যদি ঐক্য স্থাপন কখনও সম্ভব হয়, যদি মরলীর ভেদনীতি বিফল হয়, তাহা বঙ্গবাসীর ঐক্যপ্রিয়তা ও বয়কটে দৃঢ়তা দ্বারাই সাধিত হইবে।

বিষবৃক্ষের অপর শাখা

লর্ড মরলীর দ্বিতীয় চেষ্টা, রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথক করা। ইহাই ভেদনীতির দ্বিতীয় অঙ্গ, শাসন সংস্কারের দ্বিতীয় বিষময় ফল। এই সম্বন্ধে লর্ড মরলী গুপ্ত চেষ্টা করেন নাই, প্রকাশ্যেই ভেদনীতি অবলম্বন

করিয়া মুসলমান ও হিন্দুর চিরশত্রুতার ব্যবস্থা করিতেছেন। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যাবৃদ্ধিতে মধ্যপন্থী নেতাগণ এমন মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ যে সেই অল্প লাভের আশায় এই মহান অনিষ্ট আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। গোখলে মহাশয় মুক্তকণ্ঠে এই ভেদনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে লর্ড মরলী ভারতের পরিত্রাতা। তাঁহার মতে মুসলমানদিগের পৃথক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে যে মুসলমান ও হিন্দুর রাজনীতিক জীবনের শক্তি স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী হইয়া জাতীয় মহাসভার মূলতত্ত্ব ও ভারতের ভাবী ঐক্য ও শান্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে এই সত্য গোখলে মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদের বুদ্ধির অগোচর হইতে পারে না। তবে কোন্ নিগূঢ় রহস্যময় সূক্ষ্মনীতির বশে গোখলে মহাশয় এই ভেদনীতির সমর্থন করিতে সাহসী হইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের পূজনীয় সুরেন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ দৃঢ়ভাবে এই শাসন সংস্কার রূপ মহান অনর্থের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। বরং বিলাতপ্রবাসে প্রথম অবস্থায় এই শাসন সংস্কারের অযথা ও অমূলক প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সংস্কারে বঙ্গবাসীর লেশমাত্র আস্থা নাই। যদি কয়েকজন বড় লোক এই নূতন শাসনপ্রণালীতে যোগদান করিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া দেশের প্রকৃত হিত ভুলিয়া যান, তাহাতে দেশের কোন অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সর্ব্বজনপূজিত নেতা এই বিষবৃক্ষে জলসেচন করিলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে। যাঁহারা এই সংস্কারে যোগদান করিবেন, তাঁহারা মরলীর ভেদনীতির সহায়, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টিকর্ত্তা ও ভারতভূমির ভবিষ্যৎ একতার বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিবেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ এই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করিতে কখনও সম্মত হইবেন না, ইহাই আমাদের আশা।

রিজের বিষোদ্গার

রিজ "নামক একটা লোক" এদেশে সিভিলিয়ান ছিলেন। এখন পার্লামেণ্টের সভ্য। ইনিই একবার ভারতীয় কৃষকের সুহৃদ সাজিয়া বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতে বাঘ মারিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, কারণ বাঘ মারিলে হরিণ বাড়ে — হরিণ শস্যহানি করে। নির্ব্বাসন সম্বন্ধে ইঁহার যুক্তিহীন বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া পার্লামেণ্টের একজন সভ্য পরিহাসচ্ছলে ইঁহাকেই নির্ব্বাসিত করিবার

প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সংপ্রতি পার্লামেণ্টে ভারতীয় বাজেটের আলোচনাকালে ইনি বলিয়াছেন, ভারতে কোনরূপ আন্দোলন বৈধ হইতে পারে না। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ যে ইংরাজবিদ্বেষপূর্ণ তাহাতে ইঁহার সন্দেহমাত্র নাই। ইনি বলিয়াছেন ঘোষ নামক একটা লোক (শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষই ইঁহার উদ্দিষ্ট) অতিকষ্টে কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে; এখন সে যুবকদিগকে বলিতেছে, কারাক্লেশ যতটা ভয়াবহ মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা ভয়াবহ নহে, সুতরাং তাহারা যেন কাপুরুষ হইয়া না যায়। ভারত গবর্ণমেণ্ট অচিরে ইঁহাকে নির্ব্বাসিত করুন। এই উক্তিতে যে নীচতা স্বপ্রকাশ তাহার ''উতোর দিবার'' প্রবৃত্তি আমাদের নাই। তারপর ইনি বলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বয়কট ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহারা অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থন করিয়া পার্লামেণ্টের সভ্যপদ পাইয়াছেন, তাঁহারা কি জানেন না যে, বয়কটের অর্থ এই যে, ভারতে আর বিলাত হইতে জুতা ও বিয়ার মদ যাইতে পারিবে না? কি ভীষণ! ধিংড়ার মত যুবকগণ কিরূপে নষ্ট হয় তাহার কথায় রিজ বলেন, তাঁহার নিকট 'শিখের বলিদান' নামক একখানা পুস্তক আছে। উহার লেখিকা একজন নির্ব্বাসিত ব্যক্তির কন্যা (শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র)। এই ব্যক্তি একখানা রাজদ্রোহী সংবাদপত্রের ('সঞ্জীবনী'র) সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রের হাতে এই পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করেন, বলিয়া 'শিখের বলিদান'এর প্রশংসা করিয়াছেন। রিজের বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের অপরিজ্ঞাত নহে। তবে যে তাঁহার কথা বলিলাম, সে কেবল বিলাতে ভারত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের বিদ্যার দৌড় দেখাইবার জন্য। শিখের আত্ম-বলিদান মহিমা বুঝিবার সাধ্য রিজের মত লোকের নাই। ভারতচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন — ''পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।''

ধর্ম্ম, ৩য় সংখ্যা, ২১এ ভাদ্র, ১৩১৬

শাসন সংস্কার

শাসন সংস্কার গৃহীত হইলে যে কুফল ফলিবে, তাহা গতবারে বলা হইয়াছে এবং উহা দেশবাসীরও অবিদিত নহে। এরূপস্থলে যদি কেহ বলে যে, আমরা এই সংস্কারের দোষ দেখাইব কিন্তু তাহার মধ্যে যে সুবিধাটুকু দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন, তাহার বুদ্ধি বা রাজনীতিজ্ঞানের প্রশংসা করিতে

পারি না। যে দোষ দেখাইবেন সে দোষ রাজপুরুষগণের বুদ্ধির অগোচর নহে, তাঁহারা যে না বুঝিয়া সংস্কারে এই দোষ প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাও নহে। তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতেন যে, এই দোষসকলের প্রতিবাদ হইবে, কিন্তু তাঁহারা ইহা চান যে প্রতিবাদ করিয়াও দেশের নেতাগণ এই সৈন্য-সংস্কার প্রত্যাখ্যান না করুন, তাহা হইলেই তাঁহাদের অভিসন্ধি সফল হইল। দোষ সংস্কৃত করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, কেননা এই দোষ তাঁহাদের যুক্তিতে দোষ না হইয়া সংস্কারের মুখ্য গুণ। এই সংস্কারে স্বাধীনতালুব্ধ দেশবাসীর শক্তিবৃদ্ধি হইবে না, তাঁহারাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে দুটী চিরসংঘর্ষ-প্রবৃত্ত শক্তির যুদ্ধে মধ্যস্থ ও দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিবেন। তাঁহাদের এই নীতি দোষাবহ নয়, প্রশংসনীয়। তাঁহারা দেশহিতৈষী, স্বদেশের হিত, শক্তিবৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যরক্ষার উপায় দেখিতেছেন। এই নীতি উদারনীতি নয়, কিন্তু উদারনীতি যদি স্বদেশের অহিতকর বিবেচনা করি, অনুদারনীতিই অবলম্বন করা দেশহিতৈষীর যোগ্য পন্থা। আমরা দেশের কল্যাণে নিরপেক্ষ হইয়া উদারনীতি অবলম্বন করিতাম, দেশহিতৈষিতা ত্যাগে জগৎহিতৈষী সাজিতাম। এখন আমরাও স্বদেশের হিত, শক্তিবৃদ্ধি ও জীবনরক্ষার পথ দেখি। দেশ আগে বাঁচুক, তাহার পরে জগতের হিত ও উদারনীতি আচরণ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইব।

হুগলী প্রাদেশিক সমিতি

ইতিমধ্যে হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলাফল নিশ্চিত ভাবে না জানা পর্য্যন্ত সমিতির আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ অনাবশ্যক। এই বৎসর ভূত-ভবিষ্যতের সন্ধিস্থল। সমিতির কার্য্যফলের উপর বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। প্রবল নিগ্রহনীতি আরম্ভ হওয়া প্রভৃতিতে দেশ নীরব হইয়া পড়িল। বঙ্গজাতির নবোত্থিত শক্তি ও সাহস যুবকদের প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত হইল এবং ভীরুগণের পরামর্শে দেশবাসীর স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিলোপ হইতে চলিল। কোথায় নিগ্রহনীতির বৈধ অথচ সাহসপূর্ণ প্রতিরোধ করিয়া সেই নীতি বিফল করিবে, তাহা না হইয়া ভয়ে ও রাজনীতি-জ্ঞানরহিত বিজ্ঞতায় নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া প্রচারিত হইল, তাহাতে নিগ্রহনীতি সফল হইয়াছে, রাজপুরুষগণও বুঝিয়াছেন যে আমরা অমোঘ অস্ত্র আবিষ্কার করিলাম। এই নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতায় দেশবাসীর মনপ্রাণ অবসাদ-

প্রাপ্ত ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িতেছিল, জাতীয় শিক্ষার শেষ পরিণাম অতি শোচনীয় হইতেছে, বয়কটের বল ক্ষীণ হইয়া বিলাতী পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে, গত পাঁচ বৎসরের যত চেষ্টা ও উদ্যম, শক্তিহীন ও বিফল হইয়া যাইতেছে। নেতাগণ হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া দেশের প্রকৃত নেতৃত্বকার্য্য করিতে অক্ষম, কন্‌ভেন্‌সন-নীতির মমতা ও শাসন সংস্কারের মোহত্যাগ করিতে চান না, মুখে প্রকৃত জাতীয় মহাসভার পক্ষপাতী, কার্য্যে তাহার পুনঃসৃষ্টি করিবার কোনও আয়োজন করিতেছেন না, শাসন সংস্কার গ্রহণ করিতেও ভয় করেন, প্রত্যাখ্যান করিতে হইলেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। এই অবস্থায় যাঁহারা দেশের জন্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা ভয়ের পরিচয় রাখেন না, ভগবান ও বঙ্গজননী ভিন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে। যদি আমরা প্রাদেশিক সমিতিতে দেশের মুখ-রক্ষা ও ভারতের ভবিষ্যৎ আশা রক্ষা করতে পারি, পথ অনেক পরিমাণে মুক্ত হইয়া থাকিবে। সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি। নচেৎ নিজের পথ নিজে পরিষ্কার করিয়া ভয়ার্ত্ত ও নিগ্রহনীতিবিক্ষুব্ধ দেশের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।

দৈনিক পত্রিকার অভাব

জাতীয় দলের শক্তি অনেক দিন অন্তর্নিহিত হইয়া ছিল, আবার বিকাশ হইতেছে। কিন্তু সেই শক্তিবিকাশের উপযোগী উপকরণের অভাবে সম্পূর্ণ কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। আমরা যথাসাধ্য আর্য্যধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্মত রাজনীতির প্রকাশপূর্ব্বক এই বিকাশের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু সাপ্তাহিক পত্র দ্বারা এই কার্য্য সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয় না। বিশেষতঃ আমাদের রাজনীতিক জীবনে দৈনিক পত্রিকার অভাব গুরুতর অভাব। প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ লোককে জানাইয়া সেই সম্বন্ধে জাতীয় দলের মত বা কর্ত্তব্য লোকের সম্মুখে স্থাপন করিতে না পারিলে আমাদের চেষ্টায় তেজ তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতা হইতে পারে না। সেদিন কলেজ স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বক্তৃতার সারাংশ একটী সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তাগণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। সেই সভায় শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ঘন ঘন বয়কটের উল্লেখও হইয়াছিল, ইহাতে হয়ত কর্ত্তাগণ ভীত বা বিরক্ত হইলেন, সে ভয় ও বিরক্তি স্বাভাবিক, আজকালকার

দিনে বয়কট নামের যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যক্তিগত মঙ্গল সম্ভব। বয়কট প্রচারের জন্য স্বাধীন দৈনিক পত্রিকার আবশ্যকতা প্রতিদিন বোধ হইতেছে।

মেহতা মজলিসের সভাপতি

সভা হইবে কি না স্থির নাই। কিন্তু পতিত্ব লইয়া বিষম সমস্যা উপস্থিত। মাদ্রাজ কন্‌ভেন্‌সনের পুনরাবৃত্তি এবার লাহোরে হইবার কথা। কিন্তু লাহোরের দেশভক্তগণ দেশসেবার এই কৃত্রিম অভিনয়ের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। দেশে মানে না, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নাই অথচ দেশের দশ পাঁচ জন মাথাধরা লোক দেশের লোকের নামে ডিক্রি ডিসমিস করিবেন ইহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন? সে যাক। এখন সভাপতির কথা। এ সম্বন্ধে ভারত মিত্র বেশ বলিয়াছেন — ভিন্ন কংগ্রেসের পক্ষপাতিগণ আগামী লাহোর কন্‌ভেন্‌সনে মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদকে সভাপতি করিতে চান। কিন্তু নবাব সাহেব এ সম্মান গ্রহণে সম্মত নন। এখন পাঞ্জাবের কংগ্রেস কমিটী সার ফিরোজ শা মেহতাকে সভাপতি করিতে চাহিতেছেন — মেহতা সম্মত না হইলে অগত্যা সুরেনবাবু। ভারত মিত্র বলিতেছেন আমরা বলি যেরূপ করিয়াই হউক মেহতা সাহেবকেই সভাপতি করা উচিত। তিনিই ভাঙ্গা কংগ্রেসের জন্মদাতা। সুতরাং কংগ্রেসের (?) সভাপতিত্ব তাঁহাকে যেরূপ সাজে আর কাহাকেও সেরূপ সাজে না। লোকে এখন হইতেই ভাঙ্গা কংগ্রেসকে মেহতা-মজলিস বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ধর্ম্ম, ৪র্থ সংখ্যা, ২৮এ ভাদ্র, ১৩১৬

অসম্ভবের অনুসন্ধান

হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সভাপতি শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সেন জাতীয়দলকে অধীর ও অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যাঁহারা অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, মধ্যপন্থীরাই অধীরতার পরিচয় দিয়াছেন; জাতীয়দলের বিরুদ্ধে অধীরতার অভিযোগের কারণ নাই। হুগলীতে

যে জাতীয়দলের সংখ্যাধিক্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; অথচ বিরোধ-বর্জ্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয়দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ স্বাবলম্বন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইহাও যদি অধীরতা হয় তবে ধীরতা বোধ হয় জড়তার নামান্তর মাত্র। অসম্ভব আদর্শের কথায় আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, যাহারা বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে কিছুই দেখিতে চাহে না ও পারে না তাহারা ভবিষ্যতের ভাবনার ভাবুকদিগকে চিরদিনই অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। যে সকল কর্ম্মবীর সঙ্কটসময়ে বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতের উন্নতির ভিত্তিস্থাপনক্ষম তাঁহাদের ভাগ্যেও ঐরূপ উপহাস লাভ ঘটিয়া থাকে। ফলের বিষয় না জানিয়া অপেক্ষা করা জড়ত্ব, তাহা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সেখানে স্থৈর্য্য মূঢ়ের কার্য্য; গতিই জীবন। ভারতে মধ্যপন্থী সম্প্রদায়ের অকারণ ভীতিই জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে জাগরণ, যে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, যে আবেগ আসিয়াছে জাপানে, পারস্যে, তুরস্কে তাহার প্রামাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোও স্বীকার করিয়াছেন, সে প্রবাহের গতিরোধ করা মানবের সাধ্যাতীত। অথচ মধ্যপন্থীরা একথা বুঝেন না বা বুঝিয়াও বুঝেন না। সর্ব্বত্রই সংস্কারে প্রজাশক্তির আত্মবিকাশ দেখা যাইতেছে। কেবল ভারতেই অপেক্ষার আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে! এই আদেশদাতা লর্ড মরলী — সমস্ত জীবন প্রজাশক্তির সমর্থন করিয়া জীবনের সায়াহ্নে ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্যে জড়জীবনযাপনের আদেশ করিয়াছেন। এ অবস্থায় — জাতীয়দলের উন্নতি চেষ্টা উপহাসাস্পদ না মধ্যপন্থীদিগের পরনির্ভরতা ও জড়ত্ব উপহাসাস্পদ?

যোগ্যতা বিচার

ভাবে বোধ হয়, সভাপতি মহাশয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার কথায় অযথা বিশ্বাসবান হইয়া মনে করেন, আমরা আজও স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নহি। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের আলোচনাকালে একজন বক্তাও এই কথাই বলিয়াছিলেন! আমাদিগকে অনুপযুক্ত বলা ব্যতীত আংলো-ইণ্ডিয়ার পক্ষে স্বেচ্ছাচার সমর্থনের অন্য উপায় নাই। এ অবস্থায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার স্বার্থ-সমর্থক যুক্তি স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এই যুক্তি গ্রহণ করা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। গ্ল্যাডস্টোন বলিয়াছিলেন, স্বাধীনতাসম্ভোগই লোককে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে।

স্বায়ত্তশাসন সম্ভোগ ব্যতীত স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী হইবার উপায়ান্তর নাই। আমরা অবগত আছি, স্বায়ত্তশাসন পাইলে প্রথম আমাদের ভ্রম-প্রমাদ অনিবার্য্য। সকল দেশেই এইরূপ হইয়াছে। জাপানের ভ্রম হইয়াছে, তুরস্ক ও পারস্যে এখনও ভ্রম ঘটিতেছে। তাই বলিয়া স্বায়ত্তশাসনের পথে অগ্রসর না হওয়া আর উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য অর্গলবদ্ধ করা একই কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা ভ্রান্ত শিক্ষায় আপনাদিগকে অসার ও অনুপযোগী বলিয়াই বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলাম। আজ সে ভ্রম অপগত। আজ আমরা বুঝিয়াছি, এ জাতির জীবনস্পন্দন বন্ধ হয় নাই — এ জাতি জীবিত। এই অনুভূতিই জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট। আর এই অনুভূতিই আমাদিগকে উন্নতির পথারূঢ় করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে মোক্ষলাভে সক্ষম করিবে। এ অবস্থায় — আজ যখন উন্নতি আরব্ধ তখন — যোগ্যতা-বিচারের ছল করিয়া উন্নতির গতি বন্ধ করিয়া স্থির হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। আজ জাতীয় জীবনে যে সময় উপস্থিত সে সময়ের গতি রুদ্ধ হইলে আমরা উন্নতির পথে পিছাইয়া পড়িব — অগ্রসর হইতে পারিব না। সুতরাং আমাদিগকে অগ্রসরই হইতে হইবে; শঙ্কায় বা সন্দেহে বিচলিত না হইয়া স্থির ও ধীরপদে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই আজ আমাদের কর্ত্তব্য।

চাঞ্চল্য-চিহ্ন

আমাদের কোন কোন বিজ্ঞ মধ্যপন্থী এমন কথাও বলেন যে, আজকাল কোন কোন সভায় কিছু কিছু গোলমাল হয়; ইহাতে রাজনীতিক অধিকার লাভে আমাদের অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এ কথাটাও তাঁহাদের মৌলিক নহে, কপটাচারী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। যে সকল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এরূপ মত প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে কপটাচারী বলিলাম, কারণ তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, বিলাতে রাজনীতিক সভাসমিতিতে যেরূপ গোলমাল হয় ভারতে সভাসমিতিতে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। ধীর প্রকৃতির ভারতবাসীরা সেরূপ ব্যবহারে একান্ত অনভ্যস্ত। আমাদের দেশে সভাসমিতিতে গোলযোগের দুইটী প্রধান দৃষ্টান্ত দেখা যায়; — সুরাটে সুরেন্দ্রনাথের কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই, তিনি বক্তৃতা বন্ধ করিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আর সুরাটেই মধ্যপন্থীরা শ্রীযুত বাল গঙ্গাধর তিলককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে বিষম গোলযোগ উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া

থাকে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার ব্যালফোর গোলমালে বক্তৃতা করিতে পারেন নাই, শেষে দুইজন ছাত্র নারী বেশে মঞ্চে উঠিয়া তাঁহাকে জুতার মালা উপহার দেয়। তিনি হাসিতে হাসিতে সে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর একবার ছাত্রগণ কোন বক্তার বক্তৃতায় অসন্তুষ্ট হইয়া মারামারি করে ও পুলিসকে বিষম প্রহার করে। বিচারে ছাত্রদিগের কোনরূপ দণ্ড হয় নাই। আমরা অবশ্য এমন কথা বলি না যে, আমাদের দেশে রাজনীতিক আন্দোলনে সভাসমিতিতে এইরূপ চাঞ্চল্য আরব্ধ হউক। আমরা এই কথা বলিতে চাহি যে, এইরূপ চাঞ্চল্যে স্বায়ত্তশাসন লাভে আমাদের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হয় না; পরন্তু ইহা জীবনের লক্ষণ। বরং ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, আমরা যুগব্যাপী-জড়ত্ব-শাপ-মুক্ত হইয়া নবীন উদ্যমে নবীন শক্তিতে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি।

হুগলীর পরিণাম

হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন দ্বারা জাতীয় পক্ষের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মধ্যপন্থীদের মনের ভাব তাঁহাদের আচরণে বোঝা গেল, জাতীয় পক্ষের প্রাবল্যও সকলের অনুভূত হইল। বঙ্গদেশ যে জাতীয় ভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন হুগলীতে জাতীয় পক্ষের দুর্ব্বলতা ও সংখ্যার অল্পতাই অনুভূত হইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া বরং এই বর্ষকালব্যাপী দলন ও নিগ্রহে এই দলের কি অদ্ভুত শক্তিবৃদ্ধি এবং তরুণদলের হৃদয়ে কি গভীর জাতীয় ভাব ও দৃঢ় সাহস জন্মিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রাণ আনন্দিত ও প্রফুল্ল হইল। কেবলমাত্র কলিকাতা বা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নহে, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের জেলাসকল হইতে জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি সমিতিতে গিয়াছিলেন। আর একটী শুভ লক্ষণ তেজস্বী ও ভাবপ্রবণ নবীন দলের পক্ষে যাহা সহজসাধ্য নহে অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয়, শৃঙ্খলা ও নেতাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতাও হুগলীতে দেখা গেল। জাতীয় পক্ষের নেতারা কখনও মধ্যপন্থী নেতাগণের ন্যায় স্বেচ্ছায় কার্য্য চালাইতে ইচ্ছুক হইবেন না, দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গন্তব্যপথ নির্ণয় করিবেন, কিন্তু একবার পথ স্থির হইলে নেতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আবশ্যক। সেই বিশ্বাস যদি টলে, নূতন নেতা মনোনীত করা শ্রেয়স্কর, কিন্তু কার্য্যের সময়ে প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি না চালাইয়া একপ্রাণ হইয়া নেতাকে সাহায্য করা উচিত। পথনির্ণয় স্বাধীন চিন্তা

ও বহুজনের পরামর্শ নির্ণীত পথে সৈন্যের ন্যায় শৃঙ্খলা ও বাধ্যতা, ইহাই প্রজাতন্ত্রে কার্য্যসিদ্ধির প্রকৃত উপায়। অতএব হুগলী অধিবেশনে ইহাই প্রথম উপলব্ধি হয় যে, জাতীয় পক্ষ এক বৎসরের নিগ্রহ ও ভয় প্রদর্শনে অধিক বলান্বিত ও শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা এতদিনের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ।

দ্বিতীয় ফল মধ্যপন্থীদের মনের ভাব কার্য্যে প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহারা শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, সে সংস্কার নির্দ্দোষ হউক বা সদোষ হউক, দেশের হিতকর হউক বা অহিতকর হউক, তাহা সংস্কার নামে অভিহিত, অতএব গ্রহণীয়; তাহা লর্ড মরলীর প্রসূত মানস-সন্তান, অতএব গ্রহণীয়; পুরাকালের কংগ্রেসের চিরবাঞ্ছিত দুর্লভ স্বপ্ন, অতএব গ্রহণীয়; উপরন্তু মরলী-রিপন-প্রসূত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের চরম অবস্থা আনয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অতএব গ্রহণীয়। তাহাতে জাতীয় একতার আশা লুপ্তপ্রায় হউক বা না হউক, নেতাদের স্বপ্ন ভাঙিবার নহে। বয়কটকে বিষরহিত প্রেমময় স্বদেশীতে পরিণত করাও নেতাদের স্থির অভিসন্ধি। স্বয়ং সভাপতি মহাশয় শেক্ষপীরকে প্রমাণ করিয়া বয়কট নাম বয়কট করিবার পরামর্শ দিলেন, পাছে মরলী-মডারেটের মিলনমন্দিরে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রবেশ করিয়া সব ভস্মসাৎ করে। আর বোঝা গেল যে মধ্যপন্থী নেতাগণ বৈধ প্রতিরোধ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। বাস্তবিক মিলন যখন হইয়াছে, শাসন সংস্কার যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন প্রতিরোধের আর আবশ্যকতা কোথায়? বিপক্ষে বিপক্ষে প্রতিরোধ সম্ভব, প্রেমিকে প্রেমিকে প্রার্থনা অভিমান ও ক্ষণিক মনোমালিন্যই শোভা পায়। এই পুরাতন-নীতির পুনঃসংস্থাপনের ফল, নেতাগণ কন্‌ভেন্সনকে আরও দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, মাদ্রাজে বয়কট বর্জ্জন করিলে সুরেন্দ্রনাথ কন্‌ভেন্সন ত্যাগ করিবেন বলিয়া কয়েকজন যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, সেই আশা বিনষ্ট হইয়াছে। কেবল একটী বিষয়ে এখনও সন্দেহ বর্ত্তমান, জাতীয় মহাসভার পুনঃসংস্থাপন সম্ভব না অসম্ভব? একপক্ষে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে দেখা গেল যে, সভায় কোন পূর্ণ জাতীয়ভাব প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমরা সমিতি ভাঙ্গিয়া সরিয়া পড়িব, ইহাই মধ্যপন্থীদিগের দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে প্রকৃত ঐক্য অসম্ভব। ইহার তাৎপর্য্য কি? পূর্ণ রাজপুরুষ-ভক্তি-প্রকাশক কোনও প্রস্তাব উপস্থিত হইলে জাতীয় পক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, যত নিষ্ফল প্রার্থনা, প্রতিবাদ, নিবেদন গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু পূর্ণ জাতীয় ভাবব্যঞ্জক প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। এই সর্ত্তে কোন প্রবল ও বর্দ্ধনশীল দল সমিতিতে থাকিতে সম্মত হইবে না, বিশেষতঃ

যে দলের স্থায়ীভাবে সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। অপরপক্ষে জাতীয় পক্ষের নির্ব্বন্ধে দুই দলের একটী কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, জাতীয় মহাসভায় ঐক্য স্থাপন তাহার উদ্দেশ্য। সভ্যদিগের চারিজন মধ্যপন্থী, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রীযুত অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং চারিজন জাতীয় পক্ষের শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুত রজতনাথ রায়, শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত কৃতান্তকুমার বসু। ইঁহারা যদি একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসভার ঐক্য সংস্থাপন চেষ্টাসাধ্য হইবে। চেষ্টা করিলেও যে ঐক্য সাধিত হইবে, তাহাও বলা যায় না; কেন না যদি মেহতা ও গোখলে অসম্মত হয়েন অথবা বর্ত্তমান ক্রীড ও কার্য্যপ্রণালী বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে বলেন, তাহা হইলে মধ্যপন্থী নেতাগণের পক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় মহাসভা সংস্থাপনে উদ্যোগী হওয়া অসম্ভব।

এই অবস্থায় একতা অসম্ভব, কিন্তু যে ক্ষীণ আশা এখনও বিদ্যমান, তাহাই জাতীয় পক্ষ ধরিয়া আছেন, সেই আশায় সংখ্যায় অধিক হইলেও তাঁহারা সর্ব্ব-বিষয়ে মধ্যপন্থীদের নিকট ইচ্ছা করিয়া হার মানিয়াছেন। এইরূপ ত্যাগস্বীকার ও আত্মসংযম সকল পক্ষই দেখাইতে পারে। যাঁহারা স্বীয় বল অবগত আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা সেই বল প্রয়োগ করিতে ব্যস্ত হয়েন না। আমরা সুরাট অধিবেশনে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলাম, বোম্বাইয়ের নেতাদিগের অন্যায় অবিচার ও অপমান সহ্য করিয়াও শেষে ধৈর্য্যভঙ্গে সেই আত্মসংযমের ফললাভ করিতে পারিলাম না, সেই দোষের প্রায়শ্চিত্তরূপে হুগলীতে প্রবল হইয়াও দুর্ব্বল মধ্যপন্থীদলের সমস্ত আবদার সহ্য করিয়া একতার সেই ক্ষীণ আশা যাহাতে আমাদের দোষে বিনষ্ট না হয়, সেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া প্রাদেশিক সমিতিকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলাম। দেশের নিকট আমরা দোষমুক্ত হইলাম, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের অভিশাপ মুক্ত হইলাম, ইহাই আমাদের আত্মসংযমের যথেষ্ট পুরস্কার। মহাসভার একতা সাধিত হইবে কি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে, তাহা ভগবানের ইচ্ছাধীন, আমাদের নহে। আমরা ক্রীড সহ্য করিব না, যে কার্য্যপ্রণালী দেশের অনুমতি না লইয়া প্রচলিত করা হইয়াছে, দেশের প্রতিনিধিগণ প্রকাশ্যসভায় তাহা গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আমরাও গ্রহণ করিব না। এই দুই বিষয়ে আমরা কৃতনিশ্চয়, কিন্তু তাহা ভিন্ন আমাদের পক্ষ হইতে কোনও বাধা হইবার সম্ভাবনা নাই। বাধা যদি হয়, অপর পক্ষ হইতে হইবে।

কিন্তু আমরা এই ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি

না। কবে কোন্ অতর্কিত দুর্ব্বিপাকে বঙ্গদেশের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের জাতীয় পক্ষ আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভারতের নেতা, বঙ্গদেশের দৃঢ়তা, সাহস ও কর্ম্মকুশলতায় সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, নচেৎ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা জাতীয় দলকে আহ্বান করিতেছি, এখন কার্য্যক্ষেত্রে আবার অবতরণ করি; ভয়, আলস্য, নিশ্চেষ্টতা দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাধকদের সাজে না, দেশময় জাতীয় ভাব প্রবলভাবে জাগ্রত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্মদ্বারা প্রকৃত আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় না দিতে পারিলে সেই জাগরণ, সেই প্রাবল্য, সেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্থায়ী হইবে না। ভগবান কর্ম্মের জন্য, নবযুগ প্রবর্ত্তনের জন্য, জাতীয় পক্ষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইবার কেবল উত্তেজনা ও সাহস নহে, ধৈর্য্য, সতর্কতা ও শৃঙ্খলা প্রয়োজনীয়। ভগবানের শক্তি বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছে; এবার সহজে তিরোহিত হইবে না। অযাচিত ভাবে দেশসেবা করি, পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ আছে; হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম জাগিয়াছেন, ভয় ও সন্দেহ উপেক্ষা করিয়া ধীরভাবে গন্তব্যপথে অগ্রসর হই।

ধর্ম্ম, ৫ম সংখ্যা, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩১৬

শ্রীহট্ট জেলা সমিতি

জাতীয় ভাবের বিস্তার এবং আশাতীত বৃদ্ধি হুগলীতে অবগত হইয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীহট্ট জেলা সমিতিতে ইহার চূড়ান্ত দেখা গেল। পূর্ব্বাঞ্চলের এই দূর প্রান্তে মধ্যপন্থী নাম বিলুপ্ত হইয়াছে, তথায় জাতীয় ভাবই অক্ষুণ্ণ ও প্রবল। শ্রীহট্টবাসীগণ ভারতবন্ধু বেকরের রামরাজ্যে বাস করেন না, তথাপি নিগ্রহনীতির জন্মস্থানে সমিতি করিয়া স্বরাজের নাম করিতে ভয় করেন নাই, সর্ব্বাঙ্গীণ বয়কট সমর্থন করিতে সাহসী হইয়াছেন, আবেদন-নিবেদননীতি বর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মশক্তি ও বৈধ প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী প্রস্তাব সকল রচনা করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলা সমিতিতে স্বরাজ ধর্ম্মতঃ প্রত্যেক জাতির প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সমিতি দেশবাসীদিগকে স্বরাজ-লাভের জন্য সর্ব্ববিধ বৈধ উপায় প্রয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই অধিবেশনে কয়েকটী নূতন লক্ষণ দেখিলাম। প্রথমতঃ,

সমিতি রাজনীতিক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাইতে সাহসী হইয়া বিলাতযাত্রার প্রশংসনীয়তা প্রচার করিয়াছেন ও জাতীয়ভাবাপন্ন বিলাত-প্রত্যাগতদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য সমাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে যথেষ্ট বাদবিবাদ হয় কিন্তু মতামত দিবার সময়ে সর্ব্বসমেত বিলাতযাত্রা-বিরোধীর সংখ্যা একাদশের অধিক হয় নাই। প্রতিনিধিদের মধ্যেও ইহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। পাঁচ শত প্রতিনিধির মধ্যে প্রায় চল্লিশজন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, বহুশত কণ্ঠের গগনভেদী 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির সহিত প্রস্তাব গৃহীত হইল। দ্বিতীয়তঃ, অধিবেশনের সময়ে এই প্রস্তাব ভিন্ন আর কোনও প্রস্তাব গ্রহণে বক্তৃতা করা হয় নাই। প্রস্তাবক, অনুমোদক ও সমর্থক সকলে বিনা বক্তৃতায় স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৃতীয়তঃ, অধিবেশন সহরে না হইয়া জলপ্লাবিত জলসুকা গ্রামে হইয়াছে। চতুর্থতঃ, সভাপতির আসনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল বা বিখ্যাত রাজনীতিক বক্তা বিরাজমান না হইয়া একজন সুপণ্ডিত ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীতুল্য নিষ্ঠাবান ধুতি-চাদর পরিহিত রুদ্রাক্ষমালা-শোভিত ব্রাহ্মণ সেই আসন গ্রহণে সর্ব্বজনসম্মতিতে নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সকল সুলক্ষণ দেখিয়া কাহার মনে আশা ও আনন্দ সঞ্চার হইবে না? অশিক্ষিত জনসম্প্রদায় এখনও আন্দোলনে পূর্ণভাবে যোগদান করেন নাই, শিক্ষার অভাবে সেইরূপ যোগদান দুঃসাধ্য, কিন্তু আন্দোলন কয়েকজন ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ উকিল, ডাক্তার, সংবাদপত্র-সম্পাদক ও শিক্ষকের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট ও আত্মসাৎ করিয়াছে; জমিদার, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সহরবাসী, গ্রামবাসী কাহাকেও বাদ দেয় নাই, ইহাই আশার কথা।

প্রজাশক্তি ও হিন্দুসমাজ

বিলাতযাত্রার প্রস্তাবকে কেন সুলক্ষণ বলিলাম, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা উচিত। কারণ এই সম্বন্ধে এখনও মতের ঐক্য নাই, অতএব এইরূপ সামাজিক কথা উত্থাপিত না করাই শ্রেয়স্কর, ইহাই অনেকের ধারণা। আমরাও পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিতাম, এখনও যদি জাতীয় মহাসভায় এই প্রশ্ন আলোচিত হইত, আমরা তাহা বারণ করিতাম। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে কয়েকজন ইংরাজীশিক্ষিত, বিলাতীভাবাপন্ন ভদ্রলোক ভিন্ন সমস্ত শিক্ষিত সমাজ রাজনীতিক সভার অধিবেশনে যোগদান করিতেন না। ইঁহারা হিন্দুসমাজ সম্পর্কীয় জটিল

প্রশ্নগুলির বিচার করিবার অধিকারী ছিলেন না, সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতেন, হিন্দুসমাজের ক্রোধ ও ঘৃণার পাত্র হইতেন। যে সামাজিক সমিতি মহাসভার অধিবেশনস্থানে বসিত, তাহাও সেইরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিত। সমাজই সমাজরক্ষা ও সমাজসংস্কার করিতে পারে; যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম মানেন, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের পুনরুজ্জীবনে ও ধর্ম্মসংস্থাপনে ব্রতী হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সেই সমাজকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে উপহাস করেন, তাঁহারা সংস্কারের কথা তুলিলে সেই চেষ্টাকে অনধিকারচর্চ্চা ভিন্ন আর কি বলিব? মহাসভায় এখনও সমস্ত হিন্দুসমাজ যোগদান করেন নাই, অতএব মহাসভা এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণে অনধিকারী। কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র। নিষ্ঠাবান হিন্দু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উপরন্তু হিন্দুসমাজ রক্ষার উপায় না করিলে আর চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার আক্রমণে আমাদের সব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আচার-বিচার আজকাল ভানমাত্র, ধর্ম্মে জীবন্ত আস্থা ও বিশ্বাস এখন লুপ্ত না হইলেও কমিয়া গিয়াছে, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া হিন্দুর সংখ্যা সবেগে হ্রাস পাইতেছে; পূর্ব্বে সময়োপযোগী, বর্ত্তমানে অনিষ্টকারক কয়েকটী প্রথার উপর অনুচিত মমতা বশতঃ জাতির উন্নতি ও মহত্ত্বপ্রাপ্তি স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে, যখন হিন্দু রাজা ছিলেন, রাজশক্তিই ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে ও সাহায্যে সমাজরক্ষা ও সময়োপযোগী সমাজ-সংস্কার করিত। সেই রাজশক্তি লুপ্ত, শীঘ্র পুনরায় সংস্থাপিত হইবার আশাও নাই। তবে প্রজাশক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে ও সংস্থাপিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায় প্রজাশক্তি পুরাতন হিন্দু রাজশক্তির স্থান অধিকার করিয়া সেইরূপেই সমাজরক্ষা ও সমাজসংস্কার করা উচিত; নচেৎ হিন্দু জাতি উৎসন্ন হইবে। শ্রীহট্টে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই প্রস্তাবের মুখ্য সমর্থক ছিলেন, প্রতিনিধিগণের মধ্যেও বোধহয় বিলাত-ফেরত কেহ ছিলেন না, গ্রামে গ্রামে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এইস্থলে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়া আশার লক্ষণই বলিতে হইবে। ইহাতে হিন্দুসমাজেও আঘাত লাগিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অবশ্য এইরূপ প্রস্তাব অতিশয় সতর্কতার সহিত গৃহীত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণগণ ও প্রত্যেক বর্ণের মুখ্য মুখ্য সামাজিক নেতাদিগকে প্রস্তাবগ্রহণে সম্মত করাইয়া তাহার পরে প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

বিদেশযাত্রা

বিদেশযাত্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর মতের অনৈক্য থাকিতে পারে না। আমরা সকলে স্বদেশীর বিস্তারকে জাতির জীবনরক্ষার মুখ্য উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ হইলে সেই বিস্তার হওয়া দুঃসাধ্য। যাঁহারা শিল্পশিক্ষার জন্য বিদেশে যাইবেন, তাঁহারা দেশের রক্ষার্থে এবং সমাজ পুষ্ট্যর্থে বিদেশযাত্রা করিবেন, পুণ্যকার্য্যে ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইয়া যাইবেন। কোন্ মুখে সমাজ এই কার্য্যকে পাপকার্য্য বা সমাজচ্যুতির উপযুক্ত কুকর্ম্ম বলিবেন, কোন্ মুখে উৎসাহী যুবকবৃন্দকে এই মহৎ উন্নতি-চেষ্টায় নিযুক্ত করিয়া সেই আজ্ঞাপালনের পুরস্কার না দিয়া বিষম সামাজিক শাস্তিতে দণ্ডিত করিবেন। এতগুলি তেজস্বী ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশহিতৈষী জাতীয়ভাবাপন্ন যুবক যদি সমাজ হইতে বিতাড়িত হন, তাহাতে হিন্দুসমাজের কি কল্যাণ সাধিত হইবে — যুক্তির দিক দেখিতে গেলে বিলাতযাত্রা নিষেধের পক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের দিক হইতেও বিদেশযাত্রার কোনও অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হয় না। শাস্ত্রের দুয়েকটী শ্লোকের দোহাই দিলে চলে না, শাস্ত্রের ভাবার্থ ও আর্য্যসমাজের পুরাতন প্রণালীও দেখিতে হয়। অতি অর্ব্বাচীন কাল পর্য্যন্ত বিদেশযাত্রা ও সমুদ্রযাত্রা বিনা আপত্তিতে চলিত, আর্য্য সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন সমাজরক্ষা ও আচাররক্ষা কঠিন হইয়া উঠে, তখন ব্রাহ্মণদের পরামর্শে সমুদ্রযাত্রা ও আটক নদীর ওইদিকে প্রবাস করা নিষিদ্ধ হয়। সেইরূপ কারণেই জাপানে বিদেশযাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ বিধান কালসৃষ্ট, কালে নষ্ট হয়, সনাতন প্রথা হইতে পারে না। যতদিন জাতি ও সমাজ তাহা দ্বারা উপকৃত ও রক্ষিত হয়, ততদিন সময়োপ-যোগী বিধান থাকে, যেদিন জাতির ও সমাজের বিকাশ ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া যায়, সেদিন হইতে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বিদেশফেরত ভারতবাসীর ইংরাজ অনুকরণ, সমাজের উপর উপেক্ষা ভাব এবং উদ্ধত আচরণ ও কথায় এই অকল্যাণকর সংস্কারের বিলম্ব হইয়াছে। সমাজ মানিয়া, সমাজে থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা সমাজ বিনাশের চেষ্টায় সাধিত হয় না।

ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১১ই আশ্বিন, ১৩১৬

লালমোহন ঘোষ

গত পূর্ব্ব শনিবার বাগ্মীবর লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের লোকান্তর হইয়াছে। ইনি শেষ বয়সে বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণকে বর্জ্জন করিয়া কেবল মুষ্টিমেয় ইংরাজী-শিক্ষিত লোককে লইয়া রাজনীতিক আন্দোলন সফল হইতে পারে না; প্রাদেশিক সমিতিতে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবার প্রথা তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

লালমোহনের প্রথম বয়সে বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতা দূর হয় নাই। তাই তিনি বিলাতে পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ঘটনাচক্রে ফলবতী হয় নাই।

লালমোহন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বিলাতে অনেকে তাঁহার বক্তৃতা বিদেশীর বলিয়া বুঝিতে পারিত না। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে ব্যারিষ্টার ব্রানসন যখন টাউন হলে বাঙ্গালী-দিগকে গালি দেন তখন লালমোহন ঢাকায় নর্থব্রুক হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার তীব্রতার তুলনা নাই। সেই বক্তৃতার ফলে ব্রানসন ভারতবাসী অ্যাটর্ণী-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

লালমোহন শেষবয়সে নবভাবের ভাবুক হইতে পারেন নাই; বরং পূর্ব্বসংস্কার প্রযুক্ত নবভাবের ভাবুকদিগকে নিন্দাও করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাঙ্গালায় 'বয়কট' প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি। দিনাজপুরে তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদরূপে বিদেশী-বর্জ্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের প্রস্তাবাবলী

সহযোগিনী 'সঞ্জীবনী' সুরমা উপত্যকা সমিতির অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও নির্ব্বাসিতগণের সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন প্রস্তাব হইল না বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির ভ্রমাত্মক ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া সহযোগিনী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই অনুবাদ ভ্রমপূর্ণ। যে স্থানে Self-Government

শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, মূল বাঙ্গালায় সে স্থানে স্বরাজ শব্দ ছিল। স্বরাজে প্রত্যেক সভ্যজাতির অধিকার আছে, সমিতি দেশবাসীগণকে সর্ব্ববিধ বৈধ উপায়ে স্বরাজ-লাভের চেষ্টা করিতে আহ্বান করিতেছেন, এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ঔপনিবেশিক সম্বন্ধ নাই; উপরন্তু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভারতের পূর্ণ জাতীয় বিকাশের ও মহত্ত্বের উপযোগী শাসনতন্ত্র নহে; এই বিশ্বাসবলে সমিতি বিনা বিশেষণে স্বরাজই আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার লক্ষ্য বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন। বয়কট প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয় নাই; কিন্তু তাহা বঙ্গভঙ্গের সহিত জড়িত না করিয়া সমিতি স্বরাজলাভ ও দেশের উন্নতির জন্য বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সমর্থন করিয়াছেন। যে বৈধ উপায়ে স্বরাজলাভের চেষ্টা সমিতির অনুমোদিত, বয়কট সেই বৈধ উপায়ের মধ্যে গণ্য ও প্রধান, ইহাই শ্রীহট্টবাসীদিগের মত। বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বঙ্গভঙ্গ-প্রতিকারে সীমাবদ্ধ হইলে তাহার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ হইবে। সমিতির গৃহীত প্রস্তাব রচনায় এই মূল নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে যে, আত্মশক্তি দ্বারা যাহা লভ্য তাহারই উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন-নিবেদন বর্জ্জনীয়, এবং যে যে বিষয় তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে অথচ উল্লেখ করা আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা বা প্রতিবাদ বর্জ্জনপূর্ব্বক মতপ্রকাশ মাত্র করাই যথেষ্ট। এই নিয়ামানুসারে সমিতি নির্ব্বাসিতগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া সংক্ষেপে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। সহযোগিনী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। জাতীয় পক্ষ মধ্যপন্থীদিগের মন রাখিবার উদ্দেশ্যে সভাসমিতিতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন না বটে, কিন্তু সেইরূপ স্বায়ত্তশাসনে তাঁহারা আদৌ আস্থাবান নহেন এবং তাহাকে স্বরাজ শব্দে অভিহিত করিতে সম্মত নহেন। অসম্পূর্ণ স্বরাজ অধীনতা-দোষে দূষিত বলিয়া স্বরাজ নামের অযোগ্য; সেইরূপ স্বায়ত্তশাসনে ইংরাজ উপনিবেশবাসিগণও অসন্তুষ্ট, সেই অসন্তোষ হেতু যুক্ত সাম্রাজ্য (Imperial Federation) এবং স্বতন্ত্র সৈন্য ও নৌ-সেনা গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। তাঁহারা অধীন হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিতে চাহেন না, সাম্রাজ্যের সমান অধিকারপ্রাপ্ত অংশীদার হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যখন নবজাত অলব্ধপ্রতিষ্ঠ অখ্যাতনামা শিশুজাতির এই মহতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তখন আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতি যদি অসম্পূর্ণ ও জাতীয় মহত্ত্ববিকাশের অনুপযোগী স্বায়ত্তশাসনকে আমাদের

এই মহান্ ও ঈশ্বরপ্রেরিত অভ্যুত্থানের চরম ও পরম লক্ষ্য বলি, তবে তাহা আমাদের হীনতা ও ভগবানের সাহায্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অযোগ্যতা প্রকাশ করা ভিন্ন আর কি বলিব?

জাতীয় ধনভাণ্ডার

হুগলী প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে জাতীয় ধনভাণ্ডার ফেডারেশন হল নির্ম্মাণে ব্যয়িত করার প্রস্তাব অবিবাদে গৃহীত হইয়াছিল। মধ্যপন্থী দেশনায়ক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জাতীয় পক্ষের নেতা শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন; বিনা বিবাদে ও উৎসাহের সহিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইহার পর সমস্ত দেশের আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া অন্য মত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা দেশহিতৈষীর কার্য্য নহে। অথচ 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় একজন পত্র-প্রেরক পুরাতন সংস্কারের বশীভূত হইয়া ফণ্ডের দাতাগণকে কুপরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হুগলীতে সমবেত দেশনায়ক ও প্রতিনিধিগণ বিনা বিচারে ও ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্ত্রবয়নশিল্পের সাহায্যের জন্য ধনভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যথা ব্যয়িত হইলে ফণ্ডের ট্রষ্টীগণ দেশের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী হইবেন। ধন-ভাণ্ডারের অর্থ ফেডারেশন হল নির্ম্মাণ অপেক্ষা জাতীয় বিদ্যালয় বা বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহায্যে ব্যয়িত করিলে তাঁহার মতে দেশের উপকার ও জাতীয় অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে। এইগুলিই মহৎ কার্য্য, ফেডারেশন হল নির্ম্মাণ অতিশয় ক্ষুদ্র ও নগণ্য কার্য্য, হলের অভাবে আমরা এতদিন কোন অসুবিধা বোধ করি নাই; আর কিছুদিন হল নির্ম্মিত না হইলেও চলে। প্রথম কথা, বস্ত্রবয়ন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে লেখক মহাশয় জাতীয় বিদ্যালয়ে বা টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কথা উত্থাপন করিয়াছেন কেন? ইহাতে কি এই বুঝা যায় না যে, অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা তাঁহার মতে অপরাধ নয়, কিন্তু ফণ্ড তাঁহার অনভিমত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কেবল বাধা দিবার জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন? ট্রষ্টীগণ কাহার নিকট অপরাধী হইবেন? দেশের মত হুগলীতে প্রকাশ হইয়াছে, দেশের প্রতিনিধিগণ এই উদ্দেশ্যই উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব এইরূপ অর্থব্যয়ে ট্রষ্টীগণ দেশের নিকট অপরাধী

হইবেন না। দাতাদের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, দাতাগণ এই ধনভাণ্ডার নিজ ধন, নিজ সম্পত্তি হইয়া থাকিবে বলিয়া দিয়াছেন, না জাতীয় ধন, জাতীয় সম্পত্তি হইবে বলিয়া দিয়াছেন? যদি এই ধনভাণ্ডার জাতীয় সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে অর্থ সমস্ত বঙ্গদেশের মতানুসারে ব্যয়িত হওয়া উচিত। সমস্ত বঙ্গদেশ যখন এই উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়াছে, তখন দাতাগণ দেশের মতের বিরুদ্ধে মত দিয়া বাধা দিবেন কেন? অতএব এইরূপ অর্থ ব্যয়ে দাতাগণের নিকটও ট্রষ্টীগণ অপরাধী হইবেন না। তবে এই একটী আপত্তি করা যায় যে, হয়ত তাঁহারা আইনপাশে বদ্ধ, অন্য উদ্দেশ্যে ফণ্ড প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। যখন জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয় তখন সংগৃহীত অর্থ বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, এইরূপ ঘোষণা হইয়াছিল। এখন বিবেচ্য, ইত্যাদি শব্দের অর্থ কি? বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি শিল্পকার্য্য, না বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি জাতীয় কার্য্য? শেষ অর্থ যদি ধরা যায়, তাহা হইলে আইনের আপত্তিও কাটিয়া যায়। যদি ট্রষ্টীগণ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন, তবে দাতাগণের সভা করিয়া বঙ্গদেশের প্রতি-নিধিগণের মতে মত দেওয়া হউক, ট্রষ্টীগণ সেই অনুমতিতে সন্দেহমুক্ত হইতে পারেন। জাতীয় বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে ফণ্ড ব্যয় করার সম্বন্ধে নানা কারণে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। আর বস্ত্রবয়ন শিল্পে ব্যয় করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, বয়ন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রের অবশিষ্ট কার্য্য ব্যক্তিগত চেষ্টা বা যৌথ কারবার দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। এদিকে ফেডারেশন হল নির্ম্মাণ আর ক্ষুদ্র বা নিষ্প্রয়োজনীয় কর্ম্ম বলা যায় না। এতদিন হল নির্ম্মাণ না হওয়ায় সমস্ত জাতি সত্যভঙ্গ ও অকর্ম্মণ্যতারূপ কলঙ্কভাজন হইয়াছে এবং তাহার অভাবে যথেষ্ট অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে। বঙ্গ-দেশের জীবনকেন্দ্র কলিকাতায় যে ধ্বনি উঠে, সমস্ত দেশময় তাহার প্রতিধ্বনি জাগে, তাহাতেই সমস্ত জাতি উৎসাহিত ও কর্ত্তব্যপালনে বলীয়ান হয়, আন্দো-লনের আরম্ভ হইতে ইহা উপলব্ধি হইয়া আসিতেছে। কলিকাতায় নীরবতার ফলে দেশ নীরব ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হইবার স্থানের অভাব সামান্য অভাব নহে। এরূপ স্থলে সমস্ত বঙ্গদেশের অভীপ্সিত উদ্দেশ্যে জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ ব্যয় করা উচিত ও প্রশংসনীয়।

সার ফেরোজশাহ মেহতার বয়কট-অনুরাগ

এতদিন আমরা এই ধারণার বশীভূত ছিলাম যে, সার ফেরোজশাহ মেহতা চিরকালই বয়কট বিরোধী ও স্বরাজে অনাস্থাবান। এই ধারণা সার ফেরোজশাহের আচরণে ও কথায় সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া আসিতেছে। এতদিন পরে সার ফেরোজশাহের হৃদয়ে প্রবল বয়কট-অনুরাগ-বহ্নি জ্বলিতেছে ও স্বরাজের উপর অজস্র অকৃত্রিম-প্রেমধারা তাঁহার শিরায় শিরায় বহিতেছে এবং চিরকাল বহিয়াছে শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চিত হইলাম। এই অদ্ভুত বারতা 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে। লাহোরে সার ফেরোজশাহ মধ্যপন্থী মহাসভায় সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া যত ইংরাজী দৈনিক 'টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া', 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'ডেলি ন্যুজ' সকলেই আনন্দে অধীর হইয়াছে; ইহা মেহতা মহাশয়ের কম গৌরবের কথা নহে। 'বেঙ্গলী'র আর সবই সহ্য হয়, কিন্তু 'ইংলিশম্যান'এর আনন্দে সহযোগী বিপরীতভাবে অধীর হইয়া সার ফেরোজশাহ বয়কট ও স্বরাজ বিরোধী নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সহযোগী বলিয়াছেন, সার ফেরোজশাহ কলিকাতা অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব উৎসাহের ও আনন্দের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলেন, দাদাভাইয়ের মুখ হইতে স্বরাজ শব্দ নির্গত হইলে, তিনি আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বটে, কিন্তু পোড়া মনের দোষে দুষ্ট সন্দেহ জয় করিতে পারিলাম না। মনে পড়িতেছে, মাদ্রাজে ও আমেদাবাদে স্বদেশী প্রস্তাবে মেহতা মহাশয়ের তীব্র উপহাস। মনে পড়িতেছে, কলিকাতা অধিবেশনে স্বদেশী প্রস্তাবে "স্বার্থত্যাগ করিয়াও" কথাগুলি সন্নিবিষ্ট করাইবার জন্য দুই-ঘণ্টা কাল ধরিয়া তিলকের উৎকট চেষ্টা, মেহতার ক্রোধ ও তিরস্কার ও গোখলে ও মালবিয়ার মধ্যস্থতা; প্রস্তাবে সেই কথার অবতারণায় মেহতার অভিমান ও মহাসভায় নীরবতা। মনে পড়িতেছে, সুরাটের সভাভঙ্গে মেহতার আনন্দ প্রকাশ। মনে পড়িতেছে, মেহতার পত্রে বঙ্গদেশের অপমান এবং মাদ্রাজে বয়কট-বর্জ্জন। মনে পড়িতেছে, ঔপনিবেশিক স্বরাজ দূর ভবিষ্যতের স্বপ্নমাত্র বলিয়া মেহতার মতপ্রকাশ। না, পোড়া মন 'বেঙ্গলী'র শুভ সংবাদে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে সম্মত হইতেছে না। আমরা নম্রভাবে সহযোগীকে তাহার কথার অল্পমাত্র প্রমাণ দিতে অনুরোধ করিতেছি, নচেৎ এইরূপ সম্পূর্ণ অলীক ও অবিশ্বাসযোগ্য কথার প্রচারে মধ্যপন্থীদলের কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলাম না।

কন্‌ভেন্সন সভাপতির নির্ব্বাচন

মেহতা মহাশয় যে লাহোরে কন্‌ভেন্সনের সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহা জানা কথা ছিল। বঙ্গদেশের বাহিরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মধ্যপন্থীগণের মধ্যে মধ্যপন্থী বলিয়া পরিগণিত নহেন, তাঁহাকে বাদ দিলে বঙ্গদেশকে বাদ দিতে হইবে বলিয়া অগত্যা তাহারা তাঁহাকে স্থান দিতেছেন। তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়াও হয়, সুরেন্দ্রনাথকে গিলিতেও পারেন না, উদ্গার করিতেও পারেন না। যাঁহাদের উদারমত, যাঁহাদের দেশের উপর প্রগাঢ় প্রেম,* সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আবেগময়ী বক্তৃতা, তেজস্বিতা ও স্বদেশ প্রেমের গুণে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিপত্তি নষ্ট হইতে যাইতেছে, সাহসহীন বন্ধুগণের কুপরামর্শে সমস্ত ভারতের পূজ্য দেশনায়ক ক্ষুদ্র প্রাদেশিক দলের নেতায় পরিণত হইতেছেন। এইদিকে সার ফেরোজশাহ মেহতা কন্‌ভেন্সনে অসঙ্গত আধিপত্য লাভ করিয়া এই জাল কংগ্রেস বয়কট-বর্জ্জন ও শাসন সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক রাজপুরুষভক্তির মাত্রা বৃদ্ধি ও জাতীয়তা হ্রাস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাতে বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ অসন্তুষ্ট হন। তাহাতে কন্‌ভেন্সনের রাজার কি? বঙ্গদেশের উপর তাঁহার অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ অতিশয় গভীর, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ কন্‌ভেন্সন বর্জ্জন করিলেও তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিবেন [না]। স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের সহিত তাঁহার দলের কোনও আন্তরিক সহানুভূতি নাই, এই প্রস্তাবগুলি উঠিয়া গেলে তাঁহারা বাঁচেন। তাঁহারা মিণ্টো-স্বদেশী চান, স্বার্থত্যাগযুক্ত স্বদেশী চান না। এই অবস্থায় বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ হয় আস্তে আস্তে স্বকীয় রাজনীতিক মত সকল মেহতার শ্রীচরণে বলি দিতে বাধ্য হইবেন, নাহয় কন্‌ভেন্সন হইতে সরিয়া আসিতে হইবে। যুক্ত মহাসভা তাঁহাদের আত্মরক্ষার একই উপায়, কিন্তু মেহতার কথার বিরুদ্ধে সাহসে কথা বলিয়া যুক্ত মহাসভা স্থাপনের চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই বল কোথায়? যাহা হউক, এই সভাপতি নির্ব্বাচনে আমাদের পথ আরো পরিষ্কার হইয়াছে। মেহতা-মজলিসে আমাদের স্থান নাই, যুক্ত মহাসভার আশা আরও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, এখন নিজের পথ দেখি। বর্ষশেষের পূর্ব্বেই জাতীয় পক্ষের পরামর্শ-সভা স্থাপন ও সম্মিলন প্রয়োজনীয়।

* এই স্থানে মুদ্রণপ্রমাদবশত কিছু অংশ "ধর্ম্ম" পত্রিকায় বাদ পড়েছিল বলে মনে হয়।—স

ধর্ম্ম, ৭ম সংখ্যা, ১৮ই আশ্বিন, ১৩১৬

গীতার দোহাই

লণ্ডনে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের পক্ষে গীতাকে আশ্রয় করিয়া একটী অদ্ভুত ও রহস্যময় যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। অধিবেশনের পরিপোষকগণ সেইরূপ অধিবেশনে প্রকৃত ফলের সম্ভাবনা দেখাইতে না পারিয়া দেশবাসীকে গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম্ম এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে সমতা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। লণ্ডন অধিবেশন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব তাহার ফলাফল বিবেচনা না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধান করা উচিত। রাজনীতিতে ধর্ম্মের দোহাই ও গীতার দোহাই দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম, এবং 'কর্ম্মযোগী' ও 'ধর্ম্মের' চেষ্টার ফল হইতেছে বুঝিয়া আশান্বিত হইলাম। তবে গীতার এইরূপ ব্যাখ্যায় গোড়ায় গলদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিতও হইলাম। কর্ত্তব্য পালনের উপায়-নির্ব্বাচনে অপরিণামদর্শিতা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টায় উদাসীনতা শিক্ষা দেওয়া গীতার সমতাবাদ ও নিষ্কাম-কর্ম্মবাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা অগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক; তৎপরে ধীরভাবে অসিদ্ধিতে অবিচলিত হইয়া কর্ত্তব্যসম্পাদন করা ধর্ম্মানুমোদিত পন্থা। লণ্ডন অধিবেশন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিনা, তাহা লইয়াই বাদবিবাদ; সেই প্রশ্নের মীমাংসায় পরিণামচিন্তা বর্জ্জন করিতে পারি না। কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে দুই স্বতন্ত্র বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক, প্রথম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় উপায়। মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মানুমোদিত হইলে — ধর্ম্মের আবশ্যক অঙ্গ হইলে — পরিণাম চিন্তা চলে না; তাহা আমাদের স্বধর্ম্ম হয়, সেই ধর্ম্মপালনে নিধনও শ্রেয়স্কর তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মপালন পাপ। যেমন, স্বাধীনতা-অর্জ্জনের চেষ্টা, স্বাধিকার-লাভের চেষ্টা, দেশহিত-সম্পাদনের চেষ্টা জাতির প্রধান ধর্ম্ম, দেশের প্রত্যেক কর্ম্মী-সন্তানের স্বধর্ম্ম, সেই স্বধর্ম্মপালনে প্রাণত্যাগও শ্রেয়স্কর, তথাপি স্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক শূদ্রোচিত পরাধীনতা এবং দাসস্বভাব-সুলভ স্বার্থপরতা আশ্রয় করা মহাপাপ। কিন্তু উপায় কেবলই ধর্ম্মানুমোদিত হইলে চলে না, উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগীও হওয়া প্রয়োজন। স্বধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধানের জন্য ধর্ম্মানুমোদিত ও উপযুক্ত উপায় প্রয়োগপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য-সিদ্ধির চেষ্টা করিয়াও যদি সিদ্ধি লাভ না ঘটে, তাহা হইলে অসিদ্ধিতে অবিচলিত হইয়া প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সর্ব্ববিধ উপযুক্ত ও ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে কর্ত্তব্য-

পালনের দৃঢ় চেষ্টা, ইহাই গীতোক্ত সমতা ও নিষ্কাম কর্ম্ম। নচেৎ গীতার ধর্ম্ম কর্ম্মীর ধর্ম্ম, বীরের ধর্ম্ম, আর্য্যের ধর্ম্ম না হইয়া হয় তামসিক নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক শিক্ষা, নহে ত অপরিণামদর্শী মূর্খের ধর্ম্ম হইত। কর্ম্মফলে আমাদের অধিকার নাই, কর্ম্মফল ভগবানের হাতে; কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে। সাত্ত্বিক কর্ত্তা অনহংবাদী ও ফলাসক্তিহীন, কিন্তু দক্ষ ও উৎসাহী। তিনি জানেন যে তাঁহার শক্তি ভগবদ্দত্ত ও মহাশক্তিচালিত, অতএব তিনি অনহংবাদী; তিনি জানেন যে, ফল পূর্ব্ব হইতেই ভগবানের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অতএব তিনি ফলাসক্তিহীন; কিন্তু দক্ষতা, উপায়-নির্ব্বাচন-পটুতা, উৎসাহ, দৃঢ়তা, অদমনীয় উদ্যম শক্তির সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ, তাহাও তিনি জানেন, অতএব তিনি দক্ষ ও উৎসাহী হয়েন। সূক্ষ্মবিচারে গীতা-নিহিত গভীর চিন্তা ও শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। নচেৎ দুয়েকটা শ্লোকের স্বতন্ত্র ও বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে ভ্রমাত্মক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ধর্ম্মে ও কর্ম্মে অধোগতি হয়।

লণ্ডন অধিবেশন ও যুক্তমহাসভা

দেখা গেল যে, গীতোক্ত সমতাবাদের উপর লণ্ডন অধিবেশন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আর এক যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে পরিণাম-চিন্তা পরিবর্জ্জিত হয় নাই। অধিবেশনের সমর্থকগণ বলিতেছেন, আর কোনও ফল হউক বা না হউক, লণ্ডনে যুক্ত মহাসভা সংস্থাপন হইবে। লাহোরে সেই আশা করা বৃথা; লণ্ডনেই সমস্ত দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ফলীভূত হইবে। কথাটী বিশেষ শ্রবণ-সুখোৎপাদক বটে। ইহার কোন সায় থাকিলে আমরাও লণ্ডন অধিবেশনের পক্ষপাতী হইতাম। আমরাও জানি যে লাহোরে যুক্ত মহাসভা স্থাপনের কোনও আশা নাই, কখন সেই আশা পোষণও করি নাই। কিন্তু সমস্ত দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা যদি দেশেই সফল করিবার উপায় ও আশা নাই, তবে সুদূর বিদেশে সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা সফল হইবে, এই অদ্ভুত যুক্তির যাথার্থ্যতার সম্বন্ধে আমরা প্রত্যয়ান্বিত হইতে পারিলাম না। সেইরূপ সফলতার কি মূল্য বা কি স্থায়িত্ব হইতে পারে? বুঝিলাম মেহতা গোখলে কৃষ্ণস্বামী তথায় অনুপস্থিত হইলে যুক্ত মহাসভার সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে। বুঝিলাম, তাঁহারা উপস্থিত হইলেও ছাত্রদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ সেইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সাহসী হইতে পারেন। কিন্তু তাহার পরে কি হইবে? দেশে

ফিরিয়া তাঁহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? যাঁহারা স্বদেশে মেহতার ও গোখলের সম্মুখে স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে অক্ষম, তাঁহারা না হয় বিদেশে যাইয়া সাহস ও চরিত্রের বল দেখাইলেন; স্বদেশে ফিরিলে তাঁহাদের সেই সাহস ও বল থাকিবে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে দূর বিদেশে না যাইয়া যুক্ত মহাসভা দেশেই স্থাপিত হওয়া অসম্ভব কেন? মেহতা গোখলে লণ্ডন মহাসভার প্রস্তাব কখনও গ্রহণ করিবেন না। অধিবেশনে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন না, অল্প কয়েকজনের পরামর্শে অনেকের মত উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবাসীদিগের সংখ্যাধিক্য-হেতু প্রস্তাব গৃহীত হইল; আবার কন্‌ভেন্সনের অধিবেশনে গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সম্মত হইব না, ইত্যাদি অনেক অজুহাত আছে। অজুহাতের কি প্রয়োজন? কন্‌ভেন্সন-নীতির মূল তত্ত্ব এই যে চরমপন্থীগণ রাজদ্রোহী এবং সমস্ত অশান্তি ও অনর্থের মূল; তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, অতএব তাহাদের সংসর্গ রহিত না করিলে মহাসভা বিনষ্ট হইবে। এই মূল তত্ত্ব বিসর্জ্জন করিয়া যাঁহারা চরমপন্থীদিগকে পুনর্ব্বার মহাসভায় প্রবেশ করাইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের প্রস্তাব আমরা শুনিতেও বাধ্য নহি, এই কথা কি রাসবিহারী, ফেরোজশাহ ও গোখলে বলিবেন না? সার ফেরোজশাহের মত সকলেই জানেন, রাসবিহারী বাবু সুরাটের বক্তৃতায় ও মাদ্রাজের বক্তৃতায় এবং গোখলে মহাশয় পুণার বক্তৃতায় নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তখন কি আর এ আশা করা যায় যে বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ তাঁহাদের বর্জ্জন করিয়া স্বদেশে যুক্ত মহাসভা করিবেন? সেই সাহস ও দৃঢ়তা যদি থাকে, তাহা হইলে দেশে যুক্ত মহাসভার উদ্যোগ করেন না কেন? সেই দৃঢ়তা না থাকিলে লণ্ডনে যাইয়া কৌশলে বোম্বাইয়ের নেতাগণকে পরাজিত করিবার চেষ্টা বিফল হইবে।

সার জর্জ্জ ক্লার্কের সারগর্ভ উক্তি

সার জর্জ্জ ক্লার্ক সম্প্রতি পুণায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অসার ও সারগর্ভ কথার আশ্চর্য্য মিশ্রণ হইয়াছে। প্রথম যুক্তি এই যে, ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুততর উন্নতি হইলে দেশের অশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; কেন না, শ্রমজীবীর সংখ্যা অতিশয় কম, মিলের সংখ্যা বাড়িলে আরও টানাটানি পড়িবে, চাষীগণ শ্রমজীবী হওয়ায় কৃষির অবনতি হইবে। কৃষির অতিমাত্র আধিক্যে, শিল্পবাণিজ্যের বিনাশে বৃটিশ বাণিজ্যের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। ক্লার্ক সেই

অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে আশঙ্কিত হইয়াছেন। তাহা ইংরাজ রাজনীতিবিদের পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়। কিন্তু এই অবস্থায় ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও অবনতি ঘটিয়াছে; কৃষি প্রাধান্যের সঙ্কোচে, বাণিজ্যের বিস্তারে শ্রমজীবীর উন্নতিতে দেশের মঙ্গল। সার জর্জ্জ আরও বলিয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করা যদি বয়কটের উদ্দেশ্য হয়, জাভায় ও হিন্দুপ্রধান মোরিশ্যস্ দ্বীপের অধিবাসীর প্রস্তুত চিনির বর্জ্জনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহাতে বৃটিশ জাতির জ্ঞানোদয় হওয়া অসম্ভব। কার্য্যতঃ এই কথায় তিনি দেশবাসীকে বিদেশী বর্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ কথা যুক্তিসঙ্গত ও সারগর্ভ। আমরাও বলি, ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক ও ভারতবাসীর সাহায্যদাতা আমেরিকার পণ্য বর্জ্জন না করিয়া বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করায় বয়কট কৃতকার্য্য হইবে; ইংরাজ জাতির জ্ঞানোদয় ও ভারতের উপর সম্মান ভাব হইবে, স্বদেশীরও বলবৃদ্ধি হইবে। স্বদেশী বস্তু থাকিলে বিদেশী কিনিব না, স্বদেশী বস্তুর অবর্ত্তমানে আমেরিকা বা অন্য দেশের পণ্য কিনিব, বর্ত্তমান অবস্থায় বৃটিশ পণ্য কিনিব না, ইহাই স্বদেশী ও বয়কটের প্রকৃত পন্থা। ক্লার্ক মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য বা বিশেষ দোষ বা অসুবিধা উপলক্ষ্য না করিয়া অনির্দ্দিষ্টভাবে গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করায় কোনও ফল নাই। যথার্থ কথা। আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় কি দোষ বা অসুবিধা দেখি, কিসে সন্তুষ্ট হইব, তাহা রাজপুরুষদিগকে জানান হউক, তাঁহারা যদি না শুনেন তাহা হইলেও তিরস্কার করা বৃথা, আত্মশক্তি ও বৈধ প্রতিরোধ অবলম্বনীয়। ক্লার্ক মহাশয়ের কথার এই অর্থ বুঝিলাম। আশা করি, দেশবাসী বোম্বাইয়ের লাটসাহেবের এই দুই সারগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন

জাতীয় পক্ষের শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সম্প্রতি জাতীয় পক্ষের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দ্ধারণের সম্বন্ধে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন। দেখিতেছি বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন বিষয়ে বিপিন বাবুর মত কতক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অবস্থান্তরে সেইরূপ মত পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। বিশেষতঃ উদ্দেশ্য লইয়া যেমন অটল থাকা প্রয়োজনীয়, উপায় লইয়া অটল থাকা সর্ব্বদা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। উপায় লইয়া আমাদেরও মত কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে বিপিন বাবুর

যুক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া সম্ভব। তিনি বলিতেছেন, ইংরাজ জাতি দেবতা নন, তাঁহারা স্তবস্তোত্রে প্রীত হইয়া স্বর্গ হইতে স্বরাজ হাতে লইয়া অবতরণ করিবেন না, সত্য, তথাপি তাঁহারা গুণহীন বা স্বভাবতঃ অন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি আছে। সম্প্রতি নিগ্রহনীতি প্রবর্ত্তিত থাকায় ভারতবর্ষে জাতীয় পক্ষের উদ্যম ও চেষ্টা অতিশয় সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়া উত্তমরূপে চলিতেছে না, বিলাতে ভারতাগত ইংরাজের মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ দ্বারা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্য্য বৃটিশ জাতির নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিলে সেই বিবেক জাগরিত হইতে পারে এবং নিগ্রহনীতিও বন্ধ হইতে পারে। অতএব বিলাতে সেইরূপ প্রচারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা স্বীকার করিলাম ইংরাজগণ দেবতাও নন, পশুও নন, তাঁহারা মানুষ, তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি আছে। কিন্তু ইংরাজ পশু ও সম্পূর্ণ গুণহীন, এ কথাও কেহ কখন বলেন নাই, এইরূপ ভুল ধারণায় জাতীয় পক্ষ বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন ত্যাগ করেন নাই। ইংরাজ মানুষ, মানুষ নিজ স্বার্থই অনলস যুক্তি করিয়া নিজ স্বার্থকে ন্যায় ও ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে অভ্যস্ত। আমরা বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, বিলাতে সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে সাধারণ ইংরাজ কাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন — আমাদের না নিজ জাতভাইয়ের? এই কারণেই আমরা সেইরূপ চেষ্টায় আস্থাবান নই। আর একটী কথা স্মরণ করা আবশ্যক। নির্ব্বাসন ও নির্ব্বাসিতগণের সম্বন্ধে সত্য ও নির্ভুল কথা বিলাতে কটন প্রভৃতি পার্লামেন্টের সভাসদগণ প্রাণপণে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে উদারনীতিক ও রক্ষণশীল অনেক সভাসদ নির্ব্বাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কি কখনও নির্ব্বাসনপ্রথা উঠাইয়া দিবেন বা রাজপুরুষগণকে নির্ব্বাসিতদের মুক্তি দিতে আদেশ করিবেন? বিপিনবাবু এখন ইংরাজদের রাজনীতিক জীবন নিকট হইতে দেখিতেছেন, কতক অভিজ্ঞতা লাভও করিয়া থাকিবেন, তিনি এ কথার উত্তর দিউন।

ধর্ম্ম, ৮ম সংখ্যা, ২৫শে আশ্বিন, ১৩১৬

বিলাতের দূত

যেমন ভারতে, তেমনই বিলাতে বহু রাজনীতিক সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মত ইংরাজ জাতিকে নানা দলে বিভক্ত করে এবং তাহাদের সংঘর্ষে দেশের উন্নতি

ও অবনতি সংসাধিত হয়। মধ্যে মধ্যে এক এক সম্প্রদায়ের দূতস্বরূপ কোন বিখ্যাতনামা সংবাদপত্রলেখক বা পার্লামেন্টের সভাসদ এই দেশে আগমনপূর্ব্বক লোকমত ও দেশের অবস্থা কতক অবগত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভারতে নবজাগরণ ও দেশব্যাপী অশান্তির গুণে অনেক ইংরাজের দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, নবীন, উন্নতিশীল শ্রমজীবী দলে এইরূপ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ মিঃ কীর হার্ডি এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন, আবার সেই দলের একজন প্রসিদ্ধ নেতা, মিঃ র‍্যামসী ম্যাকডনাল্ড সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন। শ্রমজীবী দলের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে, এক দলের নেতা মিঃ ম্যাকডনাল্ড, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত মডারেট। একদলের নেতা মিঃ কীর হার্ডি, তাঁহারা তত নরমপন্থী নহেন। তাহা ভিন্ন চরমপন্থী ও সোসালিস্ট আছেন, তাঁহারা কীর হার্ডি ও ম্যাকডনাল্ড প্রভৃতিকে গ্রাহ্য করেন না। মিঃ ম্যাকডনাল্ড কীর হার্ডির ন্যায় বক্তৃতা ও মতপ্রচার করিতে অনিচ্ছুক, তিনি সংযতভাবে স্বীয় জ্ঞানলিপ্সা তৃপ্ত করিতে কৃতসংকল্প। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে তিনি সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তিনি এক ফরাসী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, "আমি অপেক্ষাকৃত উন্নতমতাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মিঃ অরবিন্দ ঘোষের বক্তব্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইব না, মধ্যপন্থীদলভুক্ত মিঃ ব্যানার্জ্জী ও নরমপন্থী মিঃ গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা পোষণ করি। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও গ্রীরসন প্রভৃতির ন্যায় প্রধান ব্যাঙ্কের চালকগণের সহিতও পরামর্শ করিব।" মিঃ ম্যাকডনাল্ড লর্ড মরলীর শাসন সংস্কার উদার বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এবং ভারতবাসী এইরূপ উদার সংস্কারের উপযুক্ত কি না তাহা স্বয়ং দেখিতে চাহেন। দুই মাস বা তিন মাস ভারতে ঘুরিয়া ভারতবাসীর উপযুক্ততা সম্বন্ধে মিঃ ম্যাকডনাল্ড স্বয়ং কিরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মিঃ ম্যাকডনাল্ড বিলাতের একজন প্রধান প্রজাতন্ত্র-সমর্থক; বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রজাতন্ত্রবাদীর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ উদারনীতিকের মুখে মরলীর সংস্কারের উদারতা-প্রশংসা যখন শুনিতে হইল, দেশবাসী বুঝুন, বিলাতে আন্দোলন করায় আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের উপযুক্ত ফললাভের সম্ভাবনা কত সুদূরপরাহত।

জাতীয় ঘোষণাপত্র

আমাদের রাজনীতিক কর্ত্তাদের গভীর, সূক্ষ্ম ও নানাপথগামী রাজনীতিক বুদ্ধির রহস্যময় গতি সর্ব্বদা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না। ৭ই আগষ্ট কলেজ স্কোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথা লইয়া গোল হইয়াছিল। কলেজ স্কোয়ারের নামে কর্ত্তারা এত ভীত হইয়াছিলেন যে, সেই দিন সভাপতি সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অগত্যা মিছিল পান্তির মাঠ হইতে বাহির হইবার ব্যবস্থা হইল। তথাপি অতি অল্পসংখ্যক লোক তথায় উপস্থিত হইলেন, অধিকাংশ লোক কলেজ স্কোয়ারের মিছিলে যোগদান করিতে গেলেন অথবা স্ব স্ব স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ৭ই আগষ্টের মিছিলের শোভা নষ্ট হয় এবং বিপক্ষগণ লোকের উৎসাহ ও বয়কটে তাহার ন্যূনতার কথা লিখিবার অবসর পান। এইবার কর্ত্তারা সেই ভীতি জয় করিয়াছেন, ৩০শে আশ্বিনের বিজ্ঞাপনে কলেজ স্কোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনে জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠের কথা বর্জ্জিত হইয়াছে। গত বৎসরের বিজ্ঞাপনে ছিল, “সভায় স্বদেশী মহাব্রত-গ্রহণ, বিদেশী-বর্জ্জন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ ও জাতীয় ঘোষণাপত্র-পাঠ হইবে।” এবার সেই কথার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, “সভায় বিদেশী-বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশী মহাব্রত গ্রহণ ও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ হইবে” লেখা আছে। কর্ত্তারা “জাতীয়” কথায়, না “ঘোষণা” কথায়, না ঘোষণাপত্রের মর্ম্মার্থে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। শ্রীযুত আনন্দমোহন বসু ফেডারেশন হলের জমিতে প্রথম এই ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়াছিলেনঃ — “যেহেতু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বজনীন আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করাই স্থির করিলেন, অতএব আমরা বাঙ্গালী জাতি ঘোষণা করিতেছি যে, এই বিভাগ-নীতির কুফল নিবারণ করিবার জন্য এবং জাতীয় একতা সংরক্ষণকল্পে আমরা আমাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।”

জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে এমন কি ভীষণ রাজদ্রোহসূচক কথা সন্নিবিষ্ট আছে যে, ৩০শে আশ্বিনের ভাবসূচক ও সমস্ত বঙ্গদেশের প্রতিজ্ঞাপ্রকাশক ঘোষণাপত্র সহসা বর্জ্জন করিতে হইল? না মরলী ও মিণ্টোর মনস্তুষ্টির জন্য এইরূপে নবোত্থিত জাতীয় ভাবকে খর্ব্ব করা আবশ্যক হইল? আমরা বঙ্গভঙ্গের কুফল নিবারণ করিব, জাতীয় একতা সংরক্ষণ করিব, এই পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মে সমগ্র

শক্তি প্রয়োগ করিব, এই কথাও ঘোষণা করিতে যদি সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে ৭ই আগষ্টের ও ৩০শে আশ্বিনের অনুষ্ঠান বন্ধ কর। এতটুকু তেজ ও সাহস যদি না থাকে, তাহা হইলে জাতীয় জাগরণ ও উন্নতির চেষ্টা বিফল বুঝিতে হইবে, বৃথা তাহার বাহ্যিক আড়ম্বর করা মিথ্যাচার মাত্র। জনসাধারণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, জনসাধারণ জাতীয় ঘোষণা বয়কট করিতে সম্মত হইবে না। আমরা সকলকে বলি, যদি এই ভুল সংশোধিত না হয়, ৩০শে আশ্বিনে সহস্রকণ্ঠে ঘোষণা পাঠের আদেশ কর, তাহার পরে যদি নেতাগণ সম্মত না হন, তাহা হইলে দায়িত্ব তাঁহাদের।

গুরু গোবিন্দসিংহ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পুস্তকে গুরু গোবিন্দসিংহের রাজনীতিক চেষ্টা ও চরিত্র সরল সহজ ভাষায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু শিখদের দশম গুরু কেবল যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না, তিনি ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ও ভগবদাদিষ্ট ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন, নানকের সাত্ত্বিক বেদান্ত শিক্ষাবহুল ধর্ম্মকে নূতন আকার দিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার ধর্ম্মমত ও তৎকৃত শিখধর্ম্ম ও শিখসমাজের পরিবর্ত্তন বিশদরূপে চিত্রিত হইলে এই সুন্দর জীবনী অসম্পূর্ণতা দোষে দূষিত হইত না। লেখক সংক্ষেপে শিখজাতির পূর্ব্ববৃত্তান্ত লিখিয়া গোবিন্দসিংহের চরিত্র ও আগমনের ঐতিহাসিক বীজ ও কারণ বুঝিবার সুবিধা করিয়াছেন। সেইরূপে পরবর্ত্তী বৃত্তান্তও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলে দশম গুরুর অসাধারণ কার্য্যের ফলাফল ও মহতী চেষ্টার পরিণতি বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইত। শিখ ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে গুরু গোবিন্দসিংহ। তিনি যে জাতি সংগঠনে তাঁহার সমগ্র প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করিলেন, সেই জাতির ইতিহাসই এই মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনচরিত। যেমন শিকড় ও ডগার অভাবে কাণ্ড শোভা পায় না, তেমনি শিখ সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব ও পর বৃত্তান্তের অভাবে গোবিন্দসিংহের জীবনচরিত অসম্পূর্ণ বোধ হয়। আশা করি লেখক দ্বিতীয় সংস্করণে এই অঙ্গ যোগ দিবেন এবং শিখ মহাপুরুষের ধর্ম্মমত ও সমাজ সংস্কারের বিশদ বর্ণনা করিয়া স্বলিখিত পুস্তক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবেন। তাঁহার পুস্তক পাঠে খালসা-সংস্থাপক স্বদেশহিতৈষী মহাবীরের উদার চরিত্র ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপের দিকে

মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। যাঁহারা দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে ইচ্ছুক হন, এই জীবনী তাঁহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিবে ও ঐশ্বরিক প্রেরণা দৃঢ়ীভূত করিবে।

ধর্ম্ম, ৯ম সংখ্যা, ১লা কার্ত্তিক, ১৩১৬

জাতীয় ঘোষণাপত্র

জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠ হইয়াছে, ইহা বড় সুখের বিষয়। ইহার মধ্যে আর কোনও কথা না উঠিলে, বাদ প্রতিবাদ বা মনোমালিন্যের কারণ ঘটিবার কোনও অবসর দিলেন না সেই জন্য নেতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ক্ষান্ত হইতাম। কিন্তু বেঙ্গলী পত্রিকা আমাদের মিথ্যাবাদী বলায় আমরা এই বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সহযোগী প্রকৃত কথা গুপ্ত রাখিয়া এই মাত্র বলিয়াছেন যে 'ধর্ম্ম'এ প্রকাশিত কথা সম্পূর্ণ অমূলক, অর্থাৎ আমরা মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত কথা প্রচার করিয়া মধ্যপন্থী নেতাদিগের উপর লোককে অসন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস করিলাম। তবে প্রকৃত ঘটনা জানিয়া বিচার করুন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গত বৎসরের বিজ্ঞাপনে "জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠ" হইবে এই কথা ছিল। এইবার যখন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছে, তখন একজন সম্ভ্রান্ত নেতা "জাতীয় ঘোষণাপত্র" কাটিয়া দিলেন এবং এই কথা বাদ দিয়া বিজ্ঞাপন বাহির করিবার হুকুম হইল। এই সম্বন্ধে যে পরামর্শের সময়ে প্রতিবাদ একেবারে হয় নাই, তাহাও নহে, কিন্তু নেতাদের কথার বিরুদ্ধে সজোরে কথা বলিবার কাহারও সাহস ছিল না। স্থির হইল, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. রসুল ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী স্বাক্ষর করিবেন। রসুল সাহেব জাতীয় ঘোষণাপত্র বর্জ্জন হইল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তিনি এই ভুল সংশোধন না হইলে বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত, এই অর্থে সুরেন্দ্রবাবুকে উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুত রসুলের নামযুক্ত বিজ্ঞাপন ছাপান ও বিলিও হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উত্তর প্রাপ্ত হইবামাত্র ছাপান ও বিলি বন্ধ হইয়া শ্রীযুত রসুলের নামের বদলে শ্রীযুত মতিলাল ঘোষের নাম বসাইয়া সেই বিজ্ঞাপনই ছাপাইয়া বিলি করা হইল। যাহা বলিয়াছি,

তাহা কেবল শোনা কথা নহে, অস্বীকার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, প্রত্যেক কথার অকাট্য প্রমাণ আছে। তাহার পর শ্রীযুত রসুল ও শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় ঘোষণাপত্র বর্জ্জন করিতে নেতাগণ সচেষ্ট আছেন বুঝিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং সভাপতি শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরীর উপর নোটিশ দিলেন যে এই সম্বন্ধে আমরা প্রকাশ্য সভায় আপত্তি উত্থাপন করিব এবং জাতীয় ঘোষণা পাঠ হইবার আদেশ যাহাতে হয়, সেই চেষ্টা করিব। উত্তরে শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ দেওঘর হইতে এই অর্থে টেলিগ্রাম করিলেন যে যদি গবর্ণমেণ্ট নিষেধ না করিয়া থাকেন। জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে সুরেন্দ্রবাবু ও যতীন্দ্রবাবু কোনও উত্তর করেন নাই। সভাপতি শুক্রবারে কলিকাতায় পৌঁছিলেন, রাত্রিতে পত্র পাইলেন, সেই জন্য তাঁহারও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। বুধবারে পত্র লেখা হইল, শুক্রবারে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ কলেজ স্কোয়ারে জাতীয় ঘোষণা পাঠ হইবে এই শুভ সংবাদ প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিলেন, শনিবার সকালে বেঙ্গলী পত্রিকায় আমাদের কথা অমূলক বলিয়া সেই শুভসংবাদ পাঠকবর্গকেও জানাইলেন। এই বৃত্তান্ত। সর্ব্বসাধারণই তাহার বিচার করুন।

৩০শে আশ্বিন

৩০শে আশ্বিনের সমারম্ভ দেখিয়া এইবার দেশবাসীর আনন্দ, বিপক্ষের মনঃক্ষোভ হইবার কথা। আন্দোলন যে নির্ব্বাপিত হয় নাই, বাধা বিঘ্ন, ভয় প্রলোভন অতিক্রম করিয়া পূর্ণমাত্রায় সজীব হইয়াছে। তাহার বাহ্যিক চিহ্ন বন্ধ কর, লুপ্ত কর, হৃদয়ে হৃদয়ে নূতন ভাব জাগ্রত রহিয়াছে, স্বরাজলাভেই নির্ব্বাপিত নহে, সন্তুষ্ট হইয়া অন্য আকার ধারণ করিবে। বিজাতীয় সংবাদপত্র লোকের উৎসাহ অস্বীকার করিতে সচেষ্ট হইবেই, কিন্তু তাহাদের লেখার মধ্যে নিজেদের উৎসাহভঙ্গ লক্ষিত হয়। ষ্টেট্‌সম্যান্ অন্য উপায় না দেখিয়া শ্রীযুত চৌধুরীর বক্তৃতা হইতে সান্ত্বনারস চুষিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেন না চৌধুরী মহাশয় ছাত্রদের রাজনীতি বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু ছাত্রগণ যে পূর্ণমাত্রায় ৩০শে আশ্বিনের সমারম্ভে যোগ দিয়াছেন, সেই কথা সম্বন্ধে নীরব কেন? লোকে বলে যে গতবারেও সভায় এত ভিড় হয় নাই, সেই জনতার প্রান্তে বসিবার স্থানও ছিল না, দাঁড়াইতে হইল। পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তায়, দেওয়ালে, ছাতেও লোক ছিল। বাঙ্গালী মাত্রই দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন, কেবল বড়বাজারে মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী দোকানদার লোভ

সম্বরণ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাদের দোকানে কিনিবার লোক অতি অল্পই দেখিলাম, প্রায় দোকান খুলিয়া বসিয়াই আছে। লোকের উৎসাহও কম ছিল না। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষকে সভা হইতে লইয়া যাইবার সময় সেই উৎসাহের তীব্রতা ও গভীরতা প্রকাশ পাইল। যে অনবরত জয়জয়কার ও বন্দে মাতরং ধ্বনি অনেকক্ষণ ধরিয়া পৃথিবী ও আকাশ বিকম্পিত করিল, সে নেতাদের প্রাপ্য নহে, এই দুর্দ্দিনে তাঁহারা আন্দোলনের চিহ্নস্বরূপ রহিয়া অগ্রভাগে জাতীয় ধ্বজা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই জন্য এই সম্মান। কাল যদি ভগ্নোৎসাহ হন বা সেই ধ্বজা ধূলায় লুটিতে দেন, জয়জয়কারের বদলে ধিক্কার ধ্বনি উঠিবে, নেতাগণ যেন সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ করেন।

গবর্ণমেণ্টের গোখলে না গোখলের গবর্ণমেণ্ট?

পুণার কাণ্ড ও গোখলে মহাশয়ের পরিণাম দর্শনে সমস্ত ভারত অবাক হইয়া রহিযাছে। শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ গোখলের বুদ্ধিতে ও চরিত্রে আমরা কখনও অন্য দেশবাসীর ন্যায় মুগ্ধ ছিলাম না। তাঁহার স্বার্থত্যাগের মধ্যে আমরা ব্যক্তিগত যশোলিপ্সা সম্মানপ্রিয়তা ও ঈর্ষা দেখিয়া অসন্তুষ্ট ছিলাম, তাঁহার দেশসেবার মধ্যে সাহস এবং উচ্চ আদর্শের অভাব বুঝিয়া তাঁহার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে চিরকালই আশঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এতদূর অবনতি এই ভারতবাসীর সম্মাননা ও ভালবাসার পাত্রের ভাগ্যে ঘটিবে। জানিতাম, যে তাঁহার বিখ্যাত ক্ষমাপ্রার্থনার পরে গোখলে মহাশয় রাজপুরুষদের অতীব প্রিয় পাত্র ছিলেন, তিনি যখন ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের সহিত বাদবিবাদ করিতেন, তখনও তাঁহাকে দেখিতেন যেন আলালের ঘরের দুলাল, গায়ে হাত বুলাইতেন, অথবা মিষ্ট মিষ্ট গাল দিতেন। কিন্তু একদিন যে তাঁহারই খাতিরে এক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র নিগ্রহ আইনে নিগৃহীত হইবে, পুণা সহর খানাতল্লাসীর ধূমধামে ব্যতিব্যস্ত হইবে, একজন সম্ভ্রান্ত উকিল পুলিস দ্বারা ধৃত ও অভিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য নগরবাসী ধৃত হইবার ভয়ে ব্যাকুলিত হইবেন, ইহা আমাদের স্বপ্নেরও আগোচর ছিল। জানিতাম গোখলে গবর্ণমেণ্টের, এখন জিজ্ঞাসা করিতে হইল, গবর্ণমেণ্ট কি গোখলের? গোপালকৃষ্ণ গোখলে কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ও ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অঙ্গ হইয়াছে? আমরা জানিতাম রাজনীতিক হত্যা বা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রশংসা করিলে দেশবাসীর ছাপাখানা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হয়,

বোমা বা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পুলিস পুঙ্গবদের তীব্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পহুঁছিলে সহরময় খানাতল্লাসীর ধূমধাম আরম্ভ হয়। একটী ব্যক্তির মানহানিতে বা তাঁহার উপর ভয় প্রদর্শনে যে এইরূপ নবযুগের কাণ্ড হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতাম না। এই নূতন প্রণালী গবর্ণমেণ্টের যোগ্য কি না, তাহা রাজপুরুষগণ বিবেচনা করুন। কিন্তু গোখলে মহাশয়ের পরিণাম দেখিয়া আমরা দুঃখিত রহিলাম। কবি যথার্থই বলিয়াছেন, আমরা মানুষ, বিগত মহত্ত্বের ছায়ার বিনাশেও আমাদের চক্ষে জল আসে। গোখলে মহাশয় কোন জন্মে মহৎ ছিলেন না, তবে তিনি মহতের ছায়া বটে। তাঁহার সকল মত, বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র তাঁহার নিজস্ব নহে, কৈলাসবাসী রাণাডের দান। গোখলের মধ্যে মহাত্মা রাণাডের ছায়া বিনষ্ট হইতে চলিল দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

ধর্ম্ম, ১০ম সংখ্যা, ২২এ কার্ত্তিক, ১৩১৬

বজেট যুদ্ধ

বিলাতে বজেট লইয়া যে মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে, সেই যুদ্ধ ইংরাজ রাজনীতির সামান্য বকাবকি নহে। উদারনীতিক দলে ও রক্ষণশীল দলে যে সংঘর্ষ হইত সে সামান্য মতভেদ লইয়া হইত। রিফর্‌ম বিলের পরে জমিদারবর্গ ও মধ্যশ্রেণী ইংরাজের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ ও বিরোধ রাণী এলিজাবেথ ও রাজা চার্লসের সময় হইতে ইংরাজ রাজনীতির ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা প্রশমিত হইল। মধ্যশ্রেণীর জিত হইল কিন্তু জেতা বিজিত পক্ষকে বিনষ্ট না করিয়া লব্ধ অধিকারের ভাগ দিল। তাহার পরে ঘরোয়া বিবাদ চলিতেছে। এই বিবাদে মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর সাহায্যে বিদ্রোহী জমিদারবর্গকে দমন করিবার আশায় আস্তে আস্তে ইংরাজ রাজনীতিক জীবনের ভিত্তি প্রশস্ত করিতেছে, তাহার ফলে ইংলণ্ড আজকাল (Limited Democracy) অসম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এখন লয়েড জর্জ্জ ও ওয়িন্‌ষ্টন চর্চ্চিল এই শান্ত রাজনীতিক জীবনে মহাবিভ্রাট ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতেছেন। আজকাল সমুদায় য়ুরোপে সোশ্যালিষ্ট দলের অতিশয় বৃদ্ধি ও প্রভাব হইতেছে। জার্ম্মাণীতে, ইতালীতে, বেলজিয়মে তাঁহারা মন্ত্রণাসভায় প্রবল ও বহুসংখ্যক। স্পেনে জোরজবরদস্তিতে

তাঁহাদের প্রচার ও দলবৃদ্ধি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া বার্সেলোনার ভীষণ দাঙ্গা, ফেররের মৃত্যু ও সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই স্রোতের বহির্ভূত ছিল, কেন না সেই দুই দেশে প্রজার স্বাধীনতা ও সুখের কতক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই দুই দেশেও সোশ্যালিষ্টদের প্রভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। লয়েড জর্জ্জের বজেটে হঠাৎ সোশ্যালিস্‌ম্ বৃটিশ রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। এই বজেটে জমিদারবর্গের সম্পত্তির উপর কর বসান হইয়াছে, তাহাতে জমিদারে ও মধ্যশ্রেণীতে যে সন্ধি স্থাপন হইয়াছিল, তাহার মুখ্য অঙ্গ বিনষ্ট হইয়াছে। জমিদারের জমিদারীর উপর একবার কর বসাইলে বৃটিশ প্রজাবর্গ অতি শীঘ্র সেই কর বাড়াইয়া বাড়াইয়া শেষে অল্প মূল্যে যত জমিদারী দেশের সম্পত্তি করিয়া লইবে। জমিদারবর্গ আর থাকিবে না। সেইজন্য জমিদারদের ভীষণ ক্রোধ হইয়াছে এবং জমিদার সভা (House of Lords) বজেট প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্ত্তন করিয়া Commonsএ ফিরাইয়া দিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। ইহাতে বৃটিশ রাজতন্ত্রের মূল নিয়মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। নামে প্রজার প্রতিনিধিবর্গের সর্ব্ববিধ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার জমিদার সভার আছে, কিন্তু বজেট কেবল সম্মানের জন্য সেই সভায় পাঠান হয়, জমিদার সভা কখন বজেটে হস্তক্ষেপ করে না। অতএব বজেট প্রত্যাখ্যাত হইবামাত্র উদারনীতিক মন্ত্রীগণ জমিদার সভার কমন্সকৃত প্রস্তাব নিষেধ করিবার অধিকার লোপ করা হউক, এই প্রস্তাব লইয়া ইংরাজ জাতির নিকট উপস্থিত হইবেন। উদারনীতিক দলের জয় হইলে পুরাতন রাজতন্ত্র নিষেধ অধিকারের লোপে লুপ্ত হইবে, শীঘ্র সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র স্থাপন, জমিদার সভা ও জমিদারবর্গের বিনাশ এবং সোশ্যালিস্‌মের বিস্তার হইবে। লয়েড জর্জ্জ ও চর্চ্চিল জানিয়া শুনিয়া এই রাষ্ট্রবিপ্লবের পোষকতা করিতেছেন, আস্কওয়িথ মরলী ইত্যাদি বৃদ্ধ মধ্যপন্থীগণ এই দুইজনের তেজে অভিভূত হইয়া এবং উচ্চপদের মোহে ও রাজনীতিক সংগ্রামের মত্ততায় অন্ধ হইয়া তাঁহাদের চেষ্টায় যোগদান করিতেছেন। আর Conservative England, রক্ষণশীল ইংলণ্ডের রক্ষা নাই। সর্ব্বগ্রাসী কলি ইংরাজজাতির জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ধর্ম্ম এবং মহত্ত্বের ভিত্তি সকল গিলিয়া ফেলিতেছে।

কি হইবে?

জানুয়ারী মাসে বিলাতে যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে, তাহার উপর ভারতের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে। আমাদের পক্ষে উদারনীতিক ও সোশ্যালিষ্টদের জয় একান্ত বাঞ্ছনীয়। যদি কখনও বৈধ প্রতিরোধ দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে স্বায়ত্তশাসনের বিল কমন্সে উপস্থিত করিতে বাধ্য করি, জমিদার সভা যেমন আইরিশ স্বায়ত্তশাসনের বিল প্রত্যাখ্যান করিল, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের বিলও প্রত্যাখ্যান করিবে। অতএব জমিদার সভার নিষেধ অধিকার নষ্ট হওয়াই আমাদের একমাত্র কার্য্যসিদ্ধির উপায়। ভগবান সেই উপায়ের উদ্যোগ করিতেছেন। সোশ্যালিষ্ট দলের প্রাবল্যে আমাদের আর বিশেষ কোন কার্য্যসিদ্ধির না হউক, নিগ্রহনীতি শিথিল করিবার সুবিধা হইতেও পারে, কেন না সোশ্যালিষ্ট দল এখন অধিকার-রহিত ও অধিকার লাভের প্রয়াসী, সেইজন্য জগতের অধিকার-রহিত সর্ব্ব সম্প্রদায় ও জাতির সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু এখন যে অবস্থা, তাহাতে উদারনীতিকদের জয় ও সোশ্যালিষ্টদের প্রাবল্যের আশা করা যায় না। বজেটে স্বতন্ত্র সম্পত্তির প্রথা বিনষ্ট হইবে, সোশ্যালিসম্ ইংলণ্ডে সংস্থাপিত হইবে, কাহারও ধনসম্পত্তি আর নিরাপদ নহে, এই রব তুলিয়া রক্ষণশীল দল অনেক উদারনীতিক ভদ্রলোককে স্বপক্ষে আকর্ষণ করিতেছেন। আবার টারিফ রিফর্মের ধুয়া উঠাইয়া অনেক নিম্নশ্রেণীর লোককেও তদ্রূপ হস্তগত করিয়াছেন। অবাধ বাণিজ্যে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রধান স্থান বিলুপ্ত হইয়াছে, অন্য জাতি তাঁহাকে হারাইয়া দিতেছে, সেইজন্য নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মাভাবে ও খাদ্যাভাবে হাহাকার আরম্ভ হইতেছে, এই মত উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা হইয়াছে। যে সকল নির্ব্বাচন গত কয়েক মাসে হইয়া গিয়াছে, এই উপায় দ্বারা রক্ষণশীল দলের বৃদ্ধি করা হইয়াছে, উদারনীতিক ভোট কমিয়া গিয়াছে, তথাপি উদারনীতিক ও সোশ্যালিষ্ট যদি এক হয়, রক্ষণশীল দল পরাজিত হইবে। কিন্তু এখন বিপরীত অবস্থা। যেখানে উদারনীতিক দাঁড়ায়, সেইখানে সোশ্যালিষ্ট দাঁড়ান। দুইজনের সংযুক্ত ভোট যদিও রক্ষণশীল নির্ব্বাচন প্রার্থীর ভোটের অধিক, তথাপি তাহাদের বিরোধে দুর্ব্বলপক্ষের জিত হয়। সোশ্যালিষ্টগণ ঠিক পথই ধরিয়াছেন, এইরূপ অসুবিধা ভোগ না করিলে উদারনীতিক দল তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইবে কেন? কিন্তু মিঃ আস্কওয়িথের যদি নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষে মিথ্যা কথা ও পরস্পর বিরোধী যুক্তি ব্যবহার করিতে করিতে বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, নির্ব্বাচনীর

পূর্ব্বেই তিনি সোশ্যালিষ্টদের আশু প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া আর সকল উদারনীতিক স্থানকে নিরাপদ করিবেন এবং টারিফ রিফর্‌মের ধুয়া উড়াইবার জন্য পার্লামেণ্ট ভঙ্গের পূর্ব্বেই নিষেধ অধিকার লোপের বিল কমন্সে উপস্থিত করিয়া তাহার উপরই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময়ে নির্ভর করিবেন। তাহা হইলে সমুদায় ইংরাজ নিম্নশ্রেণীর নির্ব্বাচক টারিফ রিফর্‌মের মোহ ভুলিয়া উদারনীতিক পক্ষে ভোট দিতে ছুটিয়া আসিবে। গ্লাডষ্টোন জীবিত থাকিলে তাহাই করিতেন, আস্কওয়িথ সাহেবের নিকট সেই চৌকস বুদ্ধি প্রত্যাশা করা যায় কিনা সন্দেহ।

ধর্ম্ম, ১১শ সংখ্যা, ২৯এ কার্ত্তিক, ১৩১৬

রিফর্‌ম

আজ সোমবার ১৫ই নভেম্বর — এই দিনে মহামতি লর্ড মরলী ও লর্ড মিণ্টোর গভীর ভারতহিতচিন্তায় রাজনীতিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদার মতের আসক্তি-ফলজাত শাসনসংস্কাররূপ মানসিক গর্ভ প্রসূত হইবে। লর্ড মরলী ধন্য, লর্ড মিণ্টো ধন্য, আমরা ধন্য। আজ ভারতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। আজ পারস্য, তুর্কী, চীন, জাপান পর্য্যন্ত ভারতের দিকে ঈর্ষার চক্ষে চাহিয়া 'ইংলিশম্যান'এর সুরে সুর দিয়া গাহিবে "ধন্য যাহারা পরাধীন, ধন্য ধন্য যাহারা য়ুরোপীয় জাতির পরাধীন, ধন্য ধন্য ধন্য যাহারা উদারনীতিক মরলী মিণ্টোর পরাধীন। আমরাও যদি ভারতবাসী হইতাম, এই সুখে বঞ্চিত হইতাম না।" আশা করি, যত ভারতবাসী নব উন্মাদনায় উন্মত্ত না হইয়া থাকেন, এই গানের কোরাস করিয়া আকাশমণ্ডল বিধ্বনিত করিবেন।

ইংলিশম্যানের ক্রোধ

আমরা অনেকদিন পূর্ব্বে সহকারী ইংলিশম্যানের সরলতার প্রশংসা করিয়াছিলাম। আবার আজ না করিয়া থাকিতে পারি না। অন্য অ্যাংলোইণ্ডিয়ান দৈনিকগুলি দ্বিমুখ সর্পবিশেষ, স্বাধীনতার প্রশংসা করে, এবং ভারতের পরাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। সহযোগীর চক্ষুলজ্জা নাই, যাহা মনে

আসে, তাহা কেবল মানহানির আইন চোখের সম্মুখে রাখিয়া বিনা আবরণে লেখেন, আবল-তাবল বকিতে হইলে আবল-তাবলই বকেন, যুক্তি, সত্য, সংলগ্নতার উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতে বড় ভালবাসেন। তিনি মুক্ত পুরুষ ও সংবাদপত্রের মধ্যে নাগা সন্ন্যাসী। ইংলিশম্যান স্বাধীনতার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠেন, যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরোধী, তেমনিই ইংলণ্ডের স্বাধীনতার বিরোধী। এক স্বেচ্ছাচারতন্ত্র সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া বিরাজ করিবে এবং ইংলিশম্যান তাহার মুখপাত্র হইয়া থাকিবে, ইহাই সহযোগীর রাজনীতিক আদর্শ। যাহারা স্বাধীনতার অনুমোদক ও প্রচারক, তাহারা বধ্য বা নির্ব্বাসন ও জেলের যোগ্য। মিঃ ব্যালফুর অধিকারপ্রাপ্ত হইলেই লুই নাপোলিয়নের ন্যায় রাষ্ট্রবিপ্লব করিয়া মিঃ লয়েড জর্জ্জ ও ওয়িনষ্টন্ চর্চ্চিলকে জেলে এবং মিঃ কীর হার্ডি ও ভিক্টর গ্রেসনকে কোর্ট মার্শালে পাঠাইবার পরামর্শ সহযোগী নিশ্চয়ই পাকেপ্রকারে দিবেন। স্বাধীনতা অপেক্ষাও সাম্য কথা তাঁহার অপ্রিয়। সহযোগী বলেন, সমস্ত য়ুরোপ ও আসিয়াখণ্ডময় যে সাম্যপ্রচার ও সাম্যের আকাঙ্ক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রচারকদের রক্তে নির্ব্বাপিত না হইলে পৃথিবীর যত সিংহাসন টলিবে এবং হেয়ার ষ্ট্রীট লুপ্ত হইবে। অতএব ভিক্টর গ্রেসন, বৃদ্ধ মূর্খ টলস্টয় ও "মানিকতলার" অরবিন্দ ঘোষকে — কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! — ইংলিশম্যান ঠিক ফেরারের ন্যায় বিনা বিচারে গুলি করিতে বলেন না, তবে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা না করিলে আর কেহ নিরাপদ থাকিবে না। এত সরলতার মধ্যে এই অসরলতা কেন? ইংলিশম্যানের ভয় কি? হিন্দুপঞ্চের কপালে যাহা লেখা ছিল, ইংলিশম্যান হাজার হত্যা বা বলপ্রয়োগের পরামর্শ দিলেও তাহার ভাগ্যে ইহা ঘটিবে না। প্রজাকে হত্যা করিবার প্রবৃত্তি বন্ধ করা আইনের উদ্দেশ্য, কিন্তু রাজার মনে হত্যার প্রবৃত্তি জাগাইবার চেষ্টায় কোন শাস্তি নাই।

দেওঘরে জীবন্ত সমাধি

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, একজন হিন্দু সাধু হরিদাস সন্ন্যাসীকে অতিক্রম করিয়া সমাধি-নিমগ্ন না হইয়াও জীবন্ত কবরে কয়েকদিন রহিয়াছিলেন। আমাদের দেশে পুরাতন বিদ্যা সকল লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা এইরূপ প্রয়োগে আশ্চর্য্যান্বিত হই। পূর্ব্বপুরুষদের কথা আমরা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেই। অথচ যে বিদ্যার ভগ্নাংশ মাত্র আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে, ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, শিক্ষায় আমাদের

হস্তগত হইয়াছে, তাহার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমস্ত বিদ্যা নবজাত শিশুর অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। যেমন শিশু যত পদার্থ সম্মুখে দেখে, তাহা হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বাহ্যজগতের কতক জ্ঞান সঞ্চয় করে, কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্বরূপ ও সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না, সেইরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রকৃতির স্থূল পদার্থ সকল হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কতক জ্ঞানসঞ্চয় করে। কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্বরূপ কি, স্থূল সূক্ষ্মের সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না এবং এই বিদ্যার অভাবে পদার্থের প্রকৃত স্বভাব অবগত হইতে পারে না। মনুষ্য সম্বন্ধে শবচ্ছেদ করিয়া রোগের লক্ষণ ও অবান্তর কারণ নিরীক্ষণ করিয়া যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় হয়, ততটুকু জ্ঞান পাশ্চাত্য বিদ্যায় পাওয়া যায়। এই জ্ঞান অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক বলেন, আকর্ষণশক্তি জগতের সর্ব্বব্যাপী ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম, কিন্তু মনুষ্য প্রাণায়াম দ্বারা আকর্ষণশক্তি জয় করিতে পারে এবং স্থূল জগতের বাহিরে সেই নিয়মের কোন জোর নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসনিঃশ্বাস রুদ্ধ হইলে প্রাণ শরীরে থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে যে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসনিঃশ্বাসের ক্রিয়া অনেকক্ষণ ও অনেকদিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইতে পারে অথচ সেই রুদ্ধনিঃশ্বাস ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ নড়িতে পারে ও কথা বলিতে পারে, বাঁচা ত দূরের কথা। ইহাতে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য বিদ্যা স্বক্ষেত্রে ও স্থূল পদার্থজ্ঞানেও কত সংকীর্ণ ও লঘু। আসল বিজ্ঞান আমাদেরই ছিল। সেই জ্ঞান স্থূল প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ না হইয়া সূক্ষ্ম প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু যে উপায় দ্বারা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই উপায় দ্বারা পুনর্লব্ধও হইতে পারে। সেই উপায় যোগ।

যুক্ত মহাসভা

সহযোগী বেঙ্গলী যুক্ত মহাসভার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত। সহযোগী যে সর্ত্তে জাতীয়পক্ষকে আহ্বান করিতেছেন, সেইগুলি মধ্যপন্থীদের অনুকূল। গত বর্ষে জাতীয়পক্ষ কনভেন্সনে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এবং কলিকাতা অধিবেশনে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার আশা দেখিয়া মধ্যপন্থীদের মনোনীত সর্ত্তে সম্মত হইলেন। এইবার তাঁহারা তত সহজে সম্মত হইতে পারেন না। ইতিমধ্যে রাজনীতিক

ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, পশ্চিম ভারতের মধ্যপন্থীগণের মনের ভাব পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে, জাতীয়পক্ষ আর গোখলে মেহতার অধীন হইয়া মহাসভা করিতে রাজী হইবেন না। তথাপি এখনও বিবেচনা হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইবার কথা, এখন এইরূপ মত প্রকাশে বাদবিবাদ হওয়ায় মিটমাটের বিঘ্ন হইবে মাত্র।

ধর্ম্ম, ১২শ সংখ্যা, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

হিন্দু সম্প্রদায় ও শাসন সংস্কার

আমরা যখন হিন্দু সভার কথা লিখিয়াছিলাম, তখন এই অর্থে মতপ্রকাশ করিয়াছিলাম যে, যদিও গবর্ণমেন্টের প্রসাদান্বেষী ও স্বতন্ত্রতা অনুমোদক মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর বিরক্ত হইয়া স্বতন্ত্র রাজনীতিক চেষ্টা করা হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক, তথাপি সেইরূপ চেষ্টায় দেশের অনিষ্ট ভিন্ন হিত সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। এখনও আমরা সেই মত পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ অবগত নহি। শাসন সংস্কারে বা নূতন ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের কোনও কালে আস্থা ছিল না, হিন্দু-মুসলমানকে বিনা পক্ষপাতে সেই সভায় সমান প্রবেশাধিকার দিলেও আমরা সেই কৃত্রিম সভার অনুমোদন করিতাম না। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে, এই সত্য যখন সম্পূর্ণভাবে এবং দৃঢ় হৃদয়ে গ্রহণ করিবার শক্তিলাভ করিব, তখন অতি শীঘ্রই প্রকৃত প্রজাতন্ত্র বিকাশের অনুকূল ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইবে। অতএব এই কৃত্রিম স্বর্ণভূষিত ক্রীড়ার পুতুল লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ করা আমাদের মতে বালকোচিত মূর্খতা মাত্র। তথাপি ইহা স্বীকার করি যে, এই নূতন সংস্কারে হিন্দু সম্প্রদায়ের অপমান ও বহিষ্কারের চেষ্টায় হিন্দু সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মুসলমানদের সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, যে প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা কম সে প্রদেশে অল্পসংখ্যক বলিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকবর্গের নির্ব্বাচিত স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং যে প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, সে প্রদেশে বহুসংখ্যক বলিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকবর্গের নির্ব্বাচিত স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদের কোথাও এই সুবিধা দেওয়া হয় নাই। যেস্থানে তাঁহারা অধিকসংখ্যক, সেস্থানে দেওয়া

যায় না, দিলে সভায় তাঁহাদের প্রাবল্য হইবে। যেস্থানে তাঁহারা অল্পসংখ্যক, সেইস্থানে দেওয়া হয় নাই, দিলে সভায় মুসলমানদের সম্পূর্ণ প্রাবল্য খর্ব্ব হইবে। মুসলমান নির্ব্বাচকবর্গ যে নিয়মানুসারে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব বা উদার মত লক্ষিত হয় না, অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাদ পড়িয়া গেলেন, অনেক অশিক্ষিত গবর্ণমেণ্টের খয়ের খাঁ নির্ব্বাচকবর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সেই নূতন সৃষ্টিতে প্রজাতন্ত্রের অস্পষ্ট দূরবর্ত্তী ছায়ার ছায়া পড়িয়াছে, হিন্দুদের উপর সেই এক রতি পরিমাণেও অনুগ্রহ হয় নাই। এইরূপে ভারতবর্ষের প্রধান সম্প্রদায়কে অপমানিত ও অসন্তুষ্ট করিয়া রাখার কৌশল কোন্ জগদ্বিখ্যাত রাজনীতিবিদের কল্পনায় প্রথম উদয় হইল, তাহা জানিবার জন্য মনে কৌতূহল হইল। বর্ক ও ভল্টরের ভক্তজন মরলী না কানাডা-শাসক লর্ড মিণ্টোর? না কোন গুপ্ত রত্নের?

মুসলমানদের অসন্তোষ

শাসন সংস্কারে দুইজন মুসলমান অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইংলণ্ডবাসী আমীর আলী সাহেব এবং কলিকাতার ডাক্তার সুহরাওয়ার্দ্দি, কিন্তু তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ এক ধরণের নহে। আমীর আলী রুষ্ট, কেননা এই শাসন সংস্কারে মুসলমানদের যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যল্প, জজ সাহেবের বিশ্বগ্রাসী লোভ তাহাতে তৃপ্ত হয় না। পূর্ব্বেও বুঝিয়াছিলাম যে সারাসেন জাতির ইতিহাস লিখিবার ফলে আমীর আলী সাহেবের মনে অতি উচ্চ ও প্রশংসনীয় মহত্ত্বলোভ জন্মিয়াছে, তাঁহার মনে মধ্যযুগের মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন ঘুরিতেছে। বিদ্রূপ করিলাম, কিন্তু ইহা বিদ্রূপ করিবার কথা নহে। মহৎ মন, মহতী আকাঙ্ক্ষা, বিশাল আদর্শ রাজনীতিক ক্ষেত্রে অতিশয় উপকারী ও প্রশংসনীয়, তাহাতে শক্তি হয়, উদার ক্ষত্রিয়ভাব হয়, জীবনের তীব্র স্পন্দন হয়, যে অল্পাশী, সে জীবন্মৃত। কিন্তু বিদ্রূপের কথা, হাস্যকর স্বপ্ন এই যে, বৃটিশ কর্ম্মচারীবর্গের অধীনে মুসলমানদের লুপ্ত মহত্ত্ব উদ্ধার হইবে। আমীর আলী কি মনে করেন যে ইংরাজ মুসলমানকে ভারতের "দেওয়ান" করিবার মানসে এই পক্ষপাত করিতেছেন? ডাক্তার সুহরাওয়ার্দ্দির অসন্তোষের কারণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তাঁহার নালিশ এই যে, বিলাতফেরৎ অনেক শিক্ষিত মুসলমানকে নির্ব্বাচন-অধিকারে বঞ্চিত করিয়া যত গবর্ণমেণ্টের খয়ের খাঁ অশিক্ষিত ওস্তাগর দফতরী বিবাহের

রেজিষ্ট্রার খাঁ বাহাদুর খাঁ সাহেবকে নির্ব্বাচক করা হইল। তিনি কি ইহাও বুঝিতে পারেন না যে বিলাতে, স্বাধীনতা-বিষ আছে, যাঁহারা বিলাতফেরৎ, তাঁহারা হয়ত সেই বিষে অল্পাধিক পরিমাণে বিষময় হইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে মহাবিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। আর এইরূপ সংস্কারে শিক্ষিত লোক উপযুক্ত নির্ব্বাচক, না খয়ের খাঁ ওস্তাগর দফতরী খান সাহেব খাঁ বাহাদূর বিবাহের রেজিষ্ট্রার উপযুক্ত নির্ব্বাচক? এই প্রশ্নের উত্তর ডাক্তার সাহেব বিবেচনা করিয়া দিউন, তাঁহার অসন্তোষ অজ্ঞানসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

মূল ও গৌণ

আমাদের রাজনীতিক চিন্তার প্রধান দোষ ও রাজনীতিক কর্ম্মে দৌর্ব্বল্যের কারণ এই যে আমরা মূল ও গৌণের প্রভেদ বুঝিতে অক্ষম। যাহা মূল, তাহাই ধরিতে হয়, যাহা গৌণ, তাহা মূলের অনুকূল যদি হয় মূলকে বজায় রাখিয়া গ্রহণ করিব, কিন্তু গৌণকে গ্রহণ করিতে গেলে যদি মূলকে পাইবার পথে বিঘ্ন বা বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে কোনও রাজনীতিবিদ গৌণকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। আমরা কিন্তু সম্মত হই, পদে পদে মূলকে ফেলিয়া গৌণকে আগ্রহের সহিত ধরিতে যাই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে গৌণকে লাভ করিলে শেষে মূল আপনিই হাতে আসিবে। বিপরীত কথাই সত্য, মূলকে লাভ করিলে তাহার সহিত যত গৌণ সুবিধা ও অধিকার জুটিয়া আসে। রিফর্‌মের সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ মজ্জাগত ভ্রম ও বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, কিছু লাভ করিলাম, কোন সময়ে আরও লাভ করিব, শেষে অল্প অল্প অধিকার লাভ করিতে করিতে স্বর্গে পহুঁছিব, যাঁহাদের এইরূপ ভাব, তাঁহারা এই কৃত্রিম ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত রাজনীতিক বটেন। শিশু ভিন্ন খেলনার দর বোঝে কে? কিন্তু শিশুপ্রকৃতি ত্যাগ করিয়া স্বপ্নরাজ্য হইতে অবতরণ করিয়া যদি একবার কঠিন ও অপ্রিয় সত্য দেখি, এইরূপ চিন্তাপ্রণালী কি ভ্রান্ত ও অমূলক তাহা সহজে বোধগম্য হয়। বিজ্ঞ শিশুগণ আমাদের সম্মুখে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া স্বমত সমর্থন করেন। কিন্তু এই কাল মধ্যযুগও নহে, রাণী এলিজাবেথের সময়ও নহে, প্রজাতন্ত্রের চরম বিকাশের কাল বিংশ শতাব্দী, আমরাও স্বজাতির অধীন ইংরাজ প্রজা নই, শ্বেতবর্ণ পাশ্চাত্য

রাজকর্ম্মচারীবর্গের কৃষ্ণবর্ণ আসিয়াবাসী প্রজা, অতএব এই অবস্থায় ও সেই অবস্থায় স্বর্গ-পাতালের ভেদ। ইংলণ্ডেও গৌণকে উপেক্ষা করিয়া মূলকে আদায় করিবার সুবিধা বা যন্ত্র না থাকিলে ইংলণ্ড হয় আজও স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অধীন দেশ হইয়া থাকিত, নহে ত রক্তপাতে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীন হইত। সেই সুবিধা বা যন্ত্র power of the purse, রাজা আমাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন, আমরাও রাজার বজেট ভোট করিব না এই অভ্রান্ত ব্রহ্মাস্ত্র। আইন সংগঠন বা বজেট প্রণয়নে অধিকার প্রজার প্রতিনিধিবর্গের হাতে থাকিলে আমরাও আর রিফর্ম বয়কট করিতে বলিতাম না। তবে কি না, রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করা বিজ্ঞের কর্ম্ম নহে, গবর্ণমেণ্ট ত গবর্ণমেণ্ট, তাঁহারা যাহা দেন, তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইহার পরে আরও দিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট কেন এই খেলনা ভারতের পক্বকেশ শিশুগণকে দিয়াছেন, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ? দেশময় অসন্তোষ ও অশান্তি এবং দৃঢ়ভাবে বর্জ্জন অস্ত্র প্রয়োগের ফলে তোমাদের এই লাভ হইয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, এই লাভে তোমরা সন্তুষ্ট হইবে, কি আরও দিতে হইবে। তোমরা যদি ইহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে আর একবার সেইরূপ তীব্র আন্দোলন ও বয়কটনীতির প্রয়োগ না হইলে আর কিছুই পাইবে না, না আকাশের চাঁদ, না চাঁদের কৃত্রিম স্বর্ণমাখা প্রতিকৃতি। যদি দেখেন যে ইহাতে হইল না — প্রকৃত অধিকার দিতে হইবে, তাহা হইলে প্রকৃত অধিকার দিবেন, অধিক না হউক, অল্প কিছু দিবেন। অতএব রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া দৃঢ়ভাবে বয়কট প্রয়োগই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। কিন্তু তোমাদের এই সব কথা বলা বৃথা, শিশুমহলে যে সন্দেশ রসগোল্লা প্রচলিত, সেইগুলিই তোমাদের মুখরোচক। আবার তোমরাই না কি ছেলেদের বল রাজনীতিতে মিশিতে নাই, তোমরা এখনও অপক্ববুদ্ধি, রাজনীতি বুঝিতে পার না। স্বয়ং ছেলেমানুষী বুদ্ধি ত্যাগ করিলে তাহার পরে এই কথা বলা উচিত ছিল।

একটী খাঁটী কথা

আমাদের রাজনীতিকগণকে দোষ দিব কেন, এই দেশে বৃটিশ আমলে অনেকদিন প্রকৃত রাজনীতিক জীবন লুপ্ত হইয়াছে, সেই অনুভবের অভাবে আমাদের নেতারা রাজনীতিতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এত দীর্ঘকাল পরাধীন দেশের শাসনে কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও ইংরাজ রাজনীতিকগণ এই কয়েক বৎসর ধরিয়া যে বিষম ভ্রম করিয়া আসিতেছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

বঙ্গভঙ্গের পরে এই রিফর্‌মই তাঁহাদের প্রধান ও মারাত্মক ভুল। এই রিফর্‌মের ফলে মধ্যপন্থীর প্রভাব দেশে বিনষ্ট হইবে, জাতীয় পক্ষের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হইবে, কর্ম্মচারিবর্গের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ক্ষতি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে অপদস্থ ও অপমানিত করিয়া যে বিষবীজ বপন করা হইয়াছে তাহাতে আরও গুরুতর ক্ষতি হইল। মিঃ র‍্যামসী ম্যাকডনাল্ড এম্পায়রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, এই হিন্দু-মুসলমান ভেদ রাজনীতিক্ষেত্রে স্থাপিত করিয়া কর্ম্মচারীবর্গ নিজের অনিষ্টই করিয়াছেন। কাঁচা রাজনীতিক আন্দোলন অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ও ধর্ম্মভেদমূলক অসন্তোষ ও আক্রমণ অতি গুরুতর ও গবর্ণমেণ্টের ভীতির কারণ। অতি খাঁটী কথা। আমরা যদি ইংরাজজাতির বিদ্বেষে গবর্ণমেণ্টের অকল্যাণই লক্ষ্য করিয়া দেশের কার্য্য করিতাম,— আমাদের শত্রুগণ সেই কথা রাতদিন প্রচার করেন — তাহা হইলে আমরা ইহাতে আনন্দিত হইতাম। কিন্তু আমরা গবর্ণমেণ্টের অকল্যাণ চাই না, দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতা চাই। হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষে যেমন গবর্ণমেণ্টের তেমন দেশের ভীষণ অকল্যাণ হইবে বলিয়া এই ভেদনীতির তীব্র প্রতিবাদ করি এবং হিন্দুসম্প্রদায়কে মুসলমানের সংঘর্ষ ত্যাগ করিয়া রিফর্‌ম বয়কট করিতে বলি।

ধর্ম্ম, ১৩শ সংখ্যা, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

র‍্যামসী ম্যাকডনাল্ড

আমরা র‍্যামসী ম্যাকডনাল্ডের ভারতে আগমনের সময়ে এই ভাবে লিখিয়াছিলাম যে, তিনি আসিয়াই বা কি করিবেন, অল্পদিনে ভারতে ফিরিয়া বা কি জানিয়া লইবেন, এবং মরলীর শাসন সংস্কারে যখন এত আস্থাবান, তাহার নিকট আমরাও বা কি সহানুভূতি বা লাভের প্রত্যাশা করিব? তাহার পরে মিঃ ম্যাকডনাল্ডের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। তিনি ভারতে অতি অল্পদিন ঘুরিয়া আগামী প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের সংবাদ পাইয়া বিলাতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই অল্পদিনেও প্রায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত বাস করিয়াছেন। অথচ দেখিলাম যে তিনি ভারতের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু মিঃ ম্যাকডনাল্ড রাজনীতিবিদ ও সতর্ক।

তিনি কীর হার্ডির ন্যায় তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা নহেন, নিজ মত অনেকটা গোপন করিয়া রাখেন, যাহা মনে ভাবেন তাহার অল্পাংশই বাক্যে ব্যক্ত করেন। বৃটিশ রাজনীতিক জীবনে তিনি শ্রমজীবীদলের নরমপন্থী নেতা। শ্রমজীবীরা সকলেই সোশ্যালিষ্ট, সকলেই এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, বর্ত্তমান সমাজ ও রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চান। কিন্তু কয়েকজন চরমপন্থী, প্রকাশ্যভাবে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া উদারনীতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলকে পরাভূত করিয়া প্রকৃত সাম্যপূর্ণ প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তিকে ডুবাইয়া সমষ্টিকে দেশের সর্ব্ববিধ সম্পত্তি ও আধিপত্যের অধিকারী করিতে কৃতসঙ্কল্প। মধ্যপন্থী শ্রমজীবী কীর হার্ডির দল, উদারনীতিক দলের সহিত যখন সুবিধা যোগদান করেন, যখন সুবিধা সেই দলের বিরুদ্ধাচরণ করেন, আমাদের ভূপেনবাবু ও সুরেনবাবুর ন্যায় Association cum Opposition নীতি অবলম্বন করিয়া এক হস্তে যুদ্ধ করেন, এক হস্তে আলিঙ্গন করেন। নরমপন্থীগণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া উদারনীতিকদের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে চান। উদ্দেশ্য কিন্তু একই। মিঃ ম্যাকডনাল্ড অতিশয় বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও চতুর রাজনীতিবিদ; বিলাতের ভাবী মহাযুদ্ধে তিনি বোধহয় একজন প্রধান মহারথী হইবেন। ভারতের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে, কিন্তু এই অবস্থায় ভারতের কোন হিতসাধন করা তাঁহার সাধ্যাতীত।

রিফর্ম ও মধ্যপন্থীগণ

মধ্যপন্থীদল তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত শাসন সংস্কার পাইয়াছেন কিন্তু সেই লাভে হর্ষপ্রফুল্ল না হইয়া শোকসন্তপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের ক্রন্দন ও তীব্র অভিমানের যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহাদের চতুরচূড়ামণি শ্বেত শ্যামরায় মধ্যপন্থী রাধার সহিত তাঁহার স্বভাবসুলভ ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিয়া চন্দ্রাবলীকে কৌন্সিল অভিসারে ডাকিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন। মধ্যপন্থীগণ বলিতেছেন, আমরাই শাসন সংস্কার করাইলাম, অথচ আমরাই সেই সংস্কারে বহিষ্কৃত হইলাম, যাঁহারা শাসন সংস্কারের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই গৃহীত হইয়াছেন, একি বিদ্রূপ, একি অন্যায়। এই করুণ অভিমানপূর্ণ নিবেদন চারিদিকে শুনিতেছি, তবে প্রভেদ আছে। বোম্বাইবাসিনী রাধা চির অভ্যাস রক্ষা করিয়া শ্যামের সহিত প্রেমে মাখা মধুর কলহ করিতেছেন, বঙ্গবাসিনী রাধার বিষম মান, আর শ্যামের মুখ দেখিব না, সেই কথা বলিবার

সাহস নাই, শ্যামকে একেবারে চটাইতে চান না, অথচ মনে মনে সেই ভাবই রহিয়াছে। মধ্যপন্থীদের বিপ্রলব্ধ দশা দেখিয়া হাসিও পায় দয়াও হয়। কিন্তু রাধার মনে রাখা উচিত ছিল যে কেবলই কলহ কেবলই আবদার করিলে প্রেম টেকে না, মানের ভয়ে রাধার শ্রীচরণে পড়িয়া নিজ সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দেয়, শ্বেতবর্ণ শ্যামসুন্দর সেইরূপ ছেলে নহে। দুঃখের কথা, যে বেলভিডীর নিবাসী শ্যামসুন্দর বেশী প্রেম দেখাইয়াছিলেন, তিনিই বেশী ধূর্ত্ততা করিয়াছেন, এখন মানভঞ্জন করিবে কে? বৃদ্ধ মরলী আবার কি নূতন বংশীরব করিয়া ইঁহাদের আহত হৃদয়কে শীতল করিবেন?

গোখলের মানহানি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ মাননীয় গোখলে মহাশয়ের বিরুদ্ধে কয়েকজন অপক্কবুদ্ধি লোক অযথা তিরস্কার ও বিদ্রূপ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রজাকে উত্তেজিত করিয়াছিল, ইহা বড় দুঃখের কথা। গোখলে মহাশয় মর্ম্মাহত হইয়া বৃটিশ বিচারকদের আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে তাঁহার মানহানির পন্থা বন্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রধান শত্রু ও নিন্দুক হিন্দু পঞ্চকে বিনাশ করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। মিথ্যা কথা বলিতে নাই, বিশ্বাস করিলেও যে কথা তুমি বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে অক্ষম, সেই কথা লিখিতে নাই। হিন্দু পঞ্চের সম্পাদক এবং পুণার উকীল শ্রীযুত ভীড়ে এই কথা বিস্মৃত হইয়া দণ্ডের পাত্র হইয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে নালিস করিয়া লোকপ্রিয়তা আদায় করা যায় না। অপর লোকে গোখলে মহাশয়ের মানহানি করিলে তাহার উপায় আছে, তিনিও সেই উপায় আবলম্বন করিয়া জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু নিজে নিজ মানহানি করিলে তাহার কি উপায় হইতে পারে। গোখলে মহাশয় যাহার প্রশংসা করিতেন, এখন তাহার নিন্দা করিতেছেন, যাহার নিন্দা করিতেন তাহার প্রশংসা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহার উপর সহজেই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। আগে কর্ম্মচারীদের প্রিয় হইয়াও প্রজার প্রীতি আকর্ষণ করা কঠিন হইলেও অসাধ্য ছিল না, কিন্তু নূতন প্রলয়ের পরে সেইরূপ জলস্থলবাসী জানোয়ার লোপ পাইয়াছে।

নূতন কৌন্সিলর

যখন বনের বড় বড় বৃক্ষ সকল কাটে, তখন সহস্র অলক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছপালা চক্ষু আকর্ষণ করে। আগে ভূপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, দ্বারভাঙ্গা, রাসবিহারী ইত্যাদি বড় বড় রাজনীতিক নেতা, বিখ্যাত জমিদার ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতেন, নূতন সংস্কারের প্রভাবে এইরূপ লোককে সরাইয়া সাগরের উপরে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য উঠিয়া সহর্ষে নবসূর্য্য কিরণে লম্ফ করিতেছে। প্রতিদিন নূতন নূতন নির্ব্বাচনপ্রার্থীর নাম পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। এতগুলি অজানা মহার্ঘ্য রত্ন এতদিন অন্ধকারে লুকাইয়া ছিল? আমরা লর্ড মরলীকে ধন্যবাদ দিই, দেশ এত ধনী ছিল, নিজের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে পারে নাই, মরলীর প্রভাবে রুদ্ধ ধনভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়াছে — সকল রত্ন সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া নয়ন ঝলসিয়া দিতেছে।

ধর্ম্ম, ১৪শ সংখ্যা, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ট্রান্সভালে ভারতবাসী

ট্রান্সভালবাসী ভারতসন্তান যে দৃঢ়তা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। প্রাচীন আর্য্যশিক্ষা ও আর্য্যচরিত্র এই দূর দেশে এই নিঃসহায় পদদলিত কুলীমজুর দোকানদারের প্রাণে যেমন তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, ভারতে বঙ্গদেশেও সেইভাবে, সেই পরিমাণে এখনও জাগে নাই। বঙ্গদেশে আমরা বৈধ প্রতিরোধ মুখে সমর্থন করিয়াছি মাত্র, ট্রান্সভালে তাঁহারা কার্য্যে সেই প্রতিরোধের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। অথচ ভারতে যে সকল সুবিধা ও সহজ ফলসিদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, ট্রান্সভালে তাহার লেশমাত্র নাই। এক একবার মনে হয়, ইহা বৃথা চেষ্টা, কোন আশায় ইঁহারা এত যাতনা, এত ধননাশ, এত অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিতেছেন? ভারতে আমরা ত্রিশ-কোটী ভারত সন্তান, রাজপুরুষগণ ও তাহাদের স্বজাতীয় সহায় মুষ্টিমেয় লোক, এই ত্রিশ-কোটী লোক দশদিন বৈধ প্রতিরোধ করিলে বিনা রক্তপাতে স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র আপনি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, এক কোটী লোকও সেই পথ দৃঢ়তার সহিত

অবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যে শান্ত অনিন্দ্য আইনসঙ্গত উপায়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল সুসম্পন্ন হইবে। ট্রান্সভালে মুষ্টিমেয় ভারতবাসী দেশের লোকের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, কোনও বল নাই, কোনও leverage নাই, তাঁহারা সকলে জেলে পচিলে দেশচ্যুত হইলে, নির্ম্মূল হইলে গরীব ট্রান্সভালবাসীর অল্পদিন আর্থিক ক্ষতি ও কষ্ট হইবে বটে কিন্তু সেই দেশের, সেই গবর্ণমেণ্টের কোন গুরুতর বা স্থায়ী অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং তাঁহাদের শত্রুগণ এই পরিণামই চান। আর্খিমীদীস বলিতেন, উত্তোলন-যন্ত্র রাখিবার স্থান যদি পাই, পৃথিবী শূন্যে উত্তোলন করিতে পারি। ইঁহাদের উত্তোলন-যন্ত্রও নাই, রাখিবার স্থানও নাই, অথচ পৃথিবী শূন্যে উত্তোলন করিতে উদ্যত। তথাপি তাঁহাদের পরিশ্রম কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন, আমরা ভারতবাসী, আমরা আধ্যাত্মিক বলে আস্থাবান, আধ্যাত্মিক বলে আমরা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিব। ভারতবাসী ভিন্ন এই জ্ঞান, এই শ্রদ্ধা, এই নিষ্ঠা কোন্ জাতির আছে বা থাকিতে পারে? ইহাই ভারতের মহত্ত্ব যে এই নিষ্ঠার বলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সহস্র সহস্র সংসারী সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া সরল প্রাণে দৃঢ় সাহসে এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। হয়ত যে ফলের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, সেই ফল হস্তগত হইবে না, কিন্তু এই মহৎ চেষ্টার মহৎ পরিণাম হইবে, ইহাতে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধিত হইবে, তাহার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

টাউনহলের সভা

মিঃ পোলক ট্রান্সভালবাসী ভারতসন্তানদের প্রতিনিধিরূপে এই দেশে আসিয়া ভারতবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। আমাদের সহানুভূতির অভাব নাই, ক্ষমতার অভাবে আমরা নিরুপায় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমাদের তিনটী পন্থা আছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদন করিতে পারি, ইহাতে কোন ফলের আশা নাই, গবর্ণমেণ্টও ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্টের এইরূপ বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট, কিন্তু আমাদের রাজপুরুষগণ আমাদের অপেক্ষাও নিরুপায়। যে বিষয়ে ভারতের হিত ইংলণ্ডের হিতের বিরোধী, সেই বিষয়ে ভারতীয় রাজপুরুষগণ ইচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের হিতসাধনে অক্ষম। ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করা ইংলণ্ডের অহিতের, ঔপনিবেশিকগণের ক্রোধ বিফল মনের ভাব নহে, সেই ক্রোধ কার্য্যকর। ভারতবাসীর হিতে আঘাত পড়িলে পরাধীন

ভারতবাসী কাঁদিবে, আর কি করিবে? আমরা নাটালে কুলি পাঠাইবার পথ বন্ধ করিতে বলিতেছি, ইহাতে নাটালবাসী যদি অসন্তোষ প্রকাশ করেন, আমাদের গবর্ণমেণ্ট কখনও এই উপায় অবলম্বন করিতে সাহসী হইবেন না। দ্বিতীয় পন্থা, ট্রান্সভালের ভারতবাসীদিগকে অধিক সাহায্যে পুষ্ট করা, বিশেষতঃ তাঁহাদের বালকদের শিক্ষাদানে এইরূপ সাহায্য করিলে তাঁহাদের এক গুরুতর অসুবিধা দূরীভূত হইবে। এইরূপ সাহায্য দেওয়া সহজ নহে। ভারতেও অর্থের অশেষ প্রয়োজন, অর্থের অভাবে কোন চেষ্টা ফলবতী হয় না। তবে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি আছে, গোখলেও দূরবর্ত্তী বৈধ প্রতিরোধের প্রশংসা করিয়াছেন, ভারতের রাজদ্রোহভয়ক্লিষ্ট ধনী সন্তান কেন এই নির্দ্দোষ যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন? তৃতীয় পন্থা, সমস্ত ভারতময় প্রতিবাদের সভা করিয়া গ্রামে গ্রামে ট্রান্সভালবাসী ভারতসন্তানদের অপমান, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, দৃঢ়তা, স্বার্থত্যাগ জানাইয়া ভারতের সেই আধ্যাত্মিক বল জাগান। কিন্তু সেই কার্য্যের উপযোগী ব্যবস্থা ও কর্ম্মশৃঙ্খলা কোথায়। যে দিন বঙ্গদেশ বোম্বাইয়ের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের একতা ও বলবৃদ্ধি করিতে শিখিবে, সেইদিন সেই ব্যবস্থা ও কর্ম্মশৃঙ্খলা হইতে পারে, আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্যান্য প্রদেশের লোকও সেই পথে ধাবিত হইবে। সেই পর্য্যন্ত এই নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য অবস্থা থাকিবে।

নির্ব্বাসিত বঙ্গসন্তান

এক বৎসর গতপ্রায়, নির্ব্বাসিত বঙ্গসন্তান এখনও নির্ব্বাসনে, কারাগারে। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপ্রত্যাশীগণ একবর্ষকাল কেবলই বলিতেছেন, এই হইল, কারামুক্তি হইল, মরলী একপ্রকার সম্মত হইলেন, কাল হইবে, অমুক অবসরে হইবে, রাজার জন্মদিনে হইবে, রিফর্ম প্রচার হইলেই হইবে, প্রতিবাদ সভা কর না, গোল কর না, গোল করিলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে। অথচ সেইদিন ম্যাকডনাল্ড সাহেবের মুখে শুনিলাম ভারতবাসীর নিশ্চেষ্টতায় পার্লামেণ্টে কটন প্রভৃতির আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কেন না বিলাতের লোক বলিতেছে, কই ইঁহারা গোল করিতেছেন, ভারতে সাড়া শব্দ নাই, তাহাতে বোঝা গেল নির্ব্বাসনে ভারতবাসী সন্তুষ্ট, নির্ব্বাসিতদের কয়েকজন আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিই আপত্তি করিতেছেন, নির্ব্বাসনে লোকমত ক্ষুব্ধ নহে। বিলাতের প্রজার পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। সমস্ত দেশ নির্ব্বাসনে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ রহিয়াছে,

অথচ সকলে নীরবে শান্তভাবে গবর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতি শিরোধার্য্য করিলেন, ইহা বৃটিশ জাতির ন্যায় তেজস্বী ও রাজনীতি-কুশল জাতির বোধগম্য নহে। তাহার উপর মাদ্রাজ কংগ্রেস নামে অভিহিত রাজপুরুষ-ভক্তদের মজলিসে বড় বড় নেতাগণ মরলী-মিণ্টোর স্তবস্তোত্র করিয়া বয়কট বর্জ্জনপূর্ব্বক গান করিয়াছেন, ‘‘আহা, আজ ভারতের কি সুখের সময়।’’ বঙ্গদেশের সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীর আদরের গোখলে পুণায় গবর্ণমেণ্টের ‘‘কঠোর ও নির্দ্দয় নিগ্রহনীতির’’ আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া ভারতবাসীর নেতা ও প্রতিনিধিরূপে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ রাজ-নীতিতে কোনওকালে কোনও দেশে কোনও রাজনীতিক সুফল লব্ধ হয় নাই, হইবেও না।

যুক্ত মহাসভা

সহযোগী ‘‘বেঙ্গলী’’ সেইদিন আবার অসময়ে যুক্ত মহাসভার কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, যিনি ক্রীডে সহি করিবেন না বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট না হইয়া স্বাধীনতাকেই আদর্শ করেন, তাঁহার ‘‘কংগ্রেসে’’ প্রবেশ অধিকার নাই, তিনি মেহতা গোখলে মজলিসের উপযুক্ত নহেন। এই প্রবন্ধ লইয়া অমৃত-বাজার পত্রিকার সহিত সহযোগীর বাদ-বিবাদ হইয়াছে, ‘‘বেঙ্গলী’’ বলিয়াছেন, এখন বাদ-বিবাদ করা অনুচিত, মিলনের যে অল্প সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা নষ্ট হইতে পারে। উত্তম কথা। আমরা পূর্ব্বেই বেঙ্গলীকে সেই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিলাম এবং মৌনাবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আশা করি যতদিন এই বিষয়ের মীমাংসা না হয়, সহযোগী আবার বাক্‌সংযম করিবেন। কিন্তু যখন বেঙ্গলী এইরূপ স্বাধীনতা-আদর্শ বর্জ্জন করিতে আদেশ প্রচার করিয়াছেন, আমরা তাহার উত্তরে বলিতে বাধ্য যে, আমরা সত্য ও উচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া মেহতা মজলিসে প্রবেশ করিবার জন্য লালায়িত নহি, আমরা যুক্ত মহাসভা চাই, মেহতা মজলিস চাই না। স্বাধীনচেতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত সন্তানদের প্রবেশের বিরুদ্ধে সেই মজলিসের দ্বার রুদ্ধ তাহা জানি। কনষ্টিটিউশনরূপ অর্গল ও ক্রীড নামক তালা দিয়া সযত্নে বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা জানি। যখন ভারতের অধিকাংশ ধনী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদ স্বাধীনতা-আদর্শ প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে ভীত হন, তখন আমরাও মহাসভার সেই বিষয়ে জেদ করিতে রাজী নহি, কলিকাতায়ও

জেদ করি নাই, সুরাটেও করি নাই। যতদিন সকলে একমত না হই, ততদিন স্বায়ত্তশাসনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী আছি। কিন্তু আমাদিগকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে মত দিতে, সত্যভ্রষ্ট হইতে, মিথ্যা আদর্শ প্রচার করিতে আদেশ করিবার তোমাদের কোনও অধিকার নাই। স্বাধীনতাই আমাদের আদর্শ, তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হউক বা বহির্ভূত হউক, কিন্তু আইনসঙ্গত উপায়ে সেই আদর্শসিদ্ধি বাঞ্ছনীয়। যদি মেহতা মজলিস মহাসভায় পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে সেই রুদ্ধ দ্বারের তালা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, কনষ্টিটিউশনও দ্বারের অর্গল না হইয়া কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। নচেৎ অন্য প্রতিষ্ঠার উপর মহাসভা সংগঠন করা উচিত। অবশ্যই ইহা আমাদেরই মত, যে কমিটী হুগলীতে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার পরামর্শের পরিণাম অবগত নহি, শেষ ফলের অপেক্ষায় রহিয়াছি।

রমেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের পরলোক গমনে বঙ্গদেশের একজন উদ্যমশীল, বুদ্ধিমান ও কৃতি সন্তান কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। রমেশচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিতে, রাজ্যশাসনে, বিদ্যাচর্চ্চায়, সাহিত্যে তিনি যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী পুস্তকদ্বারা ভারতবাসীর মন বয়কটগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, যদি রমেশচন্দ্রের আর সকল কর্ম্ম, পুস্তক ইত্যাদি বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হয়, এই একমাত্র অতি মহৎ কার্য্যে তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। কাহারও মৃত্যুতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতে সম্মত নহি, কারণ আমরা মৃত্যুকে মানি না, মৃত্যু মায়া, মৃত্যু ভ্রম। রমেশচন্দ্র মৃত নহেন, এই শরীর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন মাত্র এবং সেই স্থান হইতেও তাঁহার পরলোকগত আত্মা প্রিয় স্বদেশের অভ্যুত্থানের সাহায্য করিতে নিষিদ্ধ নহে।

বুদ্ধগয়া

গত ৩রা ডিসেম্বর প্রত্যূষে, পশ্চিমবঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর সদলে মটরকারে করিয়া, বোধ গয়াস্থ প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। ঐ প্রাচীন মন্দিরটী

গয়া হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার কৌতূহলোদ্দীপক আদর্শখানি হিন্দু এবং বৌদ্ধগণের ঘোরতর মনোমালিন্যের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। মোহন্ত ছোটলাট বাহাদুরকে বাড়ীটীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া যাবতীয় প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় দেখাইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস এই যে, যেখানে রাজকুমার সিদ্ধার্থ সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মন্দিরটী ঠিক সেই স্থানের উপরে অবস্থিত। যে বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি তাঁহার নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়, সেটী এখন বর্ত্তমান নাই। মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধদেবের একটী প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানে প্রাচীন অশোক রেলিংএর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার অনেকখানি আজিও দাঁড়াইয়া আছে। ইহা নিঃসন্দেহে অশোকের সমকালীন এবং অন্যূন দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। রেলিংএর অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলির দেওয়াল চাপা পড়িয়াছিল। সেগুলি যথাস্থানে আবার বসান হইয়াছে। দ্বিসহস্রাধিক বর্ষকাল ধরিয়া এই মন্দিরটী সমগ্র প্রাচ্য-ভূখণ্ডের বৌদ্ধগণের একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম, ১৫শ সংখ্যা, ২৭এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ফেরোজশাহের চাল

কুচক্রীর চক্র বোঝা দায়। ফেরোজশাহ মেহতা কুচক্রীর শিরোমণি, যখন জোরে পারেন না, হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত চাল চালিয়া অভীষ্টসিদ্ধি আদায় করা তাঁহার অভ্যাস। কিন্তু লাহোর কন্‌ভেন্সনের পনের দিন পূর্ব্বে যে অপূর্ব্ব চাল চালিয়াছেন, তাহাতে কাহার কি লাভ হইবে, তাহা বলা কঠিন। লোকে অনেক অনুমান করিতেছে, কেহ কেহ বলে, ফেরোজশাহ বঙ্গদেশের ও পঞ্জাবের অসন্তোষে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিতেছেন। স্বীকার করি, বোম্বাইয়ের এই একমাত্র সিংহ কলিকাতায় লোকমতের ভয়ে পেটে ল্যাজ গুটাইয়া রাখিয়াছিলেন, পাছে কেহ মাড়ায়, — কিন্তু লাহোর কন্‌ভেন্সন সিংহ মহাশয়ের নিজের গর্ত্ত, সেইখানে কোনও ভক্তিহীন জন্তুর প্রবেশ কঠিন আইনে নিষিদ্ধ। তাহার উপর অভ্যর্থনা সমিতি নিয়ম করিয়াছে যে, স্বেচ্ছাসেবক বল, দর্শক বল, কেহ পাণ্ডালে উচ্চ

শব্দ করিতে পারিবে না, না hiss; না বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, না "shame, shame", না জয়জয়কার! যে করিবে, তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া সভা হইতে বাহির করা হইবে। সিংহ কিসেতে ভীত? ল্যাজ মাড়ান দূরের কথা, প্রভুর কাণে কোন বিরক্তিসূচক শব্দও পৌঁছিতে পারে না, চারিদিক নিরাপদ। আবার কেহ কেহ বলে, সার ফেরোজশাহ ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্য হইতে আহূত হইয়াছেন, তাঁহার রাজভক্তির চরম বিকাশের চরম পুরস্কার হাতে পড়িতেছে, সেইহেতু আর কন্‌ভেন্সনের সভাপতি হইতে তিনি অক্ষম। কিন্তু পনের দিন বিলম্ব মাত্র, সার ফেরোজশাহ কি এত নিষ্ঠুর পিতা, যে তাঁহার আদরের কন্যার শেষ রক্ষা করিয়া স্বর্গে যাইতে অসম্মত হইবেন, গবর্ণমেণ্টও কি কন্‌ভেন্সনের মূল্য বোঝেন না? এই আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য ফেরোজশাহকে পনের দিন ছুটী দিবেন না? আমরাও একটী অনুমান করিয়া বসিয়াছি। শাসন সংস্কারে সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে, সেই কথা ফেরোজশাহের অজ্ঞাত নহে অথচ শাসন সংস্কার ও গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের লোভ দেখাইয়াই তিনি সুরাটে মহাসভা দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন। তাহার পরে বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণকে এত রূঢ়ভাবে অবমাননা করিয়াছেন যে, তাঁহারা লাহোরে গিয়া আবার অপমানিত হইতে অনিচ্ছুক। ফেরোজশাহ স্বয়ং বলেন যে, গুরুতর রাজনীতিক কারণে তিনি সভাপতিপদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই কি সেই রাজনীতিক কারণ নহে? পদত্যাগের ফলে যদি সুরেন বাবুরা কন্‌ভেন্সনে যোগ দিতে রাজী হন, শাসন সংস্কার গ্রহণের দোষ মেহতার ভাগে না পড়িয়া সমস্ত মধ্যপন্থীদলে সমভাবে বিভক্ত হয়, এই আশা। বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণের অনুপস্থিতিতে মেহতার সভাপতিত্বে অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি দ্বারা শাসন সংস্কার যদি গৃহীত হয়, সংস্কারের দশা ও কন্‌ভেন্সনের দশাও অতি শোচনীয় হইবে। ফেরোজশাহের ইচ্ছা, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণকে লাহোরে হাজির করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের কার্য্য হাসিল করিবেন, স্বয়ং বঙ্গদেশীয় শিখণ্ডীর পশ্চাৎ গুপ্তভাবে যুদ্ধ করিবেন। নচেৎ কুচক্রীর শিরোমণি উদ্দেশ্যহীন চাল চালিবেন কেন?

পূর্ব্ববঙ্গে নির্ব্বাচন

পূর্ব্ববঙ্গ প্রথম হইতে যে তেজ, সত্যপ্রিয়তা ও রাজনীতিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখাইয়া আসিতেছে, শাসনসংস্কারের পরীক্ষায় বোঝা গেল সেই সকল গুণ নিগ্রহে ও

প্রলোভনে নিস্তেজ হয় নাই, যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। ফরিদপুরে একজন হিন্দুও নির্ব্বাচন প্রার্থী হন নাই, ঢাকায় একজন মাত্র মরলীর মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন, ময়মনসিংহে যে চারিজন এই রাজভোগের আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুইজন আবার চৈতন্য লাভ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, আর দুইজন আশা করি, শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করিবেন। অতি আশ্চর্য্যের কথা, শুনিতেছি অশ্বিনীকুমারের বরিশাল সংস্কার-মদে মাতাল হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মরলীর মনের মত নৃত্য করিতেছে। এই দুর্ব্বুদ্ধি কেন? নির্ব্বাসিত অশ্বিনীকুমারের এই অপমান কেন? বরিশালের দেবতা বৃটিশ কারাগারে নিবদ্ধ, কঠিন রোগে আক্রান্ত অথচ বিনা কারণে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষায় বঞ্চিত, তাঁহার বরিশাল তাঁহাকে ভুলিয়া রাজপুরুষদের প্রেমের বাজারে নিজেকে বিক্রী করিতে ছুটিল। ছি! শীঘ্র এই দুর্ম্মতি ত্যাগ কর, পাছে বঙ্গদেশ বরিশালকে উপহাস করিয়া বলে, বৃথা অশ্বিনীকুমার সমস্ত জীবন বরিশালবাসীকে মনুষ্যত্ব কি তাহা শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে দেখাইতে খাটিয়াছেন, বৃথা শেষে স্বয়ং দেশের হিতার্থে বলি হইয়া পড়িয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ কখন মাঝামাঝি ধরণের ভাবপোষণ করে না, যে পথে যায় ছুটিয়া যায়, যে ভাব অবলম্বন করে, তাহার চরম দৃষ্টান্ত দেখায়। পশ্চিমবঙ্গে যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজস্বী পুরুষসিংহ আছেন, তেমনি নির্লজ্জ ধামাধরার পালও আছে। যাহারা কোমর বাঁধিয়া নির্ব্বাচন দৌড়ে প্রথম স্থান পাইতে লালায়িত, তাহারা প্রায়ই দেশের অজ্ঞাত অপূজ্য স্বার্থান্বেষী ধামাধরার পাল। তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় ভীড় করিলে দেশের লাভও নাই, ক্ষতিও নাই, — সভা অযোগ্য তোষামোদকারীর চিড়িয়াখানা বিশেষে পরিণত হইবে, আর কোন কুফল হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুয়েকজন দেশপূজ্য লোকের নাম দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনের কি এত অল্প আদর যে শেষে এই ভীড়ের মধ্যে কৌন্সিলে ঢুকিবার জন্যে ঠেলাঠেলি করিতে হইল? বৃদ্ধ বয়সে বৈকুণ্ঠবাবুর এই অপমানপ্রিয়তা কেন? চিড়িয়াখানায় প্রবেশ কি এত লোভনীয়?

মরলীনীতির ফল

মোটের উপর মরলীনীতির ফল দেশের উপকারী বলিতে হইল। ভারতের প্রধান বন্ধু ও হিতকর্ত্তা লর্ড কর্জ্জন বঙ্গভঙ্গ করিয়া সুপ্ত জাতিকে জাগাইয়াছিলেন, নিবিড় মোহ দূর করিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, মোহের পুনর্ব্বিস্তার, নিদ্রার নবপ্রভাবের আশঙ্কা আমাদের হিতৈষী লর্ড মরলী শাসনসংস্কার করিয়া অপনোদন করিয়াছেন। যাঁহাদের উপর বঙ্গভঙ্গের আঘাত পড়ে নাই, তাঁহারাও এই প্রহারে মর্ম্মাহত হইয়া জাগিতেছেন, সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায় পরমুখাপেক্ষার অসারতা বুঝিয়া জাতীয়তার ধ্বজার তলে অচিরে সমবেত হইবে। রাজপুরুষদের সঙ্গে জমিদার ও মুসলমান রহিয়াছেন। দেখি তাঁহারাও কদিন টিকিতে পারিবেন। ভগবানকে প্রার্থনা করি আমাদের তৃতীয় কোন হিতৈষী ইংরাজের মনে কোন নূতন যুক্তি ঢুকাইয়া দাও যাহার সুফলে জমিদার ও মুসলমানদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় হইবে। জাতীয় পক্ষের আস্থা বৃথা কল্পনা নহে। যখন ভগবান সুপ্রসন্ন, বিপক্ষের চেষ্টায় বিপরীত ফল হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাহায্য করে।

মিণ্টোর উপদেশ

এই পরীক্ষাস্থলে ছোট বড় অনেক ইংরাজ ভারতবাসীকে সংস্কারবিষয়ক সদুপদেশ দিতে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের অতি লোকপ্রিয় সদাশয় বড়লাটও নিজ পূজনীয় মুখবিবর হইতে উপদেশ-সুধা ঢালিয়া আমাদের কর্ণতৃপ্তি করিয়াছেন। সকলের একই কথা — আহা এমন সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তোমরা এইরূপে তাহার অপরূপ রূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুঁত বাহির না করিয়া cooperation সুধায় আমাদের সোনার চাঁদকে হৃষ্টপুষ্ট কর, দোষগুলি আপনিই যাইবে। শিশুর বাপ মা যে এইরূপ প্রশংসা করিবে, দোষ ঢাকিয়া দিবে তাহা স্বাভাবিক ও মার্জ্জনীয়। কিন্তু সত্য কথা এই, ছেলেটির এক বা দুই বা তিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ থাকিলে ক্ষতি হইত না, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর পচা, হৃদ্‌রোগ, যকৃতের রোগ, ক্ষয়রোগ লইয়া জাত, এই সোনারচাঁদ বাঁচিবার নহে, বাঁচিবার যোগ্যও নহে, বৃথা বাঁচাইয়া কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা বয়কট বালিসে শ্বাসরোধ করিয়া যন্ত্রণামুক্ত করা দয়াবানের কার্য্য। তাহাতে যদি শিশুহত্যা ও নৃশংসতা দোষে অপরাধী হই, না হয় নরকভোগ করিব। আমাদের কিন্তু এক কৌতূহলের

কারণ রহিল, সোনারচাঁদের বাপ মিণ্টোর উক্তি শুনিলাম, — মাননীয় মিঃ গোখলে যিনি সোনারচাঁদের মাতৃস্বরূপ, তিনি কেন নীরবে সন্তানের নিন্দা সহ্য করিতেছেন? না আমাদের গোপালকৃষ্ণ হিন্দু পঞ্চ ধ্বংস করিয়া বিজয়ানন্দের অতিরেকে সমাধিস্থ হইয়াছেন? বোধ হয় সূতিকা-অশৌচ কয়েকদিন রক্ষা করিতেছেন, সময়ে আবার সভ্যসমাজে মুখ দেখাইতে আসিবেন।

লাহোর কন্‌ভেন্সন

লাহোর কন্‌ভেন্সনের অদৃষ্ট নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশ অপ্রসন্ন, পঞ্জাব অসন্তুষ্ট, দেশের অধিকাংশ লোক হয় বহিষ্কৃত, নয় যোগদান করিতে অনিচ্ছুক, ফেরোজশাহ-প্রসূত, হরকিসনলাল-পালিত, গবর্ণমেণ্ট লালিত কন্‌ভেন্সন অতি কষ্টে নিজ প্রাণরক্ষা করিতেছিল। শেষে এই কি বজ্রাঘাত! যে প্রিয় পিতার প্রেমে বঙ্গদেশের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে বিপদাপন্ন করিয়াছিল, সেই পিতা ও ইষ্টদেবতা ফেরোজশাহ বিমুখ হইয়া সকল প্রার্থনা ঠেলিয়া নিজ গুপ্ত বিচারের অভেদ্য তিমিরে ইন্দ্রজিতের ন্যায় অতর্ক্য মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বোম্বাইয়ের সাঝ বর্ত্তমানের টেলিগ্রামের উত্তরে হরকিসনলাল দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, ফেরোজশাহ তাঁহার পদত্যাগের কারণ জানাইতে অসম্মত। অগত্যা ভক্ত তাঁহার রহস্যময় অনির্দ্দেশ্য অতর্ক্য দেবতার মুখের দিকে করুণ শূন্যদৃষ্টিতে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। নূতন সভাপতিকে অল ইণ্ডিয়া "কংগ্রেস" কমিটী ভিন্ন কে নির্ব্বাচন করিবে? সেই কমিটীর সভাস্থল ফেরোজশাহের শোবার ঘর। অতএব কমিটীর অধিবেশনে প্রভুর ইচ্ছা ব্যক্ত হইতেও পারে। কাহার শিরে ফেরোজশাহের স্পর্শে পুণ্যময় পরিত্যক্ত মালা সেই পবিত্র করকমল হইতে নিক্ষিপ্ত হইবে? ওয়াচার না মালবিয়ার, না গোখলের? আমাদের সুরেন্দ্রনাথের নামও করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি ফেরোজশাহের উচ্ছিষ্ট সভাপতিত্ব তাঁহার কৃপার দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীর অপ্রীতিভাজন হইবেন, সেই আশা পোষণ করা অন্যায়। গোখলে ফেরোজশাহের দ্বিতীয় আত্মা, ওয়াচা তাঁহার আজ্ঞাবাহক ভৃত্য, মালবিয়াকে এই মহৎ পদে নিযুক্ত করিয়া কমিটী স্বাধীনতার ঢং করুক।

ধর্ম্ম, ১৬শ সংখ্যা, ৫ই পৌষ, ১৩১৬

বেঙ্গলীর উক্তি

আমাদের সহযোগী "বেঙ্গলী" যুক্ত মহাসভা কমিটীর বিফল পরিণাম দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি ক্রীডে সম্মত হইলেন না, ক্রীডে সহি না করিলে কেহ মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, অথচ এই আল্টিমেটম দিয়াও সহযোগী আশা করিতেছেন যে আবার মিলনের চেষ্টা হইতে পারে, আবার দুই দল যুক্ত হইয়া এক সঙ্গে দেশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই ভ্রান্ত ধারণা যতদিন মধ্যপন্থী নেতাদের মন হইতে বিদূরিত না হয়, ততদিন মিলনের আশা বৃথা। যতদিন তাঁহারা এই জেদ ছাড়িতে নারাজ হইয়া থাকিবেন, ততদিন জাতীয় পক্ষ মিলনের আর কোনও চেষ্টায় যোগদান করিবেন না। কেননা, তাঁহারা জানিবেন যে অপর পক্ষে প্রকৃত মিলনের ইচ্ছা নাই। দেশকে বৃথা আশা দেখান অনুচিত। জাতীয় পক্ষ অবিলম্বে তাঁহাদের বক্তব্য সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করিবেন, তাহাতে তাঁহারা কি কি সর্ত্তে মধ্যপন্থীদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত, তাহা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হইবে। যে দিন মধ্যপন্থীগণ মেহতা ও মরলীর সকল রাজনীতিতে বিরক্ত হইয়া এই সর্ত্ত মানিয়া আমাদের নিকট সন্ধি-স্থাপনার্থে আসিবেন, সেই দিন আমরা আবার যুক্ত মহাসভা স্থাপনে সচেষ্ট হইব।

মজলিসের সভাপতি

মেহতার পদত্যাগে বঙ্গদেশীয় মধ্যপন্থীগণ এই প্রবল আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, এইবার বুঝি সুরেনবাবুর পালা, এইবার বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতা কন্‌ভেন্সনের সভাপতি হইবেন, বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হইবে, বঙ্গদেশের জিত হইবে। আশাই মধ্যপন্থীর সম্বল, সহিষ্ণুতা তাঁহাদের প্রধান গুণ! যাঁহারা সহস্রবার শ্বেতাঙ্গের আনন্দময় পদপ্রহার ভোগ করিয়া আবার প্রেম করিতে ছুটিয়া যান, সহস্রবার আশায় প্রতারিত হইয়া সগর্ব্বে বলেন, আমরা এখনও নিরাশ নহি, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী স্বদেশবাসীর ঘন ঘন অপমানে লব্ধসংজ্ঞ হইবেন অথবা মেহতা মজলিসের বঙ্গবিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়াও শিখিবেন এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন, এই আশা করা বৃথা। মেহতার মজলিস কংগ্রেসও

নহে, কন্‌ভেন্সনও নহে, যাঁহারা মেহতার সুরে গান করিবেন, মেহতার পদপল্লবে স্বাধীন মত ও আত্মসম্মান বিক্রয় করিবেন, তাঁহাদেরই জন্য এই মজলিস। যাঁহারা এই মেহতা-পূজার "ক্রীড" স্বীকার না করিয়া প্রবেশ করিবেন, অনাহূত অতিথির ন্যায় তাঁহারা অপমানিত হইবেন এবং যদি অপমানেও বশ না হন, শেষে গলাধাক্কাও খাইয়া সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন যে পদত্যাগ করিয়াও মজলিসের কর্ণধার হাল ছাড়িয়াছেন? আমরা তখনই বুঝিতে পারিয়াছি, মদনমোহনই সভাপতি হইবেন। মজলিসের পরমেশ্বর সেই আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহার বোম্বাইবাসী আজ্ঞাবহমণ্ডলী দেশকে এই আজ্ঞা জানাইয়াছেন, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীও মাথা পাতিয়াছে। বঙ্গদেশের অল্পজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন — কলিকাতায় ও ঢাকায়, কিন্তু অন্যত্র সাড়া শব্দ নাই। কয়জন যাইবেন জানি না। যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা ইহা জানিয়া যাইবেন, যে আমরা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছি। তাঁহারা বঙ্গদেশের প্রতিনিধি নহেন।

বিলাতে রাষ্ট্রবিপ্লব

বিলাতে পুরাতন বৃটিশ রাজতন্ত্র লইয়া যে মহান সংঘর্ষ আরব্ধ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণও উগ্র ও ভীতি-সঞ্চারক। ইংলণ্ডের লোকমত কিরূপে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইতেছে, তাহা রয়টরের সংবাদে দিন দিন প্রকাশ পাইতেছে। অনেক দিন পরে সেই দেশে প্রকৃত রাজনীতিক উত্তেজনা ও দলে দলে বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে। প্রথম সাধারণতঃ যাহা হয় তাহা হইল, — উদারনীতিক মন্ত্রী মিঃ উরের বক্তৃতার সময়ে চীৎকার ও বিরোধকারীদের গণ্ডগোলের বাধা, পরে বলপ্রয়োগে সভাভঙ্গের চেষ্টা। রক্ষণশীল দলের বক্তাগণও বিশেষতঃ জমিদারবর্গ, প্রজার অসন্তোষে সেইরূপ বাধা পাইতে লাগিলেন, এখন মুখ্য মুখ্য মন্ত্রী ও বিখ্যাত বক্তা ভিন্ন কোনও রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ অবাধে স্বমত প্রকাশের অবসর পাইতেছেন না, অনেক সভায় একটা কথাও বলিতে দেওয়া হয় নাই। কয়েক স্থানে সুরাট মহাসভার অভিনয় বিলাতে অভিনীত হইতেছে। এখন দেখিতেছি বড় বড় রক্ষণশীল রাজনীতিবিদও বাধা পাইতেছেন। আরও উগ্র লক্ষণ দেখা দিয়াছে, প্রাণহানির চেষ্টা। উরের একটী সভায় সেই ঘরের কাচের দরজা একপ্রকার battering ram দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, অনেক লোক আহত হইয়াছেন। আর

একটী রক্ষণশীল সভায় বলে সভাভঙ্গ করা হইয়াছে, সেই দলের স্থানিক কর্ম্মকর্ত্তাকে নির্দ্দয় প্রহারে অচেতন করা হইয়াছে, নির্ব্বাচনপ্রার্থী পলায়নপূর্ব্বক বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এই সকল লক্ষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের, — দিন দিন যে উগ্র স্বরূপ ধারণ করিতেছে, সন্দেহ হয়, নির্ব্বাচনের সময়ে রক্ষণশীল নির্ব্বাচকবর্গকে ভোট দিতে দোওয়া হইবে কি না।

গোখলের মুখদর্শন

গোখলে মহাশয়ের সূতিকা অশৌচ ঘুচিয়া গিয়াছে, আবার মুখ দেখাইয়াছেন, তাঁহার অমূল্য বাণীও শোনা গিয়াছে। জাতীয় পক্ষের নৃসিংহ চিন্তামণি কেলকর দুষ্টা-সরস্বতীর আবেশে নব ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন, বোম্বাইয়ের লাট কেলকরকে অযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার নির্ব্বাচন-লালসা নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে কেলকরকেও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া লাট সাহেবকে সাধিতে গিয়াছিলেন, লাট সাহেবও এই আবদারের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। আমাদের গোপালকৃষ্ণ ভাবিলেন, বেশ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে কঠোর ও নির্দ্দয়ভাবে নিগ্রহ করুক, আমি সেই অবসরে তাঁহাদের সহিত একটু প্রেম করি, আমার উপর লোকের যে ঘৃণা ও ক্রোধ হইয়াছে তাহা কমিয়া যাইতেও পারে। অতএব তাঁহার "দক্ষিণ সভা"র অধিবেশনে গোখলে কেলকরের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার বন্ধু ক্লার্ককে মধুর ভর্ৎসনা শুনাইয়াছেন। বলিয়াছেন, কেলকর অযোগ্য নহেন, যোগ্য ব্যক্তি, গোখলে তাঁহাকে যৌবনকাল হইতে চিনিতেছেন, উত্তম সিফারস দিতে পারেন, কেলকর রাজদ্রোহী নহেন, বিকৃতমস্তিষ্ক নহেন, লাট সাহেব আবার বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

গোখলের স্বসন্তান সমর্থন

গোখলে মহাশয় নিজের সংস্কাররূপ সন্তানের কথাও বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, আমার প্রিয়সন্তান খুব সুন্দর ছেলে, শান্ত শিষ্ট ছেলে, সমস্ত দেশের আদরের যোগ্য, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে যে রেগুলেশনরূপ বস্ত্র পরিধান করাইয়াছেন, তাহাতেই গোল, সোণারচাঁদের রূপ প্রকাশ পায় না। ক্ষতি নাই, সোণারচাঁদকে আদর কর, পোষণ কর, বস্ত্র কদিন থাকিবে, শীঘ্র পরিপাটী বেশভূষা পরাইয়া

তাহার নির্দোষ সৌন্দর্য্য সকলকে দেখাইব। বোম্বাইয়ের লাটও এই উপদেশ দিয়াছেন, দেশ কি এতই অভদ্র ও রাজদ্রোহী হইয়াছে যে লাটের অনুরোধ অমান্য করিবে? গোখলের উপযুক্ত কথা বটে।

যুক্ত মহাসভা

আমরা দেশকে জানাইতে দুঃখিত হইলাম যে যুক্ত মহাসভা হইবার লেশমাত্র সম্ভাবনা নাই। হুগলী প্রাদেশিক সভায় যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। কমিটীর প্রথম অধিবেশনে মধ্যপন্থীদলের প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাব করিলেন যে গত বৎসরে অমৃতবাজার আফিসে যে তিনটী মুখ্য প্রস্তাব স্থির হইয়াছিল, সেইগুলি লইয়া আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আবার বোম্বাইবাসীর সহিত লেখালেখি চলুক। এই তিনটী প্রস্তাব এইরূপ, — জাতীয় পক্ষ ক্রীড স্বীকার করিবে, জাতীয় পক্ষ কন্‌ভেন্সনের নিয়মাবলী স্বীকার করিবে কিন্তু সেই নিয়মাবলী মহাসভায় গৃহীত হইবে, কলিকাতা অধিবেশনের চারি প্রস্তাব মহাসভায় গৃহীত হইবে। সেইবার যাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মহাসভাকে আবার বয়কট গ্রহণ করাইবার লালসায় ক্রীড ও কনষ্টিটিউশন স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ফেরোজশাহ মেহতা কিছুতেই কলিকাতা মহাসভার বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না।

এইবার মধ্যপন্থী প্রতিনিধিগণের এই প্রস্তাব ছিল যে যখন ফেরোজশাহ বয়কট গ্রহণে অসম্মত, তখন প্রস্তাব চতুষ্টয়ের কথা তোলা বৃথা, যুক্ত মহাসভার বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে আমরা বয়কটের জন্য চেষ্টা করিব, এখন চাপিয়া রাখি। ক্রীড বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিয়া সহি করিতে হইবে। কন্‌ভেন্সনের নিয়মাবলীও মানিতে হইবে, তবে নিয়মাবলী সংশোধন করিবার জন্য লাহোরে একটী কমিটী নিযুক্ত হউক। জাতীয়পক্ষের প্রতিনিধিগণ এই অদ্ভুত প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এই স্পষ্ট উত্তর দিলেন যে তিনি কখনও ক্রীডে সহি করিতে সম্মত হইবেন না, তবে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, কয়েকদিন বিবেচনা করিয়া ও নিয়মাবলী নিরীক্ষণ করিয়া এই প্রস্তাবের কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা মধ্যপন্থীগণকে জানাইবেন। স্থির হইল যে পূজার ছুটির পরে কমিটী আবার বসিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন। ছুটির পরে জাতীয়পক্ষের প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহারা কন্‌ভেন্সনের উদ্দেশ্য

মহাসভার উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিজ মত বলিয়া কখন স্বীকার করিবেন না, সেই সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে কখন আবদ্ধ হইতে সম্মত হইবেন না এবং ক্রীডে কখন সহি করিবেন না; তাঁহারা কন্‌ভেন্সনের নিয়মাবলী মহাসভার কনষ্টিটিউশন বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তবে মিলনের সুবিধার জন্য একটী বা দুইটী অধিবেশন সেই নিয়মের অধীনে করিতে সম্মত হইতে পারেন। যে নিয়মে নূতন সভা-সমিতিদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অসমর্থ করা হইয়াছে, সেই নিয়ম রদ করিতে হইবে এবং যুক্ত মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে এই নিয়মাবলীর বদলে প্রকৃত কনষ্টিটিউশন মহাসভায় গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা কলিকাতার প্রস্তাব চতুষ্টয় মিলনের সর্ত্ত বলিয়া গ্রহণ করাইবেন না, কিন্তু মধ্যপন্থী নেতাদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা চান যে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে বা মহাসভায় এই চারি প্রস্তাবের কথা উত্থাপন করিবার পূর্ণ অবসর দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়বার যখন কমিটী মিলিত হইল, মধ্যপন্থী নেতাগণ এই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না, তাঁহারা বলিলেন ক্রীডে সহি করিতেই হইবে, নচেৎ মিলনের চেষ্টা বৃথা। ক্রীড ও নিয়মাবলী মানিয়া আমাদের সহিত লাহোরে চল, সেইখানে নিয়মাবলী সংশোধনের কমিটী নিযুক্ত করিবার জন্য জেদ করিব। জাতীয়পক্ষের প্রতিনিধিগণ ক্রীডে সহি করিতে অস্বীকৃত হইলেন। যুক্ত মহাসভা হইল না।

আমরা বারংবার বলিয়াছি, বঙ্গদেশের জাতীয় পক্ষ কখনও মেহতা মজলিসকে মহাসভা বলিয়া স্বীকার করিবে না, সেই মজলিসে ঢুকিবার জন্য লালায়িত নহে, ক্রীডে সহি করিতে কোনও কালে রাজী হইবে না। মধ্যপন্থী নেতাগণের প্রস্তাবের অর্থ এই যে জাতীয় পক্ষ দোষ স্বীকার করিয়া নিজ মত ও সত্যপ্রিয়তাকে জলাঞ্জলি দিয়া, মেহতা গোখলের নিকট জোড়হাত করিয়া সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতে করিতে মজলিসে ঢুকিবে, সেইখানে অল্পসংখ্যক জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি বহু-সংখ্যক মধ্যপন্থীদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবেন। কেন যে জাতীয় পক্ষ এত হীনতা ও আত্মাবমাননা প্রকাশ করিবেন, তাহা আমরা বুঝি না। মধ্যপন্থীগণ কি ইহাই স্থির করিয়াছেন যে জাতীয় পক্ষ দুই বৎসরের কঠিন ও নির্দ্দয় নিগ্রহে ভীত হইয়া মেহতা মজলিসের শরণ লইবার উন্মত্ত বাসনায় মিলনাকাঙ্ক্ষী হইলেন? যখন দুই পরস্পরবিরোধী পক্ষ রহিয়াছে, ইহা কি কখন সম্ভব যে এক পক্ষ বিপক্ষের সমস্ত আবদার সহ্য করিয়া নিজের সমস্ত মত আপত্তি ও উচ্চ আশাকে ভুলিয়া বিপক্ষের পদানত হইবে? গত বৎসরে অমৃতবাজার আফিসে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল — সেই প্রস্তাবে বঙ্গদেশীয় জাতীয় পক্ষ সম্মত ছিলেন না — তাহাতেও

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ কলিকাতার প্রস্তাবচতুষ্টয় রক্ষা করিয়াছিলেন, এইবার তাহাও মধ্যপন্থীগণের প্রস্তাবে রক্ষিত ছিল না। জাতীয় পক্ষের একটী কথাও থাকিবে না, মধ্যপন্থীদের কথা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই এই অদ্ভুত সন্ধির ভিত্তি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মহাসভার দাবি বলিয়া কলিকাতায় স্থির হইয়াছিল। যদিও ইহাতে আমাদের মত ছিল না, তথাপি অধিকাংশ প্রতিনিধির মত বলিয়া আমরা ইহাই মানিয়া লইলাম। সুরাটে আবার কন্‌ভেন্সনে স্থির হয় যে যাঁহারা এই আদর্শ রাজনীতিক শেষ উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নন, তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ক্রীডে সহি করা এবং এই তত্ত্বে মত দেওয়া একই কথা। প্রথমতঃ, আমাদের যাহাতে মত নাই, তাহাতে আমরা সহি করিব কেন? ধর্ম্ম আমাদের একমাত্র সহায়, সেই ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া মেহতার মনস্তুষ্টির জন্য ভগবানের অসন্তোষ অর্জ্জন করিব কেন? দ্বিতীয় কথা, যদি বল, মহাসভার দাবি মহাসভার উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছে, আর কোনও পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, স্বীকার করিবে না কেন? তাহাতেও মিলনের আশায় রাজী হইতে পারি, কিন্তু ক্রীডে সহি করিব না। ভারতের মহাসভা, মধ্যপন্থীরও নহে, জাতীয় পক্ষেরও নহে, ভারতবাসী যাহাকে প্রতিনিধি বলিয়া নির্ব্বাচন করিবেন, তাহাকে প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে, নচেৎ তোমরা মহাসভা নহ, মধ্যপন্থীর পরামর্শ সভা মাত্র। ভারতের মহাসভা, মধ্যপন্থীর নহে, ভীরুরও নহে। ক্রীডে সহি করানোর অর্থ এই যে ভারতের স্বাধীনতাপ্রয়াসী স্বার্থত্যাগী সাহসী মায়ের সন্তান ভারতের মহাসভায় প্রবেশ করিবার অযোগ্য। ক্রীডে সহি করায় জাতীয় আদর্শের অপমান, জাতীর অপমান, জাতীয়তার অপমান, মাতৃভক্ত নিগৃহীত ভারতসন্তানদের অপমান করা হইবে।

তোমাদের নিয়মাবলী স্বেচ্ছাচার ও প্রজাতন্ত্রের নিয়মভঙ্গের স্মৃতিচিহ্ন। কখন মহাসভায় গৃহীত হয় নাই, অথচ কয়েকজন বড় লোকের ইচ্ছায় মহাসভা সেই নিয়মাবলীতে বদ্ধ করিবার চেষ্টা। আমরা যদি তাহাকে কনষ্টিটিউশন বলিয়া মানি, তাহা হইলে তোমাদের সেই দেশের অহিতকর চেষ্টা সফল হইল। তথাপি যদি দুই বৎসরের মধ্যে মহাসভায় প্রকৃত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, আমরা কন্‌ভেন্সনের বর্ত্তমান নিয়মাবলী অস্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত। কেবল এক নিয়ম উঠাইয়া দিতে হইবে যাহাতে জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধির প্রবেশ কার্য্যতঃ নিষিদ্ধ হয়। এই নিয়ম না উঠাইলে বহুসংখ্যক

মধ্যপন্থীর দলে মুষ্টিমেয় জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি কি করিতে যাইবেন? ইংরাজদের শাসন সংস্কারে এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে বলিয়া তোমরা বিলাপে ও প্রতিবাদে দিঙ্‌মণ্ডল বিধ্বনিত কর; রাজপুরুষগণ আমাদিগকে বয়কট করিয়াছেন বলিয়া নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে অসম্মত হও। তোমাদেরও এই অন্যায় নিয়ম-সংস্কারের উদ্দেশ্য আমাদিগকে মহাসভা হইতে বহিষ্কার করা। এই নিয়ম যতদিন থাকে, আমরা কেন তোমাদের ব্যবস্থাপক সভায় বসিতে যাইব? এই নিয়ম উঠাইতে যদি অসম্মত হও, আমরা বুঝিব যে আমাদের সহিত মিলিত হইবার কথা মিথ্যা, শুদ্ধ নিজের কোন সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের অল্পসংখ্যক লোককে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিতেছ।

জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধিগণের প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত ও মিলনেচ্ছায় পরিপূর্ণ। তাঁহারা মহাসভার উদ্দেশ্য ও কন্‌ভেন্সনের নিয়মাবলী যতদূর পারা যায়, ততদূর মানিয়া লইয়াছেন, নিজের মতের স্বাধীনতা, সত্যের মর্য্যাদা, দেশের হিতের জন্য যাহা রক্ষণীয়, তাহা রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে মধ্যপন্থীদের কোনও প্রকৃত অসুবিধা হইবে না, রাজপুরুষগণও মহাসভাকে রাজদ্রোহীদের সম্মিলনী বলিতে পারিবেন না, মহাসভার কার্য্যেও কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই। আদান-প্রদান সন্ধির নিয়ম। এক পক্ষে কেবলই আদান, অপরপক্ষে কেবলই প্রদান, এই নিয়ম কোন দেশের! বা এই নিয়মে কবে প্রকৃত মিল হইয়াছে। যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত, সন্ধিভিক্ষা প্রার্থী হইতাম, তাহা হইলে মধ্যপন্থীদের আবদার বুঝিতাম; আমরা পরাজিত নহি, ভিক্ষাপ্রার্থীও নহি। দেশের হিতের জন্য, দেশবাসীর বাসনা বলিয়া যুক্ত মহাসভা করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম — নচেৎ আমাদের বল আছে, তেজ আছে, সাহস আছে, ভবিষ্যৎ আমাদের পক্ষে, দেশবাসী আমাদের পক্ষে, যুবকমণ্ডলী আমাদেরই, আমরা স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ধর্ম্ম, ১৭শ সংখ্যা, ১২ই পৌষ, ১৩১৬

প্রস্থান

লাহোরের ধনীপুঙ্গব হরকিসনলালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাঁহারা প্রস্থান করিয়াছেন, কন্‌ভেন্সন যজ্ঞে মরলীর শ্রীচরণে স্বদেশকে বলি দিতে, শাসনসংস্কার পেষণযন্ত্রে জন্মভূমির ভাবী ঐক্য ও স্বাধীনতা পিষিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে বসিয়াছেন

বলিয়া ভারতসচিবকে ধন্যবাদ দিতে যাঁহারা সানন্দে মহাসুখে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা দেশের নেতা, সম্ভ্রান্ত, ধনীলোক, দেশে তাঁহাদের "Stake" আছে, সম্মান আছে, প্রতিপত্তি আছে। বোধ হয় এই ধনসম্পত্তি সম্মান প্রতিপত্তি ইংরাজদের দত্ত, মায়ের দত্ত নহে বলিয়া তাঁহারা কৃতঘ্নতা অপবাদের ভয়ে জন্মভূমিকে উপেক্ষা করিয়া মরলীকেই ভজিতেছেন। দরিদ্র মা একদিকে, বরদাতা, শান্তিরক্ষক, সম্পত্তিরক্ষক গবর্ণমেণ্ট অপরদিকে, যাঁহারা মাকে ভালবাসেন, তাঁহারা একদিকে যাইবেন; যাঁহারা নিজেকে ভালবাসেন, তাঁহারা অপরদিকে যাইবেন; কিন্তু আর দুইদিকে থাকিবার চেষ্টা যেন না করেন, দুই দিকের দেয় পুরস্কার ও সুবিধা ভোগ করিবার দুরাশা যেন পোষণ না করেন। যাঁহারা কন্‌ভেন্সনে যোগদান করিতে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ লোকপ্রিয়তা, দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিপত্তি ও দেশহিতৈষিতার গৌরব পদতলে দলন করিয়া সেই কুস্থানে ছুটিতেছেন। এই প্রস্থান তাঁহাদের রাজনীতিক মহাপ্রস্থান।

হরকিসনলালের অপমান

তেজস্বী স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ কখনও দেশদ্রোহীর সম্মান করিতে ভালবাসেন না। যদি স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কয়েকদিন মৌখিক ভদ্রতা ও প্রীতি দেখান, তথাপি হৃদয়ে অবজ্ঞা ও অসম্মানের ভাব লুক্কায়িত হইয়া থাকে। পঞ্জাবের হরকিসনলাল মনে করিয়াছিলেন, আমি রাজপুরুষদের অতীব প্রিয়, পঞ্জাবের লোকমত দলন করিয়া কন্‌ভেন্সন করিতেছি, রাজপুরুষদের সাহায্যে স্বদেশী বস্তুর প্রদর্শনী করিতেছি, গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার সকল আব্দার রক্ষিত হইবে। হরকিসনলাল পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইবার জন্য লালায়িত, তাঁহার নামও নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের মধ্যে করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন নিয়মভঙ্গের জন্য সেই নাম গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে লালাজীর প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে। কন্‌ভেন্সনের হরকিসনলাল, গবর্ণমেণ্টের হরকিসনলাল, প্রতিনিধি হইবেন না, নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই, এ কিরূপ কথা, কাহার এত বড় ধৃষ্টতা, র'স গবর্ণমেণ্টকে লিখি, সকলকে মজা দেখাইব। কিন্তু হরকিসনলালের আবেদনে বিপরীত ফল হইল। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট লালাজীকে অপদস্থ করিয়া এক কথায় তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, নিয়ম অনুসারে হরকিসনলালের নাম প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রত্যাখ্যাতই থাকিবে। ন্যায্য কথা, ব্যক্তির খাতিরে নিয়মভঙ্গ

সভ্য রাজতন্ত্রের প্রথা নহে। কিন্তু হরকিসনলাল যখন মরলী ও মিণ্টোর মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণপণে খাটিয়াছেন, নাম প্রত্যাখ্যান করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সতর্ক করিতে পারিতেন, ভুল সংশোধন করা যাইত। আমরা বুঝি, জানিয়া শুনিয়া এই অপমান করা হইয়াছে, মধ্যপন্থীদলকে শিখাইবার জন্য করা হইয়াছে। রাজপুরুষেরা মধ্যপন্থীদিগকে স্বপক্ষে আকর্ষণ করিতে চান, কিন্তু কিরূপ মধ্যপন্থী? যে মধ্যপন্থী একহাতে গবর্ণমেণ্টের পা টিপিতে, এক হাতে গলা টিপিতে অভ্যস্ত, গবর্ণমেণ্টের নিন্দাও করিবেন, তাঁহাদের অনুগ্রহের দানও আদায় করিবেন, সেইরূপ মধ্যপন্থীর আর ইংরাজের বাজারে দর নাই। সম্পূর্ণ রাজভক্ত, সম্পূর্ণ সহকারিতা করিবেন, সেইরূপ মধ্যপন্থী হও, নচেৎ চরমপন্থীর ন্যায় তোমরাও বহিষ্কৃত হইবে। নূতন কৌন্সিলের নিয়মাবলীর যে উদ্দেশ্য, হরকিসনলালের অপমান করিবারও সেই উদ্দেশ্য।

আবার জাগ

বঙ্গবাসী, অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ, যে নব-জাগরণ হইয়াছিল, যে নব-প্রাণ সঞ্চারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, ম্রিয়মাণ অবস্থায়, অর্দ্ধ-নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অল্প অল্প জ্বলিতেছে। এখন সঙ্কটাবস্থা, যদি বাঁচাইতে চাও, মিথ্যা ভয়, মিথ্যা কূটনীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টা বর্জ্জন করিয়া কেবলই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার সম্মিলিত হইয়া কার্য্যে লাগ। যে মিলনের আশায় এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম, সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপন্থীদল জাতীয় পক্ষের সহিত মিলিত হইতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়। সেইরূপ মিলনের ফলে যদি দেশের হিত হইত, আমরা বাধা দিতাম না। যাঁহারা সত্যপ্রিয়, মহান আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, ভগবান ও ধর্ম্মকে একমাত্র সহায় বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা না হয় সরিয়া যাইতেন, যাঁহারা কূটনীতির আশ্রয় লইতে সম্মত, তাঁহারা মধ্যপন্থীদের সহিত যোগদান করিয়া, মেহতার আধিপত্য, মরলীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেশের হিত করিতেন। কিন্তু সেইরূপ কূটনীতিতে ভারতের উদ্ধার হইবার নহে। ধর্ম্মের বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। অতএব যাঁহারা জাতীয়তার মহান আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়া শক্তিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী, বিশ্বমঙ্গলকারিণী ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া মানবজাতির

সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন, ধর্ম্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্য্য আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান! আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছ, আবার ধর্ম্মপথে এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য্য না কর, সকলে মিলিয়া এক প্রতিজ্ঞা, এক পন্থা, এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্যম্ভাবী, তাহাই করিতে শিখ।

নাসিকে খুন

নাসিকবাসী সাবরকর কয়েকটী উদ্দাম কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া ইংরাজ বিচারালয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হইলেন, সাবরকরের একজন অল্পবয়স্ক বন্ধু নাসিকের কলেক্টর জ্যাক্সনকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন। রাজনীতিক হত্যা সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, বার বার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা বৃথা। ইংরাজের পত্রিকাসকল ক্রোধে অধীর হইয়া সমস্ত ভারতের উপর এই হত্যার দোষ আরোপ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে আরও কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহার অর্থ দোষী নির্দ্দোষীকে বিচার না করিয়া যাহাকে সন্দেহ কর, তাহাকে ধর, যাহাকে ধর, তাহাকে নির্ব্বাসিত কর, দ্বীপান্তরে পাঠাও, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাও। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করেন, তাঁহাদিগকে নিঃশেষ কর। দেশে প্রগাঢ় অন্ধকার, গভীর নীরবতা, পরম নিরাশা ব্যাপ্ত করিয়া ফেলুক, — তাহাতেই যদি রাজদ্রোহের স্ফুলিঙ্গসকল আর প্রকাশ না হয়, গুপ্ত বহ্নি নিবিয়া যায়। এই উন্মত্তের প্রলাপ শুনিয়া, বৃটিশ রাজনীতির শোচনীয় অবনতি দেখিয়া দয়া হয়, বিস্ময়ও হয়। যদি সেই পুরাতন রাজনীতিক কুশলতার ভগ্নাংশও থাকিত, তোমরা জানিতে যে অন্ধকারেই হত্যাকারীর সুবিধা, নীরবতার মধ্যে উন্মত্ত রাষ্ট্রবিপ্লবকারীর পিস্তল ও বোমার শব্দ ঘন ঘন শোনা যায়, নিরাশাই গুপ্ত সমিতির আশা। যাহাতে এই রাজনীতিক হত্যা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দেশ হইতে উঠিয়া যায়, আমরাও সেই চেষ্টা করিতে চাই। কিন্তু তাহার একমাত্র উপায়, বৈধ উপায় দ্বারা ভারতের রাজনীতিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সাধিত হইতে পারে, ইহাই কার্য্যেতেই দেখান। কেবল মুখে এই শিক্ষা দিলে আর লোকে বিশ্বাস করিবে না, কার্য্যেতেও বুঝাইতে হইবে। সেই পুণ্য কার্য্যে তোমরাই বাধা দিতে পার। কিন্তু তাহাতে যেমন আমাদের বিনাশ হইবে, তোমাদেরও বিনাশ হইবার সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম, ১৮শ সংখ্যা, ১৯এ পৌষ, ১৩১৬

মুমূর্ষু কন্‌ভেন্সন

আমাদের কন্‌ভেন্সনপ্রিয় মহারথীগণ লাহোরে মেহতা মজলিস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের প্রজাসকল কন্‌ভেন্সন চায় না, নানা উপায়ে তাহাদের অনিচ্ছা ও অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিল, কিন্তু হরকিসনলাল নাছোড়বান্দা। লোকমত দলন করিবার জন্য কন্‌ভেন্সনের সৃষ্টি, পঞ্জাবের লোকমত দলন করিয়া রাজপুরুষগণের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করিয়া যদি লাহোরে কন্‌ভেন্সন বসাইতে পারেন, তবে মেহতা মজলিসের অস্তিত্ব সার্থক হয়। এই হঠকারিতার যথেষ্ট প্রতিফল হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট তিনশ প্রতিনিধি মেহতা মজলিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দর্শকবৃন্দের সংখ্যা এত কম ছিল যে নাতিবৃহৎ ব্রাদলা হলের অর্দ্ধেকভাগ মাত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই শূন্য মন্দিরে এই অল্প পূজকের হতাশ পুরোহিতগণ বৃটিশ রাজলক্ষ্মীকে নানান স্তব স্তোত্রে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার চরণকমলে অনেক আবেদন নিবেদনরূপ উপহার করিয়া, ভক্তদের উপযুক্ত আদর করেন না বলিয়া মৃদুমন্দ ভর্ৎসনা শুনাইয়া তাঁহাদের আর্য্যকুলে জন্ম চরিতার্থ করিলেন। মেহতা মজলিস জোর করিয়া নিজেকে জাতীয় মহাসভা নামে অভিহিত করে, জাতীয় মহাসভার কোন্ অধিবেশনে অর্দ্ধশূন্য পাণ্ডালে অল্পজন প্রতিনিধি এইরূপ হাস্যকর প্রহসন অভিনয় করিয়াছেন, বল দেখি? তোমাদের মজলিস সভা বটে, কিন্তু "মহা"ও নহে, "জাতীয়"ও নহে। যে সভায় জাতি যোগদান করিতে অসম্মত, তাহার আবার "জাতীয়" নাম!

সখ্যস্থাপনের প্রমাণ

বৃটিশ রাজলক্ষ্মী উত্তর সমুদ্রের পারে বসিয়া যখন রয়টারের টেলিগ্রামরূপ দূতের মুখে এই সকল স্তবস্তোত্র শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা মনেই রাখিয়া প্রীত হাস্য করিলেন কিনা, আমরা জানি না। হয়ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের মহারোলে মালবিয়া গোখলে সুরেন্দ্রনাথের ক্ষীণস্বর একেবারে চাপিয়া পড়িয়াছে। কে জানে হয়ত, পূজ্য ইংরাজ দেবতাগণ ইহাও জানেন না যে হরকিসনলাল রাজভক্তিকে চরিতার্থ করাকে কন্‌ভেন্সনের চরম

উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ক্ষতি নাই, কলিকাতাস্থ ইংরাজ সংবাদপত্রের চালকগণ বৃটানিয়ার নামে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। লাহোরের এই কেলেঙ্কারি বৃথা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ মুক্তহস্তে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন, ষ্টেটসম্যান সেই মধুর ভর্ৎসনার মধুর ভাব না বুঝিয়া একটু অসন্তুষ্ট হইয়াও পূজায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলিশম্যানও গালাগালি দিতে না পারিয়া এদিক ওদিক বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়াও হরকিসনলালের রাজভক্তি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। দেশবাসীর অসন্তোষ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রীতি ও প্রশংসা মেহতা মজলিসের পরিপোষকগণের উপযুক্ত পুরস্কার।

নেতা দেখি, সৈন্য কোথায়?

কন্‌ভেন্সনের অপূর্ব্ব বাহাদুরী এই যে, ভারতের যত বড় বড় নেতা আছেন, সর্ব্বপ্রধান ফেরোজশাহ ভিন্ন সকলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের অধীন সৈন্য লাহোরের ভীষণ শীতের ভয়ে বা আর কোনও কারণে নেতাদের সাহসে সাহসান্বিত না হইয়া স্বগৃহেই খ্রীষ্টমাস ছুটি কাটাইলেন। বঙ্গদেশ হইতে অম্বিকাবাবু ভিন্ন যত নেতা গিয়াছিলেন সুরেনবাবু, ভূপেনবাবু, আশুবাবু, যোগেশবাবু, পৃথ্বীশবাবু, তাহাদের সৈন্যের সংখ্যা কেহ কেহ দুইজন, কেহ কেহ তিনজন, কেহ কেহ পাঁচজন বলেন। মাদ্রাজ হইতে বারজন গিয়াছিলেন, একজন দেওয়ান বাহাদুর এই মহতী সেনার নেতা, আর কয়জন নেতা ছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ এখনও আসে নাই। মধ্যপ্রদেশ হইতে পাঁচ-ছ জন, সকলে নেতা, কেন না মধ্য-প্রদেশে পাঁচ-ছ জন নেতা ভিন্ন মধ্যপন্থী আর নাই। সংযুক্ত প্রদেশ হইতে মহারথী মালবিয়া গঙ্গাপ্রসাদ ও কয়েকজন রাজা, শাহেবজাদা ইত্যাদি গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈন্য ছিল, কেহ বলে ত্রিশ জন, কেহ বলে ষাট, কেহ বলে আশী। কেবল পঞ্জাবে এই ক্রম রক্ষিত হয় নাই, সেই প্রদেশে হরকিসনলালই একমাত্র নেতা, আর সকলে সৈন্য। গ্রীক প্রতিনিধি কিনিয়াস রোমন সেনেটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, This is a senate of kings! এই সভার প্রত্যেক সভ্য একজন রাজা! আমরাও কন্‌ভেন্সন দেখিয়া বলিতে পারি, This is a Congress of leaders, এই মহাসভায় প্রত্যেক সভ্য একজন নেতা! কিন্তু সৈন্য কোথায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে তৎপাঠে জানা যায় যে তিনি দেশে যে নূতন ভাব গঠিত হইয়াছে, যে ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, যে ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, সে ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই, সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ভগবান তাহা দেখেন নাই; এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাঁহার পদস্পর্শ পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগদিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে; যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টি স্বরূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না — আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্য্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবী করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যে ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না — তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধক ভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, "তুই যে বীর রে"! তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্য্যকর জালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাবে সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরওয়া হইয়া দেশের কার্য্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎ-বাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে "তুই যে বীর রে"!

ধর্ম্ম, ১৯শ সংখ্যা, ২৬শে পৌষ, ১৩১৬

কন্‌ভেন্সনের দুর্দ্দশা

বোম্বাইয়ের ''রাষ্ট্রমতে'' কন্‌ভেন্সনের প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দের সংখ্যা বাহির হইয়াছে। এই সংবাদপত্রের লাহোর পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন, ''লাহোরের ক্রীড কংগ্রেসের অধিবেশনে সবসুদ্ধ ২২৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, এই সংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। যাঁহারা আগে রাজনীতিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন, সেইরূপ ভদ্রলোক খুব অল্পই ছিলেন। দর্শকের সংখ্যা ছয় শত বা সাত শত হইবে। সময়ে সময়ে হলের দুই ভাগই খালি ছিল। একজনও মুসলমান প্রতিনিধি বা দর্শক উপস্থিত ছিলেন না। সভাপতি মালবিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য চালাইলেন, নচেৎ এইবার ক্রীড কংগ্রেসের আরও দুরবস্থা হইত।'' পত্র-প্রেরকের শেষ উক্তির মধ্যে কোনও গুপ্ত মতভেদের ইসারা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শাসন সংস্কার লইয়া এই মতভেদ, দুইদলের আপোষের সর্ত্ত কন্‌ভেন্সনের তদ্বিষয়ক প্রস্তাব দেখিলেই বোঝা যায়। প্রস্তাবের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের সম্পূর্ণ বিরোধ। প্রথমাংশে মিন্টো ও মরলীর উদারতা, প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য উৎকট ও বিকট চেষ্টা ইত্যাদি গুণের সানন্দ প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার উদ্দাম লহরী, শেষাংশে কঠোর, প্রায় অভদ্র ভাষায় গবর্ণমেণ্টের গালাগালি এবং ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্দাম উচ্ছ্বাস। এই হাস্যকর অসঙ্গত সম্মিলনে মালবিয়ার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে, কন্‌ভেন্সন করাল অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আলাহাবাদে দক্ষ মালবিয়ার শীতল ছায়ায় আবার সম্মিলিত হইবার দুরাশা পোষণ করিতেছে।

দলাদলি ও একতার মিথ্যা ভান

মানুষমাত্র কথার দাস, বাক্‌দেবীর পুতুল। চিরপরিচিত শ্রুতিমধুর কথা শ্রবণ করাইয়া মনকে নাচান আমাদের মধ্যপন্থী বন্ধুদের একপ্রকার সিদ্ধি। তাঁহারা ইংরাজ রাজনীতিবিদগণের শিষ্য। ইংরাজ যেমন কোন শ্রুতিমধুর কথা আবৃত্তি করিয়া — যথা, বৃটিশ শান্তি, বৃটিশ ন্যায়পরতা, স্বায়ত্ত-শাসন-সংস্কার ইত্যাদি, — বিশাল শূন্যভাবের আবরণে স্বীয় অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধি করিতে অভ্যস্ত, তেমনই

তাঁহাদের মধ্যপন্থী শিষ্যগণ "বৃটিশ ন্যায়পরতার এজলাস", "বৃটিশ প্রজার বিবেকবুদ্ধি", "বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অধিকার" ইত্যাদি শ্রুতিমধুর শূন্য কথায় দেশের বুদ্ধি বিব্রত করিয়া এতদিন ভারতের প্রকৃত উন্নতির সুপন্থা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও সেই অভ্যাস যায় নাই। তাঁহারা জাতীয়পক্ষের স্বতন্ত্র কার্য্যশৃঙ্খলার উদ্যোগ চলিতেছে দেখিয়া "দলাদলি", "একতা" ইত্যাদি পরিচিত কথার রোল করিয়া লোকের মন নাচাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারাই ক্রীড ও কনষ্টিটিউশন সৃষ্টি করিয়া জাতীয়পক্ষকে মরলীর মনস্তুষ্টির আশায় বহিষ্কৃত করিলেন, তাঁহারাই হুগলী প্রাদেশিক সমিতিতে জাতীয়পক্ষের কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে উঠিয়া সমিতি ভাঙ্গিয়া দিবেন, এই বিভীষিকা দেখাইলেন, তাঁহারাই জাতীয়পক্ষের নেতাগণের সহিত একসঙ্গে কার্য্য করিতে ভীত ও অনিচ্ছুক, মধ্যপন্থী নেতাদের নামের সঙ্গে কোনও ঘোষণায় তাঁহাদের স্বাক্ষর দিবার প্রস্তাব উঠিলে, "কাজ নাই, কাজ নাই, গবর্ণমেণ্ট চটিবে, বড় মানুষেরা চটিবে," বলিয়া সেই প্রস্তাব উড়াইয়া দেন। অথচ আমাদের উপর উল্টা চাপ দিতে লজ্জিত নন। আমরাই নাকি দলাদলি করিতেছি, সামান্য মতভেদের জন্য একসঙ্গে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, কন্‌ভেন্সনে ঢুকিয়া মেহতাকে বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকি। এতদিন আমরা কোন বাধা করি নাই, দেশ, আন্দোলন, রাজনীতিক ক্ষেত্র তোমাদেরই হাতে ছিল, এই ফল হইয়াছে যে, সমস্ত দেশ নীরব হইয়া পড়িয়াছে, ভারত নিদ্রা যাইতেছে, লোকের উৎসাহ, সাহস, আশা ভগ্নপ্রায় হইয়া গেল। আমরা দেশকে জাগাইতে চাই — তোমাদিগকে চিনিয়া লইয়াছি; জানি যে ইচ্ছা থাকিলেও ভয় ও বিপদের আশঙ্কা তোমাদিগকে কার্য্য করিতে দিবে না, — আমাদের বিপদ হউক, দলন হউক, আমরা দেশের কার্য্য করিব, সেই উদ্যোগ করিতেছি। অমনই মধ্যপন্থীদের রব উঠিতেছে, আহা কি করিতেছ? একজোট হইয়া কি সুন্দর ঘুম মারিতেছিলাম! আবার দলাদলি! আমাদের প্রিয় একতা গেল, রক্ষা কর, মতিলাল কোথায়, অনাথবন্ধু কোথায়, আমাদের রক্ষা কর। তোমাদের মনের ভাব জানি। জাতীয়পক্ষ যদি কার্য্যশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তোমাদের হয় সেই কার্য্যে যোগদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের অপ্রিয় হইতে হইবে, নয় নিশ্চেষ্ট থাকিলে অকর্ম্মণ্য ও ভীরু বলিয়া দেশবাসীর সম্মান ও তোমাদের নষ্টপ্রায় নেতৃত্বের ভগ্নাংশ হারাইতে হইবে। এই জন্যই চির অভ্যাসবশে মিথ্যা একতার ভান করিয়া তোমাদের সেই প্রিয় সুখকর নিশ্চেষ্টতার জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ কর।

নির্ব্বাসনের বিভীষিকা

আমাদের পুলিস বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্ব্বাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে, এইবার নয়জন নহে, চব্বিশ জনকে মোটরকারে, রেলে, "Guide" জাহাজে গবর্ণমেণ্টের খরচে নানাপ্রদেশ ও বিবিধ জেল ঘুরিয়া আসিবার জন্য প্রস্থান করিতে হইবে। পুলিসের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখন বুঝিতে পারি নাই, নির্ব্বাসন এমনকি ভয়ঙ্কর জিনিস যে লোকে নির্ব্বাসন নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য্য, কর্ত্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে। চিদাম্বরম প্রভৃতি কর্ম্মবীর বয়কট প্রচার দোষে যে কঠিন দণ্ড হাসিমুখে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই দণ্ড অতি লঘু, অতি অকিঞ্চিৎকর। বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশসেবা করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, না হয় ভগবান লর্ড মিণ্টো বা মরলীকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জ্জনে আমার চিন্তা কর, ধ্যান কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান বিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে, নির্জ্জনতার রস আস্বাদন কর। এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? কয়েকদিন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পারিব না, — বিলাতে বেড়াইতে গেলে তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন, অখাদ্য খাইয়া, গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে। বাড়ীতে বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই, বাড়ীতেও অসুখ হয়, মরণ হয়, অদৃষ্ট-লিখিত আয়ুক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আর হিন্দুর পক্ষে মরণে ভীষণতা নাই। দেহ গেল, পুরাণো বস্ত্র গেল, আত্মা মরে না। সহস্রবার জন্মিয়াছি, সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপন করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব, কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সস্তায় ইতিহাসে অমর নাম লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত, অথচ কষ্ট নাই, অথবা সামান্য শরীরক্লেশে মুক্তি ও ভুক্তি পাইলাম। এই ত কথা? ট্রান্সভালের কুলীদের মহৎভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতর-ভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।

নির্ব্বাসন অসম্ভব

আমাদের ধারণা, এই ভয় দেখান বৃথা আস্ফালন মাত্র। প্রস্তাব করা হইয়াছে, হয়ত ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতিও হইয়াছে, কিন্তু লর্ড মরলী যে সম্মত হইবেন, তাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে চাই না। নয় জনকে নির্ব্বাসন করায় লর্ড মরলীকে যথেষ্ট ভুগিতে হইয়াছে, আবার চব্বিশ জনকে নির্ব্বাসন করিবেন? বিশেষতঃ ইহা জানার কথা যে লর্ড মরলী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয় জনকে কারামুক্তি দিতে উৎসুক, কেবল ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের জেদে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় তিনি কি সহজে আর চব্বিশ জনকে নির্ব্বাসন করিয়া দেশের গভীর অশান্তিকে আরও গভীর করিবেন, বিপ্লবকারীদের ইচ্ছার মত কার্য্য করিবেন? তিনি অনেক ভুল করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার উন্মত্ত অবস্থা হয় নাই। অবশ্য লর্ড মিণ্টো যদি বলেন যে নির্ব্বাসনের অনুমতি না দিলে তিনি ভারতের শান্তির জন্য দায়ী নহেন, কিম্বা পদত্যাগ করিবার ভয় দেখান, তাহা হইলে লর্ড মরলী দায়ে ঠেকিয়া সম্মত হইতে পারেন। নাও হইতে পারেন, কেন না লর্ড মিণ্টো না থাকিলে বৃটিশ সাম্রাজ্য যে ধ্বংস হইবে, সেই কথায় লর্ড মরলী হয়ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। যাহা হউক চব্বিশ জনকে নির্ব্বাসন করুন, বা একশ জনকে নির্ব্বাসন করুন, অরবিন্দ ঘোষকে নির্ব্বাসন করুন, বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীকে নির্ব্বাসন করুন, কালচক্রের গতি থামিবার নহে।

ধর্ম্ম, ২০শ সংখ্যা, ৪ঠা মাঘ, ১৩১৬

নবযুগের প্রথম শুভলক্ষণ

শাসন সংস্কার নবযুগের প্রথম অবতারণা, সেই যুগে অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকার মধুর প্রীতির আলোকে পরিণত হইবে এবং দণ্ডনীতির কঠোর মূর্ত্তি ইংরাজ প্রকৃতিতে লীন হইয়া সাম্যনীতির আনন্দময় বিকাশ ভারতজীবনকে সুখে ও প্রেমে পূর্ণ করিবে, এই শ্রুতিমধুর রব অনেকদিন অবধি শুনিতেছি। এতদিন পরে কুহকিনী আশার বাণী সফল হইল। যে সভা-নিষেধ আইন পূর্ব্ব বাঙ্গালার এক-মাত্র জেলায় জারি হইয়াছিল, তাহা এখন সমস্ত ভারতে জারি হইয়াছে। গত

শুক্রবার হইতে সমগ্র ভারত এই আইনের অধীন হইয়াছে। আইনে বিনা অনুমতিতে কোথাও কুড়িজন লোক এক সঙ্গে দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিবেন না, দাঁড়াইলে বা বসিলে পুলিস যদি এই কুড়িজনের সম্মিলনকে প্রকাশ্য সভা নামে অভিহিত করিতে অভিলাষী হয়, — সেইরূপ হাস্যরসপ্রিয় লোক পুলিসে অনেক আছে — তাহা হইলে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন বা বসিয়াছেন, তাঁহারা আইনে দণ্ডনীয়। প্রমাণ করিতে হইবে যে তাঁহারা "সভার" সভ্য ছিলেন না, বা সভ্য হইলেও "প্রকাশ্য" ছিলেন না। তবে যদি "প্রকাশ্য" না হন, কাজেই গুপ্ত ছিলেন, তাহা আরও বিপজ্জনক। ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে ছয়মাস বিনা পয়সায় গবর্ণমেণ্টের আতিথ্য এবং বিনা মাহিনায় সম্রাটের জন্য খাটুনির সুযোগ লাভ করিয়া নূতন যুগের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। নিজগৃহে সম্মিলিত হইলেও রক্ষা নাই। সেইখানে যদি রাজনীতির কথা হয় বা সেইরূপ কথা হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, অথবা সেইখানে অমৃতবাজার পত্রিকা, পঞ্জাবী, বেঙ্গলী, কর্ম্ম-যোগী ইত্যাদি রাজদ্রোহী সংবাদপত্র পড়া হয় বা পড়া হইবার কোনও সম্ভাবনা হয়, পুলিস আসিতে পারিবে এবং গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধুগণকে গবর্ণমেণ্ট হোটেলে লইয়া যাইতে পারিবে। যদি কুড়িজনকে পিতার শ্রাদ্ধে বা কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করি, সেখানেও এই পুলিস-লীলার সম্ভাবনা। নবযুগের শুভ প্রভাত হইয়াছে। জয় মিণ্টো-মরলী! জয় শাসন সংস্কার!

আইন ও হত্যাকারী

লাটসাহেব সমগ্র ভারতের উপর কেন এই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। অনেকে বলে, হত্যা ও ডাকাইতি হইতেছে বলিয়া এই সভা-নিষেধ ঘোষণা। গুপ্ত হত্যাকারী ও রাজনীতিক ডাকাত যে এই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রে ভীত হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহারা যে কুড়িজন মিলিয়া "প্রকাশ্য সভা" করিতে অভ্যস্ত, ইহাও কখনও শুনি নাই। ছয়মাস কারাদণ্ডের ভয়ে তাঁহারা যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস কমিশনারের নিকট অনুমতি লইয়া গুপ্ত হত্যা বা ডাকাইতির পরামর্শ করিতে বসিবেন, তাহার সম্ভাবনাও অত্যল্প। এই যুক্তির মর্ম্ম আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তবে আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্ধুগণ বলেন যে তাহা নহে, দেশে আন্দোলন হইলেই হত্যা তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, অতএব সভাসমিতি বন্ধ করা ও হত্যা ডাকাইতি বন্ধ

করা একই কথা। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এই জগতে রাজনীতি অতি সহজ খেলা হইত, পাঁচ বৎসরের শিশুও শাসনকার্য্য করিতে পারিত। দুঃখের কথা, বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থায় এই অদ্ভুত যুক্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং বিপরীত সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। এতদিন কি সভাসমিতি বন্ধ ছিল না? চরমপন্থীদলের সভাসমিতি অনেকদিন লোপ পাইয়াছে, মধ্যপন্থী নেতাগণ নির্ব্বাসনের পরে আর সভাসমিতিতে যোগদান করা বন্ধ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কলেজ স্কোয়ারে যে স্বদেশী সভা হয়, তাহাতে কোন বিখ্যাত বক্তাও উপস্থিত হন না, দর্শকমণ্ডলীও সংখ্যায় নগণ্য। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল হইতে আসিবার পরে কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন বটে, তিনিও হুগলী প্রাদেশিক সভার পরে নীরব হইয়া পড়িয়াছেন। সভার মধ্যে হত্যানিষেধের ঘন ঘন সভা এবং দক্ষিণ সভার অধিবেশনে ইংরাজবন্ধু গোখলের শান্তিময় বক্তৃতাই মাঝে মাঝে হয়। তবে হত্যা ডাকাইতি গোখলে মহাশয়ের বক্তৃতার ফল? হইতে পারে, কেন না গোখলে মহাশয় ভারতের স্বাধীনতালুব্ধ যুবকগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে বলপ্রয়োগই স্বাধীনতালাভের একমাত্র উপায়। নচেৎ সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে হত্যা ও ডাকাইতির বৃদ্ধি দিন দিন হইতেছে। তাহাই স্বাভাবিক, ভিতরে বহ্নি থাকিলে অবাধ নির্গমনেই তাহা নিরাপদে ক্ষয় হয়, নির্গমনের পথ বন্ধ করায় তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়, বলে নির্গমনের পথ খুলিয়া প্রতিরোধককে বিনাশ করিতে বাহির হয়।

আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব?

এই আইন এখনও কোনও জেলা বা সহরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু কোনও প্রদেশে সতেজে আন্দোলন আরব্ধ হইবামাত্র প্রযোজিত হইবে, সন্দেহ নাই, অতএব ইহাকে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সঙ্কেত বলিতে হইবে। এখন বিবেচ্য এই, এই অবস্থায় জাতীয়পক্ষ কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? আমরা আইনের ভিতরে আমাদের রাজনীতিক কার্য্য আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত আছি। আইনের গণ্ডী যদি এত সঙ্কীর্ণ হয় যে তাহার ভিতরে প্রকাশ্য আন্দোলন আর চলে না, তাহা হইলে আমাদের কি উপায় রহিয়াছে। এক উপায়, নীরবে এই ভ্রান্তনীতির ফল অপেক্ষা করা। আমরা জানি, গবর্ণমেণ্টও জানে যে ভারতবাসীর স্বাধীনতার আশা নির্ব্বাপিত হয় নাই, মস্তকে নিগ্রহ দণ্ডের প্রহার করায় অসন্তোষ প্রেমে পরিণত হয় নাই। প্রজার

স্পৃহা, প্রজার অসন্তোষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গুমরিয়া রহিয়াছে। এখনও বিপ্লবকারীগণ লোকের মন গুপ্তহত্যা ও বলপ্রয়োগের পথে টানিতে পারে নাই, কিন্তু কবে টানিতে পারিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার সেই অনর্থ ঘটিত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিপদ এবং দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। আমরা এই আশঙ্কায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয়পক্ষ সুশৃঙ্খলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে স্বাধীনতা লাভের নির্দ্দোষ পন্থা দেখাইতে পারিলে গুপ্তহত্যা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। এখন বুঝিলাম ইংরাজ গবর্মমেণ্ট সেই উপায় অবলম্বন করিতে দিবেন না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃ এই চিন্তা মনে আসে — তাহাই হউক, তাঁহাদের যখন এই ধারণা যে আরও উগ্র দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হইবে, তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া দণ্ডনীতি প্রয়োগ করুন। আমরা চুপ করিয়া দেখি কিসেতে কি হয়, আমরা ভ্রান্ত, না তাঁহারা ভ্রান্ত। যখন ইংরাজ রাজনীতিবিদগণ নিজেদের ভুল বুঝিবেন তখন আমাদের কর্ম্মের সময় আসিবে। এই পন্থাকে masterly inactivity — ফলবতী নিশ্চেষ্টতা বলা যায়।

চেষ্টার উপায়

নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করায় আমাদের ভবিষ্যৎ সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের প্রচুর অমঙ্গল হইবার কথা। আমরা না হয় বক্তৃতা বা সভাসমিতি নাই করিলাম, কুড়িজনের সম্মিলন নাই বা হইল, আমাদের উদ্দেশ্য বক্তৃতা করাও নহে, ইংরাজী ধরণে আন্দোলন করাও নহে। দেশের কার্য্য করা আমাদের উদ্দেশ্য, কার্য্যের শৃঙ্খলা আমাদের মিলিত হইবার কারণ। সেই কার্য্যের শৃঙ্খলা বার চৌদ্দ জন দেশের প্রতিনিধি কি করিতে পারেন না? তাঁহারা যে কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবেন দেশের লোক কি সেই পরিমাণে ক্ষুদ্র পরামর্শ-সভা করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারেন না? আর যদি এই আইনও হয় যে পাঁচ জন একসঙ্গে বসিলে বেআইনী জনতা হইবে, তাহা হইলে কি আর কোনও নির্দ্দোষ উপায় নাই? শঙ্করাচার্য্যের দেশে কি সভাসমিতি না করিয়া মত প্রচার হয় না? মন্দিরে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, নানাস্থানে নানা অবসরে ভায়ে ভায়ে দেখা হয়, সামান্য কথার মধ্যে দেশের কার্য্যবিষয়ক দুয়েক কথা কি হইতে পারে না? আইনের গণ্ডীতে থাকিব, কিন্তু আইন যাহা বারণ করে না, তাহা ত করিতে পারি? এত করিয়াও যদি

শেষে গবর্ণমেণ্ট জাতীয় শিক্ষাপরিষদকে বেআইনী জনতা বলিয়া জাতীয় বিদ্যালয়সকল বন্ধ করে, শিক্ষা দেওয়া, স্বদেশী কাপড় পরা, বিদেশী মাল না কেনা, শালিসীতে কলহ মিটানোকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া সশ্রম কারাবাস বা দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করেন, আর যদি ট্রান্সভালবাসী কুলী ও দোকানদারদের সাহস, দেশহিতৈষিতা ও স্বার্থত্যাগ আমাদের গায়ে না থাকে, তাহা হইলে না হয় পুলিস ও গুপ্ত বিপ্লবকারীর পন্থা আর রোধ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সরিয়া পড়িব। সেই পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।

ধৰ্ম্ম, ২১শ সংখ্যা, ১১ই মাঘ, ১৩১৬

আর্য্যসমাজ

আর্য্যসমাজ স্বামী দয়ানন্দের সৃষ্টি। তিনি যে ভাব ও প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, আর্য্যসমাজ যতদিন সেইভাবে ভাবান্বিত এবং সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত রহিবে, ততদিন তাহার তেজ, বৃদ্ধি ও সৌভাগ্য থাকিবে। বিভূতি বা মহাপুরুষ কোনও বিশেষ ভাব লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই ভাব প্রকাশ করিয়া তাহার বলে জগতের উপকারী মহৎ কার্য্য করিয়া যান, বা নিজ ভাবের সঞ্চারে ও বিস্তারে শক্তির একটী বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার সংস্থাপিত সংস্থা বড় হউক বা ছোট হউক সেই সংস্থা সেই বিভূতি বা মহাপুরুষের প্রতিনিধি হইয়া জগতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য করিতে থাকে। যে দিন সংস্থায় মহাপুরুষের ভাব মলিন হইবে বা তিরোহিত হইবার লক্ষণ হইবে, সেই দিন হয় ইহা বিনষ্ট হইবে নয় অন্য আকার ও অন্য ভাব গ্রহণ করিয়া জগতের অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিবে। তখন অন্যান্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্থার বিনাশ ঠেকাইতে পারেন এবং অনিষ্টের মাত্রা কমাইতে পারেন, কিন্তু আসল ভাব ফিরাইয়া আনিতে পারেন না। আর্য্যসমাজের সংস্থাপক তেজস্বী স্বামী দয়ানন্দের ভাবের মধ্যে আমরা তিন তত্ত্ব পাই, পুরুষার্থ, স্বাধীনতা এবং কৰ্ম্ম। এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মঠ তেজস্বী স্বাধীনতাপ্রিয় পঞ্জাবী জাতির প্রিয় হইয়াছে, অতুল্য কৰ্ম্মশৃঙ্খলা, কার্য্যসিদ্ধি এবং উত্তরোত্তর উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে। কিন্তু এখন যে পরীক্ষা আসিয়াছে, আর্য্যসমাজ উত্তীর্ণ হইবে তাহা আমাদের

বোধ হয় না। লাল লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনের সময়ে সমাজে অনেক দোষ প্রকাশ হইয়াছিল, এখন আরও শোচনীয় দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখিতে পাই। যে মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাবের ভিত্তি ছিল, সমাজ সে মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়া কিসেতে নিরাপদ থাকি, এই ভাবনায় ও ভয়ে উন্মত্ত হইয়াছে। বিনা বিচারে পরমানন্দকে তাড়ান এবং দুই সামান্য পত্র প্রকাশ হওয়ায় লালা লাজপত রায়কে তাঁহার সকল পদ ছাড়ান এই আশ্চর্য্য বিহ্বলতার প্রমাণ। শীঘ্র মতি না ফিরিলে আর্য্যসমাজ মৃত্যুর পথে ধাবিত হইবে। যে যে ধর্ম্ম জগতে রহিয়াছে, মনুষ্যজাতির মন অধিকার করিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলাম, শিখধর্ম্ম, ছোট হউক, বড় হউক, পরীক্ষার সময় নিজ ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া বাঁচিতে পারিয়াছে।

ইংলণ্ডের নির্ব্বাচনী

ইংলণ্ডের নির্ব্বাচনী আরম্ভ হইয়াছে। ফলে কোন্ দলের যে প্রাধান্য হইবে তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। আপাততঃ রক্ষণশীল দলেরই জয় হইতে চলিয়াছে। দক্ষিণ ও মধ্য ইংলণ্ডে ইঁহাদিগের প্রভাব অত্যন্ত অধিক দেখা যাইতেছে। লণ্ডনে দুইদলেরই সমান প্রভাব বলিয়া বোধ হয়। উত্তরাংশেই উদারনীতিকগণের প্রভাব এবং ওয়েলস ও স্কটলণ্ড একরকম সম্পূর্ণরূপেই ইহাদিগের পক্ষে। নির্বাবচনের ফলে উভয়ের ক্ষমতা সমান সমান হইলে যে দলই গবর্ণমেণ্ট করিতে চাহিবেন, ন্যাশনলিষ্টদিগের উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইবে। রক্ষণশীলগণ হোমরূলের পক্ষপাতী নহেন কাজেই ন্যাশনলিষ্টদিগের সহিত যোগদান করিয়া উদারনীতিকগণ গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা গবর্ণমেণ্ট চালাইতে পারিবেন না। কারণ অভিজাত সভার ভিটোর ক্ষমতা রহিয়াই যাইবে ও তাহারা পুনর্ব্বার বজেট প্রত্যাখ্যান করিবে। কাজেই যে পথে যাওয়া হউক না কেন তাহা সকলই রুদ্ধ। এই অদ্ভুত উভয় সঙ্কট এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্ব্বাচনের ফলের সহিত ভারতবর্ষের তত সংস্রব নাই। তবে আমরা এইটুকু আশা করি যে উদারনীতিকগণের জয় হইলে ও অভিজাত সভার ভিটোর ক্ষমতা লুপ্ত ও তৎসম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তনাদি হইলে শাসনসংস্কারাদি সম্বন্ধে আমাদিগের একটু সুবিধা হইবে। ইহা ব্যতিরেকে উদারনীতিকেরই জয় হউক, আর রক্ষণশীলেরই জয় হউক আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

ধর্ম্ম, ২৪শ সংখ্যা, ২রা ফাল্গুন, ১৩১৬

বিচার

বিচারের শুদ্ধতা সমাজের স্তম্ভস্বরূপ। সেই শুদ্ধতা কতক জজের মন ও চিত্তের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, কতক স্বাধীন লোকমত দ্বারা রক্ষিত হয়। জজ রাজার মুখ্য ধর্ম্মের ভার বহন করেন, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি; যেমন ঈশ্বর বিচারাসনে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে শত্রু মিত্র, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা ইত্যাদি ভেদ না করিয়া কেবলই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেইভাবে বিচার করা তাঁহার ধর্ম্ম। যদি রাগদ্বেষ, মানমর্য্যাদা, রাজনীতিক বা সমাজিক কোনও উদ্দেশ্যের বশে আইনের বিভ্রাট করেন, তিনিও ধর্ম্মচ্যুত হন, সমাজের বন্ধনও শিথিল হয়। আর যদি অজ্ঞ বা লঘুচিত্ত ব্যক্তিকে বিচারকর্ত্তার আসনে বসান হয়, সেই রাজ্যের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। আর সকল শাসনতন্ত্রের বিভাগে বিভ্রাট হওয়ায় অনিষ্ট ক্ষণস্থায়ী হইতেও পারে, বিচারের অশুদ্ধতায় রাজা, রাজ্য ও প্রজার ধ্বংস হয়। কোনও শাসনতন্ত্রের গুণ দোষ নির্ণয় করিবার সময় সহস্র শৃঙ্খলা, কার্য্যক্ষমতা ও সুখ-শান্তির প্রমাণ দেওয়া নিরর্থক, — যদি বিচারপ্রণালী নির্দ্দোষ না হয়, সেই শাসনতন্ত্রের প্রশংসা মিথ্যা।

লোকমতের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ যদি নিষ্পাপ ও স্থিরবুদ্ধি হইত, বিচার সম্বন্ধে লোকমতের স্বাধীনতা আবশ্যক হইত না। কিন্তু মানুষের মন চঞ্চল, তাহার চিত্তে কামনা ও রাগদ্বেষ প্রবল, তাহার বুদ্ধি অশুদ্ধ ও পক্ষপাতপূর্ণ। এই অবস্থায় বিচারের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার তিন উপায় আছে। প্রথম উপায় আইনজ্ঞ, প্রৌঢ়, ধীরপ্রকৃতি লোককে বিচারাসনে বসাইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন, স্বার্থচিন্তা, পরের আদেশ, প্রার্থনা, অনুনয় ইত্যাদি হইতে দূরে রাখা; চঞ্চলমনা, আইনে অনভিজ্ঞ যুবককে কখন বিচারাসনে আরূঢ় করা উচিত নহে, বিচারককে কোনমতে শাসকের অধীন করাও বিপজ্জনক, এই তত্ত্ব ও নিয়ম ইংলণ্ডীয় বিচারপ্রণালীতে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বৃটিশ বিচারপ্রণালীর এত প্রশংসা। দ্বিতীয় উপায় বিচারের মহান নিষ্কলঙ্ক আদর্শ স্থাপন করিয়া সেই আদর্শ বিচারক, আইনব্যবসায়ী লোক

ও সর্ব্বসাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করা। কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হওয়া মানুষের পক্ষে অতি সহজ, সেইজন্য লোকমতকে আদর্শের রক্ষকরূপে দাঁড় করান ভাল। বিচারক যদি জানেন যে আদর্শ হইতে লেশমাত্র ভ্রষ্ট হইলে লোকের নিন্দা ও কলঙ্কের পাত্র হইব, তাঁহার মনে অন্যায় করিবার প্রবৃত্তি সহজে আশ্রয় পাইবে না।

আমাদের দেশে

আমাদের দেশে কয়েক কারণবশতঃ বিচারককে শাসকের অধীন রাখা হইয়াছে, সেই জন্যে বিচারকের দায়িত্ব অনেকটা শাসকের উপর পড়িয়াছে। বিচারক ঈশ্বরের প্রতিনিধি না হইয়া শাসকের প্রতিনিধি হন। অতএব শাসকের দায়িত্ব অতি গুরুতর। ইহার উপর শাসনতন্ত্রের সুবিধার জন্য অপক্বকেশ অনভিজ্ঞ লোকের উপরেও বিচারের ভার দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আবার সম্প্রতি নূতন আইনে বিচারকের বিচার সম্বন্ধে বিপরীত লোকমত ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা শাসনের জন্য আবশ্যক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব ইহার সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু এই অবস্থায় শাসকের কি ভীষণ দায়িত্ব, তাহা শাসনকর্ত্তারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাঁহারা যেন স্মরণ করেন যে, তাঁহারা এই অপূর্ব্ব ক্ষমতার কি প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা ভগবান দেখিতেছেন, দেশের হিতাহিত, রাজ্যশাসনের ফলাফল এবং সাম্রাজ্যের সুখ শান্তি ও স্থায়িত্ব তাহারই উপর নির্ভর করে।

ধর্ম্ম, ২৫শ সংখ্যা, ৯ই ফাল্গুন, ১৩১৬

ভগবদ্দর্শন

দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র নির্ব্বাসিত হইয়া আগ্রা জেলে কিরূপে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও সর্ব্বত্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তিনি ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যখন উত্তরপাড়ায় সেই কথাই বলিয়াছিলেন, পুণার ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মর (সমাজসংস্কারক) উপহাস করিয়া বলিলেন, দেখিতেছি জেলে ঈশ্বরদর্শনের ছড়াছড়ি হইতেছে। উপহাসের

অর্থ এই যে এই সব কথা মাথাপাগলা লোকের কল্পনা অথবা মিথ্যাবাদীর বুজরুকী। অথচ অরবিন্দবাবু যাহা বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার অবিকল তাহাই বলিয়াছেন। এমনকি যাহা অনেকের বিশেষ পরিহাসের যোগ্য কথা বোধ হইয়াছে, বিচারক ও জেলরের মধ্যে সেই সর্ব্বব্যাপী প্রেমময় ও দয়াময় দর্শন, তাহাও দুইজনেই লাভ করিয়াছেন। অবশ্য, একই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দুইপ্রকার তার্কিক সিদ্ধান্ত হইতে পারে, এক সত্য লইয়া নানা মত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আগ্রায় ও আলিপুরে, যাহাদের ভিন্ন মত ও ভিন্ন প্রকৃতি, সেইরূপ দুইটী লোকের একই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়াছে, তখন কি কেহ তাহাকে পাগলামী বা বুজরুকী বলিতে পারে? পুণার “সমাজসংস্কারক”এর মতে ভগবান কখনও প্রত্যক্ষ দর্শন দেন না, তিনি নিয়মের অন্তরালে থাকেন, আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুভব করতে পারি, ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করা বাতুলের কথা। একজন বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ লোক যদি বলেন যে অমুক রাসায়নিক প্রয়োগ মিথ্যা এবং কয়েকজন বিজ্ঞানবিদ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া করিয়া বলেন, ইহা সত্য, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কাহার কথা অধিক বিশ্বাসযোগ্য, কাহার মত লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য?

জেলে দর্শন

এইরূপ লোকের আর এক অবিশ্বাসের কারণ এই যে জেল অপবিত্র স্থান, খুনী চোর ডাকাতে পরিপূর্ণ, যদিও ভগবান দর্শন দেন, তবে পবিত্রস্থানে সাধু-সন্ন্যাসীকেই দর্শন দিবেন, আইনের জালে পতিত রাজনীতিককে, ঘোর রাজসিক কার্য্যে লিপ্ত সংসারীকে জেলে দেখা দিবেন কেন? আমাদের মতে সাধু-সন্ন্যাসী অপেক্ষা এইরূপ লোককেই ভগবান সহজে ধরা দেন, আশ্রম ও মন্দির অপেক্ষা জেলে ও বধ্যভূমিতে ভগবদ্দর্শনের ছড়াছড়ি হইবার কথা। যাঁহারা মানবজাতির জন্য, দেশের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা ভগবানের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, যে দুঃখীকে সান্ত্বনা, দরিদ্রকে সাহায্য, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, নিরুপায়কে উপায় দেয়, সে আমাকেই দেয় — আমি সেই দুঃখী, সেই দরিদ্র, সেই তৃষ্ণার্ত্ত, সেই নিরুপায়। আবার জেলে অহঙ্কার সম্পূর্ণ চলিয়া যায়। সেইখানে লেশমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, ভগবানের মুখের পানে আহার, নিদ্রা, সুখ, ভাগ্য, স্বাধীনতার জন্য চাহিতেই হয়। অতএব এই অবস্থায়

সম্পূর্ণ নির্ভর, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ যেমন সহজ আর কোথাও তেমন সহজ নহে। কর্ম্মীর আত্মসমর্পণ ভগবানের অতি প্রিয় উপহার, এই পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, এই বলিই শ্রেষ্ঠ বলি। ইহাতে যদি ভগবদ্দর্শন না হয়, তবে কিসে হইবে?

বেদে পুনর্জ্জন্ম

য়ুরোপীয়গণ যখন প্রথম আর্য্যসাহিত্য আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহাদের এমন আনন্দ হয় যে সমুচিত প্রশংসা করিবার কথাও জোটে না এবং পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। পরে পাশ্চাত্য হৃদয়ে ঈর্ষার বহ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং অনেকে সেই ঈর্ষার বশে সংস্কৃত ভাষা ও বিফল সাহিত্য ব্রাহ্মণদের জাল জোচ্চুরি বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা যখন হয়, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা নূতন ফন্দী বাহির করিলেন; তাঁহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, কিছুই হিন্দুর নিজস্ব নাই, সবই বিদেশ হইতে আমদানী। রামায়ণ ও মহাভারত হোমরের অনুকরণ, জ্যোতিষ, কাব্য, নাটক, আয়ুর্ব্বেদ, শিল্প, চিত্রকলা, স্থাপত্য বিদ্যা, গণিত, দেবনাগরী অক্ষর, পঞ্চতন্ত্র, যাহা যাহা ভারতের গৌরব বলিয়া প্রসিদ্ধ, সবই গ্রীস, ইজিপ্ত, বাবুলোন ইত্যাদি দেশ হইতে ধার করা, এবং গীতা খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে চোরাই মাল; হিন্দুধর্ম্মে যদি কোন গুণ থাকে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের দান, — আর পাছে বলি, বুদ্ধ ত ভারতবাসী, তখন এই অদ্ভুত কল্পনা আবিষ্কার করিলেন যে বুদ্ধ মোঙ্গল বা তুরষ্ক জাতীয়; শাক্যগণ, শক বা Scythian; এই সময়ে এই মত প্রচার হয় যে, কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুধর্ম্মে ছিল না, বুদ্ধই এই মত সৃষ্টি করিলেন। সেইদিন দেখিলাম Hindu Spiritual Magazineএর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মত প্রচার করিয়াছেন যে এই কথা সত্য, বেদে পুনর্জ্জন্মবাদ নাই, পুনর্জ্জন্মবাদ হিন্দু-ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। জানি না সম্পাদক মহাশয় এই কথা স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিয়া বলিয়াছেন, না ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের প্রতিধ্বনি মাত্র। আমরা দেখাইতে পারি এবং দেখাইব যে, যে উপনিষদগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন যে, উপনিষদগুলি বৈদিক জ্ঞানের চরম বিকাশ, সেই উপনিষদে পুনর্জ্জন্ম ধ্রুব ও গৃহীত সত্য বলিয়া সর্ব্বত্র উল্লিখিত আছে। কর্ম্মবাদও বেদে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা মাত্র,

হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম নহে।

আর্য্যসমাজের অবনতি

আমরা আর্য্যসমাজের অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এই সমাজের অধ্যক্ষ সম্প্রতি এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন যে রাজভক্তি আর্য্যসমাজের ধর্ম্মমতের মধ্যে এক মত বলিয়া গৃহীত, সেই হেতু যে “আমি রাজভক্ত” বলিয়া শপথ গ্রহণ করিতে সম্মত, তাহাকেই আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত আর কাহাকেও নহে। অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্যও এই মহাত্মা এই বিধানের উপদেশ দিয়াছেন। ইহা যদি অধ্যক্ষজীর প্রকৃত মত হইত, আমরা কিছু বলিতাম না, কিন্তু আর্য্যসমাজের উপর ঘন ঘন রাজদ্রোহের অভিযোগ আসিয়া পড়িবার আগে তাহার এই উৎকট রাজভক্তির উদ্রেক হয় নাই। ধর্ম্ম সকলেরই জন্য, যে ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে কেহ রাজনীতিক মতের জন্য বহিষ্কৃত, সেই সম্প্রদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় নহে, স্বার্থসম্প্রদায়। আমি রাজভক্ত কি না রাজপুরুষ দেখিবেন এবং রাজপুরুষও আমার মনের ভাবের উপর অধিকার করিতে চেষ্টা করেন না, কেবল রাজভক্তির বিরুদ্ধভাব প্রচারে দেশের শান্তি যাহাতে নষ্ট না হয়, নিজ অধিকার নষ্ট না হয়, সেই চেষ্টা করেন। যে ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারে তুমি ভগবদ্ভক্ত কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া, তুমি রাজভক্ত কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, সেই মন্দির যেন কোন ভগবদ্ভক্ত না মাড়ান। Render unto Caesar the things that are Caesar's, unto God the things that are God's. সম্রাটের প্রাপ্য যাহা তাহাই সম্রাটকে অর্পণ কর, ভগবানের প্রাপ্য যাহা তাহা ভগবানের, সম্রাটের নহে।

পরিশিষ্ট

[এই দুইটি রচনা ‘ধর্ম্ম’ পত্রিকার পূর্ব্বকালীন সময়ের। বিষয়সাদৃশ্যে এখানে সন্নিবেশিত করা হল।]

ঐক্য ও স্বাধীনতা

গত ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে জাতীয়সভার ঊনবিংশ অধিবেশনের উপলক্ষে সভাপতি বঙ্গের প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন,

তাহাতে একটী নূতন রাজনৈতিক যুগপরিবর্ত্তনের অতিশয় অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহোদয়ের বলিবার ...[১] অন্য অন্য অধিবেশনের সভাপতি-দিগের বক্তৃতা সকল হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ধরণের হইয়াছে। তাঁহার কথার সুর সেই চিরপরিচিত একতানের মিল সহিত ঠিক মিলিতে পারে নাই। আগেকার[২] সভাপতিগণ প্রায়ই ভিক্ষুকবেশে রাজদুয়ারে উপস্থিত; কেহ কেহ রুক্ষভাষী দুর্দ্দান্ত ভিক্ষুক গৃহস্থের কর্ণকুহরে চেঁচামিচিতে ঝালাপালা করিয়া দান বের করিবার চেষ্টা করেন — কেহ ভদ্রলোক ভিক্ষুক মৃদুস্বরে অথবা অতি ক্ষীণ কান্নার সুরে গৃহস্বামীকে ভুলাইয়া স্বীয় মনোরথ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষ মহোদয়ের বক্তৃতায় একটী নূতন ভাবের অবতারণা লক্ষিত হয়, অর্দ্ধজাগ্রত মনুষ্যত্বের প্রথম সেই একটু ধ্বনি এখনও ক্ষীণ ও অস্পষ্ট তথাপি কবি Wordsworthএর তেজস্বী সারগর্ভ মহৎ উক্তির প্রতিধ্বনি যেন দূর হইতে শোনা যায় — Who would be free themselves must strike the blow. স্বাধীনতা চাও ত, আপনিই আপনার শিকল কাটিবে, আর কেহ তোমার হইয়া কাটিতে পারিবে না।

এখন স্বাধীনতা কি — অন্ততঃ অধুনাতন ভারতবর্ষের পক্ষে কি পরিমাণে স্বাধীনতা প্রয়াসলভ্য ও শ্রেয়স্কর, এই সম্বন্ধে কোন পরিপক্ক ও নিশ্চিত ধারণা দৃঢ়রূপে মনে অঙ্কিত[৩] করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট উক্তিগুলি বারবার আওড়ান ভারতবাসীদিগের একটী রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতেই আমাদিগের বল অর্থ ও সময় নষ্ট হয়। এই রোগ যেমন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রগাঢ় চিন্তার অভ্যাস, মনের স্বভাবলব্ধ প্রাঞ্জল ভাব ও... নষ্ট করে, তেমনই কার্য্যসিদ্ধির বিলম্ব ও সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ লোপই ঘটাইয়া শেষে নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্ট আলস্যের কারণ হয়। আজকাল বঙ্গদেশে সেই শেষ অবস্থাই কতক পরিমাণে অনুভব করিতেছি।

এই সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন উদ্দেশ্যের দিকে দুটী চিন্তার স্রোত জাতীয় মনে বহিতেছে। একটী প্রাচীন, দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে কিন্তু দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাগণ এখনও সেই স্রোতে ভাসিয়া সমস্ত জাতিকেও ভাসাইবার চেষ্টায় রত। অপরটী নূতন। যদিও দুই চারিজন সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত পুরুষ ভিন্ন কোন সর্ব্বজনসম্মত নেতা সেই দিকে অগ্রসর হন নাই, তথাপি তাহারা যে

১ এইরূপ '...' স্থানে শব্দ অথবা পঙ্‌ক্তি পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

২ অনিশ্চিত পাঠ

৩ অনিশ্চিত পাঠ

ভাগীরথীর পথ প্রস্তুত করিতেছে জাতীয় জীবন যে সেই পথেই বহিবে, এমন সম্ভাবনা অধিক। প্রাচীনেরা বলেন, আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এই চরম উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে ক্রমে ক্রমে অধিকারস্বত্ব পাইতে পাইতে শেষে অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বাধীনতা পাইব। ভারতবর্ষের রাজপুরুষ যতই নিষ্ঠুর হৌক না কেন, কিন্তু ইংরেজ জাতি মহৎ ও সহৃদয় জাতি — তাঁহাদের মধ্যে Wilberforce, Howard, Gladstone প্রভৃতি মহাত্মারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আমাদিগের দুঃখ জানে না, কাঁদিলে শুনিবে।

(খণ্ডাংশ)

৩০শে আশ্বিন

এই বৎসর ৩০ আশ্বিনের সমারোহ যেমন আগ্রহ, স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ও একপ্রাণতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যে গত দুই বৎসরের কোনও বৎসর হয় নাই, এই কথা ইংরাজ বাঙ্গালী শত্রুমিত্র সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নবজাত জাতীয় ভাবের, নবলব্ধ মাতৃজ্ঞানের বৃদ্ধি দেখিয়া সর্ব্ব সন্তানের হৃদয়ে উৎসাহ ও বলও দ্বিগুণ বৃদ্ধিলাভ। কি কারণ ৩০ আশ্বিন বাঙ্গালীর পক্ষে পবিত্র ও পূজ্য তিথি? বঙ্গভঙ্গের দিন শোকের দিন, অপমানের দিন বলিয়াই এই তিথি উন্নতিমুখ জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা অসম্ভব। যে দিন এমন কোনও চিরস্মরণীয় ঘটনা বা মহৎ জাতীয় সমারম্ভের স্মরণ করাইয়া দেয় যাহার স্মরণে সন্তানহৃদয়ে ভক্তি আনন্দ ও উচ্চ আশা সঞ্চারিত হয়, সেই দিনই জাতির প্রিয় দিন, সেই তিথিই পূজ্য ও পবিত্র। ৭ই আগষ্ট বয়কটের দিন বলিয়াই স্মরণীয় নহে, জাতীয় আত্মজ্ঞানলাভের দিন বলিয়া স্মরণীয়। বয়কটও বিদ্বেষপ্রসূত ঘৃণার প্রকাশ অথবা রাজার সঙ্গে অল্পদিনের রাগারাগি নহে, তাহার মধ্যে উচ্চতর জাতীয় ভাব নিহিত। আমরা বঙ্গবাসীগণ আত্মজ্ঞান হারা হইয়াছিলাম, ৭ই আগষ্টে সেই জাতীয় আত্মজ্ঞান পুনর্লাভ করিলাম, বুঝিলাম ভারতের জাতীয় জীবন ও উন্নতি কাহারও অনুগ্রহসাপেক্ষ নহে, আমরা বিদেশীর সাম্রাজ্য নগণ্য ও পরাধীন ক্ষুদ্রাংশ নহি, আমরাও জগতে একটী জাতি বটে, আমরা স্বতন্ত্র, দৈবীশক্তিসম্পন্ন, স্বাধীনতার অধিকারী। বয়কট সেই স্বতন্ত্রতার ঘোষণা, কর্ম্মক্ষেত্রে সেই নবজাগ্রত আত্মজ্ঞানের বিকাশের এবং ৭ই আগষ্ট সেই আত্মজ্ঞানলাভের তিথি। তেমনই বঙ্গভঙ্গ নয়, বঙ্গভঙ্গের অমৃতময় ফলই ৩০ আশ্বিনের সারার্থ।... ৩০ আশ্বিনে

মাতৃজ্ঞান জাগিল, আমরা জননীকে পুনর্লাভ করিলাম, ইহাই ৩০ আশ্বিনের পবিত্রতা, এইজন্যই বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এই তিথির চিরপ্রতিষ্ঠা। ৩০ আশ্বিন মাতৃজ্ঞানলাভের পবিত্র ও পূজ্য তিথি।

বিবিধ রচনা

পুরাতন ও নূতন

দেখিতেছি, আমরা দেশকে পুরাতনের কারাগার ভাঙ্গিয়া নূতনকে সৃষ্টি করিবার জন্যে ডাকিতেছি বলিয়া অনেকের মনে ক্রোধ, ভীতি ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে। তাঁহাদের ধারণা পুরাতনই সর্ব্বমঙ্গল, নিখুঁত সত্য, পূর্ণ জ্ঞান, ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যের অনিন্দনীয় সমৃদ্ধিশালী কোষাগার, পুরাতনের বলিয়াই ভারতের ভারতীয়ত্ব। আমরা যাহারা ভগবানে ও ভাগবত শক্তির উপর অটল শ্রদ্ধা রাখিয়া উন্নতির, দেবত্বের পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত, অকুণ্ঠ সাহসে ভবিষ্যতের নূতন আকার গড়িতে ইচ্ছুক, আমরা নাকি যৌবনের মদে উন্মত্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানে পুষ্ট উচ্ছৃঙ্খল বিপথের পথিক। পুরাতনকে সরাইয়া নূতনের আগমন সহজ করা অতীব বিপজ্জনক, সর্ব্বনাশের পন্থা। পুরাতন যদি যায়, তবে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম কোথায় রহিল, পুরাতনকে আঁকড়িয়া থাকা শ্রেয়, সেই চিরন্তন মোক্ষপরতা, সেই অতুল্য কল্যাণকর মায়াবাদ, — সেই অচল স্থিতিশীলতা, যাহা ভারতের একমাত্র সম্পদ। বলিতে পারিতাম, ভারতের, বিশেষ বঙ্গদেশের যে এখনকার অবস্থা, তাহা হইতে কি অধিক সর্ব্বনাশ, কি অধিক শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে, তাহা বোঝা বা কল্পনা করা দুষ্কর। পুরাতনকে আঁকড়িয়া যদি এই অবস্থাই হইল, তবে নূতনের চেষ্টা করায় দোষ কি? জাতির মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত, পুরাতনের উপর ভর দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা ভাল, না এই জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার জীবনের মুক্ত পথে বাহির হইবার প্রবৃত্তিই শ্রেয়স্কর? কিন্তু যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহারা অনেকে পণ্ডিত চিন্তাশীল গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাঁহাদের উক্তি এইরূপে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। বরং আমাদের কথার তাৎপর্য্য, আমাদের এই আহ্বানের গভীরতর তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করি।

সনাতন ও পুরাতন এক নয়। সনাতন চিরকালের, যাহা ত্রিকালাতীত, যাহা অবিনশ্বর, যাহা সকল রূপান্তরের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিদ্যমান থাকে, যাহাকে দেখি বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং, তাহাই সনাতন। পুরাতন বলিয়া ভারতের ধর্ম্ম ও মূল চিন্তাকে আমরা সনাতন ধর্ম্ম সনাতন সত্য বলি না, আত্মানুভূতিলব্ধ সনাতন আত্মজ্ঞান বলিয়া সেই চিন্তা, সনাতন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সেই ধর্ম্ম সনাতন। পুরাতন সনাতনের একটী সময়োপযোগী রূপ মাত্র।

পূর্ণতা

পূর্ণযোগের পন্থায় পদার্পণ করিয়াছ, পূর্ণযোগের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহাই একবার তলাইয়া দেখিয়া অগ্রসর হও। সিদ্ধির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইবার মহৎ আকাঙ্ক্ষা যাহার, তাহার দুটী কথা সম্যক জানা প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও পন্থা। পন্থার কথা পরে বলিব, আগে উদ্দেশ্যের পূর্ণ চিত্র তোমাদের চোখের সামনে পূর্ণভাবে দৃঢ়রেখায় ফলান দরকার।

পূর্ণতার অর্থ কি? পূর্ণতা ভাগবত সত্তার স্বরূপ, ভাগবতী প্রকৃতির ধর্ম্ম। মানুষ অপূর্ণ, পূর্ণতার প্রয়াসী, পূর্ণতার দিকে ক্রমবিকাশ, আত্মার ক্রম-অভিব্যক্তির ধারায় অগ্রসর। পূর্ণতা তাহার গন্তব্যস্থান, মানুষ ভগবানের একটী অর্দ্ধবিকশিত রূপ, সেইজন্য সে ভাগবত পূর্ণতার পথিক। এই মানুষরূপ মুকুলে ভাগবত-পদ্মের পূর্ণতা লুক্কায়িত, তাহা ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে প্রকৃতি ফুটাইতে সচেষ্ট আছে। যোগ-অভ্যাসে যোগশক্তিতে সে মহাবেগে ত্বরিতবিকাশে ফুটিতে আরম্ভ করে।

লোকে যাহাকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলে, মানসিক উন্নতি, নৈতিক সাধুতা, চিত্তবৃত্তির ললিত বিকাশ, চরিত্রের তেজ, প্রাণের বল, দৈহিক স্বাস্থ্য, সে ভাগবত পূর্ণতা নয়। সে প্রকৃতির একটী খণ্ড-ধর্ম্মের পূর্ণতা। আত্মার পূর্ণতায়, মানসাতীত বিজ্ঞানশক্তির পূর্ণতায় প্রকৃত অখণ্ড পূর্ণতা আসে। কারণ, অখণ্ড আত্মাই আসল পুরুষ, মানুষের মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক পুরুষত্ব তাহার একটী খণ্ড বিকাশ মাত্র। আর মনের বিকাশ বিজ্ঞানের একটী খণ্ড বাহ্যিক বিকৃত খেলা, মনের প্রকৃত পূর্ণতা আসে যখন সে বিজ্ঞানে পরিণত হয়। অখণ্ড আত্মা জগৎকে বিজ্ঞানশক্তিদ্বারা সৃজন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, বিজ্ঞানশক্তির দ্বারা খণ্ডকে অখণ্ডে তুলিয়া দেয়। আত্মা মানুষের মধ্যে মানসরূপ পর্দ্দায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, পর্দ্দা সরাইয়া আত্মার স্বরূপ দেখা দেয়। আত্মশক্তি মনে খর্ব্বীকৃত অর্দ্ধপ্রকাশিত অর্দ্ধলুক্কায়িত রূপ ও ক্রীড়া অনুভব করে, বিজ্ঞানশক্তি যখন খুলে তখনই আত্মশক্তির পূর্ণ স্ফুরণ।

পূর্ণযোগের মুখ্য লক্ষণ

ভাবের দিকে, তত্ত্বের দিকে পূর্ণযোগের অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখন যখন অনেকে এই পথে আসিয়াছে ও আসিতেছে, একবার সহজভাবে, আমাদের এই যোগপন্থা উদ্দেশ্য ও যোগসিদ্ধির মুখ্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হইয়াছে। যোগাবস্থা কখনও বুদ্ধির সহজগম্য নয়, প্রকৃত বোঝা অনুভূতি সাপেক্ষ, আত্মোপলব্ধির ফল, তথাপি বুদ্ধির সম্মুখে তার এমন আভাস স্থাপন করা দরকার যে এই পথের দিগ্বিদিক গন্তব্যস্থান ও নক্সা মানসদৃষ্টিতে চিত্রিত করিবে যাহারা পূর্ণ যোগের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ জানিতে চায়, তাহাদের সহজ উপলব্ধির জন্য, —

[অসম্পূর্ণ]

*

আমাদের আদর্শ মোক্ষ নয়, ব্রহ্মে লীন হইয়া অনির্দ্দেশ্য অনন্তে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি নয়, আদর্শ ব্যষ্টির ও সমষ্টির ভাগবত চৈতন্য লাভ, ভাগবত চৈতন্যে ঐক্য সংসিদ্ধি আনন্দ, সেই চৈতন্যে আত্মবান হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত ভগবৎপ্রেরিত ভগবৎশক্তি চালিত জীবন ও কর্ম্ম, মুক্তবৎ কর্ম্ম। গীতায় যাহা বলা আছে, "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি", সে যোগস্থ কর্ম্ম কেবল এই সাধনার অঙ্গ নয়, সিদ্ধিরও এক প্রধান অঙ্গ। সমস্ত জীবনকে আন্তর ও বাহ্যকে ভাগবত সত্তায় প্রকাশ ও ভাগবত ঐক্যের অভিব্যক্তি করা এই যোগের উদ্দেশ্য ও সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ।

*

পূর্ণ যোগের চারিটী অঙ্গ, জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম সিদ্ধি। এই চারিটী স্তম্ভের উপর দেবজীবনের অভ্রভেদী সত্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ণযোগে জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্য মোক্ষ নয়, লয় নয়, সংসারভীরুর পলায়ন নয়, বিরাগীর বিশ্ববিতৃষ্ণা নয়, পরব্রহ্মের আকাঙ্ক্ষায় লীলাময় ভগবানকে দূর করা নয়। এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য ভগবানকে জানা, ভাগবত চৈতন্যে আমার চৈতন্যকে তোলা, তাঁহার সঙ্গে এক হওয়া, আত্মায় এবং জগতে এক, বিজ্ঞানে এবং মনপ্রাণচিত্তে এক, শরীরে এক, কিছুই বাদ দিব না। পূর্ণ অদ্বৈত, ...সর্ব্বং খল্বিদং

ব্রহ্ম, তুরীয়; কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রৎ, ব্রহ্মমায়া পুরুষ প্রকৃতি তুমি আমি সেই সবই তিনি, বাসুদেবং সর্ব্বমিতি, ইহাই এই জ্ঞানের মূল মন্ত্র।

[অসম্পূর্ণ]

*

গীতায় বলে, সমতাই যোগ, সমত্বং যোগ উচ্যতে। আরও বলে, যাঁহাদের মন সাম্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ, তাঁহারাই জগতে রহিয়া জগজ্জয়ী, কারণ পরম ব্রহ্ম যেহেতু সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান, সমতাপ্রাপ্ত যোগসিদ্ধ জ্ঞানী ও কর্ম্মী সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বভাবে ব্রহ্মেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ।

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

ইহাই সমতা তত্ত্বের মূল ভিত্তি।

পূর্ণ যোগের সাধন প্রণালীতে সমতা হইতেছে যোগসিদ্ধির আরোহণে মুখ্য সোপান। অথবা বলিতে পারি, ব্রহ্মভাব যোগের ভূমিস্বরূপ, সমতা বৃন্ত, আর যতই সাধনলভ্য বস্তু নানা পত্র পুষ্প ও ফল। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ আত্মজ্ঞান, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ তপঃশক্তি, পূর্ণ অখণ্ড আনন্দ, ইহাদের একটীও সমতা ভিন্ন লাভ করিবার উপায় নাই, পূর্ণ সমতায়ই এইগুলোর পূর্ণতাও বিকসিত ও দৃঢ়লব্ধ, সেইই জন্যে যতদিন নিখুঁত সমতা সাধকের ভিতরে স্থায়ী বিশাল ও নিরেট না হয়, ততদিন এই যোগসিদ্ধির ভিত্তি অদৃঢ় ও অপর্য্যাপ্ত বুঝিতে হইবে। সমতা সুসিদ্ধ হইলেই যোগপথ সম নিষ্কণ্টক, সোজা সরল ঋজু আনন্দময় হইয়া যায়।

*

ভাগবত সত্তার সঙ্গে এক হওয়া, ভাগবত চৈতন্যে চেতনা সংযোগ করিয়া তাহার মধ্যেই অবস্থান করা, ভাগবত শক্তির প্রভাবে নিজ শক্তিকে লীন করা, ভাগবত সাধর্ম্ম্য লাভে সিদ্ধ আত্মবান হওয়া, ইহাই পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য। এক কথা দেব জন্ম লাভ, ভাগবত জীবন।

নির্লক্ষণ অনির্দ্দেশ্য লয় নহে, সেরূপ মোক্ষ আমার অভিপ্রেত নয়। ব্রহ্ম

নিত্য সনাতন, জগৎরূপ ব্রহ্মবিকাশও নিত্য সনাতন। আমি সেই প্রকাশের একটী কেন্দ্র, সমস্ত জগৎ আমার পরিধি, সকল ব্রহ্মাণ্ড আমার বিশ্ব স্বরূপ, সকল জীব আমার অগণন আমি, যেমন অনন্ত ব্রহ্মের অনির্দ্দেশ্য ঐক্য, সত্য, ব্রহ্মের এই বহু রূপ বিশিষ্ট ঐক্য সত্য।

গুরুব্রহ্ম পুরুষোত্তম অক্ষর জগৎ বিকাশেও পুরুষ স্বরূপে সেই অনির্দ্দেশ্য ঐক্য ভোগ করে, ক্ষর পুরুষে যে বহু রূপ বিশিষ্ট ঐক্যও একই সময়ে একই আধারে ভোগ করে। পুরুষোত্তমের এই লীলা আমি...। এই দ্বিবিধ রসভোগেই অনন্তের পূর্ণতা।

ভগবানের অখণ্ড সত্তা এক, সেই সত্তাকে আমরা পরমাত্মা বলি।

মানবসমাজের তিন ক্রম

মানুষের জ্ঞান ও শক্তি ক্রমবিকাশে নানারূপ ধারণ করে। সেই বিকাশের তিনটী অবস্থা দেখি — শরীরপ্রধান প্রাণনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত অবস্থা, বুদ্ধিপ্রধান উন্নত মধ্য অবস্থা, আত্মপ্রধান শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

শরীরপ্রধান প্রাণনিয়ন্ত্রিত মানুষ কাম ও অর্থের দাস। জানে সহজ সর্ব্বসাধারণ ভাব ও প্রেরণা (instinct ও impulse), কামনায় কামনায়, অর্থে অর্থে সংঘর্ষ উঠিয়া ঘটনাপরম্পরায় সৃষ্ট যে ব্যবস্থা সুবিধাজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকেই পছন্দ করে, এমন অল্প বা অনেক ব্যবস্থার সংহতিকে ধর্ম্ম বলে। রুচি-পরম্পরাগত, কুলগত বা সামাজিক আচার এইরূপ নিম্ন প্রাকৃত অবস্থার ধর্ম্ম। প্রাকৃত মানুষের মোক্ষের কল্পনা থাকে না, আত্মার সন্ধান সে পায় নাই। তাহার অবাধ শারীরিক ও প্রাণিক প্রবৃত্তির অবাধ লীলাক্ষেত্র একটী কল্পিত স্বর্গ। তাহার ওইদিকে তাহার চিন্তা উঠিতে পারে না। দেহপাতে স্বর্গগমনই তাহার মোক্ষ।

বুদ্ধিপ্রধান মানুষ কাম ও অর্থকে চিন্তাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে সর্বদা সচেষ্ট। কামের শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা কোথায়, জীবনের অনেক ভিন্নমুখী অর্থের মধ্যে কোন অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ও আদর্শ জীবনের স্বরূপ কি, — বুদ্ধিচালিত কি নিয়মের সাহায্যে সে স্বরূপ পরিস্ফুট, আদর্শ সিদ্ধ হয়, এই গবেষণায় সে ব্যাপৃত। এই স্বরূপ, আদর্শ নিয়মের কোন একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশীলনকে বুদ্ধিমান সমাজের ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। উন্নত মানসজ্ঞানে আলোকিত সমাজের নিয়ন্তা এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধিই।

আত্মপ্রধান মানুষ বুদ্ধি মন প্রাণ শরীরের অতীত গূঢ় আত্মার সন্ধান পাইয়াছে, আত্মজ্ঞানেই জীবনের গতি প্রতিষ্ঠা করে, — মোক্ষ, আত্মপ্রাপ্তি, ভগবানকে লাভ করা জীবনের পরিণতি বুঝিয়া আত্মপ্রধান মানুষ সেইদিকে তাহার সমস্ত গতি পরিচালিত করিতে চায়, যে জীবনপ্রণালী ও আদর্শ অনুশীলন আত্মপ্রাপ্তির উপযোগী, যাহাতে মানুষের মানবীয় ক্রমবিকাশের ও সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা তাহাকেই সে ধর্ম্ম বলে। শ্রেষ্ঠ সমাজ এইরূপ আদর্শ এইরূপ ধর্ম্ম দ্বারা চালিত।

প্রাণপর্ব্ব হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে বুদ্ধির অতীত আত্মায়, ধাপে ধাপে ভাগবত পর্ব্বতে মনুষ্যযাত্রীর ঊর্দ্ধ্বগামী নিয়ত আরোহণ।

*

কোনও এক সমাজে একমাত্র ধারা দৃষ্ট হয় না। প্রায় সকল সমাজেই এই তিন প্রকার মানুষ বাস করে, সেই মনুষ্য-সমষ্টির সমাজও মিশ্রজাতীয় হয়।

প্রাকৃত সমাজেও বুদ্ধিমান ও আত্মবান পুরুষ থাকে। তাঁহারা যদি বিরল, সংহতিরহিত বা অসিদ্ধ [হন], [তবে] সমাজের উপর বিশেষ কিছু ফল হয় না। যদি বহুসংখ্যককে সংহতিবদ্ধ করিয়া শক্তিমান সিদ্ধ [হন], তবেই প্রাকৃত সমাজকে মুষ্টিতে ধরিয়া তাহার কতকটা উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন। তবে প্রাকৃতজনের আধিক্যের দরুণ বুদ্ধিমানের বা আত্মবানের ধর্ম্ম প্রায়ই বিকৃত হয়, বুদ্ধির ধর্ম্ম অর্ধমৃত হইয়া পড়ে, conventionএ পরিণত হইয়া আত্মজ্ঞানের ধর্ম্ম রুচি ও বাহ্যিক আচারের চাপে ক্লিষ্ট, প্লাবিত, প্রাণহীন, স্বলক্ষ্যভ্রষ্ট — এই পরিণাম সর্ব্বদা দেখি।

বুদ্ধির প্রাবল্য যখন হয়, বুদ্ধি সমাজের নেতা সাজিয়া অবোধ রুচি ও আচারকে ভাঙ্গিয়া বদলাইয়া মানসজ্ঞানে আলোকিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা [করে], দেখি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আলোক (enlightenment) সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী এই চেষ্টার একটী রূপ মাত্র। সিদ্ধি অসম্ভব। আত্মজ্ঞানের অভাবে বুদ্ধিমানও প্রাণ-মন-শরীরের টানে নিজের আদর্শ নিজে বিকৃত করে, নিম্নপ্রকৃতির হাত এড়ান কঠিন। মধ্য অবস্থা, মধ্য অবস্থায় স্থায়িত্ব নয় — হয় নীচের দিকে পতন, নয় উচ্চের দিকে উঠা, এই দুই টানে বুদ্ধি দোদুল্যমান। আত্মবান আত্মজ্ঞানের জ্যোতিঃস্ফুরণে রুচি ও আচারকে উচ্চ ধর্ম্মের উপযুক্ত সহায় করিয়া, উচ্চ ধর্ম্মে পরিণত করিতে সচেষ্ট। তাহারও চেষ্টায় অনেক বিপদের সম্ভাবনা। নিম্নের টান অতি বড় টান, প্রাকৃতজনের নিম্নপ্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে গেলে আত্মপ্রধান সমাজেরও অধোগতির আশঙ্কা।

*

[নিম্নলিখিত অংশটি শ্রীঅরবিন্দের নোট বইয়ে উপরের রচনাটির ঠিক পূর্বে লিখিত আছে।]

এই জ্ঞান ও শক্তি সমাজকে চালাইবে, সমাজকে গঠন করিবে, প্রয়োজন মত তাহার আকার সাধারণ নিয়ম বদলাইয়া দিবে। এ জীবনের স্ফুরণে জ্ঞান ও শক্তির বিকাশের সঙ্গে সমাজেরও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। মানুষের জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা ভগবদ্দত্ত জীবন্ত জ্ঞান ও শক্তি, যাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ক্রম-

বিকাশের উদ্দেশ্য। সমাজ উদ্দেশ্য হইতে পারে না, সমাজ যন্ত্র ও উপায়। সমাজ যন্ত্রের মধ্যে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ মানুষকে পেষণ করায় নিশ্চলতা ও অবনতিই অনিবার্য্য।

মনুষ্যের ভগবৎপ্রাপ্তি, ভাগবত আত্মবিকাশ জীবনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের দিকে যারা অগ্রসর হইবে, ভগবৎ-জ্ঞানকেই যেমন ব্যষ্টির তেমনই সমষ্টির জীবনের নিয়ামক করিতে হইবে। বুদ্ধিকে জ্ঞানের স্থানে বসাইতে নাই। প্রাচীন আর্য্য জাতির সমাজ মুক্ত স্বাধীন সমাজ ছিল, শ্রুতিলব্ধ ভাগবত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মুখ্য তত্ত্ব লইয়া গঠিত। তাহার উপর কয়েকটি অত্যল্প বিশেষ নিয়ম শ্রৌত ধর্ম্মসূত্রে সংকলিত, আর্য্যধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্বের যেগুলিতে সময়োপযোগী সামাজিক আকৃতি দেওয়া হয়। যেমন মানুষের বুদ্ধির আধিপত্য বাড়িতে লাগিল, ইহাতে সেই বুদ্ধির বাঁধা পারিপাট্যের স্বাভাবিক স্পৃহা আর তৃপ্ত হয় না। নিয়ম ছিল যে পরিমাণে যে শাস্ত্র শ্রুতির পথে চলে, কেবল সেই শাস্ত্র সেই পরিমাণে গ্রাহ্য। বিপুলাকার স্মার্ত্ত শাস্ত্র রচিত হয়। তবে আর্য্যেরা এই কথা ভুলেন নাই যে শ্রুতিই আসল। স্মৃতি গৌণ, শ্রুতি সনাতন, স্মৃতি সময়োপযোগী। সেইজন্যে এই বিস্তারে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। পরিশেষে, বৌদ্ধ বিপ্লবের অবসানের পরে শ্রুতিকে একেবারে ভুলিয়া শ্রুতিকে সন্ন্যাসেরই উপায় কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকে অযথা প্রাধান্য দেওয়া হয়। দৃঢ় শাস্ত্রের বন্ধন মানুষের সকল অঙ্গের স্বাধীন সঞ্চালন বন্ধ করিয়া নিশ্চলভাবে কোন রূপে বাঁচাই সমাজের লক্ষ্য হইয়া যায়। মানুষের স্বাধীন আত্মার একমাত্র উপায় রহিল সমাজকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ।

মনুষ্য বুদ্ধি ভাগবত বিকাশে গৌণ উপায়, আসল পরিচালক নয়।

ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে চারিটী পর্যায় দেখিয়া ইহা বোঝা যায়।

সমাজের কথা

মানুষের জন্ম সমাজের জন্য নয়, সমাজ মানুষের জন্য সৃষ্ট। যাঁহারা মানুষের অন্তস্থ ভগবানকে ভুলিয়া সমাজকে বড় করিয়া তোলেন, তাঁহারা অপদেবতার পূজা করেন। অযথা সমাজপূজা মনুষ্য-জীবনের কৃত্রিমতার লক্ষণ, স্বধর্ম্মের বিকৃতি।

মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের। যাঁহারা সমাজের দাসত্ব, সমাজের বহু বাহ্যিক শৃঙ্খল মানুষের আত্মায় মনে প্রাণে চাপাইয়া তাহার অন্তস্থ ভগবানকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির প্রকৃত লক্ষ্য হারাইয়া বসিয়াছেন। এই অত্যাচারের দোষে অন্তর্নিহিত দেবতা জাগ্রত হয় না, শক্তিও ঘুমাইয়া পড়ে। দাসত্বই যদি করিতে হয়, সমাজের নয়, ভগবানের দাস্য স্বীকার কর। সেই দাস্যে মাধুর্য্যও আছে, উন্নতিও আছে। পরম আনন্দ, বন্ধনেও মুক্তি, অবাধ স্বাধীনতা তাহার চরম পরিণাম।

সমাজ উদ্দেশ্য হইতে পারে না, সমাজ উপায়, যন্ত্র। মানুষের আত্মপ্রণোদিত কর্ম্মস্ফুরিত ভগবদ্‌গঠিত জ্ঞান ও শক্তি জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা, যাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি জীবনের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান, এই শক্তি সমাজরূপ যন্ত্রকে চালাইবে, সমাজকে গঠন করিবে, প্রয়োজনমত বদলাইয়াও দিবে, ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। নিশ্চল স্থগিত সমাজ মৃত মনুষ্যত্বের কবর হইয়া যায়, জীবনের স্ফুরণে জ্ঞানশক্তির বিকাশে সমাজেরও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। সমাজযন্ত্রের মধ্যে সহস্রবন্ধনে বদ্ধ মানুষকে ফেলিয়া পেষণ করায় নিশ্চলতা ও অবনতি অনিবার্য্য।

আমরা মানুষকে ছোট করিয়া সমাজকে বড় করিয়াছি। সমাজ কিন্তু তাহাতে বড় হয় না, ক্ষুদ্র নিশ্চল ও নিষ্ফল হয়। আমরা সমাজকে উত্তরোত্তর উন্নতির উপায় নহে, নিগ্রহ ও বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাই আমাদের অবনতির, নিশ্চেষ্টতার, নিরুপায় দুর্ব্বলতার কারণ। মানুষকে বড় কর, অন্তস্থ ভগবান যেখানে গুপ্তভাবে বিরাজমান সেই মন্দিরের সিংহদ্বার খুলিয়া দাও, সমাজ আপনিই মহান, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, উন্মুক্ত উচ্চাশয় প্রয়াসের সফল ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে। ভিতরের পরিণাম ও প্রতিকৃতি বাহ্য।

জগন্নাথের রথ

আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য স্বাধীনতা জ্ঞান শক্তি সেই রথের চারি চক্র।

মনুষ্যবুদ্ধির গঠিত কিম্বা প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণস্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটী সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত অন্তর্য্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটী চলিতেছে নানা ভোগপূর্ণ লক্ষ্যহীন কর্ম্মপথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সঙ্কল্পের টানে, নিম্নপ্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতদিন অহঙ্কারই কর্ত্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, — লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালানো অসাধ্য। অহঙ্কার যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই তথ্য যেমন ব্যষ্টির, তেমনই সমষ্টির পক্ষেও সত্য।

সাধারণ মনুষ্যসমাজের তিনটী মুখ্য ভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটী নিপুণ কারিগরের সৃষ্টি, সুঠাম চাকচিক্যময় উজ্জ্বল অমল সুখকর, তাহাকে বহিয়া লইয়াছে বলবান্ সুশিক্ষিত অশ্ব, সে অগ্রসর হইতেছে সুপথে সযত্নে ত্বরারহিত অমন্থর গতিতে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইহার মালিক আরোহী। যে উপরিস্থ উত্তুঙ্গ প্রদেশে ভগবানের মন্দির, রথ তাহারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কিছু দূরে দূরে রহিয়া, সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পৌঁছিতে পারে না। যদি উঠিতে হয় রথ হইতে নামিয়া একা পদব্রজে উঠাই নিয়ম। বৈদিক যুগের পরে প্রাচীন আর্য্যদের সমাজকে এই ধরণের রথ বলা যায়।

দ্বিতীয়টী বিলাসী কর্ম্মঠের মোটরগাড়ী। ধূলার ঝড়ের মধ্যে ভীমবেগে বজ্র-নির্ঘোষে রাজপথ চূর্ণ করিয়া অশান্ত অশ্রান্ত গতিতে সে ধাইয়াছে, ভেরীর রবে শ্রবণ বধির, যাহাকে সম্মুখে পায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়। যাত্রীর প্রাণের সঙ্কট, দুর্ঘটনা অবিরল, রথ ভাঙ্গিয়া যায়, আবার কষ্টেসৃষ্টে মেরামতের পর সদর্প চলন। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, তবে যে নূতন দৃশ্য অনতিদূরে চোখের সম্মুখে পড়ে, ''এই লক্ষ্য, এই লক্ষ্য'' চীৎকার করিয়া করিয়া রথের মালিক রাজসিক অহঙ্কার সেই দিকে ছুটে। এই রথে চলায় যথেষ্ট ভোগ সুখ আছে, বিপদও অনিবার্য্য, ভগবানের নিকট পৌঁছা অসম্ভব। আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজ এই ধরণেরই মোটরগাড়ী।

তৃতীয়টী মলিন পুরান কচ্ছপগতি আধভাঙ্গা গরুরগাড়ী, টানে কৃশ অনশনক্লিষ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে; একজন ময়লা-কাপড়পরা ভুঁড়ি-

সর্ব্বস্ব শ্লথ অন্ধ বৃদ্ধ ভিতরে বসিয়া মহাসুখে কাদামাখা হুঁকা টানিতে টানিতে গাড়ীর কর্কশ ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ শুনিতে শুনিতে অতীতের কত বিকৃত আধ আধ স্মৃতিতে মগ্ন। এই মালিকের নাম তামসিক অহঙ্কার। গাড়োয়ানের নাম পুঁথি-পড়া জ্ঞান, সে পঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে গমনের সময় ও দিক নির্দ্দেশ করে, মুখে এই বুলি "যাহা আছে বা ছিল, তাহাই ভাল, যাহা হইবার চেষ্টা তাহাই খারাপ।" এই রথে ভগবানের নিকট না হৌক শূন্য ব্রহ্মে পৌঁছিবার বেশ আশু সম্ভাবনা আছে।

তামসিক অহঙ্কারের গরুরগাড়ী যতক্ষণ গ্রামের কাঁচাপথে চলে, ততক্ষণ রক্ষা। যেদিন জগতের রাজপথে সে উঠিয়া আসিবে যেখানে ভূরি ভূরি বেগদৃপ্ত মোটরের ছুটাছুটি, তখন তাহার কি পরিণাম হইবে, সে কথা ভাবিতেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বিপদ এই যে রথ বদলানোর সময় চেনা বা স্বীকার করা তামসিক অহঙ্কারের জ্ঞান-শক্তিতে কুলায় না। চিনিবার প্রবৃত্তিও নাই, তাহা হইলে তাহার ব্যবসা ও মালিকত্ব মাটী। সমস্যা যখন উপস্থিত, যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে, "না থাক, ইহাই ভাল, কেননা ইহা আমাদেরই" — তাঁহারা গোঁড়া অথবা ভাবুক দেশভক্ত। কেহ কেহ বলে, "এদিকে ওদিকে মেরামত করিয়া লও না" — এই সহজ উপায়ে নাকি গরুর গাড়ী অমনি অনিন্দ্য অমূল্য মোটরে পরিণত হইবে; — ইঁহাদের নাম সংস্কারক। কেহ কেহ বলে, "পুরাতন কালের সুন্দর রথটী ফিরিয়া আসুক" — তাঁহারা সেই অসাধ্যসাধনের উপায়ও খুঁজিতে মাঝে মাঝে প্রয়াসী। আশার অনুরূপ ফল যে হইবে, তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ কোথাও কিন্তু নাই।

তিনটীর মধ্যেই যদি পছন্দ করা অনিবার্য্য হয়, আরও উচ্চতর চেষ্টা যদি আমরা পরিহার করি, তবে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের নূতন রথ নির্ম্মাণ করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জগন্নাথের রথ যতদিন সৃষ্টি না হয়, আদর্শ সমাজও ততদিন গঠিত হইবে না। সেইটীই আদর্শ, সেইটীই চরম, গভীরতম উচ্চতম সত্যের বিকাশ ও প্রতিকৃতি। মনুষ্যজাতি গুপ্ত বিশ্বপুরুষের প্রেরণায় তাহাকেই গড়িতে সচেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতির অজ্ঞানবশে গড়িয়া বসে অন্যরূপ প্রতিমা — হয় বিকৃত অসিদ্ধ কুৎসিত, নয় চলনসই অর্দ্ধসুন্দর বা সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ; শিবের বদলে হয় বামন, নয় রাক্ষস, নয় মধ্যম লোকের অর্দ্ধদেবতা।

জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না, কোন জীবনশিল্পী আঁকিতে পারগ নন। সেই ছবি বিশ্বপুরুষের হৃদয়ে প্রস্তুত, নানা আবরণে আবৃত।

দ্রষ্টা কর্ত্তা অনেক ভগবদ্‌বিভূতির অনেক চেষ্টায় আস্তে আস্তে বাহির করিয়া স্থূল জগতে প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্য্যামীর অভিসন্ধি।

*

জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয়, সংঘ। বহুমুখী শিথিল জনসংঘ বা জনতা নয়; আত্মজ্ঞানের, ভাগবতজ্ঞানের ঐক্যমুখী শক্তির বলে সানন্দে গঠিত বন্ধনরহিত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত সংঘ।

অনেক সমবেত মনুষ্যের একত্র কর্ম্ম করিবার উপায় যে সংহতি, তাহাই সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপত্তি বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম্ প্রত্যয়ের অর্থ একত্র, অজ্ ধাতুর অর্থ গমন ধাবন যুদ্ধ। সহস্র সহস্র মানব কর্ম্মার্থে ও কামার্থে সমবেত, এক ক্ষেত্রে নানা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, কে আগে যায় কে বড় হয়, তাহা লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি — competition — যেমন অন্য সমাজের সঙ্গে তেমন পরস্পরের সঙ্গেও যুদ্ধ ও ঝগড়াঝাঁটি — এই কোলাহলের মধ্যেই শৃঙ্খলার জন্য, সাহায্যের জন্য, মনোবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নানা সম্বন্ধ স্থাপন, নানা আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ফলে কষ্টসিদ্ধ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের, প্রাকৃত সংসারের চেহারা।

ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমাজ। সেই ভেদের উপর আংশিক অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ঐক্য নির্ম্মিত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বিপরীত। ঐক্য ভিত্তি, আনন্দ-বৈচিত্র্যের জন্য — ভেদের নয় — পার্থক্যের খেলা। সমাজে পাই শারীরিক, মানসকল্পিত ও কর্ম্মগত ঐক্যের আভাস, আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।

আংশিকভাবে সংকীর্ণক্ষেত্রে সংঘস্থাপনের নিষ্ফল চেষ্টা কতবার হইয়াছে, হয় তাহা বুদ্ধিগত চিন্তার প্রেরণায় — যেমন পাশ্চাত্যদেশে, নয় নির্ব্বাণোন্মুখ কর্ম্মবিরতির স্বচ্ছন্দ অনুশীলনার্থে — যেমন বৌদ্ধদের, নয় বা ভাগবত ভাবের আবেগে — যেমন প্রথম খৃষ্টীয় সংঘ। কিন্তু অল্পের মধ্যেই সমাজের যত দোষ অসম্পূর্ণতা প্রবৃত্তি ঢুকিয়া সংঘকে সমাজে পরিণত করে। চঞ্চল বুদ্ধির চিন্তা টেঁকে না, পুরাতন বা নূতন প্রাণ-প্রবৃত্তির অদম্য স্রোতে ভাসিয়া যায়। ভাবের আবেগে এই চেষ্টার সাফল্য অসম্ভব, ভাব নিজের খরতায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। নির্ব্বাণকে একাকী খোঁজা ভাল, নির্ব্বাণ-প্রিয়তায় সংঘসৃষ্টি একটা বিপরীত কাণ্ড। সংঘ স্বভাবতঃ কর্ম্মের সম্বন্ধের লীলাভূমি।

যেদিন জ্ঞান কর্ম্ম ও ভাবের সামঞ্জস্যে ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে, সমষ্টিগত বিরাটপুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশ দিক আলোকিত করিবে। সত্যযুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্ত্য মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির-নগরী, temple city of God — আনন্দপুরী।

গীতা

গীতার ধর্ম্ম

যাঁহারা গীতা মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার বার যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও যুক্তাবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন; কই সাধারণ লোকে যাহাকে যোগ বলে, তাহার সঙ্গে তাহার মিল ত হয় না; শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে সন্ন্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন, অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মের উপাসনায় পরম গতিও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে সাঙ্গ করিয়া গীতার শ্রেষ্ঠাংশে ত্যাগের মহত্ব ও বাসুদেবের উপর শ্রদ্ধায় ও আত্মসমর্পণে পরমাবস্থাপ্রাপ্তি বিবিধ উপায়ে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতাকে রাজযোগাখ্যাপকগ্রন্থ বলা যায় না। সমতা, অনাসক্তি, কর্ম্মফলত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিষ্কাম কর্ম্ম, গুণাতীত্য ও স্বধর্ম্মসেবাই গীতার মূলতত্ত্ব। এই শিক্ষাকেই ভগবান পরম জ্ঞান ও গূঢ়তম রহস্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস গীতাই জগতের ভাবীধর্ম্মের সর্ব্বজনসম্মত শাস্ত্র হইবে। কিন্তু গীতার প্রকৃত অর্থ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। বড় বড় পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ মেধাবী তীক্ষ্ণবুদ্ধি লেখকও ইহার গূঢ়ার্থ গ্রহণে অক্ষম। একদিকে মোক্ষপরায়ণ ব্যাখ্যাকর্ত্তা গীতার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়াছেন, অপরদিকে ইংরাজ-দর্শনসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র গীতায় কেবলমাত্র ধীরভাবে কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ পাইয়া সেই অর্থই তরুণ-মণ্ডলীর মনে ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ধর্ম্ম অল্পসংখ্যক লোক আচরণ করিতে পারে। সর্ব্বজনসম্মত ধর্ম্মে এমন আদর্শ ও তত্ত্বশিক্ষা থাকা আবশ্যক যে সর্ব্বসাধারণে তাহা স্ব স্ব জীবনে ও কর্ম্মক্ষেত্রে উপলব্ধি করিতে পারে, অথচ সেই আদর্শ সম্পূর্ণ আচরণ করায় অল্পজনসাধ্য পরমগতি প্রাপ্ত হইবে। ধীরভাবে কর্ত্তব্যপালন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বটে, তবে কর্ত্তব্য কি, এই জটিল সমস্যা লইয়া ধর্ম্ম ও নীতির যত বিভ্রাট। ভগবান বলিয়াছেন, গহনা কর্ম্মণো গতিঃ, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, কি বিকর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে জ্ঞানীও বিব্রত হইয়া পড়েন, আমি কিন্তু তোমাকে এমন জ্ঞান দিব যে তোমার গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণে বেগ পাইতে হইবে না, কর্ম্মজীবনের লক্ষ্য ও সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় নিয়ম এককথায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এই জ্ঞানটা কি, এই লাখ কথার এককথা কোথায় পাইব? আমাদের বিশ্বাস গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান যেখানে তাঁহার সর্ব্বগুহ্যতম পরম বক্তব্য অর্জ্জুনের নিকট

বলিতে প্রতিশ্রুত হন, সেইখানেই এই দুর্লভ অমূল্য বস্তু অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়। সেই সর্ব্বগুহ্যতম পরম কথা কি?

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এই দুটী শ্লোকের অর্থ এক কথায়ই ব্যক্ত হয়, আত্মসমর্পণ। যিনি যত পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে তত পরিমাণে ভগবদ্দত্ত শক্তি আসিয়া পরম মঙ্গলময়ের প্রসাদে পাপমুক্ত ও দেবভাবপ্রাপ্ত করে। সেই আত্মসমর্পণের বর্ণনা প্রথম শ্লোকার্দ্ধে করা হইয়াছে। তন্মনা তদ্ভক্ত তদ্যাজী হইতে হয়। তন্মনা অর্থাৎ সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দর্শন করা, সর্ব্বকালে তাঁহাকে স্মরণ করা, সর্ব্বকার্য্যে ও সর্ব্বঘটনায় তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের খেলা বুঝিয়া পরমানন্দে থাকা। তদ্ভক্ত অর্থাৎ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত থাকা। তদ্যাজী অর্থাৎ ক্ষুদ্র মহৎ সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা এবং স্বার্থ ও কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তদর্থে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু অল্পমাত্র চেষ্টা করিলে স্বয়ং ভগবান অভয়দানে গুরু, রক্ষক ও সুহৃদ্ হইয়া যোগপথে অগ্রসর করাইয়া দেন। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। তিনি বলিয়াছেন এই ধর্ম্ম আচরণ করা সহজ ও সুখপ্রদ। বাস্তবিকই তাহাই, অথচ সম্পূর্ণ আচরণের ফল অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, শুদ্ধি ও শক্তিলাভ। মামেবৈষ্যসি অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে, আমার সহিত বাস করিবে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। এই কথায় সাদৃশ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য ফলপ্রাপ্তি ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি গুণাতীত তিনিই ভগবানের সাদৃশ্যপ্রাপ্ত। তাঁহার কোনও আসক্তি নাই, অথচ তিনি কর্ম্ম করেন, পাপমুক্ত হইয়া মহাশক্তির আধার হন ও সেই শক্তির সর্ব্বকার্য্যে আনন্দিত হন। সালোক্যও কেবল দেহপতনান্তর ব্রহ্মলোকগতি নয়, এই শরীরেও সালোক্য হয়। দেহযুক্ত জীব যখন তাঁহার অন্তরে পরমেশ্বরের সহিত ক্রীড়া করেন, মন তাঁহার দত্ত জ্ঞানে পুলকিত হয়, হৃদয় তাঁহার প্রেমস্পর্শে আনন্দপ্লুত হয়, বুদ্ধি মুহুর্মুহুঃ তাঁহার বাণী শ্রবণ করে ও প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহারই প্রেরণা

জ্ঞাত হয়, ইহাই মানবশরীরে ভগবানের সহিত সালোক্য। সাযুজ্যও এই শরীরে ঘটে। গীতায় তাঁহার মধ্যে নিবাস করার কথা পাওয়া যায়। যখন সর্ব্বজীবে তিনি, এই উপলব্ধি স্থায়ীভাবে থাকে, ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকেই দর্শন করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, স্পর্শ করে, জীব সর্ব্বদা তাঁহার মধ্যে অংশভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হয়, তখন এই শরীরেও সাযুজ্য হয়। এই পরম গতি সম্পূর্ণ অনুশীলনের ফল। কিন্তু এই ধর্ম্মের অল্প আচরণেও মহতী শক্তি, বিমল আনন্দ, সুখপূর্ণ শুদ্ধতা লাভ হয়। এই ধর্ম্ম বিশিষ্টগুণসম্পন্ন লোকের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পুরুষ, স্ত্রী, পাপযোনিপ্রাপ্ত জীবসকল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে। ঘোর পাপীও তাঁহার শরণ লইয়া অল্পদিনের মধ্যে বিশুদ্ধ হয়। অতএব এই ধর্ম্ম সকলের আচরণীয়। জগন্নাথের মন্দিরে জাতিবিচার নাই। অথচ ইহার পরমগতি কোনও ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পরমাবস্থার ন্যূন নয়।

সন্ন্যাস ও ত্যাগ

পূৰ্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, গীতোক্ত ধৰ্ম্ম সকলের আচরণীয়, গীতোক্ত যোগে সকলের অধিকার আছে অথচ সেই ধর্ম্মের পরমাবস্থা কোনও ধর্ম্মোক্ত পরমাবস্থাপেক্ষা ন্যূন নহে। গীতোক্ত ধৰ্ম্ম নিষ্কাম কৰ্ম্মীর ধৰ্ম্ম। আমাদের দেশে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত একটী সন্ন্যাসমুখী স্রোত দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে। রাজযোগ-প্রয়াসী ব্যক্তির মন সহজে গৃহকর্ম্মে বা গৃহবাসে সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। তাঁহার যোগাভ্যাসে ধ্যানধারণার বহুলায়াসপূর্ণ চেষ্টা আবশ্যক। অল্প মনঃ-ক্ষোভে অথবা বাহ্যস্পর্শে ধ্যানধারণার স্থিরতা বিচলিত হয় বা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গৃহে এইরূপ বাধা প্রচুর পরিমাণে বৰ্ত্তমান। অতএব যাঁহারা পূৰ্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে তরুণ বয়সে সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। যখন এইরূপ জন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সুদের সংখ্যা অধিক হইয়া দেশময় সেই শক্তিসংক্রমণে যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসমুখী স্রোত প্রবল হয়, তখন দেশের কল্যাণপথের দ্বারও উন্মুক্ত হয়, সেই কল্যাণসংশ্লিষ্ট বিপদের আশঙ্কাও হয়। বলা হইয়াছে, সন্ন্যাসধৰ্ম্ম উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম, কিন্তু সেই ধৰ্ম্ম গ্রহণে অল্প লোকই অধিকারী। যাঁহারা বিনা অধিকারে সেই পথে প্রবেশ করেন, তাঁহারা শেষে অল্পদূর অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথে তামসিক অপ্রবৃত্তিজনক আনন্দের অধীন হইয়া নিবৃত্ত হন। এই অবস্থায় ইহজীবন সুখে কাটে বটে, কিন্তু জগতের হিতও সাধিত হয় না, যোগের ঊর্দ্ধতম সোপানে আরোহণও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আমাদের যেরূপ কাল ও অবস্থা আগত, তাহাতে রজঃ ও সত্ত্ব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও জ্ঞান জাগাইয়া তমোবৰ্জ্জনপূৰ্ব্বক দেশের সেবায় ও জগতের সেবায় জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক বল পুনরুজ্জীবিত করা এখন প্রধান কৰ্ত্তব্য। এই জীর্ণ শীর্ণ তমঃপীড়িত স্বার্থসীমাবদ্ধ জাতির ঔরসে জ্ঞানী শক্তিমান ও উদার আর্য্যজাতির পুনঃসৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থই বঙ্গদেশে এত শক্তিবিশিষ্ট যোগবলপ্রাপ্ত জীবের জন্ম হইতেছে। ইঁহারা যদি সন্ন্যাসের মোহিনী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বধৰ্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরদত্ত কৰ্ম্ম প্রত্যাখ্যান করেন, তবে ধৰ্ম্মনাশে জাতির ধ্বংস হইবে। তরুণসম্প্রদায় যেন মনে করেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট; এই আশ্রমের পরবর্ত্তী অবস্থা গৃহস্থা-শ্রম বিহিত আছে। যখন কুলরক্ষা ও ভাবী আর্য্যজাতি গঠন দ্বারা পূৰ্ব্বপুরুষদের নিকট ঋণমুক্ত হইতে পারিব, যখন সৎকৰ্ম্ম ও ধনসঞ্চয় দ্বারা সমাজের ঋণ

এবং জ্ঞান দয়া প্রেম ও শক্তি বিতরণে জগতের ঋণ শোধ হইবে, যখন ভারতজননীর হিতার্থ উদার ও মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে জগন্মাতা সন্তুষ্ট হইবেন, তখন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আচরণ করা দোষাবহ হইবে না। অন্যথা ধর্ম্মসঙ্কর ও অধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বজন্মে ঋণমুক্ত বালসন্ন্যাসীদের কথা বলিতেছি না; কিন্তু অনধিকারীর সন্ন্যাসগ্রহণ নিন্দনীয়। অযথা বৈরাগ্যবাহুল্যে ও ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মত্যাগপ্রবণতায় মহান্ ও উদার বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের অনেক হিত সম্পাদন করিয়াও অনিষ্টও করিয়াছে এবং শেষে ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। নবযুগের নবীন ধর্ম্মের মধ্যে যেন এই দোষ প্রবিষ্ট না হয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনকে সন্ন্যাস আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন? তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মের গুণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বৈরাগ্য ও কৃপাপরবশ পার্থ বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মপথের আদেশ প্রত্যাহার করেন নাই। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কর্ম্ম হইতে কামনারহিত যোগযুক্ত বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তুমি কেন গুরুজনহত্যারূপ অতি ভীষণ কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ? অনেকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন পুনরুত্থাপন করিয়াছেন, এক-একজন শ্রীকৃষ্ণকে নিকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেষ্টা ও কুপথপ্রবর্ত্তক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন যে, সন্ন্যাস হইতে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, স্বেচ্ছাচার হইতে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মসেবাই শ্রেষ্ঠ। ত্যাগের অর্থ কামনাত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সেই ত্যাগ শিক্ষার জন্য পর্ব্বতে বা নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় লইতে হয় না, কর্ম্মক্ষেত্রেই কর্ম্ম দ্বারা সেই শিক্ষা হয়, কর্ম্মই যোগপথে আরোহণের উপায়। এই বিচিত্র লীলাময় জগৎ জীবের আনন্দ উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট। ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে যে, এই আনন্দময় ক্রীড়া সাঙ্গ হউক। তিনি জীবকে তাঁহার সখা ও খেলার সাথী করিয়া জগতের আনন্দের স্রোত চালাইতে চান। আমরা যে অজ্ঞান অন্ধকারে আছি, ক্রীড়ার সুবিধার জন্য তিনি দূরে রহিয়াছেন বলিয়াই সে অন্ধকার ঘিরিয়া থাকে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট এমন অনেক উপায় আছে যে, সেগুলি অবলম্বন করিলে অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা তাঁহার ক্রীড়ায় বিরক্ত বা বিশ্রামপ্রার্থী হন, তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহারই জন্য সেই উপায় অবলম্বন করেন, ভগবান তাঁহাদিগকেই ইহলোকে বা পরলোকে খেলার উপযুক্ত সাথী করেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা ও ক্রীড়ার সহচর বলিয়া গীতার গূঢ়তম শিক্ষা লাভ করিলেন। সেই গূঢ়তম শিক্ষা কি, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন,

কর্ম্মসন্ন্যাস জগতের পক্ষে অনিষ্টকর এবং ত্যাগহীন সন্ন্যাস বিড়ম্বনা মাত্র। সন্ন্যাসে যে ফললাভ হয়, ত্যাগেও সেই ফললাভ হয়, অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে মুক্তি, সমতা, শক্তিলাভ, আনন্দলাভ, শ্রীকৃষ্ণলাভ। সর্ব্বজনপূজিত ব্যক্তি যাহা করেন, লোকে তাহাই আদর্শ করিয়া আচরণ করে, অতএব তুমি যদি কর্ম্মসন্ন্যাস কর, সকলে সেই পথের পথিক হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর ও অধর্ম্মপ্রাধান্য সৃষ্টি করিবে। তুমি কর্ম্মফলস্পৃহা ত্যাগ করিয়া মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম আচরণ কর, আদর্শস্বরূপ হইয়া সকলকে নিজ নিজ কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দাও, তাহা হইলেই আমার সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত ও প্রিয়তম সুহৃদ হইবে। তাহার পরে তিনি বুঝাইয়াছেন যে, কর্ম্মদ্বারা শ্রেয়ঃপথে আরূঢ় হইয়া সেই পথে শেষ অবস্থায় শম অর্থাৎ সর্ব্ব-আরম্ভ-ত্যাগই বিহিত। ইহাও কর্ম্মসন্ন্যাস নহে, অহঙ্কার বর্জ্জনপূর্ব্বক বহুলায়াসপূর্ণ রাজসিক চেষ্টাত্যাগে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া, গুণাতীত হইয়া তাঁহার শক্তিচালিত যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম করা। সেই অবস্থায় জীবের এই স্থায়ী জ্ঞান হয় যে, আমি কর্ত্তা নহি, আমি দ্রষ্টা, আমি ভগবানের অংশ, আমার স্বভাবরচিত এই দেহরূপ কর্ম্মময় আধারে ভগবানের শক্তিই লীলার কার্য্য করে। জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, প্রকৃতি কর্ত্তা, পরমেশ্বর অনুমন্তা। এই জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষ শক্তির কোনও কার্য্যারম্ভে কামনা-রূপ সাহায্য বা বাধা দিতে ইচ্ছুক হন না। শক্তির অধীন হইয়া দেহ-মন-বুদ্ধি ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডও যদি ভগবানের অনুমত হয় এবং স্বধর্ম্মপথে যদি তাহাই ঘটে, তাহাতেও অলিপ্তবুদ্ধি কামনারহিত জ্ঞানপ্রাপ্ত জীবের পাপস্পর্শ হয় না। কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকের লভ্য জ্ঞান ও আদর্শ, ইহা সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে এই পথের সাধারণ পথিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? তাঁহারও এই জ্ঞান কতক পরিমাণে প্রাপ্য যে, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। সেই জ্ঞানের বলে ভগবানকে স্মরণ করিয়া স্বধর্ম্মসেবাই তাঁহার পক্ষে আদিষ্ট।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

স্বধর্ম্ম স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। কালের গতিতে স্বভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়। কালের গতিতে মানুষের যে সাধারণ স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম যুগধর্ম্ম। জাতির কর্ম্মগতিতে যে জাতীয় স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম জাতির ধর্ম্ম। ব্যক্তির কর্ম্মগতিতে যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত

কর্ম্ম ব্যক্তির ধর্ম্ম। এই নানা ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মের সাধারণ আদর্শ দ্বারা পরস্পর-সংযুক্ত ও শৃঙ্খলিত হয়। সাধারণ ধার্ম্মিকের পক্ষে এই ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। ব্রহ্মচারী অবস্থায় এই ধর্ম্মসেবার জন্য জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চিত হয়, গৃহস্থাশ্রমে এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে বানপ্রস্থে বা সন্ন্যাসে অধিকারপ্রাপ্তি হয়। ইহাই ধর্ম্মের সনাতন গতি।

বিশ্বরূপ দর্শন

গীতায় বিশ্বরূপ

"বন্দেমাতরম্" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল কথা প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনা মাত্র। আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। বিশ্বরূপদর্শন গীতার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অর্জ্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি দ্বারা নিরসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অদৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। সেইজন্য অর্জ্জুন অন্তর্য্যামীর অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল, বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, তাহা সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ; সেই রূপদর্শনের পরে যে জ্ঞান কথিত হয়, সে জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা। এই বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনাকে যদি কবির উপমা বলি, গীতার গাম্ভীর্য্য, সততা ও গভীরতা নষ্ট হয়, যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটী দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয়। বিশ্বরূপদর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে, — কেননা বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত, বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের সত্য, কারণজগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত অর্জ্জুন কারণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।

সাকার ও নিরাকার

যাঁহারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা গুণ ও আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন; যাঁহারা সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নির্গুণত্ব অস্বীকার করেন এবং আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন। সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসক এই

দুইজনেরই উপর খড়্গহস্ত। আমরা এই তিন মতকেই সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান-সম্ভূত বলি। কেননা যাঁহারা সাকার ও নিরাকার, দ্বিবিধ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে এককে সত্য, অপরকে অসত্য কল্পনা বলিয়া জ্ঞানের অন্তিম প্রমাণ নষ্ট করিবেন এবং অসীম ব্রহ্মকে সীমার অধীন করিবেন? যদি ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথা সত্য; কিন্তু যদি ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথাও সত্য। ভগবান রূপের কর্ত্তা, স্রষ্টা, অধীশ্বর, তিনি কোন রূপে আবদ্ধ নহেন; কিন্তু যেমন সাকারত্ব দ্বারা আবদ্ধ নহেন, সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, স্থূলপ্রকৃতির নিয়ম বা দেশকালের নিয়মরূপ জালে তাঁহাকে ধরিবার ভান করিয়া আমরা যদি বলি, তুমি যখন অনন্ত, আমি তোমাকে সান্ত হইতে দিব না, চেষ্টা কর দেখি, তুমি পারিবে না, তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালে ফার্ডিনান্দ — এ কি হাস্যকর কথা, একি ঘোর অহঙ্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরহিত, নিরাকার ও সাকার, সাধককে সাকার হইয়া দর্শন দেন, — সেই আকারে পূর্ণ ভগবান রহিয়াছেন অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। কেননা ভগবান দেশকালাতীত, অতর্কগম্য, দেশ ও কাল তাঁহার খেলার সামগ্রী, দেশ ও কালরূপ জাল ফেলিয়া সর্ব্বভূতকে ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে সেই জালে ধরিতে পারিব না। যতবার তর্ক ও দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অসাধ্য সাধন করিতে যাই, ততবার রঙ্গময় সেই জালকে সরাইয়া আমাদের অগ্রে, পিছনে, পার্শ্বে, দূরে, চারিদিকে মৃদু মৃদু হাসিয়া বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত করেন। যে বলে আমি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, সে কিছুই জানে না; যে বলে, আমি জানি অথচ জানি না, সেই প্রকৃত জ্ঞানী।

বিশ্বরূপ

যিনি শক্তির উপাসক, কর্ম্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে আদিষ্ট, তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপদর্শন অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বেও তিনি আদেশলাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রুজু হইয়াছে, পাশ হয় নাই। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মশিক্ষার

ও তৈয়ারী হইবার সময়। বিশ্বরূপদর্শনে কর্ম্মের আরম্ভ। বিশ্বরূপদর্শন অনেক প্রকার হইতে পারে — যেমন সাধনা, যেমন সাধকের স্বভাব। কালীর বিশ্বরূপদর্শনে সাধক জগৎময় অপরূপ নারীরূপ দেখেন, এক অথচ অগণন দেহযুক্ত, সর্ব্বত্র সেই নিবিড়-তিমির-প্রসারক ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বত্র সেই রক্তাক্ত খড়্গের আভা নয়ন ঝলসিয়া নৃত্য করিতেছে, জগৎময় সেই ভীষণ অট্টহাসির স্রোত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে। এই সকল কথা কবির কল্পনা নহে, অতিপ্রাকৃত উপলব্ধিকে অসম্পূর্ণ মানবভাষায় বর্ণনা করিবার বিফল চেষ্টা নহে। ইহা কালীর আত্মপ্রকাশ, ইহা আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ, — যাহা দিব্যচক্ষুতে দেখা হইয়াছে, তাহার অনতিরঞ্জিত সরল সত্য বর্ণনা। অর্জ্জুন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন নাই, দেখিয়াছিলেন কালরূপী শ্রীকৃষ্ণের সংহারক বিশ্বরূপ। একই কথা। দিব্যচক্ষুতে দেখিলেন, বাহ্যজ্ঞানহীন সমাধিতে নহে — যাহা দেখিলেন, ব্যাসদেব তাহার অবিকল অনতিরঞ্জিত বর্ণনা করিলেন। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে, সত্য, জাগ্রত সত্য।

কারণজগতের রূপ

ভগবদ্-অধিষ্ঠিত তিন অবস্থার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, — প্রাজ্ঞ-অধিষ্ঠিত সুষুপ্তি, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ-অধিষ্ঠিত স্বপ্ন, বিরাট-অধিষ্ঠিত জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগৎ। সুষুপ্তিতে কারণজগৎ, স্বপ্নে সূক্ষ্মজগৎ, জাগ্রতে স্থূল-জগৎ। কারণে যাহা নির্ণীত ও আমাদের দেশকালের অতীত, সূক্ষ্মে তাহা প্রতি-ভাসিত, স্থূলে আংশিকভাবে স্থূলজগতের নিয়ম অনুসারে অভিনীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পূর্ব্বেই বধ করিয়াছি, অথচ স্থূলজগতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান, জীবিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভগবানের এই কথা অসত্য নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, নচেৎ ইহলোকে তাঁহাদের বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত জীবন কারণে, স্থূলে তাহার ছায়া মাত্র পড়ে। কিন্তু কারণজগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম স্বতন্ত্র। বিশ্বরূপ কারণের রূপ, স্থূলে দিব্যচক্ষুতে প্রকাশিত হয়।

দিব্যচক্ষু

দিব্যচক্ষু কি? কল্পনার চক্ষু নহে, কবির উপমা নহে। যোগলব্ধ দৃষ্টির তিন প্রকার আছে — সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিজ্ঞানচক্ষু ও দিব্যচক্ষু। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় মানসিক মূর্ত্তি দেখি, বিজ্ঞানচক্ষুতে আমরা সমাধিস্থ হইয়া সূক্ষ্মজগৎ ও কারণজগতের অন্তর্গত নামরূপের প্রতিমূর্ত্তি ও সাঙ্কেতিক রূপ চিত্তাকাশে দেখি, দিব্যচক্ষুতে কারণজগতের নামরূপ উপলব্ধি করি, — সমাধিতেও উপলব্ধি করি, স্থূলচক্ষুর সম্মুখেও দেখিতে পাই। যাহা স্থূলেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা যদি ইন্দ্রিয়গোচর হয় ইহাকে দিব্যচক্ষুর প্রভাব বুঝিতে হয়। অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু প্রভাবে জাগ্রদবস্থায় ভগবানের কারণান্তর্গত বিশ্বরূপ দেখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই বিশ্বরূপদর্শন স্থূলজগতের ইন্দ্রিয়গোচর সত্য না হউক, স্থূল সত্য অপেক্ষা সত্য, — কল্পনা, অসত্য বা উপমা নহে।

গীতার ভূমিকা

প্রস্তাবনা

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গুহ্যতম, গীতায় যে ধর্ম্মনীতি প্রচারিত, সকল ধর্ম্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কর্ম্মপন্থা প্রদর্শিত, সেই কর্ম্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ।

গীতা অযুতরত্নপ্রসূ অতল সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল সেই সমুদ্রের নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে করিতেও গভীরতার অনুমান করা যায় না, তল পাওয়া যায় না। শত বৎসর খুঁজিতে খুঁজিতে সেই অনন্ত রত্নভাণ্ডারের সহস্রাংশ ধনও আহরণ করা দুষ্কর। অথচ দু-একটী রত্ন উদ্ধার করিতে পারিলে দরিদ্র ধনী হন, গভীর চিন্তাশীল জ্ঞানী, ভগবদ্‌বিদ্বেষী প্রেমিক, মহাপরাক্রমী শক্তিমান কর্ম্মবীর তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ও সন্নদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন।

গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সর্ব্বদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিস্মিত হইবেন।

এইরূপ গভীর ও গুপ্তজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক অথচ ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, রচনা সরল, বাহ্যিক অর্থ সহজবোধগম্য। গীতাসমুদ্রের অনুচ্চ তরঙ্গের উপরে উপরে বেড়াইলেও, ডুব না দিলেও, কতক শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। গীতারূপ আকরের রত্নোদ্দীপিত অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ না করিয়া চারিপার্শ্বে বেড়াইলেও তৃণের মধ্যে পতিত উজ্জ্বল মণি পাওয়া যায়, ইহজীবনের তরে তাহাই লইয়া ধনী সাজিতে পারিব।

গীতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনও আসিবে না যখন নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। এমন জগৎশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত বা গভীর জ্ঞানী গীতার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যে তাঁহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হইলে বলিতে পারি, হইয়াছে, ইহার পরে আর গীতার ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত অর্থ বোঝা গেল। সমস্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া এই জ্ঞানের কয়েকদিক মাত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব, বহুকাল যোগমগ্ন হইয়া বা নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরূঢ়

হইয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিব যে গীতোক্ত কয়েকটী গভীর সত্য উপলব্ধি করিলাম বা গীতার দু-একটী শিক্ষা ইহজীবনে কার্য্যে পরিণত করিলাম। লেখক যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, যেটুকু কর্ম্মপথে অভ্যাস করিয়াছেন, বিচার ও বিতর্ক দ্বারা তদনুযায়ী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অপরের সাহায্যার্থ বিবৃত করা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য।

বক্তা

গীতার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে বক্তা, পাত্র ও তখনকার অবস্থার কথা বিচার করা প্রয়োজন। বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পাত্র তাঁহার সখা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, অবস্থা কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

অনেকে বলেন, মহাভারত রূপক মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অর্জ্জুন জীব, ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ রিপুসকল, পাণ্ডবসেনা মুক্তির অনুকূল বৃত্তি। ইহাতে যেমন মহাভারতকে কাব্যজগতে হীন স্থান দেওয়া হয়, তেমনই গীতার গভীরতা, কর্ম্মীর জীবনে উপযোগিতা ও উচ্চ মানবজাতির উন্নতিকারক শিক্ষা খর্ব্ব ও নষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কেবল গীতাচিত্রের ফ্রেম নয়, গীতোক্ত শিক্ষার মূল কারণ এবং গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কাল্পনিক অর্থ যদি স্বীকার করা যায়, গীতার ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম, সংসারে আচরণীয় ধর্ম্ম না হইয়া সংসারের অনুপযোগী শান্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মে পরিণত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। শাস্ত্রে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভগবান বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারবাদ এবং দশম অধ্যায়ে বিভূতিবাদ অবলম্বন করিয়া ভগবান সর্ব্বভূতের দেহে প্রচ্ছন্নভাবে অধিষ্ঠিত, বিশেষ বিশেষ ভূতে শক্তিবিকাশে কতক পরিমাণে ব্যক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণদেহে পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ, ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র রূপকমাত্র, সেই রূপক বর্জ্জন করিয়া গীতার আসল শিক্ষা উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু সেই শিক্ষার এই অংশ বাদ দিতে পারি না। অবতারবাদ যদি থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিব কেন? অতএব স্বয়ং ভগবান এই জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারক।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানবদেহে মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদনুসারে লীলা করিয়া গিয়াছেন। সেই লীলার প্রকাশ্য ও গূঢ় শিক্ষা যদি আয়ত্ত করিতে পারি, এই জগদ্ব্যাপী লীলার অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রণালী

আয়ত্ত করিতে পারিব। এই মহতী লীলার প্রধান অঙ্গ পূর্ণজ্ঞানপ্রবর্ত্তিত কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের মধ্যে ও সেই লীলার মূলে কি জ্ঞান নিহিত ছিল, গীতায় তাহা প্রকাশিত হইল।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার জীবনে মহাশক্তির অতুলনীয় বিকাশ ও রহস্যময় ক্রীড়া দেখি। সেই রহস্যের ব্যাখ্যা গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎপ্রভু, বিশ্বব্যাপী বাসুদেব, অথচ স্বীয় মহিমা প্রচ্ছন্ন করিয়া পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতি, সখা, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি সম্বন্ধ মানবদিগের সঙ্গে স্থাপন করিয়া লীলা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আর্য্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রহস্য এবং ভক্তিমার্গের উত্তম শিক্ষা নিহিত আছে। ইহার তত্ত্বগুলিও গীতোক্ত শিক্ষার অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কল্পে কল্পে সেই সন্ধিস্থলে ভগবান পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ হন। কলিযুগ চতুর্যুগের মধ্যে যেমন নিকৃষ্ট তেমনই শ্রেষ্ঠ যুগ। সেই যুগ মানবোন্নতির প্রধান শত্রু পাপপ্রবর্ত্তক কলির রাজ্যকাল; মানবের অত্যন্ত অবনতি ও অধোগতি কলির রাজ্যকালে হয়। কিন্তু বাধার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শক্তিবৃদ্ধি হয়, পুরাতনের ধ্বংসে নূতনের সৃষ্টি হয়, কলিযুগেও সেই নিয়ম দেখা যায়। জগতের ক্রমবিকাশে অশুভের যেই অংশ বিনাশ হইতে যাইতেছে, তাহাই কলিযুগে অতিবিকাশে নষ্ট হয়, এই দিকে নূতনের বীজ বপিত ও অঙ্কুরিত হয়, সেই বীজই সত্যযুগে বৃক্ষে পরিণত হয়। উপরন্তু যেমন জ্যোতিষবিদ্যায় একটী গ্রহের দশায় সকল গ্রহের অন্তর্দ্দশা ভোগ হয়, তেমনই কলির দশায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নিজ নিজ অন্তর্দ্দশা বারবার ভোগ করে। এইরূপ চক্রগতিতে কলিযুগে ঘোর অবনতি, আবার উন্নতি, আবার ঘোরতর অবনতি, আবার উন্নতি হইয়া ভগবানের অভিসন্ধি সাধিত হয়। দ্বাপর কলির সন্ধিস্থলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অশুভের অতিবিকাশ, অশুভের নাশ, শুভের বীজবপন ও অঙ্কুরপ্রকাশের অনুকূল অবস্থা করিয়া যান, তাহার পরে কলির আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই গীতার মধ্যে সত্যযুগানয়নের উপযোগী গুহ্য জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রণালী রাখিয়া গিয়াছেন। কলির সত্য অন্তর্দ্দশার আগমনকালে গীতাধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যম্ভাবী। সেই সময় উপস্থিত বলিয়া গীতার আদর কয়েকজন জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বসাধারণে এবং ম্লেচ্ছদেশেও প্রসারিত হইতেছে।

অতএব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার গীতারূপ বাক্য স্বতন্ত্র করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তি।

পাত্র

গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহাবীর ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন। যেমন বক্তাকে বাদ দিলে গীতার উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় অর্থ উদ্ধার করা কঠিন, তেমনই পাত্রকে বাদ দিলে সেই অর্থের হানি হয়।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-সখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, এক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা মানবদেহধারী পুরুষোত্তমের সহিত স্ব স্ব অধিকার ও পূর্ব্বকর্ম্মভেদানুসারে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সাত্যকি তাঁহার অনুগত সহচর ও অনুচর, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মন্ত্রণাচালিত আত্মীয় ও বন্ধু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের ন্যায় কেহই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সমবয়স্ক পুরুষে পুরুষে যত মধুর ও নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণে অর্জ্জুনে সেই সকল মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভাই, তাঁহার প্রিয়তম সখা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম ভগিনী সুভদ্রার স্বামী। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান এই ঘনিষ্ঠতা অর্জ্জুনকে গীতার পরম রহস্য শ্রবণের পাত্ররূপে বরণ করিবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

"এই পুরাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ আমার ভক্ত ও সখা বলিয়া তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। কারণ, এই যোগ জগতের শ্রেষ্ঠ ও পরম রহস্য।" অষ্টাদশ অধ্যায়েও গীতার কেন্দ্রস্বরূপ কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র ব্যক্ত করিবার সময় এই কথার পুনরুক্তি হইয়াছে।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

"আবার আমার পরম ও সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার অতীব প্রিয়, সেই হেতু তোমার নিকট এই শ্রেয়ঃ পথের কথা প্রকাশ করিব।" এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য শ্রুতির অনুকূল, যেমন কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে,

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

"এই পরমাত্মা দার্শনিকের ব্যাখ্যা দ্বারাও লভ্য নহে, মেধাশক্তি দ্বারাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। ভগবান যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহারই লভ্য; তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় শরীর প্রকাশ করেন।" অতএব যিনি ভগবানের সহিত সখ্য ইত্যাদি মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ, তিনিই গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র।

ইহার মধ্যে আর এক অতি প্রয়োজনীয় কথা নিহিত। ভগবান অর্জ্জুনকে এক শরীরে ভক্ত ও সখা বলিয়া বরণ করিলেন। ভক্ত নানাবিধ; সাধারণতঃ কাহাকেও ভক্ত বলিলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধের কথা মনে উঠে। সেই ভক্তির মূলে প্রেম আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বাধ্যতা, সম্মান ও অন্ধভক্তি তাহার বিশেষ লক্ষণ। সখা কিন্তু সখাকে সম্মান করেন না; তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক আমোদ ও স্নেহ-সম্ভাষণ করেন; ক্রীড়ার্থ তাঁহাকে উপহাস ও তাচ্ছিল্যও করেন, গালি দেন, তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য করেন। সখা সর্ব্বকালে সখার বাধ্য হয়েন না, তাঁহার জ্ঞানগরিমা ও অকপট হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইয়া যদিও তাঁহার উপদেশানুসারে চলেন, সে অন্ধভাবে নহে; তাঁহার সহিত তর্ক করেন, সন্দেহ সকল জ্ঞাপন করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মতের প্রতিবাদও করেন। ভয়বিসর্জ্জন সখ্য সম্বন্ধের প্রথম শিক্ষা; সম্মানের বাহ্য আড়ম্বর বিসর্জ্জন তাহার দ্বিতীয় শিক্ষা; প্রেম তাহার প্রথম কথা ও শেষ কথা। যিনি এই জগৎসংসারকে মাধুর্য্যময়, রহস্যময়, প্রেমময়, আনন্দময় ক্রীড়া বুঝিয়া ভগবানকে ক্রীড়ার সহচররূপে বরণ করিয়া সখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র। যিনি ভগবানের মহিমা, প্রভুত্ব, জ্ঞানগরিমা, ভীষণত্বও হৃদয়ঙ্গম করেন, অথচ অভিভূত না হইয়া তাঁহার সহিত নির্ভয়ে ও হাসিমুখে খেলা করিয়া থাকেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র।

সখ্য সম্বন্ধের মধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে আর সকল সম্বন্ধ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ সখ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অতি মধুর হয়, এইরূপ সম্বন্ধই অর্জ্জুন গীতার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্থাপন করিলেন। "তুমি আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, তোমা ভিন্ন কাহার শরণাপন্ন হইব? আমি হতবুদ্ধি, কর্ত্তব্যভারে ভীত, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তীব্র শোকে অভিভূত। তুমি আমাকে রক্ষা কর, উপদেশ দান কর, আমার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের সমস্ত ভার তোমার উপর ন্যস্ত

করিলাম।'' এই ভাবে অর্জ্জুন মানবজাতির সখা ও সহায়ের নিকট জ্ঞানলাভার্থ আসিয়াছিলেন। আবার মাতৃসম্বন্ধ এবং বাৎসল্যভাবও সখ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, কনীয়ান ও অল্পবিদ্য সখাকে মাতৃবৎ ভালবাসেন ও রক্ষা করেন, যত্ন করেন, সর্ব্বদা কোলে রাখিয়া বিপদ ও অশুভ হইতে পরিত্রাণ করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য স্থাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট স্বীয় মাতৃরূপও প্রকাশ করেন। সখ্যের মধ্যে যেমন মাতৃপ্রেমের গভীরতা, তেমনই দাম্পত্যপ্রেমের তীব্রতা ও উৎকট আনন্দও আসিতে পারে। সখা সখার সান্নিধ্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন, তাঁহার বিরহে কাতর হয়েন; তাঁহার দেহস্পর্শে পুলকিত হয়েন, তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে আনন্দভোগ করেন। দাস্য সম্বন্ধও সখ্যের ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত হইলে অতি মধুর হয়। বলা হইয়াছে, যিনি যত মধুর সম্বন্ধ পুরুষোত্তমের সহিত স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহার সখ্যভাব তত প্রস্ফুটিত হয় এবং তত গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্রত্ব লাভ হয়।

কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন মহাভারতের প্রধান কর্ম্মী, গীতায় কর্ম্মযোগশিক্ষা প্রধান শিক্ষা। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এই তিন মার্গ পরস্পর বিরোধী নহে, কর্ম্মমার্গে জ্ঞান-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মে ভক্তিলব্ধ শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে তাঁহারই সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারই আদিষ্ট কর্ম্ম করা গীতোক্ত শিক্ষা। যাঁহারা সংসারের দুঃখে ভীত, বৈরাগ্যপীড়িত, ভগবানের লীলায় জাতবিতৃষ্ণ, লীলা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ক্রোড়ে লুক্কাইয়া থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের মার্গ স্বতন্ত্র। বীরশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের সেইরূপ কোনও ইচ্ছা বা ভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কোন শান্ত সন্ন্যাসী বা দার্শনিক জ্ঞানীর নিকট এই উত্তম রহস্য প্রকাশ করেন নাই, কোন অহিংসা-পরায়ণ ব্রাহ্মণকে এই শিক্ষার পাত্র বলিয়া বরণ করেন নাই, মহাপরাক্রমী তেজস্বী ক্ষত্রিয় যোদ্ধা এই অতুলনীয় জ্ঞানলাভের উপযুক্ত আধার বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিলেন। যিনি সংসারযুদ্ধে জয় বা পরাজয়ে অবিচলিত, তিনিই এই শিক্ষার গূঢ়তম স্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। যিনি মুমুক্ষুত্ব অপেক্ষা ভগবান-লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তিনিই ভগবৎ-সান্নিধ্যের আস্বাদ পাইয়া আপনাকে নিত্যমুক্ত-স্বভাববান বলিয়া উপলব্ধি করিতে এবং মুমুক্ষুত্ব অজ্ঞানের শেষ আশ্রয় বুঝিয়া বর্জ্জন করিতে সক্ষম। যিনি তামসিক ও রাজসিক অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া সাত্ত্বিক অহঙ্কারে বদ্ধ থাকিতে চাহেন না, তিনিই গুণাতীত হইতে সক্ষম। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে রাজসিক বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন, অথচ সাত্ত্বিক আদর্শ গ্রহণে রজঃশক্তিকে সত্ত্বমুখী করিয়াছেন। সেইরূপ পাত্র

গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম আধার।

অর্জ্জুন সমসাময়িক মহাপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ, সেই যুগের সর্ব্ববিধ সাংসারিক জ্ঞানে পিতামহ ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানতৃষ্ণায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর শ্রেষ্ঠ, সাধুতায় ও সাত্ত্বিক গুণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে উদ্ধব ও অক্রূর শ্রেষ্ঠ, স্বভাবগত শৌর্য্যে ও পরাক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারথী কর্ণ শ্রেষ্ঠ। অথচ অর্জ্জুনকেই জগৎপ্রভু বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে অচলা জয়শ্রী এবং গাণ্ডীব প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র সমর্পণ করিয়া তাঁহার দ্বারা ভারতের সহস্র সহস্র জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধাকে নিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অসপত্ন সাম্রাজ্য অর্জ্জুনের পরাক্রমলব্ধ দানরূপে সংস্থাপন করিলেন; উপরন্তু তাঁহাকেই গীতোক্ত পরম জ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্ণীত করিলেন। অর্জ্জুনই মহাভারতের নায়ক ও প্রধান কর্ম্মী, সেই কাব্যের প্রত্যেক অংশ তাঁহারই যশোকীর্ত্তি ঘোষণা করে। ইহা পুরুষোত্তম বা মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেবের অন্যায় পক্ষপাত নহে। এই উৎকর্ষ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের ফল। যিনি পুরুষোত্তমের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নির্ভরপূর্ব্বক কোনও দাবী না করিয়া স্বীয় শুভ ও অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, পাপ ও পুণ্যের সমস্ত ভার তাঁহাকে সমর্পণ করেন, নিজ প্রিয়কর্ম্মে আসক্ত না হইয়া তদাদিষ্ট কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়েন, নিজ প্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া তৎপ্রেরিত বৃত্তি গ্রহণ করেন, নিজ প্রশংসিত গুণ সাগ্রহে আলিঙ্গন না করিয়া তদ্দত্ত গুণ ও প্রেরণা তাঁহারই কার্য্যে প্রযুক্ত করেন; সেই শ্রদ্ধাবান অহঙ্কাররহিত কর্ম্মযোগী পুরুষোত্তমের প্রিয়তম সখা ও শক্তির উত্তম আধার, তাঁহা দ্বারা জগতের বিরাট কার্য্য নির্দ্দোষরূপে সম্পন্ন হয়। ইসলাম-প্রণেতা মুহম্মদ এইরূপ যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অর্জ্জুনও সেইরূপ আত্মসমর্পণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; সেই চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা ও ভালবাসার কারণ। যিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দৃঢ়চেষ্টা করেন, তিনিই গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরু ও সখা হইয়া তাঁহার ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

অবস্থা

মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য ও উক্তির উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে কি অবস্থায় সেই কার্য্য বা সেই উক্তি কৃত বা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা জানা

আবশ্যক। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালে যখন শস্ত্রপ্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে — প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে — সেই সময়ে ভগবান গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে বিস্মিত ও বিরক্ত হন, বলেন ইহা নিশ্চয় কবির অসাবধানতা বা বুদ্ধির দোষ। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে সেই স্থানে সেইরূপ ভাবাপন্ন পাত্রকে দেশকালপাত্র বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন।

সময় যুদ্ধের প্রারম্ভকাল। যাঁহারা প্রবল কর্ম্মস্রোতে নিজ বীরত্ব ও শক্তি বিকাশ ও পরীক্ষা করেন নাই, তাঁহারা কখনও গীতোক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। উপরন্তু যাঁহারা কোন কঠিন মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, যে মহাব্রতে অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক শত্রুবৃদ্ধি, অনেক পরাজয়ের আশঙ্কা স্বভাবতঃই হয়, সেই মহাব্রতের আচরণে যখন দিব্যশক্তি জন্মিয়াছে, তখন ব্রতের শেষ উদ্‌যাপনার্থে, ভগবানের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ এই জ্ঞান প্রকাশ হয়। গীতা কর্ম্মযোগকে ভগবানলাভের প্রতিষ্ঠা বিহিত করে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ কর্ম্মেতেই জ্ঞান জন্মায়, অতএব গীতোক্ত মার্গের পথিক পথত্যাগ করিয়া দূরস্থ শান্তিময় আশ্রমে পর্ব্বতে বা নির্জ্জন স্থানে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেন না, মধ্যপথেই কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ সেই স্বর্গীয় দীপ্তি জগৎ আলোকিত করে, সেই মধুর তেজোময়ী বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল, সেখানে শস্ত্রপাত হইতেছে। যাঁহারা এই পথে পথিক, এইরূপ কর্ম্মে অগ্রণী, প্রায়ই কোনও গুরুতর ফলোৎপাদক সময়ে, যখন কর্ম্মীর কর্ম্মানুসারে অদৃষ্টের গতি এদিক না ওদিক চালিত হইবে, তখনই অকস্মাৎ তাঁহাদের যোগসিদ্ধি ও পরমজ্ঞানলাভ হয়। তাঁহার জ্ঞান কর্ম্মরোধক নয়, কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাও সত্য যে ধ্যানে, নির্জ্জনে, স্বস্থ আত্মার মধ্যে জ্ঞানোন্মীলন হয়, সেইজন্য মনীষিগণ নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। কিন্তু গীতোক্ত যোগের পথিক মন-প্রাণ-দেহরূপ আধার এমনভাবে বিভক্ত করিতে পারেন যে, তিনি জনতায় নির্জ্জনতা, কোলাহলে শান্তি, ঘোর কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরম নিবৃত্তি অনুভব করেন। তিনি অন্তরকে বাহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন না, বরং বাহ্যকে অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। সাধারণ যোগী সংসারকে ভয় করেন, পলায়নপূর্ব্বক যোগাশ্রমে শরণ লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হন। সংসারই কর্ম্মযোগীর যোগাশ্রম। সাধারণ যোগী বাহ্যিক শান্তি ও নীরবতা অভিলাষ করেন, শান্তিভঙ্গে তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। কর্ম্মযোগী অন্তরে বিশাল শান্তি ও নীরবতা ভোগ করেন, বাহ্যিক কোলাহলে সেই অবস্থা আরও গভীর হয়, বাহ্যিক তপোভঙ্গে সেই স্থির আন্তরিক

তপঃ ভগ্ন হয় না, অবিচলিত থাকে। লোকে বলে, সমরোদ্যত সৈন্যের মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদ কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর, যোগপ্রভাবে সম্ভব হয়। সেই যোগবলে যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্তরে ও বাহিরে শান্তি বিরাজ করে, যুদ্ধের কোলাহল সেই দুইজনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহাতে কর্ম্মোপযোগী আর এক আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিহিত। যাঁহারা গীতোক্ত যোগ অনুশীলন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী অথচ কর্ম্মে অনাসক্ত। কর্ম্মের মধ্যেই আত্মার আন্তরিক আহ্বান শ্রবণে তাঁহারা কর্ম্মে বিরত হইয়া যোগমগ্ন ও তপস্যারত হন। তাঁহারা জানেন কর্ম্ম ভগবানের, ফল ভগবানের, আমরা যন্ত্র, অতএব কর্ম্মফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হন না। ইহাও জানেন যে, কর্ম্মযোগের সুবিধার জন্য, কর্ম্মের উন্নতির জন্য, জ্ঞানবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেই আহ্বান হয়। অতএব কর্ম্মে বিরত হইতে ভয় করেন না, জানেন যে তপস্যায় কখনও বৃথা সময়ক্ষেপ হইতে পারে না।

পাত্রের ভাব, কর্ম্মযোগীর শেষ সন্দেহের উদ্রেক। বিশ্বসমস্যা, সুখদুঃখ সমস্যা, পাপপুণ্য সমস্যায় বিব্রত হইয়া অনেকে পলায়নই শ্রেয়স্কর বলিয়া নিবৃত্তি, বৈরাগ্য ও কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় বুঝাইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছেন। যীশু, টলষ্টয় ইত্যাদি মানবজাতির সন্ততিস্থাপক বিবাহপদ্ধতি ও জগতের চিরন্তন নিয়ম যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। সন্ন্যাসী বলেন, কর্ম্মই অজ্ঞানসৃষ্ট, অজ্ঞান বর্জ্জন কর, কর্ম্ম বর্জ্জন কর, শান্ত নিষ্ক্রিয় হও। অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মে বিলীন হও। তবে এই জগৎ কেন, এই সংসার কেন? ভগবান যদি থাকেন, কেন অর্ব্বাচীন বালকের ন্যায় এই বৃথা পণ্ডশ্রম, এই নীরস উপহাস আরম্ভ করিয়াছেন? আত্মাই যদি থাকেন, জগৎ মায়াই হয়, এই আত্মাই বা কেন এই জঘন্য স্বপ্ন নিজ নির্ম্মল অস্তিত্বে অধ্যারোপ করিয়াছেন? নাস্তিক বলেন, ভগবানও নাই, আত্মাও নাই, আছে অন্ধশক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র। তাহাই বা কিরূপ কথা? শক্তি কাহার? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল, কেনই বা অন্ধ ও উন্মত্ত? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই, না খৃষ্টান, না বৌদ্ধ, না অদ্বৈতবাদী, না নাস্তিক, না বৈজ্ঞানিক; সকলেই এই বিষয়ে নিরুত্তর অথচ সমস্যা এড়াইয়া ফাঁকি দিতে সচেষ্ট। এক উপনিষদ ও তাহার অনুকূল গীতা এইরূপ ফাঁকি দিতে অনিচ্ছুক। সেইজন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতা গীত হইয়াছে। ঘোর সাংসারিক কর্ম্ম, গুরুহত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা, আত্মীয়হত্যা তাহার উদ্দেশ্য, সেই অযুত প্রাণীসংহারক

যুদ্ধের প্রারম্ভে, অর্জ্জুন হতবুদ্ধি হইয়া গাণ্ডীব হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, কাতরস্বরে বলিতেছেন —

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।

"কেন আমাকে এই ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?" উত্তরে সেই যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে বজ্রগম্ভীর স্বরে ভগবৎ-মুখনিঃসৃত মহাগীতি উঠিয়াছে। —

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্।

*

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

*

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥

*

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

*

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

*

নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

*

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

*

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

*

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

*

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা।
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥

*

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

"অতএব তুমি কর্ম্মই করিয়া থাক, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তোমাকেও সেই কর্ম্ম করিতে হইবে। ...যোগস্থ অবস্থায় আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। ...যাঁহার বুদ্ধি যোগস্থ, তিনি পাপ পুণ্য এই কর্ম্মক্ষেত্রেই অতিক্রম করেন, অতএব যোগার্থ সাধনা কর, যোগই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসাধন। ...মানুষ যদি অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন, তিনি নিশ্চয় পরম ভগবানকে লাভ করিবেন। ...জ্ঞানপূর্ণ হৃদয়ে আমার উপর তোমার সকল কর্ম্ম নিক্ষেপ কর, কামনা পরিত্যাগে, অহঙ্কার পরিত্যাগে দুঃখরহিত হইয়া যুদ্ধে লাগ। ...যিনি মুক্ত, আসক্তিরহিত, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা জ্ঞানে নিবাস করে, যিনি যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করেন, তাঁহার সকল কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া তখনই আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়। ...সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, সেই হেতু তাহারা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া মোহে পতিত হয়। ...আমাকে সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের সখা ও বন্ধু বলিয়া জানিলে পরম শান্তিলাভ হয়। ...আমিই তোমার শত্রুগণকে বধ করিয়াছি, তুমি যন্ত্র হইয়া তাহাদের সংহার কর, দুঃখিত হইও না, যুদ্ধে লাগিয়া যাও, বিপক্ষকে রণে জয় করিবে। ...যাঁহার অন্তঃকরণ অহংজ্ঞানশূন্য, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি যদি সমস্ত জগৎকে সংহার করেন, তথাপি তিনি হত্যা

করেন নাই, তাঁহার পাপরূপ কোন বন্ধন হয় না।"

প্রশ্ন এড়াইবার, ফাঁকি দিবার কোন লক্ষণ নাই। প্রশ্নটী পরিষ্কারভাবে উত্থাপন করা হইল। ভগবান কি, জগৎ কি, সংসার কি, ধৰ্ম্মপথ কি, গীতায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। অথচ সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কৰ্ম্মশিক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। ইহাতেই গীতার সাৰ্ব্বজনীন উপযোগিতা।

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুৰ্ব্বত সঞ্জয়॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, —

হে সঞ্জয়, ধৰ্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষ কি করিলেন।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচাৰ্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন, —

তখন রাজা দুর্যোধন রচিতব্যূহ পাণ্ডব-অনীকিনী দেখিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচাৰ্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥৩॥

"দেখুন, আচাৰ্য্য, আপনার মেধাবী শিষ্য দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা রচিতব্যূহ এই মহতী পাণ্ডবসেনা দেখুন।"

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমাৰ্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥৪॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥৬॥

এই বিরাট সৈন্যে ভীম ও অর্জ্জুনের সমান মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষ আছেন, — যুযুধান, বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ,

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও মহাপ্রতাপী কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরপুঙ্গব শৈব্য,

বিক্রমশালী যুধামন্যু ও প্রতাপবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সকলেই মহাযোদ্ধা।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥৭॥

আমাদের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, যাঁহারা আমার সৈন্যের নেতা, তাঁহাদের নাম আপনার স্মরণার্থ বলিতেছি, লক্ষ্য করুন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥৮॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥৯॥

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ ও সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ততনয় ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ,

এবং অন্য অনেক বীরপুরুষ আমার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥১০॥

আমাদের এই সৈন্যবল একে অপরিমিত, তাহাতে ভীষ্ম আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাদের ওই সৈন্যবল পরিমিত, ভীমই তাঁহাদের রক্ষা পাইবার আশাস্থল।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥১১॥

অতএব আপনারা যুদ্ধের যত প্রবেশস্থলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সৈন্যভাগে অবস্থান করিয়া সকলে ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।”

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥১২॥

দুর্যোধনের প্রাণে হর্ষোদ্রেক করিয়া কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদে রণস্থল ধ্বনিত করিয়া মহাপ্রতাপভরে শঙ্খনিনাদ করিলেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥১৩॥

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদ্য অকস্মাৎ বাদিত হইল, রণস্থল উচ্চ-শব্দসঙ্কুল হইল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥১৪॥

অনন্তর শ্বেতাশ্বযুক্ত বিশাল রথে দণ্ডায়মান মাধব ও পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥১৫॥

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥১৬॥

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ এবং নকুল সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥১৮॥

পরম ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত যোদ্ধা সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয়, সকলেই চারিদিক হইতে স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ম্॥১৯॥

সেই মহাশব্দ আকাশ ও পৃথিবী তুমুলরবে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥২০॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

তখন শস্ত্রনিক্ষেপ আরব্ধ হইবার পরে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥২৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন, —

"হে নিষ্পাপ, দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর, যতক্ষণ যুদ্ধস্পৃহায় অবস্থিত এই বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করি। জানিতে চাই, কাহাদের সহিত এই রণোৎসবে যুদ্ধ করিতে হইবে।

দেখি এই যুদ্ধপ্রার্থীগণ কাহারা, যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধনের প্রিয়কার্য্য করিবার কামনায় এইখানে সমাগত হইয়াছেন।”

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥২৫॥

সঞ্জয় বলিলেন, —

গুড়াকেশের এই কথা শুনিয়া হৃষীকেশ দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপনপূর্ব্বক

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমুদায় নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ।”

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥২৬॥

সেই রণস্থলে পার্থ দেখিলেন পিতা, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, সুহৃদ, যত আত্মীয় ও স্বজন, দুই পরস্পরবিরোধী সৈন্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥২৭॥

সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে এইরূপ অবস্থিত দেখিয়া কুন্তীপুত্র তীব্র কৃপায় আবিষ্ট হইয়া বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥২৮॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥২৯॥

অর্জ্জুন বলিলেন, —

"হে কৃষ্ণ, এই সকল স্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া আমার দেহের অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে,

সমস্ত শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ উপস্থিত, গাণ্ডীব অবশ হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, চর্ম্ম যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥৩০॥

আমি দাঁড়াইবার শক্তিরহিত হইলাম, মন যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। হে কেশব, অশুভ লক্ষণ সকল দেখিতেছি।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥৩১॥

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না; হে কৃষ্ণ, আমি জয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥৩৪॥

বল, গোবিন্দ, রাজ্যে আমাদের কি লাভ? কি লাভ ভোগে? কি প্রয়োজন জীবনে? যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন বাঞ্ছনীয়,

তাঁহারাই জীবন ও ধন ত্যাগ করিয়া এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত, — আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ,

মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, কুটুম্ব। হে মধুসূদন, ইঁহারা যদি আমাকে বধ

করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে বধ করিতে চাই না।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন॥৩৫॥

ত্রিলোকরাজ্যের লোভেও চাই না, পৃথিবীর আধিপত্য ত দূরের কথা। ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিয়া, হে জনার্দ্দন! আমাদের কি মনের সুখ হইতে পারে?

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥৩৬॥

ইহারা আততায়ী, তথাপি ইহাদের বধ করিলে পাপই আমাদের মনে আশ্রয় পাইবে। অতএব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যখন আমাদের আত্মীয়, তখন তাহাদিগকে সংহার করিতে আমরা অধিকারী নহি। হে মাধব, স্বজন বধে আমরা কিরূপে সুখী হইব?

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন॥৩৮॥

যদিও ইঁহারা লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া কুলক্ষয়ের দোষ ও মিত্রের অনিষ্টকরণে মহাপাপ বুঝেন না,

আমরা, জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ বুঝি, কেন আমাদের জ্ঞান হইবে না, এই পাপ হইতে আমরা কেন নিবৃত্ত হইব না?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥৩৯॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম সকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মনাশে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥৪০॥

অধর্ম্মের অভিভবে হে কৃষ্ণ, কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হয়। কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হইলে বর্ণসঙ্কর হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলাঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪১॥

বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকগণের নরক প্রাপ্তির হেতু, কেননা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডোদক হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতৃলোক হইতে পতিত হন।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥৪২॥

কুলনাশকদের এই বর্ণসঙ্করোৎপাদক দোষ সকলের ফলে সনাতন জাতিধর্ম্ম সকল ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হয়।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥৪৩॥

যাঁহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়াছে, সেই মনুষ্যদের নিবাস নরকে নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহাই প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥৪৪॥

অহো! আমরা অতি মহৎ পাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, যে রাজ্য-সুখের লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যম করিতেছিলাম।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥৪৫॥

যদি অশস্ত্র ও প্রতিকারে অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সংহার করেন, তাহাই ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল।”

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন, —

এই বলিয়া অর্জ্জুন শোকোদ্বেগে কলুষিতচিত্ত হইয়া যুদ্ধকালে আরূঢ়শর ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক রথে বসিয়া পড়িলেন।

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তি

গীতা মহাভারতের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে উক্ত হয়। অতএব গীতার প্রথম শ্লোকে দেখি রাজা ধৃতরাষ্ট্র দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দুই সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহাদের প্রথম চেষ্টা কি, বৃদ্ধ রাজা তাহা জানিতে উৎসুক। সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তির কথা আধুনিক ভারতের ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের চোখে কবির কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি বলিতাম অমুক লোক দূরদৃষ্টি (Clairvoyance) ও দূরশ্রবণ (Clairaudience) প্রাপ্ত হইয়া দূরস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ দৃশ্য ও মহারথীগণের সিংহনাদ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটী তত অবিশ্বাসযোগ্য না-ও হইতে পারিত। আর ব্যাসদেব যে এই শক্তি সঞ্জয়কে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আরও আষাঢ়ে গল্প বলিয়া উড়াইতে প্রবৃত্তি হয়। যদি বলিতাম যে একজন বিখ্যাত য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ অমুক লোককে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত (Hypnotised) করিয়া তাঁহার মুখে সেই দূর ঘটনার কতক বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেই যাঁহারা পাশ্চাত্য hypnotismএর কথা মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেও পারিতেন। অথচ hypnotism যোগশক্তির নিকৃষ্ট ও বর্জ্জনীয় অঙ্গ মাত্র। মানুষের মধ্যে এমন অনেক শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে পূর্ব্বকালের সভ্য জাতি সেই সকল জানিত ও বিকাশ করিত; কিন্তু কলিসম্ভূত অজ্ঞানের স্রোতে সেই বিদ্যা ভাসিয়া গিয়াছে, কেবল আংশিকরূপে অল্প লোকের মধ্যে গুপ্ত ও গোপনীয় জ্ঞান বলিয়া রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্মদৃষ্টি বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় আছে যাহা দ্বারা আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাতীত পদার্থ ও জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারি, সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, সূক্ষ্ম শব্দ শ্রবণ, সূক্ষ্ম গন্ধ আঘ্রাণ, সূক্ষ্ম পদার্থ স্পর্শ ও সূক্ষ্ম আহার আস্বাদ করিতে পারি। সূক্ষ্মদৃষ্টির চরম পরিণামকে

দিব্যচক্ষু বলে, তাহার প্রভাবে দূরস্থ, গুপ্ত বা অন্যলোকগত বিষয় সকল আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। পরম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস যে এই দিব্যচক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য hypnotistএর অদ্ভুত শক্তিতে যদি আমরা অবিশ্বাসী হই না, তবে অতুল্য জ্ঞানী ব্যাসদেবের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইব কেন? শক্তিমানের শক্তি পরের শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ও মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন, ইতো প্রভৃতি কর্ম্মবীর উপযুক্ত পাত্রে শক্তি সংক্রমণের দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের সহকারী প্রস্তুত করিয়াছেন। অতি সামান্য যোগীও কোন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কয়েকক্ষণের জন্য বা কোনও বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য পরকে স্বীয় সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন, — ব্যাসদেব ত জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও অসামান্য যোগসিদ্ধ পুরুষ। বাস্তবিক, দিব্যচক্ষুর অস্তিত্ব আষাঢ়ে গল্প না হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য হইবার কথা। আমরা জানি, চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ শ্রবণ করে না, নাসিকা আঘ্রাণ করে না, ত্বক্ স্পর্শ উপলব্ধি করে না, রসনা আস্বাদ করে না। মনই দর্শন করে, মনই শ্রবণ করে, মনই আঘ্রাণ করে, মনই স্পর্শ উপলব্ধি করে, মনই আস্বাদ করে। দর্শন শাস্ত্রে ও মনস্তত্ত্ববিদ্যায় এই সত্য অনেকদিন হইতে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, hypnotismএ ইহা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে, যে চক্ষু মুদ্রিত হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য যে কোন নাড়ী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে চক্ষু ইত্যাদি স্থূলেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রাপ্তির কেবল সুবিধাজনক উপায়, স্থূল শরীরের সনাতন অভ্যাসে বদ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের দাস হইয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে কোন শারীরিক প্রণালী দ্বারা সেই জ্ঞান মনে পৌঁছাইতে পারি — যেমন অন্ধ স্পর্শ দ্বারা পদার্থের আকৃতির ও স্বভাবের নির্ভুল ধারণা করে। কিন্তু অন্ধের দৃষ্টি ও স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় যে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি মনের মধ্যে দেখে। ইহাকেই দর্শন বলে। প্রকৃতপক্ষে আমি সম্মুখস্থিত পুস্তক দর্শন করি না, সেই পুস্তকের যে প্রতিমূর্ত্তি আমার চক্ষুতে চিত্রিত হয়, তাহাই দেখিয়া মন বলে, পুস্তক দেখিলাম। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্তের দূরস্থ পদার্থ বা ঘটনা দর্শনে ও শ্রবণে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, পদার্থজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কোন শারীরিক প্রণালীর আবশ্যকতা নাই, — সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিতে পারি। লণ্ডনে ঘরে বসিয়া সে সময় এডিনবরোতে যে ঘটনা হইতেছে, মনের মধ্যে তাহা দেখিলাম, এইরূপ দৃষ্টান্তের

সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ও দিব্যচক্ষুতে এই প্রভেদ আছে যে, সূক্ষ্মদর্শী মনের মধ্যে অদৃষ্ট পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করে, দিব্যচক্ষু দ্বারা আমরা মনের মধ্যে সেই দৃশ্য না দেখিয়া, শারীরিক চক্ষের সম্মুখে দেখি, চিন্তাস্রোতে সেই শব্দ না শুনিয়া শারীরিক কর্ণে শুনি। ইহার এক সামান্য দৃষ্টান্ত Crystalএ বা কালির মধ্যে সমসাময়িক ঘটনা দেখা। কিন্তু দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে এইরূপ উপকরণের কোন আবশ্যকতা নাই, তিনি এই শক্তিবিকাশে বিনা উপকরণে দেশকালের বন্ধন খুলিয়া অন্য দেশের ও অন্য কালের ঘটনা অবগত হইতে পারেন। দেশবন্ধন মোচনের প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি, কাল-বন্ধনও যে মোচন করা যায়, মানুষ যে ত্রিকালদর্শী হইতে পারে, তাহার এত বহুসংখ্যক ও সন্তোষজনক প্রমাণ এখনও জগতের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই। তবে যদি দেশবন্ধন মোচন করা সম্ভব হয়, কালবন্ধন মোচন অসম্ভব কথা বলা যায় না। যাহা হউক, এই ব্যাসদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমবেত ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণকে চক্ষে দেখিলেন, দুর্যোধনের উক্তি, পিতামহ ভীষ্মের ভীম সিংহনাদ, পাঞ্চজন্যের কুরুধ্বংসঘোষক মহাশব্দ ও গীতার্থদ্যোতক কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ কর্ণে শ্রবণ করিলেন।

আমাদের মতে মহাভারতও রূপক নহে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও কবির কল্পনা নহে, গীতাও আধুনিক তার্কিক বা দার্শনিকের সিদ্ধান্ত নহে। অতএব গীতার কোনও কথা যে অসম্ভব বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। এইজন্যই দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তির কথার এত বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম।

দুর্যোধনের বাক্‌কৌশল

সঞ্জয় সেই প্রথম যুদ্ধচেষ্টা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্য রচিত ব্যূহ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। কেন দ্রোণের নিকট গেলেন তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। ভীষ্মই সেনাপতি, যুদ্ধের কথা তাঁহাকেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু কূটবুদ্ধি দুর্যোধনের মনে ভীষ্মের উপর বিশ্বাস ছিল না। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনুরক্ত, হস্তিনাপুরের শান্ত্যনুমোদক দলের (peace party) নেতা; যদি পাণ্ডবে ধার্ত্তরাষ্ট্রেই যুদ্ধ হইত, ভীষ্ম কখনই অস্ত্রধারণ করিতেন না; কিন্তু কুরুদের প্রাচীন শত্রু ও সমকক্ষ সাম্রাজ্যলিপ্সু পাঞ্চালজাতি দ্বারা কুরুরাজ্য আক্রান্ত দেখিয়া কুরুজাতির প্রধান পুরুষ, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্ সেনাপতিপদে

নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে চিররক্ষিত স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের শেষরক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দুর্যোধন স্বয়ং অসুরপ্রকৃতি, রাগদ্বেষই তাঁহার সর্ব্বকার্য্যের প্রমাণ ও হেতু, অতএব কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রাণপ্রতিম পাণ্ডবগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিবার বল এই কঠিন তপস্বীর প্রাণে আছে, তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। স্বদেশহিতৈষী পরামর্শের সময়ে স্বীয় মত প্রকাশপূর্ব্বক স্বজাতিকে অন্যায় ও অহিত হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই অন্যায় ও অহিত একবার লোকদ্বারা স্বীকৃত হইলে স্বীয় মত উপেক্ষা করিয়া অধর্ম্মযুদ্ধেও স্বজাতি-রক্ষা ও শত্রুদমন করেন, ভীষ্মও সেই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ভাবও দুর্যোধনের বোধাতীত। অতএব ভীষ্মের নিকট উপস্থিত না হইয়া দ্রোণকে স্মরণ করিলেন। দ্রোণ ব্যক্তিগতভাবে পাঞ্চালরাজের ঘোর শত্রু, পাঞ্চাল দেশের রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু দ্রোণকে বধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ, অর্থাৎ দুর্যোধন ভাবিলেন, এই ব্যক্তিগত বৈরভাবের কথা স্মরণ করাইলে আচার্য্য শান্তির পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিবেন। স্পষ্ট সেই কথা বলিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নের নামমাত্র উল্লেখ করিলেন, তাহার পরে ভীষ্মকেও সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে কুরুরাজ্যের রক্ষক ও বিজয়ের আশাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। প্রথম বিপক্ষের মুখ্য মুখ্য যোদ্ধার নাম উল্লেখ করিলেন, পরে স্বসৈন্যের কয়েকজন নেতার নাম বলিলেন, সকলের নহে, দ্রোণ ও ভীষ্মের নামই তাঁহার অভিসন্ধি সিদ্ধ্যর্থ যথেষ্ট, তবে সেই অভিসন্ধি গোপন করিবার জন্য আর চারি-পাঁচটী নাম বলিলেন। তাহার পরে বলিলেন, ''আমার সৈন্য অতি বৃহৎ, ভীষ্ম আমার সেনাপতি, পাণ্ডবদের সৈন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাদের আশাস্থল ভীমের বাহুবল, অতএব আমাদের জয় হইবে না কেন? তবে ভীষ্মই যখন আমাদের প্রধান ভরসা, তাঁহাকে শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সকলের উচিত. তিনি থাকিলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।'' অনেকে ''অপর্য্যাপ্ত'' শব্দের বিপরীত অর্থ করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, দুর্যোধনের সৈন্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সেই সৈন্যের নেতাগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে কাহারও ন্যূন নহেন, আত্মশ্লাঘী দুর্যোধন কেন স্ববলের নিন্দা করিয়া নিরাশা উৎপাদন করিতে যাইবেন? ভীষ্ম দুর্যোধনের মনের ভাব ও কথার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সন্দেহ অপনোদনার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিলেন। দুর্যোধনের হৃদয়ে তাহাতে হর্ষোৎপাদন হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, দ্রোণ ও ভীষ্ম দ্বিধা দূর করিয়া যুদ্ধ করিবেন।

পূর্ব্ব সূচনা

যেই ভীষ্মের গগনভেদী শঙ্খনাদে রণক্ষেত্র কম্পিত হইল, তখনই সেই বিশাল কৌরব সেনার চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং রণোল্লাসে রথীগণ মাতিতে লাগিল। অপরদিকে পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠ বীর ও তাঁহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের যুদ্ধাহ্বানের উত্তরস্বরূপ শঙ্খনাদ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইয়া রণচণ্ডীকে সৈন্যের হৃদয়ে জাগাইলেন। সেই মহান্ শব্দ পৃথিবী ও নভঃস্থলকে ধ্বনিত করিয়া যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ইহার এই অর্থ নহে যে ভীষ্ম প্রভৃতি এই শব্দে ভীত হইলেন, তাঁহারা বীরপুরুষ, রণচণ্ডীর আহ্বানে ভীত হইবেন কেন? এই উক্তিতে কবি প্রথম অত্যুৎকট শব্দের শারীরিক বেগবান সঞ্চার বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন বজ্রনাদ অনেকবার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া যায় এইরূপ শ্রোতার বোধ হয়, তেমনই এই রণক্ষেত্রব্যাপী মহাশব্দের সঞ্চার হইল; আর এই শব্দ যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভাবী নিধনের ঘোষণা, যেই হৃদয়গুলি পাণ্ডবদের শস্ত্র বিদীর্ণ করিবে, পূর্ব্বেই তাঁহাদের শঙ্খনাদ বিদীর্ণ করিয়া গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দুই দিক হইতে শস্ত্রনিক্ষেপ হইতে লাগিল, এই সময়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি আমার রথ দুই সৈন্যের মধ্যভাগে স্থাপন কর, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি, কে কে বিপক্ষ, কাহারা যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্যোধনের প্রিয়কর্ম্ম করিতে সমাগত হইয়াছেন, কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে।" অর্জ্জুনের ভাব এই যে আমিই পাণ্ডবদের আশাস্থল, আমা দ্বারাই বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা হন্তব্য, অতএব দেখি ইহারা কাহারা। এই পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়ভাব রহিয়াছে, কৃপা কিম্বা দৌর্ব্বল্যের কোন চিহ্ন নাই। ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বিপক্ষের সৈন্যে উপস্থিত, সকলকে সংহার করিয়া অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অসপত্ন সাম্রাজ্য দিবার জন্য উদ্যোগী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে অর্জ্জুনের মনে দৌর্ব্বল্য আছে, এখন চিত্ত পরিষ্কার না করিলে এমন কোনও সময়ে অকস্মাৎ চিত্ত হইতে বুদ্ধিতে উঠিয়া অধিকার করিতে পারে যে পাণ্ডবদের বিশেষ অনিষ্ট, হয় ত সর্ব্বনাশ হইবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এমন স্থানে রথ স্থাপন করিলেন যে ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রিয়জন তাঁহার সম্মুখে রহিলেন অথচ আর সকল কৌরবপক্ষীয় নৃপতিকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখ, সমবেত কুরুজাতিকে দেখ। স্মরণ করিতে হয় যে অর্জ্জুন স্বয়ং কুরুজাতীয়, কুরুবংশের গৌরব, তাঁহার সকল আত্মীয়, প্রিয়জন,

বাল্যের সহচরগণ সেই কুরুজাতীয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই তিনটী সামান্য কথার গভীর অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন অর্জ্জুন দেখিলেন যাঁহাদের সংহার করিয়া যুধিষ্ঠিরের অসপত্ন রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহারা আর কেহ নন, নিজ প্রিয় আত্মীয়, গুরু, বন্ধু, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র। দেখিলেন সমস্ত ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ পরস্পরের সহিত প্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ অথচ পরস্পরকে সংহার করিতে এই ভীষণ রণক্ষেত্রে আগত।

বিষাদের মূল কারণ

অর্জ্জুনের নির্ব্বেদের মূল কি? অনেকে এই বিষাদের প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুমার্গপ্রদর্শক ও অধর্ম্মের অনুমোদক বলিয়া নিন্দা করেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের শান্তিভাব, বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসাভাব এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেমভাবই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যুদ্ধ ও নরহত্যা পাপ, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাতক, তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই অসঙ্গত কথা বলেন। কিন্তু এই সকল আধুনিক ধারণা দ্বাপর যুগের মহাবীর পাণ্ডবের মনেও উঠে নাই; অহিংসাভাব শ্রেষ্ঠ, বা যুদ্ধ, নরহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাপ বলিয়া যুদ্ধে বিরত হওয়া উচিত, এই চিন্তার কোনও চিহ্নও অর্জ্জুনের কথায় ব্যক্ত হয় না। বলিলেন বটে, গুরুজনকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর, বলিলেন বটে যে বন্ধুবান্ধবের হত্যায় পাপ আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, কিন্তু কর্ম্মের স্বভাব দেখিয়া এই কথা বলেন নাই, কর্ম্মের ফল দেখিয়া বলিলেন; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিষাদ ভঞ্জনার্থ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে কর্ম্মের ফল দেখিতে নাই, কর্ম্মের স্বভাব দেখিয়া সেই কর্ম্ম করা উচিত না অনুচিত স্থির করিতে হয়। অর্জ্জুনের প্রথম ভাব এই যে ইঁহারা আমার আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু, বাল্যসহচর, সকলে স্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র, ইঁহাদের হত্যায় অসপত্ন রাজ্যলাভ করিলে সেই রাজ্যভোগ কদাচ সুখপ্রদ হইতে পারে না, বরং যাবজ্জীবন দুঃখ ও পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, বন্ধুবান্ধবশূন্য পৃথিবীর রাজ্য কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। অর্জ্জুনের দ্বিতীয় ভাব এই যে প্রিয়জনকে হত্যা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, যাঁহারা দ্বেষের পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তৃতীয় ভাব এই যে স্বার্থের জন্য এইরূপ কর্ম্ম করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ক্ষত্রিয়ের অনুচিত। চতুর্থ ভাব এই যে ভ্রাতৃবিরোধে ও ভ্রাতৃহত্যায় কুলনাশ ও জাতিধ্বংস ঘটিবে, এইরূপ কুফল সৃষ্টি কুলরক্ষক ও জাতিরক্ষক ক্ষত্রিয়বীরের পক্ষে

মহাপাপ। এই চারটী ভাব ভিন্ন অর্জ্জুনের বিষাদের মূলে আর কোনও ভাব নাই। ইহা না বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার অর্থও বুঝা যায় না। খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত গীতার ধর্ম্মের বিরোধ ও সামঞ্জস্যের কথা পরে বলা হইবে। অর্জ্জুনের কথার ভাব সূক্ষ্মবিচারে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রদর্শন করি।

বৈষ্ণবী মায়ার আক্রমণ

অর্জ্জুন প্রথম তাঁহার বিষাদের বর্ণনা করিলেন। স্নেহ ও কৃপার অকস্মাৎ বিদ্রোহে মহাবীর অর্জ্জুন অভিভূত ও পরাস্ত, তাঁহার শরীরের সমস্ত বল এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গিয়াছে, অঙ্গ সকল অবসন্ন, দাঁড়াইবার শক্তিও নাই, বলবানের হস্ত গাণ্ডীব ধারণে অসমর্থ, শোকের উত্তাপে জ্বরের লক্ষণ ব্যক্ত, শরীরের দৌর্ব্বল্য হইয়াছে, ত্বক্ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, মুখ ভিতরে শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর তীব্রভাবে কম্পমান, মন যেন সেই আক্রমণে ঘুরিতেছে। এই ভাবের বর্ণনা পড়িয়া প্রথম কবির তেজস্বিনী কল্পনার অতিরিক্ত বিকাশ বলিয়া কেবল সেই কবিত্বসৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া ক্ষান্ত হই; কিন্তু যদি সূক্ষ্মবিচারে নিরীক্ষণ করি, তখন এই বর্ণনার একটী গূঢ় অর্থ মনে উদয় হয়। অর্জ্জুন পূর্ব্বেও কুরুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, অথচ এইরূপ ভাব কখনও হয় নাই, এখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় হঠাৎ এই আন্তরিক উৎপাত হইয়াছে। মনুষ্যজাতির অনেক অতিপ্রবল বৃত্তি ক্ষত্রিয় শিক্ষা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরাভূত ও আবদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের হৃদয়তলে গুপ্তভাবে রহিয়াছে। নিগ্রহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না, বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সংযমে চিত্তশুদ্ধি হয়। নিগৃহীত বৃত্তি ও ভাবসকল হয় এই জন্মে, নহে পরজন্মে একদিন চিত্ত হইতে উঠিয়া বুদ্ধিকে আক্রমণ করে এবং জয় করিয়া সমস্ত কর্ম্ম স্ববিকাশের অনুকূল পথে চালায়। এই হেতু, যে এই জন্মে দয়াবান, সে অন্য জন্মে নিষ্ঠুর হয়, যে এই জন্মে কামী ও দুশ্চরিত্র, সে অন্য জন্মে সাধু ও পবিত্রচেতা হয়। নিগ্রহ না করিয়া বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে বৃত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া চিত্ত পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাকেই সংযম বলে। জ্ঞানের প্রভাবে তমোভাবের অপনোদন না হইলে সংযম অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অজ্ঞান দূর করিয়া সুপ্ত বিবেক জাগাইয়া চিত্তশোধন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু পরিহার্য্য বৃত্তিসকল চিত্ত হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক বুদ্ধির সম্মুখে

উপস্থিত না করিলে বুদ্ধিও প্রত্যাখ্যান করিবার অবসর পায় না, উপরন্তু যুদ্ধেই অন্তঃস্থ দৈত্য ও রাক্ষস বিবেক দ্বারা হত হয়, তখন বিবেক বুদ্ধিকে মুক্ত করে। যোগের প্রথম অবস্থায় যত কুপ্রবৃত্তি চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, প্রবল বেগে বুদ্ধিকে আক্রমণ করিয়া অনভ্যস্ত সাধককে ভীতি ও শোকে বিহ্বল করিয়া ফেলে, ইহাকেই পাশ্চাত্য দেশে বলে শয়তানের প্রলোভন, ইহাই মারের আক্রমণ। কিন্তু সেই ভীতি ও শোক অজ্ঞানসম্ভূত, সেই প্রলোভন শয়তানের নহে, ভগবানের। অন্তর্য্যামী জগৎগুরুই সেই সকল প্রবৃত্তি সাধককে আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন, অমঙ্গলের জন্য নহে, মঙ্গলের জন্য, চিত্তশোধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সশরীরে বাহ্যজগতে অর্জ্জুনের সখা ও সারথি, তেমনই তাঁহার মধ্যে অশরীরী ঈশ্বর ও অন্তর্য্যামী পুরুষোত্তম, তিনিই এই গুপ্ত বৃত্তি ও ভাব প্রবলবেগে এক সময় বুদ্ধির উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে বুদ্ধি ঘূর্ণ্যমান হইল এবং প্রবল মানসিক বিকার তৎক্ষণাৎ স্থূল শরীরে কবিবর্ণিত লক্ষণ সকলে ব্যক্ত হইল। প্রবল অপ্রত্যাশিত শোক-দুঃখের এইরূপ শারীরিক বিকাশ হয়, তাহা আমরা জানি, তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ অনুভবের বহির্ভূত নহে। অর্জ্জুনকে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া অখণ্ড বলে এক মুহূর্ত্তে অভিভূত করিল, সেইজন্য এই প্রবল বিকার। যখন অধর্ম্ম দয়া প্রেম ইত্যাদি কোমল ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া, অজ্ঞান জ্ঞানের বেশে ছদ্মবেশী হইয়া আসে, গাঢ় কৃষ্ণ তমোগুণ উজ্জ্বল ও বিশদ পবিত্রতার ভাণ করিয়া বলে, আমি সাত্ত্বিক, আমি জ্ঞান, আমি ধর্ম্ম, আমি ভগবানের প্রিয় দূত, পুণ্যরূপী পুণ্যপ্রবর্ত্তক, তখন বুঝিতে হইবে যে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া বুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে।

বৈষ্ণবী মায়ার লক্ষণ

এই বৈষ্ণবী মায়ার মুখ্য অস্ত্র কৃপা ও স্নেহ। মানবজাতির প্রেম ও ভালবাসা বিশুদ্ধ বৃত্তি নহে, শারীরিক ও প্রাণকোশাগত বিকারের বশে পবিত্র প্রেম ও দয়া কলুষিত ও বিকলাঙ্গ হয়। চিত্তই বৃত্তির বাসস্থান, প্রাণ ভোগের ক্ষেত্র, শরীর কর্ম্মের যন্ত্র, বুদ্ধি চিন্তার রাজ্য। বিশুদ্ধ অবস্থায় এই সকলের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পরের অবিরোধী প্রবৃত্তি হয়, চিত্তে ভাব ওঠে, শরীর দ্বারা তদনুযায়ী কর্ম্ম হয়, বুদ্ধিতে তৎসম্পর্কীয় চিন্তা হয়, প্রাণ সেই ভাব, কর্ম্ম ও চিন্তার আনন্দ ভোগ করে, জীব সাক্ষী হইয়া প্রকৃতির এই আনন্দময় ক্রীড়াদর্শনে আনন্দলাভ করে।

অশুদ্ধ অবস্থায় প্রাণ শারীরিক বা মানসিক ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া শরীরকে কর্ম্মযন্ত্র না করিয়া ভোগের উপায় করে, শরীর ভোগে আসক্ত হইয়া বার বার শারীরিক ভোগের জন্য দাবী করে, চিত্ত শারীরিক ভোগের কামনায় আক্রান্ত হইয়া আর নির্ম্মল ভাব গ্রহণে অক্ষম হয়, কলুষিত বাসনাযুক্ত ভাব চিত্তসাগর বিক্ষুব্ধ করে, সেই বাসনার কোলাহল বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া বিব্রত করে, বধির করে, বুদ্ধি আর নির্ম্মল, শান্ত অভ্রান্ত চিন্তা গ্রহণে সমর্থ হয় না, চঞ্চল মনের বশীভূত হইয়া ভ্রমে, চিন্তাবিভ্রাটে, অনৃতের প্রাবল্যে অন্ধ হয়। জীবও এই বুদ্ধিভ্রংশে হৃতজ্ঞান হইয়া সাক্ষীভাব ও নির্ম্মল আনন্দভাবে বঞ্চিত হইয়া আধারের সহিত নিজ একত্ব স্বীকার করিয়া আমি দেহ, আমি প্রাণ, আমি চিত্ত, আমি বুদ্ধি এই ভ্রান্ত ধারণায় শারীরিক ও মানসিক সুখ-দুঃখে সুখী ও দুঃখী হয়। অশুদ্ধ চিত্ত এই বিভ্রাটের মূল, অতএব চিত্তশুদ্ধি উন্নতির প্রথম সোপান। এই অশুদ্ধতা কেবল তামসিক ও রাজসিক বৃত্তিকে কলুষিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সাত্ত্বিক বৃত্তিকেও কলুষিত করে। অমুক লোক আমার শারীরিক বা মানসিক ভোগের সামগ্রী, আমার ভাল লাগে, তাহাকেই চাই, তাহার বিরহে আমার ক্লেশ হয়, ইহা অশুদ্ধ প্রেম, শরীর ও প্রাণ চিত্তকে কলুষিত করিয়া নির্ম্মল প্রেমকে বিকৃত করিয়াছে। বুদ্ধিও সেই অশুদ্ধতার ফলে ভ্রান্ত হইয়া বলে, অমুক আমার স্ত্রী, ভাই, ভগ্নী, সখা, আত্মীয়, মিত্র, তাহাকেই ভালবাসিতে হয়, সেই প্রেম পুণ্যময়, সেই প্রেমের প্রতিকূল কার্য্য যদি করি, তাহা পাপ, ক্রূরতা, অধর্ম্ম। এইরূপ অশুদ্ধ প্রেমের ফলে এমন বলবতী কৃপা হয় যে প্রিয়জনের কষ্ট, প্রিয়জনের অনিষ্ট অপেক্ষা ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেওয়াও শ্রেয়স্কর বোধ হয়, শেষে এই কৃপার উপর আঘাত পড়ে বলিয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া নিজ দৌর্ব্বল্যের সমর্থন করি। এইরূপ বৈষ্ণবী মায়ার প্রমাণ অর্জ্জুনের প্রত্যেক কথায় পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবী মায়ার ক্ষুদ্রতা

অর্জ্জুনের প্রথম কথা, ইঁহারা আমাদের স্বজন, আত্মীয়, ভালবাসার পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া আমাদের কি হিত সাধিত হইবে? বিজেতার গর্ব্ব, রাজার গৌরব, ধনীর সুখ? আমি এই সকল শূন্য স্বার্থ চাই না। লোকের রাজ্য, ভোগ, জীবন প্রিয় হয় কেন? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছেন বলিয়া, আত্মীয়স্বজনকে সুখে রাখিতে পারিব বলিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত ঐশ্বর্য্যের সুখে ও আমোদে দিন

কাটাইতে পারিব বলিয়া এই সকল সুখ ও মহত্ত্ব লোভের বিষয়। কিন্তু যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য ভোগ ও সুখ চাই, তাঁহারাই আমাদের শত্রু হইয়া যুদ্ধে উপস্থিত। তাঁহারা আমাদিগকে বরং বধ করিতে প্রস্তুত তথাপি আমাদের সহিত রাজ্য ও সুখ একত্র ভোগ করিতে সম্মত নন। আমাকে বধ করুন, আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে কখন বধ করিতে পারিব না। যদি তাঁহাদের হত্যায় ত্রিলোকরাজ্য অধিকার করিতাম, তাহা হইলেও পারিতাম না, পৃথিবীর অসপত্ন সাম্রাজ্য কি ছার! স্থূলদর্শী লোক —

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।"

এবং

"এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতো পি মধুসূদন॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।"

এই উক্তিতে মোহিত হইয়া বলেন, "অহো! অর্জ্জুনের কি মহান্ উদার নিঃস্বার্থ প্রেমময় ভাব। রুধিরাক্ত ভোগ ও সুখ অপেক্ষা পরাজয়, মরণ, চিরদুঃখ তাঁহার বাঞ্ছনীয়।" কিন্তু যদি অর্জ্জুনের মনের ভাব পরীক্ষা করি, আমরা বুঝিতে পারি যে অর্জ্জুনের ভাব অতি ক্ষুদ্র, দুর্ব্বলতা-প্রকাশক, ক্লীবোচিত। কুলের হিতার্থে বা প্রিয়জনের প্রেমে, কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা অনার্য্যের পক্ষে মহৎ উদার ভাব হইতে পারে, আর্য্যের পক্ষে তাহা মধ্যম ভাব, ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্বার্থত্যাগ করাই উত্তমভাব। অপর পক্ষে কুলের হিতার্থে, প্রিয়জনের প্রেমে, কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অধম ভাব। ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্নেহ, কৃপা ও ভয় দমন করা প্রকৃত আর্য্যভাব। এই ক্ষুদ্রভাবের সমর্থনার্থ অর্জ্জুন স্বজনহত্যার পাপ দেখাইয়া আবার বলিলেন, "ধার্ত্তরাষ্ট্রদের বধে আমাদের কি সুখ, কি মনস্তুষ্টি হইতে পারে? তাঁহারা আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, যদিও অন্যায় করেন ও আমাদের শত্রুতা করেন, রাজ্য অপহরণ করেন, সত্যভঙ্গ করেন, তাঁহাদের বধে আমাদের পাপই হইবে, সুখ হইবে না।" অর্জ্জুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছেন, নিজ সুখের জন্য বা যুধিষ্ঠিরের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রবধে নিযুক্ত হন নাই, ধর্ম্মস্থাপন, অধর্ম্মনাশ, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন, ভারতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত এক মহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সমস্ত সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য।

কুলনাশের কথা

কিন্তু স্বীয় দুর্ব্বলতার সমর্থনে অর্জ্জুন আর এক উচ্চতর যুক্তি আবিষ্কার করিলেন, এই যুদ্ধে কুলনাশ ও জাতিনাশ হইবে, অতএব এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ নহে, অধর্ম্মযুদ্ধ। এই ভ্রাতৃহত্যায় মিত্রদ্রোহ, অর্থাৎ যাঁহারা স্বভাবতঃ অনুকূল ও সহায়, তাঁহাদের অনিষ্ট করা হয়, উপরন্তু স্বীয় কুল অর্থাৎ যে কুরুনামক ক্ষত্রিয় বংশ ও জাতিতে উভয় পক্ষের জন্ম হইয়াছে, তাহার বিনাশ সাধিত হয়। প্রাচীন কালে জাতি প্রায়ই রক্তের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক মহান্ কুল বিস্তার পাইয়া জাতিতে পরিণত হইত, যেমন ভোজবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি ভারত-জাতির অন্তর্গত কুলবিশেষ এক-একটী বলশালী জাতি হইয়াছিল। কুলের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ ও পরস্পরের অনিষ্টকরণ তাহাকেই অর্জ্জুন মিত্রদ্রোহ নামে অভিহিত করিলেন। একে এই মিত্রদ্রোহ নৈতিক হিসাবে মহাপাপ, তাহাতে অর্থনীতিক হিসাবে এই মহান্ দোষ মিত্রদ্রোহে সন্নিবিষ্ট যে কুলক্ষয় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। সনাতন কুলধর্ম্মের সম্যক্ পালন কুলের উন্নতির ও অবস্থিতির কারণ, যে মহৎ আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা গার্হস্থ্যজীবনে ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষগণ স্থাপিত ও রক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, সেই আদর্শের হানি বা শৃঙ্খলার শিথিলীকরণ হইলে কুলের অধঃপতন হয়। কুল যতদিন সৌভাগ্যবান ও বলশালী হইয়া থাকে, ততদিন এই আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, কুল ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তমোভাবের প্রসারণে মহান্ ধর্ম্মে শিথিলতা হয়, তাহার ফলে অরাজকতা, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবিষ্ট হয়, কুলের মহিলাগণ দুশ্চরিত্রা হয় এবং কুলের পবিত্রতা নষ্ট হয়, নীচজাতীয় ও নীচচরিত্রবিশিষ্ট লোকের ঔরসে মহান্ কুলে পুত্রোৎপাদন হয়। তাহাতে পিতৃপুরুষের প্রকৃত সন্ততিচ্ছেদে কুলহন্তাদের নরক-প্রাপ্তি হয় এবং অধর্ম্মের প্রসারে, বর্ণসঙ্করসম্ভূত নৈতিক অধোগতি ও নীচ গুণের বিস্তারে এবং অরাজকতা প্রভৃতি দোষে সমস্ত কুলও বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং নরকপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উভয়ই কুলনাশে নষ্ট হয়। জাতিধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত কুলসমষ্টিতে যে মহান্ জাতি হয়, সেই জাতির পুরুষপরম্পরায় আগত সনাতন আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা। তাহার পরে অর্জ্জুন আবার তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্ত ও কর্ত্তব্য-কর্ম্মবিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞাপন করিয়া যুদ্ধের সময়েই গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন। কবি এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন যে, শোকে তাঁহার বুদ্ধিবিভ্রাট হইয়াছিল বলিয়া অর্জ্জুন এইরূপ

ক্ষত্রিয়ের অনুচিত অনার্য্য আচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

বিদ্যা ও অবিদ্যা

আমরা অর্জ্জুনের কুলনাশবিষয়ক কথার মধ্যে একটী অতি বৃহৎ ও উন্নত ভাবের ছায়া দেখিতে পাই, এই ভাবের সহিত যে গুরুতর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, তাহার আলোচনা গীতার ব্যাখ্যাকর্ত্তার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। অথচ আমরা যদি কেবল গীতার আধ্যাত্মিক অর্থ অন্বেষণ করি, আমাদের জাতীয়, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত সাংসারিক কর্ম্ম ও আদর্শ হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করি, সেই ভাব ও সেই প্রশ্নের মহত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিব এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপী বিস্তার সঙ্কুচিত করিব। শঙ্কর প্রভৃতি যাঁহারা গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারপরাঙ্মুখ দার্শনিক অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ জ্ঞানী বা ভক্ত ছিলেন, গীতায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা ভাব খুঁজিয়া যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। যাঁহারা এক আধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী তাঁহারাই গীতার গূঢ়তম শিক্ষার অধিকারী। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী ও কর্ম্মী ছিলেন, গীতার পাত্র অর্জ্জুন ভক্ত ও কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। একটী মহৎ রাজনীতিক সংঘর্ষ গীতাপ্রচারের কারণ, সেই সংঘর্ষে অর্জ্জুনকে মহৎ রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্র ও নিমিত্তরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা গীতার উদ্দেশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রই শিক্ষাস্থল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় রাজকুমার, রাজনীতি ও যুদ্ধ তাঁহার স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। গীতার উদ্দেশ্য বাদ দিয়া, গীতার বক্তা, পাত্র ও প্রচারের কারণ বাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করা চলিবে কেন?

মানব-সংসারের পাঁচটী মুখ্য প্রতিষ্ঠা চিরকাল বর্ত্তমান — ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, জাতি, মানবসমষ্টি। এই পাঁচটী প্রতিষ্ঠার উপর ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবৎপ্রাপ্তির দুই মার্গ, বিদ্যাকে আয়ত্ত করা এবং অবিদ্যাকে আয়ত্ত করা, দুটীতেই আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্দর্শন উপায়। বিদ্যার মার্গ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি অবিদ্যাময় প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ লাভ বা পরব্রহ্মে লয়। অবিদ্যার মার্গ সর্ব্বত্র আত্মা ও ভগবানকে দর্শন করিয়া জ্ঞানময় মঙ্গলময় শক্তিময় পরমেশ্বরকে বন্ধু, প্রভু, গুরু, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, দাস, প্রেমিক,

পতি, পত্নীরূপে প্রাপ্ত হওয়া। শান্তি বিদ্যার উদ্দেশ্য, প্রেম অবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভগবানের প্রকৃতি বিদ্যাবিদ্যাময়ী। আমরা যদি কেবল বিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি বিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব, যদি কেবল অবিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি অবিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটীকেই যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই সম্পূর্ণভাবে বাসুদেবকে লাভ করেন; তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত। যাঁহারা বিদ্যার শেষ লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। ঈশা উপনিষদে এই মহান্ সত্য অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা —

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে বিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

"যাঁহারা অবিদ্যার উপাসক হন, তাঁহারা অন্ধ অজ্ঞানরূপ তমঃ মধ্যে প্রবেশ করেন।* যে ধীর জ্ঞানীগণ আমাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে বিদ্যারও ফল আছে, অবিদ্যারও ফল আছে, সেই দুই ফল স্বতন্ত্র। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতময় পুরুষোত্তমের আনন্দ ভোগ করেন।"

সমস্ত মানবজাতি অবিদ্যা ভোগ করিয়া বিদ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাই প্রকৃত ক্রমবিকাশ। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সাধক, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মযোগী, তাঁহারা এই মহৎ অভিযানের অগ্রগামী সৈন্য, দূর গন্তব্যস্থানে ক্ষিপ্রগতিতে পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসেন ও মানবজাতিকে সুসংবাদ শ্রবণ করান, পথ প্রদর্শন করেন, শক্তি বিতরণ করেন। ভগবানের অবতার ও বিভূতি আসিয়া পথ সুগম করেন,

* কোন অজ্ঞাত কারণে উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির বঙ্গানুবাদ এখানে নাই। শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী The Upanishads গ্রন্থে এই পঙ্‌ক্তিটির ইংরাজী অনুবাদ আছে। সেখান হতে পঙ্‌ক্তিটি বাংলায় অনূদিত হল: "যাঁহারা কেবল বিদ্যার উপাসক হন, তাঁহারা যেন অধিকতর তমঃ মধ্যে প্রবেশ করেন।" —স

অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন, বাধা বিনাশ করেন। অবিদ্যায় বিদ্যা, ভোগে ত্যাগ, সংসারে সন্ন্যাস, আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা, ভগবানে জগৎ, জগতে ভগবান, এই উপলব্ধি আসল জ্ঞান, ইহাই মানবজাতির গন্তব্যস্থানে গমনের নির্দ্দিষ্ট পথ। আত্মজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা উন্নতির প্রধান অন্তরায়, দেহাত্মকবোধ, স্বার্থবোধ, সেই সঙ্কীর্ণতার মূল কারণ, অতএব পরকে আত্মবৎ দেখা উন্নতির প্রথম সোপান। মনুষ্য প্রথম ব্যক্তি লইয়া থাকে, নিজ ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, ভোগ ও শক্তিবিকাশে রত থাকে। আমি দেহ, আমি মন, আমি প্রাণ, দেহের বল, সুখ, সৌন্দর্য্য, মনের ক্ষিপ্রতা, আনন্দ, স্বচ্ছতা, প্রাণের তেজ, ভোগ, প্রফুল্লতা জীবনের উদ্দেশ্য ও উন্নতির চরমাবস্থা, মনুষ্যের এই প্রথম বা আসুরিক জ্ঞান। ইহারও প্রয়োজন আছে; দেহ, মন, প্রাণের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা প্রথম সাধন করিয়া তাহার পর সেই পূর্ণবিকশিত শক্তি পরের সেবায় প্রয়োগ করা উচিত। সেইজন্য আসুরিক শক্তিবিকাশ মানবজাতির সভ্যতার প্রথম অবস্থা; পশু, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ পর্য্যন্ত মনুষ্যের মনে, কর্ম্মে, চরিত্রে লীলা করে, বিকাশ পায়। তাহার পর মনুষ্য আত্মজ্ঞান বিস্তার করিয়া পরকে আত্মবৎ দেখিতে আরম্ভ করে, পরার্থে স্বার্থ ডুবাইতে শিখে। প্রথম পরিবারকেই আত্মবৎ দেখে, স্ত্রী-সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, স্ত্রী-সন্তানের সুখের জন্য নিজ সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে বংশ বা কুলকে আত্মবৎ দেখে, কুলরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রী-সন্তানকে বলি দেয়, কুলের সুখ, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য নিজের ও স্ত্রী-সন্তানের সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে জাতিকে আত্মবৎ দেখে, জাতিরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রী-সন্তানকে, কুলকে বলি দেয়, — যেমন চিতোরের রাজপুতকুল সমস্ত রাজপুতজাতির রক্ষার্থে বার বার স্বেচ্ছায় বলি হইল, — জাতির সুখ, গৌরব, বৃদ্ধির জন্য নিজের, স্ত্রী-সন্তানদের, কুলের সুখ, গৌরব, বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে সমস্ত মানবজাতিকে আত্মবৎ দেখে, মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রী-সন্তানকে, কুলকে, জাতিকে বলি দেয়, — মানবজাতির সুখ ও উন্নতির জন্য নিজের, স্ত্রী-সন্তানদের, কুলের, জাতির সুখ, গৌরব ও বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। এইরূপ পরকে আত্মবৎ দেখা, পরের জন্য নিজেকে ও নিজের সুখকে বলি দেওয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসূত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। য়ুরোপের নৈতিক উন্নতি এই পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন য়ুরোপীয়গণ ব্যক্তিকে পরিবারে ডুবাইতে, পরিবারকে কুলে ডুবাইতে শিখিয়াছিলেন, আধুনিক য়ুরোপীয়গণ কুলকে জাতিতে

ডুবাইতে শিখিয়াছেন, জাতিকে মানবসমষ্টিতে ডুবান এখন তাঁহাদের মধ্যে কঠিন আদর্শ বলিয়া প্রচারিত; টলষ্টয় ইত্যাদি মনীষীগণ এবং সোশ্যালিষ্ট, এনার্কিষ্ট ইত্যাদি নব আদর্শের অনুমোদক দল এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত য়ুরোপের দৌড়। তাঁহারা অবিদ্যার উপাসক, প্রকৃত বিদ্যা অবগত নহেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে বিদ্যামুপাসতে।

ভারতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই মনীষীগণ আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন অবিদ্যার পঞ্চপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ভগবান আছেন, তাঁহাকে না জানিতে পারিলে অবিদ্যাও জ্ঞাত হয় না, আয়ত্ত হয় না। অতএব কেবল পরকে আত্মবৎ না দেখিয়া আত্মবৎ পরদেহেষু অর্থাৎ নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে সমানভাবে ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন। নিজের উৎকর্ষ করিব, নিজের উৎকর্ষে পরিবারের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; পরিবারের উৎকর্ষ করিব, পরিবারের উৎকর্ষে কুলের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; জাতির উৎকর্ষ করিব, জাতির উৎকর্ষে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হইবে; এই জ্ঞান আর্য্য সামাজিক ব্যবস্থার ও আর্য্য শিক্ষার মূলে নিহিত। ব্যক্তিগত ত্যাগ আর্য্যের মজ্জাগত অভ্যাস, পরিবারের জন্য ত্যাগ, কুলের জন্য ত্যাগ, সমাজের জন্য ত্যাগ, মানবজাতির জন্য ত্যাগ, ভগবানের জন্য ত্যাগ। আমাদের শিক্ষায় যে দোষ বা ন্যূনতা লক্ষিত হয়, সেই দোষ কয়েকটী ঐতিহাসিক কারণের ফল, যেমন, জাতিকে সমাজের মধ্যে দেখি, সমাজের হিতে ব্যক্তির ও পরিবারের হিত ডুবাইয়া থাকি, কিন্তু জাতির রাজনীতিক জীবনবিকাশ আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্গত মুখ্য অঙ্গ বলিয়া গৃহীত ছিল না। পাশ্চাত্য হইতে এই শিক্ষা আমদানী করিতে হইল। অথচ আমাদেরও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে, মহাভারতে, গীতায়, রাজপুতানার ইতিহাসে, রামদাসের দাসবোধে এই শিক্ষা আমাদের স্বদেশেই ছিল। অতিরিক্ত বিদ্যা-উপাসনায়, অবিদ্যাভয়ে আমরা সেই শিক্ষা বিকাশ করিতে পারি নাই, সেই দোষে তমাভিভূত হইয়া জাতিধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া কঠিন দাসত্বে, দুঃখে, অজ্ঞানে পড়িলাম, অবিদ্যাও আয়ত্ত করিতে পারি নাই, বিদ্যাও হারাইতে বসিয়াছিলাম। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য

কুল ও জাতি মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশে ভিন্ন হয়, প্রাচীনকালে সেই ভিন্নতা ভারতে ও অন্য দেশেও এত পরিস্ফুট হয় নাই। কয়েকটী বড় বড় কুলের

সমাবেশে একটী জাতি হইয়া দাঁড়াইত। এই ভিন্ন ভিন্ন কুল হয় এক পূর্ব্বপুরুষের বংশধর, নয় ভিন্ন-বংশজাত হইলেও প্রীতিসংস্থাপনে এক বংশজাত বলিয়া গৃহীত। সমস্ত ভারত এক বড় জাতি হয় নাই, কিন্তু যে বড় বড় জাতি সমস্ত দেশ ছাইয়া বিরাজ করিত, তাহাদের মধ্যে এক সভ্যতা, এক ধর্ম্ম, এক সংস্কৃত ভাষা এবং বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। তথাপি প্রাচীনকাল হইতে একত্বের চেষ্টা হইয়া আসিয়াছিল, কখনও কুরু, কখনও পাঞ্চাল, কখনও কোশল, কখনও মগধ জাতি দেশের নেতা বা সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া সাম্রাজ্য করিত, কিন্তু প্রাচীন কুলধর্ম্ম ও কুলের স্বাধীনতাপ্রিয়তা একত্বের এমন প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিত যে সেই চেষ্টা কখন চিরকাল টিকিতে পারে নাই। ভারতে এই একত্বের চেষ্টা, অসপত্ন সাম্রাজ্যের চেষ্টা পুণ্যকর্ম্ম এবং রাজার কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। এই একত্বের স্রোত এত প্রবল হইয়াছিল যে চেদিরাজ শিশুপালের ন্যায় তেজস্বী ও দুরন্ত ক্ষত্রিয়ও যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যস্থাপনে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এইরূপ একত্ব, সাম্রাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসন্ধ পূর্ব্বেই এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি অধর্ম্ম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা বিফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যের প্রধান বাধা গর্ব্বিত ও তেজস্বী কুরুবংশ। কুরুজাতি অনেকদিন হইতে ভারতের নেতৃস্থানীয় জাতি ছিল, ইংরাজিতে যাহাকে hegemony বলে অর্থাৎ অনেক সমান স্বাধীন জাতির মধ্যে প্রধানত্ব ও নেতৃত্ব, তাহাতে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল। যতদিন এই জাতির বল ও গর্ব্ব অক্ষুণ্ণভাবে থাকিবে, ভারতে কখন একত্ব স্থাপিত হইবে না, শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। অতএব তিনি কুরুজাতির ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্যে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বিস্মৃত হন নাই; যাহা ধর্ম্মতঃ কাহারও প্রাপ্য, তাহাতে তাহাকে বঞ্চিত করা অধর্ম্ম বলিয়া কুরুজাতির যে ন্যায়তঃ রাজা ও প্রধান, সেই যুধিষ্ঠিরকে ভাবী সম্রাটপদে নিযুক্ত করিবার জন্য মনোনীত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম ধার্ম্মিক, সমর্থ হইয়াও স্নেহের বশে নিজের প্রিয় যাদবকুলকে কুরুজাতির স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই, পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবহেলা করিয়া নিজ প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু কেবল বয়স বা পূর্ব্ব অধিকার দেখিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়, গুণ ও সামর্থ্যও দেখিতে হয়। রাজা যুধিষ্ঠির যদি অধার্ম্মিক,

অত্যাচারী বা অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য পাত্রকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইতেন। যুধিষ্ঠির যেমন বংশক্রমে, ন্যায্য অধিকারে ও দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মে সম্রাট হইবার উপযুক্ত, তেমনই গুণেও সেই পদের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা তেজস্বী ও প্রতিভাবান অনেক বড় বড় বীর নৃপতি ছিলেন, কিন্তু কেবল বলে ও প্রতিভায় কেহ রাজ্যের অধিকারী হন না। রাজা ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, প্রজারঞ্জন করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। প্রথম দুই গুণে যুধিষ্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধর্ম্মপুত্র, তিনি দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্ম্মা, প্রজার অতীব প্রিয়। শেষোক্ত আবশ্যক গুণে তাঁহার যে ন্যূনতা ছিল, তাঁহার বীর ভ্রাতৃদ্বয় ভীম ও অর্জ্জুন তাহা পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের তুল্য পরাক্রমী রাজা বা বীরপুরুষ সমকালীন ভারতে ছিলেন না। অতএব জরাসন্ধবধে কণ্টক উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির দেশের প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন এবং দেশের সম্রাট হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিক ও রাজনীতিবিদ্। দেশের ধর্ম্ম, দেশের প্রণালী, দেশের সামাজিক নিয়মের ভিতরে কর্ম্ম করিয়া যদি তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ধর্ম্মের হানি, সেই প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ, সেই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন কেন? বিনা কারণে এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব করা দেশের অহিতকর হয়। সেই হেতু প্রথমে পুরাতন প্রণালী রক্ষা করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু দেশের প্রাচীন প্রাণালীর এই দোষ ছিল যে তাহাতে চেষ্টা সফল হইলেও সে ফল স্থায়ী হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা ছিল। যাঁহার সামরিক বলবৃদ্ধি আছে, তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার বংশধর ক্ষীণতেজ হইবামাত্র সেই মুকুট মস্তক হইতে আপনি খসিয়া পড়ে। যে তেজস্বী বীরজাতিসকল তাঁহার পিতার বা পিতামহের বশ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিজয়ী পুত্রের বা পৌত্রের অধীনতা স্বীকার করিবেন কেন? বংশগত অধিকার নহে, রাজসূয় যজ্ঞই অর্থাৎ অসাধারণ বলবীর্য্য সেই সাম্রাজ্যের মূল, যাঁহার অধিক বলবীর্য্য তিনিই যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইবেন। অতএব সাম্রাজ্যের কোন স্থায়িত্ব হইবার আশা ছিল না, অল্পকাল প্রধানত্ব বা hegemonyই হইতে পারে। এই প্রথার আর একটী দোষ এই ছিল যে, নবসম্রাটের অকস্মাৎ বলবৃদ্ধি ও প্রধানত্বলাভে দেশের বলদৃপ্ত অসহিষ্ণু তেজস্বী ক্ষত্রিয়গণের হৃদয়ে ঈর্ষ্যাবহ্নি প্রজ্বলিত হয়; ইনি প্রধান হইবেন কেন, আমরা কেন হইব না, এই বিচার সহজে

মনের মধ্যে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। যুধিষ্ঠিরের নিজকুলের ক্ষত্রিয়গণ এই ঈর্ষ্যায় তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, তাঁহার পিতৃব্যের সন্তানগণ এই ঈর্ষ্যার উপর নির্ভর করিয়া কৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিলেন। দেশের প্রণালীর দোষ অল্পদিনেই ব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধার্ম্মিক তেমনই রাজনীতিবিদ্। তিনি কখনও সদোষ, অহিতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি তাঁহার যুগের প্রধান বিপ্লবকারী। রাজা ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিবার সময় সমকালীন পুরাতন মতের অনেক ভারতবাসীর আক্রোশ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচালিত যাদবকুল কখনও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বা ধর্ম্মকে বিকৃত করিতে কুণ্ঠিত হন না, যে কৃষ্ণের পরামর্শে কার্য্য করিবে, সেই নিশ্চয় অবিলম্বে পাপে পতিত হইবে। কেন না, পুরাতন রীতিতে আসক্ত রক্ষণশীলের মতে নূতন প্রয়াসই পাপ। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পতনে বুঝিলেন — বুঝিলেন কেন, তিনি ভগবান, পূর্ব্বে জানিতেন, — যে, দ্বাপরযুগের উপযোগী প্রথা কলিতে কখনও রক্ষণীয় নহে। অতএব তিনি আর সেইরূপ চেষ্টা করিলেন না, কলির উচিত ভেদদণ্ড প্রধান রাজনীতি অনুসরণ করিয়া গর্ব্বিত দৃপ্ত ক্ষত্রিয় জাতির বল নাশে ভাবী সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি কুরুদের পুরাতন সমকক্ষ শত্রু পাঞ্চালজাতিকে কুরুধ্বংসে প্রবৃত্ত করিলেন, যত জাতি কুরুদের বিদ্বেষে যুধিষ্ঠিরের প্রেমে বা ধর্ম্মরাজ্য ও একত্বের আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সকলকে সেই পক্ষে আকর্ষণ করিলেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করাইলেন। যে সন্ধির চেষ্টা হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আস্থা ছিল না, তিনি জানিতেন সন্ধির সম্ভাবনা নাই, সন্ধি স্থাপিত হইলেও সে স্থায়ী হইতে পারে না, তথাপি ধর্ম্মের খাতিরে ও রাজনীতির খাতিরে তিনি সন্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযুদ্ধের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বিজেতা, দিব্যশক্তিপ্রণোদিত মহারথী অর্জ্জুন। অর্জ্জুন শস্ত্রত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক পরিশ্রম পণ্ড হইত, ভারতের একত্বও সাধিত হইত না, দেশের ভবিষ্যতে অবিলম্বে ঘোর কুফল ফলিত।

ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ

অর্জ্জুনের সমস্ত যুক্তি কুলের হিত অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজিত, জাতির হিতচিন্তা স্নেহবশে তাঁহার মন হইতে অপসারিত হইয়াছে। তিনি কুরুবংশের হিত ভাবিয়া ভারতের হিত বিস্মৃত হইয়াছেন, অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধ-পরিকর হইতেছেন। স্বার্থের জন্য ভ্রাতৃবধ মহাপাপ, এ কথা সকলে জানে, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেমের বশে জাতীয় অনর্থ সম্পাদনে সহায় হওয়া, জাতীয় হিতসাধনে বিমুখ হওয়া, এই পাপ গুরুতর। অর্জ্জুন যদি শস্ত্রত্যাগ করেন, অধর্ম্মের জয় হইবে, দুর্য্যোধন ভারতে প্রধান নৃপতি ও সমস্ত দেশের নেতা হইয়া জাতীয় চরিত্র ও ক্ষত্রিয়কুলের আচরণ স্বীয় কুদৃষ্টান্তে কলুষিত করিবেন, ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত কুলসকল স্বার্থ, ঈর্ষ্যা ও বিরোধপ্রিয়তার প্রেরণায় পরস্পরকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইবে, দেশকে একত্রিত, নিয়ন্ত্রিত ও শক্তির সমাবেশে সুরক্ষিত করিবার কোন অসপত্ন ধর্ম্ম-প্রণোদিত রাজশক্তি থাকিবে না, এই অবস্থায় যে বিদেশী আক্রমণ তখনও রুদ্ধ সমুদ্রের ন্যায় ভারতের উপর পড়িয়া প্লাবিত করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, সে অসময়ে আসিয়া আর্য্যসভ্যতা ধ্বংস করিয়া জগতে ভাবী হিতের আশা নির্ম্মূল করিত। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাশে দুই সহস্র বর্ষ পরে ভারতে যে রাজনীতিক উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তখনই আরম্ভ হইত।

লোকে বলে অর্জ্জুন যে অনিষ্টের ভয়ে এই আপত্তি করিয়াছিলেন, সত্য সত্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে সেই অনিষ্ট ফলিল। ভ্রাতৃবধ, কুলনাশ, জাতিনাশ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কলি প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ। এই যুদ্ধে ভীষণ ভ্রাতৃবধ হইল, ইহা সত্য। জিজ্ঞাস্য এই, আর কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইত? এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থনার বিফলতা জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি পঞ্চ গ্রামও ফিরিয়া পাইলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেন, সেইটুকু পদ রাখিবার স্থল পাইলেও শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের দৃঢ়নিশ্চয় ছিল, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দিবেন না। যখন সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ফলের উপর নির্ভর করে, সেই যুদ্ধে ভ্রাতৃবধ হইবে বলিয়া মহৎ কর্ম্মে ক্ষান্ত হওয়ায় অধর্ম্ম হয়। পরিবারের হিত জাতির হিতে, জগতের হিতে ডুবাইতে হয়; ভ্রাতৃস্নেহে, পারিবারিক ভালবাসার মোহে কোটী কোটী লোকের সর্ব্বনাশ করা চলে না, কোটী কোটী

লোকের ভাবী সুখ বা দুঃখমোচন বিনষ্ট করা চলে না, তাহাতে ব্যক্তির ও কুলের নরকপ্রাপ্তি হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল, তাহাও সত্য কথা। এই যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ লোপ পাইল। কিন্তু কুরুজাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরুধ্বংসে ক্ষতি না হইয়া লাভই হইয়াছে। যেমন পারিবারিক ভালবাসার মায়া আছে, তেমনই কুলের উপর মায়া আছে। দেশভাইকে কিছু বলিব না, দেশবাসীর সঙ্গে বিরোধ করিব না, অনিষ্ট করিলেও, আততায়ী হইলেও, দেশের সর্ব্বনাশ করিলেও তিনি ভাই, স্নেহের পাত্র, নীরবে সহ্য করিব, আমাদের মধ্যে যে বৈষ্ণবী মায়া-প্রসূত অধর্ম্ম ধর্ম্মের ভান করিয়া অনেকের বুদ্ধিভ্রংশ করে, তাহা এই কুলের মায়ার মোহে উৎপন্ন। বিনা কারণে বা স্বার্থের জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যকতার অভাবে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ ও কলহ করা অধর্ম্ম। কিন্তু যে দেশভাই সকলের মাকে প্রাণে বধ করিতে বা তাঁহার অনিষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার দৌরাত্ম্য নীরবে সহ্য করিয়া সেই মাতৃহত্যা বা অনিষ্টাচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া আরও গুরুতর পাতক। শিবাজী যখন মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক দেশভাইকে সংহার করিতে গেলেন, তখন যদি কেহ বলিতেন, আহা! কি কর, ইহারা দেশভাই, নীরবে সহ্য কর, মোগল মহারাষ্ট্রদেশকে অধিকার করে করুক, মারাঠায় মারাঠায় প্রেম থাকিলেই হয়, — কথাটী কি নিতান্ত হাস্যকর বোধ হইত না? আমেরিকানরা যখন দাসত্বপ্রথা উঠাইবার জন্য দেশে বিরোধসৃষ্টি ও অন্তঃস্থ যুদ্ধসৃষ্টি করিয়া সহস্র সহস্র দেশ-ভাইয়ের প্রাণসংহার করিলেন, তাঁহারা কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন? এমন হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ, দেশভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতির হিত ও জগতের হিতের একমাত্র উপায় হয়। ইহাতে কুলনাশের আশঙ্কা যদি হয়, তাহা হইলেও জাতির হিত ও জগতের হিতসাধনে ক্ষান্ত হইতে পারি না। অবশ্য যদি সেই কুলের রক্ষা জাতির হিতের জন্য আবশ্যক হয়, সমস্যা জটিল হয়। মহাভারতের যুগে ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সকলে কুলকেই মনুষ্যজাতির কেন্দ্র বলিয়া জানিত। সেইজন্যই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যাঁহারা পুরাতন বিদ্যার আকর ছিলেন, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ধর্ম্ম পাণ্ডবদের দিকে, জানিতেন যে মহৎ সাম্রাজ্যসংস্থাপনে সমস্ত ভারতকে এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিতেন যে কুলই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও জাতির কেন্দ্র, কুলনাশে ধর্ম্মরক্ষা ও জাতিসংস্থাপন অসম্ভব। অর্জ্জুনও সেই ভ্রমে পতিত হইলেন।

এই যুগে জাতিই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, মানবসমাজের কেন্দ্র। জাতিরক্ষা এই যুগের প্রধান ধর্ম্ম, জাতিনাশ এই যুগের অমার্জ্জনীয় মহাপাতক। কিন্তু এমন যুগ আসিতেও পারে যখন এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন হয়ত জগতের বড় বড় জ্ঞানী ও কর্ম্মী জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্লবকারী হইয়া নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া জগতের হিতসাধন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল

প্রথম কৃপার আবেশে অর্জ্জুন কুলনাশের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন, কেন না, এই বৃহৎ সৈন্যসমাবেশ দর্শনে কুলের চিন্তা, জাতির চিন্তা আপনিই মনে উঠে। বলা হইয়াছে, কুলের হিতচিন্তা সেইকালের ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন জাতির হিতচিন্তা আধুনিক মনুষ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কুলনাশে জাতির প্রতিষ্ঠা নাশ হইবে, এই আশঙ্কা কি অমূলক ছিল? অনেকে বলে, অর্জ্জুন যাহা ভয় করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ভারতের অবনতি ও দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মূল কারণ। তেজস্বী ক্ষত্রিয়বংশের লোপে, ক্ষত্রতেজের হ্রাসে ভারতের বিষম অমঙ্গল হইয়াছে। একজন বিখ্যাত বিদেশী মহিলা, যাঁহার শ্রীচরণে অনেক হিন্দু এখন শিষ্যভাবে আনতশির, এই বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে ক্ষত্রিয়নাশে ইংরাজ-সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম করাই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের ধারণা, যাঁহারা এইরূপ অসংলগ্ন কথা বলেন, তাঁহারা বিষয়টী না তলাইয়া অতি নগণ্য রাজনীতিক তত্ত্বের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির দোষ দেখাইতেছেন। এই রাজনীতিক তত্ত্ব ম্লেচ্ছবিদ্যা, অনার্য্য চিন্তাপ্রণালী-সম্ভূত। অনার্য্যগণ আসুরিক বলে বলীয়ান, সেই বলকে স্বাধীনতা ও জাতীয় মহত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া জানেন।

জাতীয় মহত্ত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, চতুর্ব্বর্ণের চতুর্ব্বিধ তেজই সেই মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। সাত্ত্বিক ব্রহ্মতেজ রাজসিক ক্ষত্রতেজকে জ্ঞান, বিনয় ও পরহিতচিন্তার মধুর সঞ্জীবনী সুধায় জীবিত করিয়া রাখে, ক্ষত্রতেজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। ক্ষত্রতেজরহিত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শূদ্রত্বের নিকৃষ্ট গুণসকলকে আশ্রয় দেয়, অতএব যে দেশে ক্ষত্রিয় নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ। যদি ক্ষত্রিয়বংশের লোপ হয়, নূতন ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্ত্তব্য। ব্রহ্মতেজপরিত্যক্ত ক্ষত্রতেজ দুর্দ্দান্ত উদ্দাম

আসুরিক বলে পরিণত হইয়া প্রথম পরহিত বিনাশ করিতে চেষ্টিত হয়, শেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। রোমান কবি যথার্থ বলিয়াছেন, অসুরগণ স্বীয় বলাতিরেকে পতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। সত্ত্ব রজঃকে সৃষ্টি করিবে, রজঃ সত্ত্বকে রক্ষা করিবে, সাত্ত্বিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গল সম্ভব। সত্ত্ব যদি রজঃকে গ্রাস করে, রজঃ যদি সত্ত্বকে গ্রাস করে, তমঃ প্রাদুর্ভাবে বিজয়ী গুণ স্বয়ং পরাজিত হয়, তমোগুণের রাজ্য হয়। ব্রাহ্মণ কখনও রাজা হইতে পারে না, ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইলে শূদ্র রাজা হইবে, ব্রাহ্মণ তামসিক হইয়া অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া শূদ্রের দাস হইবে, আধ্যাত্মিক ভাব নিশ্চেষ্টতাকে পোষণ করিবে, স্বয়ং ম্লান হইয়া ধর্ম্মের অবনতির কারণ হইবে। নিঃক্ষত্রিয় শূদ্রচালিত জাতির দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভারতের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে আসুরিক বলের প্রভাবে ক্ষণিক উত্তেজনায় শক্তিসঞ্চার ও মহত্ত্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু শীঘ্র হয় দুর্ব্বলতা, গ্লানি ও শক্তিক্ষয় হইয়া দেশ অবসন্ন হইয়া পড়ে, নয় রাজসিক বিলাস, দম্ভ ও স্বার্থের বৃদ্ধিতে জাতি অনুপযুক্ত হইয়া মহত্ত্বরক্ষায় অসমর্থ হয়, নয় অন্তর্বিরোধে, দুর্নীতিতে, অত্যাচারে দেশ ছারখার হইয়া শত্রুর সহজলভ্য শিকার হয়। ভারতের ও য়ুরোপের ইতিহাসে এই সকল পরিণামের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মহাভারতের সময়ে আসুরিক বলের ভারে পৃথিবী অস্থির হইয়াছিল। ভারতের এমন তেজস্বী পরাক্রমশালী প্রচণ্ড ক্ষত্রিয়তেজের বিস্তার পূর্ব্বেও হয় নাই, পরেও হয় নাই, কিন্তু ভীষণ বলের সদুপযোগ হইবার সম্ভাবনা অতিশয় কম ছিল। যাঁহারা এই বলের আধার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অসুরপ্রকৃতির — অহঙ্কার, দর্প, স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের মজ্জাগত ছিল। যদি শ্রীকৃষ্ণ এই বল বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে যে তিন প্রকার পরিণাম বর্ণনা করিয়াছি, তাহার একটী না একটী নিশ্চয় ঘটিত। ভারত অসময়ে ম্লেচ্ছের হাতে পড়িত। মনে রাখা উচিত পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ঘটিয়াছে, আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে ম্লেচ্ছদের প্রথম সফল আক্রমণ সিন্ধুনদীর অপর পার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছে। অতএব অর্জ্জুন-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-রাজ্য এতদিন ব্রহ্মতেজ-অনুপ্রাণিত ক্ষত্রতেজের প্রভাবে দেশকে রক্ষা করিয়াছে। তখনও সঞ্চিত ক্ষত্রতেজ দেশে এত ছিল যে তাহার ভগ্নাংশই দুই সহস্র বর্ষ দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্যমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রম, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ, রাজসিংহ, প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ইত্যাদি মহাপুরুষ সেই ক্ষত্রতেজের বলে দেশের

দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। সেই দিনই গুজরাটযুদ্ধে ও লক্ষ্মীবাইয়ের চিতায় তাহার শেষ স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক কার্য্যের সুফল ও পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেল, ভারতকে, জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য আবার পূর্ণাবতারের আবশ্যকতা হইল। সেই অবতার আবার লুপ্ত ব্রহ্মতেজ জাগাইয়া গেলেন, সেই ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজ সৃষ্টি করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্রতেজ কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রে নির্ব্বাপিত করেন নাই, বরং আসুরিক বল বিনাশ করিয়া ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই রক্ষা করিয়াছেন। আসুরিক বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়বংশের সংহারে উদ্দাম রজঃ-শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, ইহা সত্য। এইরূপ মহাবিপ্লব, অন্তর্বিরোধকে উৎকট ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া নিগৃহীত করা, উদ্দাম ক্ষত্রিয়কুল সংহার সর্ব্বদা অনিষ্টকর নয়। অন্তর্বিরোধে রোমান ক্ষত্রিয়কুলনাশে ও রাজতন্ত্র-স্থাপনে রোমের বিরাট সাম্রাজ্য অকালবিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে শ্বেত ও রক্ত গোলাপের অন্তর্বিরোধে ক্ষত্রিয়কুলনাশে চতুর্থ এডওয়ার্ড, অষ্টম হেন্‌রি ও রাণী এলিজাবেথ সুরক্ষিত পরাক্রমশালী বিশ্ববিজয়ী আধুনিক ইংলণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতও সেইরূপে রক্ষা পাইল।

কলিযুগে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু অবনতি আনয়ন করিবার জন্য ভগবান কখন অবতীর্ণ হন নাই। ধর্ম্মরক্ষা, বিশ্বরক্ষা, লোকরক্ষার জন্য অবতার। বিশেষতঃ কলিযুগেই ভগবান পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হন, তাহার কারণ, কলিতে মানুষের অবনতির অধিক ভয়, অধর্ম্মবৃদ্ধি স্বাভাবিক, অতএব মানবজাতির রক্ষার জন্য, অধর্ম্মনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, কলির গতি রুদ্ধ করিবার জন্য এই যুগে পুনঃ পুনঃ অবতার হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, কলির রাজ্য আরম্ভ হইবার সময় হইয়াছিল, তাঁহারই আবির্ভাবে ভীত হইয়া কলি নিজের রাজ্যে পদস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারই প্রসাদে পরীক্ষিত কলিকে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়া তাঁহারই যুগে তাঁহার একাধিপত্য স্থগিত করিয়া রাখিলেন। যে কলিযুগের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কলির সঙ্গে মানবের ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে ও চলিবে, সেই সংগ্রামের সহায় ও নায়করূপে ভগবানের অবতার ও বিভূতি কলিতে ঘন ঘন আসেন, সেই সংগ্রামের উপযোগী ব্রহ্মতেজ, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা ও রক্ষা করিতে ভগবান কলির মুখে মানবশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের রক্ষা মানবকল্যাণের ভিত্তি ও আশাস্থল। ভগবান কুরুক্ষেত্রে ভারতের রক্ষা করিয়াছেন। সেই রক্তসমুদ্রে নূতন জগতের লীলাপদ্মে কালরূপী বিরাটপুরুষ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন, —

মধুসূদন অর্জ্জুনের কৃপার আবেশ, অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় ও বিষণ্ণভাব দেখিয়া তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥২॥

শ্রীভগবান বলিলেন, —

"হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কট সময়ে এই অনার্য্যের আদৃত স্বর্গপথরোধক অকীর্ত্তি-কর মনের মলিনতা কোথা হইতে উপস্থিত?

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥৩॥

"হে পৃথাতনয়! হে শত্রুদমনে সমর্থ! ক্লীবত্ব আশ্রয় করিও না, ইহা তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই ক্ষুদ্র মনের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর, ওঠ।"

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জ্জুন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছে, বিষাদ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন করিবার জন্য অন্তর্য্যামী তাঁহার প্রিয় সখাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃকে দূর করে। তিনি বলিলেন, দেখ, ইহা তোমার স্বপক্ষের সঙ্কটকাল, এখন

যদি তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর, তাহাদের সম্পূর্ণ বিপদ ও বিনাশের সম্ভাবনা আছে। রণক্ষেত্রে স্বপক্ষত্যাগ তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের মনে উঠিবার কথা নয়, কোথা হইতে হঠাৎ এই দুর্ম্মতি? তোমার ভাব দুর্ব্বলতাপূর্ণ, পাপপূর্ণ। অনার্য্যগণ এই ভাব প্রশংসা করে, তাহার বশ হয়, কিন্তু তাহা আর্য্যের অনুচিত, তাহাতে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্ন হয় এবং ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তির লোপ হয়। তাহার পরে আরও মর্ম্মভেদী তিরস্কার করিলেন। এই ভাব ক্লীবোচিত, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি জেতা, তুমি কুন্তির পুত্র, তুমি এইরূপ কথা বল? এই প্রাণের দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর, ওঠ, তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদ্যোগী হও।

কৃপা ও দয়া

কৃপা ও দয়া স্বতন্ত্র ভাব, এমন কি কৃপা দয়ার বিরোধী ভাবও হইতে পারে। আমরা দয়ার বশে জগতের কল্যাণ করি, মানুষের দুঃখ, জাতির দুঃখ, পরের দুঃখ মোচন করি। যদি নিজের দুঃখ বা ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ সহ্য না করিতে পারিয়া সেই কল্যাণসাধনে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার দয়া নাই, কৃপারই আবেশ হইয়াছে। সমস্ত মানবজাতির বা দেশের দুঃখমোচন করিতে উঠিলাম, সেই ভাব দয়ার। রক্তপাতের ভয়ে, প্রাণীহিংসার ভয়ে সেই পুণ্যকার্য্যে বিরত হইলাম, জগতের, জাতির দুঃখের চিরস্থায়িতায় সায় দিলাম, এই ভাব কৃপার। লোকের দুঃখে দুঃখী হইয়া যে দুঃখমোচনের প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে দয়া বলে। পরের দুঃখচিন্তায় বা দুঃখদর্শনে কাতর হওয়া, এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, কৃপা। দয়া বলবানের ধর্ম্ম, কৃপা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। দয়ার আবেশে বুদ্ধদেব স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, বন্ধুবান্ধবকে দুঃখী ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া জগতের দুঃখমোচন করিতে নির্গত হইলেন। তীব্র দয়ার আবেশে উন্মত্ত কালী জগৎময় অসুর সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্তপ্লাবিত করিয়া সকলের দুঃখমোচন করিলেন। অর্জ্জুন কৃপার আবেশে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই ভাব অনার্য্য-প্রশংসিত, অনার্য্য-আচরিত। আর্য্যশিক্ষা উদার, বীরোচিত, দেবতার শিক্ষা। অনার্য্য মোহে পড়িয়া অনুদার ভাবকে ধর্ম্ম বলিয়া উদার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। অনার্য্য রাজসিকভাবে ভাবান্বিত হইয়া নিজের, প্রিয়জনের, নিজ পরিবারের বা কুলের হিত দেখে, বিরাট কল্যাণ দেখে না, কৃপায় ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া নিজেকে পুণ্যবান বলিয়া গর্ব্ব করে, কঠোরব্রতী আর্য্যকে নিষ্ঠুর ও অধার্ম্মিক

বলে। অনার্য্য তামসিক মোহে মুগ্ধ হইয়া অপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি বলে, সকাম পুণ্যপ্রিয়তাকে ধর্ম্মনীতির উর্ধ্বতম আসন প্রদান করে। দয়া আর্য্যের ভাব। কৃপা অনার্য্যের ভাব।

পুরুষ দয়ার বশে বীরভাবে পরের অমঙ্গল ও দুঃখকে বিনাশ করিবার জন্য অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নারী দয়ার বশে পরের দুঃখলাঘবের জন্যে শুশ্রূষায়, যত্নে ও পরহিতচেষ্টায় সমস্ত প্রাণ ও শক্তি ঢালিয়া দেয়। যে কৃপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয়, কাঁদিতে বসিয়া ভাবে আমার কর্ত্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান, — সে ক্লীব। এই ভাব ক্ষুদ্র, এই ভাব দুর্ব্বলতা। বিষাদ কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে বিষাদকে আশ্রয় দেয়, সে পাপকে আশ্রয় দেয়। এই চিত্তমলিনতা, এই অশুদ্ধ ও দুর্ব্বলভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উদ্যোগী হইয়া কর্ত্তব্যপালনে জগতের রক্ষা, ধর্ম্মের রক্ষা, পৃথিবীর ভার লাঘব করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মর্ম্ম।

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥৪॥

অর্জ্জুন বলিলেন, —

"হে মধুসূদন, হে শত্রুনাশকারী, আমি কিরূপে ভীষ্ম ও দ্রোণকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়া সেই পূজনীয় গুরুজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥৫॥

এই উদারচেতা গুরুজনকে বধ না করিয়া পৃথিবীতে ভিখারীর অবস্থা ভোগ করা শ্রেয়ঃ। গুরুজনকে যদি বধ করি, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হারাইয়া কেবল অর্থ ও কাম ভোগ করিব, সেও রুধিরাক্ত বিষয়ভোগ এবং পৃথিবীতেই ভোগ্য, প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥৬॥

সেই হেতু আমাদের জয় বা পরাজয়, কোন্‌টী অধিক প্রার্থনীয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহাদিগকে বধ করিলে আমাদের জীবিত থাকিবার কোন ইচ্ছা থাকিবে না, তাঁহারাই বিপক্ষীয় সৈন্যের অগ্রভাগে উপস্থিত, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সৈন্যনায়ক।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥৭॥

দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয়স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি বিমূঢ়, সেইজন্য তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, তুমি আমাকে কিসেতে শ্রেয়ঃ হইবে নিশ্চিতভাবে তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার নিকট শরণ লইলাম, আমাকে শিক্ষা দাও।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥৮॥

কেন না, পৃথিবীতে অসপত্ন রাজ্য এবং দেবগণের উপরও আধিপত্য লাভ করিলেও এই শোক আমার সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ শোষণ করিয়া লইবে, সেই শোকাপনোদনের কোন উপায় আমি দেখি না।”

অর্জ্জুনের শিক্ষাপ্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উদ্দেশ্য অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন, তিনি রাজনীতিক আপত্তি উত্থাপন করিতে বিরত হইলেন, কিন্তু আর যে যে আপত্তি ছিল, তাহার কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষার্থে শরণাগত হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমি স্বীকার করি আমি ক্ষত্রিয়, কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া মহৎ কার্য্যে বিরত হওয়া আমার পক্ষে ক্লীবত্বসূচক, অকীর্ত্তিজনক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু মনও মানে না, প্রাণও মানে না। মন বলে, গুরুজন হত্যা মহাপাপ, নিজ সুখের জন্য গুরুজনকে হত্যা করিলে অধর্ম্মে পতিত হইয়া ধর্ম্ম, মোক্ষ, পরলোক, যাহা বাঞ্ছনীয়, সকলই যাইবে। কামনা তৃপ্ত হইবে, অর্থস্পৃহা তৃপ্ত হইবে, কিন্তু সে কয়দিন? অধর্ম্মলব্ধ ভোগ প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহার পর অনির্ব্বচনীয় দুর্গতি হয়। আর যখন ভোগ করিবে, তখন সেই ভোগের মধ্যে গুরুজনের রক্তের

আস্বাদ পাইয়া কি সুখ বা শান্তি হইবে? প্রাণ বলে, ইহারা আমার প্রিয়জন, ইহাদের হত্যা করিলে আমি আর এই জন্মে সুখভোগ করিতে পারিব না, বাঁচিতেও চাই না। তুমি যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্যভোগ দাও বা স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যভোগ দাও, আমি কিন্তু শুনিব না। যে শোক আমাকে অভিভূত করিবে, তাহা দ্বারা সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে শিথিল ও অসমর্থ হইবে, তখন তুমি কি ভোগ করিবে? আমার বিষম চিত্তের দীনতা উপস্থিত, মহান্ ক্ষত্রিয়স্বভাব সেই দীনতায় ডুবিয়া গিয়াছে। আমি তোমার নিকট শরণ লইলাম। আমাকে জ্ঞান, শক্তি, শ্রদ্ধা দাও, শ্রেয়ঃপথ দেখাইয়া রক্ষা কর।"

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়া গীতোক্ত যোগের পন্থা। ইহাকে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বলে। যিনি ভগবানকে গুরু, প্রভু, সখা, পথপ্রদর্শক বলিয়া আর সকল ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, পাপ পুণ্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার না করিয়া নিজ জ্ঞান কর্ম্ম ও সাধনার সমস্ত ভাব শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই গীতোক্ত যোগের অধিকারী। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি যদি গুরুহত্যাও করিতে বল, ইহাকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়া দাও, আমি তাহাই করিব। এই গভীর শ্রদ্ধার বলে অর্জ্জুন সমসাময়িক সকল মহাপুরুষকে অতিক্রম করিয়া গীতোক্ত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন।

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জ্জুনের দুই আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাহার পরে গুরুর ভার গ্রহণ করিয়া আসল জ্ঞান দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত আপত্তিখণ্ডন, তাহার পরে গীতোক্ত শিক্ষার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আপত্তিখণ্ডনের মধ্যে কয়েকটী অমূল্য শিক্ষা পাওয়া যায়, যাহা না বুঝিলে গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কয়েকটী কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ॥৯॥

সঞ্জয় বলিলেন, —

পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আবার সেই গোবিন্দকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না" এবং নীরব হইয়া রহিলেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ হাস্য করিয়া দুই সেনার মধ্যস্থলে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে এই উত্তর দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥১১॥

শ্রীভগবান বলিলেন, —
"যাহাদের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই, তুমি তাহাদের জন্য শোক কর, অথচ জ্ঞানীর ন্যায় তত্ত্বকথা লইয়া বাদবিবাদ করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥১২॥

ইহাও নহে যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিবৃন্দ ছিল না, ইহাও নহে যে আমরা সকলে দেহত্যাগের পরে আর থাকিব না।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥১৩॥

যেমন এই জীব-অধিষ্ঠিত দেহে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য কালের গতিতে হয়, তেমনই দেহান্তরপ্রাপ্তিও কালের গতিতে হয়, তাহাতে স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী বিমূঢ় হন না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥১৪॥

মরণ কিছুই নয়, যে বিষয়স্পর্শে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সংস্কার সৃষ্ট হয়, সেই স্পর্শসকল অনিত্য, আসে, যায়, সেইসকল অবিচলিত হইয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস কর।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥১৫॥

যে স্থিরবুদ্ধি পুরুষ এই স্পর্শসকল ভোগ করিয়াও ব্যথিত হন না, তৎসৃষ্ট সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই মৃত্যু জয় করিতে সক্ষম হন।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥১৬॥

যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব হয় না, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হয় না, তথাপি সৎ ও অসৎ দুইটীর অন্ত হয়, ইহা তত্ত্বদর্শীগণ দর্শন করিয়াছেন।

অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥১৭॥

কিন্তু যাহা এইসমস্ত দৃশ্যজগৎ নিজের মধ্যে বিস্তার করিয়াছেন, সেই আত্মার ক্ষয় হয় না, কেহ তাহার ধ্বংস করিতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥১৮॥

নিত্য দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহের অন্ত আছে, আত্মা অসীম ও অনশ্বর; অতএব, হে ভারত, যুদ্ধ কর।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥১৯॥

যিনি আত্মাকে হন্তা বলেন এবং যিনি দেহনাশে আত্মাকে নিহত বলিয়া বোঝেন, দুই জনই ভ্রান্ত, অজ্ঞ, এই আত্মা হত্যাও করে না, হতও হয় না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥২০॥

এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহার কখনও উদ্ভব হয় নাই এবং কখনও লোপ হইবে না। সে জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন, পুরাতন, দেহনাশে হত হয় না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥২১॥

যিনি ইঁহাকে নিত্য, অনশ্বর ও অক্ষয় বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কিরূপে কাহাকে হত্যা করেন বা করান?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥২২॥

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ফেলিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই রূপেই জীব জীর্ণ দেহ ফেলিয়া অন্য নূতন দেহকে আশ্রয় করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥২৩॥

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥২৪॥

আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥২৫॥

আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, বিকাররহিত। তুমি আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক করা পরিত্যাগ কর।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥২৬॥

আর যদি তুমি মনে কর যে জীব বার বার জন্মায় ও মরে, তাহা হইলেও তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥২৭॥

যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয় মরণ হয়, যাহার মরণ হয়, তাহার নিশ্চয় জন্ম হয়, অতএব যখন মৃত্যু অপরিহার্য্য পরিণাম, তাহার জন্য শোক করা অনুচিত।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥২৮॥

সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত হইয়া থাকে, মাঝে ব্যক্ত হয়, আবার অব্যক্ত হয়, এই স্বাভাবিক ক্রমে শোক করিবার কোনও কারণ নাই।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥২৯॥

আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া দেখেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা বলেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা শুনেন, কিন্তু শুনিয়াও কেহ আত্মাকে জানিতে পারেন নাই।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥৩০॥

আত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহের মধ্যে অবধ্য হইয়া থাকে, অতএব এই সকল প্রাণীর জন্য কখন শোক করা উচিত নহে।”

মৃত্যুর অসত্যতা

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসির ভাব প্রকাশ হইল, সেই হাসি রঙ্গময় অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ, — অর্জ্জুনের ভ্রমে মানবজাতির পুরাতন ভ্রম চিনিয়া অন্তর্য্যামী হাসিলেন, সেই ভ্রম শ্রীকৃষ্ণেরই মায়াপ্রসূত, জগতে অশুভ, দুঃখ ও দুর্ব্বলতা ভোগ ও সংযম দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্য তিনি মানবকে এই মায়ার বশীভূত করিয়াছেন। প্রাণের মমতা, মরণের ভয়, সুখ-দুঃখের অধীনত্ব, প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ, ইত্যাদি অজ্ঞান অর্জ্জুনের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই মানবের বুদ্ধি হইতে দূর করিয়া জগৎকে অশুভমুক্ত করিতে হইবে, সেই শুভ কার্য্যের

অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, গীতা প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। কিন্তু প্রথম অর্জ্জুনের মনে যে ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, মানবজাতির প্রতিনিধি, তাঁহাকেই গীতা প্রদর্শিত হইবে, তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র; কিন্তু মানবজাতি এখনও গীতার অর্থ গ্রহণের যোগ্য হয় নাই, অর্জ্জুনও সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যে শোক, দুঃখ ও কাতরতা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তাহা মানবজাতি কলিযুগে সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া আসিতেছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রেম আনয়ন করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম দয়া আনয়ন করিয়া, ইসলামধর্ম্ম শক্তি আনয়ন করিয়া সেই দুঃখভোগ লাঘব করিতে আসিয়াছে। আজ কলিযুগান্তর্গত প্রথম খণ্ড সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, ভগবান আবার ভারতকে, কুরুজাতির বংশধরগণকে গীতা প্রদান করিতেছেন, যদি গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সুনিশ্চিত ফল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিতের ন্যায় পাপপুণ্য বিচার করিতেছ, জীবন-মরণের তত্ত্ব বলিতেছ, জাতির কল্যাণ অকল্যাণ কিসে হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় তোমার কথার মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং তোমার প্রত্যেক কথা ঘোর অজ্ঞানপূর্ণ। স্পষ্ট কথা বল, আমার হৃদয় দুর্ব্বল, শোকে কাতর, বুদ্ধি কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ; জ্ঞানীর ভাষায় অজ্ঞের ন্যায় তর্ক করিয়া তোমার দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শোক মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যমাত্র মরণ ও বিচ্ছেদ অতি ভয়ঙ্কর, জীবন মহামূল্য, শোক অসহ্য, কর্ত্তব্য কঠোর, স্বার্থসিদ্ধি মধুর বুঝিয়া হর্ষ করে, দুঃখ করে, হাসে, কাঁদে, কিন্তু এই সকল বৃত্তিকে কেহ জ্ঞানপ্রসূত বলে না। যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ। জ্ঞানী কাহারও জন্য শোক করেন না, — না মৃত ব্যক্তির জন্য, না জীবিত ব্যক্তির জন্য। তিনি এই কথা জানেন — মরণ নাই, বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, আমরা অমর, আমরা চিরকাল এক, আমরা আনন্দের সন্তান, অমৃতের সন্তান, জীবনের মরণের সঙ্গে, সুখ দুঃখের সঙ্গে এই পৃথিবীতে লুকোচুরি খেলা করিতে আসিয়াছি — প্রকৃতির বিশাল নাট্যগৃহে হাসিকান্নার অভিনয় করিতেছি, শত্রু মিত্র সাজিয়া যুদ্ধ ও শান্তি, প্রেম ও কলহের রস আস্বাদন করিতেছি। এই যে অল্পকাল বাঁচিয়া থাকি, কাল পরশ্ব দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব জানি না, ইহা আমাদের অনন্ত ক্রীড়ার মধ্যে এক মুহূর্ত মাত্র, ক্ষণিক খেলা, কয়েকক্ষণের ভাব। আমরা ছিলাম, আমরা

আছি, আমরা থাকিব — সনাতন, নিত্য, অনশ্বর — প্রকৃতির ঈশ্বর আমরা, জীবন-মরণের কর্ত্তা, ভগবানের অংশ, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকারী। যেমন দেহের বাল্য, যৌবন, জরা, তেমনই দেহান্তরপ্রাপ্তি, — মরণ নামমাত্র, নাম শুনিয়া আমরা ভয় পাই, দুঃখিত হই, বস্তু যদি বুঝিতাম ভয়ও পাইতাম না, দুঃখিতও হইতাম না। আমরা যদি বালকের যৌবনপ্রাপ্তিকে মরণ বলিয়া কাঁদিয়া বলিতাম, আহা আমাদের সেই প্রিয় বালক কোথায় গেল, এই যুবাপুরুষ সেই বালক নহে, আমার সোনারচাঁদ কোথায় গিয়াছে — আমাদের ব্যবহারকে সকলে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞানজনিত বলিত; কেননা, এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, বালকদেহে ও যুবকদেহে একই পুরুষ বাহ্য-পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। জ্ঞানী, সাধারণ মানুষের মরণে ভয় ও মরণে দুঃখ দেখিয়া তাহার ব্যবহার ঠিক সেইভাবে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞানজনিত বলিয়া দেখেন, কেননা দেহান্তরপ্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, স্থূলদেহে ও সূক্ষ্মদেহে একই পুরুষ বাহ্য পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। অমৃতের সন্তান আমরা, কে মরে, কে মারে? মৃত্যু আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, — মৃত্যু ফাঁকা আওয়াজ, মৃত্যু ভ্রম, মৃত্যু নাই।

মাত্রা

পুরুষ অচল, প্রকৃতি চল। চল প্রকৃতির মধ্যে অচল পুরুষ অবস্থিত। প্রকৃতিস্থ পুরুষ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখে, শোনে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদ করে, স্পর্শ করে, তাহাই ভোগ করিবার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। আমরা দেখি রূপ, শুনি শব্দ, আঘ্রাণ করি গন্ধ, আস্বাদ করি রস, অনুভব করি স্পর্শ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রই ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের বিশেষ বিষয় সংস্কার। বুদ্ধির বিষয় চিন্তা। পঞ্চ তন্মাত্র এবং সংস্কার ও চিন্তা অনুভব ও ভোগ করিবার জন্য পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পর সম্ভোগ ও অনন্ত ক্রীড়া। এই ভোগ দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ নাই, পুরুষের চিরন্তন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ আছে, শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, হর্ষশোক ইত্যাদি দ্বন্দ্ব অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ করে। কামনা অশুদ্ধতার কারণ। কামীমাত্রই অশুদ্ধ, যে নিষ্কাম, সে শুদ্ধ। কামনায় রাগ ও দ্বেষ সৃষ্ট হয়, রাগদ্বেষের বশে পুরুষ বিষয়ে আসক্ত হয়, আসক্তির

ফল বন্ধন। পুরুষ বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ, এমনকি ব্যথিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হইয়াও আসক্তির অভ্যাসদোষে তাহার ক্ষোভ, ব্যথা বা যন্ত্রণার কারণ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয়।

সমভাব

শ্রীকৃষ্ণ প্রথম আত্মার নিত্যতার উল্লেখ করিয়া পরে অজ্ঞানের বন্ধন শিথিল করিবার উপায় দেখাইলেন। মাত্রা অর্থাৎ বিষয়ের নানারূপ স্পর্শ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের কারণ। এই স্পর্শসকল অনিত্য, তাহাদের আরম্ভও আছে, অন্তও আছে, অনিত্য বলিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিত্য বস্তুতে যদি আসক্ত হই, তাহার আগমনে হৃষ্ট হই, তাহার নাশে বা অভাবে দুঃখিত বা ব্যথিত হই। এই অবস্থাকে অজ্ঞান বলে। অজ্ঞানে অনশ্বর আত্মার সনাতন ভাব ও অন্বয় আনন্দ আচ্ছন্ন হয়, কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব ও বস্তুতে মত্ত হইয়া থাকি, তাহার নাশের দুঃখে শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এইরূপ অভিভূত না হইয়া যে বিষয়ের স্পর্শসকল সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিয়াও সুখ-দুঃখে, শীতোষ্ণে, প্রিয়াপ্রিয়ে, মঙ্গলামঙ্গলে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ ও শোক অনুভব না করিয়া সমানভাবে প্রফুল্লচিত্তে হাস্যমুখে গ্রহণ করিতে পারে, সে পুরুষ রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, অজ্ঞানের বন্ধন কাটিয়া সনাতন ভাব ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, — অমৃতত্বায় কল্পতে।

সমতার গুণ

এই সমতা গীতার প্রথম শিক্ষা। সমতাই গীতোক্ত সাধনের প্রতিষ্ঠা। গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় ভারত হইতে এই সমতার শিক্ষা লাভ করিয়া য়ুরোপে সমতা-বাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক এপিকুরস শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত শিক্ষার আর একদিক ধরিয়া শান্তভোগের শিক্ষা, Epicureanism বা ভোগবাদ প্রচার করিলেন। এই দুই মত, সমতাবাদ ও ভোগবাদ প্রাচীন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নৈতিক মত বলিয়া জ্ঞাত ছিল, এবং আধুনিক য়ুরোপেও নব আকার ধারণ করিয়া Puritanism ও Paganismএর চির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গীতোক্ত সাধনে সমতাবাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ ভোগ একই কথা। সমতা কারণ, শুদ্ধ ভোগ কার্য্য। সমতায়

আসক্তি মরে, রাগদ্বেষ প্রশমিত হয়, আসক্তি নাশে এবং রাগদ্বেষ প্রশমনে শুদ্ধতা জন্মায়। শুদ্ধ পুরুষের ভোগ কামনা ও আসক্তিরহিত, অতএব শুদ্ধ। ইহাতেই সমতার গুণ যে সমতার সহিত আসক্তি ও রাগদ্বেষ এক আধারে থাকিতে পারে না। সমতাই শুদ্ধির বীজ।

দুঃখজয়

গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় এই ভুল করিলেন যে তাঁহারা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা দুঃখ নিগ্রহ করিয়া, ছাপাইয়া, পদে দলিত করিয়া দুঃখজয়ের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গীতায় অন্যত্র বলিয়াছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। ভূতসকল নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, নিগ্রহে কি হইবে? দুঃখনিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক, কঠোর, প্রেমশূন্য হইয়া যায়। দুঃখে অশ্রুজল মোচন করিব না, যন্ত্রণাবোধ স্বীকার করিব না, ‘‘এ কিছু নহে’’ বলিয়া নীরবে সহ্য করিব, স্ত্রীর দুঃখ, সন্তানের দুঃখ, বন্ধুর দুঃখ, জাতির দুঃখ অবিচলিত চিত্তে দেখিব, এই ভাব বলদৃপ্ত অসুরের তপস্যা — তাহার মহত্ত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় নহে, শেষ বা চরম শিক্ষা নহে। দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় জ্ঞান, শান্তি, সমতা। শান্তভাবে সুখ-দুঃখ গ্রহণ করাই প্রকৃত পথ। প্রাণে সুখ-দুঃখের সঞ্চার বারণ করিব না, বুদ্ধি অবিচলিত করিয়া রাখিব। সমতার স্থান বুদ্ধি, চিত্ত নহে, প্রাণ নহে। বুদ্ধি সম হইলে, চিত্ত ও প্রাণ আপনিই সম হয়, অথচ প্রেম ইত্যাদি প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি শুকাইয়া যায় না, মানুষ পাথর হয় না, জড় ও অসাড় হয় না। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি — প্রেম ইত্যাদি প্রকৃতির চিরন্তন প্রবৃত্তি, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় পরব্রহ্মে লয়। প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতিবর্জ্জন অসম্ভব। যদি কোমলতা পরিত্যাগ করি, কঠোরতা হৃদয়কে অভিভূত করিবে, — যদি বাহিরে দুঃখের স্পন্দন নিষেধ করি, দুঃখ ভিতরে জমিয়া থাকিবে এবং অলক্ষিতভাবে প্রাণকে শুকাইয়া দিবে। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তপস্যায় শক্তি হইবে বটে কিন্তু এই জন্মে যাহা ছাপাইয়া রাখিলাম, পরজন্মে তাহা সর্ব্বরোধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসিবে।

বেদ ও উপনিষদ

উপনিষদ

আমাদের ধর্ম্ম অতি বিশাল ও নানা শাখাপ্রশাখা শোভিত। তাহার মূল গভীরতম জ্ঞানে আরূঢ়, তাহার শাখাগুলি কর্ম্মের অতি দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেমন গীতার অশ্বত্থবৃক্ষ, উর্ধ্বমূল ও "অবাক্ শাখঃ", তেমনই এই ধর্ম্ম জ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত, কর্ম্মপ্রেরক। নিবৃত্তি তাহার ভিত্তি, প্রবৃত্তি তাহার গৃহ-ছাদ-দেওয়াল, মুক্তি তাহার চূড়া। মানবজাতির সমস্ত জীবন এই বিশাল হিন্দুধর্ম্ম-বৃক্ষের আশ্রিত।

সকলে বলে বেদ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু অল্প লোকেই সেই প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ও মর্ম্ম অবগত আছে, প্রায়ই শাখাগ্রে বসিয়া আমরা দুই একটী সুস্বাদু নশ্বর ফলের আস্বাদে মজিয়া থাকি, মূলের কোনও সন্ধান রাখি না। আমরা শুনিয়াছি বটে যে বেদের দুই ভাগ আছে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, কিন্তু আসল কর্ম্মকাণ্ড কি বা জ্ঞানকাণ্ড কি তাহা জানি না। আমরা মোক্ষমূল্লর [Max Müller] কৃত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকিতে পারি, বা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ঋগ্বেদ কি তাহা জানি না। মোক্ষমূল্লর ও দত্ত মহাশয়ের নিকট এই জ্ঞান পাইয়াছি যে ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির বাহ্য পদার্থ বা ভূতসকলকে পূজা করিতেন, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি ইত্যাদির স্তবস্তোত্রই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সেই অনাদ্যনন্ত অপৌরুষেয় মূল জ্ঞান। আমরা ইহাই বিশ্বাস করিয়া বেদের, ঋষিদের ও হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিয়া মনে করি যে আমরা বড়ই বিদ্বান, বড়ই "আলোকপ্রাপ্ত"। আসল বেদে সত্য সত্য কি আছে, কেনই-বা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাজ্ঞানী ও মহাপুরুষগণ এই স্তবস্তোত্রগুলিকে অনাদ্যনন্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্তজ্ঞান বলিয়া মানিতেন, তাহার কোন অনুসন্ধান করি না।

উপনিষদই বা কি, তাহাও অত্যল্প লোক জানে। যখন উপনিষদের কথা বলি, আমরা প্রায়ই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ ইত্যাদি দার্শনিক ব্যাখ্যার কথা ভাবি। আসল উপনিষদে কি লেখা রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, কেন পরস্পরবিরোধী ষড়্দর্শন এই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ষড়্দর্শনের অতীত কোন্ নিগূঢ় অর্থ সেই জ্ঞানভাণ্ডারে লভ্য হয়, এই চিন্তাও করি না। শঙ্কর যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সহস্র বর্ষকাল সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, শঙ্করের ব্যাখ্যাই আমাদের বেদ, আমাদের উপনিষদ, কষ্ট করিয়া আসল উপনিষদ কে পড়ে? যদি পড়ি, শঙ্করের ব্যাখ্যার বিরোধী কোন ব্যাখ্যা দেখিলে আমরা তখনই তাহা ভুল বলিয়া প্রত্যাখ্যান

করি। অথচ উপনিষদের মধ্যে কেবল শঙ্করলব্ধ জ্ঞান নহে, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে বা হইবে, সেইগুলি আর্য্য ঋষি ও মহাযোগী অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিগূঢ় অর্থপ্রকাশক শ্লোকে নিহিত করিয়া গিয়াছেন।

উপনিষদ কি? যে অনাদ্যনন্ত গভীরতম সনাতন জ্ঞানে সনাতন ধর্ম্ম আরূঢ়-মূল, সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদ। চতুর্ব্বেদের সূক্তাংশে সেই জ্ঞান পাওয়া যায়, কিন্তু উপমাচ্ছলে স্তোত্রের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা আচ্ছাদিত, যেমন আদর্শে মানবের প্রতিমূর্ত্তি। উপনিষদ অনাচ্ছন্ন পরম জ্ঞান, আসল মনুষ্যের অনাবৃত অবয়ব। ঋগ্বেদের বক্তা ঋষিগণ ঐশ্বরিক প্রেরণায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান শব্দ ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষিগণ সাক্ষাদ্দর্শনে সেই জ্ঞানের স্বরূপ দেখিয়া অল্প ও গভীর কথায় সেই জ্ঞান ব্যক্ত করিলেন। অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি কেন, তাহার পরে যত দার্শনিক চিন্তা ও বাদ ভারতে, য়ুরোপে, আসিয়ায় সৃষ্ট হইয়াছে, Nominalism, Realism, শূন্যবাদ, ডারউয়িনের ক্রমবিকাশ, কম্‌তের Positivism, হেগেল, কান্ত, স্পিনোজা, শোপনহাওর, Utilitarianism, Hedonism, সকলই উপনিষদের ঋষিগণের সাক্ষাদ্দর্শনে দৃষ্ট ও ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র যাহা খণ্ডভাবে দৃষ্ট, সত্যের অংশমাত্র হইয়াও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচারিত, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া বিকৃতভাবে বর্ণিত, তাহা উপনিষদে সম্পূর্ণভাবে, নিজ প্রকৃত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, শুদ্ধ অভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব শঙ্করের ব্যাখ্যায় বা আর কাহারও ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ না হইয়া উপনিষদের আসল গভীর ও অখণ্ড অর্থগ্রহণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

উপনিষদের অর্থ গূঢ় স্থানে প্রবেশ করা। ঋষিগণ তর্কের বলে, বিদ্যার প্রসারে, প্রেরণার স্রোতে উপনিষদুক্ত জ্ঞানলাভ করেন নাই, যে গূঢ়স্থানে সম্যক জ্ঞানের চাবি মনের নিভৃত কক্ষে ঝুলান রহিয়াছে, যোগদ্বারা অধিকারী হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই চাবি নামাইয়া তাঁহারা অভ্রান্ত জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। সেই চাবি হস্তগত না হইলে উপনিষদের প্রকৃত অর্থ খুলিয়া যায় না। কেবল তর্কবলে উপনিষদের অর্থ করা ও নিবিড় অরণ্যে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্র মোমবাতির আলোকে নিরীক্ষণ করা একই কথা। সাক্ষাদ্দর্শনই সূর্য্যালোক, যাহা দ্বারা সমস্ত অরণ্য আলোকিত হইয়া অন্বেষণকারীর নয়নগোচর হয়। সাক্ষাদ্দর্শন যোগেই লভ্য।

পুরাণ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উপনিষদের কথা লিখিয়াছি এবং উপনিষদের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার প্রণালী দেখাইয়াছি। উপনিষদ যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ, পুরাণও প্রমাণ, শ্রুতি যেমন প্রমাণ, স্মৃতিও প্রমাণ, কিন্তু একদরের নহে। শ্রুতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে যদি স্মৃতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে স্মৃতির প্রমাণ গ্রহণীয় নহে। যাহা যোগসিদ্ধ দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত ঋষিগণ দর্শন করিয়াছেন, অন্তর্য্যামী জগদ্‌গুরু তাঁহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে শ্রবণ করাইয়াছেন, তাহাই শ্রুতি। প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যা, যাহা পুরুষপরম্পরায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই স্মৃতি। শেষোক্ত জ্ঞান অনেকের মুখে অনেকের মনে পরিবর্ত্তিত, বিকৃত হইয়াও আসিতে পারে, অবস্থান্তরে নূতন নূতন মত ও প্রয়োজনের অনুকূল নূতন আকার ধারণ করিয়া আসিতে পারে। অতএব স্মৃতি শ্রুতির ন্যায় অভ্রান্ত বলা যায় না। স্মৃতি অপৌরুষেয় নহে, মনুষ্যের সীমাবদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল মত ও বুদ্ধির সৃষ্টি।

পুরাণ স্মৃতির মধ্যে প্রধান। উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পুরাণে উপন্যাস ও রূপকাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও অভিব্যক্তি, পুরাতন সামাজিক অবস্থা, আচার, পূজা, যোগ-সাধন, চিন্তাপ্রণালীর অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন পুরাণকার প্রায় সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক; তাঁহাদের জ্ঞান ও সাধনলব্ধ উপলব্ধি তাঁহাদের রচিত পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ হিন্দুধর্ম্মের আসল গ্রন্থ, পুরাণ সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা আসল গ্রন্থের সমান হইতে পারে না। তুমি যে ব্যাখ্যা কর আমি সেই ব্যাখ্যা নাও করিতে পারি, কিন্তু আসল গ্রন্থ পরিবর্ত্তন বা অগ্রাহ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। যাহার বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে মিল হয় না, তাহা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু পুরাণের সঙ্গে মিল না হইলেও নূতন চিন্তা গৃহীত হইতে পারে। ব্যাখ্যার মূল্য ব্যাখ্যাকর্ত্তার মেধাশক্তি, জ্ঞান ও বিদ্যার উপরে নির্ভর করে। যেমন, ব্যাসদেবের রচিত পুরাণ যদি বিদ্যমান থাকিত, তাহার আদর প্রায় শ্রুতির সমান হইত; তাহার অভাবে ও লোমহর্ষণরচিত পুরাণের অভাবে যে অষ্টাদশ পুরাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে সকলের সমান আদর না করিয়া বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের ন্যায় যোগসিদ্ধ ব্যক্তির রচনাকে অধিক মূল্যবান বলিতে হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মত পণ্ডিত অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ লেখকের রচনাকে শিব বা অগ্নিপুরাণ অপেক্ষা

গভীর জ্ঞানপূর্ণ বলিয়া চিনিতে হয়। তবে ব্যাসদেবের পুরাণ যখন আধুনিক পুরাণগুলির আদিগ্রন্থ, এইগুলির মধ্যে যেটী নিকৃষ্ট তাহাতেও হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব-প্রকাশক অনেক কথা নিশ্চয় রহিয়াছে, এবং যখন নিকৃষ্ট পুরাণও জিজ্ঞাসু বা ভক্ত যোগাভ্যাসরত সাধকের লেখা, তখন রচয়িতার স্বপ্রয়াস-লব্ধ জ্ঞান ও চিন্তাও আদরণীয়।

বেদ ও উপনিষদ হইতে পুরাণকে স্বতন্ত্র করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম বলিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত লোক যে মিথ্যা ভেদ করিয়াছে, তাহা ভ্রম ও অজ্ঞানসম্ভূত। বেদ ও উপনিষদের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে বুঝায়, ব্যাখ্যা করে, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে, জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করে বলিয়া পুরাণ হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণের মধ্যে গৃহীত। যাঁহারা বেদ ও উপনিষদ ভুলিয়া পুরাণকে স্বতন্ত্র ও যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় মূল বাদ দেওয়ার ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞানকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, বেদের অর্থ লোপ পায়, পুরাণের প্রকৃত অর্থও লোপ পায়। বেদের উপর পুরাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরাণের উপযোগ করিতে হয়।

ঈশা উপনিষদ

কর্ম্মযোগের প্রধান তত্ত্ব

১। এই চল পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু চল, এই সবই দেখ যেন ঈশ্বর দ্বারা আবৃত ও আচ্ছাদিত। এই সকল ত্যাগ করিয়া ভোগ কর, কাহারও ধনের উপর লোভদৃষ্টি করিও না।

২। এই লোকে কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ, কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ বাঁচিতে ইচ্ছা কর। এইরূপ কর্ম্মযোগে — ত্যাগযুক্ত ভোগ যাহার লক্ষণ — মনুষ্যের বুদ্ধি স্বকৃত কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়া থাকে; মনুষ্য তুমি, এই ভিন্ন অন্য উপায় তোমার নাই।

৩। যে অন্ধ তিমিরাবৃত লোক সকলকে অসুর লোক বলে, যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা দেহত্যাগে সেই সকল লোকে গমন করে।

ঈশ্বর কি? তিনি পরব্রহ্ম, আত্মা

৪। যাহা এক, যাহা অচল হইয়াও মন অপেক্ষা বেগবান, দেবগণ তাহার পিছনে ছুটিয়া তাহা ধরিতে পারিলেন না। অন্য সকলে ধাবিত হয়, তাহা দাঁড়াইয়া থাকিয়াও তাহাদিগকে অতিক্রমণ করে। তাহার মধ্যে আকাশে বহমান প্রাণরূপ বায়ু জলের বিকার সকল বিহিত স্থানে স্থাপন করে।

৫। তাহা চল অথচ অচল, তাহা দূরে অথচ নিকট, তাহা এই সকলের অন্তরে স্থিত অথচ এই সকলের বাহিরে স্থিত।

সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের ফল

৬। যিনি সর্ব্বভূত আত্মার মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন, তাহার পরে কাহারও উপর দ্বেষ করেন না, কিছুতে তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হয় না।

৭। তাঁহার জ্ঞান আছে এবং সর্ব্বভূত তাঁহার চিত্তে আত্মাই বলিয়া অনুভূত হয়; সেই অবস্থায় মোহ বা শোক কিরূপে হইতে পারে? তিনি সর্ব্বত্র একত্ব দেখেন অর্থাৎ এক পরমেশ্বরকেই দেখেন।

ঈশ্বর কে?

৮। তিনিই সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়াছেন। যাহা জ্যোতির্ম্ময়, নিরাকার, দোষরহিত, যাহার স্নায়ু ইত্যাদি কিছুই নাই, যাহা শুদ্ধ, যাহাকে পাপ স্পর্শ করে না, তাহা তিনি। তিনি জ্ঞানস্বরূপ প্রাজ্ঞ, তিনি মনোময় হিরণ্যগর্ভ, তিনি সর্ব্বব্যাপী বিরাট, তিনি স্বয়ম্ভূ তুরীয়। তিনিই সনাতন কাল হইতে সকল বস্তু নিজ নিজ স্বভাব ও ধর্ম্ম অনুসারে বিধান করিয়াছেন।

বিদ্যা ও অবিদ্যার সম্বন্ধ

৯। যাহারা অবিদ্যাসেবনই করে, তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে; যাহারা বিদ্যায়ই রত, তাহারা যেন তাহা অপেক্ষাও গাঢ় তিমিরে নিমগ্ন হয়।

১০। বিদ্যায় এক ফল বিহিত, অবিদ্যায় অন্য ফল বিহিত, যে বীরপুরুষদের নিকট আমরা পরব্রহ্মের তত্ত্বব্যাখ্যা পাইয়াছি, তাঁহারাই আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন।

১১। যে বিদ্যাও জানে, অবিদ্যাও জানে, সে অবিদ্যায় মৃত্যুর পার হইয়া বিদ্যায় অমৃতত্ব ভোগ করে।

১২। যাহারা অব্যক্ত প্রকৃতিকেই উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে; যাহারা ব্যক্ত প্রকৃতিতেই রত তাহারা যেন তাহা অপেক্ষাও গাঢ় তিমিরে নিমগ্ন হয়।

১৩। জন্মেতে এক ফল বিহিত, জন্মবর্জ্জনে অন্য ফল বিহিত; যে বীরপুরুষদের নিকট আমরা পরব্রহ্মের তত্ত্বব্যাখ্যা পাইয়াছি, তাঁহারাই আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন।

১৪। যে সম্ভূতি ও বিনাশ (লীলা ও নির্ব্বাণ) উভয়কেই জানে, সে বিনাশে মৃত্যুর পার হইয়া সম্ভূতিতে অমৃতত্ব ভোগ করে।

যোগসিদ্ধির প্রার্থনা

১৫। সত্যের মুখ স্বর্ণময় পাত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে; হে সূর্য্য, সত্যই আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার সত্যদর্শনের জন্য সেই আবরণ সরাইয়া দাও।

১৬। হে সূর্য্য, হে পূষণ, হে একমাত্র জ্ঞানী, হে যম, হে প্রজাপতিতনয়, তোমার কিরণজাল বাহিত কর, পরে (সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে) সংহত কর। যে জ্যোতি তোমার (অষ্টরূপের মধ্যে) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দররূপ, তাহা যেন দেখিতে পাই। যে পুরুষ সেইখানে অবস্থিত, আমিই সে।

১৭। এই যে আমাদের প্রাণ, তাহা বায়ু ভিন্ন কিছুই নহে, শরীর ভস্মে পরিণত হয়, ইহাই মৃত্যুরহিত। হে শক্তির আধার মন, স্মরণ কর, তোমার কৃতকর্ম্ম স্মরণ কর, হে মন, স্মরণ কর, কর্ম্মসকল স্মরণ কর।

১৮। হে অগ্নি, তুমি দেব, সকল কর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া সুপথে আমাদিগকে মঙ্গলধামে লইয়া যাও। আমাদের কুটিল পাপপ্রবৃত্তি আত্মসাৎ কর, তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

*

শঙ্করাচার্য্য ঈশা উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী শিক্ষা বুঝিয়া সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্কর জ্ঞানমার্গপরায়ণ, অদ্বৈতবাদী, — বেদে সর্ব্বত্র জ্ঞানমার্গের প্রশংসা, কর্ম্মের হীনতা, অদ্বৈতবাদের পরিপোষক অর্থ দেখিয়াছেন। অন্য আচার্য্যগণ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে নানা মুনির নানা মত, আমরা কোন্ পথ অনুসরণ করিব? আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক শব্দের সরল স্বাভাবিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদ স্বয়ং কি বলে তাহা দেখিতে হয়; কোনও "বাদের" দিকে অর্থ টানিলে ব্যাখ্যার বিভ্রাট হয়। আর এক কথা স্মরণ করা উচিত। উপনিষদের ঋষিগণ তর্কবলে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কোন কথার অবতারণা করেন নাই, — তাঁহারা দ্রষ্টা, যোগমার্গে যাহা দর্শন করিয়াছেন তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই তর্ক দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তর্ক প্রমাণ নহে, দর্শনই প্রমাণ। যে তর্ক করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সে প্রকৃত দার্শনিক নহে; যে তত্ত্বদর্শী, সেই প্রকৃত দার্শনিক। এই দুই নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঈশা উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া পরে এই উপনিষদে যে জ্ঞানশিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিব। ধর্ম্ম পত্রিকায় গীতার ব্যাখ্যা চলিতেছে, গীতার অনেক কথার প্রমাণ এই উপনিষদে পাওয়া যায় বলিয়া ঈশা উপনিষদের ও গীতার ব্যাখ্যা একসময়ে করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

উপনিষদে পূর্ণযোগ

পূর্ণযোগ, নরদেহে দেবজীবন, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ভগবৎশক্তিচালিত পূর্ণলীলা। যাহাকে আমরা মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়া প্রচার করি, এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি যেমনই কোনও বুদ্ধি-গঠিত নূতন চিন্তা নহে, তেমনই কোনও প্রাচীন পুঁথির হরফ, কোনও লেখা-শাস্ত্রের প্রমাণ বা দার্শনিক সূত্রের দোহাই তাহার নহে। ভিত্তি পূর্ণতর অধ্যাত্মজ্ঞান, ভিত্তি আত্মায় বুদ্ধিতে হৃদয়ে প্রাণে দেহে ভাগবত সত্তার জ্বলন্ত অনুভূতি। এই জ্ঞান কিছু নূতন আবিষ্কার নয়, অতি পুরাতন, নিতান্ত সনাতন। এই অনুভূতি বেদের প্রাচীন ঋষির, উপনিষদের সত্য-দ্রষ্টা চরম জ্ঞানীর, — "সত্যশ্রুতঃ কবয়ঃ" যাঁহারা, তাঁহাদেরই অনুভূতি। কলির পতিত ভারতের নৈরাশ্যঘেরা ক্ষুদ্রাশয়তায় ও বিফল প্রযত্ন প্রাণে নূতন শোনায় বটে, — যেখানে অধিকাংশই আধমানুষ হইয়া জীবন যাপন করিতে সন্তুষ্ট, পুরা মনুষ্যত্বের সাধনা কজন করে, সেখানে নরদেবত্বের কা কথা। কিন্তু এই আদর্শ লইয়াই আমাদের শক্তিধর আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা জাতির প্রথম জীবন গঠন করিলেন। এই জ্ঞানসূর্য্যের উল্লাসভরা ঊষাকালে আত্মস্থ আনন্দবিহঙ্গের সোমরসপ্লাবিতকণ্ঠে বেদগানের আহ্বানধ্বনি উঠিয়া বিশ্বদেবতার চরণপ্রান্তে পৌঁছিল। মনুষ্যের আত্মায়, মনুষ্যের জীবনে সর্ব্ববিধ দেবত্ব গঠন দ্বারা সেই অমর বিশ্বদেবের মহীয়সী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করার উচ্চাশা ছিল ভারত-সভ্যতার প্রথম বীজমন্ত্র। ক্রমশঃ সেই মন্ত্র ভুলিয়া যাওয়া, হ্রাস করা, বিকৃত করা, এই দেশের ও এই জাতির অবনতি ও দুর্গতির কারণ। আবার সেই মন্ত্র উচ্চারণ, আবার সেই সিদ্ধির সাধনা, পুনরুত্থান ও উন্নতির একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ ও একমাত্র অনিন্দ্য উপায়। কেননা, ইহাই পূর্ণ সত্য, — যেমন ব্যষ্টির তেমনি সমষ্টির সাফল্য এইখানেই। মনুষ্যের সাধনা, জাতির গঠন, সভ্যতার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ, এই সকলের গূঢ় তাৎপর্য্য ইহাই। অন্য যে সকল উদ্দেশ্যের পিছনে আমাদের প্রাণ ও বুদ্ধি ছুটিয়া হয়রান হয়, সে সকল গৌণ উদ্দেশ্য আংশিক, দেবতাদের সত্য অভিসন্ধির সহায় মাত্র। অন্য যে সকল খণ্ড-সিদ্ধি লইয়া আমরা উল্লসিত হই, সেই সকল কেবল পথের আরামগৃহ, মার্গস্থ পর্ব্বতশিখরে জয়পতাকা প্রোথিত করা। আসল উদ্দেশ্য আসল সিদ্ধি মনুষ্যের মধ্যে, কেবল কয়েকজন বিরল মহাপুরুষে নয়, সকলের মধ্যে, জাতিতে, বিশ্বমানবে ব্রহ্মের বিকাশ ও স্বয়ংপ্রকাশ, ভগবানের প্রকট শক্তিসঞ্চারণ, জ্ঞানময় আনন্দময় লীলা।

এই জ্ঞান, এই সাধনের প্রথম রূপ ও অবস্থা আমরা দেখিতে পাই ঋগ্বেদে। ভারত-ইতিহাসের মুখেই আর্য্যধর্ম্ম মন্দিরের দ্বারস্থ স্তূপে খোদিত আদিলিপি। ঋগ্বেদই যে তাহার আদিম বাণী, সেকথা আমরা ঠিক নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না, কারণ ঋগ্বেদের ঋষিগণও স্বীকার করেন যে তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী যাঁহারা ছিলেন, আর্য্য জাতির আদি পূর্ব্বপুরুষেরা, "পূর্ব্বে পিতরো মনুষ্যা", এই পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই দেবজীবনলাভের সাধনমার্গ পরবর্ত্তী মানবের সত্যের ও অমৃতত্বের পন্থা। তবে ইহাই বলেন, প্রাচীন ঋষিরা যাহা দেখাইয়াছিলেন নূতন ঋষিরাও তাহাই অনুসরণ করিতেছেন, যে দিব্য বাক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন পিতৃগণের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই ঋগ্বেদের মন্ত্রে, অতএব ঋগ্বেদে এই ধর্ম্মের যে রূপ দেখিতে পাই তাহাকেই তাহার আদিরূপ বলা যায়। ইহারই অতি মহৎ অতি উদার রূপান্তর উপনিষদের জ্ঞান, বেদান্তের সাধনা। বেদের বৈশ্বদেব্য জ্ঞান ও দেবজীবন সাধনা, উপনিষদের আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা দুইটী সমন্বয়ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত — বিশ্বপুরুষ ও বিশ্বশক্তির নানা দিক, ব্রহ্মের সকল তত্ত্বকে একত্র করিয়া বৈশ্বদেব্য, সর্ব্বম্ ব্রহ্মের অনুভূতি ও অনুশীলন তাহার মূল কথা। তাহার পরে বিশ্লেষণের যুগ আরম্ভ হয়। সত্যের একটী না একটী খণ্ড দর্শন লইয়া বেদান্তের পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা, সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিক বিভিন্ন সাধনা সৃষ্টি করে; শেষে খণ্ড দর্শনের খণ্ড লইয়া অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণব শৈব পুরাণ তন্ত্র সমন্বয়ের চেষ্টাও কোনও দিন থামে নাই, গীতায়, তন্ত্রে, পুরাণেও সেই চেষ্টা দেখি, প্রত্যেকে কতকটা কৃতার্থও হইয়াছে, অনেক নূতন অধ্যাত্ম অনুভূতিও অর্জ্জন করা হইয়াছে, তবে বেদ উপনিষদের তুল্য ব্যাপকতা আর পাই না। ভারতের আদিম অধ্যাত্ম-বাণী যেন বুদ্ধির অতীত কোনও সর্ব্বব্যাপী উজ্জ্বল জ্ঞানালোক হইতে উদ্ভূত, যাহাকে অতিক্রম করা দূরের কথা, যেখানে পৌঁছানও বুদ্ধিপ্রধান পরবর্ত্তী যুগদের অসাধ্য বা কঠিন হইয়া যায়।

ঈশ উপনিষদ

[১]

ঈশ উপনিষদের সোজা অর্থ গ্রহণ করার এবং তাহার নিহিত ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদ আর এই উপনিষদের উপর শঙ্কর-প্রণীত ভাষ্য। সাধারণ মায়াবাদ নিবৃত্তির একমুখী প্রেরণা ও সন্ন্যাসীর প্রশংসিত কর্ম্মবিমুখতার সহিত ঈশ উপনিষদের সম্পূর্ণ বিরোধ, শ্লোকগুলির অর্থকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া উল্টা অর্থ সৃষ্টি না করিলে এই বিরোধের সমাধান করা অসম্ভব। যে উপনিষদে লেখা আছে

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ

আর লেখা আছে

ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে

যে উপনিষদ সাহস করিয়া বলিয়াছে

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

আরও বলিয়াছে

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা

আর ইহাও বলিয়াছে

সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে,

সেই উপনিষদের সঙ্গে মায়াবাদ ও নিবৃত্তিপথের মিল হইবে কি প্রকারে? শঙ্করের পরে যিনি দাক্ষিণাত্যে অদ্বৈত মতের প্রধান নিয়ন্তা, সেই বিদ্যারণ্য ইহা বুঝিয়াই এই ঈশকে বারটী প্রধান উপনিষদের তালিকা হইতে নির্ব্বাসন করিয়া তাহারই স্থানে নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদকে বসাইয়া দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত বিধানকে উল্টাইয়া সেইরূপ দুঃসাহস করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, ইহা শ্রুতি, মায়া শ্রুতির

প্রতিপাদ্য তত্ত্ব, অতএব এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থও মায়াবাদের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইতে পারে না।...* নিংড়াইলে নিশ্চয় প্রকৃত লুক্কায়িত অর্থ অর্থাৎ মায়াবাদ — যন্ত্রণায় বাধ্য হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। এই বিপ্রলব্ধির বশীভূত হইয়া শঙ্করাচার্য্য ঈশ উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

দেখা যাক একদিকে শাঙ্কর ভাষ্য কি বলে আর অপর দিকে সত্য সত্য উপনিষদই কি বলে। উপনিষৎকার ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্বকে প্রথমেই পরস্পরের সম্মুখ করিয়া মিলাইয়া এই দুইটীর মূল সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিলেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ইহার সোজা অর্থ "ঈশ্বরের বাস করিবার অর্থে এই সকল বিদ্যমান, যাহা কিছু জগতীর মধ্যে জগৎ" অর্থাৎ গমনশীলার মধ্যে গমনশীল। ইহা সহজে বোঝা যায় যে ব্রহ্মবিকাশে দুইটী তত্ত্ব প্রকটিত হয়, স্থাণু ও জগতী, নিশ্চল সর্ব্বব্যাপী নিয়ামক পুরুষ ও গমনশীলা প্রকৃতি, ঈশ্বর ও শক্তি। স্থাণুকে যখন ঈশ্বর নাম দেওয়া হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ এই হয় যে জগতী ঈশ্বরের অধীন, তাঁহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার ইচ্ছায় প্রকৃতি সকল কর্ম্ম করেন। এই পুরুষ শুধু সাক্ষী ও অনুমন্তা নয়, জ্ঞাতা ঈশ্বর, কর্ম্মের নিয়ন্তা, প্রকৃতি কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী নহে, নিয়তি মাত্র, কর্ত্রী বটে কিন্তু কর্ত্তার অধীনে, পুরুষের আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি।

তাহার পর ইহাও দেখা যায় যে এই জগতী শুধু গমনশীলা শক্তি, শুধু জগৎকরণস্বরূপ তত্ত্ব নয়, সে জগৎরূপেও বর্ত্তমান। জগতী শব্দের সাধারণ অর্থ পৃথিবী, তবে এখানে তাহা খাটে না। "জগত্যাম্ জগৎ" এই দুই শব্দের সংযোগে উপনিষৎকার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে দুইটীর ধাতুগত অর্থ এখানে উপেক্ষণীয় নহে, তাহার উপর জোর দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই ধাতুগত অর্থ গমন বা গতি।

জগতী যদি পৃথিবীই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই সকল যাহা কিছু গমনশীলা পৃথিবীতে গমনশীল হয়, অর্থাৎ যত মনুষ্য, পশু, কীট, পাখী, নদ, নদী ইত্যাদি। এই অর্থ বড় অসম্ভব। উপনিষদের ভাষায় সর্ব্বমিদম্ শব্দে সর্ব্বত্রই জগতের যাবৎ বস্তু লক্ষিত হয়, পৃথিবী নয়। অতএব জগতী শব্দে বুঝিতে হইবে

* পাণ্ডুলিপি অস্পষ্ট

রূপে প্রকটিত গমনশীলা শক্তি, জগৎ শব্দে যত কিছু প্রকৃতির গতির একটী গতি হয় প্রাণীরূপে অথবা পদার্থরূপে বিদ্যমান। বিরোধ হয় ঈশ্বর ও জগতের যা কিছু, এই দুইটীর মধ্যে। যেমন ঈশ্বর স্থাণু, প্রকৃতি বা শক্তি গমনশীলা, সর্ব্বদা কর্ম্মে ও জগৎব্যাপী গতিতে ব্যাপৃত, সেইরূপ জগতে যাহা কিছু আছে তাহাও গতির একটী ক্ষুদ্র জগৎ, তাহাও সর্ব্বদাই প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সন্ধিস্থল, চঞ্চল, নশ্বর, স্থাণুর বিপরীত। একদিকে ঈশ্বর, একদিকে পৃথিবী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু জঙ্গম, ইহাতে সেই নিত্য বিরোধ ফুটে না। একদিকে স্থাণু ঈশ্বর, অপরদিকে চঞ্চলা প্রকৃতি ও তাহার সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রকৃতির গতিকৃত যাহা কিছু আছে, — যাবতীয় অস্থায়ী বস্তু, এই সর্ব্বজনলক্ষিত নিত্যবিরোধ লইয়া উপনিষদের আরম্ভ। এই বিরোধের সমাধান কোথায়? এই দুই তত্ত্বের পূর্ণ সম্বন্ধ বা কি।

এই বিরোধ ও তাহার সমাধানের উপর সমস্ত উপনিষদ গঠিত। পরে ঈশ্বর কি আর জগৎ কি তাহার বিচার করিতে গিয়া উপনিষৎকার তিনবার তাহাই অন্যপ্রকারে উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথম ব্রহ্মের বেলায় পুরুষ ও প্রকৃতির বিরোধ অনৈজদ্ একং মনসো জবীয়ঃ... তদ্ এজতি তন্নৈজতি — এই কয়টী শব্দে তিনি বুঝাইয়াছেন যে দুইটী ব্রহ্ম, পুরুষও ব্রহ্ম, প্রকৃতি আর প্রকৃতিরূপী জগৎও ব্রহ্ম। তাহার পর আত্মার কথায়, ঈশ্বর ও যাহা কিছু জগতের তাহাদের বিরোধ। আত্মাই ঈশ্বর, পুরুষ...

[২]

ঈশ উপনিষদ পূর্ণযোগ-তত্ত্ব ও পূর্ণ আধ্যাত্মসিদ্ধি-পরিচায়ক, অল্পেতে বহু সমস্যা সমাধানকারী, অতি মহৎ অতল গভীর অর্থে পরিপূর্ণ শ্রুতি। আঠার শ্লোকে সমাপ্ত কয়েকটী ক্ষুদ্রাকার মন্ত্রে জগতের ততোধিক মুখ্য সত্য ব্যাখ্যাত। এইরূপ ক্ষুদ্র পরিসরে অনন্ত অমূল্য সম্পত্তি — infinite riches in a little room — শ্রুতিতেই পাওয়া যায়।

সমন্বয়-জ্ঞান সমন্বয়-ধর্ম্ম, বিপরীতের মিলন ও একীকরণ এই উপনিষদের প্রাণ। পাশ্চাত্য দর্শনে একটী নিয়ম আছে যাহাকে Law of contradiction বলে, বিপরীতের পরস্পর বহিষ্করণ বলা যায়। দুইটী বিপরীত সিদ্ধান্ত একসঙ্গে টিকিতে পারে না, মিলিত হইতে পারে না, দুইটী বিপরীত গুণ এক সময়ে এক

স্থানে এক আধারে এক বস্তুর সম্বন্ধে যুগপৎ সত্য হইতে পারে না। এই নিয়ম অনুসারে বিপরীতের মিলন ও একীকরণ হইতেই পারে না। ভগবান যদি এক হন, তিনি হাজার সর্ব্বশক্তিমান হউন বহু হইতে পারেন না। অনন্ত কখন সান্ত হয় না। অরূপের রূপ হওয়া অসাধ্য, যে সরূপ হইল তাহার অরূপত্ব বিনষ্ট হয়। ব্রহ্ম যে এক সময়েই নির্গুণ ও সগুণ, উপনিষদ যেমন ভগবানের সম্বন্ধে বলে যে তিনি "নির্গুণো গুণী", এই সিদ্ধান্তকেও এই যুক্তি উড়াইয়া দেয়। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, অরূপত্ব, একত্ব, অনন্তত্ব যদি সত্য হয়, তাহার সগুণত্ব, সরূপত্ব, বহুত্ব, সান্ততা মিথ্যা, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" মায়াবাদীর এই সর্ব্বধ্বংসী সিদ্ধান্ত এই দার্শনিক নিয়মের চরম পরিণতি। ঈশ উপনিষদের দ্রষ্টা ঋষি প্রতিপদে এই নিয়মকে দলন করিয়া প্রতি শ্লোকে তাহার যেন অসারত্ব ঘোষণা করিয়া বৈপরীত্যের মধ্যে বিপরীত তত্ত্বের গুপ্ত হৃদয়ে মিলন ও একীকরণের স্থান বাহির করিয়া চলিতেছেন। গতিশীল জগৎ ও স্থাণু পুরুষের একত্ব, পূর্ণ ত্যাগে পূর্ণ ভোগ, পূর্ণ কর্ম্মে সনাতন মুক্তি, ব্রহ্মের গতির মধ্যেই চিরস্থাণুত্ব, চিরন্তন স্থাণুত্বে অবাধ অচিন্ত্য গতি, অক্ষর ব্রহ্ম ও ক্ষর জগতের একত্ব, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ বিশ্বপুরুষের একত্ব, যেমন অবিদ্যায় তেমন বিদ্যায় পরম অমরত্ব লাভের অভাব, যুগপৎ বিদ্যা অবিদ্যা সেবনে অমরত্ব, জন্মচক্রঘুরণেও নয়, জন্মবিনাশেও নয়, যুগপৎ সম্ভূতি ও অসম্ভূতির সিদ্ধিতে পরম মুক্তি ও পরম সিদ্ধি, এইগুলিই উপনিষদের উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত মহাতথ্য।

দুর্ভাগ্যবশতঃ উপনিষদের অর্থ লইয়া অনর্থক গোল করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের প্রধান প্রায়ই সর্ব্বজনস্বীকৃত টীকাকার, কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয়, শঙ্করের মায়াবাদ অতল জলে ডুবিয়া যায়। মায়াবাদের প্রতিষ্ঠাতা দার্শনিকদের মধ্যে অতুল্য অপরিমেয় শক্তিশালী। যমুনানদী স্বপথত্যাগে অনিচ্ছুক হওয়ায় তৃষিত বলরাম যেমন লাঙ্গলাকর্ষণে তাহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া চরণপ্রান্তে হাজির করিয়া দিলেন, শঙ্করও গন্তব্যস্থলের পথে এই মায়াবাদনাশী উপনিষদকে পাইয়া তাহার অর্থ টানিয়া হিঁচড়াইয়া স্বমতের সহিত মিলাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতে উপনিষদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, দুয়েকটী দৃষ্টান্তে বোঝা যায়। উপনিষদে বলা আছে যাহারা একমাত্র অবিদ্যাকে উপাসনা করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়, আবার যাহারা একমাত্র বিদ্যাকে উপাসনা করে, তাহারা যেন আরও গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করে। শঙ্কর বলেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই স্থলে সাধারণ অর্থে আমি বুঝিব না, বিদ্যার অর্থ এখানে দেববিদ্যা। উপনিষদে বলা আছে,

"বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যা মৃতমশ্নুতে", অসম্ভূতি দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়া সম্ভূতি দ্বারা অমরত্ব ভোগ করিব। শঙ্কর বলেন, পড়িতে হয় "অসম্ভূত্যা মৃতং", বিনাশের অর্থ এখানে জন্ম। দ্বৈতবাদী একজন টীকাকার ঠিক এইভাবে "তত্ত্বমসি" কথা পাইয়া বলেন, "অতৎ ত্বমসি" পড়িতে হইবে। শঙ্করের পরবর্ত্তী একজন প্রধান মায়াবাদী আচার্য্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ঈশ উপনিষদকে মুখ্য প্রমাণস্বরূপ উপনিষদের তালিকা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নৃসিংহতাপনীয়কে তাহার স্থলে 'প্রমোট' করিয়া চরিতার্থ হইলেন। বাস্তবিক এইরূপ গায়ের জোরে স্বমত স্থাপনের প্রয়োজন নাই। উপনিষদ অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত দিক, কোন একমাত্র দার্শনিক মতের পরিপোষক নয় দেখায় বলিয়া সহস্র দার্শনিক মত এই এক বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছে। প্রত্যেক দর্শন অনন্ত সত্যের এক একটী দিক বুদ্ধির সম্মুখে শৃঙ্খলিতভাবে উপস্থিত করে। অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশ, অনন্ত ব্রহ্মে পৌঁছিবার পথও অগণ্য।

[৩]

প্রাচীন শ্রৌতগ্রন্থের মধ্যে অল্পেতে বহু মুখ্যতত্ত্বপরিচায়ক শ্রুতি পূর্ণযোগের তত্ত্ব সমর্থক পাই এই ঈশ উপনিষদে। ঈশ উপনিষদে লক্ষ্য ও পথ সমন্বয়সিদ্ধি ও সমন্বয়ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঋষিদৃষ্টি এখানে জগতের প্রধান প্রধান যত বৈপরীত্য লইয়া প্রত্যেক বিরোধের অতলে তলাইয়া সেই বিরোধের মধ্যে মিলন ও একীকরণের গভীর তত্ত্বস্থলে পৌঁছিয়াছে। আর আর উপনিষদে অনন্তজ্ঞানের একদিক ধরিয়া ব্রহ্মের ব্যাখ্যা পাই, এইটীই সব দিক দেখিয়া আঠার শ্লোকের অল্প পরিসরে ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপের পূর্ণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথের পূর্ণ ব্যাখ্যা কয়েকটী মাত্র গভীর উদার মন্ত্রে শেষ করিয়াছে। অবশ্যই সংক্ষেপে। অনন্তের দিক খুঁটিনাটি সত্যের সূর্য্যের সহস্রকিরণময় অশেষ পরিস্ফুরণ এখানে পাওয়া যায় না। নিতান্তই যাহা আসল প্রয়োজনীয় অপরিবর্জ্জনীয়।

বেদরহস্য

বেদসংহিতা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সভ্যতা ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস। কিন্তু এই উৎসের মূল অগম্য পর্ব্বতের গুহায় নিলীন, তাহার প্রথম স্রোতও অতি প্রাচীন ঘন কণ্টককময় অরণ্যে পুষ্পিত বৃক্ষলতাগুল্মের বিচিত্র [আবরণে]* আবৃত। বেদ রহস্যময়। ভাষা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি অন্য যুগের সৃষ্টি, অন্য ধরনের মনুষ্যবুদ্ধিসম্ভূত। এক পক্ষে অতি সরল, যেন নির্ম্মল সবেগ পর্ব্বতনদীর প্রবাহ, অথচ এই চিন্তাপ্রণালী আমাদের এমনই জটিল বোধ হয়, এই ভাষার অর্থ এমনই সন্দিগ্ধ যে মূল চিন্তা ও ছত্রে ছত্রে ব্যবহৃত সামান্য কথাও লইয়া প্রাচীনকাল হইতে তর্ক ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। পরম পণ্ডিত সায়ণাচার্য্যের টীকা পড়িয়া মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয় যে, হয় বেদের কখনই কোনও সংলগ্ন অর্থ ছিল না, নয় যাহা ছিল তাহা বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণরচনার অনেক আগে সর্ব্বগ্রাসী কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল।

সায়ণ বেদের অর্থ করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। যেন এই ঘোর অন্ধকারে মিথ্যা আলোকের পিছনে দৌড়াইয়া বার বার আছাড় খায়, গর্ত্তে পঙ্কে ময়লা জলে পড়ে, হয়রাণ হইয়া যায়, অথচ ছাড়িতেও পারে না। আর্য্যধর্ম্মের আসল পুস্তক, অর্থ করিতেই হয়, কিন্তু এমন হেঁয়ালির কথা, এমন রহস্যময় নানা নিগূঢ় চিন্তায় জড়িত সংশ্লেষণ যে সহস্র স্থলে অর্থই করা হয় না, যেখানে কোনও রকমেই অর্থ হয়, সেখানেও প্রায়ই সন্দেহের ছায়া আসিয়া পড়ে। এই সঙ্কটে অনেকবার সায়ণ নিরাশ হইয়া ঋষিদের মুখে এমন ব্যাকরণের বিরোধী ভাষা, এমন কুটিল জড়িত ভগ্ন বাক্যরচনা, এমন বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন চিন্তা আরোপ করিয়াছেন যে তাঁহার টীকা পড়িয়া এই ভাষা ও চিন্তাকে আর্য্য না বলিয়া বর্ব্বরের বা উন্মত্তের প্রলাপ বলিতে প্রবৃত্তি হয়। সায়ণের দোষ নাই। প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্কও তদ্রূপ বিভ্রাটে বিভ্রাট করিয়াছেন আর যাস্কের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণকারও বেদের সরল অর্থ না পাইয়া কল্পনার সাহায্যে mythopoeic facultyর আশ্রয়ে দুরূহ ঋকগুলির ব্যাখ্যা করিবার বিফল চেষ্টা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকেরা এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া নানান কল্পিত ইতিহাসের আড়ম্বরে বেদের সুকৃত সরল অর্থ বিকৃত ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। একটী উদাহরণে

* পাণ্ডুলিপিতে কিছুটা জায়গা ছাড়া আছে। —স

এই অর্থবিকৃতির ধরণ ও মাত্রা বোঝা যাইবে। পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে অগ্নির নিষ্পেষিত বা ছাপান অবস্থা আর অতিবিলম্বে তাহার বৃহৎ প্রকাশের কথা আছে। "কুমারং মাতা যুবতিঃ সমুব্ধং গুহা বিভর্ত্তি ন দদাতি পিত্রে। ...কমেতং ত্বং যুবতে কুমারং পেষী বিভর্ষি মহিষী জজান। পূর্ব্বীর্হি গর্ভঃ শরদো ববর্দ্ধ অপশ্যং জাতং যদসূত মাতা।" ইহার অর্থ, "যুবতী মাতা কুমারকে ছাপান রাখিয়া গুহায় অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে নিজ জঠরে বহন করেন, পিতাকে দিতে চান না। হে যুবতী, এই কুমার কে, যাহাকে তুমি সম্পিষ্ট হইয়া অর্থাৎ তোমার সঙ্কুচিত অবস্থায় নিজের ভিতরে বহন কর? মাতা যখন সঙ্কুচিত অবস্থা ছাড়িয়া মহতী হন, তখন কুমারকে জন্ম দেন। অনেক বৎসর ধরিয়া গর্ভস্থ শিশু বৃদ্ধি পাইয়াছে, যখন মাতা তাহাকে প্রসব করিলেন, তখন তাহাকে দেখিতে পাইলাম।" বেদের ভাষা সর্ব্বত্রই একটু ঘন, সংহত, সারবান, অল্প কথায় বিস্তর অর্থ প্রকট করিতে চায়, ইহা সত্ত্বেও অর্থের সরলতা, চিন্তার সামঞ্জস্যের হানি হয় না। ঐতিহাসিকেরা সূক্তের এই সরল অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, যখন মাতা পেষী, তখন "কুমারং সমুব্ধং", মাতার সম্পিষ্ট অর্থাৎ সঙ্কুচিত অবস্থায় কুমারেরও নিষ্পিষ্ট অর্থাৎ ছাপান অবস্থা হয়, ঋষির ভাষা ও চিন্তার এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য কিম্বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পেষী দেখিয়া পিশাচী বুঝিলেন, ভাবিলেন কোনও পিশাচী অগ্নির তেজ হরণ করিয়াছে, মহিষী দেখিয়া রাজার মহিষী বুঝিলেন, কুমারং সমুব্ধং দেখিয়া কোনও ব্রাহ্মণকুমার রথের চাকায় নিষ্পেষিত হইয়া মরিয়াছে ইহাই বুঝিলেন। এই অর্থে বেশ একটা লম্বা আখ্যায়িকাও সৃষ্টি হইল। ফলে সোজা ঋকের অর্থ দুরূহ হইয়া গেল, কুমার কে, জননী কে, পিশাচী কে, অগ্নির না ব্রাহ্মণকুমারের গল্প হইতেছে, কে কাহাকে কি বিষয়ে কথা বলিতেছে, সব গণ্ডগোল। সর্ব্বত্রই এইরূপ অত্যাচার, অযথা কল্পনার দৌরাত্ম্যে বেদের প্রাঞ্জল অথচ গভীর অর্থ বিকৃত বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, অন্যত্র যেখানে ভাষা ও চিন্তা একটু জটিল, টীকাকারের কৃপায় দুর্ব্বোধ্যের দুর্ব্বোধ্যতা ভীষণ অস্পৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋক বা উপমা কেন, বেদের আসল মর্ম্ম লইয়া অতি প্রাচীনকালেও বিস্তর মতভেদ ছিল। গ্রীসদেশীয় য়ুহেমেরের মতে গ্রীকজাতির দেবতারা চিরস্মরণীয় বীর ও রাজা ছিল, কালে অন্যপ্রকার কুসংস্কারে ও কবির উদ্দাম কল্পনায় দেবতা বানাইয়া স্বর্গে সিংহাসনারূঢ় করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতেও য়ুহেমেরপন্থীর অভাব ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারা বলিত আসলে অশ্বিদ্বয় দেবতাও নয়, নক্ষত্রও নয়,

বিখ্যাত দুইজন রাজা ছিলেন, আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ, তবে যদি মৃত্যুর পরে দেবভাবাপন্ন হয়। অপরের মতে সবই Solar myth, অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র আকাশ তারা বৃষ্টি ইত্যাদি বাহ্য প্রকৃতির ক্রীড়াকে কবিকল্পিত নামরূপে সাজাইয়া মনুষ্যাকৃতি দেবতা করা হইয়াছে এবং এই মত আজকালকের য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মনোনীত পথ পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছে। বৃত্র মেঘ, বলও মেঘ, আর যত দস্যু দানব দৈত্য আকাশের মেঘ মাত্র, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র এইসকল সূর্য্যকিরণের অবরোধকারী জলবর্ষণে বিমুখ কৃপণ জলধরকে বিদ্ধ করিয়া বৃষ্টিদানে পঞ্চনদের সপ্তনদীর অবাধ স্রোতঃসৃজনে ভূমিকে উর্ব্বরা, আর্য্যকে ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তোলেন। অথবা ইন্দ্র মিত্র অর্য্যমা ভগ বরুণ বিষ্ণু সবাই সূর্য্যের নামরূপ মাত্র, মিত্র দিনের দেবতা, বরুণ রাত্রির, ঋভুগণ যাঁহারা মনের বলে ইন্দ্রের অশ্ব, অশ্বিদ্বয়ের রথ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারাও আর কিছুই নন, সূর্য্যের কিরণ। অপরদিকে অসংখ্য গোঁড়া বৈদিকও ছিল। তাহারা কর্ম্মকাণ্ডী, ritualist। তাহারা বলে দেবতা মনুষ্যাকৃতি দেবতাই বটে, প্রাকৃতিক শক্তির সর্ব্বব্যাপী শক্তিধরও বটে, অগ্নি একসময়েই বিগ্রহবান দেবতা এবং বেদীর আগুন, পার্থিব অগ্নি, বাড়বানল ও বিদ্যুৎ এই তিন মূর্ত্তিতে প্রকটিত, সরস্বতী নদীও বটে, দেবীও বটে ইত্যাদি। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দেবতারা স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে স্বর্গদান, ইহলোকে বল, পুত্র, গাভী, অশ্ব, অন্ন ও বস্ত্র দান করেন, শত্রুকে সংহার করেন, স্তোতার বেআদবী নিন্দুক সমালোচকের মাথা বজ্রাঘাতে চূর্ণ করেন ইত্যাদি শুভ মিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হন। প্রাচীন ভারতে এই মতই প্রবল ছিল।

তথাপি এমন চিন্তাশীল লোকের অভাব ছিল না যাঁহারা বেদের বেদত্বে, ঋষির প্রকৃত ঋষিত্বে আস্থাবান ছিলেন, ঋকসংহিতার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতেন, বেদে বেদান্তের মূল তত্ত্ব খুঁজিতেন। তাঁহাদের মতে ঋষিরা দেবতার নিকট যে জ্যোতির্দ্দান প্রার্থনা করিতেন, সে ভৌতিক সূর্য্যের নয়, জ্ঞানসূর্য্যের, গায়ত্রীমন্ত্রোক্ত সূর্য্যের, বিশ্বামিত্র যাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই জ্যোতি সেই "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ", এই দেবতা ইনি, "যো নো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ," যিনি আমাদের সকল চিন্তা সত্যতত্ত্বের দিকে প্রেরিত করেন। ঋষিরা তমঃ ভয় করিতেন — রাত্রির নহে, কিন্তু অজ্ঞানের সেই ঘোর তিমির। ইন্দ্র জীবাত্মা বা প্রাণ; বৃত্র মেঘও নয়, কবিকল্পিত অসুরও নয় — যাহা আমাদের পুরুষার্থকে ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত করিয়া রোধ করে, যাহার মধ্যে দেবগণ অগ্রে নিহিত ও লুপ্ত হইয়া বেদবাক্যজনিত উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে নিস্তারিত ও প্রকট হন,

তাহাই বৃত্র। সায়ণাচার্য্য ইহাদের ''আত্মবিদ'' নামে অভিহিত করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের বেদব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই আত্মবিদ্‌কৃত ব্যাখ্যার দৃষ্টান্তস্বরূপ রহূগণ পুত্র গোতম ঋষির মরুৎস্তোত্র [উল্লেখ]* করা যায়। সেই সূক্তে গোতম মরুদ্‌গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট ''জ্যোতি'' ভিক্ষা করিয়াছেন —

যূয়ং তৎ সত্যশবস আবিষ্কর্ত্ত মহিত্বনা।
বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ॥
গূহতা গুহ্যং তমঃ বিযাত বিশ্বমত্রিণম্।
জ্যোতিষ্কর্ত্তা যদুশ্মসি॥

কর্ম্মকাণ্ডীদের মতে এই ঋকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় জ্যোতিকে ভৌতিক সূর্য্যেরই জ্যোতি বুঝিতে হয়। ''যে রক্ষঃ সূর্য্যের আলোককে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, মরুদ্‌গণ সে রক্ষকে বিনাশ করিয়া সূর্য্যের জ্যোতি পুনঃ দৃষ্টিগোচর করুন।'' আত্মবিদের মতে অন্যরূপ অর্থ করা উচিত, যেমন, ''তোমরা সত্যের বলে বলী, তোমাদের মহিমায় সেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হোক, তোমাদের বিদ্যুৎসম আলোকে রক্ষকে বিদ্ধ কর। হৃদ্‌রূপ গুহায় প্রতিষ্ঠিত অন্ধকার গোপন কর, অর্থাৎ সেই অন্ধকার যেন সত্যের আলোকবন্যায় নিমগ্ন, অদৃশ্য হইয়া যাক। পুরুষার্থের সকল ভক্ষককে অপসারিত করিয়া আমরা যে জ্যোতি চাই, তাহা প্রকটিত কর।'' এখানে মরুদ্‌গণ মেঘহন্তা বা বায়ু নহেন, পঞ্চপ্রাণ। তমঃ হৃদয়গত ভাবরূপ অন্ধকার, পুরুষার্থের ভক্ষক ষড়রিপু, জ্যোতিঃ পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎরূপ জ্ঞানের আলোক। এই ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মতত্ত্ব, বেদান্তের মূলকথা, রাজযোগের প্রাণায়ামপ্রণালী একযোগে বেদে পাওয়া গেল।

এই গেল বেদে স্বদেশী বিভ্রাট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কোমর বাঁধিয়া আসরে নামায় এই ক্ষেত্রে ঘোরতর বিদেশী বিভ্রাটও ঘটিয়াছে। সেই বন্যার বিপুল তরঙ্গে আমরা আজ পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাইয়া ভাসিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন নিরুক্তকার ও ঐতিহাসিকদের পুরোন ভিত্তির উপরেই নিজ চকচকে নব কল্পনামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা যাস্কের নিরুক্ত তত মানেন না, বর্লিন ও পেত্রগ্রাদে নবীন মনোনীত নিরুক্ত তৈয়ারি করিয়া তাহারই সাহায্যে

* পাণ্ডুলিপিতে কিছুটা জায়গা ছাড়া আছে।—স

বেদের ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রাচীন ভারতবর্ষীয় টীকাকারদের Solar mythএর বিচিত্র নবমূর্ত্তি বানাইয়া, প্রাচীন রঙের উপর নূতন রং ফলাইয়া এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়াছেন। এই য়ুরোপীয় মতেও বেদোক্ত দেবতা বাহ্য প্রকৃতির নানা ক্রীড়ার রূপক মাত্র। আর্য্যেরা সূর্য্য চন্দ্র তারা নক্ষত্র উষা রাত্রি বায়ু ঝটিকা খাল নদী সমুদ্র পর্ব্বত বৃক্ষ ইত্যাদি দৃশ্যবস্তুর পূজা করিতেন। এই সকলকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত বর্ব্বর জাতি এইগুলির বিচিত্র গতিকে কবির রূপকচ্ছলে স্তব করিত। আবার তাহারই মধ্যে নানান দেবতার চৈতন্যময় ক্রিয়া বুঝিয়া সেই শক্তিধরের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ও তাঁহাদের নিকট যুদ্ধে বিজয়লাভ ধনদৌলত দীর্ঘজীবন আরোগ্য ও সন্ততি কামনা করিতেন, রাত্রির অন্ধকারে বড় ভীত হইয়া যাগযজ্ঞে সূর্য্যের পুনরুদ্ধার করিতেন। ভূতেরও আতঙ্ক ছিল, ভূত তাড়াইবার জন্যে দেবতার নিকটে কাতরোক্তি করিতেন। যজ্ঞে স্বর্গলাভের আশা ও প্রবল [ইচ্ছা]* ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরের উচিত ধারণা ও কুসংস্কার।

যুদ্ধে বিজয়লাভ, যুদ্ধ কাহার সঙ্গে? ইঁহারা বলেন, পঞ্চনদনিবাসী আর্য্যজাতির সমর আসল ভারতবাসী দ্রাবিড়জাতির সঙ্গে, আর প্রতিবেশীদের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ সতত ঘটিয়া আসে, সেই আর্য্যতে আর্য্যতে ভিতরের কলহ। যেমন প্রাচীন ঐতিহাসিক বেদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋক বা সূক্তকে আধার করিয়া নানান ইতিহাস গঠন করিতেন, ইঁহাদেরও ঠিক সেই প্রণালী। তবে সেইরূপ বিচিত্র অতিপ্রাকৃতঘটনায় ভরা বিচিত্র গল্প না বানাইয়া জান বৃশ ঋষির সারথ্যে ব্রাহ্মণকুমারের রথচক্রে নিষ্পেষণ, মন্ত্রপ্রয়োগে পুনর্জীবন দান, পিশাচীকৃত অগ্নিতেজের হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি অদ্ভুত কল্পনা না করিয়া আর্য্য ত্রিৎসুরাজ সুদাসের সঙ্গে মিশ্রজাতীয় দশজন রাজার যুদ্ধ, একদিকে বশিষ্ঠ অপরদিকে বিশ্বামিত্রের পৌরোহিত্য, পর্ব্বতগুহানিবাসী দ্রাবিড় জাতি দ্বারা আর্য্যদের গাভী হরণ ও নদীর স্রোত বন্ধন, দেবশুনী সরমার উপমা-ছলে দ্রাবিড়দের নিকট আর্য্যদৌত্য বা রাজদূতীপ্রেরণ, প্রভৃতি সত্য বা মিথ্যা সম্ভব ঘটনা লইয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন। এই প্রাকৃতিক ক্রীড়ার পরস্পর-বিরোধী রূপকের আর তাহার সঙ্গে এই ইতিহাসসম্বন্ধী রূপকের মিল করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী বেদের যে অপূর্ব্ব গোল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তবে তাঁহারা বলেন না কি, আমরা কি

* পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি লেখার পর কেটে দেওয়া আছে।—স

করিব, প্রাচীন বর্ব্বর কবিদের মন গোলমেলে ছিল, সেই জন্যই এইরূপ গোঁজামিল করিতে হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যা কিন্তু ঠিক, খাঁটি, নির্ভুল। সে যাহাই হৌক, ফলে প্রাচ্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় বেদের অর্থ যেমন অসংলগ্ন গোলমেলে দুরূহ ও জটিল হইয়াছিল, পাশ্চাত্যদের ব্যাখ্যায় সেইরূপেই হইয়াছে। সবই বদলাইয়াছে, অথচ সবই সমান। টেম্‌স্‌, সেন ও নেবা নদীর শত শত বজ্রধর আমাদের মস্তকের উপর নব পাণ্ডিত্যের স্বর্গীয় সপ্তনদী বর্ষণ করিয়াছেন সত্য, তাঁহাদের কেহও বৃত্রকৃত অন্ধকার সরাইতে পারেন নাই। আমরা যেই তিমিরে, সেই তিমিরে।

ঋগ্বেদ

ভূমিকা

“আর্য্য” পত্রিকায় “বেদরহস্য”তে বেদ সম্বন্ধে যে নূতন মত প্রকাশিত হইতেছে, এইগুলি সেই মতের অনুযায়ী অনুবাদ। সেই মতে, বেদের প্রকৃত অর্থ আধ্যাত্মিক, কিন্তু গুহ্য ও গোপনীয় বলিয়া অনেক উপমা, সঙ্কেতশব্দ, বাহ্যিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের যোগ্য বাক্যসকল দ্বারা সেই অর্থ আবৃত। আবরণ সাধারণের পক্ষে অভেদ্য, দীক্ষিত বৈদিকের পক্ষে পাতলা ও সত্যের সর্ব্বাঙ্গপ্রকাশক বস্তু মাত্র ছিল। উপমা ইত্যাদির পিছনে এই অর্থ খুঁজিতে হইবে। দেবতাদের “গুপ্তনাম” ও স্ব স্ব প্রক্রিয়া, “গো” “অশ্ব” “সোমরস” ইত্যাদি সঙ্কেতশব্দের অর্থ, দৈত্যদের কর্ম্ম ও গূঢ় অর্থ, বেদের রূপক, myth ইত্যাদির তাৎপর্য্য জানিতে পারিলে সেই বেদের অর্থ মোটামুটি বোঝা যায়। অবশ্য তাহার গূঢ় অর্থের প্রকৃত ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি বিশেষ জ্ঞান ও সাধনার ফল, বিনা সাধনে কেবল বেদাধ্যয়নে হয় না।

এই সকল বেদতত্ত্ব বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা রহিয়াছে। আপাততঃ কেবল বেদের মুখ্য কথা সংক্ষেপে বলি। সেই কথা এই: জগৎ ব্রহ্মময় কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব মনের অজ্ঞেয়। অগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন “তৎ অদ্ভূতং”, অর্থাৎ সকলের উপরে ও সকলের অতীত, কালাতীত। আজও নহে, কল্য নহে, কে তাহা জানিতে পারিয়াছে? আর সকলের চৈতন্যে তাহার সঞ্চার, কিন্তু মন যদি নিকটে গিয়া নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করে, তৎ অদৃশ্য হয়। কেনোপনিষদের রূপকেরও এই অর্থ, ইন্দ্র ব্রহ্মের দিকে ধাবিত হন, নিকটে এলেই ব্রহ্ম অদৃশ্য। তথাপি তৎ “দেব”রূপে জ্ঞেয়।

দেবও “অদ্ভুত”, কিন্তু ত্রিধাতুতে প্রকাশিত — অর্থাৎ দেব সন্ময়, চিৎশক্তিময়, আনন্দময়। আনন্দতত্ত্বে দেবকে লাভ করা যায়। দেব নানারূপে, বিবিধ নামে জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া ও ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই নামরূপ সকল বেদের দেবতাসকল।

বেদে বলে, প্রকাশ্য জগতের উপরে ও নিম্নে দুই সমুদ্র আছে। নিম্ন অপ্রকেত “হৃদ্য” বা হৃৎসমুদ্র, ইংরাজিতে যাহাকে subconscient বলে, — উপরে সৎসমুদ্র, ইংরাজিতে যাহাকে superconscient বলে। দুটীকে গুহা বা গুহ্যতত্ত্ব বলে। ব্রহ্মণষ্পতি অপ্রকেত হইতে বাক্ দ্বারা ব্যক্তকে প্রকাশ করেন, রুদ্র প্রাণতত্ত্বে

প্রবিষ্ট হইয়া রুদ্রশক্তি দ্বারা বিকাশ করেন, উপরের দিকে জোর করিয়া তোলেন, ভীম তাড়নায় গন্তব্যপথে চালান, বিষ্ণু ব্যাপক শক্তি দ্বারা ধারণ করিয়া এই নিত্যগতির সৎসমুদ্র বা জীবনের সপ্ত নদীর গন্তব্যস্থল অবকাশ দেন। অন্য সকল দেবতা এই গতির কর্ম্মকারক, সহায়, উপায়।

সূর্য্য সত্যজ্যোতির দেবতা, সবিতা অর্থাৎ সৃজন করেন, ব্যক্ত করেন, পূষা অর্থাৎ পোষণ করেন, "সূর্য্য" অর্থাৎ অনৃতের অজ্ঞানের রাত্রী হইতে সত্যের জ্ঞানের আলোক জন্মাইয়া দেন। অগ্নি চিৎশক্তির "তপঃ", জগৎকে নির্ম্মাণ করেন, জগতের সর্ব্ববস্তুর ভিতরে রহিয়াছেন। তিনি ভূতত্ত্বে অগ্নি, প্রাণতত্ত্বে কামনা ও ভোগপ্রেরণা, যাহা পান তাহা ভক্ষণ করেন, মনস্তত্ত্বে চিন্তাময় প্রেরণা ও ইচ্ছাশক্তি, মনের অতীত তত্ত্বে জ্ঞানময় ক্রিয়াশক্তির অধীশ্বর।

[নির্বাচিত ঋক্‌সূক্ত]

প্রথম মণ্ডল — সূক্ত ১

মূল, অন্বয় ও ব্যাখ্যা

অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥১॥

অগ্নিকে ভজনা করি যিনি যজ্ঞের দেব পুরোহিত, ঋত্বিক, হোতা এবং আনন্দ-ঐশ্বর্য্যের বিধানে শ্রেষ্ঠ।

ঈড়ে — ভজামি, প্রার্থয়ে, কাময়ে। ভজনা করি।

পুরোহিতং — যে যজ্ঞে পুরঃ সম্মুখে স্থাপিত; যজমানের প্রতিনিধি ও যজ্ঞের সম্পাদক।

ঋত্বিজম্ — যে ঋতু অনুসারে অর্থাৎ যথার্থ কাল দেশ নিমিত্ত অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করে।

হোতারং — যে দেবতাকে আহ্বান করিয়া হোম নিষ্পাদন করে।

রত্নধা — সায়ণ রত্নের অর্থ রমণীয় ধন করিয়াছেন। আনন্দময় ঐশ্বর্য্য বলিলে যথার্থ অর্থ হয়।

"ধা"র অর্থ যে ধারণ করে বা যে বিধান করে বা যে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ ঋষিভির্ ঈড্যো নূতনৈতর্ উত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি॥২॥

যে অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিগণের ভজনীয় ছিলেন, তিনি নূতন ঋষিদেরও (উত) ভজনীয়। কেননা তিনি দেবগণকে এই স্থানে আনয়ন করেন। সে ভজনীয়ত্বের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, 'স' শব্দ সেই আভাস দেয়। এহ বক্ষতি — ইহ আবহতি। অগ্নি স্বরথে দেবতাদিগকে আনয়ন করেন।

অগ্নিনা রয়িম্ অশ্নবৎ পোষম্ এব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমম্॥৩॥

রয়িং — রত্নর যে অর্থ, রয়িঃ, রাধঃ, রায়ঃ ইত্যাদির সেইই অর্থ। তবে রত্ন শব্দে "আনন্দ" অর্থ অধিক প্রস্ফুট।
অশ্নবৎ — অশ্নুয়াৎ। প্রাপ্ত হয় বা ভোগ করে।
পোষম প্রভৃতি রয়ির বিশেষণ। পোষং অর্থাৎ যে পুষ্ট হয়, যে বৃদ্ধি পায়।
যশসং — সায়ণ যশ শব্দের অর্থ কখন কীর্ত্তি কখন অন্ন করিয়াছেন। আসল অর্থ বোধহয় যেন সাফল্য, লক্ষ্যস্থান প্রাপ্তি ইত্যাদি। দীপ্তি অর্থও সঙ্গত কিন্তু এখানে তাহা খাটে না।

অগ্নে যং যজ্ঞম্ অধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূর্ অসি।
স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি॥৪॥

যে অধ্বর যজ্ঞের সর্ব্বদিকে তুমি ঘিরিয়া প্রাদুর্ভূত, সেই যজ্ঞ দেবদের নিকট গমন করে।
অধ্বরং — ধ্বৃ ধাতু অর্থ হিংসা করা। সায়ণ "অহিংসিত যজ্ঞ" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু "অধ্বর" শব্দ স্বয়ং যজ্ঞবাচক হইয়া গিয়াছে, — "অহিংসিত" শব্দের কখনও সেইরূপ পরিণাম অসম্ভব। অধ্বার অর্থ পথ, অধ্বর পথগামী বা পথ-স্বরূপই হইবে। যজ্ঞ দেবধাম গমনের পথ ছিল আবার যজ্ঞ দেবধামের পথিক বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত। এই অর্থ সঙ্গত। অধ্বর যে অধ্বরার মত অধ্ ধাতু সম্ভূত, ইহার এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে অধ্বা ও অধ্বর দুইটীই আকাশ অর্থে ব্যবহৃত ছিল।
পরিভূঃ — পরিতো জাতঃ।

দেবেষু — সপ্তমী দ্বারা লক্ষ্যস্থান নির্দ্দিষ্ট।
ইৎ — এব

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবা দেবেভিরাগমৎ ॥৫॥

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেৎ তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥৬॥

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি ॥৭॥

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্।
বর্ধমানং স্বে দমে ॥৮॥

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥৯॥

আধ্যাত্মিক অর্থের অনুবাদ

যিনি দেবতা হইয়া আমাদের যজ্ঞে কর্ম্মনিয়ামক পুরোহিত, কালজ্ঞ ঋত্বিক, হবিঃ ও আহ্বানের প্রাপক হোতা সাজেন এবং অশেষ আনন্দৈশ্বর্য্য বিধান করেন, সেই তপোদেব অগ্নিকে ভজনা করি। (১)

যেমন প্রাচীন ঋষিদের তেমনই আধুনিক সাধকদেরও এই তপোদেবতা ভজনার যোগ্য। তিনিই দেবগণকে এই মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করেন। (২)

তপঃ-অগ্নি দ্বারাই মানুষ দিব্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। এই ঐশ্বর্য্য অগ্নিবলে দিনদিন বর্দ্ধিত, অগ্নিবলে বিজয়স্থলে অগ্রসর, অগ্নিবলে বহুল বীরশক্তিসম্পন্ন হয়। (৩)

হে তপঃ-অগ্নি, যে দেবপথগামী যজ্ঞের সর্ব্বদিকে তোমার সত্তা অনুভূত হয়, সেই আত্মপ্রয়াসই দেবতার নিকট পহুঁচিয়া সিদ্ধ হয়। (৪)

এই তপঃ-অগ্নি যিনি হোতা, যিনি সত্যময়, সত্যদৃষ্টিতে যাঁহার কর্ম্মশক্তি

স্থাপিত, নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় শ্রৌতজ্ঞানে যিনি ধনী, তিনিই দেববৃন্দকে লইয়া যজ্ঞে নামিয়া আসুন। (৫)

হে তপঃ-অগ্নি, যে তোমাকে দেয়, তুমি যে তাহার শ্রেয়ঃ সৃষ্টি করিবেই, ইহাই তোমার সত্যসত্তার লক্ষণ। (৬)

অগ্নি, আমরা প্রতিদিন অহোরাত্রে তোমার নিকট বুদ্ধির চিন্তায় আত্মসমর্পণকে উপহারস্বরূপ বহন করিয়া আগত হই। (৭)

দেবোন্মুখ সকল প্রয়াসের নিয়ামক, সত্যের দীপ্তিময় রক্ষক, যিনি স্বীয় ধামে সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইতেছেন, তাঁহারই নিকট আগত হই। (৮)

যেমন পিতার সামীপ্য সন্তানের সুলভ, তুমিও সেইরূপ আমাদের নিকট সুলভ হও, দৃঢ়সঙ্গী হইয়া কল্যাণগতি সাধিত কর। (৯)

[বিকল্প অনুবাদ]

তপোদেবতা অগ্নিকে আমি কামনা করি আমার যজ্ঞের যিনি পুরোহিত ও ঋত্বিক, আমার যজ্ঞের যিনি হোতা, প্রভূত আনন্দ যাঁহার দান। (১)

তপোদেবতাই পুরাতন ঋষিদের কাম্য ছিলেন, তিনিই নবীনদের কাম্য। তিনিই এই পৃথিবীতে দেবসংঘকে বহন করিয়া আসেন। (২)

তপোদেব অগ্নি দ্বারা মানুষ সেই বৈভব ভোগ করে যাহার দিনদিন বৃদ্ধি যে যশস্বী যে বীরশক্তিতে ভরা। (৩)

হে অগ্নি তপোদেবতা, যে পথযাত্রী যজ্ঞের চারিদিকে তুমি তোমার সত্তায় পরিবেষ্টন কর, সেই কর্ম্মই দেবমণ্ডলে পহুঁচিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হয়। (৪)

তপোদেবতা অগ্নি আমাদের যজ্ঞের হোতা সত্য কবিকর্ম্মা বিচিত্র ভিন্ন স্তুতির শ্রোতা। দেবতা, অন্যসকল দেবতাদের লইয়া আমাদের নিকটে আসেন। (৫)

হে অঙ্গিরা অগ্নি, যজ্ঞদাতার জন্যে তুমি যে পরম আনন্দ ও কল্যাণ সৃষ্টি করিবে, সেটাই সেই পরম সত্য। (৬)

অগ্নি তপোদেবতা, আমরা প্রতিদিন দিনে রাত্রে তোমার কাছে চিন্তায় মনের নতি ভরিয়া বহন করিয়া আসি। (৭)

তুমি দেবযাত্রী রাজাস্বরূপ সত্যের গোপ্তা স্বভবনে সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইয়া স্বদীপ্তি প্রকাশ কর। (৮)

পিতা যেমন তাঁহার পুত্রের তুমিও আমাদের সহজগম্য হও। আমাদের স্বস্তি দিতে লাগিয়া থাক। (৯)

ব্যাখ্যা

বিশ্বযজ্ঞ

বিশ্বজীবন একটী বৃহৎ যজ্ঞস্বরূপ। যজ্ঞের দেবতা স্বয়ং ভগবান, প্রকৃতি যজ্ঞদাতা। ভগবান শিব, প্রকৃতি উমা, উমার হৃদয়ের অন্তরে শিবরূপকে ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ শিবরূপ হারা, প্রত্যক্ষ শিবরূপকে পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। এই লালসা বিশ্বজীবনের নিগূঢ় অর্থ।

কিন্তু কি উপায়ে সফলমনোরথ হয়? নিজ স্বরূপে পহুঁচিয়া পুরুষোত্তমের স্বরূপকে পাইবার কি কৌশল বিধেয়, কোন্ পথ প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট? চক্ষে অজ্ঞানের আবরণ, চরণে স্থূলের সহস্র নিগড়। স্থূলসত্তা অনন্ত সৎকেও যেন সান্তে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নিজেও যেন বন্দী হইয়া পড়িয়াছে, স্বয়ংগঠিত এই কারাগৃহের হারান চাবি আর হাতের কাছে পায় না। জড়-প্রাণশক্তির অবশ সঞ্চারে অনন্ত উন্মুক্ত চিৎশক্তি যেন বিমূঢ়, নিলীন অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। অনন্ত আনন্দ যেন তুচ্ছ সুখদুঃখের অধীন প্রাকৃত চৈতন্য সাজিয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতে বেড়াইতে নিজ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না, খুঁজিতে খুঁজিতে আরও দুঃখের অসীম পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে যায়। সত্য যেন অনৃতের দ্বিধাময় তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছে। মানসাতীত বিজ্ঞানতত্ত্বে অনন্ত সত্যের প্রতিষ্ঠাস্থল, বিজ্ঞানতত্ত্বের ক্রীড়া পার্থিব চৈতন্যে হয় নিষিদ্ধ নয় স্বল্প ও বিরল, যেন আড়াল হইতে ক্ষণিক বিদ্যুতের ভগ্ন উন্মেষ মাত্র। এখানে শুধু সত্যানৃতে দোলায়মান ভীরু খোঁড়া মূঢ় মানসতত্ত্ব ঘুরিয়া ফিরিয়া সত্যকে অন্বেষণ করিতেছে, পাইয়াও আবার হারায়, একমুহূর্ত্ত সত্যের একদিক ধরিয়া রাখিতে পারিলে অন্যদিক ধরিতে গিয়াই প্রথমটী হাত হইতে খসিয়া যায়। মানসতত্ত্ব বিপুল প্রয়াসে সত্যের আভাস বা সত্যের ভগ্নাংশ পাইতে পারে, কিন্তু সত্যের পূর্ণ ও প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময় অনন্তরূপ তাহার হস্তের ইয়ত্তার অতীত। যেমনই জ্ঞানে, তেমনই কর্ম্মেও সেই বিরোধ, সেই অভাব, সেই বৈফল্য। সহজ সত্যকর্ম্মের হাস্যময় দেবনৃত্যের স্থানে প্রাকৃত ইচ্ছাশক্তির নিগড়বদ্ধ চেষ্টা সত্য অসত্য পাপ পুণ্য বৈধ অবৈধ কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্মের জটিলপাশে বৃথা ছটফট করিতেছে। বাসনাহীন বৈফল্যহীন আনন্দময় প্রেমময় ঐক্যরসমত্তা ভাগবতী ক্রিয়াশক্তির গতি সর্ব্বদা মুক্ত অকুণ্ঠিত ও অস্খলিত। সেই স্বাভাবিক সহজ বিশ্বময় সঞ্চরণ প্রাকৃত ইচ্ছাশক্তির অসম্ভব।

এইরূপে সান্তের অনৃত ফাঁদে পড়া এই পার্থিব প্রকৃতির সেই অনন্ত সত্তা, অনন্ত চিৎশক্তি, অনন্ত আনন্দচৈতন্য লাভ করিবার কি বা আশা কি বা উপায়?

যজ্ঞই উপায়। যজ্ঞের অর্থ আত্মসমর্পণ, আত্মবলিদান। যাহা তুমি আছ, যাহা তোমার আছে, যাহা ভবিষ্যতে স্বচেষ্টায় বা দেবকৃপায় হইতে পার, যাহা কিছু কর্ম্মপ্রবাহে অর্জ্জন বা সঞ্চয় করিতে পার, সবই সেই অমৃতময়ের উদ্দেশ্যে হবিঃরূপে তপঃ অগ্নিতে ঢাল। ক্ষুদ্র সর্ব্বস্ব দানে অনন্ত সর্ব্বস্ব লাভ করিবে। যজ্ঞে যোগ নিহিত। যোগে আনন্ত্য অমরত্ব ও পরমতত্ত্বের পরমানন্দ প্রাপ্তি বিহিত। ইহাই প্রকৃতির উদ্ধারের পথ।

জগতী দেবী সেই রহস্য জানেন। সেই বিপুল আশায় তিনি সর্ব্বদা অনিদ্রিত অশ্রান্ত, রাতদিন মাস পরে মাস বৎসর পরে বৎসর যুগ পরে যুগ যজ্ঞই করিতেছেন। আমাদের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত দ্বেষ ভ্রম, সুখদুঃখ এই বিশ্বযজ্ঞের অঙ্গমাত্র। জগতী দেবী স্থূল সৃষ্টি করিয়া বিশ্বময় অগ্নির জঠরে ঢালিয়া দিয়াছেন, পেয়েছেন বদলে প্রাণশক্তির খেলা জীবে উদ্ভিদে, ধাতুতে। কিন্তু প্রাণশক্তি প্রকৃতির স্বরূপ নহে, প্রাণময় পুরুষ পুরুষোত্তম নহেন। জগতী দেবী জগতের সকল প্রাণী ও তাহাদের সকল চেষ্টা বৈশ্বানর অগ্নির ক্ষুধিত জঠরে ঢালিয়া দিয়াছেন, পেয়েছেন বদলে মনঃশক্তির খেলা পশুতে, পক্ষীতে, মনুষ্যে। কিন্তু মনঃশক্তিও প্রকৃতির স্বরূপ নহে, মনোময় পুরুষ পুরুষোত্তম নহেন। জগতী দেবী জগতের সকল প্রেমদ্বেষ, হর্ষদুঃখ, সুখবেদনা, পাপপুণ্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, চেষ্টা-আবিষ্কার, মতিমনীষাবুদ্ধি বিশ্বমানব অগ্নির অনন্ত জঠরে ঢালিয়া দিয়াছেন, পাইবেন বদলে বিজ্ঞান তত্ত্বের উন্মুক্ত দ্বার, অনন্ত সত্যের পন্থা, বিশ্ব-পর্ব্বতের আনন্দ চূড়ায় আরোহণ, অনন্ত ধামে অনন্ত পুরুষোত্তমের আলিঙ্গন।

পাইবেন, কিন্তু এখনও পান নাই। ক্ষীণ আশার রেখামাত্র কাল-গগনে দেখা দিয়াছে। অতএব অনবরত যজ্ঞ চলিতেছে, দেবী যাহাই উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন, তাহাই বলি দিতেছেন। তিনি জানেন সকলের ভিতরে সেই লীলাময় অকুণ্ঠিত মনে লীলার রসাস্বাদন করিতেছেন, যজ্ঞ বলিয়া সকলের চেষ্টা সকল তপস্যা গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই বিশ্বযজ্ঞকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া উত্থানে পতনে জ্ঞানে অজ্ঞানে জীবনে মৃত্যুতে নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যধামের দিকে সর্ব্বদাই অগ্রসর করিতেছেন। তাঁহার ভরসায় প্রকৃতি দেবী নির্ভীক অকুণ্ঠিত বিচারহীন। সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই ভাগবতী প্রেরণা বুঝিয়া সৃজন ও হনন, উৎপাদন ও বিনাশ, জ্ঞান ও অজ্ঞান সুখদুঃখ পাপপুণ্য পক্ক অপক্ক কুৎসিত সুন্দর পবিত্র

অপবিত্র যাহা হাতে পান, সবই সেই বৃহৎ চিরন্তন হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছেন। স্থূল সূক্ষ্ম যজ্ঞের হবিঃ, জীব যজ্ঞের বদ্ধ পশু। যজ্ঞের মনপ্রাণদেহরূপ ত্রিবন্ধনযুক্ত যূপকাষ্ঠে জীবকে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রকৃতি তাহাকে অহরহ বলি দিতেছেন। মনের বন্ধন অজ্ঞান, প্রাণের বন্ধন দুঃখ বাসনা ও বিরোধ, দেহের বন্ধন মৃত্যু।

প্রকৃতির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল, এই বদ্ধ জীবের কি উপায় হইবে? তাহার নিস্তার না হইলে প্রকৃতিরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সেজন্য উপায় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটী কি? উপায় যজ্ঞ, আত্মদান, আত্মবলি। তবে প্রকৃতির অধীন না হইয়া, স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইয়া যজমান সাজিয়া সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য যে পুরুষই যেমন যজ্ঞের দেবতা, পুরুষও যজ্ঞের পশু। জীবই পশুরূপ পুরুষ। পুরুষ নিজ শরীর-মন-প্রাণ বলিরূপে যজ্ঞের প্রধান উপায়রূপে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মদানের এই গুপ্ত উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে যে একদিন চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিকে নিজ হাতে লইয়া, প্রকৃতিকে তাঁহারা ইচ্ছার বশীভূত দাসী প্রণয়িনী ও যজ্ঞের সহধর্ম্মিণী করিয়া স্বয়ং নির্দ্দোষ যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। এই গুপ্ত কামনা পূরণার্থে নরের সৃষ্টি। পুরুষোত্তম নরমূর্ত্তিতে সেই লীলা করিতে চান। আত্মস্বরূপ, অমরত্ব, সনাতন আনন্দের বিচিত্র আস্বাদন, অনন্ত জ্ঞান, অবাধ শক্তি, অনন্ত প্রেম নরদেহে নরচৈতন্যে ভোগ করিতে হইবে। সকল আনন্দ পুরুষোত্তমের মধ্যে আছেই। পুরুষ নিজের মধ্যে সনাতনরূপে সনাতনভোগ সর্ব্বদা করিতেছেন, তাহার উপর মানবকে সৃষ্টি করিয়া বহুতে একত্ব, সান্তে অনন্ত, বাহ্যেতে আন্তরিকতা, ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়, পার্থিবে অমরলোকত্ব, এই বিপরীত রসগ্রহণে তিনি তৎপর। প্রথমে দুটীর মধ্যে অবিদ্যায় ভেদ সৃজন করিয়া ভোগ করিবার ইচ্ছা, পরে অবিদ্যাকে বিদ্যার আর বিদ্যাকে অবিদ্যার আলিঙ্গনে জড়াইয়া একত্বে দ্বিবিধত্ব বজায় রাখিয়া এক আধারে যুগপৎ সম্ভোগে দুইটী ভগিনীর পূর্ণ ভোগ করিবেন। জাগরণের দিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যেই মনের উপরে বুদ্ধির ওপারে গুপ্ত সত্যময় বিজ্ঞানতত্ত্বে বসিয়া, আবার আমাদের মধ্যেই হৃদয়ের নীচে চিত্তের যে গুপ্ত স্তর, যেখানে হৃদয়গুহা, যেখানে নিহিত গুহ্য চৈতন্য-সমুদ্র, হৃদয় মন প্রাণ দেহ অহঙ্কার যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র, সেইখানেও বসিয়া এই পুরুষ প্রকৃতির অন্ধ প্রয়াস, অন্ধ অন্বেষণ দ্বন্দ্ব প্রতিঘাতে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টায় নানা রসাস্বাদন অনুভব করিতেছেন। উপরে সজ্ঞানে ভোগ, নিম্নে অজ্ঞানে ভোগ, এইরূপে দুইটীই যুগপৎ চলিতেছে। কিন্তু চিরদিন এই অবস্থায় মগ্ন হইলে তাঁহার নিগূঢ় প্রত্যাশা, তাঁহার চরম অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়

না। এইজন্য প্রত্যেক মানুষের জাগরণের দিন বিহিত। অন্তঃস্থ দেবতা একদিন অবশ পুণ্যহীন প্রাকৃত আত্মবলি ত্যাগ করিয়া সজ্ঞান সমন্ত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন; সকল প্রাণীমাত্রের পক্ষে ইহা অবধারিত।

এই সজ্ঞান সমন্ত্র যজ্ঞ বেদোক্ত কর্ম্ম। তাহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, বিশ্বময় বহুত্বে সম্পূর্ণতা — যাহাকে বেদে বৈশ্বদেব্য ও বৈশ্বানরত্ব বলে, আর তাহার সহিত একাত্মক পরমদেবসত্তায় অমরত্বলাভ। যখন বৈশ্বদেব্য বলি, ইহা বুঝিবেন যে বেদোক্ত দেবগণ অর্ব্বাচীন সাধারণের হেয় ইন্দ্র অগ্নি বরুণ নামক ক্ষুদ্র দেবতা নন। ইহারা ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় শক্তিধর নানা মূর্ত্তি। আর এই অমরত্ব পুরাণোক্ত তুচ্ছ স্বর্গ নয়। বৈদিক ঋষিদের অভিলষিত স্বর্লোক জন্ম মৃত্যুর ওধারে পরমধাম অনন্তলোকের প্রতিষ্ঠা, বেদোক্ত অমরত্ব সচ্চিদানন্দের অনন্ত সত্তা ও চৈতন্য। মানবের ভিতরে দেবত্ব জাগরণ, মানবাধারে সকল দেবতার গঠন, সেই দেবতাগণের একীভূত বহুত্বকে স্বপ্রতিষ্ঠা করিয়া পরম দেবতত্ত্বের সত্তায় চরম আরোহণ ও সেই জগৎবন্ধু গোপালের* ক্রোড়ে নির্ম্মল আনন্দের ক্রীড়া, ইহাই বেদোক্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

তপোদেব অগ্নি

এই যজ্ঞে জীবই যজমান, গৃহস্বামী, জীবের প্রকৃতি গৃহপত্নী, যজমানের সহধর্ম্মিণী, কিন্তু পুরোহিত কে হইবে? জীব যদি স্বয়ং স্বযজ্ঞের পৌরোহিত্য সম্পাদন করিতে যায়, যজ্ঞ সুচারুরূপে পরিচালিত হইবার আশা নাই-ই বলা যায়; কারণ জীব অহঙ্কার দ্বারা চালিত, মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক ত্রিবিধ বন্ধনে জড়িত। এই অবস্থায় স্বপৌরোহিত্য গ্রহণ করায় অহঙ্কারই হোতা ঋত্বিক এমন কি যজ্ঞের দেবতা সাজে, তাহা হইলে অবৈধ যজ্ঞবিধানে মহৎ অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা। প্রথমে নিতান্ত বদ্ধ অবস্থা হইতে সে মুক্তি চায়। আর যদি বন্ধনমুক্ত হইতে হয়, স্বশক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় লইতেই হইবে। ত্রিবিধ যূপরজ্জুর শিথিলীকরণের পরেও যজ্ঞ চালাইবার মত নির্দোষ জ্ঞান ও শক্তি হঠাৎ প্রাদুর্ভূত বা সত্বরে সুগঠিত হয় না। দিব্য জ্ঞান ও দিব্য শক্তির প্রয়োজন, তাহার যজ্ঞ দ্বারাই আবির্ভাব ও সুগঠন সম্ভব। আর জীব মুক্ত হইলেও, দিব্যজ্ঞানী ও

* কথাটী বৈদিক। ভগবানের গোপালত্ব পুরাণের সৃষ্টি নয়, ইহা বৈদিক উপমা।

দিব্যশক্তিমান হইলেও যজ্ঞের ভর্ত্তা অনুমন্তা ঈশ্বরও যজ্ঞফলের ভোক্তা হয়, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা হয় না। দেবতাকেই পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া বেদীর উপরে সংস্থাপিত করিতে হইবে। দেবতা স্বয়ং মানবহৃদয়ে প্রবিষ্ট প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের পক্ষে দেবত্ব ও অমরত্ব অসাধ্য। সত্য বটে দেবতা জাগ্রত হওয়ার আগে সেই বোধনার্থে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যজমানের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সুদাস ত্রসদস্যু ও ভরতপুত্রের হোতা হন। কিন্তু দেবতাকে আহ্বান করিয়া বেদীর উপরে পুরোহিত ও হোতার স্থান দিবার জন্যেই সেই মন্ত্র প্রয়োগ ও হবিঃ প্রয়োগ। দেবতা অন্তরে জাগ্রত না হইলে কেহ জীবকে তরণ করিতে পারে না। দেবতাই ত্রাণকর্ত্তা, দেবতাই যজ্ঞের একমাত্র সিদ্ধিদাতা পুরোহিত।

দেবতা যখন পুরোহিত হন, তখন তাঁহার নাম অগ্নি, তাঁহার রূপও অগ্নিরূপ। অগ্নির পৌরোহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সকল যজ্ঞের মুখ্য উপায় ও প্রারম্ভ। এইজন্যই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকে অগ্নির পৌরোহিত্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

এই অগ্নি কে? অগ্ ধাতুর অর্থ শক্তি, যিনি শক্তিমান তিনি অগ্নি। আবার অগ্ ধাতুর অর্থ আলোক বা জ্বালা, যে শক্তি জ্বলন্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, জ্ঞানের কর্ম্মবলস্বরূপ, সেই শক্তির শক্তিধর অগ্নি। আবার অগ্ ধাতুর অন্য অর্থ পূর্ব্বত্ব ও প্রধানত্ব, যে জ্ঞানময় শক্তি জগতের আদিতত্ত্ব হইয়া জগতের অভিব্যক্ত সকল শক্তির মূল ও প্রধান, সেই শক্তির শক্তিধর অগ্নি। আবার অগ্ ধাতুর অর্থ নয়ন, জগতাদি সনাতন পুরাতন প্রধান শক্তির যে শক্তিধর জগৎকে নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যধামের দিকে লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, যে কুমার দেবসেনার সেনানী, যিনি পথে প্রদর্শক, যিনি প্রকৃতির নানা শক্তিকে জ্ঞানে বলে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিয়া সুপথে চালিত করেন, সেই শক্তিধর অগ্নি। বেদের শত শত সূক্তে অগ্নির এই সকল গুণ ব্যক্ত ও স্তুত হইয়াছে। জগতের আদি, জগতের প্রত্যেক স্ফুরণে নিহিত, সকল শক্তির মূল ও প্রধান, সকল দেবতার আধার, সকল ধর্ম্মের নিয়ামক, জগতের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় সত্যের রক্ষক এই অগ্নি আর কিছুই নন, ভগবানের ওজঃ-তেজঃ-ভ্রাজঃ-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞানমণ্ডিত পরম-জ্ঞানাত্মক তপঃ-শক্তি।

সচ্চিদানন্দের সৎতত্ত্ব চিন্ময়। এই যে সতের চিৎ, সেই আবার সতের শক্তি। চিৎশক্তিই জগতের আধার, চিৎশক্তিই জগতের আদিকরণ ও স্রষ্টা, চিৎশক্তিই জগতের নিয়ামক ও প্রাণস্বরূপ। চিন্ময়ী যখন সৎপুরুষের বক্ষস্থলে মুখ লুকাইয়া

স্তিমিতলোচনে কেবল সতের স্বরূপ চিন্তা করেন, তখন অনন্ত চিৎশক্তি নিস্তব্ধ হয়, সেই অবস্থা প্রলয় অবস্থা, নিস্তব্ধ আনন্দসাগরস্বরূপ। আবার যখন চিন্ময়ী মুখ তুলিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া সৎপুরুষের মুখ ও তনু সপ্রেমে দেখেন, সৎপুরুষের অনন্ত নাম ও রূপ ধ্যান করেন, কৃত্রিম বিচ্ছেদমিলনজনিত সম্ভোগের লীলা স্মরণ করেন, তখন সেই আনন্দের অজস্র প্রবাহ তাহার উন্মত্ত বিক্ষোভ বিশ্বানন্দের অনন্ত তরঙ্গ সৃষ্টি করে। চিৎশক্তির এই নানা ধ্যান এই একমুখী অথচ বহুমুখী সমাধিই তপঃশক্তির নামে অভিহিত। সৎপুরুষ যখন তাঁহার চিৎশক্তিকে কোনও নামরূপসৃজন, কোনও তত্ত্ববিকাশ, কোনও অবস্থাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সং-গৃহীত, সঞ্চালিত, স্ববিষয়ের উপর সংস্থাপিত করেন, তখন তপঃশক্তির প্রয়োগ হয়। এই তপঃপ্রয়োগই যোগেশ্বরের যোগ। ইহাকেই ইংরাজীতে Divine will বা Cosmic will বলে। এই Divine will বা তপঃশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্ট, চালিত, রক্ষিত হয়। অগ্নিই এই তপঃ।

চিৎশক্তির দুই দিক দেখি, চিন্ময় ও তপোময়, সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটাই এক। ভগবানের জ্ঞান সর্ব্বশক্তিময়, তাঁহার শক্তি সর্ব্বজ্ঞানময়। তিনি আলোকজ্ঞান করিলেই আলোক সৃষ্টি অনিবার্য্য: কারণ তাঁহার জ্ঞান তাঁহার শক্তির চিন্ময় স্বরূপ মাত্র। আবার জগতের যে কোন জড়স্পন্দনেও, যেমন অণুর নৃত্যে বা বিদ্যুতের লম্ফনে জ্ঞান নিহিত, কারণ তাঁহার শক্তি তাঁহার জ্ঞানের স্ফুরণ মাত্র। কেবল আমাদের মধ্যে অবিদ্যার ভেদবুদ্ধিতে অপরাপ্রকৃতির ভেদগতিতে জ্ঞান ও শক্তি বিভিন্ন অসম ও পরস্পরে যেন কলহ-প্রিয় বা অমিলে ক্লিষ্ট ও খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে অথবা ক্রীড়ার্থে সেইরূপ অসমতা ও কন্দলের ঢং করে। প্রকৃতপক্ষে জগতের ক্ষুদ্রতম কর্ম্ম বা সঞ্চারে ভগবানের সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তি নিহিত, ইহার ব্যতিরেকে বা ইহার কমেতে সে কর্ম্ম বা সঞ্চার ঘটাইবার কাহারও শক্তি নাই। যেমন ঋষির বেদবাক্যে বা শক্তিধর মহাপুরুষের যুগপ্রবর্ত্তনে, তেমনি মূর্খের নিরর্থক বাচালতায় বা আক্রান্ত ক্ষুদ্র কীটের ছটফটানিতে এই সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত হয়। তুমি আমি যখন জ্ঞানের অভাবে শক্তির অপচয় করি বা শক্তির অভাবে জ্ঞানের নিষ্ফল প্রয়োগ করি, সর্ব্বজ্ঞানী সর্ব্বশক্তিমান আড়ালে বসিয়া সেই শক্তিপ্রয়োগকে তাঁহার জ্ঞান দ্বারা, সেই জ্ঞানপ্রয়োগকে তাঁহার শক্তি দ্বারা সামলান ও চালান বলিয়া সেই ক্ষুদ্র চেষ্টায় জগতে একটা কিছু হয়। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হইয়া উঠিল, তাহার উচিত কর্ম্মফলও সাধিত হইল। ইহাতে আমার তোমার অজ্ঞ মনোরথ ও প্রত্যাশা ব্যর্থ

হইল বটে, কিন্তু সেই বৈফল্যেই তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি সাধিত হয় এবং সেই বৈফল্যেই আমাদের কোনও ছদ্মবেশী কল্যাণ ও জগতের মহান উদ্দেশ্যের এক ক্ষুদ্রতম অংশের ক্ষুদ্র আংশিক অথচ অত্যাবশ্যক উপকার সিদ্ধ হয়। অশুভ, অজ্ঞান ও বৈফল্য ছদ্মবেশ মাত্র। অশুভে শুভ, অজ্ঞানে জ্ঞান, বৈফল্যে সিদ্ধি ও শক্তি গুপ্ত হইয়া অপ্রত্যাশিত কর্ম্ম সম্পাদন করে। তপঃ-অগ্নির নিগূঢ় অবস্থিতি ইহার কারণ। এই অনিবার্য্য শুভ, এই অখণ্ডনীয় জ্ঞান, এই অবিতথ শক্তি ভগবানের অগ্নিরূপ। যেমন সৎপুরুষের চিৎ ও তপঃ এক, যেমন দুইটাই আনন্দেরই স্পন্দন, সেইরূপে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ এই অগ্নিতে জ্ঞান ও শক্তি অবিচ্ছিন্ন এবং দুইটাই শুভ ও কল্যাণকর।

জগতের বাহিরের আকৃতি অন্যরূপ, সেখানে অনৃত, অজ্ঞান, অশুভ, বৈফল্যই প্রধান। অথচ এই ছেলেকে ভয় দেখান মুখোসের ভিতরে মাতৃমুখ লুক্কায়িত। এই অচেতন, এই জড়, এই নিরানন্দ ভেল্কী মাত্র, ভিতরে জগৎপিতা জগন্মাতা জগতাত্মা সচ্চিদানন্দ আসীন। এইজন্য বেদে আমাদের সাধারণ চৈতন্য রাত্রী নামে অভিহিত। আমাদের মনের চরম বিকাশও জ্যোৎস্না-পুলকিত তারানক্ষত্র-মণ্ডিত ভগবতী রাত্রীর বিহার মাত্র। কিন্তু এই রাত্রীর কোলে তাঁহার ভগিনী দৈবী উষা অনন্তপ্রসূত ভাবী দিব্যজ্ঞানের আলোক লইয়া লুক্কায়িত। পার্থিব চৈতন্যের এই রাত্রীতেও তপঃ-অগ্নি পুনঃ পুনঃ জাজ্বল্যমান হইয়া উষার আভাতে আলোকবিস্তার করেন। তপঃ-অগ্নিই অন্ধ জগতে সত্যচৈতন্যময়ী উষার জন্ম-মুহূর্ত্ত প্রস্তুত করিতেছেন। পরম দেবতা এই তপঃ-অগ্নিকে জগতে প্রেরণ ও স্থাপন করিয়াছেন, প্রত্যেক পদার্থ ও জীবজন্তুর অন্তরে নিহিত হইয়া বিশ্বের সমস্ত গতিকে অগ্নিই নিয়মন করিতেছেন। ক্ষণিক অনৃতের মধ্যে সেই অগ্নিই চিরন্তন সত্যের রক্ষক, অচেতনে ও জড়ে অগ্নিই অচেতনের নিগূঢ় চৈতন্য, জড়ের প্রচণ্ড গতি ও শক্তি। অজ্ঞানের আবরণে অগ্নিই ভগবানের গূঢ় জ্ঞান, পাপের বৈরূপ্যে অগ্নিই তাঁহার সনাতন অকলঙ্ক শুদ্ধতা, দুঃখদৈন্যের বিমর্ষ কুয়াশায় অগ্নিই তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বভোগী আনন্দ, দুর্ব্বলতা ও জড়তার মলিন বেশে অগ্নিই তাঁহার সর্ব্ববাহক সর্ব্বকর্ম্ম-বিশারদ ক্রিয়াশক্তি। একবার এই কৃষ্ণ আবরণ ভেদ করিয়া যদি অগ্নিকে আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত প্রকাশিত উন্মুক্ত ও ঊর্দ্ধগামী করিতে পারি, তিনিই দৈবী উষাকে মানবচৈতন্যে আনিয়া দেবগণকে ভিতরে জাগাইয়া অনৃত অজ্ঞান নিরানন্দ বৈফল্যের কৃষ্ণ আবরণকে সরাইয়া আমাদিগকে অমর ও দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলিবেন। অগ্নিই অন্তঃস্থ দেবতার প্রথম ও প্রধান

জাগ্রত রূপ। তাঁহাকে হৃদয়বেদীতে প্রজ্বলিত করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করি। তাঁহার সর্ব্বপ্রকাশক জ্বালা জ্ঞান, তাঁহার সর্ব্বদাহক ও পাবক জ্বালা শক্তি। সেই জ্ঞানময় শক্তিময় জ্বলন্ত আগুনে আমাদের এই সকল তুচ্ছ সুখদুঃখ, এই সকল ক্ষুদ্র পরিমিত চেষ্টা ও বৈফল্য, এই সমুদায় মিথ্যা ও মৃত্যু সমর্পিত করি। পুরাতন ও অনৃত ভস্মীভূত হৌক, নূতন ও সত্য জাজ্বল্যমান সাবিত্রীরূপে গগনস্পর্শী তপঃ-অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইবে।

ভুলিও না যে সকলই আমাদের অন্তরে, মানবের ভিতরেই অগ্নি, ভিতরেই বেদী, হবিঃ ও হোতা, ভিতরেই ঋষি মন্ত্র ও দেবতা, ভিতরেই ব্রহ্মের বেদগান, ভিতরেই ব্রহ্মদ্বেষী রাক্ষস ও দেবদ্বেষী দৈত্য, ভিতরেই বৃত্র ও বৃত্রহন্তা, ভিতরেই দেবদৈত্য যুদ্ধ, ভিতরেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু অথর্ব্বা সুদাস ত্রস-দস্যু দাসজাতি ও পঞ্চবিধ ব্রহ্মান্বেষী আর্য্যগণ। মানবের আত্মা ও জগৎ এক। তাহার ভিতরেই দূর ও নিকট, দশ দিক, দুই সমুদ্র, সপ্ত নদী, সপ্ত ভুবন। দুই গুপ্ত সমুদ্রের মাঝখানে আমাদের এই পার্থিব জীবন প্রকাশিত। নিম্নর সমুদ্র সেই গুহ্য অনন্ত চৈতন্য যাহা হইতে এই সমুদায় ভাব ও বৃত্তি, নাম ও রূপ অহরহঃ ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাদুর্ভূত হয়, যেমন ভগবতী রাত্রীর কোলে তারা নক্ষত্র প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকে আধুনিক ভাষায় অচেতন (inconscient) বা অচেতন-চৈতন্য (subconscient) বলে, বেদের অপ্রকেতং সলিলং, প্রজ্ঞাহীন সমুদ্র। প্রজ্ঞাহীন হইলেও সে অচেতন নয়, তাহার মধ্যে প্রজ্ঞাতীত বিশ্বচৈতন্য সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্মে সমর্থ হইয়া যেন অবশ সঞ্চারে জগতের সৃষ্টি ও গতি সম্পাদিত করে। উপরে গুহ্য মুক্ত অনন্ত চৈতন্য যাহাকে অতিচৈতন্য (superconscient) বলে, যাহার ছায়া এই অচেতন-চেতন। সেখানে সচ্চিদানন্দ জগতে পূর্ণপ্রকাশিত, সত্যলোকে অনন্ত সৎ-রূপে তপোলোকে অনন্ত চিৎ-রূপে জনলোকে অনন্ত আনন্দরূপে, মহর্লোকে বিশাল বিশ্ব-আধার সত্যরূপে। মধ্যস্থ পার্থিব চৈতন্য বেদোক্ত পৃথিবী। এই পৃথিবী হইতে জীবনের আরোহণীয় পর্ব্বত গগনে উঠে, তাহার প্রত্যেক সানু আরোহণের একটী সোপান, প্রত্যেক সানু সপ্তলোকের একটী লোকের অন্তঃস্থ রাজ্য। দেবতারা আরোহণের সহায়, দৈত্যরা শত্রু ও পথরোধক। এই পর্ব্বতারোহণই বৈদিক সাধকের যজ্ঞগতি, যজ্ঞের সহিত পরম-লোকে পরম আকাশে আলোকসমুদ্রে উঠিতে হইবে। আরোহণের এই অগ্নিই সাধনস্বরূপ, এই পথের নেতা, এই যুদ্ধের যোদ্ধা, এই যজ্ঞের পুরোহিত। বৈদিক কবিগণের অধ্যাত্মজ্ঞান এই মূল উপমার উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন বৃন্দাবনবাসী

প্রেমিক গোপগোপীর উপমার উপর বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞান-সকল। এই উপমার অর্থ সর্ব্বদা মনে রাখিলে বেদতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়া উঠে।

প্রথম মণ্ডল — সূক্ত ২

হে সর্ব্বদ্রষ্টা জীবনদেব বায়ু, এস। এই তোমার জন্যে আনন্দের মদ্যরস প্রস্তুত। এই আনন্দ মদ্যরস পান কর, শুন এই আহ্বান যখন ডাকি, শুন। (১)

জীবনদেবতা, তোমার প্রণয়ীগণ তাহাদের উক্তি বলে তোমাকে সাধনা করে, তাহাদের আনন্দরস প্রস্তুত, তোমার দিনগুলির জ্যোতি তাহাদের আয়ত্ত। (২)

জীবনদেবতা, দাতার জন্যে তোমার ভরা প্রাণনদী স্পর্শ করিয়া বহিতেছে, আনন্দ মদ্য পান করিতে তাহার স্রোত হইয়াছে উরু ও বিস্তৃত। (৩)

ইন্দ্র ও বায়ু, এই সেই আনন্দ মদ্যরস, শ্রেয়সকল লইয়া এস। সোম দেবতারা তোমাদের দুইজনকে কামনা করে। (৪)

বিভবে ধনশালী, ইন্দ্র ও বায়ু তোমরা আনন্দরসের চেতনা জাগাইয়া দাও। ধাবিত হও, এস। (৫)

ইন্দ্র ও বায়ু, ত্রিদিবের নর, তোমাদের যথার্থ চিন্তা লইয়া এই সু-সিদ্ধ আনন্দ রসভোগ করিতে শীঘ্র উপস্থিত হও। (৬)

পবিত্র বুদ্ধি মিত্রকে, নাশক পরিপন্থীর বিনষ্টা বরুণকে আহ্বান করি, জ্যোতির্ম্ময় যাঁহারা সত্যের আলোময় চিন্তা সাধনা করেন। (৭)

মিত্র ও বরুণ, তোমরা সত্যকে বর্দ্ধন কর, সত্যকে স্পর্শ কর, সত্য দ্বারা বৃহৎ কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়া ভোগ কর। (৮)

মিত্র ও বরুণ আমাদের দুই দ্রষ্টা কবি। বহুবিধ তাহাদের জন্ম, উরু অনন্তলোক বাসভূমি। কর্ম্মে তাহারা সম্মুখ জ্ঞানশক্তি ধারণ করেন। (৯)

প্রথম মণ্ডল — সূক্ত ৩

দ্রুতপদ অশ্বীদ্বয়, বহুভোগী আনন্দপতি, আমাদের কর্ম্মপ্রসূত প্রেরণাসকলে আনন্দ কর। (১)

বহুকর্ম্মী মনস্বী নর অশ্বীদ্বয়, তোমাদের তেজোময় চিন্তায় আমাদের উক্তি-

সকলকে স্থান দিয়া সম্ভোগ কর। (২)

হে কর্ম্মী পথিকদ্বয়! প্রসৃত হইয়াছে, তাহার যৌবনভরা এই আনন্দরস স্থান এই যজ্ঞাসন, সেও প্রস্তুত। তীব্রপন্থী তোমরা এস। (৩)

হে বিচিত্ররশ্মি শক্তিধর ইন্দ্র, দশটী সূক্ষ্ম শক্তির হাতে এই সোমরস শরীরে পূত হইয়া তোমাকে কামনা করিতেছে। (৪)

এস, ইন্দ্র, আমাদের চিন্তা তোমাকে পথপ্রেরণা দিতেছে, দ্রষ্টা ঋষি সবেগে পথে চালাইতেছেন। সোমদাতা! আহ্বানকারীর মন্ত্রগুলি বরণ করিতে এস। (৫)

হরি-অশ্বের নিয়ামক ইন্দ্র, ত্বরিতগতি মন্ত্রগুলিকে বরণ করিতে এস এই সোমরসে যে আমাদের আনন্দ তোমার মনেও সেটিকে ধারণ কর। (৬)

হে বিশ্বদেবেরা তোমরাও এস যাহারা দ্রষ্টা মনুষ্যদের কল্যাণকারী ধারণকর্ত্তা, দাতার আনন্দরস যাহারা বিতরণ কর। (৭)

হে বিশ্বদেবেরা স্বর্গ নদী তরণ করিয়া ত্বরিত এস সোম যজ্ঞের যেন স্ব স্ব বিশ্রাম স্থানে ত্রিদিবের দীপ্ত গাভীসংঘ। (৮)

হে বিশ্বদেবেরা, তোমরা তীব্রজ্ঞানী, নাই তোমাদের বিরোধী, নাই তোমাদের বিনষ্টা। আমার মনের এই যজ্ঞ বহন কর, বরণ কর। (৯)

বিশ্বপাবনী দেবী সরস্বতী বহুবৈভবে বৈভবশালিনী চিন্তাধনে ঐশ্বর্য্যময়ী, তিনিও যেন আমার এই যজ্ঞকর্ম্মকে কামনা করেন। (১০)

সরস্বতী সত্যবাকের প্রেরণাদাত্রী সরস্বতী সুচিন্তায় জ্ঞানজাগরণকর্ত্রী, আমার যজ্ঞকর্ম্মকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। (১১)

সরস্বতী মনের দৃষ্টির বলে চেতনার মহাসমুদ্রকে আমাদের জ্ঞানের বস্তু করেন। আমার সকল চিন্তায় আলোকবিস্তার করিয়া তিনি আসীন। (১২)

প্রথম মণ্ডল — সূক্ত ৪

প্রতিদিন সেই সুন্দর রূপগুলির শিল্পীকে যেন জ্ঞানরশ্মির দোহন করিতে কুশল দোহনকারীকে আহ্বান করি। (১)

আনন্দরসের আনন্দপায়ী, সোমযজ্ঞে এস। পান কর। বহু ঐশ্বর্য্য, তোমার মত্ততা। (২)

তোমার সেই অন্তরতম সুচিন্তাসকল আমাদের জ্ঞানে আসে। এস, তোমার প্রকাশ আমাদের ওপারে যেন না যায়। (৩)

অগ্রসর হও ওই পারেই, শক্তিমান অপরাজিত আলোকিতচিত্ত ইন্দ্রকে প্রাপ্ত কর, যিনি তোমার সখাদের যাহা পরম তাহা বিধান করিবেন। (৪)

যাহারা আমাদের সিদ্ধির নিন্দা করে, তাহারা বলিবে "যাও, হইয়াছে, অন্য ক্ষেত্রেও সাধনা কর। ইন্দ্রেই তোমাদের কর্ম্ম স্থাপিত কর"। (৫)

হে কর্ম্মী এই আর্য্য জাতিরাও আমাদের সৌভাগ্যশালী বলুক। ইন্দ্রর শান্তিতে আনন্দে আমরা যেন বাস করি। (৬)

তীব্র গতি ইন্দ্রকে এই তীব্রগতি যজ্ঞশ্রী, এই নরচিত্ত মত্তকারী আনন্দমদিরা লইয়া দাও। তাঁহাকে পথপ্রেরণা দাও যিনি তাঁহার সখাদের আনন্দমত্ততায় বিভোর করেন। (৭)

হে শতকর্ম্মী, এই আনন্দরস পান করিয়া তুমি আবরণকারীদের বিনাশ করিয়াছ, ঐশ্বর্য্যশালী মনুষ্যকে তাহার ঐশ্বর্য্যে বর্দ্ধিত করিয়াছ। (৮)

হে ইন্দ্র শতকর্ম্মী, ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী তোমাকে ঐশ্বর্য্যে ভরণ করি, তুমি আরও ধনরাশি আমাদের হইয়া জয় করিবে। (৯)

যিনি ঐশ্বর্য্য নদী, যিনি মহান, যিনি ওপারে নিত্য পথে পৌঁছান, যিনি সোম-দাতার সখা, সেই ইন্দ্রকে গান কর। (১০)

প্রথম মণ্ডল — সূক্ত ৫

হে স্তোমবাহক সখাগণ, এস, বল, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে গান কর। (১)

বহুর মধ্যে যাহার বহুত্ব শ্রেষ্ঠ, সকল কমনীয় বস্তুর যিনি ঈশ্বর, প্রকাশ — আনন্দরসকে দোহন করিয়া সেই ইন্দ্রকে গান কর। (২)

তিনি যেন যোগে আমাদের লভ্যলাভে, তিনি ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ দিতে, তিনি এই পুরীর অধিষ্ঠাত্রী শক্তিতে আবির্ভূত হন। যেন তাঁহার সকল বৈভব লইয়া আমাদের কাছে আসেন। (৩)

যাঁহার যুদ্ধে দীপ্ত অশ্বদেরকে শত্রুরা সংগ্রামে রোধ করিতে অসমর্থ, সেই ইন্দ্রকে গান কর। (৪)

তিনি আনন্দরসকে পবিত্র করেন, পবিত্র হইয়া এই যে দধিমিশ্রিত সোম পানার্থে তাঁহার নিকট যাইতেছে। (৫)

হে সুতকর্ম্মী ইন্দ্র তাহা পান করিতে, মহতের মহত্তম হইতে তুমি সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে বিস্তার কর। (৬)

হে মন্ত্রপ্রিয়, সেই তীব্রগতি আনন্দরস যেন তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হৌক, যেন তোমার জ্ঞানী মনকে আনন্দ দিক। (৭)

হে শতকৰ্ম্মী আমাদের উক্তি, আমাদের স্তব তোমাকে আগেও বৰ্দ্ধিত করিতেন, এখনও যেন আমাদের বাক্যসকল আরো বৰ্দ্ধিত করুক। (৮)

অক্ষয়বৃদ্ধিশালী ইন্দ্র যেন এই সেই বৈভব জয় করুন যাহার মধ্যে সৰ্ব্ববিধ বলবীৰ্য্য নিহিত। (৯)

হে মন্ত্রপ্রিয়, দেখ যেন কোন মৰ্ত্ত্য আমাদের শরীরের হানি না করুক। তুমি সকলের ঈশ্বর, তাহার অস্ত্রকে অন্যপথে চালিত কর। (১০)

প্রথম মণ্ডল — সূক্ত ১৭

মূল

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে। তা নো মৃড়াত ঈদৃশে॥১॥
গন্তারা হি স্থোঽবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ। ধর্তারা চর্ষণীনাম্॥২॥
অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ। তা বাং নেদিষ্ঠমীমহে॥৩॥
যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাম্। ভূয়াম বাজদাব্নাম॥৪॥
ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্যানাম্। ক্রতুর্ভবত্যুক্থ্যঃ॥৫॥
তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি। স্যাদুত প্ররেচনম্॥৬॥
ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে। অস্মান্ৎসু জিগ্যুষস্কৃতম্॥৭॥
ইন্দ্রাবরুণ নূ নু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা। অস্মভ্যং শর্ম যচ্ছতম্॥৮॥
প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে। যামৃধাথে সধস্তুতিম্॥৯॥

ঈদৃশে। কিম্বা "এই দৃষ্ট্যর্থে"। এতদৃষ্টে। মাবতঃ। "ম" ধাতু বংশের সকলের ধারণই আদিম অর্থ কিন্তু চূড়ান্ত প্রাপ্তি, সম্পূর্ণতা ও সিদ্ধিও "ম" দ্বারা ব্যক্ত হয়। বিপ্রস্য মাবতঃ এই কথার "যে জ্ঞানী জ্ঞানের বা সাধনার শেষ সীমায় পৌঁছিতেছেন" এই অর্থও হইতে পারে; কিন্তু যখন কাৰ্য্যর ধারণকর্ত্তা বলিয়া ইন্দ্র ও বরুণ আহূত হইলেন, তখন প্রথম অর্থই সমর্থনীয়। শক্তিধারণে কাৰ্য্য সিদ্ধি, শক্তিধারণে যে সমর্থ, মানসিক বলের দেবতা ইন্দ্র এবং ভাব মহত্ত্বের দেবতা বরুণ তাহারই সহায়তা করেন। দুৰ্ব্বলকে তাঁহাদের আবেশ সহ্য করিতে

অসমর্থ বলিয়া তাঁহারা সেই পরিমাণে সাহায্য ও রক্ষা করিতে পারেন না।

ক্রতুঃ কথাটীর প্রাচীন অর্থ ছিল শক্তি, বল বা সামর্থ্য; গ্রীক ভাষায় সেই অর্থে ক্রতস্ (kratos, বল, krateros, বলবান) শব্দটি পাওয়া যায়। এখানে যখন ইন্দ্র ও বরুণকে ক্রতু বলিয়া প্রশংসিত হইলেন, ইহাও প্রমাণিত হয় যে এই শব্দের বলবান বা প্রভু অর্থও ছিল।

প্ররেচনং শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ ছিল কুমতি ও কুবৃত্তিকে বহিষ্কৃত করিয়া আধারকে মলশূন্য ও শুদ্ধ করা। ইহাই গ্রীকদের সেই বিখ্যাত "katharsis"।

সধস্ — সধ্ ধাতুর বিশেষণ ও বিশেষ্য, যে ধাতু হইতে সাধন কথাটী উৎপন্ন হয়। কিন্তু পরে সংস্কৃতে সেই ধাতু লুপ্ত হয়। "বলদ" অর্থদ্যোতক সধিষ্ঠ শব্দ আছে — যে জন্তু পরিশ্রম করে, জমিকে চাষের যোগ্য করে, সেই সধিষ্ঠ।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, তোমরাই সম্রাট, তোমাদিগকেই আমরা রক্ষকরূপে বরণ করি, — সেই যে তোমরা এইরূপ অবস্থায় আমাদের উপর সদয় হও। (১)

কারণ, যে জ্ঞানী শক্তি-ধারণ করিতে পারেন, তোমরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে রক্ষণার্থে উপস্থিত হও; তোমরাই কার্য্য সকলের ধারণকর্ত্তা। (২)

আধারের আনন্দপ্রাচুর্য্যে যথা কামনা আত্মতৃপ্তি অনুভব কর। হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমরা তোমাদের অতিনিকট সহবাস চাই। (৩)

যে সকল শক্তি এবং যে সকল সুবুদ্ধি আন্তরিক ঋদ্ধি বর্দ্ধন করে, সেই সকলের প্রবল আধিপত্যে আমরা যেন প্রতিষ্ঠিত থাকি। (৪)

যাহা যাহা শক্তিদায়ক ইন্দ্র তাহার এবং যাহা প্রশস্ত ও মহৎ বরুণ তাহারই স্পৃহণীয় প্রভু হন। (৫)

এই দুইজনের রক্ষণে আমরা স্থির সুখে নিরাপদ থাকি এবং গভীর ধ্যানে সমর্থ হই। আমাদের সম্পূর্ণ শুদ্ধি হৌক। (৬)

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, আমরা তোমাদিগের নিকট চিত্রবিচিত্র আনন্দলাভার্থে যজ্ঞ করি, আমাদিগকে সর্ব্বদা জয়ী কর। (৭)

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, আমাদের বুদ্ধির সকল বৃত্তি যেন বশ্যতা স্বীকার করে, সেই বৃত্তিসকলে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে শান্তি দান কর। (৮)

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, এই সুন্দর স্তব তোমাদিগকে যজ্ঞরূপে অর্পণ করি, সে যেন তোমাদের ভোগ্য হয়, সেই সাধনার্থ স্তববাক্য তোমরাই পুষ্ট ও সিদ্ধিযুক্ত করিতেছ।(৯)

ব্যাখ্যা

প্রাচীন ঋষিগণ যখন আধ্যাত্মিক যুদ্ধে অন্তঃশত্রুর প্রবল আক্রমণে দেবতাদের সহায়তা লাভ প্রার্থনা করিতেন, সাধনপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অসম্পূর্ণতা বোধে পূর্ণতা-প্রতিষ্ঠা-মানসে "বাজঃ" বা শক্তির স্থায়ী জমাট অবস্থা কামনা করিতেন অথবা অন্তঃপ্রকাশ ও আনন্দের পরিপূর্ণতায় তাহারই প্রতিষ্ঠা করিতে ভোগ করিতে বা রক্ষা করিতে দেবতাদের আহ্বান করিতেন, তখন আমরা প্রায়ই তাহাদিগকে জোড়া জোড়া অমরগণকে একবাক্যে একস্তবে ডাকিয়া মনের ভাব জানাইতে দেখি। অশ্বিনদ্বয়, ইন্দ্র ও বায়ু, মিত্র ও বরুণ এইরূপ সংযোগের উদাহরণ। এই স্তবে ইন্দ্র ও বায়ু নহে, মিত্র ও বরুণ নহে, ইন্দ্র ও বরুণের এইরূপ সংযোগ করিয়া কন্ববংশজ মেধাতিথি আনন্দ, মহত্বসিদ্ধি ও শান্তির প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার এখন উচ্চ বিশাল ও গম্ভীর মনের ভাব। তিনি চান মুক্ত ও মহৎ কর্ম্ম, চান প্রবল তেজস্বী ভাব কিন্তু সেই বল স্থায়ী ও গভীর বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই তেজ শান্তির বিশাল পক্ষদ্বয়ে আরূঢ় হইয়া কর্ম্ম-আকাশে বিচরণ করিবে, তিনি চান আনন্দের অনন্ত সাগরে ভাসমান হইয়াও, আনন্দের চিত্রবিচিত্র তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও সেই আনন্দে স্থৈর্য্য, মহিমা ও চিরপ্রতিষ্ঠার অনুভব। তিনি সেই সাগরে মজিয়া আত্মজ্ঞান হারা হইতে, সেই তরঙ্গে লুলিতদেহ হইয়া হাবুডুবু খাইতে অনিচ্ছুক। এই মহৎ আকাঙ্ক্ষালাভের উপযুক্ত সহায়তাকারী দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ। রাজা ইন্দ্র, সম্রাট বরুণ। সমস্ত মানসিকবৃত্তি, অস্তিত্ব ও কর্ম্মকারিতার কারণ যে মানসিক তেজ ও তপঃ, ইন্দ্রই তাহার দাতা এবং বৃত্রদের আক্রমণ হইতে তাহার রক্ষা করেন। চিত্ত ও চরিত্রের যত মহৎ ও উদার ভাব, যাহার অভাবে মনের এবং কর্ম্মের ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণতা, দুর্ব্বলতা বা শিথিলতা অবশ্যম্ভাবী, বরুণই তাহা স্থাপন করেন ও রক্ষা করেন। অতএব এই সূক্তের প্রারম্ভে ঋষি মেধাতিথি এই দুজনেরই সহায়তা ও সখ্য বরণ করেন। ইন্দ্রাবরুণয়োরহমব আবৃণে। "সম্রাজোর" — কেননা তাহারাই সম্রাট। অতএব "ঈদৃশে", এই অবস্থায় বা অবসরে (যে মনের অবস্থার বর্ণনা করিলাম)

তিনি নিজের জন্যে ও সকলের জন্যে তাহাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন — তা নো মৃড়াত ঈদৃশে। যে অবস্থায় দেহের, প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানাংশের সকল বৃত্তি ও চেষ্টা স্বস্থানে সমারূঢ় ও সংবৃত, কাহারও জীবের উপর আধিপত্য, বিদ্রোহ বা যথেচ্ছাচার নাই, সকলেই স্ব স্ব দেবতার ও পরাপ্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ভগবৎনির্দ্দিষ্ট সময়ে ও পরিমাণে সানন্দে করিতে অভ্যস্ত, যে অবস্থায় গভীর শান্তি অথচ তেজস্বী সীমারহিত প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি, যে অবস্থায় জীব স্বরাজ্যের স্বরাট, নিজ আধাররূপ আন্তরিক রাজ্যের প্রকৃত সম্রাট, তাহারই আদেশে বা তাহারই আনন্দার্থে সকল বৃত্তি সুচারুরূপে পরস্পরের সহায়তাপূর্ব্বক কর্ম্ম করে অথবা তাহার ইচ্ছা হইলে গভীর তমোরহিত নিষ্কর্ম্মতায় মগ্ন হইয়া অতল শান্তি অনির্ব্বচনীয় রসাস্বাদন করে, প্রথম যুগের বৈদান্তিকেরা সেই অবস্থাকে স্বারাজ্য বা সাম্রাজ্য বলিতেন। ইন্দ্র ও বরুণ সেই অবস্থার বিশেষ অধিকারী, তাহারাই সম্রাট। ইন্দ্র সম্রাট হইয়া আর সকল বৃত্তিকে চালিত করেন, বরুণ সম্রাট হইয়া আর সকল বৃত্তিকে শাসন করেন এবং মহিমান্বিত করেন।

এই মহিমান্বিত অমরদ্বয়ের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভে সকলে অধিকারী নহেন। যিনি জ্ঞানী, যিনি ধৈর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অধিকারী। বিপ্র হওয়া চাই, মাবান হওয়া চাই। বিপ্র ব্রাহ্মণ নহে, বি ধাতুর অর্থ প্রকাশ, বিপ্‌ ধাতুর অর্থ প্রকাশের ক্রীড়া, কম্পন বা পূর্ণ উচ্ছ্বাস, যাঁহার মনে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, যাঁহার মনের দ্বার জ্ঞানের তেজীয়সী ক্রীড়ার জন্য মুক্ত, তিনিই বিপ্র। মা ধাতুর অর্থ ধারণ। জননী গর্ভে সন্তানের ধারণকর্ত্রী বলিয়া মাতা শব্দে অভিহিত। আকাশ সকল ভূতের সকল জীবের জন্ম, ক্রীড়া ও মৃত্যু স্বকুক্ষিতে ধারণ করিয়া স্থির অবিচলিত হইয়া থাকে বলিয়া সকল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণস্বরূপ বায়ুদেবতা মাতরিশ্বা নামে খ্যাত। আকাশের ন্যায় যার ধৈর্য্য ও ধারণশক্তি, প্রচণ্ড ঘূর্ণবায়ু যখন দিঙ্‌মণ্ডলকে আলোড়িত করিয়া প্রচণ্ড হুঙ্কারে বৃক্ষ, জন্তু, গৃহ পর্য্যন্ত টানিয়া রুদ্র ভয়ঙ্কর রাসলীলার নৃত্য অভিনয় করে, আকাশ যেমন সেই ক্রীড়াকে সহ্য করে, নীরবে স্বসুখে মগ্ন হইয়া থাকে, যিনি সেইরূপে প্রচণ্ড বিশাল আনন্দ, প্রচণ্ড রুদ্র কর্ম্মস্রোত এমন কি শরীর বা প্রাণের অসহ্য যন্ত্রণাকেও স্বীয় আধারে সেই ক্রীড়ার উন্মুক্ত ক্ষেত্র দিয়া অবিচলিত ও আত্মসুখে প্রফুল্ল থাকিয়া সাক্ষীরূপে ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই মাবান। যখন এইরূপ মাবান বিপ্র, এইরূপ ধীর জ্ঞানী স্বীয় আধারকে বেদী করিয়া যজ্ঞার্থে দেবতাদের আহ্বান করে, ইন্দ্র ও বরুণের সেইখানে অকুণ্ঠিত গতি, তাঁহারা স্বেচ্ছায়ও উপস্থিত হন, যজ্ঞ রক্ষা

করেন, তাহার সকল অভীপ্সিত কর্ম্মের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা সাজিয়া (ধর্ত্তারা চর্ষণীনাং) বিপুল আনন্দ, শক্তি ও জ্ঞানপ্রকাশ প্রদান করেন।

প্রথম মণ্ডল — সূক্ত ৭৫

মূল

জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমম্। হব্যা জুহ্বান আসনি॥১॥
অথা তে অঙ্গিরস্তমাগ্নে বেধস্তম প্রিয়ম্। বোচেম ব্রহ্ম সানসি॥২॥
কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ। কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ॥৩॥
ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ। সখা সখিভ্য ইড্যঃ॥৪॥
যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাঁ ঋতং বৃহৎ। অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্॥৫॥

অনুবাদ

যাহা ব্যক্ত করিতেছি তাহা অতিশয় বিস্তৃত ও বৃহৎ এবং দেবতার ভোগের সামগ্রী, তাহা তুমি সপ্রেমে আত্মসাৎ কর। যতই হব্য প্রদান করি, তোমারই মুখে অর্পণ কর। (১)

হে তপঃ-দেব! শক্তিধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিধাতা, আমি আমাদের যে হৃদয়ের মন্ত্র ব্যক্ত করিতেছি, তাহা তোমার প্রিয় এবং আমার অভিলষিতের বিজয়ী ভোক্তা হৌক। (২)

হে তপঃ-দেব অগ্নি, জগতে কে তোমার সঙ্গী ও ভ্রাতা? তোমাকে দেবগামী সখ্য দিতে কে সমর্থ? তুমি বা কে? অথবা কার অন্তরে অগ্নি আশ্রিত? (৩)

অগ্নি! তুমিই সর্ব্বপ্রাণীর ভ্রাতা, তুমিই জগতের প্রিয় বন্ধু, তুমিই সখা এবং তোমার সখাদের কাম্য। (৪)

মিত্র ও বরুণের উদ্দেশ্যে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে বৃহৎ সত্যের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর। অগ্নি! সেই সত্য তোমারই নিজের গৃহ, সেই লক্ষ্যস্থলে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠিত কর। (৫)

প্রথম মণ্ডল — সূক্ত ১১৩

সর্ব্বজ্যোতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি সেইই আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। দেখ সর্ব্বব্যাপী বিচিত্রজ্ঞানময় বোধরূপে তাহার জন্ম! রাত্রীও বিশ্বস্রষ্টা সত্যাত্মার নন্দিনী, তিনিও স্রষ্টার সৃষ্ট্যর্থ সৃষ্টা, রাত্রী উষাকে গর্ভে বহন করিতেছিলেন, এখন গর্ভ শূন্য করিয়া সেই জ্যোতিকে জন্ম দিয়া গিয়াছেন। (১)

রক্তাভ-বৎস-যুক্তা রক্তাভ-শ্বেতবর্ণা আলোকদেবী উপস্থিত, কৃষ্ণবর্ণা তমোরূপিণী রাত্রীই জীবের এই সকল নানারূপ গৃহকে তাঁহার জন্যে মুক্ত করিয়া চলিয়াছেন। এই রাত্রীও এই উষার একই প্রেমময় বন্ধু, দুইজনই অমৃতত্ব-পূর্ণ, দুইজনই পরস্পরে অনুকূলমনা। এই যে পৃথিবী ও দ্যুলোক বাহিরে ভিতরে আমাদের ক্ষেত্র, তাহার দিকসকল নিশ্চিত করিতে দুইজনই বিচরণ করিতেছেন। (২)

দুই ভগিনীর একই অনন্তপথ, দেবদের শিষ্যা দুই ভগিনী স্বতন্ত্রভাবে সেই পথে বিচরণ করিতেছেন। মিশেনও না, পরস্পরের উপর দানবর্ষণ করিতে করিতে পথে থামেনও না। রাত্রী ও উষার একই মন, রূপমাত্র বিভিন্ন। (৩)

সত্যপথে যিনি আমাদের দীপ্তিময়ী নেত্রী, তিনিই এখন সত্য সকলকে চিত্তে উদ্ভাসিত করিতেছেন। দেখ, কত বিচিত্র অর্গলবদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। দশদিকে জগতের সঙ্কীর্ণ পরিধিসকল দেবতা আগলাইয়া দিয়াছেন, আমাদের প্রাণে আনন্দের বহুত্ব প্রকাশিত। উষা আমাদের জগৎক্ষেত্রের অব্যক্ত নানা ভুবন সকল প্রকাশ করিয়াছেন। (৪)

পুরুষ জগতের এই অনৃতময় বক্র পথে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। হে পূর্ণতাদায়িনী উষা তুমিই তাহাকে কর্ম্মপথে, ভোগপথে, যজ্ঞপথে, আনন্দপথে এগোতে আহ্বান কর। যাহারা অল্পদর্শনে সমর্থ ও সন্তুষ্ট ছিল, তাহাদের বিশালদৃষ্টিলাভের জন্যে তুমি জগৎক্ষেত্রের নানা ভুবন তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছ। (৫)

তুমিই ক্ষত্রতেজ, তুমিই দিব্যজ্ঞানশক্তি, তুমিই মহতী প্রেরণা, তুমিই আমাদের ক্ষেত্র ও পথ, তুমিই সেই পথে চলনশক্তি। জীবনের যত একাত্ম নানারূপ বিকাশ ও ক্রীড়া দেখাইবার জন্যে উষাদেবী জগৎক্ষেত্রের নানা ভুবন প্রকাশ করিয়াছেন। (৬)

এই দেখ স্বর্গের দুহিতা সম্পূর্ণ প্রভাত হইতেছেন, আলোকবসনা যুবতী দেখা দিয়াছেন। হে পূর্ণভোগময়ী উষা, আজিই এই মর্ত্ত্যলোকে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরীরূপে নিজেকে প্রকাশ কর। (৭)

যাঁহারা অগ্রে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে ইনিও অনুসরণ করিতেছেন; যাঁহারা নিত্যই নিত্য স্রোতে আসিবেন, তাঁহাদের ইনিই প্রথমা ও অগ্রগামিনী। যেই জীবিত, তাঁহাকে আরোহণ মার্গে তুলিয়া যাইতেছেন। বিশ্বপ্রাণে কে মৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকেও জাগাইতেছেন। (৮)

উষা, তুমি যে বলদেবতা অগ্নিকে পূর্ণদীপ্তি লাভের সমর্থ করিয়াছ, তুমি যে সত্যাত্মা সূর্য্যের সত্যদৃষ্টিদ্বারা এই সমস্তকে প্রকাশ করিয়াছ, তুমি বিশ্বযজ্ঞার্থে মানবকে তমঃ হইতে আলোকে আনয়ন করিয়াছ। দেবতাদের ব্রতে ইহাই তোমার আনন্দদায়ক কর্ম্ম। (৯)

জ্ঞানের কি ইয়ত্তা, প্রকাশের কি বিশালতা, যখন যে সকল উষা আগে প্রভাত হইয়াছে আর যাহারা এখন প্রভাত হইতে আসিতেছে তাহাদের সঙ্গে অদ্যকার উষারূপ বিশ্বময় জ্ঞানোন্মেষ একদীপ্তি হইয়া যায়। প্রাচীন প্রভাত সকল এই প্রভাতকে কামনা করিয়াছিল, তাঁহাদের আলোকে ইনি আলোকিত। এখন ধ্যানস্থ হইয়া ভাবী উষা সকলের সঙ্গে মিলিত ও একচিত্ত হইবার মানসে সেই আলোক ভবিষ্যতের দিকে বাড়াইতেছেন। (১০)

তৃতীয় মণ্ডল — সূক্ত ৪৬

মূল

যুধ্মস্য তে বৃষভস্য স্বরাজ উগ্রস্য যূনঃ স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ।
অজুর্যতো বজ্রিণো বীর্যাণীন্দ্র শ্রুতস্য মহতো মহানি॥১॥
মহাঁ অসি মহিষ বৃষ্ণ্যেভির্ধনস্পৃদুগ্র সহমানো অন্যান্।
একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ জনান্॥২॥
প্র মাত্রাভী রিরিচে রোচমানঃ প্র দেবেভির্বিশ্বতো অপ্রতীতঃ।
প্র মজ্মনা দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যাঃ প্রোরোর্মহো অন্তরিক্ষাদৃজীষী॥৩॥
উরুং গভীরং জনুষাভ্যুগ্রং বিশ্বব্যচসমবতং মতীনাম।
ইন্দ্রং সোমাসঃ প্রদিবি সুতাসঃ সমুদ্রং ন স্রবত আ বিশন্তি॥৪॥
যং সোমমিন্দ্র পৃথিবীদ্যাবা গর্ভং ন মাতা বিভৃতস্ত্বায়া।
তং তে হিন্বন্তি তমু তে মৃজন্ত্যধ্বর্যবো বৃষভ পাতবা উ॥৫॥

অনুবাদ

যে দেবতা পুরুষ যোদ্ধা ওজস্বী স্বরাজ্যের স্বরাট, যে দেবতা নিত্যযুবা স্থির-শক্ত প্রখরদীপ্তিরূপ ও অক্ষয়, অতি মহৎ সেই শ্রুতিধর বজ্রধর ইন্দ্র, অতি মহৎ তাঁহার বীরকর্ম্ম সকল। (১)

হে বিরাট, হে ওজস্বী, মহান তুমি, তোমার বিস্তার-শক্তির কর্ম্ম দ্বারা তুমি আর সকলের উপর জোর করিয়া তাহাদের নিকট আমাদের অভিলষিত ধন বাহির কর। তুমি এক, সমস্ত জগতে যাহা যাহা দৃষ্ট হয় তাহার রাজা, মানুষকে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়ো, তাহার জেতব্য স্থিরধামে তাহাকে স্থাপন করো। (২)

ইন্দ্র দীপ্তিরূপে প্রকাশ হইয়া জগতের মাত্রা সকল অতিক্রম করিয়া যান, দেবদেরও সকল দিকে অনন্তভাবে অতিক্রম করিয়া সকলের অগম্য হন। সবেগে ঋজুগামী এই শক্তিধর তাঁহার ওজস্বিতায় মনোজগত, উরু ভূলোক এবং মহান প্রাণজগৎকে অতিক্রম করিয়া যান। (৩)

এই বিস্তৃত ও গভীর, এই জন্মতঃ উগ্র ও ওজস্বী, এই সর্ব্ববিকাশক সর্ব্ব-চিন্তা-ধারক ইন্দ্ররূপ সমুদ্রে জগতের আনন্দ-মদ্যকর রসপ্রবাহ সকল মনোলোকের মুখে অভিব্যক্ত হইয়া স্রোতস্বিনী নদীর মত প্রবেশ করে। (৪)

হে শক্তিধর, এই সেই আনন্দ-মদিরা মনোলোক ও ভূলোক মাতা যেমন অজাত শিশুকে ধারণ করে, সেইরূপে তোমারই কামনায় ধারণ করে। অধ্বরের অধ্বর্য্যু তোমারই জন্যে হে বৃষভ, তোমারই পানার্থে সেই আনন্দপ্রবাহকে ধাবিত করে, তোমারই জন্যে সেই আনন্দকে মার্জ্জিত করে। (৫)

চতুর্থ মণ্ডল — সূক্ত ১

হে তপোদেবতা অগ্নি, তোমাকেই একপ্রাণ দেববৃন্দ উচ্চাশয় কর্ম্মধররূপে মানবের অন্তরে প্রেরণ করিয়াছেন, চিন্ময় ক্রিয়াশক্তির আবেশে প্রেরণ করিয়াছেন। হে যজ্ঞকারিন্, তাঁহারাই মর্ত্ত্য মানবের অন্তরে অমর দেবতাকে জন্মাইয়াছেন। যাহার প্রজ্ঞাবলে মানবে দেবতা প্রকাশিত, যে বিশ্বময়ের জ্ঞানসঞ্চারণে দেবতা মানবে বিকশিত, জন্মাইয়াছেন তাঁহাকে দেববৃন্দ। (১)

হে তপঃ-অগ্নি, সেই তুমি আমাদের ভ্রাতা বরুণকে, যজ্ঞানন্দ বৃহত্তম অনন্তব্যাপীকে পথে প্রবর্ত্তিত কর, মনের সুমতিতে দেবধাম উদ্দেশ্যে মানবের আরোহণ সাধিত কর। (২)

হে কর্ম্মনিষ্পাদক সখা, যেন বা অশ্বযুগল, যেন বেগবান অশ্বযুগল শীঘ্রগামী রথচক্রকে পথধাবনে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপে আমাদের যাত্রার্থে এই সখাকে প্রবর্ত্তিত কর। বরুণ সঙ্গী, সর্ব্বজ্যোতি-প্রকাশ মরুদ্‌গণ সঙ্গী, খুঁজিয়া লও পরম সুখ। হে ফলদায়িন্! পবিত্র জ্বালায় দীপ্ত তপঃ-অগ্নি! যোদ্ধার পথপ্রেরণা পূরণে আত্মপুত্ররূপ দেবতা সৃজনে যে সুখশান্তি অন্তরে সে গঠন কর। (৩)

বরুণ যখন ক্রুদ্ধ, জ্ঞানী তুমি তাঁহার উদ্ধত প্রহারকে অপসারিত কর। যজ্ঞে সমর্থ, কর্ম্মধারণে বলবান, পবিত্র দীপ্তি প্রকাশে প্রাণে অশুভ সেনার বিদারক স্পর্শকে দূর কর। (৪)

আমাদের এই উষায়, এই জ্ঞানোদয়ে নিম্নতম পার্থিবভুবনে নামিয়া মানবের অতি নিকট সঙ্গী হইয়া তপঃ-অগ্নির আনন্দ যেন বরুণের গ্রাস ছাড়াইয়া সুখশান্তিতে পহুঁচিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্বদা আহ্বান শুনিয়া সত্বরে এস হৃদয়ে তপঃ-অগ্নি।(৫)

মর্ত্ত্যগণে এই সুখভোগী দেবতার দর্শন শ্রেষ্ঠ চিত্রতম ও স্পৃহণীয় যেন অবিনাশ্য বিশ্বধাত্রী জগদ্ধেনুর দান-স্রোত, যেন তাহার স্বচ্ছ সুতপ্ত ঘৃত ক্ষরিত হইল। (৬)

এই অগ্নির তিনটী পরম জন্ম আছে, তিনটীই সত্যময়, তিনটীই স্পৃহণীয়। সেই ত্রিবিধরূপে অনন্তের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সঞ্চরণে প্রকাশিত অনন্ত অগ্নি সান্তে আসিয়াছেন। পবিত্র শুভ্র আর্য্যকর্ম্মা, তাঁহার দীপ্তি প্রকটিত হইতেছে। (৭)

অগ্নি দূত হইয়া মানবাত্মার বাসভবনরূপ সর্ব্ব ভুবনে নিজ কামনা প্রসার করিতেছেন, সর্ব্বভুবনে হোতা জ্যোতির্ম্ময় রথে সঞ্চরণ করিয়া আনন্দময় জিহ্বায় সর্ব্ববস্তু ভোগ করেন। তাঁহার অশ্ব রক্তবর্ণ, বপুর মহৎ আলোক সর্ব্বত্র বিস্তারিত, সর্ব্বদা তিনি আনন্দময় যেন ভোগ্যবস্তু পূর্ণ সভাগৃহ। (৮)

ইনিই মানুষকে জ্ঞানে জাগ্রত করেন, ইনিই মানবযজ্ঞের গ্রন্থি, যেন দীর্ঘ রজ্জু তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যায়, আত্মার এই দ্বারযুক্ত নানা বাসগৃহে তপঃ-অগ্নি সিদ্ধির সাধনে রত হইয়া বাস করেন। দেবতা মর্ত্ত্য মানবের সাধনের উপায়স্বরূপ হইতে স্বীকৃত। (৯)

সপ্তম মণ্ডল — সূক্ত ৭০

হে অশ্বীদ্বয় যাহা যাহা বরণীয়, তোমরাই তাহা দান কর! এস, তোমাদের সে স্বর্গ পৃথিবীতেই ব্যক্ত হইয়াছে। জীবনের অশ্ব সুখময় পৃষ্ঠ হইয়া সেই স্থানে প্রবৃষ্ট হইয়াছে, সেই স্থান তোমাদের জন্ম ও আশ্রয়স্থান সেই স্থানে তোমরা ধ্রুব

স্থিতির জন্যে আরোহণ কর। (১)

ওই সেই তোমাদের আনন্দময়ী সুমতি আমাদের দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিতেছে, মানুষের এই বহুদ্বারযুক্ত পুরে মনের স্বচ্ছ তপঃ তপ্ত হইয়াছে। সেইই শক্তি সুযুক্ত শ্বেতকিরণময় অশ্বদ্বয় রূপ ধারণ করিয়া আমাদের রথে যোজিত হয়। সমুদ্রসকল, নদীসকল পার করিয়া দেয়। (২)

সপ্তম মণ্ডল — সূক্ত ৭৭

উষাস্তোত্র

তরুণ প্রেয়সী উষার দীপ্তিময় দেহ প্রকাশ হইয়াছে, বিশ্বময় জীবনকে উদ্দেশ্যপথে প্রেরণা করিয়াছেন উষা। তপোদেব অগ্নি মনুষ্যের মধ্যে জ্বলিতে জন্মিয়াছে। উষা সর্ব্বরূপ অন্ধকার ঠেলিয়া জ্যোতির সৃজনে কৃতার্থ।

মহৎ বিস্তার, নিখিলের দিকে সম্মুখ দৃষ্টি জনি উঠিয়াছেন। পরিধান আলোক-বস্ত্র পরিয়া শুক্ল-তত্ত্বের শ্বেতকায় প্রকাশ করান দেবী। তাঁহার বর্ণ স্বর্গের সোনা, তাঁহার দর্শন পূর্ণদৃষ্টি স্বরূপ, জ্ঞানের রশ্মিযূথের মাতা, জ্ঞানের দিবসের নেত্রী, তাঁহার আলোকময় দেহ প্রকাশ হইয়াছে।

দেবতাদের চক্ষু সূর্য্যকে ভোগময়ী বহন করিতে, সেই দৃষ্টিসিদ্ধ শ্বেত প্রাণ-অশ্বকে আনয়ন করিতে, সত্যের কিরণে সুব্যক্ত, দেখা দিয়াছেন দেবী উষা। দেখি নানা দৈব ঐশ্বর্য্য, দেখি নিখিলের মধ্যে সম্ভূতা সর্ব্বত্র সেইই আলোকময়ী।

যাহাই আনন্দময় তাহা অন্তরে, যাহাই মনুষ্যের শত্রু তাহা দূরে, এইরূপ তোমার প্রভাত চাই। গঠন কর আমাদের সত্যদীপ্তির অসীম গোচারণ, গঠন কর আমাদের ভয়শূন্য আনন্দভূমি। যাহা দ্বৈত ও দ্বেষময় তাহা দূর কর, মনুষ্য-আত্মার যত ধন বহিয়া এস। হে ঐশ্বর্য্যময়ী, আনন্দ ঐশ্বর্য্য প্রেরণ কর জীবনে।

দেবী উষা, তোমার যে শ্রেষ্ঠ দীপ্তির ক্রীড়া, তাহা লইয়া আমাদের অন্তরে বিকশিত হও, এই দেহীর জীবন বিস্তারিত কর। হে সর্ব্বানন্দময়ী, স্থির প্রেরণা দাও, দাও সেই ঐশ্বর্য্য যেখানে সত্যের কিরণময় গাভীই ধন, যেখানে জীবনের সেই অনন্তগামী রথ ও অশ্ব।

সেই ধনে ধনী বশিষ্ঠ আমরা, — হে সুজাতা, হে স্বর্গনন্দিনী, যখন চিন্তাস্রোতে তোমাকে বর্দ্ধিত করি, তুমিও আমাদের অন্তরে ধারণ কর লব্ধ জ্ঞান বৃহৎ সেই আনন্দরাশি।

নবম মণ্ডল — সূক্ত ১

দেবমন ইন্দ্রের পানার্থে অভিষুত হইয়া স্বাদুতম মাদকতম ধারায় বহিয়া যাও, সোমদেব। (১)

প্রতিরোধী রাক্ষসের হন্তা সর্ব্বকর্ম্মা শক্তিধর জ্ঞানবিদ্যুৎ-প্রহৃত জন্মস্থান হইতে ইন্দ্রিয়-আধারে ঢালা হইয়া সিদ্ধিস্থানে আসীন হউক। (২)

বৃত্রের হননকারী, তব ধনের মুক্তহস্ত দাতা তুমি, পরম সুখের বিধাতা হও, ঐশ্বর্য্যশালী দেবতাদের ঐশ্বর্য্যসুখ আমাদের নিকট পার করিয়া লইয়া এস। (৩)

তব আনন্দসারের বলে মহৎ দেবতা সকলের জন্ম দিতে, ঐশ্বর্য্যপূর্ণতা সত্য-শ্রুতির পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে যাত্রা কর। (৪)

সেই দেবজন্মই আমাদের গন্তব্যস্থল, তাহারই উদ্দেশ্যে দিনদিন আমরা কর্ম্মপথে অগ্রসর হই। হে আনন্দদাতা, তোমাতেই আমাদের সত্যদ্যোতক উক্তিসকল প্রকাশিত হয়। (৫)

জ্ঞানময় সূর্য্যদেবের দুহিতা মনপবিত্রের অবিচ্ছিন্ন বিস্তারে তোমার রস গ্রহণ করিয়া পূত করেন। (৬)

যে মানসলোক আমরা পার হইব, সেই দ্যুলোকে মনের সূক্ষ্মশক্তি কর্ম্মপ্রয়াসে এই দেবতাকে ধরে। তাহারা দশটী ভগিনী, দেবতার দশটী ভোজ্যা রমণীস্বরূপ।(৭)

এই দেবতাকে অগ্রগামিনী শক্তিসকল পথধাবনে চালাইয়া দেয়, তাঁহার আধার-পাত্রকে সশব্দে ভরিয়া দেয়। সেই আনন্দমদিরা সর্ব্বব্যাপী, তিন পরম তত্ত্বে নির্ম্মিত। (৮)

দেবমন ইন্দ্রের পানার্থে স্বর্গের অহননীয় ধেনুগণ এই শিশু আনন্দকে জ্যোতি-দুগ্ধে মিশ্রিত করে। (৯)

ইহারই মত্ততায় বীর দেবমন যত বিরোধী দানবকে নাশ করে এবং স্বর্গের প্রভূত ধন প্রভূত দানে বিতরণ করে। (১০)

নবম মণ্ডল — সূক্ত ২

দেবত্ব জন্মাইতে মনপবিত্রকে অতিক্রম করিয়া সবেগে বহিয়া যাও, সোমদেব। হে আনন্দ, বিশ্বধনের বর্ষণকারী হইয়া দেবমন ইন্দ্রেতে প্রবেশ কর। (১)

হে আনন্দের দেবতা, অতিশয় জ্যোতির্যুক্ত হও বিশ্বধনের বর্ষণকারী বৃষভ তুমি, মহৎ সুখভোগ আমাদের ভিতরে বিকাশ কর। নিজধামে আসীন হও, বিশ্বজীবনকে ধারণ কর। (২)

সুত হইলে এই সর্ব্ব বিধাতার আনন্দধারা প্রীতিময় স্বর্গমধু দোহন করিয়া দেয়। ইচ্ছাবলে সিদ্ধ হইয়া ইনি বিশ্বপ্রবাহকে বসনস্বরূপ পরিধান করিলেন।(৩)

সেই মহতী বিশ্বপ্রবাহরূপ স্বর্গনদীসকল এই মহানের দিকে ধাবিত হয় যখন জ্যোতিযূথে আচ্ছাদিত হইতে চান। (৪)

এই যে আনন্দ-সমুদ্র দ্যুলোকের ধারণকারী ভিত্তিস্বরূপ, সেই প্রবাহে সে মনপবিত্রে পরিমার্জ্জিত হয়, মনপবিত্রে আনন্দদেব মানুষকে চায়। (৫)

জ্যোতির্ম্ময় আনন্দবৃষভ হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন। মহান সে, মিত্রের মতো সর্ব্বদর্শী জ্ঞানসূর্য্য কিরণে উদ্দীপ্ত। (৬)

হে আনন্দদেব, তোমার কর্ম্মেচ্ছুক উক্তিসকল মহাবলে পূত ও মার্জ্জিত হয় যখন তুমি মত্ততা দিতে নিজ শরীরকে শোভমান কর। (৭)

সেই তেজস্বী মত্ততার জন্য আমরা তোমাকে চাই, আমাদের ভিতরে তুমি অতিমানসলোকের স্রষ্টা, তুমি যাহা ব্যক্ত কর, সবই মহৎ। (৮)

সুমধুর মদিরার ধারায় আমাদের জন্যে দেবমন-আকাঙ্ক্ষী হইয়া বর্ষণকারী পর্জ্জন্য সাজিয়া ধাবিত হও। (৯)

হে আনন্দদেব, তুমি সেই লোকের জ্যোতির্ম্ময় গাভী, আশু অশ্ব, বীর যোদ্ধা পুরুষ ও পূর্ণ ধন জয় করিয়া আন, সোমদেব, তুমিই যজ্ঞের আদি ও পরম আত্মা। (১০)

নবম মণ্ডল — সূক্ত ১১৩

এই সূক্তে কশ্যপ ঋষি অমরত্বের প্রকাশ্য আনন্দস্বরূপ সোমদেবকে আহ্বান করিয়া সেই মহৎ দেবতার স্তবপূর্ব্বক অমরত্ব যাজ্ঞা করিলেন। সূক্তের তত্ত্ব এইরূপ:

আনন্দ সরসীতে সোমরস পান করুন বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, সোমপানে করুন আত্মায় বলধারণ, সোমপানে করুন মহৎ বীরকর্ম্মের ইচ্ছা। আনন্দময়! বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (১)

অনন্তদিক্‌পতি সর্ব্ববরদায়িন্! ঋজুতার জন্মভূমি হইতে আবহমান এস, সোমদেব! সত্যবলে সত্যবাণীর গর্ভে শ্রদ্ধায় তপস্যায় তুমি সমুদ্ভূত। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (২)

পর্জ্জন্যের সর্ব্বদানে এই মহৎ দেবতা বর্দ্ধিত, সূর্য্যদুহিতার সর্ব্বজ্ঞানে এই মহৎ দেবতা আনীত, গন্ধর্ব্বের রসগ্রহণে এই মহৎ দেবতা গৃহীত, গন্ধর্ব্বগ্রহণে সোমরসে সে পরমরস বিহিত। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (৩)

সত্যজ্যোতির্ম্ময় তুমি, বাক্যে ব্যক্ত কর সত্যধর্ম্ম, সত্যকর্ম্মা তুমি, ব্যক্ত কর সত্যসত্তা, আনন্দের রাজা সোমদেব তুমি, বাক্যে ব্যক্ত কর সত্যশ্রদ্ধা। ধাতার হস্তে তোমার নির্দ্দোষ সৃষ্টি, সোমদেব। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (৪)

বিশাল উগ্র আনন্দের পূর্ণ নানাবিধ প্রবাহ সত্যসত্তায় সঙ্গম করিতে ধাবিত, মিলনেচ্ছায় রসময়ের অসংখ্য রস পরস্পরে পড়িতেছে। হৃদ্‌গত সত্যমন্ত্রে তুমি পূত, হৃদ্‌গত সত্যমন্ত্রে দ্যুতিমান, হে দেবতা! বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (৫)

মনের যে উচ্চ চূড়ায় ছন্দের গতিতে মন্ত্রদ্রষ্টার চিন্তা বাক্যে উদ্‌গত, সেইখানে সোমনিঃসারণে সোমরসপ্লাবনে আনন্দের সৃষ্টি, আনন্দে স্বর্গীয় মহিমা। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (৬)

যে ধামে অবিনাশ্য জ্যোতি, যে ধামে স্বর্লোক নিহিত, হে আবহমান সোমদেব, সেই ধামে আমাকে তুলিয়া, স্থান দাও অমর অক্ষয় লোকে। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (৭)

যে ধামে সূর্য্যতনয় ধর্ম্মরাজ রাজা, যে ধামে দ্যুলোকের আরোহণীয় সানুর চূড়া, যে ধামে প্রবল বিশ্বনদী সকলের উৎস, সেই ধামে আমাকে অমর করিয়া তোল। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (৮)

যে ধামে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ দ্যুলোকের ত্রিদিবের স্বর্লোকের ত্রিপুট আনন্দধামে, যে লোকের অধিবাসী আত্মাগণ নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময়, সেই ধামে আমাকে অমর করিয়া তোল। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (৯)

যে ধামে কামনা অতিকামনার নিঃশেষ প্রাপ্তি, যে ধামে মহৎ সত্যের নিবাস-

ভূমি, যে ধামে স্বভাবের সকল প্রেরণার তৃপ্তি, স্বপ্রকৃতি পূর্ণ, সেই ধামে আমাকে অমর করিয়া তোল। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (১০)

যে ধামে সকল আনন্দ সকল প্রমোদ, যে ধামে সকল প্রীতি সকল সুখক্রীড়া চিরতরে আসীন, যে ধামে কামের সর্ব্বকামনার নির্দ্দোষ সুখাস্বাদন, সেই ধামে আমাকে অমর করিয়া তোল। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর। (১১)

দশম মণ্ডল — সূক্ত ১০৮

হৃদয়ে কি বাসনা, সরমে? কেন এই দেশে আগমন? দূর সেই পন্থা, পরমশক্তিতে প্রকাশিত। আমাদের নিকটে কি আশা, কি প্রেরণা? পথে কি গভীর বাণী? অতল রসা-নদীর তরঙ্গ কোন রঙ্গে পার হইলি, সরমে? (১)

ইন্দ্রের দূতি আমি ইন্দ্রের প্রেরণায় বিচরণ করিতেছি তোমাদের সুবিশাল গুপ্তনিধির বাসনায়, পণিগণ। উল্লংঘনের ভয়ে রাত্রী সরিল। রসানদীর তরঙ্গমালা পার হইলাম উল্লম্ফনে। (২)

কিরূপ সেই ইন্দ্র, সরমে? কি বা তাহার দৃষ্টিবল যাহার দৌত্যকার্য্যে জগতের চূড়া হইতে এই দেশে আসিলি? আসুন সে দেবতা, করিব তাঁহাকে সখা, করিব জ্যোতির্ম্ময় গোযূথের গোপতি। (৩)

কাহারও না বিজিত কখন ইন্দ্র,...* যাহার দৌত্যকার্য্যে জগতের চূড়া হইতে এই দেশে আসিলাম! সুগভীর অবহমান নদীসকল তরঙ্গে গুপ্ত করেন না। (৪)

* শব্দটির পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

পত্রাবলী

মৃণালিনীদেবীকে লিখিত

c/o K. B. Jadhav, Esq.
Near Municipal Office
Baroda
25th June 1902

প্রিয়তমা মৃণালিনি,

তোমার জ্বরের কথা শুনে বড় দুঃখিত হলাম। আশা করি এর পরে তুমি তোমার শরীর একটু দেখবে। ঠাণ্ডা জায়গা, যাতে ঠাণ্ডা না লাগে, তাই করিবে। আজ দশ টাকা পাঠালাম, ঔষধ আনিয়ে রোজ খাবে, অন্যথা করিবে না। আমি একটা ঔষধের সন্ধান পেয়েছি যাতে তোমার অসুখ সারিবে। রোজ খেতে হবে না, দুয়েকবার খেলেই সারিবে কিন্তু আসামে খাবার সুবিধে হবে না। দেওঘরে গেলে খেতে পারিবে। আমি সরোজিনীকে লিখব কি করিতে হবে।

সরোজিনী দেওঘরেই আছে। বৌদিদি দার্জ্জিলিং থেকে কলিকাতায় গিয়েছেন, দার্জ্জিলিঙে তাঁর অসুখ করে। সরোজিনী চিঠি লিখেছে, শীতকাল পর্য্যন্ত দেশে থাকবে। দিদিমারা তাকে খুব ধরেছেন, ওঁদের আশা বৌদিদি সরোজিনীর বিয়ে যোগাড় করিতে পারিবেন। আমার মতে বেশী আশা নেই। তবে যদি সরোজিনী রূপগুণের অতিরিক্ত আশা ছাড়ে, হলেই হয়।

কেঁচো লানাবলী পাহাড়ে গিয়েছিল, আমাকেও সেখানে ডেকেছিল। প্রবন্ধ লিখবার ইচ্ছা ছিল, তাই বলে ডেকেছিল। লেখাও হল কিন্তু বের করিবে না। শেষমুহূর্ত্তে কি হল, হঠাৎ মত ফিরল। আর একটা খুব মহৎ আর গোপনীয় কাজ যুটল, আমাকেই করিতে হইল। আমার কাজ দেখে কেঁচো বড়ই সন্তুষ্ট হল আবার প্রতিজ্ঞা করেছে আমার বেশী মাইনে দেবে। কে জানে দেবে কি না। কেঁচোর কথার কথাই সার, কাজ ত বড় দেখা যায় না। তবে দিতে পারে। যা দেখতে পাচ্চি তাতে বোধ হচ্চে যে কেঁচোর পতনের দিন ঘনিয়ে আসছে, সব লক্ষণ খারাপ।

আমি এখন খাসেরাওদের বাড়ীতেই আছি, তোমরা আসবে তখন নৌলাখীতে যাইব। এ বৎসর বৃষ্টি বোধ হয় বেশী পড়বে না। বৃষ্টি না পড়লে নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হবে। তা হলে তোমার এখানে আসা বন্ধ হতে পারে, এলে কেবলি কষ্ট

হবে, খাবার কষ্ট, জলের কষ্ট, গরমের কষ্ট। বরদায় এ বৎসর গর্ম্মী পড়েনি, বড় সুন্দর বাতাস বয়ে রয়েছে, কিন্তু সে সুন্দর বাতাসে বৃষ্টির আশা উড়ে যাচ্চে। এখনো দশ বার দিন আছে, সেই দশ বার দিনের মধ্যে ভাল বৃষ্টি হলে, এই মহাবিপদের হাত থেকে উদ্ধার হবে। দেখি অদৃষ্টে কি লেখা আছে।

তোমার ছবি শীঘ্রই পাঠাব। যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জী আমাদের বাড়ীতে রয়েছে, আজ দেখা করিতে যাইব, ভাল ছবি বেছে নেব।

তোমার বাপ আর তোমার মাকে আমার প্রণাম জানাবে। আর সব না লিখলেও তুমি বুঝে নেবে।

তোমার স্বামী

30th August 1905

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

তোমার 24th Augustএর পত্র পাইলাম। তোমার বাপ-মার আবার সেই দুঃখ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কোন্ ছেলেটী পরলোক গিয়াছে, তাহা তুমি লিখ নাই। দুঃখ হ'লে বা কি হয়। সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা দেয়, দুঃখ সর্ব্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্র কামনার সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। ধীর চিত্তে সব সুখদুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।

আমি কুড়ি টাকা না পড়িয়া দশ টাকা পড়িয়াছিলাম, তাই দশ টাকা পাঠাইব বলিয়াছিলাম। পনের টাকা যদি দরকার পনের টাকাই পাঠাইব। এই মাসে সরোজিনী তোমার জন্যে দার্জ্জিলিঙে কাপড় কিনিয়াছে, তার টাকা পাঠাইয়াছি। তুমি যে এইদিকে ধার করিয়া বসেছ, তাহা কি করিয়া জানিব? পনের টাকা লেগেছিল, পাঠাইয়াছি, আর তিন চারি টাকা লাগিবে, তাহা আগামী মাসে পাঠাইব। তোমাকে এইবার কুড়ি টাকা পাঠাইব।

এখন সেই কথাটী বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়; সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোকে অসাধারণ মত,

অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামি বলে, তবে পাগলের কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশ জন অসাধারণ, সেই দশ জনের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হয়। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখদুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা অসামান্য চরিত্র চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হৌক বা মহাপুরুষ হৌক অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন। কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? ঋষিগণ এই উপায় ঠিক করিলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অদ্য হইতে পতিঃ পরমো গুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তিনি যে কার্য্যই স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য্য নির্ব্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্ম্মের পথ ধরিবে না নূতন সভ্য ধর্ম্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ, সে তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামির পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগ্‌লী হইবার চেষ্টা করিবে। যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।

আমার তিনটী পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামি এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়,

তাহাই নিজের জন্যে খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী রইল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্যে, সুখের জন্যে, বিলাসের জন্যে খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্দ্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পূরিয়া সুখ করিয়া কৃতার্থ হয়। আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। আর নয়, সে পাপ জন্মের মতন ছাড়িয়া দিলাম।

ভগবানকে দেওয়ার মানে কি। মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা উষাকে দিয়াছি তার জন্যে কোন অনুতাপ নাই, পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম্ম। কিন্তু শুধু ভাইবোনকে দিলে হিসাবটা চুকে না। এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশকোটী ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেক অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদেরও হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা। তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বল্‌ছিলে "আমার কোন উন্নতি হল না।" এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি?

দ্বিতীয় পাগলামি সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে। পাগলামিটা এই, যে কোনমতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে — আমি সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা

তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সে পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামি এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে। শারীরিক বল নাই, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত। ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। তুমি নমাসীর কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদলোকে আমার সরল ভালমানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ হোক বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।

এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি। তুমি উষার শিষ্য হইয়া সাহেবপূজামন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দিয়া দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে, এই সব মহৎ কর্ম্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, — ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে-যে অভাব আছে তিনিই শীঘ্র পূরণ করিবেন। যে ভগবানের নিকটে আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস

করিতে পার, দশ জনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইবে। আবার বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।

চিরদিন কি এই ভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার খাইব, হাসিব, নাচিব, যত রকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি।

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল। যে যাহা বলে, তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্ম্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শুধরোতে হইবে, একজনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য করিয়া অবিচলিত চিত্তে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে।

আর একটা দোষ আছে, তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর ভাবে শুনিতে পারে না; ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়; ব্রাহ্মস্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হইয়াছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দূষিত, দেওঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ় মনে তাড়াইতে হয়, তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে, তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে; পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার স্বাভাবিক টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব, ঈশ্বর-উপাসনায় সেই জোর পাইবে।

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের মনে ধীরচিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছু নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী হইবে। তাঁর কাছে সর্ব্বদা এই

প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্ব্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে?

তোমার

3 Oct. 1905

প্রিয়তমা,

এই পনের দিন কলেজের পরীক্ষা চলিতেছে, তাহা ছাড়া একটী স্বদেশী সমিতি স্থাপন হইতেছে, এই দুই কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া চিঠি লিখিবার অবসর পাই নাই। তোমারও চিঠি অনেকদিন পাই নাই। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। কাল থেকে কলেজ বন্ধ। অবশ্যই আমার কাজ বন্ধ নয়, তবে একঘণ্টার বেশী করিতে হয় না।

আমি এইবারে কুড়ি টাকা পাঠাইলাম। দশটাকা Burn Company কেরানীদের জন্য দিতে পার। তা নৈলে আর কোনও সদুদ্দেশে খরচ কর। Burn Companyর ব্যাপারটা কি আমি বুঝিতে পারি না, খবরের কাগজে কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাই নাই। আজকাল এইরকম ধর্ম্মঘট করা সহজ ব্যাপার নয়, গরীব প্রায়ই হার খায়, ধনবানের জয় হয়। যেদিন ভারতবাসী মধ্যমশ্রেণীর লোক ক্ষুদ্র চাকরীর আশা ছাড়িয়া নিজে ব্যবসা করিতে যাইবে, সে ভারতের বড় সুদিন হইবে। বেশী টাকা দিতে পারি না, কারণ সরোজিনীকে তার দার্জ্জিলিঙের খরচের জন্যে 60 বা 70 টাকা দিতে হইবে, আর মাধবরাওকে বিলেতে কোন বিশেষ কাজের জন্যে পাঠান হয়েছে, তাঁর জন্যেও টাকা রাখিতে হয়। স্বদেশী movementএর জন্যে অনেক টাকা দিতে হইয়াছে, তার উপর আর একটী movement চালাইবার চেষ্টা করিতেছি তার জন্যে অশেষ টাকা চাই। আমার কিছু বাঁচছে না।

Florilineটা পাঠান হল, আশা করি পেয়েছ। ধনজী এখানে ছিল না, তার পরে এসেছে কিন্তু লক্ষণরাও পরীক্ষায় ব্যস্ত, আমারও সেই দশা, দুজনে ভুলিয়া গিয়াছিলুম। শীঘ্র prescription পাঠাইব।

"Seeker" পড়িবে কেন? সে ত পুরোন কবিতা, ধর্ম্মের সম্বন্ধে আমার তখন কোনও জ্ঞান ছিল না। কবিতাটা অতিমাত্র pessimistic. বাঙ্গালায় pessimistic কি জানি না, মারাঠীতে নিরাশাবাদী বলে। এখন আমি বুঝিতে পারিলাম নিরাশা অজ্ঞানের একটা রূপ মাত্র।

সেদিন খাসেরাও এর কাছে গিয়েছিলাম। আনন্দরাও খুব মস্ত হয়েছে। বড় জোচ্ছোর হবে।

শ্রী

22 Oct. 1905

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

তোমার পত্র পাইলাম। অনেকদিন চিঠি লিখিনি কিছু মনে করিবে না। আমার health নিয়ে অত চিন্তা কেন, আমার ত কখন সর্দ্দি কাশি ছাড়া কোন ব্যামো হয় না। বারি এখানে আছে, তাহার শরীর ভয়ানক খারাপ, কেবলি জ্বরের ফলে নানা রোগ হয়, কিন্তু হাজার রোগ হলেও তাহার তেজ কমে না, স্থির থাকে না, একটু ভাল হলেই দেশের কাজে বেরুতে চায়। সে চাকরী নেবে না। অবশ্যই এসব খবর সরোজিনীকে লিখি না; তুমিও লেখো না, সে ভাবনায় পাগল হবে, বোধ হয় নভেম্বর মাসে কলিকাতায় যাব, সেখানে আমার অনেক কাজ আছে।

তোমার সেই লম্বা চিঠি পেয়ে আমার নিরাশ হবার কোন কারণ হয়নি, আনন্দিতই হয়েছিলাম। সরোজিনী ত্যাগ স্বীকার করিতে তোমার মত প্রস্তুত হলে আমার ভবিষ্যতে কাজের বড় সুবিধে হয়। তাহা কিন্তু হবে না। তাহার সুখের আশা অতি প্রবল, জানি না কখন জয় করিতে পারিবে কি না। ভগবানের যা ইচ্ছে তাহাই হবে।

তোমার চিঠি একটা কাগজের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, বের করব। পেলেই আবার লিখব। সন্ধ্যার সময় হচ্চে, আজকের মতন শেষ করি।

আমি ভাল আছি, চিঠি না পেলেও চিন্তা করিতে নাই। আমার কি অসুখ হবে? আশা করি তোমরা সব ভাল আছ।

তোমার

———

আমার নাম নিয়ে কি করিবে? ওই dash বসিয়েচি, তাহা চলিবে না?

c/o Babu Subodh Chandra
Mullick
12 Wellington Square
Calcutta
[December 1905?]

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

তোমার একখানি চিঠি পাইয়াছি। তাহা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। আমি বম্বে হইতে তোমাকে একটী চিঠি লিখিয়াছিলাম, সেই চিঠিতে আমার দেশে যাবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। তার সঙ্গে অনেক দরকারী কথা ছিল। আর কাহাকেও দেশে যাবার কথা জানাই নাই। না জানাইবার বিশেষ কারণও ছিল। এখন বুঝিতে পারিলাম সেই চিঠি পাও নাই। হয় চাকর পোষ্টে দেয় নি, নয় পোষ্ট অফিসে গোলমাল করিয়াছে। যা হৌক তুমি যে অত সহজে ধৈর্য্যচ্যুত হও, এটা বড় দুঃখের কথা। কেননা — আবার সেই কথা বলি — তুমি একজন সাধারণ সাংসারিক লোকের স্ত্রী হও নাই, তোমার বিশেষ ধৈর্য্য ও শক্ততার দরকার। এমন সময়ও আসিতে পারে যখন একমাস কিংবা দেড়মাস নয়, ছমাস পর্য্যন্তও আমার কোন খবর পাইবে না। এখন থেকে একটু শক্ত হইতে শিখিতে হয়, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

অনেক দরকারী কথা লিখিয়াছিলাম, সে সব আবার লিখিবার সময় নাই। একটু পরে লিখিব। আমি এখান থেকে শীঘ্র কাশী যাব, কাশী হইতে বরদা। গেলেই ছুটি নিয়ে আবার দেশে আসিব। তবে যদি Clarke না আসিয়া থাকেন, একটু মুস্কিল হবে।

বারি দেওঘরে রয়েচে, তার কেবলি জ্বর হয়। আমি ছুটি না পাইলে সে বোধ হয় বরদায় ফিরিয়া যাইবে।

A.G.

2nd March 1906

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

আজ কলিকাতায় যাত্রা করিব। অনেক দিন আগে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু ছুটির হুকুম হইয়া গেলেও বরদার কর্ত্তারা সহি করিবার সময় পান নাই বলিয়া আমার দশদিন বৃথাই গেল। যাই হোক সোমবারে কলিকাতায় পহুঁচিব। কোথায়

থাকিব জানি নাই। নমাসীর বাড়িতে থাকিবার যো নাই। একে আমি মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়াছি, আর এই জীবনে বোধহয় খাইব না, কিন্তু নমাসী তাহা শুনিবেন কেন। তারপর আমার একান্ত জায়গা না থাকিলে সুবিধা নাই। সকালে দেড়ঘণ্টা আর সন্ধ্যাবেলা দেড়ঘণ্টা একেলা বসিয়া কত কি করিতে হয়, সেসব পরের সম্মুখে হয় না। 12 Wellington Squareএ আমার বেশ সুবিধা হইত, কিন্তু হেম মল্লিক সম্প্রতি মারা গেলেন, সেইখানে এখন যাইতে পারিব না। তবে সেই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে আমি পাইব।

আসামে যেতে বলেছ, চেষ্টা করিব। কিন্তু একবার কলিকাতায় পদার্পণ করিলে কেউ ছাড়ে না। হাজার কাজ হাতে আসে, আত্মীয়দের কাছে দেখা করিতে যাইবার সময় পাই না। আর আসামে গেলে দুচারদিনই থাকিতে পারিব। তোমাকে বারি বেশ আনিতে পারে, তার সঙ্গে রণছোড়কে দিতে পারি। আমি যদি যাই, এ মাসে বোধ হয় পেরে উঠিব না, তবে কলিকাতায় গিয়ে দেখি। এটাও হতে পারে, সরোজিনী যদি আসামে যেতে চায়, বারি দিয়ে দিতে পারে, আমি এক মাস পরে গিয়ে আনিতে পারি। কলিকাতায় গিয়ে ঠিক করিব।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

23 Scott's Lane
Calcutta
17th February, 1907.*

প্রিয় মৃণালিনী,

অনেক দিন চিঠি লিখি নাই, সেই আমার চিরন্তন অপরাধ, তাহার জন্য তুমি নিজ গুণে ক্ষমা না করিলে, আমার আর উপায় কি? যাহা মজ্জাগত তাহা এক দিনে বেরোয় না, এই দোষ শুধরাইতে আমার বোধ হয় এই জন্ম কাটিবে।

8th জানুয়ারি আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি

* চিঠির উল্লিখিত ঘটনার পূর্বাপর তথ্যের ভিত্তিতে এটা অনুমিত হয় যে এই পত্রখানি ১৯০৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারিতে লিখিত, ১৯০৭ সালে নয়।

এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল, যে এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে। এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে, তবে বলা আবশ্যক নচেৎ আমার গতিবিধি তোমার আক্ষেপ ও দুঃখের কথা হইতে পারে। তুমি মনে করিবে আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছি। তাহা মনে করিবে না। এই পর্য্যন্ত আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক দোষ করিয়াছি, তুমি যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে, সে স্বাভাবিক কিন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল। তুমি আসিবে, তখন আমার কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবে। আশা করি ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণার যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন, কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি আমার সহধর্ম্মিণী হইতে চাও, তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে যাহাতে তিনি তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুণা করিয়া পথ দেখাইবেন। এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়। তোমা ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্বামী

পুনশ্চ — সংসারের কথা সরোজিনীকে লিখিয়াছি, আলাদা তোমাকে লেখা অনাবশ্যক, তাহার পত্র দেখিয়া বুঝিবে।

6th December, 1907

প্রিয় মৃণালিনী,

আমি পরশ্ব চিঠি পাইয়াছিলাম, সে দিনই র‍্যাপারও পাঠান হইয়াছিল, কেন পাও নাই তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

*

আমার এইখানে এক মুহূর্ত্তও সময় নাই; লেখার ভার আমার উপর, কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজের ভার আমার উপর, 'বন্দে মাতরমের' গোলমাল মিটাইবার ভার

আমার উপর। আমি পেরে উঠছি না। তাহা ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে, তাহাও ফেলিতে পারি না।

আমার একটী কথা শুনিবে কি? আমার এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, চারিদিকে যে টান পড়েছে পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি অস্থির হইলে আমারও চিন্তা ও দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হয়, তুমি উৎসাহ ও সান্ত্বনাময় চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হইবে, প্রফুল্লচিত্তে সব বিপদ ও ভয় অতিক্রম করিতে পারিব। জানি দেওঘরে একেলা থাকিতে তোমার কষ্ট হয়, তবে মনকে দৃঢ় করিলে এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ তত মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই দুঃখ অনিবার্য্য, মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আমি সাধারণ বাঙ্গালীর মত পরিবার বা স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমার ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম, আমার নির্দ্দিষ্ট কাজের সফলতায় তোমার সুখ না ভাবিলে তোমার অন্য উপায় নাই। আর একটা কথা, যাহাদের সঙ্গে তুমি এখন থাক, তাঁহারা অনেকে তোমার আমার গুরুজন, তাঁহারা কটুবাক্য বলিলে, অন্যায় কথা বলিলে, তথাপি তাঁহাদের উপর রাগ করো না। আর যাহা বলেন তাহা যে সবই তাঁহাদের মনের কথা বা তোমাকে দুঃখ দিবার জন্যে বলা হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করো না। অনেকবার রাগের মাথায় না ভেবে কথা বেরোয়, তাহা ধরে থাকা ভাল নয়। যদি নিতান্ত না থাকিতে পার আমি গিরিশ বাবুকে বলিব, তোমার দাদামহাশয় বাড়ীতে থাকিতে পারেন আমি যতদিন কংগ্রেসে থাকি।

আমি আজ মেদিনীপুরে যাব। ফিরে এসে এখানকার সব ব্যবস্থা করে সুরাটে যাব। হয়ত 15th or 16thই যাওয়া হইবে। জানুয়ারি ২রা তারিখে ফিরিয়া আসিব।

তো—

23 Scott's Lane,
Calcutta
21-2-08

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

কলেজের মাইনে পেতে দেরি হবে বলে রাধাকুমুদ মুখার্জ্জীর কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার করিয়া পাঠাইলাম। অবিনাশকে পাঠাইতে বলিয়াছি, সে টেলিগ্রাফ

করিয়া পাঠাইয়া থাকিবে, কিন্তু তোমার নামে পাঠাইতে ভুলিয়া গেলাম। তাহা হইতে ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া যা বাকি থাকে কতকটা মার জন্যে রাখিয়া কতকটা ধার চুকাইয়া দিবে। আগামী মাসে ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারি মাসের মাহিনা তিনশ টাকা পাইব, তখন বাকি ধার চুকাইতে পারিব।

আগে যে চিঠি লিখেছিলাম, তার কথা এখন থাক। তুমি এলে সব কথা বলিব, হুকুম পাইয়াছি, আর না বলিয়া থাকিতে পারিব না। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্বামী

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই। আমার বোধ হয় শীঘ্র আমাদের জীবনে একটী বৃহৎ পরিবর্ত্তন হইবে। যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের সকল অভাব দূর হইবে। মায়ের ইচ্ছার অপেক্ষায় রহিলাম। আমার ভিতরেও শেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে। মায়ের আবেশ ঘন ঘন হইতেছে। একবার এই পরিবর্ত্তন শেষ হইলে, আবেশ স্থায়ী হইলে, আর আমাদের বিচ্ছেদ থাকিতে পারে না। কারণ যোগসিদ্ধির দিন নিকটবর্ত্তী। তাহার পর সম্পূর্ণ কার্য্যের স্রোত। কাল পরশুর মধ্যে কোন লক্ষণ প্রকাশ হইবে। তাহার পর তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

মৃণালিনী,

অনেকদিন হল তোমার চিঠি পেয়েছি, উত্তর দিতে পারি নি। তার কয়েকদিন পরে আমার জড়বৎ অবস্থা হয়ে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ও লেখা বন্ধ করা হয়েছে। আজ আবার প্রবৃত্তি জেগেছে, তোমায় চিঠির উত্তর দিতে পারিলাম।

বারিনকে লিখিত

পণ্ডিচেরী
April, 1920

স্নেহের বারিন,

তোমার তিনটী চিঠি পেয়েছি (তারপর আজ আর একটী), এই পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে উঠে নি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটা miracle, কেন না আমার চিঠি লেখা হয় once in a blue moon, — বিশেষ বাঙ্গলায় লেখা, যাহা এই পাঁচ সাত বৎসরে একবারও করি নি। শেষ করে যদি postএ দিতে পারি, তাহা হলেই miracleটী সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও, আমিও নিতে রাজী, — তার অর্থ, যিনি আমাকে তোমাকে প্রকাশ্যেই হৌক, গোপনেই হৌক তাঁহার ভাগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা — যাহাকে পূর্ণযোগ বলি — সেই পন্থায় চলিতে হইবে। আমরা যাহা আলিপুর জেলে কর্ত্তুম, তোমার আণ্ডামান ভোগের সময় তুমি যাহা করেছ, এটী ঠিক তাহা নয়। যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, লেলে যা দিয়েছিলেন, জেলে যা করেছি, সেটী ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক ওদিক ঘুরে দেখা, পুরাতন সকল খণ্ড যোগের এটী ওটী ছোঁয়া তোলা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা, এটার এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটার পিছনে যাওয়া। তাহার পর পণ্ডিচেরীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল, অন্তর্য্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন, তাহার সম্পূর্ণ theory, যোগ শরীরের দশটী অঙ্গ। এই দশ বৎসর ধরে তাহারই development করাচ্ছেন অনুভূতিতে, এখনও শেষ হয়নি। আর দুই বৎসর লাগতে পারে। আর যতদিন শেষ না হয়, বোধ হয় বাঙ্গালায় ফিরতে পারবো না। পণ্ডিচেরীই আমার যোগসিদ্ধির নির্দ্দিষ্ট স্থল — অবশ্যই এক অঙ্গ ছাড়া, সেটা হচ্ছে কর্ম্ম। আমার কর্ম্মের কেন্দ্র বঙ্গদেশ, যদিও আশা করি তার পরিধি হবে সমস্ত ভারত ও সমস্ত পৃথিবী।

যোগপন্থাটী কি, তাহা পরে লিখিব — অথবা তুমি যদি এখানে আস, তখনই সেই কথা হবে, এই সব বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই মাত্র বলিতে পারি, যে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কর্ম্ম ও পূর্ণ ভক্তির সামঞ্জস্য ও

ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলিয়া মনের অতীত বিজ্ঞানভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তাহার মূল তত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে সে মনবুদ্ধিকে জানত আর আত্মাকে জানত, মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত, কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করিতে পারে, অনন্ত অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরিতে পারে না, ধরিতে হলে সমাধি মোক্ষ নির্ব্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নাই। সেই লক্ষণহীন মোক্ষলাভ এক এক জন করিতে পারে বটে কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত আছেনই, ভগবান মানুষে যা চান, সেটী হচ্ছে তাঁহাকে এখানেই মূর্ত্তিমান করা ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে — to realise God in life। পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করিতে পারে নি, জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্", ভারতের "ইমে লোকাঃ" সত্যই সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে ভাবে আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য কর্ব্বে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি? আগে মানসিক levelএ যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত কর্ত্তে হয়, তাহার পর উপরে ওঠা। উপরে না উঠিলে — অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে, জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solved হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন, এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎ আর মায়া বলে দেখতে হয় না, জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা পাওয়া সম্ভব হয়, গীতায় যাকে বলে "সমগ্রং মাং জ্ঞাতুং প্রবিষ্টুম্"। অন্নময় দেহ, প্রাণ, মনবুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ এই হল আত্মার পাঁচটী ভূমি, যতই উঁচুতে উঠি, মানুষের spiritual evolutionএর চরম সিদ্ধির অবস্থা নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে ওঠায় আনন্দে ওঠা সহজ হয়ে যায়, অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থার স্থির প্রতিষ্ঠা হয় শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়, দেহে জগতে জীবনে। পূর্ণ সত্তা পূর্ণ চৈতন্য পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue, তার মূল কথা।

এইরূপ হওয়া সহজ নয়, এই পনের বৎসর পরেই আমি এইমাত্র বিজ্ঞানের তিনটী স্তরের নিম্নতম স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তুলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার through

দিয়ে অপরকেও অল্প আয়াসে বিজ্ঞানসিদ্ধি দিবেন, এর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্যে অধীর নহি। যাহা হবার, ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মতন ছুটে ক্ষুদ্র অহমের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নাই। যদি কর্ম্মসিদ্ধি নাও হয়, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না, এই কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না, ভগবান যখন চালাবেন, তখন চলব।

বাঙ্গালা যে প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতন রূপ কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এরও দরকার ছিল। বাঙ্গালা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে সেইগুলির সংস্কার exhaust করে আসল সারটী লয়ে জমি উর্ব্বর কর্ব্বে। আগে ছিল বেদান্তের পালা, অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া ইত্যাদি। যাহা এখন হচ্ছে, তোমার বর্ণনা দেখে বোঝা যায়, এইবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের পালা, লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে মেতে যাওয়া। এইগুলি অতি পুরাতন, নবযুগের অনুপযোগী, টিকতে পারে না, এইরূপ উন্মাদনা টিকবার নহে। তবে বৈষ্ণব ভাবের এই গুণ আছে যে ভগবানের সঙ্গে জগতের একটী সম্বন্ধ রাখে, জীবনের একটী অর্থ হয়। খণ্ডভাব বলে পূর্ণ সম্বন্ধ, পূর্ণ অর্থ নাই। যে দলাদলির ভাব লক্ষ্য করেছ, সেটী অনিবার্য্য। মনের ধর্ম্ম এই, খণ্ডকে লয়ে তাহাকে পূর্ণ বলা, আর সকল খণ্ডকে বহিষ্কৃত করা। যে সিদ্ধ ভাবটী নিয়ে আসেন, তিনি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন, মূর্ত্ত কর্ত্তে না পারিলেও; শিষ্যেরা তাহা পায় না, মূর্ত্ত নহে বলে। পুঁটলি বাঁধছে বাঁধুক, দেশে ভগবান যে দিন পূর্ণ অবতীর্ণ হবেন পুঁটলি আপনি খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতার, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ, তাতে বিচলিত হই না। অধ্যাত্ম ভাব খেলুক দেশে, যে ভাবেই হৌক, যত দলেই হৌক, পরে দেখা যাবে। এটী নবযুগের শৈশব, এমন কি embryonic অবস্থা। আভাস মাত্র, আরম্ভ নয়।

তারপর মতিদের কথা। মতিলাল যাহা আমার কাছে পেয়েছে, সে হয় আমার যোগের প্রথম প্রতিষ্ঠা, ভিত্তি — আত্মসমর্পণ, সমতা ইত্যাদি, তাহারই অনুশীলন করে আসছে, সম্পূর্ণ হয়নি, — এই যোগের একটী বিশিষ্টতা এই যে সিদ্ধি একটু উপরে না উঠলে ভিত্তিও পাকা হয় না। এখন মতিলাল আরও উঁচুতে উঠতে চায়। তার আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটী খসেছে, কয়েকটী এখনও আছে। আগে ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার, অরবিন্দ মঠ কর্ত্তে

চেয়েছিল*, এখন বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, প্রাণে কিন্তু সেই পুরাতনের ছাপ এখন একেবারে মুছে যায় নি। সে জন্যে সংসারে থেকে ত্যাগী সন্ন্যাসী হতে বলে। কামনা-ত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছে, কামনা ত্যাগ আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ধরিতে পারে নি। আর আমার যোগটা নিয়েছিল, যেমন বাঙালীর সাধারণ স্বভাব, তেমন জ্ঞানের দিক থেকে নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্ম্মের দিকে। জ্ঞান কতকটা ফুটেছে, অনেক বাকি আছে, আর ভাবুকতার কুয়াশা dissipated হয় নি, তবে যেমন নিবিড় ছিল তেমন আর নাই। সাত্ত্বিকতার গণ্ডী পুরোমাত্রায় কাটতে পারে নি, অহং এখনও রয়েছে। এক কথায় তার development চলছে, পূর্ণ হয় নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নাই, আমি তাকে নিজের স্বভাব অনুসারে develop কর্ত্তে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে ঢালতে চাই না, আসল জিনিসটী সকলের মধ্যে এক হবে, তবে নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর থেকে grow কর্ব্বে, বাহির থেকে গঠন কর্ত্তে চাই না, মতিলাল মূলটী পেয়েছে, আর সব আসবে।

তুমি বলছ, মতিলালও কেন পুঁটলি বাঁধছে, তার explanation এই। প্রথম কথা তাহার চারিদিকে কয়েকজন লোক জুটেছে যারা তাহাকে ও আমাকে জানে, সে যা পেয়েছে আমার কাছে, তারাও পাচ্ছে। তারপর আমি প্রবর্ত্তকে "সমাজ কথা" বলে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তার মধ্যে সংঘের কথা বলেছিলাম, ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি সংঘ চাই। এই ideaকেই মতিলাল নিয়ে দেবসংঘ নাম বার করেছে। আমি বলেছিলাম ইংরাজীতে divine lifeএর কথা, নলিনী তার অনুবাদ করে দেবজীবন, যারা দেবজীবন চায়, তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। মতিলাল সেইরূপ সংঘের বীজস্বরূপ চন্দননগরে স্থাপন করে দেশময় ছড়িয়ে দিবার চেষ্টা আরম্ভ করে। এইরূপ চেষ্টার উপর "অহম"এর ছায়া যদি পড়ে, সংঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হইতে পারে যে, যে সংঘ শেষে দেখা দিবে, এটাই তাই, সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাহিরে, তারা ভিতরকার লোক নহে, হলেও তারা ভ্রান্ত, ঠিক আমাদের যে বর্ত্তমান ভাব, তার সঙ্গে মিলে না বলে। মতিলালের এই ভুল যদি থাকে, কতকটা থাকবার কথা, — তবে আছে কিনা আমি জানি না, — বিশেষ ক্ষতি নাই, সে ভুল টিকবে না। তাহার দ্বারা আর তাহার ক্ষুদ্র মণ্ডলীর দ্বারা

* মতিলালের চিঠি আজ পেয়েছি, সে বলেছে — সে সঙ্কল্প তার কখনও ছিল না, ভুল বুঝা হয়েছে।

আমাদের অনেক কাজ হয়েছে আর হচ্ছে যে আর কেহ এ পর্য্যন্ত কর্ত্তে পারে নি। তার মধ্যে ভাগবত শক্তি work কর্চ্ছে, তার কোনও সন্দেহ নাই।

তুমি হয়ত বলবে সংঘেরও কি দরকার। মুক্ত হয়ে সর্ব্ব ঘটে থাকব, সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যে যা হয়। সে সত্যি কথা, কিন্তু সত্যের একটী দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে, আকার মূর্ত্তি ভিন্ন জীবনের effective গতি নাই। অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালী নয়, রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলে রূপগ্রহণ। আমরা জগতের কোনও কার্য্য বাদ দিতে চাই না, রাজনীতি বাণিজ্য সমাজ কাব্য শিল্পকলা সাহিত্য সবই থাকবে, এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে। রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানী, বিলাতী ঢঙের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল, আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি, না কল্লে দেশ উঠত না, আমাদেরও experience লাভ ও পূর্ণ development হত না। এখনও তার দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার, ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তারই অনুরূপ করা চাই। এই দশ বৎসর আমার influence মৌনভাবে এই বিলাতী রাজনীতি ঘটে ঢেলেছি, ফলও হয়েছে, এখনও তাহাই কর্ত্তে পারি যেখানে দরকার, কিন্তু যদি বাহিরে গিয়ে আবার সেই কর্ম্মে লাগি, রাজনীতিক পাণ্ডাদের সঙ্গে মিশে কাজ করি, একটী পরধর্ম্মের, একটী মিথ্যা রাজনীতিক জীবনের পোষণ করা হবে। লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise কর্ত্তে চায়, যেমন গান্ধী, ঠিক পথটী ধর্ত্তে পার্চ্ছে না। গান্ধী কি করছেন? অহিংসা পরম ধর্ম্ম, jainism, হরতাল, passive resistance ইত্যাদির খিচুড়ি করে সত্যাগ্রহ বলে একরকম Indianised Tolstoyism দেশে আনছেন, ফল হবে যদি কোনও স্থায়ী ফল হয় এক রকম Indianised Bolshevism। তাঁহার কর্ম্মে আমার আপত্তি নাই, যাঁর যে প্রেরণা, তিনি তাহাই করুন। তবে এটী আসল বস্তু নয়। এই সকল অশুদ্ধ রূপে spiritual শক্তি ঢাল্লে, কাঁচা ঘটে কারণোদধির জল, হয় ওই কাঁচা জিনিসটি ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে, সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে। সর্ব্বক্ষেত্রে তাই। Spiritual influence চালাতে পারি, লোকে তাহা নিয়ে জোর পেয়ে কাজ কর্ব্বে খুব energyর সহিত, তবে সেই শক্তি ex-

panded হবে শিবমন্দিরে বানরের মূর্ত্তি গড়ে স্থাপন কর্ত্তে। বানরটী প্রাণপ্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয় ত কর্ব্বে যতদিন সেই প্রাণ, সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারতমন্দিরে চাই হনুমান নয়, দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিশতে পারি কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্যে, আমাদের আদর্শের spirit ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তাহা না কল্লে দিশেহারা হব, প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Individually সর্ব্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সর্ব্বত্র থেকে তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসে নি। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যাহা চাই, তাহা হবে না। সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ; যারা আদর্শ পেয়েছে, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে কাজ কর্ব্বে, পরে spiritual communeর মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ যুগানুরূপ আকৃতি দিবে, পুরাতন আর্য্যসমাজের মত শক্ত বাঁধা রূপ নয়, অচলায়তন নয়, স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মতন ছড়িয়ে যেতে পারে, নানা ভঙ্গী লয়ে এটীকে ঘিরে ওটীকে প্লাবিত করে সবকে আত্মসাৎ কর্ব্বে, করিতে করিতে spiritual community দাঁড়াবে। এটাই হচ্ছে আমার বর্তমান idea, এখনও পুরো developed হয় নি। আলিপুরে ধ্যানে যা এসেছে, তাই developed হচ্চে, শেষে কি দাঁড়াবে পরে দেখব। ফলটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান। মতিলালের ক্ষুদ্র লোকসংহতি একটী experiment মাত্র, দেখছে সংঘবদ্ধ হয়ে বাণিজ্য industry চাষ ইত্যাদি কর্ব্বার উপায়। আমি শক্তি দিচ্ছি, watch কর্চ্চি, ভবিষ্যতের মালমশলা আর useful suggestionএর মধ্যে থাকতে পারে। এখনকার দোষগুণ ও limitation দেখে judge করো না। এই সকলের এখন নিতান্তই initial ও experimental অবস্থা।

তারপর তোমার পত্রের কয়েকটী বিশেষ কথার আলোচনা করি। তোমার যোগের সম্বন্ধে যা লিখেছ, সেই সম্বন্ধে এই পত্রে বিশেষ কিছু লিখতে চাই না, দেখা হলে সুবিধে হবে। তবে এক কথা লিখেছ, মানুষের সঙ্গে দেহ সম্বন্ধ নাই, তোমার চোখে দেহ শব। অথচ মন টানছে সংসার কর্ত্তে। সেই অবস্থা এখনও কি আছে? দেহকে শব দেখা সন্ন্যাসের, নির্ব্বাণপথের লক্ষণ। ওই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না। সর্ব্ববস্তুতে আনন্দ চাই, যেমন আত্মায় তেমন দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। যাহা আছে জগতে, তাহাতে ভগবানকে দেখি, সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি, এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়, শরীরেও

সেই আনন্দের মূর্ত্ত তরঙ্গ ছুটে, এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্ম্মে পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। অনেক দিন থেকে মানসিক ভূমিতেও মনের, ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় করে তুলেছি, এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের রূপ ধারণ কর্চ্ছে। এই অবস্থায়ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি।

তারপর দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ, — "আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।" দেবসংঘের প্রকৃত অর্থ আমি বলে দিয়েছি। দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছে, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলে কর্ত্তে পারে। বড় আধার, ক্ষুদ্র আধার আছে মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate বলে গ্রহণ কর্চ্চি না। তবে যেরূপ আধারই হৌক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হয়, তারপর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নাই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না, ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল মনের চিত্তের প্রাণের দেহের, বা কম বাধা? সময় কি লাগে নি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পরে মুহূর্ত্ত? দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি, জানি না, তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন — তাহাই যথেষ্ট। সকলেরও তাই। আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তি এই যোগের সাধক।

নারায়ণের ভার নিয়েছ ভাল হয়েছে। নারায়ণ আরম্ভ করেছিল বেশ, তারপর নিজের চারিদিকে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডী টেনে, দলাদলির ভাব পোষণ করে পচতে আরম্ভ করে। নলিনী প্রথম নারায়ণে লিখত, তারপর স্বাধীন মতের অবকাশ না পেয়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছে। খোলা ঘরের মুক্ত হাওয়া চাই, তা না হলে জীবনশক্তি থাকবে কেন, মুক্ত আলো মুক্ত বাতাস প্রাণশক্তির প্রথম আহার। আমার লেখা দেওয়া এখন অসম্ভব, পরে দিতে পারি, তবে প্রবর্ত্তকেরও claim আছে আমার উপর, দুদিকের call satisfy করা প্রথম একটু কঠিন হতে পারে। দেখা যাবে যখন বাঙ্গালা লিখতে আরম্ভ কর্ব্ব, এখন সময়ের অভাব। "আর্য্য" ছাড়া আর কিছু লেখা অসম্ভব, প্রতি মাসে 64 pages আমাকেই যোগাতে হয়, সে কম খাটুনি নয়। তারপর আছে কবিতা লেখা, যোগসাধনের সময় চাই, বিশ্রামের সময়ও চাই। "সমাজ কথা" — যাহা সৌরিনের কাছে রয়েছে তাহার

অধিকাংশ বোধ হয় প্রবর্ত্তকে বেরিয়েছে। আর তার কাছে যাহা আছে, সেটা হয় ত অশুদ্ধ, শেষ সংস্কার হয় নি। আগে আমি দেখি সেটা কি, তার পরে নারায়ণে বেরুতে পাবে কি না, দেখা যাবে।

প্রবর্ত্তকের কথা লিখেছ, লোকে বুঝে না, সে misty, হেঁয়ালি, এই অভিযোগ বরাবর শুনে আসছি। স্বীকার করি মতিবাবুর লেখায় তত clear-cut চিন্তা নাই, বড় ঘনিয়ে লেখে। তবে প্রেরণা, শক্তি, power আছে। নলিনী ও মণিই ছিল আগে প্রবর্ত্তকের লেখক, তখনও লোকে বলত হেঁয়ালি। অথচ নলিনীর clear-cut চিন্তা আছে, মণির লেখা direct ও শক্তিপূর্ণ। Aryaর সম্বন্ধেও সেই একই নালিশ, লোকে বুঝতে পারে না, এত ভেবে চিন্তে কে পড়তে চায়? তাহা সত্ত্বেও প্রবর্ত্তক বঙ্গদেশে ঢের কাজ করে এসেছে, আর তখন লোকের ধারণা ছিল না যে আমি প্রবর্ত্তকে লিখি। এখন যদি সেইরূপ effect হয় না, তার কারণ এই হবে যে লোকে এখন কাজের দিকে, উন্মাদনার দিকে ছুটেছে। একদিকে ভক্তির বন্যা, অপরদিকে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা। কিন্তু বাঙ্গালাদেশ যখন দশ বৎসর ধরে অসাড় নিস্পন্দ ছিল, প্রবর্ত্তকই ছিল একমাত্র শক্তির উৎস, বাঙ্গালার ভাব বদলাতে অনেক সাহায্য করেছে। আমার বোধ হয় না যে এর মধ্যে তার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

এই সম্বন্ধে আমি যা অনেক দিন থেকে দেখছি তার দুয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের প্রধান দুর্ব্বলতার কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস, জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability or unwillingness to think, চিন্তা কর্ব্বার অক্ষমতা বা চিন্তা "ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হৌক, এখন কিন্তু এই ভাবটী ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগে ছিল রাত্রীকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন, আধুনিক জগতে জ্ঞানীর জয়ের যুগ, যে বেশী চিন্তা করে অন্বেষণ করে পরিশ্রম করে বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটী জিনিষ, অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেখানে, এই শক্তির বলে জগৎকে গ্রাস কর্ত্তে পার্চ্চে আমাদের পুরাকালের তপস্বীর মত যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত সন্দিগ্ধ বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তাহা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট, সে নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giant ছাড়া

সর্ব্বত্রই তোমার সে সোজা মানুষ অর্থাৎ average man যে চিন্তা কর্ত্তে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা, য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা গভীর কথা। সামান্য কুলীমজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায় মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই। তবে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics, yogic hallucination, "ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না।" তবে এখন এই limitationও surmount কর্ব্বার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্চে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে, আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান, এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মতন উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্যে শক্তির দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়া বিশাল জ্ঞান পেয়েছিল, বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তারা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, ধর্ম্ম বাহ্যের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটী ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকিবে, ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গালাদেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্রবুদ্ধি আছে, ভাবের capacity আছে, intuition আছে, এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলি যথেষ্ট নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, বীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের আনন্দ ও ক্ষমতা যোটে, তা হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। চৈতন্যের সময় থেকে, তার অনেক আগে থেকেও বাঙ্গালী কি কচ্ছে? অধ্যাত্ম সত্যের কোন সহজ মোটামুটি কথা ধরে ভাবের তরঙ্গে কয়েক দিন নেচে বেড়ায়, তারপরে অবসাদ, তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশ অবনতি, জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে, খেতে পাচ্চে

না, পরবার কাপড় পাচ্চে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত ব্যবসাবাণিজ্য জমী চাষ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে পরের হাতে যেতে আরম্ভ কর্চ্ছে। শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমকে সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই, প্রেমও থাকে না, সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রতা আসে, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে প্রাণে হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া মনোমালিন্য ঈর্ষা ঘৃণা দলাদলি বঙ্গদেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতেও আর কোথাও তত নাই। আর্য্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁকডাক নাচানাচি ছিল না, কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত ওরা, সে বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দুদিন স্থায়ী থাকে। তুমি বলচ চাই ভাব উন্মাদনা দেশকে মাতান। রাজনীতিক্ষেত্রে ওসব করেছিলাম স্বদেশীর সময়ে, যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনও ফল হয়নি। হয়েছে, যত movement হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে সে অধিকাংশ possibilityর বৃদ্ধি, স্থিরভাবে actualise কর্ব্বার এটী ঠিক রীতি নয়। সেই জন্যে আমি আর emotional excitement, ভাব, মনমাতানোকে base কর্ত্তে চাই না। আমি আমার যোগের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে চাই বিশাল বীর সমতা, সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারের সকল বৃত্তিতে পূর্ণ দৃঢ় অবিচলিত শক্তি, শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার, সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম আনন্দ ঐক্যের স্থির ecstasy। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র-আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাহাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই, আমি গুরু হতে চাই না, আমার স্পর্শে জেগে হৌক, অপরের স্পর্শে জেগে হৌক কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভাগবত জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture পড়ে এই কথা ভাববে না যে আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা কর্চ্চি। তবে other side of the shield, কোথায় দোষ ক্ষতি ন্যূনতা তাহা দেখাবার চেষ্টা করেছি। এইগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না। যত সাধু মহাপুরুষদের কথা লিখেছ, ওসব আমার কেমন কেমন ঠেকে, যেন যা চাই, এর মধ্যে তা পাচ্চি না। দয়ানন্দের অদ্ভুত সব সিদ্ধি আছে, আশ্চর্য্য automatic writting হয় তার নিরক্ষর শিষ্যদের। ভাল কথা, কিন্তু এটী হচ্ছে psychic faculty মাত্র। তাদের মধ্যে আসল বস্তু কি ও কতদূর

এগিয়েছে, তাই জানতে চাই। আর একজন লোককে স্পর্শ করে মাতিয়ে দেয়। বেশ কথা, কিন্তু সে মাতানোর ফল কি; সে লোকটী কি সেই ধরণের মানুষ হয় যে নবযুগের, ভাগবত সত্যযুগের স্তম্ভরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে, এই প্রশ্ন। দেখছি তোমার সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, — আমারও আছে।

সাধুসন্তদের ভবিষ্যদ্‌বাণী পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল, অবজ্ঞার বা অবিশ্বাসের হাসি নয়, — দূর ভবিষ্যতের কথা আমি জানি না, ভগবান আমাকে যে আলোক দেন মাঝে মাঝে, তাহা আমার এক পা আগে পড়ে, সেই আলোকে আমি চলি। তবে আমি ভাবছি, এঁরা আমাকে চান কেন, সে মহাসম্মিলনে আমার স্থান কি? আশঙ্কা আমাকে দেখে তাঁরা নিরাশ না হন, আমিও fish out of the water না হই। আমি ত সন্ন্যাসী নই, সাধুও নই, সন্তও নই, ধার্ম্মিক পর্য্যন্তও নই, আমার ধর্ম্ম নাই, আচার নাই, সাত্বিকতা নাই, আমি ঘোর সংসারী, বিলাসী, মাংসভোজী, মদ্যপায়ী, অশ্লীলভাষী, যথেচ্ছাচারী, বামমার্গের তান্ত্রিক। এই সকল মহাপুরুষ ও অবতারদের মধ্যে আমিও কি একজন মহাপুরুষ ও অবতার? আমাকে দেখে হয় তো ভাববেন কলির অবতার বা আসুর রাক্ষসী কালীর, খৃষ্টানরা যাকে Antichrist বলে! আমার সম্বন্ধে দেখছি একটী ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে গেছে, লোকে যদি disappointed হয়, তার জন্যে আমি দায়ী নহি।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটলি St. Peterএর চাদরের মত, অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজগিজ কর্চ্ছে। এখন পুঁটলি খুলছি না। অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারি হয় নি বলে নয়, আমি তৈয়ারি হয় নি বলে। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ কর্ত্তে পারে?

তোমার
সেজদাদা

পুনশ্চ — নলিনী লিখেছে তোমরা এপ্রিলের শেষে আসবে না, মে মাসে। উপেনও আসবার কথা লিখেছিলে, তার কি হল? সে কি তোমাদের কাছে রয়েছে না অন্যত্র? মুকুন্দীলাল আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন সরোজিনীর ঠিকানায় দিবার জন্যে, কিন্তু সরোজিনী কোথায় আমি জানি না, সেজন্য তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি forward করো।

মতিলালের চিঠি পেয়েছি, তাতে ও আর কয়েকটী circumstanceএ বুঝলাম তার আর সৌরিনের মধ্যে misunderstandingএর ছায়া পড়ছে, সে মনোমালিন্যে পরিণত হতে পারে। আমাদের মধ্যে এরূপ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। মতিলালকে এ সম্বন্ধে লিখব, তুমি সৌরিনকে বল, যেন সাবধান হয় যে এরূপ breach বা riftএরও লেশমাত্র কারণ না ঘটে। কে মতিলালকে বলেছে যে সৌরিন লোককে জানাচ্ছে (impression দিচ্ছে) যে প্রবর্ত্তকের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ কথা নিশ্চয় সৌরিন বলে নি, কারণ প্রবর্ত্তক আমাদেরই কাগজ, আমি স্বহস্তে লিখি বা না লিখি, আমারই through দিয়ে ভগবান মতিলালকে শক্তি দিয়ে লেখাচ্ছেন, spiritual হিসেবে আমারই লেখা, মতিলাল তার মনের রং দেয় মাত্র। হয় ত সৌরিন বলেছে প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধ ওঁর নিজের লেখা নয়, তাও বলা দরকার নাই, তাতে লোকের মনে উলটো wrong impression হতে পারে। প্রবর্ত্তকে কে লেখে না লেখে সে কথা অনেকটা গোপন করে রেখেছি, — প্রবর্ত্তকে প্রবর্ত্তকই লেখে, শক্তিই লেখে, সে কোন বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, আর এটী সত্যই কথা। দেবজন্ম ইত্যাদি নলিনী মণির প্রবন্ধ বইর আকারে বেরিয়েছে, তাহাতেও নাম দেওয়া হয়নি, সেই একই principleএ। তাহাই থাক্ until further order।

''প্রবর্ত্তক'' উদ্দেশ্যে লিখিত

সততং কীর্ত্তয়ন্তো তং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ তং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

তচ্চিত্তা তদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌।
কথয়ন্তশ্চ তং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি...

তাহা যতদূর হইতে পারিয়াছি, ততটুকু আমাদের সিদ্ধি। সেই আদর্শ পূর্ণ করিতে পারি নাই, পারিব বলিয়া তাহার কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সাধনা করিতেছি।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥

পরকেও এ সাধনপথে ডাকিয়া আমাদের যে আস্থা, যে অনুভব, আর তার উপরেও যে Pisgah sight, পর্ব্বত চূড়া হইতে promised landএর দর্শন মুক্তকণ্ঠে প্রচার করি। আমাদের অনেকের এই অনুভব হইয়াছে

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

যে একবিন্দু শক্তি হইয়াছে, তাহাতেই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই। ফল ভগবানের হাতে কিন্তু এই পথের পুরা সিদ্ধির দূরের কথা। এই পথ শুধু ব্যষ্টিযোগের, individual সিদ্ধির নয়, সমষ্টিযোগের, collective সিদ্ধির পন্থা, একজনের যদি ভগবৎকৃপায় পূর্ণযোগের সিদ্ধি হয়, তাহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিব না। এই পথ আরোহণের পথ, সিদ্ধির উপরেও সিদ্ধি আছে, শেষ পর্য্যন্ত না উঠিয়া উত্তম যোগারূঢ় না হইয়া সিদ্ধপুরুষ বলা আস্পর্দ্ধা মাত্র। আর আমরা miracle mongerও নই। Miracle আবার কি? যাহা হয় জগতে, সবই প্রকৃতির নিয়মের অন্তর্গত এক শক্তির খেলা, হয় miracle নাই, নয় all is miracle। তবে যে সাধারণ শক্তির উপর ঈশ্বরী শক্তির খেলা আছে, তাহা সত্য, সেই ভিতরের কথা, বাহিরের বুজরুকী নহে। সেই ভগবানের ইচ্ছাশক্তি, ব্যক্তিগত শক্তি নয়, ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণের উপায়, ব্যক্তির অহংকার স্ফুরণ, হৃদয়ের আবেগ, প্রাণের বাসনা বুদ্ধির অভিমত পূরণের নয়।

যাহা লিখিব তাহা পত্রপ্রেরকের মতখণ্ডনের জন্য নয়, সেই পত্রের কথা

হইতে কয়েকটী সাধারণ প্রশ্ন উঠে, সাধকের মনেও কাঁচা অবস্থায় সন্দেহ বা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে, এই পত্রকে lead বা starting point করিয়া সেগুলির উত্তর দেওয়া, অপনোদন করাই উদ্দেশ্য। তবে এক কথা বলিয়া রাখি। ইংরাজী ভাষায় এই সকল কথার চর্চ্চা অনেক দিন করিতেছি, — তুমি যে এখন বাঙ্গালা ভাষায় পুনরুক্তি করিবার আদেশ করিয়াছ, তাহা যেমন আমার উপর তেমনই পাঠকের [উপর] অত্যাচার। তুমি বেশ জান শিক্ষা ও ঘটনার পরম্পরার দোষে, ইংরাজীতে লিখিবার ক্ষমতা কতকটা জন্মিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহা আমার নাই। যদি মাতৃভাষার অঙ্গচ্ছেদ বা হত্যা পর্য্যন্ত করি, প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠাগুলি ইংরাজী বাঙ্গালায় কলুষিত করি সে দোষ আমার নয়, তোমার। এই গেল অতি দীর্ঘ প্রস্তাবনা। আসল কথা আরম্ভ করি।

পত্র

জিজ্ঞাসা করি, এই পত্রের উত্তর আমার নিকটে আদায় করিবার উদ্দেশ্য? তর্ক যদি করিতে হয়, তর্কের সাধারণ ভিত্তি (common ground) প্রয়োজন, তাহার এখানে নিতান্ত অভাব। চিন্তা করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র, ভাবগত অনুভবে আলোক আঁধারের প্রভেদ। অবশ্য পত্রলেখকেরই মনে আঁধার, আমার মনে আলোক, এই কথা বলি না। কথার অর্থ এই, যে তাঁহার পক্ষে 'যা নিশা' সেই যোগজ্ঞানের গভীর গুহায় আমার জাগরণ ও দর্শন হয়, যে বুদ্ধির দিবালোকে তিনি জাগেন ও দেখেন, আমার চক্ষে সেই আলোক ঘোর রাত্রী না হৌক, রাত্রীর অর্দ্ধালোকিত প্রান্তভাগ, মিথ্যা আলোকের কুহক বোধ হয়। তাহার নিকট যোগ-লব্ধজ্ঞান, যোগলব্ধ শক্তি প্রহেলিকা আত্মপ্রবঞ্চনা অজ্ঞান, আমার নিকট বুদ্ধির জ্ঞান প্রাণের আবেগময়ী আশাই অজ্ঞান, কুহক মরীচিকা, প্রহেলিকা, আত্মপ্রবঞ্চনা।

পত্রলেখক হয়ত য়ুরোপীয় বুদ্ধিপ্রধান শাস্ত্রের উপাসক। যে মানুষী বুদ্ধির কল্যাণকর পরিণামে মনুষ্যজাতি অদ্য দলিত অধীর ক্ষতবিক্ষত, এই তিনি তাহারই জয়গানে উন্মত্ত শ্রীহক কি মহারবে না নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুল অনুনাদিত করিয়া ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় প্রবৃত্ত। সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্। এই ঘোর আক্রমণে মহাকাপুরুষ ভগবান যদি ভারত হইতে চিরকালতরে পলায়ন না করেন, মানুষী বুদ্ধির শক্তি বৃথা। যদিও য়ুরোপীয় শাস্ত্র বলি, ওই শাস্ত্রে য়ুরোপের অদ্য আর সেই অটল বিশ্বাস বুদ্ধিবাদকে নাই।

কতকটা বুদ্ধিবাদের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়া কতকটা তাহার অতিমাত্র সেবনের পরিণাম ভোগ করিয়া য়ুরোপ নূতন ভাবে ভাবুক, য়ুরোপ ভগবানকে খুঁজিতেছে। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে আমেরিকায় দর্শনে কাব্যে চিত্রকলায় সঙ্গীতে কুড়ি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই স্রোত চলিতেছে। এখনও বটে অনেকে যে আঁধারে সেই আঁধারে, অনেকে হাতড়াইতেছে, অনেকে অস্পষ্ট কুয়াশায় নানা মূর্ত্তি দেখিতেছে, আবার অনেকে দিবালোকে আলোকিত চক্ষুষ্মান। স্রোত ত দেখি দিনদিন খরতর বেগে বহিতেছে। এখনও য়ুরোপের ভুলে ভুক্তভোগী হই নাই, ভারতের নানা ভুলভ্রান্তির শোচনীয় পরিণামে অস্থির। পত্রলেখক সেই অধীরতায় একদেশদর্শী কল্পনার বশে স্বপ্ন দেখিতেছেন, বুদ্ধির উপাসনায় যখন য়ুরোপ প্রবল সুখী (?) অধীশ্বর হইয়াছে, পরিণাম সেইখানে উত্থান, এইখানে পতন, আর যখন পরিণাম দেখিয়াই পথ পছন্দ করিতে হয়, ফলেন পরিচীয়তে, তখন আমরাও কেন সেই একপথে ছুটিব না? আপত্তি নাই। ঢুলুক না সকলে, দেশের যদি সেই অভিপ্রেত হয়। অনেক গর্ত্তে পড়িয়া তাহার পর যদি জ্ঞান হয়, ঠিক পথে চলিতে শিখি। মানুষী তনু আশ্রিত ভগবানকে অবমাননা করিয়া জ্ঞান কর্ম্মকে খাটো করিয়া যে গর্ত্তে পড়িলাম, তাহারই মধ্যে এখনো ঘুরপাক খাইতেছি, না হয় বুদ্ধির বলে উঠিয়া অন্য যে গর্ত্তে প্রাচীন গ্রীস রোম পড়িয়া মরিল, আধুনিক রুশ জর্ম্মণী পড়িয়াছে, কত প্রবল জাতি পড়িয়া পচিবে, আমরাও না হয় সেই গর্ত্তে আছাড় খাইয়া সে সুখও উপভোগ করি, করি মার্দ্যকরী বুদ্ধিমদিরার সেবন — যাবৎ পততি ভূতলে, তাহার পরেও, যদি ইচ্ছা হয়, উত্থায়াপি পুনঃ নীত্বা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। শেষে জাতীয় নির্ব্বাণপ্রাপ্তি লাভ করি। আমরা কিন্তু যে সত্যের পথ অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছি, সেই পথে দেশকে ডাকিতে বিরত হইব না।

যাক মতের বিরোধের কথা। আমার মতে যদিও শ্রীহকের কথা ভ্রান্ত, অর্থাৎ বিকৃত সত্য, তথাপি বিকৃতির মধ্যেও সত্যের আভাস আছে। তাহার মনের ভাব ও অবস্থা অতি স্বাভাবিক, হয়ত আজকাল ভারতে অনেকের অন্তরের সেই দশা। তাহার প্রয়োজনও ছিল। এই কথা অন্যত্র অনেকবার লিখিয়াছি যে য়ুরোপের জড়বাদী নাস্তিকতারও একসময় আবশ্যকতা ছিল ধর্ম্মের কুমতি ভগবৎসম্বন্ধে ক্ষুদ্রভ্রান্ত ধারণা সজোরে বিনষ্ট করিবার জন্যে। এখন যে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধারণা য়ুরোপ আমেরিকাকে আলোকিত করিতেছে সেগুলি উদার মহৎ গভীর বেদান্তের সত্য প্লাবিত। ক্ষেত্রকে বুদ্ধিবাদ বৈজ্ঞানিক জড়বাদ নাস্তিকতা পরিষ্কার করিয়া এই নূতন বীজ বপন করিবার অবসর দিয়াছে। আমাদের মধ্যে পুরাণ

অচলায়তন ভাঙ্গিবার আবশ্যকতা ছিল। বুদ্ধিবাদী ইংরেজ শিক্ষা সেই কর্ম্মের সহায়তা করিয়াছে, প্রকৃত পূর্ণ আধ্যাত্মিক সত্য পরিস্ফুট হইবার অবকাশ করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের শেষ অবস্থায় যোগে বৈরাগ্য নিশ্চেষ্টতা জীবন হইতে নিষ্কৃতির প্রয়াসে অতিমাত্র বৃদ্ধি, সংসারে নিস্তেজ ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ দেখি। কিন্তু সেই ব্যাধির প্রকৃত ঔষধ বুদ্ধিবাদ নহে, জীবনেও বেদান্ত ধর্ম্মের পূর্ণতর আচরণ এই জ্ঞানই আমাদের সাধনা ও প্রচারের মূল মন্ত্র।

শ্রীহক সেই পথ মাড়াইতে চান না, বুদ্ধির বলেই দেশকে বলবান করিতে উৎসুক, আমার আপত্তি নাই, সবাই স্ব স্ব চিন্তা ও প্রেরণার স্রোতে কর্ম্মে লাগুন। সাক্ষাৎ কথা এই বুদ্ধিকেই যে প্রধান বলে তাহার পক্ষে যোগের কথা প্রহেলিকা আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। যোগের প্রথম ভিত্তি এই যে বুদ্ধির উপরে কিছু আছে, যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। বুদ্ধির বিকাশ ও বিশুদ্ধতা ত চাইই। হয় প্রথম ভগবানকে বুদ্ধির বদ্ধ দ্বারের উদ্‌ঘাটনে স্বধানপ্রতিষ্ঠিত দর্শন করিয়া, নয় হৃদয়ের গুপ্ত স্তরে অনুভব করিয়া তাহার পরে বুদ্ধির অতীত হই। গীতায়ও বলে, এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। যিনি বুদ্ধির উপরে, বুদ্ধি হইতে মহৎ বুদ্ধির সাহায্যেই তাঁহাকে বুঝিয়া smaller selfকে greater selfএর, ক্ষুদ্র আমিকে বড় আমির, মানুষের অহংকে অন্তরস্থ পরমাত্মা পুরুষোত্তমের বশ করা বিহিত। বুদ্ধিবাদী ও আত্মবাদীর পথ বিভিন্ন, গতির নিয়ম শক্তি আস্থা স্বতন্ত্র, পথিকের ভাষাও স্বতন্ত্র। আমি ও শ্রীহক দুইজনেই ভগবৎ শব্দ প্রয়োগ করি, কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধে তাঁহার বুদ্ধির ধারণা আর আমার অন্তরের অনুভব, এই দুইটীর বিন্দুমাত্র ঐক্য নাই। শব্দ এক, অর্থ বিভিন্ন। এই স্থলে তর্কের কি উপকার? তিনি যদি ইংরাজী আমি যদি ফরাসী লিখি, যেমন ফল হয়, এই ক্ষেত্রে সেই ফলই হওয়া সম্ভব। তাহার ইংরাজী আমি বুঝিতে পারিব, আমার ফরাসী তিনি বুঝিবেন কেন। তাহার মনের ভাব আমি বুঝি, মনুষ্য সাধারণের ভাব, আমারও একদিন সেই ধরনের চিন্তা তর্ক সন্দেহ যে হয় নি তাহা নহে, যখন আমিও বুদ্ধিবাদী নাস্তিক বা agnostic ছিলাম, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করি নাই। আমার যে ভাব ও প্রত্যক্ষ দর্শন (direct experience) তাহার হয় নাই, জিনিষটী যখন চেনেন না, যে ভাষায় তাহা ব্যক্ত হয়, তাহার পক্ষে শূন্য কল্পনার ভাষা মাত্র। শ্রীহকের কল্পিত ভগবানকে মনুষ্যের মানসক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হন, আমার আপত্তি নাই, সত্য ভগবানকে কেহ বিতাড়িত করিবেন না, শ্রীহকও নয়, Voltaireও নয়, জড়বাদী বিজ্ঞানও নয়। তিনি নাস্তিককেও চালান, আস্তিককেও

চালান, তিনি সকলের অন্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা।

এই পত্রের আর একটী আপদ যে আমরা যাহা বলি নাই, পত্রলেখক তাহাই জোর করিয়া আমাদের মুখে গুঁজাইয়া দেন, সেই কল্পিত মিথ্যা ভক্তিকেই ব্যঙ্গপূর্ণ তেজস্বী বাক্যস্রোতে ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হন। প্রথম তিনি বলেন, আত্মসমর্পণের অর্থ নিশ্চেষ্টতা, তোমাদের সাধন নিশ্চেষ্টতার সাধন, তাহা যদি হয়...

ধৈর্য্যের সহিত, সূক্ষ্মভাবে দার্শনিকের কথা বুঝিয়া নেওয়া আবশ্যক। ক্ষুদ্রকায় প্রবর্ত্তকের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেইরূপ পূর্ণ দার্শনিক বিচার সম্ভব নহে। যোগপন্থা কিন্তু শুধু চিন্তার বিষয় নহে, আন্তরিক জীবনের অনুভবের বিষয়। যেমন সাধারণ মনুষ্যজীবনে নানা বিরোধ ওঠে, যোগপন্থায়ও ততই বা ততোধিক বিরোধ বিঘ্ন প্রকট হয়। Provisional সামঞ্জস্য করি অনুভবে চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, অবশেষে ভগবৎ আলোক বিস্তারে সব বিঘ্ন বিদূরিত হয়, সকল বিরোধী সত্যের প্রকৃত অর্থ ...* তাহাতেই সামঞ্জস্য আপনি আসিয়া পড়ে, বুদ্ধির চেষ্টা করিয়া আর মিলাইতে হয় না। শ্রীহক কিন্তু যোগপ্রার্থী নয়, অন্তরের জীবনের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই, ভারতের বাহিরের জীবনের দিকে। আমাদের উদ্দেশ্য ও ...* ভিতরের জীবন দ্বারা বাহিরের জীবন গড়া, to live from within outward, অবস্থার দাসত্ব না করিয়া বাহ্যিক ঘটনার বেগে পুতুল নাচ না করিয়া ভিতরের স্বারাজ্য সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করা। আমাদের বিশ্বাস দেশের যুবকগণ যদি এইরূপ ভিতরের স্বারাজ্য সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারে, ভারতভূমি আবার অভ্রভেদী মহিমায় মস্তক উত্তোলন করিয়া সমস্ত জগৎকে স্বকীয় আলোকে শক্তিতে আনন্দে পূর্ণ ও প্লাবিত করিয়া দিবে। ফলেন পরিচীয়তে, ফল কিন্তু একদিনেও হইবার নয়, কাঁচা অবস্থায়ও নয়, পূর্ণসিদ্ধির উপর নির্ভর করে।

আমাদের বিশ্বাস এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনের চেষ্টায় ভারত প্রাচীনকালে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল পরে অবনতির যুগেও সেই বলে সহস্র বিপদে বাঁচিয়াছে, য়ুরোপ এখন যে পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য ভগবদ্‌রাজ্য সংস্থাপন করিতে প্রয়াসী, এই পন্থায়ই সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে, বুদ্ধির অহঙ্কারের বলে নয়। শ্রীহকের মতে এই বিশ্বাস নিতান্ত অসার শিশুর আরামদায়ক কল্পনা মাত্র। তিনি বলেন ভারতের কেন্দ্রশক্তি কখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল না, principleকে সম্মুখে রাখিয়া ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেন নাই, দৌর্ব্বল্যে, আত্মরক্ষায় অসামর্থ্যে, তাহার পরে দায়ে ঠেকিয়া

* দুষ্পাঠ্য

সন্ন্যাসী সাজিয়াছে। ইতিহাসের অদ্ভুত ব্যাখ্যা বটে! ভারত সজ্ঞানে (consciously) টলস্টয়ের মত Resist no evil ইতি মহাবাক্যের শ্রদ্ধায় দুঃখদারিদ্র্য মহৎ করেনি। "ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞান ভূয়া মাত্র। ইহা জীবনেতে পূর্ণমাত্রায় গঠন করিয়া তুলিতে অক্ষম।" আবার বলেন না কি, "Lloyd George, Dr. Wilsonএর মত এমন একটী লোকও ভারতে ছিল না যে একটা principleকে সম্মুখে রাখিয়া সকল ঐশ্বর্য্যকে ত্যাগ করিয়াছিল।" আমাদের আত্মসমর্পণ কথা শুনিয়া শ্রীহকের হাসি পায়, এই কথা শুনিয়া আমাদেরও হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। আমরা পাগল না হয় শিশুর মত অনেক অসার কথা বলি, কিন্তু তুমি বুদ্ধির উপাসক এই কি নিতান্ত বালকের মত উক্তি উদ্ধার করিলেন, শ্রীহক? প্রাচীন ভারতের আশ্রমপ্রথায় কি কোন principle ছিল না? বুদ্ধের ঐশ্বর্য্যত্যাগে principle ছিল না? দায়ে ঠেকিয়াই বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকলেই সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন?

আসল কথা বলি। Resist no evil প্রাচীন বৌদ্ধদের জৈনদের principle ছিল, সমস্ত ভারতের নয়। ভারতের প্রাচীন মতে দারিদ্র্য গ্রহণ করা, নিঃস্ব হওয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, সংসারীর ধর্ম্ম নয়। ভারতের শাস্ত্র মনুষ্য জীবন চারিটী উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়াছে, অর্থ কাম ধর্ম্ম মোক্ষ, য়ুরোপীয় শাস্ত্রেরও unformulated ভাবে অনেকদিন সেই চারিটীই ছিল, সে মনুষ্যস্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সত্য যে ভারতের সন্ন্যাসী যাহাই করুন জাতি ইচ্ছা করিয়া ঐশ্বর্য্যত্যাগ করেন নাই। প্রবর্ত্তকের লেখক ভাবের উচ্ছ্বাসে এই কথা লিখিয়া ফেলিলেন যে ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরিয়া ইহজগতের সকল ঐশ্বর্য্যেই বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, অত্যাচার সহ্য করিয়াছে — স্বেচ্ছায় নয়, দৈববিপাকে। এই কথা অতিশয়োক্তি, ঠিক সত্য নয়। ভারতবর্ষ সেইদিন পর্য্যন্ত মহা ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, মহা শক্তিমান ছিল। হূন শককে আত্মসাৎ করিয়া দুদিনে ফেলিয়াছিল, বর্ব্বরকে সুসভ্য আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিল। মুসলমান আসিয়াছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্য কমে নাই। বিজিত যদি বল দেখিবে য়ুরোপেও এমন দেশ নাই যে একসময় বিজেতার অধীনে ছিল না। তবে ভারতের রাজনীতিক ঐক্যতার অভাবে বারবার সেই আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে, বারবার সামলাইয়া লইয়াছে হয় বিজিতকে আত্মসাৎ করিয়াছে নয় বোঝাপড়া করিয়া শান্তিতে বা যুদ্ধে, ইহা কম শক্তির লক্ষণ নহে। অবশেষে অবসন্ন দুর্ব্বল দরিদ্র হইয়া পড়ে — ঐশ্বর্য্যহীন বিবিধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত — এই দুই শতাব্দী ধরিয়া মাত্র, এখন আবার উঠিতেছে, ইংরেজ জাতির সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া স্বরাজের চেষ্টায় আছে। আধ্যাত্মিক বলে নয় ত কোন শক্তিতে এতদিন

বাঁচিয়াছে, বিপদের তরঙ্গে বারবার উঠিয়াছে বল দেখি? ভারতবাসী যিনিই বলুন, ইংরেজই হউন, ভারতবাসীই হউন, কখন একথা স্বীকার করো না যে আমরা হীন চিরপতিত গুণহীন জাতি। সে কথা সত্য নহে, ডাহা মিথ্যা।

তাহার পর আধ্যাত্মিকতার কথা। যিনি বলেন ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় আধ্যাত্মিকতাকে principle করিয়া গঠিত হয়নি, তিনি হয় ভাল করিয়া study করেন নাই নয় আধ্যাত্মিকতা কি সেই সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত। স্বীকার করি, ভারতে আধ্যাত্মিকতার ছাঁচে সমস্ত জীবনকে "পূর্ণ মাত্রায়" গঠন করিতে পারে নাই — কজন principleএর মত সমস্ত সত্তার অংশকে গঠন করিতে সমর্থ। মনুষ্য অতি complex being, সেই জন্য জীবনের যত জটিলতা, সমস্যা, আত্মবিরোধ। ইহাও স্বীকার করি সেই ন্যূনতা যত গলদের গোল। এই আদর্শের যেমন মহাফল হয়, তেমনই মহাবিপদও হয়, ন্যূনতায় সহজে ভ্রংশ হয়, কিন্তু আবার শীঘ্র পুনরুত্থান হয়। ইহাও স্বীকার করি যে শেষ অবস্থায় অতিমাত্র গলদ ছিল, মানুষী তনু আশ্রিত ভগবানকে অবমাননা, জ্ঞান কর্ম্মকে খাটো করা, যোগের জীবনের বিচ্ছেদ ও বিরোধ, ইত্যাদি ভুলভ্রান্তির অতিমাত্র বৃদ্ধি। সেইজন্যেই ভারতের আধ্যাত্মবিজ্ঞানকে ভূয়া মাত্র বলা নিতান্ত অসার কথা, অল্প বা অধীর বুদ্ধির লক্ষণ। আধ্যাত্মিকতার ঠিক পন্থা হারাইয়া ভারত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আধ্যাত্মিকতা জিনিসটা ভিতরে কখন হারায় নাই, সেই নিহিত শক্তিতে সমস্ত আক্রমণ বিপদ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে, সেই শক্তিতে উঠিয়াছে। প্রমাণ এই যে যেখানে যতবার উঠিয়াছে, সে আধ্যাত্মিকতার একটা নূতন তরঙ্গের মুখে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এইবারও যে উত্থান হইতেছে, আধ্যাত্মিকতার নূতন তরঙ্গই তাহার পূর্ব্ব-চিহ্ন ছিল। ইতিহাসকে যদি অস্বীকার কর, factকে যদি স্বমতের জোরে উড়াইয়া দাও, তাহা হইলে আর কথা নাই।

শ্রীহক য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেখান। জিজ্ঞাসা করি মানুষী বুদ্ধির অনুশীলনে কোনও য়ুরোপীয় জাতি অমর হইয়াছে বা সহস্র সহস্র বৎসর বাঁচিয়াছে। তিনি যদি বলেন যে আধ্যাত্মিকতায় ধুয়া ধরায় বুদ্ধিকে প্রধান না করায় ভারত অধঃ-পতিত, — স্বাধীন বুদ্ধির অনুশীলন কমিয়া যাওয়ায় ঢের ক্ষতি হইয়াছে, অস্বীকার করি না, আমি সে কথা বারবার লিখিয়াছি, — আমিও বলিতে পারি কেবল মানুষী বুদ্ধিকে প্রধান করিয়াই রোম গ্রীস মিশর, অসুর দেশ বাবিলোন মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষী বুদ্ধির প্রাবল্যে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-আমেরিকা জর্ম্মণীকে জয় করিয়াছে, অতএব ভগবানকে তাড়াইয়া দাও, জয় মানুষী বুদ্ধির জয়! জিজ্ঞাসা

করি জর্ম্মণীর কি বুদ্ধিবল, বুদ্ধির অনুশীলন ছিল না? যুদ্ধের প্রথম দিন পর্য্যন্ত জর্ম্মণীই এক শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপের গুরু, দর্শনে গুরু, বিদ্যায় গুরু, বুদ্ধিবাদের গুরু, জড়বাদের গুরু, Socialismএর গুরু, বিজ্ঞান তত্ত্ব অন্বেষণে তত না হোক বিজ্ঞান প্রয়োগে গুরু। সেইরূপ বুদ্ধিগঠিত শৃঙ্খলা নিরেট বন্ধন organisation, efficiency আর কোথাও ছিল না। এই বুদ্ধিই যদি সর্ব্বস্ব, হেন জর্ম্মণীর পতন হইয়াছে কেন। যে ইংলণ্ড বুদ্ধির ধার ধারে না, we somehow muddle through বলিয়া যাহার বড়াই, সে জয়ী হইয়াছে কেন, যে ফ্রান্সের চিরকলঙ্ক এই যে সাহসী বুদ্ধিমান সভ্যতার কেন্দ্র হইয়াও সে বিপদে টিকিতে পারে না, সেই বা এইবার টিকিয়াছে কেন, যে আমেরিকা সভ্যতার একপ্রান্তে পড়িয়াছিল, সে হঠাৎ জগতে idealismএর নেতা হইয়া উঠিয়াছে কেন। কেবলই কি বুদ্ধির বলে?

জানি না শ্রীহক য়ুরোপের ভিতরের খবরের কথা রাখেন না কেবলই এই দেশের খবরের কাগজ পড়িয়া তাহার ধারণা গঠিত করেন! ইহা কি জানেন না যে বুদ্ধিবাদী য়ুরোপ আর বুদ্ধিবাদী নহে, ভারতের আধ্যাত্মিকতার সেইখানে আধিপত্য-কাল আরম্ভ হইয়াছে। এই স্রোত কুড়ি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বহিতেছে — দর্শনে, চিন্তায়, কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে। ইহা কি জানেন না যে, আমেরিকায় সৈনিক কি ধরণের চিঠি লেখেন, মাঝে মাঝে কবিতার উদ্গার করে ছত্রে ছত্রে ভগবানের কথা ভগবানের ভরসায় তাঁহারই শক্তিতে যুদ্ধ করার কথা। আর সামান্য লেখক যে সব কবিতা লেখে, কেবলই অধ্যাত্ম, পুনর্জ্জন্ম, সর্ব্বজীবে ভগবদ্দর্শনের কথা। ইংরেজ Wells সে দিন বুদ্ধির বলে আদর্শ সমাজ সংস্থাপন কথা লিখিয়াছেন, এখন কি লিখিতেছেন? "বুদ্ধির বলে হইবে না, অন্তরস্থ ভগবানকে জাগাইয়া দাও, উঠে পড়ি, ভগবানের সৈনিক হইয়া আত্মার বলে ভগবানের শক্তিতে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য, ভগবদ্‌রাজ্য স্থাপন করি।" Noyesএর মত ইংরেজ কবিরাও সেই একই কথা লেখেন, ভগবানের রাজ্য। শ্রীহক দেশ হইতে মহাকাপুরুষ ভগবানকে তাড়াইতে বলিতেছেন, য়ুরোপকে সেই কথা বলেন গিয়া!* শুধু আমরা

* [পত্রের মধ্যে এই অংশটুকুর স্থান নির্দেশ করা যায়নি, তবে এইখানে প্রযোজ্য হতে পারে।]

"তাহা কি হইতে পারে? বীর মানুষী বুদ্ধি কাপুরুষ ভগবানকে তাড়াইতে পারিবে না। ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহার নাম মুছাইত? আলবাৎ করেঙ্গা। দুঃখের কথা যে, যে কেষ্ট শ্রীহকের বিস্ময় ও ভক্তির পাত্র, সেখানেই ধূর্ত্ত ভগবান একবার পলায়ন করিয়াও এখন আবার রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, বুদ্ধিবাদ হটিয়া যাইতেছে। আবার বেদান্তের দেশ, অবতারবাদের দেশ ভারত, চৈতন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জন্মভূমি বঙ্গভূমি হইতে ভগবানকে তাড়াইতে আহ্বান করিতেছেন। শ্রীহক ক্ষমা করুন, সেই অসাধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে আমরা নারাজ।"

যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিতেছি তাহা নয়, য়ুরোপের চিন্তানায়ক সেই সুর ধরিয়াছেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য একমত হইতেছেন।

এখন প্রশ্ন এই য়ুরোপ বুদ্ধিবাদ ছাড়িতেছে, আমরা কি ধরিব, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বলে, নয় বুদ্ধির বলেই বলীয়ান হইব? যদি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পূর্ণমাত্রায় জীবনকে গঠন করা শ্রেয়ঃ, তাহার প্রকৃত পন্থা কি? সেই আলোচনা পরে হইবে।

*

যে পত্র আমার নিকট পাঠাইয়াছ, পত্রলেখক [এর] মনের মত সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন। লেখক বিক্ষিপ্ত চিন্তার উত্তেজনায় হৃদয়ের তীব্র আবেগে যে এলোমেলো ভাবে নানান কথা জড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহার চিন্তার গতি যদি অনুসরণ করিতে যাই, সেই আবর্ত্তে পড়িতে হয়, অথচ অন্য ভাবে অন্য দিক হইতে বিষয়টী ঠিক উত্তর দেওয়া হয় না। তাহার উপর অল্পকথায় সমস্ত বিশ্বসমস্যা উত্থাপন! দুইচারিটী মোট কথায় বিশ্বসমস্যার মীমাংসা করা অসাধ্য, যদিও অল্প-কথায় উত্থাপন করা সহজ। যেমন পারি, দুই কথায় সহজ ভাবে যাহা হয়, এই সকল প্রশ্ন ও আপত্তির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। প্রথম একটা কথা না বলা চলে না। লেখক মানুষী বুদ্ধির ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ, বুদ্ধির বলে আস্থাবান বলবান হইতে চান। বেশত, কিন্তু ইহাই যদি পন্থা, প্রথম বুদ্ধিকে ধীর স্থির শৃঙ্খলিত করিতে হয়, হৃদয়ের আবেগ উদ্বেগ বিক্ষেপে উদ্বেলিত চিন্তায় কোনও সমস্যা মীমাংসিত হয় না, জীবনের গতির কোনও স্থির পন্থাও পাওয়া যায় না। য়ুরোপের বুদ্ধিবাদীও এই কথা জানেন ও বলেন যে হৃদয়দমনে মতের হঠকারিতা বর্জ্জনে ক্ষুদ্র আমিকে নীরব করিয়া বিরাট সত্যকে দেখিতে হয়। জগৎ দুঃখপূর্ণ বলিয়া চঞ্চল হওয়ার কোনও ফল নাই, স্থিরভাবে গলদ কোথায় দেখ, রোগের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ঔষধ ও পথ্য বিধেয়। আর একটী অপ্রিয় কথা আমি বলিতে বাধ্য। জাতি বা ব্যক্তি যদি জগতের সহস্র আঘাতে তিষ্ঠিতে চায়, ধীরভাবে দাঁড়াইতে হয়। বিপদে আক্ষেপ অশ্রুবর্ষণ কান্নার সুর নৈরাশ্য হাহাকার দৌর্ব্বল্যের অক্ষমতার লক্ষণ। ইহা হইতে বিপদকে "মূক ও বধিরের মত" নীরবে সহ্য করা সহস্রগুণ ভাল। আত্মরক্ষা, সহ্য করা বা তিতিক্ষা, স্থিরতায় ক্ষমতায় স্বারাজ্য, আত্মশক্তিতে সাম্রাজ্য, এই হইল আত্মোন্নতির চারিটী ধাপ, বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ের চারিটী পাঠ। লেখক ভগবানকে "মহা কাপুরুষ" বলিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের জগৎ বীরের দিগ্বিজয়ের রণক্ষেত্র। জীবনের আকৃতি গতি স্থিতি দেখ, জড় হইতে

আত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত ইহাই তাহার প্রথম ও শেষ শিক্ষা। তিনি যদি সত্যই লক্ষ্য ও পথ ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া principle সম্মুখে রাখিয়া চলিতে চান, বুদ্ধির খেয়াল নয়, প্রাণের তরঙ্গরূপ অধীর উচ্ছ্বাস নয়, আগে স্থির ভাবে দেখুন, তাহার পর যে সত্যই পান, সেই principle পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করায় ফল হইবে। বুদ্ধির অনন্তপথ, বুদ্ধিমান একপথ স্থির করিয়া লক্ষ্যের দিকে চলেন, এই ওই দিক ছুটিলে ব্যতিব্যস্তই হইতে হয়, কোথাও পহুঁচান যায় না। ইহাই বুদ্ধির নিয়ম।

প্রবর্ত্তকের নির্দ্দিষ্ট পথ স্বতন্ত্র, সে একা বুদ্ধির নহে, আত্মার ও সমগ্র সত্তার। আমরা পূর্ণযোগের সাধক, ভগবানকে পূর্ণভাবে লাভ করিয়া জগতে দাঁড়াইতে চাই। এই সাধনায় অনেক বিরোধের সামঞ্জস্য করা, অনেক জটিল সমস্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। তথাপি আমাদেরও একটী principle আছে, সেটীকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া চলি, সে কি তাহা পরে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। পত্রলেখক প্রবর্ত্তকে বিরোধের উক্তি দেখিয়া আমাদের উপর আক্রোশ করেন, বিরোধের সামঞ্জস্য দেখেন না, তাহার কারণ তিনি কেবল বহির্মুখী তার্কিক বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে চান, আমরা কিন্তু আত্মজ্ঞান ও সাধনের দৃষ্টিতে দেখি, সেই ভাবে চলি। আত্মবিরোধের একটী দৃষ্টান্ত দেন যে আমরা একস্থলে বলিয়াছি "যে যেখানে আছ, বসে পড়", আর একস্থলে "ভগবান যে দিকে ছুটিয়ে চালান, যাও।" এখন যোগপথে বসিয়া পড়া যেমন সত্য, ছুটিয়া যাওয়াও সত্য। সাধনের কথা, সাধনের নানা অবস্থা আছে। প্রথম উক্তি একটী সাধারণ নিয়ম, শেষ উক্তি বিশেষ অবস্থায় খাটে। সাধনের প্রথম অবস্থায় ভগবান চালান বটে, আমরা কিন্তু ছুটি অহংকারের, রাজসিক উত্তেজনার বেগে প্রেরণাকে বিকৃত করিয়া, তখন বসিবার আদেশ, নিশ্চেষ্টতার সাধন অনিবার্য্য হয়। বরাবরই যদি সেই অশুদ্ধ মনে বিকৃত প্রেরণায় চলি, কোনও গভীর খাদে পড়িয়া হাড় ভাঙ্গান লাভই হইবে। ভগবান যখন চালান, যাও, যখন বসাইয়া দেন, বসিয়া পড়, এই কথায় এমন কি বিরোধ আছে? যখন সিদ্ধির অবস্থা হইবে তখন এই বিকৃতির জঞ্জাল বিনষ্ট হইবে, তখন না হয় অবিশ্রামে বরাবর ছুটিয়া যাইব, তাহাও ভগবানের ইচ্ছাশক্তি আদেশ ও প্রেরণার উপর নির্ভর করে। আর তখনও সকল চেষ্টার পিছনে একটা মহতী নিশ্চেষ্টতা বিরাজ করিবে। আত্মতত্ত্বের কথা, যোগের কথায় কেবলই তার্কিক বুদ্ধি লাগান চলে না। তার্কিক বুদ্ধির হিসাবে উপনিষদের ভগবানকে এক সময়ই নির্গুণ ও গুণী বলা বিরোধ দোষে দূষিত বর্ণনা, যেমন এক ফুল সুগন্ধি ও গন্ধহীন

হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানের বেলায় তাহা খাটে না। তিনি গুণের মধ্যে নির্গুণ, চেষ্টার মধ্যে নিশ্চেষ্ট, যেমন জমাট বরফের ঢাকা তরল জল। বুদ্ধিমানের mechanical রূল করা কর্ম্মে ও সাধকের জীবন্ত আত্মগঠিত কর্ম্মেও সেই প্রভেদ।...

*

প্রথম পত্র সাধারণের জন্যে লিখি নাই, লিখেছিলাম তোমার পত্রের দুয়েকটী কথার উত্তরে। আমাদের কাজের পথে অতি আবশ্যক ভেবে, বাঙ্গালীর কোথায় দোষত্রুটি কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাতের সম্ভাবনা তারই সম্বন্ধে কয়েকটী চিন্তা ব্যক্ত করেছিলাম সেই পত্রে। বাঙ্গালীর কোনদিকে আশা, কোথায় তাহার বল ক্ষমতা কার্য্যসিদ্ধির সামগ্রী, কিসেতে তার শক্তি নিহিত, সে সকল কথা লিখবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে ছিল সকলের জানা কথা, আমাদের উচ্চাশার ভিত্তি, আমাদের কর্ম্ম প্রেরণার প্রধান সহায়। বাঙ্গালীর জাগরণ মহত্ত্ব অশেষ potentiality উদার ভবিষ্যৎ লইয়া আমরা যে উচ্চ ধারণা ও উচ্চ আশা পোষণ কর্ত্তে সাহস করি, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল চিত্র মনের পটে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে, সে এত উচ্চ এত উজ্জ্বল যে সে অত্যল্প লোকের কল্পনায়ও আসিতে পারে। সে আশা দেশাভিমানীর মিথ্যা স্বপ্ন নয়, বাস্তবকে বীজরূপ দেখে ভাবী মহৎ বৃক্ষের আকৃতি নিরূপণ, actualকে চিনে possibleকে চেনা সেই কারণেই...

*

জাতির দোষ অভাবের সম্বন্ধে লিখেছি যাহা, তাহা তোমার কথার উত্তরে একটী দিক মাত্র, ছায়ার দিকটী মনে কর না যা এইটী এই বিষয়ে শেষ কথা। সর্ব্বদা সত্যের দুই দিক আছে, ছায়ার দিকটী দেখিয়ে দিলাম, আলোর দিকটী দেখতে হবে, তাহাই আসল। তাহারই উপর বেশী জোর দেওয়া ভাল। Negativeটী দেখাতে হয়, ভিতরের দোষ অভাব মোচন করা দরকার শুদ্ধির জন্যে, positiveটী কিন্তু সিদ্ধির বীজ, আত্মার মূল capital, ভবিষ্যতে উন্নতির মুখ্য উপায়।...

*

মায়াবাদের কথা যখন আবার উঠিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে দুয়েকটী মুখ্য কথা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করি। সত্য কি অসত্য কি, নিত্য

অনিত্য, সৎ অসৎ ইত্যাদি দুরূহ দার্শনিক তর্ক ছাড়িয়া দিলাম। আসল কথা সহজ উদ্দেশ্য লইয়া, practical spiritual result, আধ্যাত্মিক চরম সিদ্ধি ও জগজ্জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ও পরিণাম। আমাদের কি মতের সিদ্ধান্ত মনোনীত, কি ভাবি, চিন্তার প্রণালী ও ধরণ গৌণ কথা, কি হই তাহাই মুখ্য। আধ্যাত্মিক চিন্তা অধ্যাত্ম সিদ্ধির সহায় বলিয়া আদরণীয়, ভাবা হওয়ার উপায় বলিয়া মহৎ, শক্তির একটী প্রধান যন্ত্র।

প্রবর্ত্তকে মায়াবাদের বিরুদ্ধে অনেকবার লেখা হয়, এই পর্য্যন্ত সে গৌণভাবে হয়, মায়াবাদপ্রসূত কয়েকটী সাধারণ ভ্রান্তি আমাদের গন্তব্য পথে অন্তরায়রূপে পড়িয়া আছে, সেইগুলি অপসারিত করিবার অভিপ্রায়ে মোটামুটি কয়েকটী কথা। এখন একজন প্রধান সন্ন্যাসী প্রচারক এই আক্রমণে ক্ষুব্ধ হইয়া সেই দার্শনিক শুষ্কবাদের আধুনিক একটী সরস [প্রবন্ধ] বাহির করিয়াছেন, এই অবসরে একটু বিস্তারিতভাবে আসল কথা বলা প্রয়োজন হইল। আর প্রথমে এই কথা আদবে উঠে কেন, তাহার কৈফিয়ৎ দরকার। মায়াবাদের উপর আমাদের এত বিতৃষ্ণা কেন? বাদবিবাদের কি প্রয়োজন, প্রত্যেকেই ভগবানের নিকট নিজের মনোনীত পথে যাইলেই হয়, ভগবান অনন্ত, তাঁহার নিকট পহুঁচিবার পথও অনন্ত। অবশ্যই ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম চর্চ্চার বিষয়ে এই নিয়ম খাটে, কিন্তু এই বিষয় ব্যক্তিগত সাধনা লইয়া নয়, সমষ্টি লইয়া। ভারতের জীবন, জগতের জীবন লইয়া। মায়াবাদ শুধু সাধনায় একটী পন্থা নহে, তাহার হাত জগৎকে গ্রাস করিতে প্রসারিত। তাহার প্রভাবের ছায়া সমস্ত জীবনের উপর ছাইয়া পড়িয়াছে — সেই ছায়ায় ভারতের জীবন শুকিয়া গিয়া আধমরা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে আবার পুনরুজ্জীবিত বলবান পরিপুষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা প্রয়োজন। মায়াবাদের একমাত্র আধিপত্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

*

স্বামী সর্ব্বানন্দের সকল যুক্তির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এইরূপ বাদবিবাদে যে বিশেষ কোনও উপকার হয়, সেই বিশ্বাস আমার নাই, অথবা কোনও উপকার যদিও হয়, সে বুদ্ধির চতুঃসীমানায় নিবদ্ধ। এইরূপ তর্ক, দার্শনিক যুক্তির তর্ক ও কথার কাটাকাটিতে বুদ্ধির সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেও পারে, আত্মার স্ফূর্ত্তি কিন্তু সরস ও পূর্ণ না হইয়া খর্ব্ব হয়, শুকাইয়া যায়। যাহা বাস্তব, যাহা প্রত্যক্ষ তাহা লইয়াই আত্মার অনুভূতির জীবন্ত বিস্তার

ও উন্নতি। তথাপি যখন কথাটী উঠিয়াছে, এই সকল যুক্তি তর্কে এক এক জনের কাঁচা বুদ্ধি বিচলিত হইতে পারে, এই সম্বন্ধে আমাদের যা বলিবার বলিয়া শেষ করা ভাল।

আমাদের বিশ্বাস বুদ্ধিপ্রসূত দর্শনে ভগবানকে, আত্মাকে পাওয়া যায় [না]। দর্শনের আবশ্যকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই দর্শন কল্যাণকর যে প্রকৃত দর্শন, দৃষ্টি, অনুভূতি, intuitionএ প্রতিষ্ঠিত। তর্ক করিয়া যে সিদ্ধান্ত আমার মনোনীত তাহাই স্থাপন করিয়া একদিকদর্শী সত্যকে প্রতিপন্ন করা, ইহাই বুদ্ধি-প্রসূত দর্শনের নিয়ম...

*

মায়াবাদের আধিপত্য, মায়াবাদই ভারত আত্মার একমাত্র সত্য জ্ঞান অন্য সর্ব্ববিধ দর্শন ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি খণ্ড সত্য বা ভ্রান্তি, এই যে ধারণা – — যাহা শংকরের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধিকে আক্রান্ত ও অভিভূত করিয়া রহিয়াছে, প্রবর্ত্তকে তাহার বিপক্ষে অনেকবার লেখা হইয়াছে। সেইদিন প্রবর্ত্তকে সেই অর্থেই একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; সেই প্রবন্ধ অবশ্য গভীর সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব তলাইয়া নহে, প্রশ্নর একটী দিক মাত্র লইয়া লেখা। তাহারই প্রতিবাদে স্বামী সর্ব্বানন্দ উদ্বোধনের আষাঢ়ের সংখ্যায় একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া মায়াবাদকে সমর্থন করিয়াছেন। দার্শনিক বাদবিবাদে আমরা প্রায়ই সময় নষ্ট করিতে ...* অনিচ্ছুক। প্রথমতঃ প্রবর্ত্তকের আকার ক্ষুদ্র, দার্শনিক বাগবিতণ্ডার শেষ নাই, সম্যক রূপে এই যুক্তি ওই যুক্তির নিরসন খণ্ডন সমর্থন প্রতিষ্ঠা করিতে যদি হয়, আমাদের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অবসর থাকা কঠিন। মায়াবাদের সম্বন্ধেও আমরা শুধু কয়েকটী মোট কথা বলিয়া সন্তুষ্ট ছিলাম তাহাও কেবল এই কারণে বলিতে হইল, যে আধুনিক ভারতের মনে ওই দার্শনিক মতের ছাপ, মায়াবাদের একাধিপত্য পূর্ণযোগের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা না বলা চলে না। আমাদের উদ্দেশ্য মানুষের সমস্ত সত্তা জাগাইয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আলোকিত করিয়া আত্মানুভূতিতে ভরিয়া ভগবৎ-চিন্তায় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া মানুষের সকল বৃত্তি ভগবানের সাযুজ্যে সালোক্যে সামীপ্যে সাধর্ম্ম্যে ভগবদ্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশকে জগৎকে মনুষ্য জীবনের

* এই স্থলে এক বা একাধিক শব্দ লেখার জন্য পাণ্ডুলিপিতে জায়গা ছাড়া ছিল। —স.

প্রকৃত উন্নতি সম্পূর্ণতা সংসিদ্ধির দিকে প্রণোদিত করা। মায়াবাদ যদি একান্ত একমাত্র সত্য হয়, এই চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। একই উপায় থাকে, কৌপীন বা গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া অরণ্যে পর্ব্বতে গুহায় বা মঠে বসিয়া — কিন্তু মঠস্থাপনও যে অজ্ঞান ভেল্কী মায়া, তাহা ভুলিতে নাই — লয়ের, মোক্ষের তীব্র পরিশ্রম। যদি এই একমাত্র সত্য অর্থে আমরা অসমর্থ, যতদিন সামর্থ্য না হয় মায়ার মধ্যে রহিয়াই সকল দুঃখ ক্লেশ দেশের দারিদ্র্য অবনতি মাথায় করিয়া কোনরকম বাঁচিয়া থাকা আর সবই মায়া জগৎ মিথ্যা চেষ্টা মিথ্যা এই [মন্ত্র] আওড়াইতে আওড়াইতে ওই একমাত্র সত্য জ্ঞানকে অবাধ্য মনে জাগ্রত করা বুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

সাধনাবিষয়ক পত্রাবলী

[এই পত্রগুলো 'ন', 'স' ও 'এ'কে লিখিত। এঁদের মধ্যে 'ন' ও 'স' ছিলেন আশ্রমের সাধিকা — শ্রীমাকে সম্বোধন করে বাংলায় চিঠি লিখতেন। শ্রীঅরবিন্দ সেসব চিঠির উত্তর দিতেন। 'এ' ছিল দশমবর্ষীয়া বালিকা, কলকাতা হতে শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি লেখা শুরু করেন।]

''ন''কে লিখিত

ইহা সত্য নয় যে তোমার ভিতরেই বিরুদ্ধ শক্তি আছে — বিরুদ্ধ শক্তি বাহিরে, আক্রমণ করে ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে — এইরকম ভয় ও উদ্বেগকে স্থান দিয়ো না।...

6.2.34

*

ন: দু-তিন দিন যাবৎ দেখছি যে আশ্রমের মধ্যে এবং আশ্রমের আবহাওয়ার মধ্যে একটি খারাপ শক্তি ও একটি ভাল শক্তি এসে ঘোরাফেরা করছে। আমার অনুভূতি কি সত্য?

উ: যেমন বহির্জ্জগতে আশ্রমেও এই দুই শক্তি আরম্ভ থেকে বিদ্যমান আছে। অশুদ্ধ শক্তিকে জয় করে সিদ্ধিলাভ কর্ত্তে হবে।

6.2.34

*

ন: মা, সকলে সব সময় তোমাকে অনুভব করে ধ্যান করে শান্ত ভাবে চলছে। আমি কেন সব সময় তোমাকে হারিয়ে দ্বন্দ্ব, মিথ্যা শক্তি ও বিরুদ্ধ শক্তির বাধায় আক্রান্ত হয়ে পড়লাম?

উ: ''সকলে'' কারা? দুয়েকজন ছাড়া কেহ শান্তভাবে চলে না, সকলেই বাধা মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এগুচ্ছে।

8.2.34

*

মহেশ্বরীর দান শান্তি সমতা মুক্তির বিশালতা — তোমার এই সবের বিশেষ দরকার আছে বলে তিনি তোমার আহ্বানে দেখা দেন।

9.2.34

*

তাতে ভীত বা বিচলিত হয়ো না, যোগপথের নিয়ম এই, আলো অন্ধকারের অবস্থা অতিক্রম করে যেতে হয়। অন্ধকারেও শান্ত হয়ে থাক।

9.2.34

*

Persevere in this attitude of firmness and courage. এই দৃঢ়তা ও সাহসের ভাবকে সব সময় ধরে থাক।

9.2.34

*

(Red Lotus) — The Divine Harmony.

(Blue Light) — The Higher Consciousness.

(Golden Temple) — The Temple of the Divine Truth.

স্থির ধীর হয়ে থাক, তবে তোমার বাহিরেও, তোমার বহিঃপ্রকৃতিতে, তোমার জীবনে আস্তে আস্তে এই সকল ফলবে।

12.2.34

*

বাধা সকলের থাকে, আশ্রমে এমন সাধক নাই যার বাধা নাই। ভিতরে স্থির হয়ে থাক, বাধার মধ্যেও সাহায্য পাবে, সত্য চৈতন্য সকল স্তরে ফুটবে।

12.2.34

*

সব সময় স্থির হয়ে থাক — মায়ের শক্তিকে শান্তভাবে ডেকে সব উদ্বেগ ছেড়ে দিয়ে।

13.2.34

*

প্রতিক্ষণ বাধার কথা, আমি খারাপ আমি খারাপ ইত্যাদি কথা চিন্তা করে করে চলা হচ্ছে তোমার প্রধান অন্তরায়। শান্ত ভাবে মায়ের উপর নির্ভর করে,

স্থির ভাবে সাধারণ প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে, আস্তে আস্তে জয় করা — এই হচ্ছে এক মাত্র পরিবর্ত্তনের উপায়।

23.2.34

*

এটা কি মস্ত বড় অহংকার নয়, যে তোমারই জন্যে এত কাণ্ড হয়েছে? আমি খুব ভাল, খুব শক্তিমান, আমার দ্বারাই সব হচ্ছে, আমা ছাড়া মায়ের কাজ চলতে পারে না, এ ত এক রকম অহংকার। আমি খারাপের চেয়ে খারাপ, আমারই বাধার জন্য সব বন্ধ হয়েছে, ভগবান তাঁর কাজ চালাতে পারেন না, এই আর একরকম উল্টো অহংকার।...

23.2.34

*

ইহা হচ্ছে তোমার ভিতরের মন, আর মায়ের ভিতরের মনের যোগ — কপালে ওই মনের centre — সে যোগ যখন হয়, তখন সেই ভিতরের মনে ভাগবত সত্যের দিকে একটা আকর্ষণ হয় আর সে উঠতে আরম্ভ করে।

26.2.34

*

এটাই ঠিক পন্থা। সব সময় ভাল অবস্থা, সব সময় ভিতরে মায়ের দর্শন শ্রেষ্ঠ সাধকেরও হয় না — সে হবে সাধনার পাকা অবস্থায়, সিদ্ধির অবস্থায়। সকলের হয় মাঝে মাঝে ভরা অবস্থা আর মাঝে মাঝে শূন্য অবস্থা। শূন্য অবস্থায়ও শান্ত হয়ে থাকা উচিত।

26.2.34

*

অবশ্যই অনুভবটী সত্য — রাখতে হবে, অথবা বার বার repeat করতে হবে। আর বিপরীত অনুভব বা বাধা বা শূন্য অবস্থা এলে উতলা না হয়ে শান্ত হয়ে ভাল অনুভবের অপেক্ষা করা উচিত।

26.2.34

*

ন: কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম যে আমার মন প্রাণ প্রকৃতিই আমাকে তোমার পথে চলতে সাহায্য করছে। ইহা কি কোন দিন সত্য হবে?

উ: আজ থেকেও তারা সাহায্য কর্ত্তে পারে যদি তুমি শান্ত ও স্থির হয়ে থাক। তোমার এই ধারণা ভুল যে তোমার মনপ্রাণের সমস্ত প্রকৃতি যোগের বিরোধী।

26.2.34

*

...তপস্যার অগ্নি জ্বল্লে কম্প আর মাথায় একটী অসাধারণ অবস্থা অনেকের হয়। স্থির হয়ে থাকলে সে আর টিকে না, সব শান্ত হয়ে যায়।

26.2.34

*

ন: কাল রাত্রি হতে মাথার উপর একটা খুব শান্ত ও গভীর জিনিষ অনুভব করছি। কখনও তা বিস্তৃত হয়ে সমস্ত আধারে ছড়িয়ে পড়ে, কখনও-বা হৃদয়ে ও মনের মধ্যে নেমে কিছুক্ষণ থাকে।

উ: ইহা খুব ভাল। এইটী হচ্ছে আসল অনুভূতি। এই শান্তি যখন সমস্ত আধারে ব্যাপ্ত হয়ে যায় আর দৃঢ় নিরেট স্থায়ী হয় তখনই ভাগবত চেতনার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়।

27.2.34

*

ইহা করা সকলের পক্ষে কঠিন। শান্তি সত্য ইত্যাদি আগে ভিতরে স্থাপিত হয়, তারপরে বাহিরে কার্য্যে পরিণত হয়।

28.2.34

*

শূন্য অবস্থাকে ভয় করতে নেই। শূন্য অবস্থার মধ্যেই ভাগবত শক্তি নেমে আসে। মা তোমার মধ্যে সর্ব্বদাই আছেন — তবে শান্তি শক্তি আলো নিজের মধ্যে স্থাপিত না হলে সে সবসময় বোঝা যায় না।

28.2.34

*

যে তোমাকে ডাকল, সে তোমার মা নয়। এই সকল অভিজ্ঞতায় পার্থিব মাতা হচ্ছে পার্থিব প্রকৃতি, সাধারণ বহিঃপ্রকৃতির প্রতীক মাত্র।

Feb. 1934

*

সব বাধা ত বিরোধী শক্তির সৃষ্টি নয় — সাধারণ অশুদ্ধ প্রকৃতিরই সৃষ্টি, যা সকলের মধ্যে আছে।

Feb. 1934

*

তপস্যা শুধু এই, স্থির থাকা, মাকে ডাকা, খুব শান্ত দৃঢ়ভাবে অশান্তিকে, নিরাশাকে, কামনা-বাসনাকে প্রত্যাখ্যান করা।

Feb. 1934

*

আশ্রমে যে অসুখ বেড়াচ্ছে একে ওকে ধরে, এগুলো তারই লক্ষণ — স্থির থাকলে এইগুলো স্পর্শ করেই চলে যায়।

Feb. 1934

*

ন: কোন কোন সময় আমার মধ্যে এমন একটি শক্তি ও তেজ আসে যে তখন মনে হয় আমাকে কোন মিথ্যার শক্তি স্পর্শ করতে পারবে না।

উ: হ্যাঁ, এইরূপ শক্তি আধারে সব সময় থাকলে, সাধনা অনেকটা সহজ হয়ে যায় — যদি তাতে অহংকার না আসে।

Feb. 1934

*

বাধা সকলের হয় — যারা কাজ করে না, তাদেরও বিশেষ জোরে বাধা আসে।

1.3.34

*

নঃ ধ্যানে বসলে আগের মত গভীরে ও সমাধির মধ্যে যেতে পারি না কেন মা?

উঃ কেন হয় বলেছি — যোগশক্তির জোর এখন প্রকৃতির রূপান্তর, শান্তির ও ঊর্দ্ধ্বচৈতন্যের অবতরণ ও প্রতিষ্ঠার উপর বেশী পড়েছে, গভীর ধ্যানের অভিজ্ঞতার উপর তত না — আগে যেমন হয়েছিল।

1.3.34

*

নঃ আজ দেখলাম, মূলাধারের সঙ্গে মায়ের চেতনার সঙ্গে একখানা স্বর্ণদড়ির সম্বন্ধ হয়েছে।

উঃ এর অর্থ — মায়ের চেতনার সাথে তোমার physical প্রকৃতির একটী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে — সোনার দড়ি যে সম্বন্ধের চিহ্ন।

2.3.34

*

নঃ ...আমার একটু মনমরা শুষ্কভাব এসেছে। আর মনপ্রাণ-চেতনা দেখি আমাকে ত্যাগ করে দুদিন ধরে বাইরের জিনিষের সাথে, চেতনার সাথে যুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেমন যেন তোমাকে হারায়ে শূন্য নির্জ্জনতার মধ্যে পড়ে আছি।

উঃ যদি তাই হয়, তাহলে তার অর্থ এই যে তোমার ভিতরের সত্তা কতকটা স্বতন্ত্র ও মুক্ত হয়ে গেছে — বাহিরের সত্তাই বাহিরের জিনিষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সেই বাহিরের সত্তাকেও আলোকিত ও মুক্ত করা প্রয়োজন।

3.3.34

*

সাদা গোলাপ মায়ের কাছে প্রেমময় আত্মসমর্পণ, তার ফল সত্যের আলোকের বিস্তার আধারের মধ্যে। সাদা পদ্ম = মায়ের চেতনা প্রস্ফুটিত তোমার মানস স্তরে। কমলালেবুর রংয়ের মত আলো (red-gold) = দেহের মধ্যে পরম সত্যের দীপ্তি (Supramental in physical)।

5.3.34

*

সত্যের সোজা পথ খোলা আধারে। যা সমর্পণ করা হয় সেই অবস্থায় আধারে, সহজ সরলভাবে উপরে মায়ের কাছে গিয়ে সত্যের সঙ্গে মিলিত হয়, সত্যময় হয়ে যায়।

5.3.34

*

ন: মা, দেখলাম যে overmind-এর ঊর্দ্ধে এক infinite জগৎ। সে জগতে দেখলাম তোমার মত কতকগুলি বালিকা খেলা করছে। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সেখান হতে দুটি বালিকা আমাকে ডাকতে ডাকতে আমার দিকে নেমে আসল। মা, বালিকাগুলি কে?

উ: সত্যের জগৎ, সেই জগতের দুই শক্তি নেমেছিল ডাকতে — সত্যের দিকে উঠবার জন্যে।

5.3.34

*

ন: উপর হতে একটি খুব বড় চক্রের মত আমার মাথার মধ্যে নেমেছে। ...আর তার প্রভাব দেখি একটু একটু করে সমস্ত স্তরে বিস্তৃত হচ্ছে।

উ: মায়ের শক্তির একটী ক্রিয়া। যে ঊর্দ্ধ চেতনা হতে মাথায় (মনক্ষেত্রে) নেমে সমস্ত আধারে কাজ করবার জন্যে বিস্তৃত হচ্ছে।

7.3.34

*

ন: আত্মার গভীর প্রদেশে একখানা গভীরতম জগৎ আছে। এই জগতের মধ্যে দিয়ে দেখলাম একখানা সোজা রাস্তার মত কি বহু ঊর্দ্ধের দিকে উঠে গেছে।

উ: অর্থ — সেখানে পরম সত্যের সঙ্গে একটী সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়েছে।

7.3.34

*

ন: নাভির উপর হতে দেখি সাপের মত আলোকিত একটা কি নেচে নেচে

ঘুরে ঘুরে ঊর্দ্ধের দিকে উঠে যাচ্ছে।

উ: সে হচ্ছে প্রাণ ও দেহের শক্তি ঊর্দ্ধ সত্যের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে উঠে যাচ্ছে।

7.3.34

*

ন: মা, যতই তোমার শক্তির শান্ত চাপ পড়ছে, ততই দেখি মাথা কামড়াছে।

উ: Physical mind খুল্লে সেরকম মাথা কামড়ান আর হবে না।

7.3.34

*

ন: মা, ভেতরে যেসব সুন্দর অনুভূতি হয়, তাতে মনে করি যে এবার থেকে আমি এইরকম সুন্দরভাবেই সবসময় থাকব। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতিতে ও চেতনায় আসলে সব চলে যায় কেন? তোমাকে আবার স্মরণ করতে লাগলে এবং অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে সেই অনুভূতিগুলো ফিরে আসে।

উ: ওই রকমই হয়। যদি স্মরণ করে সুন্দর অবস্থা আবার দেখতে ও অনুভব করতে পার, ইহা উন্নতির লক্ষণ। বহিঃপ্রকৃতির বিপরীত ভাবের জোর কমে যাচ্ছে বোধ হয়।

9.3.34

*

ন: কতকগুলি ছোট ছোট বালিকার মত কারা করুণ ও মধুর সুরে শুধু তোমাকে ডাকছে, "মা, আমরা তোমাকে চাই, আমাদেরকে তোমার করে নাও"। আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। এরা কি সত্য? এরা কে, মা?

উ: হ্যাঁ, সত্য। বালিকারা হয় তুমি নিজে নানা স্তরে নয় তোমার চেতনার কয়েকটী শক্তি (Energies)।

9.3.34

*

জ্ঞান অনেক রকম আছে — চেতনা যেমন, জ্ঞানও তেমন। ঊর্দ্ধ চেতনার

জ্ঞান সত্য ও পরিষ্কার — নিম্ন চেতনার জ্ঞানে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত, অপরিষ্কার। বুদ্ধির জ্ঞান এক রকম, supramental চেতনার জ্ঞান আর এক রকম, বুদ্ধির অতীত। শান্ত জ্ঞান ঊর্দ্ধ্বচেতনার।

12.3.34

*

নঃ মা, তোমাকে আমার মধ্যে অনুভব করলে যেন আমিত্ব ভুলে যাই। আমার চেতনা, ইচ্ছা, অনুভূতি এবং সমস্ত অংশ কারো যন্ত্র হিসাবে চালিত হয়। কিছুক্ষণ পরে তা হারিয়ে ফেলি।

উঃ এইরূপ অনুভূতিও ঊর্দ্ধ্বচেতনার। সে চেতনা যখন মন প্রাণ দেহে নামে, তখন জাগ্রতে এইরূপ হয়।

12.3.34

*

নঃ আমি দেখলাম একটা খুব সুন্দর ছোট গাছ, তার পাতার রঙ চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল এবং সাদা। গাছটি ক্রমশ বড় ও উজ্জ্বল হয়ে নিজেকে ভগবানের দিকে খুলছে। আর দেখলাম একটি শান্ত ও পরিষ্কার সমুদ্র তোমার দিকে বয়ে যাচ্ছে, আর আমি যা সমর্পণ করছি তা এই সমুদ্রের সাথে মিশে যাচ্ছে।

উঃ গাছটী আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি তোমার মধ্যে — সমুদ্র তোমার vital.

12.3.34

*

নঃ বিজ্ঞানের আলো (Supramental light) কি কমলালেবুর রঙের মত আলো?

উঃ হ্যাঁ, ঠিক আদি Supramental light নয়, তবে সে আলো যখন physicalএ নামে, তখন ঐ রঙকে ধারণ করে।

12.3.34

*

ইহা খুব ভাল। এইরূপ সত্যমিথ্যাকে স্বতন্ত্র হওয়া psychic সত্তার জাগ্রত

ভাবের লক্ষণ। Psychic discrimination, চৈত্য পুরুষের বিবেকের দ্বারা এইরূপ স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।

14.3.34

*

সাধক-সাধিকার কথা বেশী ভাবতে নাই — তাতে মন সহজে সাধারণ বাহিরের চেতনায় নেমে যায় — এই সব মাকে সমর্পণ করে, মায়ের উপর নির্ভর করে ভিতরে বাস করতে হয়।

16.3.34

*

ন: একটী ছোট বালিকা আমার সাথে সাথে যেন আছে ও বেড়াচ্ছে। তার প্রভাব যখন বহিঃসত্তায়, বহিঃসত্তা হতে কি যেন তোমাকে পাওয়ার জন্য aspire করে।

উ: বালিকাটী বোধ হয় নিজের psychic being — মায়ের অংশ।

17.3.34

*

এই সব বিলাপ ও আত্মগ্লানির কথা লেখায় বিশেষ কিছু উপকার হবে না। শান্তভাবে মায়ের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। যদি বাধা আসে, তা শান্তভাবে সাধনা করে, মাকে ডেকে মায়ের শক্তিতে অতিক্রম করতে হয়। যদি নিজের ভিতরে প্রকৃতির কোন ত্রুটি বা wrong movement দেখ তাহলেও বিচলিত চঞ্চল দুঃখিত হয়ে কোন লাভ নেই — মায়ের কৃপায়, সাধনার উন্নতিতে অপ-সারিত হবে বলে এই শান্ত বিশ্বাস রেখে নিজেকে উপরের দিকে খুলতে হবে। যোগসিদ্ধি বা রূপান্তর একদিনে বা অল্পদিনে হয় না। ধীর শান্ত হয়ে পথে চলতে হয়।

17.3.34

*

ন: মাঝে মাঝে দেখছি আমার ভিতরের গভীর স্তর হতে খুব সুন্দর আলোকময়

পবিত্র শান্ত জিনিষ একটি ফুলের মত হয়ে তোমাকে আহ্বান করতে উপরের দিকে উঠে। কিছুদূর উঠলে দেখি উপর হতে নানা রকমের তোমার জিনিষ নেমে আসে আর এর সাথে মিলিত হয়।

উঃ যা উঠে তাহা তোমার psychic চেতনা — যে ঊর্দ্ধ চেতনার স্তরে উঠে, সেই সেই স্তরের শক্তি আলো শান্তি ইত্যাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে আধারে নামিয়ে আনে।

20.3.34

*

ফুল হবার অর্থ — তোমার psychic surrender হচ্ছে।

20.3.34

*

নঃ মা, এখন দেখছি যে মাথার চারিদিকে একটি শান্ত শক্তিমান এবং আলোকময় কি ঘুরছে, আর এই দেহ মন প্রাণ হতে কি সব যেন শুষ্ক এবং বাসি ফুলের মত ঝরে পড়ছে।

উঃ ইহা হচ্ছে ঊর্দ্ধ চেতনার অবতরণ ও আধারের উপর প্রভাব।

20.3.34

*

সাধনা হয় সময়ের প্রয়োজন অনুসারে। আগে ছিল ভিতরের সাধনার, সহজ ধ্যানের অবস্থা — এখন প্রয়োজন অন্তর বাহিরকে এক করা — দেহচেতনা পর্য্যন্ত।

21.3.34

*

নঃ তুমি লিখেছিলে, "...তবে কাজের সময় খুব বেশী গভীরে না যাওয়া ভাল"। মা, গভীরে গেলে কি খারাপ হয়? আমার যখন এইরূপ হয় তখন দেখি, আমার বাহিরের অংশ যা কাজ করতে হয় করছে...।

উঃ তাহা ভাল। গভীরে যাওয়া এই অর্থে লিখলাম, যেন গভীর tranceএ

মগ্ন হওয়া — কেহ যদি এসে হঠাৎ ভেঙ্গে দেয়, তাহলে ফল ভাল নাও হতে পারে।

21.3.34

*

এইসব অনুভূতি খুব ভাল। এই সকল জিনিস প্রথম শুধু আসে যায় আবার আসে, থাকে না, কিন্তু আস্তে আস্তে জোর পায়, আধারও অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার পরে বেশী স্থায়ী হয়।

22.3.34

*

বড় রাজ্য true physical (spiritual physical) হতে পারে আর বালক বালিকা সে রাজ্যের পুরুষ প্রকৃতি, বোধ হয়।

23.3.34

*

আর সব ঠিক কিন্তু Psychic সত্তা মন প্রাণ দেহের পিছনে থাকে আর এই তিনটীকেই স্পর্শ করে। মনের ওই ধারে অধ্যাত্ম সত্তা ও ঊর্দ্ধ্বচেতনা থাকে।

23.3.34

*

যা দেখেছ তা সত্যই — তবে যাকে খারাপ শক্তি বল, সে সাধারণ প্রকৃতি মাত্র। সেই প্রকৃতিই মানুষকে প্রায় সব করায় — সাধনায় তার প্রভাব অতিক্রম করতে হয় — তবে সহজে হয় না — দৃঢ় স্থির চেষ্টায় শেষে হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে।

26.3.34

*

নঃ মা, প্রাণের নিম্নে দেখলাম একটা সমতল ভূমি আছে। সেখানে একটি গাভী আছে। আর মনের নিম্নেও দেখলাম একখানা সমতল ভূমি আছে, তাতে দেখলাম একটি ময়ূর আছে।

উ: সমতল ভূমির অর্থ মনে প্রাণে চেতনার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা — ময়ূর সত্যের শক্তির জয়ের লক্ষণ। গাভী সত্যের আলোর প্রতীক।

28.3.34

*

সাধারণ মনের তিনটী স্তর আছে। চিন্তার স্তর বা বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তির স্তর (বুদ্ধিপ্রেরিত Will) আর বহির্গামী বুদ্ধি। উপরের মনেরও তিনটী স্তর আছে — Higher Mind, Illumined mind, Intuition। মাথার মধ্যে যখন দেখেছ, ওই সাধারণ মনের তিনটী স্তর হবে — উপরের দিকে খোলা, প্রত্যেকের মধ্যে একটী বিশেষ ভাগবতী শক্তি কাজ করতে নামছে।

30.3.34

*

প্রাণের ঊর্দ্ধ্বগামী অবস্থা ভগবানের দিকে, সত্যের দিকে। সত্যের (সোনার রঙের) ও Higher Mindএর (নীল আলোর) প্রভাব মূর্ত্ত হয়ে উঠে নেমে ঘুরছে সেই ঊর্দ্ধ্বগামী প্রাণচেতনায়।

30.3.34

*

যে চক্র দেখেছ, সে প্রাণের psychic হতে পারে — সমুদ্রটী vital consciousness, অগ্নিকুণ্ড প্রাণের aspiration, ঈগল পক্ষীগুলি প্রাণের ঊর্দ্ধ্বগামী প্রেরণা — মন্দির হচ্ছে psychic প্রভাবপূর্ণ প্রাণপ্রকৃতির মন্দির।

30.3.34

*

যখন সাধক খাঁটি চেতনার মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করে তখনও অন্য অংশগুলি থাকে, তবে খাঁটি চেতনার প্রভাব বাড়তে বাড়তে ওইগুলোকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে ফেলে।

2.4.34

*

Higher Mindএ বাস করা তত কঠিন নয় — চেতনা মাথার একটু উপরে যখন ওঠে তখন তাহা আরম্ভ হয় — কিন্তু Overmindএ উঠতে অনেক সময় লাগে, খুব বড় সাধক না হলে হয় না। এই সব স্তরে বাস করলে মনের বাঁধন ভেঙ্গে যায়, চেতনা বিশাল হয়ে যায়, ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান কমে যায়, সবই এক, সকলই ভগবানের মধ্যে, ইত্যাদি ভাগবত বা অধ্যাত্ম জ্ঞান সহজ হয়ে যায়।

2.4.34

*

শিশুটী তোমার psychic being, তোমার ভিতরে সত্যের জিনিষ বার করে আনছে — রাস্তাটী হচ্ছে Higher Mindএর রাস্তা যে সত্যের দিকে উঠছে।

6.4.34

*

ইহা সত্য নয় — অনেকের কুণ্ডলিনীর জাগরণের অনুভূতি হয় না, কয়েকজনের হয় — এই জাগরণের উদ্দেশ্য সকল স্তর খুলে দেওয়া আর ঊর্দ্ধচেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করা — কিন্তু এই উদ্দেশ্য অন্য উপায়েও হয়।

6.4.34

*

বড় স্তরটী অধ্যাত্ম চেতনা হবে, তার মধ্যে সত্যের মন্দির, তোমার vitalএর সঙ্গে এই স্তরের সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে, ঊর্দ্ধের শক্তি vitalএ উঠা-নামা কর্চ্ছে যেন সেতু দিয়ে।

6.4.34

*

মায়ের মধ্যে থেকেই একটী Emanation অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও চেতনার অংশ, প্রতিকৃতি ও প্রতিনিধি হয়ে প্রত্যেক সাধকের কাছে একজন বেরিয়ে আসেন বা থাকেন তাকে সাহায্য করবার জন্য — প্রকৃত পক্ষে মা-ই সেই রূপ ধরে আসেন।

9.4.34

*

ন: দেখছি যে তোমার জগৎ হতে দুই বালিকা আমার প্রিয় সাথীর মত বার বার নেমে আসছে। একটির রূপ নীল আলোকের ন্যায় আর একটির রূপ সূর্য্যের আলোকের ন্যায়। একটির পোষাক নীল, অপরটির হলদে।

উ: ঊর্দ্ধমনের শক্তি (নীল) — তার উপর যে মন বা Intuition — সম্ভবতঃ এই দুইটীরই শক্তি।

9.4.34

*

বেদযজ্ঞে পাঁচটী অগ্নি থাকে, পাঁচটী না থাকলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। আমরা বলতে পারি psychicএ, মনে, প্রাণে, দেহে ও অবচেতনায়, এই পাঁচটী অগ্নির দরকার।

9.4.34

*

নীল — Higher Mind,
সূর্য্যের আলো — Light of divine Truth,
উজ্জ্বল লাল — হয় Divine Love নয় ঊর্দ্ধচেতনার Force.

11.4.34

*

ন: আমার সব সময় নীরব গম্ভীর এবং নির্জ্জনতায় থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। বাইরের দিকে গেলে এবং একটু বাজে কথা বললে চঞ্চল হয়ে যাই।

উ: Inner beingএ যা হচ্ছে, তারই ফল এই নীরবতার দিকে ভিতরের টান।

11.4.34

*

এই সকল হচ্ছে symbols যেমন পদ্ম ফুল চেতনার প্রতীক, সূর্য্য জ্ঞানের বা সত্যের, চন্দ্র অধ্যাত্ম জ্যোতির, তারা সৃষ্টির, অগ্নি তপস্যার বা aspirationএর, —

সোনার গোলাপ = সত্যচেতনাময় প্রেম ও সমর্পণ।

সাদা পদ্ম = মায়ের চেতনা (Divine Consciousness)।

গাভী চেতনা ও আলোকের প্রতীক। সাদা গাভীর অর্থ উপরের শুদ্ধ চেতনা।

11.4.34

*

তুমি বলেছিলে ধ্যানে লেখা দেখেছিলে — তার উত্তরে আমি বলেছি যে যেমন ধ্যানে নানা রকম দৃশ্য দেখা যায়, সেইরকম ধ্যানে নানা রকম লেখাও দেখা যায়। এই সব লেখাকে আমরা লিপি বা আকাশলিপি নাম দি। এই লেখাগুলো বদ্ধ চোখেও দেখা যায়, খোলা চোখেও দেখা যায়।

13.4.34

*

ন: দেখলাম আমার গলার নিম্নে একটি পুকুর, বুকের নিম্নে একটি পুকুর, আর নাভির উপরে একটি পুকুর আছে। এই তিনটি পুকুরে জল নেই, সব শুকিয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ পরে দেখি খুব ঊর্দ্ধে একটি পর্বত আছে। সে পর্বত হতে পবিত্র জল এসে পুকুরগুলিতে পতিত হচ্ছে। আর মা, দেখলাম, এই জলের মধ্যে কমল ফুটতে আরম্ভ করছে।

উ: সাধারণ মন হৃদয় প্রাণই এই তিনটী শুষ্ক পুকুর — তার মধ্যে ঊর্দ্ধচৈতন্যের প্রবাহ নেমেছে — আর মন হৃদয় প্রাণ ফুলের মত ফুটে যাচ্ছে।

16.4.34

*

লাল গোলাপী ভাগবত প্রেমের আলো, সাদা ত ভাগবত চৈতন্যের আলো।

16.4.34

*

ন: কি করে আমার outer beingকে পরিবর্তন করব এবং তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করব? আমার সমস্ত চিন্তা, খাওয়া, পড়া, কথা বলা, কাজ, ঘুমানো সব যেন তোমার হয়। আমার প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস যেন তোমার দিক থেকে আসছে এইরূপ অনুভব আমার হয়।

উ: বাহিরের এইরূপ পূর্ণ অবস্থা পরে আসে — এখন জাগ্রত চেতনায় সত্য অনুভূতিকে বাড়তে দাও, তার ফলে ওসব হবে।

16.4.34

*

গাছটী ভিতরের spiritual life, তার উপর বসেছে সত্যের বিজয়স্বরূপ স্বর্ণ ময়ূর, প্রত্যেক ভাগে — চন্দ্র = অধ্যাত্ম শক্তির আলো।

18.4.34

*

['ন'-র মনে হয়েছে এতদিন সে মিথ্যাই সাধনা করেছে। সবই ব্যর্থ হয়েছে। চেতনার অগ্রগতি কিছুই হয়নি।]

উ: যা হয়ে ছিল, সে মিথ্যা বা ব্যর্থ নয় — তবে যেমন চেতনা খুলে খুলে যায়, দেখবার ও সাধনা কর্ব্বার ধরণও বদলে যায়। যা অজ্ঞানের, অহংকারের, প্রাণের বাসনার মিশ্রণ সাধনায় ছিল, তাহা খসে যেতে আরম্ভ করে।

20.4.34

*

অভিজ্ঞতাগুলি ভাল — এই অগ্নি psychic fire — আর যে অবস্থার বর্ণনা করেছ সে অবস্থা psychic condition, যার মধ্যে অশুদ্ধ কিছু আসতে পারে না।

23.4.34

*

এই চিন্তা ও এই স্বপ্ন বোধ হয় ''ম''র মন থেকে এসে অলক্ষিতে তোমার অবচেতনায় পশে প্রকাশ পেয়েছে। এই রকম পরের চিন্তার আক্রমণ থেকে সব সময়, অবচেতন মন প্রাণকে রক্ষা করা কঠিন। ইহা আমার কিছু নয় জেনে প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

26.4.34

*

নঃ মা, আমি আজ দেখতে পাচ্ছি যে আমার মধ্যে অহংকার, আত্মগরিমা, বাসনা, কামনা, মিথ্যা কল্পনা, হিংসা, বিরক্তি, উত্তেজনা, দাবী, আসক্তি, চঞ্চলতা, জড়তা, আলস্য ইত্যাদি অজস্র দোষে ভরা। আমার কোন কিছুই তোমার দিকে খোলেনি, শুধু ক্ষুদ্র হৃদয়খানা একটু খুলেছে এবং psychic being তোমাকে চাইছে।

উঃ এ সব দোষ অবশ্যই বের করতে হবে — কিন্তু হৃদয় যখন খুলেছে, psychic being যখন conscious হচ্ছে, তখন আর সব খুলবেই, দোষ বাধা আস্তে আস্তে খসে যাবে।

26.4.34

[রেখাঙ্কিত অংশটুকুর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা সম্ভবত 'ন' চেয়েছিলেন।]

অর্থ — মানুষের মধ্যে এই সকল দুর্ব্বলতা আছে, সেগুলোর সম্বন্ধে (নিজের দৃষ্টি থেকে লুকোতে না দিয়ে) সচেতন হতে হয় — তবে psychic being যখন সচেতন হয়েছে, তখন ভয় নেই, এই সব সেরে যাবে।

*

Psychic being যখন conscious হয় সাধকের মধ্যে, তখন মানুষের স্বভাবে যে সব দোষ দুর্ব্বলতা, সব দেখিয়ে দেয় — নিরাশার ভাবে নয়, সমর্পণ ও রূপান্তর করবার জন্য।

27.4.34

*

নঃ আজ প্রায় সময় অনুভব করেছি যে পদ্মফুলের মত কি একটা আমার ভিতর খুলে যাচ্ছে, আর উপর হতে নীল সাদা আলো ও শান্তি নামছে। যখন তোমার কথা চিন্তা করছি তখন দেখছি যে জ্যোতির্ম্ময়ী ও চাঁদের আলোর মত একখানা সরু কি তোমার জগতের দিকে উঠে গিয়েছে।

উঃ যা খুলছে তা psychic আর heartএর consciousness — উপর হতে আসছে higher mindএর ও ভাগবত চেতনার আলো ও শান্তি। যা চাঁদের মত উঠছে, তা psychic থেকে আধ্যাত্মিক aspirationএর স্রোত।

27.4.34

*

আক্রমণ যদি হয়, কান্না না করে মাকে ডাক — মাকে ডাকলে শক্তি আসবে, আক্রমণ সরে যাবে।

4.5.34

*

কতকটা তাই, তবে বাধা কাউকে সহজে ছাড়ে না, খুব বড় যোগীকেও নয়। মনের বাধা অপেক্ষাকৃত সহজে ছাড়ান যায়, কিন্তু প্রাণের বাধা, শরীরের বাধা তত সহজে যায় না, সময় লাগে।

18.5.34

*

সাপ হচ্ছে energy (শক্তি)র প্রতীক। ঊর্দ্ধের একটী energy মাথার উপরে higher consciousnessএ দাঁড়িয়ে আছে।

30.5.34

*

ন: দেখলাম যে আমি আমার এই দেহে নাই। একটি আনন্দিত মুক্ত ছোট বালিকার মত হয়ে তোমাদের শ্রীচরণে আছি।

উ: তোমার inner beingএর রূপ।

30.5.34

*

অবশ্য এই সব আলোচনা না করা শ্রেয়স্কর — মানুষের স্বভাব পরের সম্বন্ধে এই রকম আলোচনা [করে] — অনেক ভাল সাধকও এই অভ্যাস ছেড়ে দিতে চায় না বা পারে না। কিন্তু এতে সাধনার ক্ষতি ভিন্ন উপকার হয় না।

1.6.34

*

হ্যাঁ — কিন্তু ভিতরে ভোগ বাসনা ইত্যাদি ত্যাগ করতে হয় — বাহিরের সব শূন্য করা দরকার নাই — মা যা দেন তা নিয়ে আসক্তিশূন্য হয়ে থাকা ভাল।

8.6.34

*

সময়ে সব বাধা চলে যাবে — উৰ্দ্ধের চেতনা যেমন বাহিরের মন প্রাণে শরীরে বেড়ে যায়, বাধার বেগও কমে যায়, শেষে অদৃশ্য হয়ে যাবে, অরূপেও থাকবে না।

9.6.34

*

চেতনা বাহিরে যায়, সব সময় ভিতরের অবস্থা রাখতে পার না, এ কিছু গুরুতর কথা নয় — সকলের হয়, যতদিন ভিতরের সম্পূর্ণ রূপান্তর না হয়। তাতে সপ্রমাণ হয় না যে অভিজ্ঞতা অনুভূতি মিথ্যা।

9.6.34

*

শান্তভাবে বসে মাকে স্মরণ করে মায়ের কাছে নিজেকে খুলে রাখ — ধ্যানের নিয়ম এই।

19.6.34

*

ইহা ত সকলেরই হয় — ভাল অবস্থায় সৰ্ব্বদা থাকা বড় কঠিন, অনেক সময় লাগে — স্থির হয়ে সাধনা করো, বিচলিত হয়ো না। সময়ে হয়ে যাবে।

25.6.34

*

জাগ্রত অবস্থাতেই সব নামান, সব ভাগবত অনুভূতি পাওয়া এ যোগের নিয়ম। অবশ্য প্রথম অবস্থায় ধ্যানেই বেশী হয় আর শেষ পর্য্যন্ত উপকারী হতে পারে — কিন্তু শুধু ধ্যানে অনুভূতি হলে সমস্ত সত্তার রূপান্তর হয় না। জাগ্রতে হওয়া সেজন্য খুব ভাল লক্ষণ।

25.6.34

*

পদ্মের ও সূর্য্যের অর্থ ত জান। বিছানার মধ্যে দেখলে তার বিশেষ কোন

অর্থ নয়, অর্থ এই যে physical পর্য্যন্ত এ সব নামছে।

25.6.34

*

ন: আজ দেখলাম তোমার কোলের উপর মাথা রেখে যেন ধ্যান করছি। আর তোমার দেহ হতে অগ্নির মত আলো বার হয়ে আমার সমস্ত মলিনতা দূর করে দিচ্ছে, আর শান্ত ও খুব উজ্জ্বল এক রূপ বার হয়ে আমাকে শান্ত আলোকিত করছে।

উ: এই হচ্ছে psychicএর সত্য অনুভূতি, খুব ভাল লক্ষণ। ইহাই চাই।

25.6.34

*

...বাজে চিন্তা কে না করে — সব সময় মাকেই স্মরণ করে, কেহই পারে না physical mind relax করে। ঊর্দ্ধ চৈতন্য সম্পূর্ণ নামলে, তার পর হয়।

26.6.34

*

স্বর্ণ = সত্য জ্ঞানময় চেতনা — রূপা = অধ্যাত্ম চেতনা।

27.6.34

*

['ন'এর পত্রের "সাদা আলো" এবং "অগ্নির মত আলো" কথা দুটির কাছে শ্রীঅরবিন্দ যথাক্রমে "ভাগবত চৈতন্যের আলো" এবং "aspiration ও তপস্যার আলো" লেখেন।]

*

সোনার দড়ি — সত্য চেতনার সম্বন্ধ মায়ের সঙ্গে; সোনার গোলাপ — সত্য চেতনাময় প্রেম ও সমর্পণ; সাদা পদ্ম — মায়ের চেতনা (divine consciousness) higher mindএ ও psychicএ খুলছে। চক্রটির অর্থ = মায়ের শক্তির কাজ চলছে নিম্নের স্তরে।

28.6.34

*

হীরার আলো ত মায়েরই আলো at its strongest — এইরূপ মায়ের শরীর হতে বেরিয়ে সাধকের উপরে পড়া খুব স্বাভাবিক, সাধক যদি ভাল অবস্থায় থাকে।

29.6.34

*

কোন সাধকের সম্বন্ধে আলোচনা করা ভাল নয়। তাতে কারো উপকার হয় না, বরং অনিষ্ট হয়। এই আশ্রমে সকলে করে, কিন্তু এতে atmosphere troubled হয়ে থাকে, সাধনার ক্ষতিও হয়। তার চেয়ে মাকে চিন্তা করা, যোগের বা অন্য ভাল কথা বলা ঢের ভাল।

29.6.34

*

বড় বড় সাধককেও বাধা আক্রমণ করতে পারে, তাতে কি? Psychic অবস্থা থাকলে, মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, এই সব আক্রমণের চেষ্টা বৃথা হয়ে যায়।

29.6.34

*

নীল ত Higher Mindএর বর্ণ — নীল পদ্ম = সেই ঊর্দ্ধমনের উন্মীলন তোমার চেতনায়।

30.6.34

*

হয় ত শরীরে ধ্যানের কিছু বাধা আছে, যাতে বসা চায় না। তবে ইহাও অনেকের সাধনায় ঘটে যে সাধনা আপনা আপনি চলে, জোর করে বসে ধ্যান করা আর হয় না, কিন্তু অমনি বসতে হাঁটতে শুয়ে থাকতে ঘুমোতেও পর্য্যন্ত সাধনা নামে।

2.7.34

*

নঃ মা, দেখলাম যে আধারের মধ্যে একটি খুব বড় বৃক্ষ, যে ঊর্দ্ধের দিকে বড় হচ্ছে...।

উঃ বৃক্ষটী তোমার আধ্যাত্মিক জীবন যে তোমার মধ্যে বাড়তে আরম্ভ করেছে।

6.7.34

*

হ্যাঁ, মাকেই চাইতে হয় কোন বাসনা দাবী ইত্যাদি পোষণ না করে। ও সব এলে সায় না দিয়ে ফেলে দিতে হয়। তার পরেও প্রকৃতির পুরাতন অভ্যাসের দরুণ ওগুলো আসতে পারে, কিন্তু শেষে অভ্যাসটী ক্ষয় হয়ে যাবে, আর আসবে না।

6.7.34

*

Sex-force মানব মাত্রেরই আছে, সে impulse প্রকৃতির একটা প্রধান যন্ত্র যার দ্বারা সে মানুষকে চালায়, সংসার সমাজ পরিবার সৃষ্টি করে, প্রাণীর জীবন অনেকটা তার উপর নির্ভর করে। সে জন্যে সকলের মধ্যে sex impulse আছে, কেউ বাদ যায় না — সাধনা করলেও এই sex impulse ছাড়তে চায় না, সহজে ছাড়ে না, সে প্রাণ শরীরে প্রকৃতি রূপান্তরিত হওয়া পর্য্যন্ত ফিরে ফিরে আসে। তবে সাধক সাবধান হয়ে তাকে সংযম করে, প্রত্যাখ্যান করে, যত বার আসে ততবার তাড়িয়ে দেয় — এই করে করে শেষে লুপ্ত হয়ে যায়।

10.7.34

*

আমার কথা — যা অনেকবার বলেছি — তা ভুলে যেয়ো না। উতলা না হয়ে স্থির শান্ত ভাবে সাধনা কর, তাহলেই সব আস্তে আস্তে ঠিক পথে আসবে। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ভাল নয় — শান্তভাবে মাকে ডাক, তাঁর কাছে সমর্পণ কর। প্রাণ যতই শান্ত হয়, তত সাধনা steadily এক পথে চলে।

17.8.34

*

শান্ত ও সচেতন থাক, মাকে ডাক, ভাল অবস্থা ফিরে আসবে। সমর্পণ সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে — যেখানে দেখছ হয়নি, সেখানটাও সমর্পণ কর — এইরূপ করতে করতে শেষে সম্পূর্ণ হবে।

27.8.34

*

It is good.

হৃদয় যদি মায়ের দিকে খোলা থাকে আর সব শীঘ্র খুলে যায়।

29.8.34

*

হ্যাঁ ভিতরেই সব আছে ও নষ্ট হবার নয় — সে জন্য বাহিরের বাধাবিপত্তিতে বিচলিত না হয়ে ওই ভিতরের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় আর তার ফলে বাহিরও রূপান্তরিত হবে।

4.10.34

*

যখন খুব গভীর অবস্থা হয়, তখন উঠলে বা হাঁটলে সেরূপ মাথা ঘোরা হয় — শরীরের দুর্ব্বলতার দরুণ নয়, চেতনা ভিতরে গেছে, শরীরে আর সম্পূর্ণ চেতনা নাই বলে। এইরূপ অবস্থায় চুপ করে বসে থাকা ভাল — শরীরে যখন চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে আসে, তখন উঠতে পার।

24.10.34

*

এটা খুব বড় opening — সূর্য্যের জ্যোতি যে নামছে সে সত্যের জ্যোতি — সে সত্য ঊর্দ্ধ্ব মনেরও অনেক উপরে।

24.10.34

*

মূলাধার physicalএর inner centre — পুকুরটী চেতনার একটী opening বা formation, সে চেতনার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের presence = লাল পদ্ম আর inner physicalএ প্রেমের গোলাপী আলো নামছে।

24.10.34

*

কল্পনা নয়। মায়ের অনেক personality আছে, সেগুলো প্রত্যেকের different রূপ, সে সব সময়ে সময়ে মায়ের শরীরে ব্যক্ত হয়। সাড়ীর রং যেমন, মা সে রঙের আলো বা শক্তি নিয়ে আসেন। কারণ প্রত্যেক রং এক এক শক্তির (forceএর) দ্যোতক।

26.10.34

*

নঃ মা, মূলাধারের লাল পদ্ম দেখি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তাতে তোমার আলোও নামতে আরম্ভ করেছে বলে মনে হয়।

উঃ That is very good. ওখানেই শরীর প্রকৃতির রূপান্তর আরম্ভ হয়।

26.10.34

*

বাধা ত বিশেষ কিছু নয়, মানুষের বহিঃপ্রকৃতিতে যা থাকে তাই — সেগুলো মায়ের শক্তির working দ্বারা ক্রমে ক্রমে দূরীকৃত হবে। তার জন্য চিন্তিত বা দুঃখিত হবার কোন কারণ নাই।

12.11.34

*

হ্যাঁ, যা বলছ তা সত্যই। বহিশ্চেতনা অজ্ঞানময়, যা আসে উপর থেকে তার যেন একটা ভুল transcription, যেন ভুল নকল বা ভুল অনুবাদ করতে চায়, নিজের মত গড়তে চায়, নিজের কল্পিত ভোগ বা বাহ্যিক সার্থকতা বা অহংভাবের তৃপ্তির দিকে ফিরাতে চেষ্টা করে। এই হচ্ছে মানবস্বভাবের দুর্ব্বলতা। ভগবানকে ভগবানের জন্যই চাইতে হয়, নিজের চরিতার্থতার জন্য নয়। যখন

psychic being ভিতরে সবল হয়, তখন এই সব বহিঃপ্রকৃতির দোষ কমে যেতে যেতে শেষে নির্ম্মল হয়ে যায়।

(1934)

*

অজ্ঞান অহংকার ও বাসনাই হচ্ছে বাধা — মনপ্রাণদেহ যদি ঊর্দ্ধ্বচৈতন্যের আধার হয়, তা হলে এই ভাগবত জ্যোতি শরীরে নামতে পারবে।

8.1.35

*

উপরের এই জগৎ হচ্ছে ঊর্দ্ধ্বচৈতন্যের ভূমি (plane), আমাদের যোগসাধনা দ্বারা নামিতেছে। পার্থিব জগৎ আজকাল বিরোধী প্রাণজগতের তাণ্ডব নৃত্যে পূর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ।

8.1.35

*

নিম্নের প্রাণ ও মূলাধারই Sex Impulseএর স্থান। গলার নীচে রয়েছে vital mindএর স্থান। অর্থাৎ যখন নিম্নে sex impulse হয়, তখন vital mindএ তারই (sex impulseএর) চিন্তা বা কোনও mental রূপ সৃষ্টি হবার চেষ্টা হয়, তাতে মনের গোলমাল হয়ে যায়।

15.1.35

*

বোধ হয় বাহিরের স্পর্শ পেয়ে এই সব হয়েছে। এখন এই সব প্রাণের গোলমাল কয়েকজনের মধ্যে বার বার হচ্ছে। এক জন থেকে গিয়ে আর এক জনের মধ্যে যাচ্ছে একটা রোগের মত। বিশেষ এই ভাব যে আমি মরব, আমি এই শরীর রাখব না, এই শরীরে আমার যোগসাধনা হবে না, এটাই প্রবল। অথচ, এই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ হতে বিনা বাধায় যোগসিদ্ধ হব, এই ধারণা অত্যন্ত মিথ্যা। এই ভাবে দেহ ত্যাগ করলে পর জন্মে বরং আরও বাধা হবে আর মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবেই না। এই সব হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ,

তার উদ্দেশ্য সাধকদের সাধনা ভেঙে দিতে, মায়ের শরীরকে ভেঙে দিতে, আশ্রমকে আর আমাদের কাজকে ভেঙে দিতে। তুমি সাবধান হয়ে থাক, এই সব তোমার মধ্যে ঢুকতে দিয়ো না।

বাহিরের লোক আমাকে শাসন কর্চ্ছে, আমার খুব লেগেছে, আমি মরে যাব, এ হচ্ছে প্রাণের অহংকারের কথা, সাধকের কথা নয়। আমি তোমাকে সতর্ক করেছি, অহংকারকে স্থান দিয়ো না। কেহ যদি কোন কথা বলে, অবিচলিত হয়ে শান্তসম নিরহংকার ভাবে থাক, মায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়ে।

27.1.35

*

সূর্য্যের অনেক রূপ আছে, অনেক বর্ণের আলোর সূর্য্য। যেমন লাল, তেমনই হিরণ্ময়, নীল, সবুজ ইত্যাদি।

29.1.35

*

এইরূপ মায়ের মধ্যে মিশে যাওয়াই প্রকৃত মুক্তির লক্ষণ।

31.1.35

*

এইরূপ শরীরে মায়ের আলো ভরে গেলে, physical চেতনার রূপান্তর সম্ভব হয়।

31.1.35

*

It is very good. নিদ্রার সময়ে চেতনা স্তরের পরে স্তরে যায়। জগতের পর জগতে — যেমন জগৎ, তেমন স্বপ্ন দেখে। খারাপ স্বপ্ন প্রাণের জগতের কয়েকটী প্রদেশের দৃশ্য ও ঘটনা মাত্র — আর কিছু নয়।

2.2.35

*

নঃ মা, আজ দুই দিন যাবৎ প্রণাম হতে আসবার পর যেন অন্য রকম অবস্থা হয়, কিছুতেই ভাল লাগে না। কোথায় যাব, কোথায় গেলে মাকে ভগবানকে পাব, শান্তি আনন্দ পাব ও কখন নিজেকে মাকে দেওয়া হবে এইরূপ ভাব হয়।

উঃ এই অবস্থাকে ঢুকতে দেবে না — এই অবস্থাই অনেকজনের মধ্যে ঢুকে তাদের সাধনার বিষম ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে — তাতে মায়ের উপর অসন্তোষ, অস্থির চঞ্চলতা, চলে যাবার ইচ্ছা, মরবার ইচ্ছা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি ঢোকে। যে এক তামসিক শক্তি আশ্রমে ঘুরছে কাকে ধরব খুঁজে, সেই শক্তি এই সব অজ্ঞানের ভাব ঢুকিয়ে দেয়, ওসব feelingএর মাথামুণ্ড নেই — মাকে ছেড়ে কোথায় গিয়ে মাকে পাবে, শান্তি আনন্দ পাবে। এক মুহূর্ত্তকাল এই সবকে স্থান দিয়ো না।

22.4.35

*

সাপ হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি — মূলাধার (physical centre) তার একটী প্রধান স্থান — সেখানে কুণ্ডলিত অবস্থায় সুপ্ত হয়ে থাকে। যখন সাধনা দ্বারা জাগ্রত হয়, তখন উপরের দিকে ওঠে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। মায়ের শক্তির অবতরণে সে এর মধ্যে স্বর্ণময় হয়েছে, অর্থাৎ ভাগবত সত্যের আলোয় ভরা।

25.4.35

*

না এ কল্পনা বা মিথ্যা নয় — উপরের মন্দির ঊর্দ্ধ চেতনার, নীচের মন্দির এই মন প্রাণ শরীরের রূপান্তরিত চেতনা — মা নীচে নেমে এই মন্দির সৃষ্টি করেছেন আর সেখান থেকে সত্যের প্রভাব সর্ব্বত্র তোমার মধ্যে বিস্তার কর্চ্ছেন।

26.4.35

*

নঃ মা, আমি তোমার পায়ের কাছে কিছু দেখি না ও অনুভব করি না কেন, সব তোমার কোল হতে আর বুক হতে অনুভব করি কেন?

উঃ তা প্রায় সকলেরই হয় — বুক থেকেই মায়ের সৃষ্টি শক্তি বাহিরে এসে

সকলের মধ্যে নিজের কাজ করে। আর সব স্থান হতেও করে, কিন্তু বুকেই কেন্দ্রীকৃত।

26.4.35

*

সাধনা ত মাকে feel করা কাছে ও ভিতরে, মা সব কচ্ছেন বলে অনুভব করা, মায়ের সব জিনিস ভিতরে receive করা। এই অবস্থা থাকলে পড়াতে মন দিলে কোন ক্ষতি হতে পারে না।

29.4.35

*

মা তোমাকে চান আর তুমি মাকে চাও। মাকে তুমি পাচ্ছ এবং আরও পাবে। তবে হয়ত তোমার physical consciousnessএ একটা আকাঙ্ক্ষা আসতে পারে মাঝে মাঝে যে মায়ের বাহিরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শারীরিক সান্নিধ্য ইত্যাদি থাকা চাই। মা ওসব দিচ্ছেন না কেন, মা হয়ত আমাকে চান না। কিন্তু জীবনের ও সাধনার এই অবস্থায় তাহা হতে পারে না। এমন কি মা তাহা দিলে সাধক তাতে মজবে আর ভিতরের আসল সাধনা ও রূপান্তর হবে না। চাই মার সঙ্গে ভিতরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সান্নিধ্য এবং চাই রূপান্তর — বাহিরের মন প্রাণ দেহ পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি করবে ও রূপান্তর হবে। ইহাই মনে রেখে চল।

17.5.35

*

নঃ মাঝে মাঝে মনে হয় যে সমস্ত সত্তা খুলে কাঁদলে অনেক পরিবর্ত্তন হবে। মা, আমার কি তোমার জন্য এখন কাঁদার দরকার?

উঃ কান্না যদি psychic beingএর হয়, খাঁটি চাওয়ার বা খাঁটি psychic ভাবের কান্না, তা হলে সেই ফল হতে পারে। Vital দুঃখের বা বাসনার বা নিরাশার কান্নায় লোকসানই হয়।

17.5.35

*

আমি এ কথা ত অনেকবার লিখেছি মানুষের বাহির চেতনার পূর্ণ রূপান্তর করা অল্প সময়ে হয় না। ভাগবত শক্তি সেটাকে আস্তে আস্তে বদলিয়ে দেয় — যাতে শেষে কোন ফাঁক থাকে না, কোন ক্ষুদ্রতম অংশেও নিম্ন প্রকৃতির কোন পুরাতন গতি না থাকে। সেজন্যে অধৈর্য্য বা haste করতে নাই। শুধু সবকে যেন সমর্পিত হয়, মায়ের কাছে open হয়, তাহাই দেখতে হয়। আর সব আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

1.6.35

*

নঃ ...সব সময় একই অবস্থা — শান্ত নীরব ও আনন্দিত — কাজে কর্মে চলায় ফেরায় বাহিরে অন্তরে।

উঃ ইহা খুব ভাল — পূর্ণ সমতা ও আসল জ্ঞানের অবস্থা — যখন ইহা স্থায়ী হয়, তখন সাধনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

7.6.35

*

মূলাধারের স্বর্ণ সর্প — রূপান্তরিত সত্যময় শরীরচেতনার প্রতীক।

13.6.35

*

তুমি যদি ভিতরে শান্ত ও সমর্পিত হয়ে থাক, তাহলে বাধাবিঘ্ন ইত্যাদি তোমাকে বিচলিত করবে না। অশান্তি চঞ্চলতা আর "কেন হচ্ছে না, কবে হবে" এই ভাব ঢুকতে দিলে বাধাবিঘ্ন জোর পায়। তুমি বাধাবিঘ্নের দিকে অত নজর দাও কেন? মায়ের দিকে চাও। নিজের ভিতরে শান্ত সমর্পিত হয়ে থাক। নিম্নপ্রকৃতির ছোট ছোট defect সহজে যায় না। তা নিয়ে বিচলিত হওয়া বৃথা। মার শক্তি যখন সমস্ত সত্তা অবচেতনা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দখল করবে তখন হবে — তাতে যদি অনেকদিন লাগে তা হলেও ক্ষতি নাই। সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য অনেক সময়ের দরকার।

19.6.35

*

উপর খুব বড় একটী যে আছে, সে ঊর্দ্ধ্বচেতনার অসীম বিশালতা। তুমি যে অনুভব কর্চ্ছ যে মাথা যে ঘুরে ঘুরে নেমে আসে সে ত স্থূল মাথা অবশ্য নয় কিন্তু মনবুদ্ধি। সে ওই বিশালতার মধ্যে উঠে সেইভাবে নামে।

22.6.35

*

কতদূর এসেছি, আর কতদূর এই সব প্রশ্নেতে বিশেষ কোনও লাভ নাই। মাকে কাণ্ডারী করে স্রোতে এগিয়ে চল, তিনি তোমাকে গন্তব্য স্থানে পহুঁছিয়ে দিবেন।

25.6.35

*

মাথার উপরে একটী পদ্ম আছে, সে হচ্ছে ওই ঊর্দ্ধ্বচেতনার কেন্দ্র, সে পদ্মই হয়ত ফুটতে চায়।

24.8.35

*

মাথার উপরেই আছে ঊর্দ্ধ্বচেতনার স্থান, ঠিক মাথার উপরে সে আরম্ভ হয় আর সেখান থেকে ওঠে আরও উপরে অনন্তে। সেখানে যে বিশাল শান্তি ও নীরবতা আছে তারই pressure তুমি অনুভব কর। সে শান্তি ও চেতনা সমস্ত আধারে নাবতে চায়।

24.8.35

*

যখন চেতনা বিশাল ও বিশ্বময় হয় আর সমস্ত বিশ্বেই মাকে দেখা যায় তখন অহং আর থাকে না, থাকে শুধু মায়ের কোলে তোমার আসল সত্তা, মায়ের সন্তান মায়ের অংশ।

24.8.35

*

দুঃখ কেন পাচ্ছ? মায়ের উপর নির্ভর করে সমতা রাখলে দুঃখ পাবার কথা নাই। মানুষের কাছে সুখ ও শান্তি ও আনন্দ পাবার আশা বৃথা।

8.9.35

*

তুমিই আমার কথা বুঝতে পার নি। আমি একথা বলি নি যে তোমার অসুখ নাই, আমি বলেছি যে সে অসুখ nervous স্নায়ুজাত। এক রকম বদহজম আছে যাকে ডাক্তারেরা বলে nervous dyspepsia স্নায়ুজাত অজীর্ণ। যে সব sensation তুমি অনুভব করেছ, গলায় ছাতিতে খাওয়া ওঠা আটকান ইত্যাদি সে সব ওই রোগের লক্ষণ, nervous sensation। এ রোগকে সারান অনেকটা মনের উপর নির্ভর করে। মন যদি রোগের suggestionএ খায় দায়, তাহলে অনেকদিন টিকতে পারে। মন যদি সে সব suggestionকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সারান সহজ হয়, বিশেষ যখন মায়ের শক্তি আছে। আমি তাই বলেছিলাম বমির ভাবকে accept করো না, মাকে ডাক। অসুখটী সেরে যাবে।

আমি বারবার একটী কথা তোমাকে লিখেছি, সে কথাটী ভুলে যাও কেন? শান্ত ভাবে দৃঢ় ভাবে মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে পথে এগুতে হবে। অধৈর্য্য, চঞ্চলতাকে স্থান দেবে [না], সময় লাগলে বাধা এলেও বিচলিত অধীর বা উদ্বিগ্ন না হয়ে চলতে হবে। অধীর হলে, অস্থির উদ্বিগ্ন হলে বাধা বেড়ে যায়, আরো বিলম্ব হয়। এ কথাটী সর্ব্বদা মনে রেখে সাধনা কর।

একেবারে না খেয়ে থাকতে নাই — তাতে দুর্ব্বলতা বাড়ে, দুর্ব্বলতা বাড়লে অসুখ টিকবার কথা। নিদান দুধ ত খেতেই হয় আর যদি পার ত সাধারণ খাওয়ায় আবার পেটকে অভ্যস্ত করতে হয়। মা বলেছে yellow কলা দিতে, lithineও খাওয়া ভাল।

এ রোগে যকৃতের disturbances হতে পারে। খেলেই একটু পরে বমির ভাব হওয়া। এটা nervous dyspepsiaর লক্ষণ।

10.9.35

*

উভয় রকম করা শ্রেষ্ঠ। যদি দূরে থেকে শুধু সাধনা করা সম্ভব হত, তা হলে তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হত, কিন্তু তা সব সময় করা যায় না। কিন্তু আসল কথা

এই যে psychicএর মধ্যে তোমার দৃঢ় স্থান বা নিরাপদ দুর্গ করে সাধনা করতে হয় — অর্থাৎ স্থির ধীরভাবে মায়ের উপর নির্ভর করা, অধীর না হয়ে প্রসন্ন চিত্তে চলা। তুমি যা বলছ, তা সত্য — এই ছোট ছোট অসম্পূর্ণতা ইত্যাদিই এখন আসল অন্তরায় বড় বাধার চেয়ে। কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে বার করতে হয়, অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করতে হয়, হঠাৎ করা যায় না। অতএব সেগুলো দেখে দুঃখিত বা অধীর হতে নাই, মায়ের শক্তিই আস্তে আস্তে সে কাজ করে ফেলবে।

12.9.35

*

যেমন এই সাধনায় চঞ্চলতা দূর করতে হয়, দুঃখকেও স্থান দিতে নাই। মায়ের উপর নির্ভর করে স্থির চিত্তে শান্ত প্রসন্ন মনে এগুতে হয়। যদি মায়ের উপর নির্ভর থাকে, তাহলে দুঃখের স্থান কোথায়। মা দূরে নন, সর্ব্বদা কাছেই থাকেন, সে জ্ঞান সে বিশ্বাস সব সময় রাখতে হয়।

17.9.35

*

তাতে ব্যস্ত হয়ো না। সব সময়ে চেষ্টা করে মনে রাখা সহজ নয় — যখন মায়ের presenceএ সমস্ত আধারে ভরে যাবে, তখন সেই স্মরণ আপনিই থাকবে, ভুলে যাবার যো থাকবে না।

23.9.35

*

যা feel করছ তাহা সত্যই — ইহাই মানুষের বাধা দুঃখ ও অবনতির কারণ। মানুষ নিজেই নিজের অশুভ সৃষ্টি করে, সায় দেয়, আঁকড়ে ধরে।

26.9.35

*

যদি গভীর হৃদয়ের (psychicএর) পথ ধর, মার কোলে শিশুর মত থাক, তা হলে এই সব sex impulse ইত্যাদি আক্রমণ করেও কিছু করতে পারবে

না, শেষে আর আসতেও পারবে না।

30.9.35

*

যদি মায়ের উপর শুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি থাকে, নির্ভর থাকে, তা হলে মাকে পাওয়া যায়, না থাকলে তীব্র চেষ্টা দ্বারাও পাওয়া যায় না।

2.10.35

*

এ সব হচ্ছে বাহিরের প্রকৃতি যা সাধকের চারিদিকে ঘোরে প্রবেশ করবার জন্য। নিজের মন প্রাণ দেহ এই বাহিরের প্রকৃতির কবলে থাকলে সেইরূপ পর্দ্দা হয় বটে, কিন্তু মায়ের উপর নির্ভর করলে, মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, মায়ের শক্তি সে পর্দ্দা সরিয়ে মন প্রাণ দেহ চেতনাকে মায়ের যন্ত্রে পরিণত করবে।

2.10.35

*

শরীরে মায়ের শক্তি ডেকে এ সব ব্যথা ও অসুখবোধ তাড়াতে হবে।

9.10.35

*

Yes, this is the true psychic attitude. যে এই ভাবটী রাখতে পারে সব সময়ে, সব ঘটনার মধ্যে, সে গন্তব্য পথে সোজা চলে যায়।

11.10.35

*

মানুষের মনই অবিশ্বাস কল্পনা, ভুল চিন্তায়, অশ্রদ্ধায় ভরা, অজ্ঞানে ও দুঃখেও ভরা। সে অজ্ঞানই সে অশ্রদ্ধার কারণ, সে দুঃখের উৎস। মানুষের বুদ্ধি অজ্ঞানের যন্ত্র; প্রায়ই ভুল চিন্তা ভুল ধারণা আসে, অথচ সে মনে করে আমারই চিন্তা সত্য। তার চিন্তায় ভুল আছে কি নাই আর ভুল কোথায় তা দেখে বিবেচনা করবার ধৈর্য্য তার নাই। এমন কি ভুল দেখালে অহংকারে লাগে, ক্রোধ হয়

বা দুঃখ হয়, স্বীকার করতে চায় না। অথচ অপরের ভুল দোষ দেখাতে পারলে তার খুব তৃপ্তি হয়। পরের নিন্দা শুনলে সত্য বলে গ্রহণ করে অমনই, কতদূর সত্য তা বিবেচনাও করে না। এরূপ মনের মধ্যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহজে হয় না। সেজন্য মানুষের কথা শুনতে নাই, তার প্রভাব নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে নাই, যদি [বা] শুনতে হয়। আসল কথা নিজের ভিতরে গিয়ে psychic beingকে জাগাতে হয়, তার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে সত্য বুদ্ধি মনে বেড়ে যায়, সত্য ভাব ও feeling হৃদয়ে আসে, সত্য প্রেরণা প্রাণে উঠে, psychicএর আলোতে মানুষ বস্তু ঘটনা জগতের উপর নূতন দৃষ্টি পড়ে, মনের অজ্ঞান ও ভুল দেখা ভুল চিন্তা অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা আর আসে না।

22.10.35

*

[কেউ ‘ন’এর সঙ্গে অতিশয় দুর্ব্যবহার করেছে]

এই সময়ে প্রায়ই সাধকদের অহংকার উঠে সাধনায় ঘোর অন্তরায় কর্চ্ছে, অনেককে অনুচিত ব্যবহার করিয়ে দিচ্ছে। তুমি নিজে অটল হয়ে ভিতরে থাক, তাকে স্থান দিয়ো না।

23.10.35

*

This is very good. এই সব আক্রমণ যদি ঢুকতে না পারে বা ঢুকেও টিকতে না পারে, বুঝতে হবে যে outer beingএর চেতনা জাগ্রত হয়েছে আর তার শুদ্ধি অনেকটা progress করেছে।

27.10.35

*

আত্মাই এইরূপ অসীম বিরাট ইত্যাদি, ভিতরের মন প্রাণ physical consciousness যখন সম্পূর্ণরূপে খোলে তারাও তাই — বাহিরের মন প্রাণ দেহ শুধু যন্ত্র এই জগতের বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার ও খেলার জন্য। বাহিরের মন প্রাণ দেহও যখন আলোময় চৈতন্যময় হয় তখন তারা আর সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ বলে বোধ হয় না, তারাও অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

30.10.35

*

যখন Physical consciousness প্রবল হয়ে আর সকলকে ঢেকে সমস্ত স্থান ছড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে, তখন এই রকম অবস্থা হয় — কারণ এই দেহচেতনার স্বতন্ত্র প্রকৃতি যখন প্রকাশ হয় তখন সব বোধ হয় জড়বদ্ধ তমোময়, জ্ঞানের প্রকাশ রহিত, শক্তির প্রেরণা রহিত। এই অবস্থাতে সম্মতি দেবে না — যদি আসে, মায়ের আলো ও শক্তিকে এই দেহচেতনার মধ্যে প্রবেশ করে আলোময় ও শক্তিময় করবার জন্যে ডেকে আনবে।

30.10.35

*

হ্যাঁ, খাওয়া ভাল — দুর্ব্বল হয়ে থাকলে তমোময় অবস্থা আসবার সম্ভাবনা বেশী হয়।

31.10.35

।

ন: মা, তোমার হয়ে শুধু তোমার জন্যে কাজ করছি। ক আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমি নীরব ও শান্ত থাকি। ...কারো কোন ব্যবহার, কোন কথা আমাকে কিছু করতে পারে না।

উ: কাজের মধ্যে এই ভাবই ভাল। সব সময় রাখতে হয়, তাতে কাজে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সহজ হয়।

2.11.35

*

তাহাই চাই — হৃদয়পদ্ম সর্ব্বদা খোলা, সমস্ত nature হৃদয়স্থ psychic beingএর বশ হওয়া, এতেই নবজন্ম হয়।

3.11.35

*

ন: আমি আজও তোমা হতে বহুদূরে আছি বলে কেন মনে করছি, মা?

উ: কেন মনে করছ? তোমার physical mindকে [= দ্বারা] তোমার inner beingকে ঢেকে দিতে allow করছ বলে। তোমার inner being অর্থাৎ

psychic beingই সর্ব্বদাই আমি মায়ের শিশু বলে নিজেকে চেনে, মায়ের কাছে, মায়ের কোলে থাকে — physical mind সেই কথা ভাবতে সেই সত্য উপলব্ধি করতে সহজে পারে না। সেই জন্য সর্ব্বদা গভীরে psychicএ থাকতে হয়। যা ভিতরে তোমার soul জানে তা বাহির থেকে physical mind দিয়ে খোঁজা দরকার কি? যখন বাহিরের মনে সম্পূর্ণ আলো আসবে তখন সেও জানবে।

6.11.35

*

হ্যাঁ, সমস্ত সত্তাকে (physical mind ও physical vital পর্য্যন্ত) একদিকেই ফিরাতে হয়। তারাও যখন ওইভাবে ফিরে তখন কোনও serious difficulty আর থাকে না।

7.11.35

*

যা বলেছি কত বার, তা আবার বলতে হয়। শান্ত সমাহিত হয়ে সাধনা কর, সব ঠিক পথে চলবে, বহিঃপ্রকৃতিও বদলাবে, কিন্তু হঠাৎ নয়, আস্তে আস্তে। অপরদিকে যদি বিচলিত চঞ্চল হও, কল্পনা বা দাবী উঠে, তাহলে নিরর্থক গোলমাল ও কষ্ট সৃষ্টি করবে। মা গম্ভীর হয়েছে, আমাকে ভালবাসে না ইত্যাদি — এইসব মায়ের উপর আক্রোশ কোন কামনার বা দাবীর লক্ষণ, বাসনা বা দাবী কৃতার্থ হয় না বলে এই সব ধারণা। এই সবকে স্থান দিয়ো না, এ সবেতে নিরর্থক সাধনার ক্ষতি হয়ে যায়।

29.11.35

*

এই অবস্থা, এই বুদ্ধিই সত্য, সব সময় রাখা উচিত। অহংকারের বুদ্ধিতে আর লোককে ও ঘটনাকে না দেখে এই অধ্যাত্মবুদ্ধিতে আর ভিতরের psychicএর দৃষ্টিতে দেখতে হয়।

7.12.35

*

মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যার আছে সে সব সময় মায়ের কোলে, মায়ের মধ্যে থাকে। বাধা উঠতে পারে, কিন্তু হাজার বাধা তাকে বিচলিত করতে পারে না। সে বিশ্বাস, সে শ্রদ্ধা সব সময়, সব অবস্থায়, সব ঘটনায় অটুট রাখা, এ হল যোগের মূল কথা। আর সব গৌণ, এটাই হচ্ছে আসল।

16.12.35

*

এই সময় physical consciousnessএর উপর শক্তি কাজ কর্চ্ছে, সেই জন্য অনেকের এই physical consciousnessএর বাধা প্রবলভাবে উঠেছিল — তোমার চঞ্চলতার কারণ এই যে এই বাহিরের physical consciousnessএর সঙ্গে নিজেকে identify করেছিলে যেন সে চেতনাই তুমি। কিন্তু আসল সত্তা ভিতরে যেখানে মায়ের সঙ্গে সংযোগ থাকে। সেই জন্য physical consciousnessএর অজ্ঞান, তামসিকতা, ভুল বোঝা ইত্যাদি নিজের বলে গ্রহণ করতে নেই। যেন বাহিরের যন্ত্র, সেই যন্ত্রের যত দোষ অসম্পূর্ণতা সব মায়ের শক্তি সারিয়ে দেবে এই জ্ঞানই রেখে ভিতর থেকে সাক্ষীর মত অবিচলিত হয়ে দেখতে হয় — মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে।

16.12.35

*

ভিতরে সবই আছে ও মায়ের কাজ ভিতরে হচ্ছে। তবে বাহিরের মনের সঙ্গে যুক্ত হলে সে সব টের পাওয়া যায় না, যতদিন সে মন পূর্ণ আলোকিত না হয়, ভিতরের সঙ্গে এক না হয়।

19.12.35

*

তুমি যা বর্ণনা করেছ, “ভিতরে গভীরে শান্তিময় প্রেমময় বেদনা, তখন ভিতরে কিসে আমাকে টানে” psychic বেদনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এই সবই psychic sorrowএর লক্ষণ।

20.12.35

*

এই সব বাধা দেখে বিচলিত হয়ো না। ভিতরে যেয়ে স্থিরভাবে দেখে যাও, ভিতর থেকে জ্ঞান বাড়বে। মায়ের শক্তিই এই সব বাধাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দেবে।

20.12.35

*

আসল কথা এই যে কাজের মধ্যে অহংকারের বা বহিঃপ্রকৃতির বশ হবে না। তা যদি হও কাজ ত আর সাধনার অংশ হয় না, তা হয়ে যায় সামান্য কাজের সমান। কাজকেও সমর্পিত ভাবে ভিতর থেকে করতে হয়।

27.12.35

*

নঃ মা, আজ কয়েকদিন ধরে দুঃখ নিরানন্দ ও হতাশাব্যঞ্জক নানা কল্পনা ও প্রেরণা আসতে আরম্ভ করেছিল। আমি শুধু ছোট শিশু হয়ে মা মা ডেকে চলেছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি old পাতার মত সব ঝরে পড়ে গেল এবং তারপর দেখি তোমার শান্তি আলো পবিত্রতা ও আনন্দ নেমে আসল।

উঃ এই রকম reject করে, ফেলে ফেলে দিয়ে ওসব suggestions নষ্ট হয়ে যায় — তাদের জোর ক্রমশঃ কমে গিয়ে আর তাদের প্রাণ থাকবে না।

4.1.36

*

নঃ শুধু বাধা নিয়ে বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম ও বাধার কথা বেশী চিন্তা করেছিলাম, তাই এত দুঃখকষ্ট ও আঘাত পেয়েছিলাম। আর তোমাকে ভুলব না।

উঃ এই ভাল। তা করতে পারলে, বাধা ত বাধা বলে আসবে না বরং রূপান্তরের সুবিধের জন্য আসবে।

4.1.36

*

এই সব গোলমালের সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক হয়েছে, সে এই — এই সময় খুব সাবধান হও কার সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠতা কর বা বেশী মেশ।

যেমন D. R.এ 'চ', 'জ'। 'চ'র মধ্যে অশুদ্ধ শক্তির খুব খেলা হয়, তখন [তার] শরীরের মধ্যে একটা জ্বালা হয় আর বুদ্ধির বিপরীত অবস্থাও হয়, hunger-strike করে মাকে জোর করে নিজের ইচ্ছার অধীন করতে চায়, বিদ্রোহ করে আমাদের নিন্দাও করে, সাধিকাদের [মনে] আমাদের উপর অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি 'চ'র সঙ্গে [যারা] বেশী মেশে এই পেটে আগুনের জ্বালা গোলমাল ও বুদ্ধির বিপরীত অবস্থা তাদের মধ্যে সংক্রামক রূপে আরম্ভ হয়েছিল। 'জ'র [ক্ষেত্রে] তত হয় না, তবে অহঙ্কার ও অশুদ্ধ অবস্থা সহজে উঠে, তখন শরীরের ভিতরেও আগুনের জ্বালা ও নানা গোলমাল হয়। তোমার গোলমালের, unsafe conditionএর feeling আর red pepper কাটা গায়ে লাগার feeling তাদের সেই অশুদ্ধ শক্তির আক্রমণের চেষ্টা হতে পারে। সে জন্য বলছি সাবধান হয়ে থাক, মা ছাড়া আর কারো কাছে নিজেকে open করো না। এই কথা তোমারই জন্য লিখেছি, আর কারও কাছে প্রকাশ করতে নেই। প্রণামে মা তোমার ভিতরে দেখছিলেন কেন গোলমালের feeling হচ্ছে। প্রকৃতির বাধা সকলেরই হয় — কিন্তু গোলমাল যাতে না হয় এই দিকে সাবধান থাকা ভাল।

21.1.36

*

এই অনুভূতি খুব ভাল। প্রণামে মা ভিতর থেকে কি দিচ্ছেন, তাই feel করতে হয় — শুধু বাহিরের appearance দেখে লোকে কত ভুল বুঝে ভিতরের দান নিতে ভুলে যায় বা নিতে পারে না।

22.1.36

*

এই change (পিছনের দিকে) খুব ভাল, অনেকবার পিছন থেকে এই ধরণের আক্রমণ আসে, কিন্তু মায়ের শক্তি ও চৈতন্য সেখানে থাকলে আর প্রবেশ করতে পারে না। সাদা পদ্মের অর্থ এই যে সেখানে মায়ের চৈতন্য প্রকাশ হচ্ছে।

পিছনের দিকে psychic beingএর স্থান আর সেখানে যত কেন্দ্র, যেমন heart centre, vital centre, physical centre যেখানে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

হয়, সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠার স্থান। এই জন্য এই পিছনের দিকটার চেতনার অবস্থা বড় important.

24.1.36

*

এই যে feeling যে মা দূরে আছে, এটা ভুল ধারণা। মা তোমার কাছেই, তবে বাহিরের মন প্রাণের পর্দ্দা পড়ে, তখন এই ধারণা হয়। যে একবার ভিতরে ভিতরে মায়ের কোলে রয়েছে তার পক্ষে এই পর্দ্দা সরান কঠিন নয়।

31.1.36

*

এ মনে রাখ যে মা দূরে যান না, সর্ব্বদা নিকটে ভিতরে আছেন — যখন বহিঃপ্রকৃতির কোনও রকম চঞ্চলতা হয়, তখন সে ভিতরের সত্য ঢেকে ফেলে ঢেউর মত, তাই ওরূপ বোধ হয়। ভিতরে থাক, ভিতরে থেকে সব দেখ, কর।

12.2.36

*

এই সবই সত্য। বাহিরের অহংকার, অজ্ঞান অসত্য। বাহিরকার নিজের নয়, আত্মার নয় বলে reject করতে হয়। তার জন্য ভিতরে থাকতে হবে, সেখান থেকে সব বুঝতে দেখতে করতে হবে।

13.2.36

*

যখন বাহিরের physical consciousnessএ অবস্থান হয়, তখন এইরূপ সাধনাশূন্য অনুভূতিশূন্য অবস্থা হয় — তা সকলের হয়। তা না হবার একমাত্র উপায় তোমাকে বলেছিলাম — ভিতরে থাকা, বাহিরের অজ্ঞান অহংকার সাধারণ প্রাণবৃত্তির বশ না হয়ে ভিতরের psychic being থেকে এসবকে দেখা, প্রত্যাখ্যান করা। ভিতর থেকে মায়ের শক্তি আস্তে আস্তে এসব অন্ধকার অংশকে আলোকিত রূপান্তরিত করে। যারা তাই করে, তাদের বাধাও বাধা দিতে পারে না। অনেকে তা করে না, physicalএই অবস্থান করে সে, physicalএর উপর যত দিন

উপর থেকে আলো শক্তি ইত্যাদি না আসে।

23.2.36

*

এই কথার উত্তর আগেই দিয়েছি। ভিতরে থাক, ভিতরে থেকে সব দেখ, বাহিরের চক্ষুতে নয়। বহিশ্চৈতন্যে থাকলে চিন্তায় আচরণে অনেক ভুল হবার কথা। ভিতরে থাকলে psychic being ক্রমশঃ প্রবল হয়, psychic beingই সত্য দেখে, সব সত্যময় করে দেয়।

25.2.36

*

এই চিন্তা ও ভয়ের বদলে এই নিশ্চয়তা ও শ্রদ্ধা রাখতে হয় যে যখন একবার মায়ের সঙ্গে ভিতরে যোগ হয়েছে, তখন হাজার বাধা হলেও বহিঃপ্রকৃতির কতই না দোষ বা অসম্পূর্ণতা থাকলেও মায়ের জয় আমার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী, অন্যথা হতেও পারে না।

26.2.36

*

যখন এই শূন্য অবস্থা আসে, তখন মনকে খুব শান্ত কর, মায়ের শক্তি আলোককে ডাক বহিঃপ্রকৃতিতে নামবার জন্যে।

7.3.36

*

এই সব বহিঃপ্রকৃতি থেকে আসে। যখনই আসে আমার নয় বলে reject করতে হয়। বাহিরের যা আসে তাতে সায় না দিলে শেষে আর আসতে পারবে না।

9.3.36

*

"লোকে আঘাত দিলে" মানে তোমার অহংকারে আঘাত পড়লে। অহংকার

যতদিন থাকবে ততদিন তার উপর আঘাত পড়বেই। অহংভাবকে ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ সমর্পিত অন্তঃকরণে সমভাব সহিত কাজ করতে হয়, ইহাই সাধনার একটী প্রধান অংশ। তাই করলে আঘাত লাগবে না, মাকে পাওয়াও সহজ হবে।

18.3.36

*

ভিতর থেকে যা বলা হয়েছে, তা সত্যই। বহিশ্চেতনার অজ্ঞানে থেকে কেবল ভুলভ্রান্তি মিথ্যা কষ্ট হয়, সেখানে সব ক্ষুদ্র অহমের খেলা। ভিতরেই থাকতে হয় — আসল সত্য চেতনা সত্য ভাব সত্য দৃষ্টি যার মধ্যে, অহংকার অভিমান বাসনার দাবীর লেশ মাত্র থাকবে না, তাহাই grow করতে দাও, তখন মায়ের চৈতন্য তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, মানব প্রকৃতির অন্ধকার বিরোধ বিভ্রাট আর থাকবে না।

18.3.36

*

এই কথা। মাকে প্রথম পেতে হবে ভিতর থেকে, বাহির থেকে নয় — বাহির থেকে পেতে গেলে, তাও হয়, ভিতরটাও কখনও তার সান্নিধ্য দ্বারা আলোকিত হয় না। ভিতরে সম্পূর্ণরূপে পেলে তার পরে বাহিরটা যা আবশ্যক তা realised হতে পারে। এই সত্য দু'একজন ছাড়া কেহ এখনও ভাল করে বুঝতে পারেনি।

22.3.36

*

ন: স্বপ্ন দেখলাম একটি পুরুষমানুষ আমার কাছে এসেছে। আমি তার বুকের উপর উঠে তাকে মেরে ফেললাম ও তার পুরুষাঙ্গ কেটে দিলাম। ...তখন দেখি আমার চেহারা মহাকালীর মত ভীষণ হয়েছে।

উ: এই পুরুষটী কোন vital force হবে, হয়ত sex impulseএর একটা force। এই অনুভূতিতে তোমার vital being তাকে কেটে ফেলেছে। সাধকের vital being এইরূপ যোদ্ধা হওয়া চাই — খারাপ vital forceর বশ না হয়ে, ভীত না হয়ে তাকে meet করবে আর বিনাশ করবে।

23.3.36

*

নঃ মা, আমি দেখছি আমার মাথাটা খুব শান্ত পবিত্র আলোকিত হয়ে বিশ্বময় হচ্ছে।

উঃ খুব ভাল অনুভূতি। এতে বোঝা যায় যে mindএ ঊর্দ্ধ্বচেতনা নামছে, আত্মার উপলব্ধি নিয়ে নামছে। তখনই এইরূপ শান্ত পবিত্র আলোময় বিশ্বময় হয় — কারণ আত্মা বা true সত্তা সেরূপ শান্ত পবিত্র আলোময় বিশ্বময়।

27.3.36

*

ভাল, এইরূপ করে ঊর্দ্ধ্বচেতনা নামা চাই শান্ত বিশ্বময় ভাব নিয়ে, প্রথম মাথায় (মানস ক্ষেত্রে) তার পর হৃদয়ে (emotional vital ও psychicএ) তার পরে নাভিতে ও নাভির নীচে (vitalএ) শেষে সমস্ত physicalকে ব্যাপ্ত করে।

28.3.36

*

নীল আলো আমার, সাদা আলো মায়ের — যখন ঊর্দ্ধ্বচেতনা (higher consciousness) বিশ্বময় ভাব নিয়ে আধারে প্রথম নামতে আরম্ভ করে তখন নীল আলো খুব দেখা স্বাভাবিক।

28.3.36

*

ভিতরে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে হয় আর সেখান থেকে বাহিরের প্রকৃতির বাধা দোষ ত্রুটি দেখতে হয়, দেখে বিচলিত বা বিষণ্ণ বা নিরাশ হতে নাই। স্থিরভাবে প্রত্যাখ্যান করে মায়ের আলো ও শক্তির জোরে শুধরিয়ে নিতে হয়।

16.4.36

*

যে চিন্তার কথা বল, সে চিন্তা দূর করতে হয়। আমি যা চাই, তা হয়নি, যা পাবার আশা ছিল তা পাইনি। কেমন [করে] করব, আমার হবে না — এ সব হচ্ছে অশ্রদ্ধার কথা, প্রাণের চাওয়া ও পাওয়া না-পাওয়ার চিন্তা। আমি কি পাব

মার কাছে এই চিন্তা হচ্ছে অহমের, — মাকে কেমন করে নিজেকে সব দেবে, এই চিন্তাই হচ্ছে অন্তরাত্মার — সাধকের প্রায় সব বাধার লুক্কান মূল এই পাওয়ার ভাব। যে সব দেয় ভগবানকে, সে ভগবানকে আর ভগবানের সব পায়, না চেয়েও। যে পেতে চায় এটা ওটা, সে এটা ওটা পায়, কিন্তু ভগবানকে পায় না।

18.4.36

*

কেহ যদি সচেতন হয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে মায়ের উপর নির্ভর করে, মায়ের শক্তির জোরে ধীর ভাবে ঠেলে দেয় যতবার আসে, শেষে সে বাধামুক্ত হবেই হবে।

20.4.36

*

It is good. সব সময় মায়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হয় যে তাঁরই হাতে আছি, তাঁর শক্তিতে সব হবে। তা হলে বাধার জন্য দুঃখ বা নিরাশা আসতে পারবে না।

17.5.36

*

এমন অবস্থা হওয়া চাই যে চেতনা ভিতরে থাকবে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর মায়ের শক্তি কাজ করাবে, বাহিরের চেতনা সে শক্তির যন্ত্র হয়ে কাজ করবে — কিন্তু এই অবস্থা পুরোপুরি রূপে সহজে আসে না। সাধনা করতে করতে আসে আর আস্তে আস্তে complete হয়ে যায়।

23.5.36

*

সাধনার পথে শূন্যতা অনেকবার আসে — শূন্য অবস্থায় বিচলিত হতে নাই। শূন্যতা অনেকবার নূতন উন্নতিকে prepare করে। তবে দেখতে হবে যেন শূন্যতার মধ্যে বিষাদ চঞ্চলতা না আসে।

25.5.36

*

ইহাই ঠিক। দেহের মরণে মুক্তি হয় না, এই দেহেই নূতন দেহচেতনা ও সেই নূতন চেতনার শক্তি চাই।

25.5.36

*

এই অবস্থাই চাই — সব ভিতরে বিরাট শান্ত নীরব মাময় আনন্দময়।

28.5.36

*

'স' সম্বন্ধে লিখেছিলাম যে 'প'র আধখাওয়া রুটি গ্রহণ করা বড় ভুল। এইরূপ স্থলে সে লোকটীর মধ্যে যদি কোন খারাপ শক্তি অধিকার করে থাকে তাহলে ঐ আহারকে অবলম্বন করে সেই শক্তি যে খায় তার শরীরের উপর প্রাণস্তরের উপর আক্রমণ করতে পারে।

3.6.36

*

ন: ''ত'' ও ''স''র সঙ্গে অন্যদিনের চেয়ে বেশী কথা বলাতে আমার খুব মাথা কামড়েছিল ও অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। কিন্তু যখন একটু শান্ত নীরব হয়ে তোমায় ডাকলাম ও আমার ভিতরে একটি তোমাময় তীব্র ইচ্ছা ও বিশ্বাস হল যে ইহা দূর হইবে। একটু পরে দেখি, সত্যই দূর হয়েছে আর আমি অসীম শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতায় ও তোমাতে ভরে উঠছি।

উ: এই হচ্ছে আসল উপায় — এই উপায়েই চেতনার যত lowering বা deviation (নিম্নগতি বা ভ্রান্তগতি) সারান যায়।

9.6.36

*

ন: সারারাত যেন অন্ধকারময় অচৈতন্যময় তমোময় জগতে মড়ার মত পড়ে থাকি। সকালে উঠতে পারি না। জোর করে উঠে দেখি শরীরটা বড় জড় অলস বলহীন উৎসাহহীন শান্তি ও আনন্দশূন্য হয়ে যায়। মা এমন হলে আমার ঘুম দূর করে দাও।

উ: অবচেতনার ঘুম ওরকমই হয় — কিন্তু না ঘুমালে অবচেতনায় ছাপ বেড়ে যায়, কমে না। এ সবের মধ্যে উপরের আলো ও চেতনাকে ডেকে আনা হচ্ছে একমাত্র উপায়।

20.6.36

*

কখনও বাধার অবস্থা স্থায়ী থাকতে পারে না — মায়ের কোল থেকে তুমি দূরে যেতেও পার না — মাঝে মাঝে পর্দ্দা পড়ে মাত্র, সে জন্যে বাধা উঠলে ভয় করতে নাই, দুঃখ করতে নাই, বাধাকে reject করতে করতে মাকে ডাকতে ডাকতে ভাল অবস্থা ফিরে আসে — শেষে বাধা উঠলেও আর স্থায়ী সত্যি অবস্থাকে cover করতে পারবে না।

22.6.36

*

এই হচ্ছে ঊর্দ্ধচেতনার সোপান — এই চেতনার অনেক plane বা সমতল ভূমি, এই সোপানে ভূমির পর ভূমিতে উঠে শেষে supermindএ উঠে, ভগবানের সীমাহীন আলোময় আনন্দময় অনন্তে।

27.6.36

*

যখন অজ্ঞানের মিথ্যা ওঠে তখন পথ ঢাকা হয়ে পড়ে — তার উপায় আছে এই — এই মিথ্যায় বিশ্বাস না করা, এ suggestionকে reject করা এ সব সত্য হতে পারে না বলে। বাধা আছে তাতে কি, সোজা পথে চল, বাধা শেষে আপনি খসে পড়বে।

27.6.36

*

এইটী বাহিরের গোলমালের ফল। শরীরের উপর আক্রমণ — শান্ত ভাবে নিজের মধ্যে সংযত হয়ে বাহির করতে হবে।

1.7.36

*

এ ত ভালই — বাহিরে প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা ঘটুক, সব সময় অবিচলিত থাকা, ভিতরে মায়ের সঙ্গে যুক্ত। ইহাই সাধকের অবস্থা হওয়া উচিত।

2.7.36

*

এখনও শরীর বাহিরের সাধারণ influencesএর উপরে ওঠেনি — এ সর্দ্দি এ সব বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা ভিজে বাতাসের ফল হবে। কিন্তু শরীর মায়ের শক্তির দিকে খুলেছে, যে শক্তিকে ডাকলে এ সব বাহিরের স্পর্শ শীঘ্র মুছে যায়।

12.7.36

*

নঃ এখন আর দুঃখ কান্না হতাশা ও মরে যাব, চলে যাব, মা আমাকে ভালবাসেন না ইত্যাদি মানব প্রকৃতির জিনিস আমার মধ্যে আসতে পারছে না। যদি কোন রকমে আসে, কে আমাকে সচেতন করে দেয় এবং আমি ছোট শিশুর মত মা মা ডাকি ও হৃদয়ের গভীরে যাই...।

উঃ It is very good. এই ভাবে চললে মানব প্রকৃতির ঐ সব পুরাতন movement খসে যাবে, আর আসতে পারবে না।

18.7.36

*

নঃ মা, এখন আমি feel করি তুমি আমার ভিতর দিয়ে সব কাজ করছ ও আমার ভিতরে আছ... আজকাল কাজের জন্য কেহ বকাবকি করলে শান্ত ভাবে থাকি ও সতর্ক হয়ে ভিতরের আনন্দে কাজ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে বাহিরের ও মানব প্রকৃতির জিনিষ এসে আমাকে ঢেকে ফেলে আর তখন আমি একটু গোলমাল চিন্তা ও চঞ্চলতা অনুভব করি ও তোমাকে ভুলে যাই।

উঃ This also is very good. বাহির, ভুলে যাওয়া এই সব প্রকৃতির habitএর জন্য হয়। কিন্তু এই ভিতরের ভাব যদি সব সময় যত্ন করে রাখ, তা হলে এই সব habit খসে যাবে, শেষে আর আসবে না। সত্য চেতনার movementই মন প্রাণের natural habit হয়ে যাবে।

18.7.36

*

আমরা ত তোমাকে ছেড়ে দিইনি। যখন depression হয় তখন তুমি এ সব কথা ভাব। মাঝে মাঝে তুমি বাহিরের চেতনায় এসে আর মাকে feel কর না, তাই বলে ভাবা উচিত নয় যে মা তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আবার ভিতরে যাও, সেখানে তাঁকে feel করবে।

5.9.36

*

যখন চেতনা physicalএ নামে তখন এইরূপ অবস্থা হয়। তার অর্থ এই নয় যে সব সাধনার ফল বৃথা হয়েছে বা উপরে চলে গেছে — সব আছে কিন্তু আবরণের মধ্যে পিছনে রয়েছে। এই obscure physicalএ মায়ের চেতনা আলো ও শক্তি নামাতে হয় — সেটা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আর এ অবস্থা ফিরে আসবে না। কিন্তু যদি বিচলিত হও, depressed হও বা এই সব চিন্তা প্রবেশ করে যে আমার আর এ জীবনে হবে না, মরা ভাল ইত্যাদি, তা হলে একটা বাধা হয় সে চেতনা শক্তি আলো নামবার পথে। সেজন্য এগুলোকে reject করে মায়ের উপর নির্ভর রাখা আর শান্তভাবে aspire করা ও তাঁকে ডাকা উচিত।

19.9.36

*

মা ত ওরকম কিছু বলেননি তোমার সম্বন্ধে। এই কথা সত্য যে একটী মুখ্য কাজ আছে সকলের যা মা দিয়েছেন, সেটা ত প্রধান কার্য্য। তার পর অন্য সময়ে যা তারা করতে চায়, সে স্বতন্ত্র কথা। সব কাজ right spiritএ করতে হয়, বাহিরে কিছু না চেয়ে, মায়ের চরণে সমর্পণ করে, ইহাই আসল কথা।

21.9.36

*

ওই সোজা আলোকময় পথই আসল পথ, তবে তার মধ্যে পহুঁচতে সময় লাগে। একবার ঐ পথে পহুঁচলে আর বিশেষ কোনও কষ্ট বাধা স্খলন হয় না।

21.9.36

*

আমি ত বলেছি কেন হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে হয় না — বাহিরের physical consciousness ওঠার জন্য। এইরূপ অবস্থা সকলের হয় — তখন ধৈর্য্য ধরে তার মধ্যে মায়ের চেতনা নামাতে হয়, অনেক সময় লাগলেও ক্ষতি নাই। রূপান্তর ত খুব কঠিন ও মহৎ কাজ — সময় লাগা স্বাভাবিক। ধৈর্য্য ধরতে হয়।

26.9.36

*

এটা সত্য যে বাহিরের মন, চোখ, মুখ সব মাকে দিতে হয় নিজের নয় ভেবে, যাতে সব তারই যন্ত্র হয়, আর কিছু নয়।

1.10.36

*

এসব বিলাপ ও আক্রোশ তামসিক অহংকারের লক্ষণ — আমি পারি না, আমি মরব, আমি চলে যাব ইত্যাদি করলে বাধা আরও ঘনিয়ে এসে তামসিক অবস্থাকে বাড়িয়ে দেয়, এতে সাধনার কোন উন্নতির সাহায্য হয় না। আমি একথা তোমাকে বার বার লিখেছিলাম। আসল কথা আর একবার লিখি। তোমার সাধনা নষ্ট হয়নি, যা পেয়েছিলে তাও চলে যায় নি, পর্দ্দার পিছনে পড়েছে শুধু। সাধনার পথে একটা সময় আসে যখন চেতনা একেবারে physical planeএ নেমে যায়। তখন ভিতরের সত্তার উপর, ভিতরের অনুভূতির উপর একটা অপ্রবৃত্তির ও অপ্রকাশের পর্দ্দা পড়ে, এমন বোধ হয় যে সাধনা আর কিছুই নাই, aspiration নাই, অনুভূতি নাই, মায়ের সান্নিধ্য নাই, একেবারে সাধারণ মানুষের মত হয়েছি। এই অবস্থা যে শুধু তোমারই হয়েছে তা নয়, সকলের হয় বা হয়েছে বা হবে, এমন কি শ্রেষ্ঠ সাধকদেরও হয়। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে এই যে এটা সাধনপথের একটা passage মাত্র, যদিও বড় দীর্ঘ passage। এ অবস্থায় না নামলে পুরো রূপান্তর হয় না। এই ভূমিতে নেমে সেখানে স্থির হয়ে মায়ের শক্তির খেলা, রূপান্তরের কাজ ডেকে আনতে হয়, আস্তে আস্তে সব cleared হয়ে যায়, অপ্রকাশের বদলে দিব্য প্রকাশ হয়, অপ্রবৃত্তির বদলে দিব্য শক্তি ও অনুভূতির প্রকাশ হয়, শুধু ভিতরে নয়, বাহিরে, শুধু উচ্চ ভূমিতে নয়, নিম্ন ভূমিতে, শরীর চেতনায়, অবচেতনায়ও হয়। আর যে সব অনুভূতির উপর পর্দ্দা পড়েছিল, সেগুলো বেরিয়ে আসে, এই সব ভূমিকেও অধিকার করে। কিন্তু

সহজে শীঘ্র হয় না, আস্তে আস্তে হয় — ধৈর্য্য চাই, মায়ের উপর বিশ্বাস চাই, দীর্ঘকালব্যাপী সহিষ্ণুতা চাই। যে ভগবানকে চায় তাকে ভগবানের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যে সাধনা চায়, তাকে সাধনা পথের কষ্ট বাধা, বিপরীত অবস্থাকে সহ্য করতে হয়। শুধু সাধনায় সুখ ও বিলাস চাইলে চলবে না, বাধা আছে বলে, বিপরীত অবস্থা আসে বলে কেবল কান্নাকাটি ও নিরাশা পোষণ করলে চলবে না। তাতে পথ আরও দীর্ঘ হয়। ধৈর্য্য চাই, শ্রদ্ধা চাই, মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর চাই।

14.12.36

*

এই attitudeই ভাল। যখনই বাধা হয়, চেতনার উপর পর্দ্দা পড়ে, তখন বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে মাকে ডাকতে হয় যতক্ষণ পর্দ্দা খসে না যায়। পর্দ্দা পড়ে বটে কিন্তু পিছনে সবই আছে।

15.12.36

*

মা ইচ্ছা করে আঘাত করেন নি! তবে যদি ভিতরে কোন বাসনা বা অহংকার থাকে, সেগুলো উঠে মায়ের কাছে স্বীকৃতি বা পোষণ না পেয়ে নিজেকে আহত বোধ করে আর সাধক মনে করে মা আমাকে আঘাত দিচ্ছেন। যদি বা কখন আঘাত দেন, অহংকার ও বাসনাকে আঘাত দেন, তোমাকে নয়। অহংকার ও বাসনাকে বর্জ্জন করে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে প্রকৃতির সব দোষ ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়, এবং মায়ের চিরসান্নিধ্য পাওয়া যায়।

15.1.37

*

এই নীচে নামা শারীরিক চেতনায় সকল সাধকেরই হয় — না নামলে সে চেতনায় রূপান্তর হওয়া কঠিন।

24.1.37

*

ন: আমি প্রায় সময় চেষ্টা করছি আমার মধ্যে তোমার আলো ও চেতনাকে

ডেকে আনতে কিন্তু আমার ভিতরে তেমন কিছু হচ্ছে না মা, আমি কি করব?

উ: ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা করলে শেষে ফল হতে আরম্ভ হয়। শরীরচেতনা খোলে, অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

24.1.37

*

এতে বিচলিত হয়ো না। যোগপথে এইরূপ অবস্থা আসেই — যখন নিম্নতম শরীরচেতনায় ও অবচেতনায় নামবার সময় আসে — সে সমস্ত অনেকদিন টিকতে পারে। কিন্তু এ পর্দ্দার পিছনে মা আছেন, পরে দেখা দেবেন, এই নিম্নরাজ্য উপরের আলোকের রাজ্যে পরিণত হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সব সমর্পণ করতে করতে এই বাধাপূর্ণ অবস্থার শেষপর্য্যন্ত এগিয়ে চল।

8.3.37

*

মা তোমা থেকে দূরে যাননি, সঙ্গেই আছেন — বহিশ্চেতনার পর্দ্দার জন্য অনুভব কর না — তবে বিশ্বাস রেখে থাকতে হয় যে মা আছেন তোমার সঙ্গে, ভিতরেই রয়েছেন, সে বিশ্বাসে চলতে হয়। এই সব বাধা ত কিছুই নয়, মানুষমাত্রেই রয়েছে, "উপযুক্ত" ত কেহই নাই — এই সব ভাল খারাপের গণনা বৃথা। মায়ের উপর বিশ্বাস ও অটুট aspiration রাখাই সব, তাতে শেষে সব বাধা অতিক্রম করা হয়।

14.3.37

*

যতই নিম্নে ও অতল গভীরে যাও, মা সেখানে তোমার সঙ্গে আছেন।

18.3.37

*

মা ভগবান ছাড়া তুমি নও — মা ত তোমার সঙ্গেই আছেন — সাধক পাতালে নামে সেখানে উপরের আলো ও চেতনা আনবার জন্য — এই বিশ্বাস রেখে ধীরচিত্তে চল, সে আলো সে চেতনা নামবেই।

3.4.37

*

শেষ পত্রে যা লিখেছ, সবই সত্য — এইরূপ সচেতন হয়ে সব সময় থাক — বাহিরের স্পর্শে বা মিথ্যার শক্তির suggestionএ আর বিচলিত বা বিমূঢ় হতে হবে না। নিজের ভিতরে থাক যেখানে মা আছেন — বাহির ত বাহির, বাহিরকে ভিতর থেকে সত্যের চক্ষু দিয়ে দেখতে হয়, তা হলেই সাধক নিরাপদ হয়ে থাকে। সাধকরাই অজ্ঞানে ডুবে মায়ের কাছ থেকে দূর হয়ে যায়। মা ত কখন দূর হন না, চিরকাল ভিতরে সঙ্গেই আছেন। ভিতরে থাকলে তাঁকে হারায় না।

পুনশ্চ — অসুখটা বোধ হয় এই আক্রমণের ফল, শান্ত হয়ে মায়ের দিকে শরীর-চেতনা খুলে রাখ — সেরে যাবে।

3.6.37

*

ন: এখন প্রতি মুহূর্ত্তে শ্বাসে প্রশ্বাসে প্রত্যেক চিন্তাতে ও দৃষ্টিতে অসংখ্য ছোট ছোট শিশিরবিন্দুর মত বাধা অনুভব হচ্ছে। প্রায়ই মাথা কামড়ায়, বিশেষ করে যখন ভিতরে ডুবে থাকি তখন অসহ্য হয়। কখনও কখনও বুকের মধ্যে ভয়ের মত একটি কম্প হয় ও মনপ্রাণ বেশী ছটফট করে, কোন সময় গলাতে কাঁটার মত কি আসে...।

উ: শরীরচেতনা ত এ সব বাধা উঠিয়ে দেবেই। এগুলোকে উপেক্ষা করে দৃঢ় হয়ে মায়ের কাছে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখবে, তবে বাধাগুলো শেষে আর পথ রোধ করতে পারবে না।

6.6.37

*

মায়ের সাহায্য ত আছেই — বাধার জন্য নিরাশ না হয়ে ভিতরে নীরব হয়ে নিজেকে খুলে থাক, সে সাহায্য পাবে, গ্রহণ করতে পারবে।

31.8.37

*

মায়ের ভালবাসা ও সাহায্য সব সময়ই আছে, তাহার অভাব কখনও হয় না।

26.9.38

*

নঃ এখনও পর্য্যন্ত কেন আমি সব সময় মাকে কাজের মধ্যে স্মরণ করতে পারি না?

উঃ ইহা মনের স্বভাব সে যাহা করে তাতেই মগ্ন থাকে — সাধনার অভ্যাসের বলে মনের এই সাধারণ গতি অতিক্রম করা যায়।

*

সমস্ত সত্তা সব detailএ খোলা ও সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে সময় লাগে — বিশেষ lower vital ও physicalএ (নাভির নীচে ও পায়ের তল পর্য্যন্ত) উপরের চৈতন্য নামতে সময় লাগে। তোমার higher vital বেশ খোলা আছে, নিম্ন প্রাণ ও শরীরচেতনা খুলছে — কিন্তু সম্পূর্ণ খোলে নি, সেই জন্য এখনও বাধা আছে — কিন্তু তাতে বিচলিত হতে নেই। মায়ের কাজ তোমার ভিতরে দ্রুত হচ্ছে, সব হয়ে যাবে।

*

আমি লিখেছিলাম যে কোন বাসনা বা দাবীকে আশ্রয় না দিয়ে মাকেই চাইতে হয়। বাসনা ইত্যাদি আসে প্রাণের পুরাতন অভ্যাস দরুণ — তবে যদি সায় না দাও আর ফেলে দাও প্রত্যেকবার, অভ্যাসে জোর কমে যাবে, শেষে বাসনা দাবী আর আসবে না।

*

It is very good — ভিতরের পরিবর্ত্তন যখন হয়েছে, বাহিরেরও আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, বহিঃসত্তা ভিতরের প্রকাশ, মায়ের যন্ত্র হবে।

*

নঃ আমি সমস্ত আধারে তোমার শক্তির অবতরণ ও কাজ feel করছি। পিছনে অর্থাৎ পিঠের মধ্যে কিছু খুলছে বোধ হচ্ছে এবং তার মধ্যে তোমার শান্তি ও আলো দেখছি ও feel করছি।

উঃ ইহা খুব ভাল। পেছনের সত্তাটা প্রায়ই অচেতন হয়ে থাকে আর তার দ্বারা বাধা ঢুকতে পারে সহজে। এই পেছনের ভাবটা খোলা ও সচেতন হওয়ায় খুব ভাল ফল হয়।

*

মা ত আছেন তোমার ভিতরে। যে পর্দ্দা পড়েছে physical প্রকৃতির, তারই উপর শক্তির কাজ করা হচ্ছে, সে মায়ের আলোকে শেষে transparent হয়ে যাবে।

*

ঘুম না হওয়া, শরীর দুর্ব্বল হওয়া কিছুতেই ভালো নয়। ঘুম না হলে শরীর দুর্ব্বল হবেই। ঘুমেও সাধনার অবস্থা থাকতে পারে। অর্থাৎ মায়ের কোলে ঘুমোন, কিন্তু ঘুম চাই-ই।

*

একবার বিশদ অবস্থা, একবার বাধার অবস্থা, এ সকলের হয়। সাধনার ক্রম এই। স্থির হয়ে থাক, আস্তে আস্তে বিশদ অবস্থা বাড়বে, বাধার অবস্থা কমে যাবে, শেষে আর আসবে না।

*

অশান্তি ও অচৈতন্যতা এলে, শান্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান করে মায়ের নিকট সমর্পণ কর — তা হলে ওগুলো টিকতে পারবে না।

*

মায়ের সাহায্য তোমার সঙ্গে আছেই — নিজেকে খুলে রাখলে তোমার ভিতরে তার কাজ সফল হবে।

*

ইহাই চাই — যদি বাধা এসেও টলাতে না পারে, তা হলে সে চেতনার যেন একটী দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়ে যাচ্ছে — যেমন ভিতরে, তেমনই বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে।

*

ক্লান্তিবোধ শরীরচেতনার — তমোগুণ যার প্রধান লক্ষণ। যখন এ শরীরচেতনা ভাবে যে 'আমি কাজ কর্চ্চি' তখন এই ক্লান্তিবোধ হয়। আজকাল আশ্রমে শরীরচেতনায় এই তমোগুণ খুব খেলছে, একজনের চেতনা থেকে অপরের মধ্যে প্রসার হচ্ছে।

*

'মা আজ গম্ভীর হয়ে রয়েছেন, আমার উপর তিনি অসন্তুষ্ট। আমি যোগের অযোগ্য, আমার কিছু হবে না' এই সব মনের খেয়াল করে আশ্রমের অনেকে বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ নিজের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়, যন্ত্রণা ভোগ করে, এমন কি চরম বিপদে পড়বার উদ্যোগ করে। তুমি ওদের মতন করো না। এই সব চিন্তা যখন আসে, তখন তাড়িয়ে দাও। Confidence in the Mother হচ্ছে এই যোগের প্রধান অবলম্বন, সেই confidence কখন হারাতে নাই।

*

অবশ্য বাকসংযম সাধনার পথে খুব উপকারী। অতিমাত্র (অনাবশ্যক) কথা বলায় শক্তিক্ষয় হয় আর নিম্ন চেতনায় অবতরণ সহজে হয়।

*

বহির্মনের বাধা অতিক্রম করা প্রায় সময় সাপেক্ষ কারণ তার মূল স্বভাবের মাটিতে পোঁতা, শক্ত ও গভীরে যায়। এই বাধায় বিচলিত হওয়া উচিত নয়, এই stageএ সে স্বাভাবিক। Patience ও perseverence চাই তাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে।

*

বলেছি কতকটা বাধা থাকবে উপরে উপরে, ভিতরে শান্ত স্থির থাকলে ভিতরে ঢুকতে পারবে না — সাধনা করতে করতে সে উপরের বাধা ক্রমে ক্রমে চলে যাবে — এগুলো প্রায়ই হঠাৎ যায় না।

*

নঃ মা, ধ্যানে যেমন শান্তি আলো পাই, জাগ্রতেও যেন তা পাচ্ছি। তুমি কি এখন আবার আমার মধ্যে নেমে এসেছ? তোমার চরণ দুখানা মনে হচ্ছে আমার ভিতরে নেমে এসেছে ও উপস্থিত আছে।

উঃ It is very good. সব ছিল ভিতরে, কিছুই হারাও নি — দেখছ, সব ফিরে আসছে।

*

ন: মা, কাল যে সারাদিন আমি ক্রন্দন করেছিলাম কেননা আমি সব সময় তোমার সঙ্গে যুক্ত নই কেন এবং কেন আমি pure ও তোমার দিকে সম্পূর্ণভাবে open নই, আজ সে দুঃখ আমার চলে গেছে। আজকে আমি সব সময় সব কিছুতে তোমাকে feel করছি আর তুমি যেন ধীরে ধীরে আরো আমার কাছে এগিয়ে আসছ এবং আমাকে তোমার আলো ও শান্তি দিয়ে ভরে তুলছ।

উ: এ সব ভালই। এখনও যে সবসময় সম্পূর্ণভাবে হয় না, ইহা আশ্চর্য্য নয়, দুঃখের কথা নয়। এত শীঘ্র যে এতদূর এগিয়েছে সাধনা, ইহাই আশ্চর্য্য ও সুখের কথা।

*

ন: মা, আজ প্রণাম করবার সময় আমার ভিতর হতে কি সে তোমার কাছ থেকে কিছু পেতে চেয়েছিল। কি কারণে আমার ভিতরে এরকম হল? কেন আমি প্রফুল্ল অন্তরে মুক্তভাবে সব তোমার শ্রীচরণে দিতে পারলাম না?

উ: বোধ হয়, পুরোন অভ্যাসের দরুন ঐ কিছু পেতে চাওয়া এসেছিল। বাসনাতে দুঃখ আসে। একটু সাবধান হয়ে প্রত্যাখ্যান করলে চলে যাবে।

*

ন: সর্ব্বদা মাকে সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়ার বোধ হচ্ছে, আর চোখ অশ্রুতে ভরে আসছে। এই অশ্রু ত আমার নিজের দুঃখের জন্য নয়। তবে ইহা কিসের জন্য?

উ: অশ্রু যখন দুঃখের নয়, তখন প্রেমভক্তিরই অশ্রু।

*

ন: মা, তুমি তোমার শিশুকে এবং তোমার শিশুর সব নিয়ে নিয়েছ এবং তোমার আর আমার মাঝে কোন ভেদ নেই। এই সব কি দেখছি মা, দৃশ্যের মত, কাল্পনিক জিনিসের মত?

উ: এই অবস্থা ভালই। ভেদ যখন নাই, তখন ভিতরের চেতনা মায়ের সঙ্গে মিলে আছে বলে সে রকম বোধ হয়।

*

নঃ হৃদয়ে তোমার আসনের দুপাশে খুব উপর হতে দুটো সিঁড়ি নেমে এসেছে, একটি রূপার আর একটি সোনার। এই সিঁড়ি দিয়ে ছোট বালিকার মত অনেক শক্তি নামছে; তাদের রূপ, পোশাক, আলো দুই রকম — বিশুদ্ধ সাদা আর উজ্জ্বল সূর্য্যের মত।

উঃ আধ্যাত্মিকতার পথ ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও ঊর্দ্ধের সত্যের পথ ও সেই সত্যের শক্তি।

*

নঃ মাঝে মাঝে feel করি যে খুব উপর হতে কে আমাকে মধুরভাবে বলছেন, ‘‘আয়, আয়, সব ছেড়ে সমর্পণ করে উঠে আয়’’। আর এই বাণী শোনার সাথে খুব উজ্জ্বল নীল আলোও পাই। মা, কে আমাকে ডাকছেন?

উঃ একদিন উপরে — মনের উপরে উঠতে হবে। উপরের শান্তি শক্তি নামা ও উপরে উঠে মনের উপরে থাকা এই যোগের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

*

নঃ আজ আমার সাথে কোন কিছুর সম্বন্ধ নেই, আমি যেন সব কিছু হতে মুক্ত হয়ে গভীর শান্তি মাতৃময় চেতনার মধ্যে ডুবে আছি। আজ দুইবার দুইটী খারাপ শক্তিকে দেখেছিলাম ও বোধ করেছিলাম তারা আমার পুরনো চেতনা ও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমার মধ্যে ঢুকতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি অচঞ্চল থেকে সব তোমাদের শ্রীচরণে বলি দিয়েছি।

উঃ It is good. খারাপ শক্তি বা অবস্থা আসতে চাইলেই, এমনই শান্ত ও সচেতন মনে মাকে ডাকলে তা চলে যাবে।

*

নঃ মা, তুমি যেন এখন তোমার শিশুর কপালের মাঝখানে আছ। আগে তোমাকে হৃদয়ে feel করতাম ও দেখতাম, এখন কেন কপালের মধ্যে দেখছি?

উঃ বোধ হয় মা তোমার মন ঊর্দ্ধ্ব চৈতন্যের দিকে বিশেষভাবে খুলতে চান বলে কপালে তাঁর স্থান করেছেন।

*

ন: মা, এখন দেখছি আমার গলায় একটি সাদা পদ্মের মালা কে পরিয়ে দিয়েছে। আমার এখন এত আনন্দ কেন হয়েছে জানি না।

উ: It is very good. তার অর্থ physical mindএ মায়ের চেতনার আলোকের স্থাপন।

*

[স্বপ্নে সাধিকা দেখেছে যে শ্রীমা তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করছেন। কিন্তু সাধিকার বিশ্বাস যে শ্রীমার রূপ ধরে কোন বিরোধী শক্তি তাকে বিচলিত ও ব্যস্ত করছে।]

উ: এই সব মিথ্যা স্বপ্ন আসে প্রাণের অবচেতনা হতে — জাগ্রত অবস্থায় আর না পেরে ঘুমে অবচেতন অবস্থায় মিথ্যা দেখিয়ে যদি বিচলিত করে, ভালো অবস্থা নষ্ট করতে পারে, এই চেষ্টা বিরুদ্ধ শক্তি কর্চ্ছে। এই রকম স্বপ্নে কোন আস্থা স্থাপন করবে না, জেগে ঝেড়ে ফেলে দেবে।

*

এই sex-difficulty আশ্রমে অধিকাংশ সাধকদের প্রধান বাধা। একমাত্র মায়ের শক্তি তাহা অপসারণ করতে পারে — নিজেকে খুলে রাখ সে শক্তির কাছে আর সমস্ত মন প্রাণে তার অপনোদনের জন্য aspiration কর।

*

এত দুর্ব্বলতা হয়েছে না খেয়ে না ঘুমিয়ে। এই মত [না] খাওয়ার ইচ্ছা তাড়িয়ে দিতে হবে — জোর করে খেতে হবে আর ক্রমে খাওয়া বাড়িয়ে দিতে হবে, যতদিন আগেকার মত না হয়। ব্যথা ইত্যাদি সব দুর্ব্বলতার জন্যে হয়েছে। ভাল খেলে ঘুমও হয়। ...আসল কথা তুমি রোগ হলে বড় বেশী চঞ্চল হও, সেই জন্য এই সব হয়। শান্ত হয়ে থাকলে অল্পেতে ও শীঘ্র সেরে যায়। তারপর ঔষধ খেতে চাও না, সে আর একটা মুস্কিল — ঔষধ খেলে শীঘ্র সেরে যায়। অথবা ঔষধ যদি না খাও তাহলে খুব শান্ত সচেতন হয়ে থাকতে হয়, তাহলেও শীঘ্র সারবার সম্ভাবনা হয়। যাই হৌক এখন খেলে ঘুমোলে শান্ত হয়ে বিশ্রাম করলে শরীরের ভালো অবস্থা শীঘ্র ফিরে আসবে।

এই সাধনায় প্রাণ শরীরকে তুচ্ছ করা, ফেলে দিতে চাওয়া মস্ত একটী ভুল।

এ ত প্রাণহীন অশরীরী যোগসাধনা নয়। প্রাণ শরীর মায়ের যন্ত্র, বাসস্থান, মন্দির। পরিষ্কার করে রাখতে হয়, সবল সজাগ করে রাখতে হয়। খাওয়া, ঘুম ইত্যাদি neglect করতে নাই, যাতে শরীর ভাল থাকে তাই করতে হবে। এই কথা আর ভুলে যেও না, শরীর হচ্ছে সাধনার ধন। তাহাকে সম্মান করতে হবে, ভালো অবস্থায় রাখতে হবে।

*

নঃ মা, আমি দূরে থেকে আর কোন কিছু অনুভব করতে দেখতে চাই না। মার শিশু কেন মার কাছ থেকে দূরত্ব অনুভব করবে?

উঃ সে কথা নিয়ে চিন্তা কর না — ভিতরেই সব স্থাপন কর, বাহিরটার সব পরে হবে।

*

নঃ মা, এখন আমি মাঝে মাঝে সাধারণ চেতনায় ও আমোদে আহ্লাদে পড়ে ভুল করি, সাংসারিক বিষয় চিন্তা করি ও আলোচনা করি।

উঃ মায়ের চৈতন্য যত তোমার মধ্যে স্থান পেয়ে সমস্ত আধার দখল করে ততই ওগুলো বহিষ্কৃত বা রূপান্তরিত হবে। ততদিন স্থির ধীর ভাবে সাধনা করে চল।

*

নঃ মা, চিঠি লিখতে বসলে কত মিথ্যা জল্পনা কল্পনা বাসনা আসছে...

উঃ বাধাকে নিজের না ভেবে স্বতন্ত্র হয়ে তাকে দেখবে আর আমার নয় বলে reject করবে। তা হলে অতিক্রম করা বেশী সহজ হয়।

*

নঃ মা, আমার মনের মধ্যে এই ভাব আসছে যে তুমি আমার উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট, সে জন্য তুমি আমাকে দেখে হাসছ না, চেয়েও দেখছ না। আরও মনে হচ্ছে যে আমি খুব খারাপ, তোমার যোগের অনুপযুক্ত।

উঃ এ সব হচ্ছে বাহিরের প্রাণপ্রকৃতির suggestion তোমাকে নিরাশায় ফেলবার জন্য ও বাধা সৃষ্টি করার জন্য — এই সব কল্পনাকে স্থান দিতে নাই।

*

ন: হঠাৎ দৈববাণীর মত কে আমাকে বলল, "তোমার এই বাধা শেষ বাধা, একে জয় করতে পারলে আর নয়, তোমার স্থূল চেতনাকে পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর করবার জন্য বাধা এসেছে। সবকিছু রূপান্তর হয়ে মাতৃময় হয়ে থাকতে হবে।" এই সব কি সত্য, মা?

উ: যে দিন psychic সব সময় জাগ্রত থাকবে আর উপরেও থাকতে পারবে, সে দিন এই বাণী সফল হতে পারে। এখন তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছ।

*

ধ্যান করবার চেষ্টার দরকার নাই — আপনি যা হয় তাই যথেষ্ট।

*

ন: মা, কে আমাকে যেন বলল, "তোমার আর কিছু করবার দরকার নাই, কোন দিকে মন দিতে বা দেখতে হবে না। শুধু নিজেকে মার কাছে নিঃশেষে দিয়ে দাও আর মাকে সব সময় ডেকে চল। মা ও মার শক্তি সব করে নেবেন।"

উ: এই কথা সত্য। Psychicএরই কথা। যেখানে মায়ের বিরুদ্ধে বা মায়ের কৃত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধকদের অহংকার উঠবে, সেখানে সংঘর্ষ হবেই — তার মধ্যে যেয়ো না, মায়ের শক্তি যা করবে তাই হবে।

*

ন: কেমন করে ও কখন তোমার রাজ্য বহিঃসত্তায় স্থাপিত হবে?

উ: কখন হবে তা এখনই বলা যায় না — কিন্তু ভেতরের চৈতন্য মাময় হলে, তারই বলে বহিঃপ্রকৃতিও বদলানো হবে, ইহাই বলা যায়।

*

আমি ত তোমাকে বার বার বলেছি যে তোমার যেমন স্বভাব ও বাধা, প্রায় সকলের সেরূপ মানুষ-স্বভাব ও বাধা — এদিক ওদিক difficulties থাকতে পারে সাধকদের মধ্যে, কিন্তু আসলে সকলেই মানুষ, বহিঃপ্রকৃতি এখনও অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ।

*

ন: একটি কিসের মালা আমার গলায় ঝুলছে, আর তা হতে তোমার আলো বার হয়ে তোমার শিশুর সব আলোকিত ও তোমাময় করছে।

উ: গলায় অর্থাৎ মনবুদ্ধির বহির্গামী অংশে (physical mind), এখানে যে কাজ হচ্ছে ও কাজের ফল হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে।

*

দুর্ব্বল যদি বোধ হয়, আস্তে আস্তে মায়ের শক্তিকে শরীরে ডেকে আন — বল আসবে।

*

ন: মা, তোমার চেয়ে মানুষের কথা আমার বেশী মনে হয়। সংসারের দিকে বারবার মন যেতে চাচ্ছে। আমার প্রকৃতি খুব চঞ্চল, unconscious। মনের প্রাণের চেতনার মধ্যে অসংখ্য অদিব্য জিনিষ ভেসে উঠছে।

উ: তুমি তোমার শান্ত সাধনার গতি রাখতে পার নি বলে আর বাধার জন্যে উতলা হয়ে অশান্তি ও চঞ্চলতাকে স্থান দিয়েছিলে বলে, এই সব বাহিরের লোকে যে বাহিরের atmosphere এখানে আনায় আশ্রমের atmosphereএ একটা কোলাহল ও confusion এসেছিল, তার প্রভাব তোমার উপর পড়েছে। স্থির হয়ে যাও, অশান্তিকে স্থান না দিয়ে দৃঢ়ভাবে মাকে ডেকে ডেকে সেই আগেকার ভাল অবস্থা ফিরিয়ে আন।

*

ন: মা, আজ দুপুরবেলা দেখি আমাকে অন্ধকার এসে আবৃত করতে চাইছিল, নীচের দিকে কিসে যেন টানছিল, আর এরই মধ্যে দেখলাম উপর হতে শান্তি আর আলো নামছিল। প্রথমে ভয় পেলেও দৃঢ়ভাবে বললাম যে আমার মধ্যে মা আছেন, আমাকে এরা কিছুই করতে পারবে না। কিছু পরে দেখলাম সব চলে গেছে।

উ: হ্যাঁ, এই রকমই করতে হয়, দৃঢ় হয়ে থাকতে হয় — তা হলে নিম্নপ্রকৃতির আক্রমণ সহজে এড়ান যায়।

*

নঃ মা, আমি কেন এখনও কাজ করতে করতে, পড়তে গিয়ে তোমাকে খানিকক্ষণের জন্য ভুলে যাই?

উঃ পড়ার সময়, কাজ করার সময় মাকে স্মরণ করা সহজ নয় — মন কাজ বা পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ভুলে যায়। চেষ্টা করতে করতে স্মরণ করার অভ্যাস হয়ে যায়।

*

নঃ মাঝে মাঝে শরীর যখন শান্তভাবে বিশ্রাম করে, দেখি ও অনুভব করি সত্তার সমস্ত অংশ তোমাকে সমর্পিত হচ্ছে এবং সুন্দরভাবে সবকিছু তোমাময় হয়ে উঠছে। জোর করে নিজেকে বাহিরের দিকে ও কাজের দিকে নিয়ে গেলে এই সুন্দর অবস্থা কেমন যেন নষ্ট হয়ে যায়।

উঃ চেতনার খুব উন্নতির লক্ষণ — শেষে কাজের সময়ে এই মাময় চেতনা সম্পূর্ণরূপে থাকে, কিন্তু এখন জোর [করে] কাজের দিকে turn করা দরকার নাই।

*

নঃ বর্তমানে আমার ঘুম যেন শান্ত আলোকিত এবং সচেতন হয়েছে। মনে হয় যেন আমি আলো আর শান্তির মধ্যে ঘুমোচ্ছি।

উঃ এই ঘুমের অবস্থা বড়ই ভাল। ঘুম এইরূপই সচেতন হওয়া চাই।

এই সকল অনুভূতি বেশ — দিন দিন সাধনার উন্নতি হচ্ছে।

*

নঃ মা, মাঝে মাঝে তোমার ভাব দেখে মনে হয় তুমি আমাকে দেখে হাসনি কারণ আমার মধ্যে কিছু উন্নতি হয় নি। আমার ভিতরে হয়ত সব খারাপ জিনিস আছে।

উঃ এটাই আমি বারণ করেছিলাম কারণ এই হচ্ছে মনের কল্পনা। প্রথম কথা, সাধকরা কেবলই ভুল দেখে মায়ের সম্বন্ধে — দ্বিতীয় কথা, সাধকদের ভাল অবস্থা বা খারাপ অবস্থার সঙ্গে মায়ের হাসি বা গম্ভীর হওয়ার কোন সম্বন্ধ নাই। তারপর এই সব কল্পনার মধ্যে প্রাণের দাবী মেশা আছে। সেজন্য নিরাশা কান্নাকাটি ইত্যাদি আসে ওসব নিয়ে। সেই জন্য এই সব কল্পনা বা নিরর্থক অনুমান করতে নাই।

*

নঃ আমার ভিতরে সব সময় যেন একটি অগ্নি জ্বলছে ও বেদনার মত কি হচ্ছে, আর আমার কিছু ভাল লাগছে না।

উঃ এই রকম জ্বালা ও ভাল না লাগা অশান্ত প্রাণের লক্ষণ, একে আশ্রয় দিতে নাই।

*

Sex impulse মনুষ্য স্বভাবের একটী প্রবল অংশ সেজন্য বার বার আসে। কোন রকম সহি না দিয়ে (মনের কল্পনায় ইত্যাদি) অবিচলিত হয়ে এ আর আমার নয় বলে প্রত্যাখ্যান করলে, শেষে তার জোর আর থাকবে না, এলেও আর চেতনাকে স্পর্শ করতে পারবে না, তারপর তার আসাও বন্ধ হবে।

*

তোমাকে বলেছি একবার, মানুষের মধ্যে এক নয়, অনেক ব্যক্তি আছে many persons in one being — সকলেই বিভিন্ন। তবে central being যদি সাধনা করে স্থিরভাবে, সকলে শেষে মায়ের বশে আসে।

*

যেমন দৃশ্য তেমনই লেখা দেখা যায় ধ্যানে — এমনকি খোলা চোখ দিয়ে দেখা যায়। ইহাকে লিপি বা আকাশলিপি বলে।

*

নঃ মা, তোমার নিকট যাহা দরকার মনে হয় তা লিখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তুমি দিলে তা নির্ভয়ে গ্রহণ করতে পারি না। অথচ না দিলে দুঃখ হয়।

উঃ যদি না দিলে দুঃখ করে, তাতে প্রমাণ হয় যে চাওয়ার মধ্যে বাসনা ছিল। বাসনাশূন্য হতে হয় সাধককে।

*

বাধা যতই হৌক, সাধনা নষ্ট হতে পারে না — এখানে হৌক বা অন্যত্র হৌক সাধনা করতে গেলেই বাধা উঠে কারণ প্রকৃতির রূপান্তর করতে হয়, সে রূপান্তরের চেষ্টার ফলে সব উঠে দেখা দেয় পুরাতন প্রকৃতির যত জিনিস, সাধক

তাতে ভীত হয় না, মায়ের শক্তির সাহায্যে সব রূপান্তরিত করে দেয়।

*

ন: দেখছি যে উপর হতে খুব মধুময় গাঢ়তম শান্তি আধারের একটী স্তরে নামছে।

উ: এই শান্তিকে সর্ব্বত্র নামাতে হয় — যেন সমস্ত শরীর চিরশান্তিতে ভরে যায়।

*

ন: ... মাথার উপর দেখি একটি আলোকময় চক্রের মত কি ঘুরতে থাকে, মা। ইহা কি?

উ: আলোকময় চক্র ঘোরার অর্থ উপরের আলোর শক্তি কাজ কর্চ্ছে মনের উপরে।

*

পাঁচ বৎসর ত কিছুই নয় — বড় বড় যোগী ত ওর চেয়ে খুব বেশী সময় চেষ্টা করে ভগবানকেও পান নাই, রূপান্তরও পান নাই — এর জন্য চিৎকার করা ও যোগসাধনা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব বলা এমন দাবী ও অহংকার করা উচিত নয়। শান্ত হয়ে ধৈর্য্য ধরে সাধনা কর — যদি বিশেষ কোন গুরুতর স্খলন হয়, সেটা ফুল্লভাবে মাকে বলে দাও আর সাহায্য চেয়ে নাও। সাধারণ বাধা ত সকলেরই আছে, তার জন্য ভিতরে ভিতরে মাকে ডেকে থাক, শেষে ফল হবে। কিন্তু এ সব নিরাশার কথা ও কিছু হল না, কিছু হল না ইত্যাদি বুলি ছেড়ে দাও।

*

এ ঔষধ খেয়ে কাহারও কখন বমি হয় নি — তোমার nervous mindএর কল্পনা বড় প্রবল বলে বোধ হয় শরীরের উপর এই ফল হয়েছে। তবে যদি ঔষধের উপর এত ঘৃণা থাকে, খেয়ে কোন লাভ নাই। ওমনই যা হয় forceর দ্বারা — শরীরকে খুলতে হবে Forceর কাছে।

*

নঃ মা, আমি কাপড় বড় বেশী তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলি। ছোটবেলাতেও এরূপ হত, সেজন্য আমার মা-বাবা খুব বিরক্ত হতেন।

উঃ ইহা, শরীরচেতনা শান্ত স্থির হয়ে গেলে, শুধরে যাবার কথা।

*

নঃ মা, আমি মশারী ছাড়া আনন্দে ঘুমাতে পারি, আমাকে মশা কামড়ায় না। আমি আর যা অদরকারী তা ব্যবহার করব না, তোমার শ্রীচরণে আমার মশারীটা আর দুইখানা ক্ষুদ্র জিনিষ অর্পণ করলাম।

উঃ এগুলো কেন দিয়েছ? মায়ের দরকার নাই, তোমার আছে। মশা গরমের সময় তত কামড়ায় না — কিন্তু বর্ষার পরে আবার আসবে। মা এ সব ফিরিয়ে দিচ্ছেন, মায়ের দান বলে গ্রহণ কর। মাকে কিছু দিতে হলে নিজেকে দাও, মা সানন্দে গ্রহণ করবেন।

*

Very good. অশুদ্ধ যা আছে, শান্ত হয়ে মায়ের শক্তির আগুনে দিয়ে দাও। উপরের সব আধারে নামুক — শেষে নীচের কিছুর জন্য জায়গা আর থাকবে না।

*

নঃ কেন এত নেমে গিয়েছিলাম? মনে হয় সমস্ত কিছুকে তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করতে যাতে তারা তোমার জগৎ হতে সমূলে ধ্বংস হয়। হে ভগবান, ইহা কি কল্পনা?

উঃ ইহা কল্পনা নয়। নিম্নে যাওয়ার উদ্দেশ্যই এই, নীচে যাসব আছে সমর্পণ করা, আলোকিত রূপান্তরিত করা।

*

নঃ মাঝে মাঝে মাথায় কেমন কেমন অনুভব হচ্ছে: কোন সময় অবশ এবং শান্ত, আর কোন সময় শিন্ শিন্ করে এবং তা হতে কি যেন ঊর্দ্ধের দিকে উঠে যায়, আর কোন সময় মনে হয় উপর হতে কি নেমে খুলছে।

উঃ উপর থেকে শক্তি মাথায় নামায় কখন কখন এইরূপ অনুভব হয়।

*

নঃ খুব ঊর্দ্ধে একটি তরঙ্গহীন প্রশান্ত মহাসাগর দেখছি। সে সাগরটি যেন অনন্তের সাথে যুক্ত হয়ে এক খানা স্বর্ণ তরণীকে বুকে করে নিম্নের দিকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

উঃ ঊর্দ্ধচৈতন্যের স্রোত নামবার লক্ষণ।

*

নঃ উপর হতে সূর্য্যের মত আর নীল আলোর মত দুই আলো গোল হয়ে শুধু হৃদয়ের মধ্যে নামছে।

উঃ অর্থ এই, সত্যের আলো ও ঊর্দ্ধমনের আলো আবার নামছে।

*

নঃ মা, আমার চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা দেখছি। মনে হয় আমি সব বাধাকে খুঁজে বার করে দৃঢ় হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাদের জয় করতে চাচ্ছি বলে বাধা এমনভাবে দেখা দিচ্ছে। আমার অনুভূতি কি সত্য?

উঃ তোমার অনুভূতি সত্য। বাধাকে ভয় করো না — সব দেখে সব জেনে সরিয়ে দিতে হয়, সে জন্যে দেখা দিচ্ছে।

*

শরীরচেতনার বহির্ম্মনই সাধনার এই stageএ বিশেষ বাধা দেয়, সে বড়ই obstinate, ছাড়ে না — সাধককে তার চেয়েও obstinate হতে হয়, ধীর স্থির, মাকে ভিতরে পাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেষে হাজার obstinate হৌক, এই মন আর পারবে না, পথে আসবেই।

*

নঃ শুনলাম, কে আমাকে বলছে, ‟তুমি, তোমার ভিতরে মনে প্রাণে দেহে যেসব বাধা আছে তাদেরকে রূপান্তরিত করে অথবা দূর করে তবে নূতন জন্ম নিয়ে মার কাছে যেতে পারবে।” মা, ইহা কি সত্য?

উঃ এ সব কথা সত্য, সকল সাধকের পক্ষে খাটে। তবে এ সব বাধার মধ্যে, দীর্ঘ পরিবর্ত্তনের ক্রমের মধ্যে মা যে সর্ব্বদা কাছে রয়েছে, সাহায্য করছে — এ কথা মনে রাখতে হবে, তা হলে শান্ত মনে নিরাপদে পথে চলা সহজ হবে।

*

ন: অনুভব করছি যে মন প্রাণ চেতনা ভিতরে না থেকে বাহিরের দিকে চলে যাচ্ছে।

উ: ইহা সকলেরই হয়। অনেক এগিয়ে গেলে সাধনার পথে, তার পরে ভিতর বাহির এক হয়ে যায়, তখন আর হয় না।

*

ন: মাঝে মাঝে যখন করুণাময়ী মাকে অনুভব করি ও ডাকি, তখন প্রবল বেগে কান্না আসে আর তার সাথে সাথে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে একটি মধুময় ও শান্তিময় জিনিষ অনুভব করি।

উ: এইরকম কান্না প্রায়ই psychic being থেকে আসে — যে চিন্তা আসে তার সঙ্গে, সে psychic beingএর চিন্তা।

*

স্থির ভাবে সাধনা করে চল — বাধাগুলো সময়ে খসে যাবে।

*

ন: মা, আমি এখন কেবল শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়ে রয়েছি। ভিতরে তোমাদের জন্য কিছু নাই বলে মনে হচ্ছে। এত নিম্নে কেন পড়ে গেলাম?

উ: সাধনায় চেতনা ওঠা নামা অনিবার্য্য — যখন নামে, তখন বিচলিত না হয়ে ধৈর্য্য ধরে মায়ের আলো শক্তি সে শুষ্ক অংশে ডেকে আনতে হয় — ইহাই হচ্ছে right attitude ও উৎকৃষ্ট উপায়।

*

ন: মা, আমার প্রাণজগতের একটি শক্তিকে উপর হতে আর একটি শক্তি এসে তোমাদের শ্রীচরণে বলি দিল। কিছুক্ষণ পরে এই বলির রক্তের মধ্যে দেখি পদ্মফুল ফুটল।

উ: অর্থ — নিম্ন প্রকৃতির একটী শক্তির বিনাশ হয়ে প্রাণের এক ভাগে সত্য চেতনা খুলে গেল।

*

এখন বোঝা যায় যে তোমার অসুখ nervous, কারণ এই সব sensation nervous ছাড়া কিছুই নয়। এই বমির suggestion তাড়িয়ে দাও — যখন এ সব sensation আসে তখন শান্ত হয়ে থাক, মাকে ডেকে যাও শ্রদ্ধার সহিত। Suggestionএর জোর কমে গেলেই অসুখটা সেরে যাবে।

*

যখন কোন বাধাকে বের করবার চেষ্টা চলছে, ও রকমই হয় — একদিন সব মুক্ত হয়, বোধ হয় যেন সব চলে গেছে, পরদিন আবার সে বাধা দেখা দেয়। Persevere করলে শেষে বাধাটা দুর্ব্বল হয়ে আর আসে না, যদি বা আসে তার কোন জোর থাকে না।

*

ন: মা, বর্ত্তমানে আমি অন্য জিনিসের চেয়ে বাণী কেন বেশী শুনতে পাচ্ছি, এবং লিপি কেন বেশী দেখতে পাচ্ছি?

উ: সাধনার গতির বেগ বাড়তে বাড়তে এই সব আসে। তবে খুব সাবধান হয়ে লিপি ও বাণীকে দেখে লও ও শুনে লও — কারণ এগুলো সত্য ও উপকারী হতে পারে, মিথ্যা ও বিপজ্জনক হতে পারে।

*

ন: যখন ক, খ ইত্যাদির সঙ্গে কথা বলি, শরীর দুর্ব্বল লাগে, ভিতরে অশান্তি অস্বস্তি বোধ হয়, মাথা ধরে, কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু দ, স ইত্যাদির সঙ্গে কথা বললে কখনও এরকম হয় না। কেন, মা?

উ: যখন মেশা হয় ও কথা বলা হয়, তখন সে লোকের চেতনার vibrations তোমার উপর পড়ে। দুজনে মেলামেশা কথাবার্ত্তা বেশী করলেই সেই রকম হয়, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কেহ কিছু বোধ করে না, conscious effectও হয় না বা যদি হয় তা লোকে টের পায় না যে এর জন্য হয়েছে। কিন্তু যখন সাধনা করে চেতনা সজাগ হয় ও sensitive হয়, তখন feel করা যায় আর এরকম ফলও হয়। যাদের চেতনার সঙ্গে তোমার চেতনার মিল হয়, তাদের সঙ্গে করলে কিছু হয় না, কিন্তু যেখানে চেতনার মিল নাই অথবা সে লোকের মধ্যে খারাপ ভাব থাকে তোমার উপর তখন এরকম effect হতে পারে।

*

এ হচ্ছে পুরান vital প্রকৃতি যে একটা দাবীর ভাব নিয়ে ওঠে, কই আমি যা চাই তা আমি পাই না এই ভাব। এই ভাব থেকে যত কল্পনা ওঠে — মা আমাকে দূরে রাখে, ভালবাসে না ইত্যাদি। এ যখন ওঠে, তখন বুঝাতে হবে, প্রত্যাখ্যান করতে হবে, psychic এ সব চায় না। শুধু মাকে ভালবাসতে চায়, জানে যে মাকে ভালবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি দিলে সব হয়। গভীরে psychicএর মধ্য থাকতে হয় সব সময়।

*

নঃ আমি প্রায় সব সময়ই আমার সামনে একটি সোজা পথ দেখতে পাই। কে যেন ভিতর হতে বলে, ‟সব কিছু দূরে ফেলে, কিছুর দিকে লক্ষ্য না করে শুধু মা মা বলে এগিয়ে যাও — মা নিয়ে যাবেন।”

উঃ এটাই সত্য পথ — সে পথে বাধা ইত্যাদি এলে তাতে disturbed হয় না, মাই এই সব শুধরিয়ে নেবেন, আমার ভয় বা দুঃখ করবার কিছুই নাই এই বলে সোজা পথে এগিয়ে যায়।

*

কি করা যায়, ‟স”র বৃদ্ধ বয়স, স্বভাবের পরিবর্ত্তন সহজে হয় না। তার সঙ্গে patient হয়ে যতদূর possible কাজ করতে হয়। যে দিন psychic atmosphere সর্ব্বত্র স্থাপিত হবে, সে দিনই এই সব আর হবে না।

*

তুমি কি green কলা খেয়েছিলে? যাদের পিত্ত আছে, তাদের পক্ষে এগুলো ভাল নয়। খেলে বমির ভাব হয়। এইগুলো খেতে নাই।

আজকে কি হয়, তা দেখে আমাকে জানাও তারপরে বলব খাবে বা বন্ধ করতে হবে কি বদলাতে হবে।

*

যে রকমই হয় ধ্যানে কর্ম্মে বা ওমনি বসলে মায়ের চৈতন্য মায়ের শক্তি আধারে নামা ও কাজ করাই আসল — যে ভাবে, যে উপায়েই হৌক।

*

নঃ এখানে দেখছি সাধক সাধিকাদের মধ্যে হিংসা ও পরের সম্বন্ধে নিন্দা করা স্বভাব খুব আছে।

উঃ তুমি যা বলছ তা সত্য — মানুষের মন প্রায় এই সব দোষে পূর্ণ — সাধকরা এখনও এইসব ক্ষুদ্রতা মন প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় না, ইহাতে মায়ের কাজের অনেক বিঘ্ন আসে। তবে তুমি এই সব দেখে বিচলিত হয়ো না — নিজেকে এই সব... থেকে স্বতন্ত্র রেখে সকলের কল্যাণেচ্ছা করে নিজের সাধনা শান্ত মনে কর।

*

হ্রদের অর্থ — চেতনায় এমন একটী স্থায়ী স্রোত যাতে ঊর্দ্ধ্ব স্তর ও physicalএর সম্বন্ধ হয় — এই রকম সম্বন্ধ থাকলে ঊর্দ্ধ্ব স্তরের আলো physicalএ নামতে পারে।

*

যদি তাতে ভিতরের চৈতন্য হারানো না যায়, তা হলে বিশেষ ক্ষতি নাই। যা কর, তার মধ্যে সচেতন থেকে মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা চাই, ইহাই আসল।

*

তুমি আমার কথা ভুল বুঝেছ — আমি লিখেছিলাম দুইরকম অহংকার আছে — একটী হচ্ছে রাজসিক অহংকার যে মনে করে আমি শক্তিমান আমার দ্বারাই সব হচ্ছে — আর একটী আছে ঠিক উল্টো — তামসিক অহংকার যে মনে করে আমি সকলের চেয়ে খারাপ ইত্যাদি যেমন তুমি বার বার বলছ "আমার মত খারাপ আর কেউ নাই আশ্রমে।" তার উপর যদি বল "আমার জন্য সব বন্ধ হয়েছে আমারই বাধায় আশ্রমের এই অবস্থা।" তবে এইটী যে শেষোক্ত তামসিক অহংকার ছাড়া আর কি হতে পারে?

*

আগে যে অবস্থা ছিল, যা পেয়েছিলে, সে সব নষ্ট হয় নি, নষ্ট হবারও নয়, কিন্তু তোমার অশান্তিতে ও অসাবধানতায় ঢাকা পড়েছিল। শান্ত ও সচেতন হলেই

সব ফিরে আসে। তাহাই এখন হচ্ছে। এখন আগেকার মতন সাধনা কর — আবার দ্রুত উন্নতি হবে।

*

যখন ঊর্দ্ধ্ব চেতনাময় অবস্থার বদলে নিম্ন চেতনার অবস্থা আসে — এ রকম ত সকল সাধকের হয় — তখন নিজেকে quiet রেখে মায়ের শক্তিকে ডাকতে হয় আর নিজেকে খুলে দিতে হয় যতক্ষণ ঊর্দ্ধ্ব অবস্থা ফিরে না আসে। নিম্ন অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না, ভাল অবস্থা ফিরবেই। এ রকম করলে প্রত্যেক বার নিম্ন প্রকৃতির কতকটা উন্নতি হয়, এক অংশ — যা আগে খোলা ছিল না — খুলে যায় — শেষে সব খুলে থাকবে আর সব ঊর্দ্ধ্ব চেতনাময় অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে।

*

মা তোমাকে ছেড়ে দেন নাই, ছাড়বেনও না। চেতনা শরীরচেতনায় নেমেছে বলে এ বাধা দাঁড়িয়ে গিয়েছে, অনেকের হয়েছে। এ ত চিরস্থায়ী নয় — ধৈর্য্য রেখে চল বাধার মধ্যেও — ভাল অবস্থা আসবে।

*

'ত'র সম্বন্ধে আমি তোমাকে প্রথম থেকেই সতর্ক করেছিলাম আর এ সবেতে প্রবেশ না করে মায়ের কাজ মায়েরই জন্য করতে বলেছিলাম, তুমিও তাহাতে সম্মত হয়েছিলে। তা ছাড়া এই সব সহ্য না করিতে শিখলে সাধকের উচিত সমতা কোত্থেকে আসবে? অপ্রিয় ব্যবহার, অপ্রিয় কথা, অপ্রিয় ঘটনা এই সকলই সাধককে ভগবানের একনিষ্ঠ ও জগতের সব ঘটনায় অবিচল হবার opportunity করে দেয়। আর সব যা লিখেছ, তার উপায় কান্না নয়, উপায় নিজের psychic beingএ বাস করে মায়ের শক্তির উপর নির্ভর করে অগ্রসর হওয়া, যাতে সব বাধা, সব অপূর্ণতা quietly কমে যাবে, বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমার ভাল অবস্থা ফিরেছে শুনে সুখী হলাম, সে অবস্থা যেন অচল হয়ে থাকুক।

*

Vitalএর গোলমাল যখন আর হবে না, physicalএ যখন শান্তি পুরোভাবে

সব সময় থাকবে, এই সব শরীরের গলদ আর থাকবে না।

*

ন: আজ কদিন নিম্ন প্রকৃতি হতে অসংখ্য বাধা এসে গ্রাস ও অধিকার করতে চাইছে। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যেও আমার হৃদয়ে তোমার স্মৃতি ও তোমার কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা এবং তোমার জন্য প্রেম অনুভব করছি।

উ: বাধার মধ্যেও [যদি] সেই ভাব সেই স্মৃতি রাখতে পার, তা হলে লেশমাত্র ভাবনার কারণ নাই, তাতেই শেষে সব বাধাকে অতিক্রম করে মায়ের চৈতন্যের মধ্যে স্থায়ীভাবে নিবাস করবে।

*

এ সব ত প্রাণের তামসিক কল্পনা, নিম্ন প্রকৃতির suggestion। বিরুদ্ধ শক্তিও এ সব অযোগ্যতার মরণের idea suggest করে নিরাশা ও দুর্ব্বলতা আনবার জন্য। এই সব suggestionকে কখন ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে নাই।

*

Sex-impulse কি ভাবে উঠছে? সাধারণভাবে না কারও উপর আকর্ষণ। যা উঠুক না কেন, তাকে আশ্রয় না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে মাকে ডাক, মায়ের শক্তিকে আধারে ডেকে নামিয়ে দাও — আবার সত্য চৈতন্য এসে শরীরে স্থাপিত হবে।

*

ন: ...মাথার উপর হতে কিছুর অবতরণ ও চাপ অনুভব করি, তখন মাথা কামড়ায় কেন?

উ: সে মাথা কামড়ান গ্রাহ্য করতে নেই। উপরের জিনিষ নামতে নামতে সেরে যায়।

*

ন: মা, গতকাল স্বপ্নে আমার পার্থিব মাকে দেখেছি। সে বলল, "মাকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে দিয়ে সাধনা কর, আমি তোকে আর বাধা দেব না। তুই মাকে পেলে আমি মুক্তি পাব।"

উ: এই সব স্বপ্নে পার্থিব মা আসে physical natureএর প্রতীক হয়ে। যে এই সব কথা বলছিল, সে ছিল তোমার পার্থিব মা নয়, পার্থিব মার রূপ গ্রহণ করে পার্থিব প্রকৃতি।

*

ন: আজ হতে আমি ধৈর্য্যহীন অশান্ত অধীর হব না ও বাধা দেখে ভয় করব না... এখন যতই বাধা আসুক শান্তভাবে গভীর বিশ্বাসে তোমার দিকে আসব ও তাদেরকে তোমার পায়ে দিয়ে দেব।

উ: ইহাই right attitude। সর্ব্বদা এই attitude রাখতে হয়, তাহলে মায়ের শক্তি ভিতরে ভিতরে সহজে কাজ করতে পারবে এই অবচেতনার ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করবার জন্য।

*

ন: মা, আমি তাকে [একটি খুব শান্ত ভাব] অনুভব করছি কিন্তু চোখে দেখছি না। সে অরূপে কেন থাকছে?

উ: শান্তির কাজ প্রায় অরূপেই হয়।

*

ন: আমি মাঝে মাঝে নিজের চেতনা কেন হারিয়ে ফেলি? ইহা খারাপ না ভাল? কোন কিছু করতে করতে দেখি যে চেতনাটা হঠাৎ কোথায় চলে গেছে, আবার আপনা আপনি ফিরে আসে।

উ: চেতনা যখন ভিতরে যায় তখন ঐ রকম হয়। খারাপ নয়, তবে কাজের সময় বেশী গভীরে না যাওয়া ভাল।

*

ন: মা, আমার মধ্যে একটি ভাব আছে যে তুমি আমাকে বড় বড় সাধক-সাধিকার মত ভালবাস না, দেখ না, চাও না, ও তোমার করে নিচ্ছ না...।

উ: যা দেখছ তা সত্যই। শুধু তোমার নাই, আশ্রমময় এই ভাব রয়েছে, অনেকের সাধনার বিষম বাধা সৃষ্টি কর্চ্ছে। এর মধ্যে আছে তামসিক অহঙ্কার ও ক্ষুদ্র vitalএর দাবী। এ ভাবকে কখনও স্থান দিয়ো না। যে মাকে কিছু না

চেয়ে নিজেকে দেয়, সে মাকে সম্পূর্ণভাবে পায়, মাকে পেলে সবই পাওয়া যায়, ভাগবত চৈতন্য, শান্তি, বিশালতা, ভাগবত জ্ঞান ও প্রেম ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষুদ্র দাবী করতে গেলে, শুধু বাধাই সৃষ্টি হয়।

*

ন: দু'তিন দিন যাবৎ আমার মাথাধরা হয়েছে...। মাথার উপর আগের মত বড় একটি কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে, আর এখন মাথা হতে সমস্ত শরীরে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

উ: হয় ত এই "বড় কিছুর" অবতরণে শরীরে একটু difficulty আছে, সেই জন্য এই মাথা ধরা। তা যদি হয় মনকে খুব শান্ত ও wide করে খুলে দিলে সেই difficulty চলে যায়।

*

ইহাই চাই — সমস্ত স্তরে psychic beingএর প্রভাব ও আধিপত্য।

*

এটাও কতবার বলেছি — শান্ত হয়ে ভিতরে থাক — যে সময়ই সত্য চেতনা আসে, এই সব চঞ্চলতা সত্যকে দূর করে, কেবলই মিথ্যা নিরাশা ইত্যাদি আসে। মায়ের উপর নির্ভর করে শান্ত ধীর চিত্তে থাক, বাধা সকলের হয়, বাধা সত্ত্বেও স্থির হয়ে পথে এগুতে হয়।

*

একটা আবরণ এখনও আছে — সম্পূর্ণ শক্তি এখনও নামতে পারে। তাছাড়া অনেক সাধকের আধ ঘুমন্ত অবস্থা — পুরো জাগতে চায় না।

*

হতাশ হতে নেই ও দুঃখ কান্না করতে নেই। শান্ত হয়ে দেখ এবং স্থির শান্ত হয়ে [দোষ-ত্রুটি] শুধরে লও।

*

ন: আজ দেখছি যে উপর হতে একটি চক্র নাভির নীচের অংশে নামছে।

উ: অর্থ শক্তির working lower vitalএ নেমে এসেছে।

*

'ক'র সঙ্গে দেখা হবার ফলে তোমার জাগ্রত মনের উপর নয় কিন্তু অবচেতনায় যে সব পুরোনো ঘটনার ছাপ রয়েছে — তার উপর স্পর্শ পড়েছিল, যে জন্য রাত্রে এই স্বপ্ন। এই সব অবচেতনার পুরোনো ছাপ ও স্মৃতি স্বপ্নে প্রায়ই ওঠে, তাতে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। এই সব ছাপ আস্তে আস্তে একেবারে মুছে যাবে — তখন আর এই রকম হবে না।

*

ন: মা, এখন একটু বেশী কথা বললে মাথা ঘোরে এবং মাথা কাঁপতে থাকে আর আমি শেষে দুর্ব্বল ও একটু চঞ্চল হয়ে পড়ি।

উ: এই সব না থাকা ভাল — যেমন ভিতরে শান্ত হয়ে থাকা, তেমন শরীরেও সব শান্ত সুখময় অচঞ্চল থাকা চাই। Peace in the cells, শরীরের অণু পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে, এই মাথা ঘোরা ইত্যাদি আর থাকবে না।

*

ন: কাজের কথা বলতে বলতে অনেক অনাবশ্যক কথা বলে ফেলি। তারপর দেখি যে এতে আমার ভিতরের শান্ত ও গম্ভীরভাব নষ্ট হয়ে যায়।

উ: ভিতরে থেকেই, সেখান হতে সচেতন হয়ে কথা বলা — ইহাই চাই। এ অভ্যাস দৃঢ় হলে আর এ বাধা থাকবে না।

*

ও বাড়ীতে যে একটী disturbance in the atmosphere আছে, তাহা সত্য — কিন্তু বাহির থেকে হৌক বা ভিতর থেকে হৌক সব disturbanceএ ধীর ভাবে দৃঢ়তার সহিত মায়ের উপর নির্ভর করলে কোন Force কিছুই করতে পারবে না।

*

Very good. মায়ের জয় হবেই এই বিশ্বাস সব সময় রেখে শান্ত ধীর ভয়শূন্য হয়ে সাধনা করতে হয়।

*

বাধা আসে মায়ের শক্তি নেমে বাধাকে বিনষ্ট করবে বলে। নিম্ন প্রকৃতিতে নেমে যাও সে প্রকৃতিকে মায়ের আলো শান্তি শক্তিতে ভরে দিয়ে রূপান্তরিত করবার জন্য।

*

ইহাই ঠিক জ্ঞান — মূলাধার হচ্ছে শরীরচেতনার কেন্দ্র, সেখানে sex impulseএর স্থান, সেখানে মায়ের রাজ্য স্থাপন করতে হবে।

*

নঃ ...দেখছি সত্যের, জ্ঞানের, শান্তির, চেতনার, পবিত্রতার সিঁড়ির মত কি নেমে এসেছে; তা দিয়ে মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধে যেন উঠে যাই এবং সেখানে অনেক বালিকার সাথে আমার মিলন হয়।

উঃ যে বালিকাদের কথা লিখেছ তারা মায়ের শক্তি নানা স্তরে। তোমার অভিজ্ঞতাগুলি বেশ ভাল — অবস্থাও ভাল — সাধনা ভাল চলছে — বাধাগুলো আসে বহিঃপ্রকৃতি থেকে অবস্থা disturb করবার জন্য — গ্রহণ করো না।

*

দুটী অগ্নি, মনের শান্ত ও প্রাণের তীব্র aspiration উঠে যায় — তার ফলে ঊর্দ্ধে চৈতন্যের জ্যোতির্ম্ময় আলো নামে।

*

নঃ ...গলা হতে বাম হাত পর্য্যন্ত যেন কিছু হয়েছে ও হচ্ছে... feel করেছি যে এইটুকু অংশ ঝিন্ ঝিন্ করে শান্ত হয়ে অবশ হয়ে যাচ্ছে আর প্রত্যেক লোমকূপের মধ্যে নীল আলোকের মত বিন্দু বিন্দু কি পড়ছে।

উঃ ঊর্দ্ধ চৈতন্যই নামছে। গলায় আছে বহির্দ্দর্শী বুদ্ধির কেন্দ্র, বাহু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের একটী স্থান — গলা কাঁধ বাহু বুকের উপরি অংশ (হৃদয়ের উপরে) কর্ম্মোন্মুখ

vital mindএর জায়গা। সেখানে উপরের Force বিস্তার হচ্ছে।

*

সাদা জবা — মায়ের শুদ্ধ শক্তি।

*

ন: মা, সিঁড়ি দিয়ে প্রণাম hallএ নামবার সময় আমি অনুভব করি যে তুমি উপর হতে আমার মধ্যেই নেমে আসছ। আর মাঝে মাঝে অনুভব করি যে তোমার stepএ আমার মধ্যে পদ্মফুল ফুটছে।

উ: ইহা সত্য অনুভব। মা তখন তোমার মধ্যে নেমে চেতনা (পদ্ম)কে ফুটিয়ে দেয়।

*

শান্তি নামা ভালই — সমস্ত ভিতরে ও বাহিরে গাঢ় হয়ে নামুক।

*

ন: অহংকার, বাসনা, কামনা, দাবী, হিংসা, গর্ব্ব, আসক্তি, অচৈতন্যতা কোথা হতে আসে? তাদের স্থান কোথায়? মা, এইসব কখন এবং কেমন করে পরিপূর্ণভাবে দূর হবে?

উ: তাদের স্থান ভিতরে কোথাও নাই — বহিঃপ্রকৃতি থেকে আসে। তবে যখন মানুষে স্থান পেয়েছে, তখন তারা প্রাণভূমিকে দখল করে বসে রয়েছে, যেন অতিথি আহূত হয়ে বাড়ীকে দখল করে বসে ফেলে। যোগসাধনা দ্বারা আমরা তাদের বাহির করি, তখন বাহিরে রয়ে আবার দখল করবার চেষ্টায় থাকে — যতদিন তারা বিনষ্ট না হয়।

*

Physical consciousnessএর পুরাতন অভ্যাস এমন সাধারণ চৈতন্যে নামা সকলের সহজে হয়ে যায়। তার জন্য দুঃখ করো না, স্থির হয়ে আবার ঊর্দ্ধ্ব চৈতন্যে ফিরে যাও। সে ফিরে যাওয়া এখন আগেকার চেয়ে সহজ হয়েছে।

*

...সকলের বহিঃসত্তায় এইরূপ জন্মলব্ধ অন্ধকারময় অংশ আছে। তা নিজেদের নয়, বংশের। এইটী নূতন করে গড়তে হয়।

*

It is very good — যা দেখেছ বুঝেছ তা সত্য। যে ভিতরে পথ দেখেছ, তাতেই চলতে হবে, যে ভিতরের অবস্থা লক্ষ্য করেছ তাহাই রাখতে হবে। বাহিরের যা তা দেখে নেবে, যা দরকার তাই করে নেবে কিন্তু তাতে মজবে না, যুক্ত হবে না, বাসনা করবে না। এই অবস্থা যদি কেহ রাখতে পারে, তবেই সে সাধনপথে শীঘ্র এগোয়, বাধা বিঘ্ন ইত্যাদি এলেও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না — তার বহিঃপ্রকৃতিও আস্তে আস্তে অন্তর প্রকৃতির সুন্দর অবস্থা পাবে।

*

ন: কেহ আমাকে ‘‘ন’’ বলে চিনতে পারছে না, ‘‘ন’’ বললে সকলে অবাক হয়ে যায়। মা, কালকে এমন স্বপ্নে যেন সারারাত চলে গেছে। সকালে জাগবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত এর প্রেসার দেহে পর্য্যন্ত feel করছিলাম।

উ: স্বপ্নের অর্থ ছিল পুরোনো দেহস্বভাবের মৃত্যু আর দেহচৈতন্যে নবজন্ম লাভ।

*

...প্রাণ সমর্পিত হলে আর সব সমর্পণ করার বিশেষ বাধা হয় না।

*

যে সব অমিল হয় ‘ক’র সঙ্গে বা ‘খ’র সঙ্গে সে তাদের মানব প্রকৃতির natural movementএর ফল, psychic পরিবর্ত্তন ছাড়া তার কোন উপায় নাই। এই সবকে ভিতরের একটী শান্ত সমতার ভূমি থেকে দেখে অবিচলিত ভাবে observe করা শিখতে হবে। মানব প্রকৃতি সহজে বদলায় না — ভিতরে যাদের psychic জাগরণ ও অধ্যাত্ম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাদেরও পথে এই প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা, রূপান্তরিত করা সহজ নয়। এদের কাছে যারা এখনও ভিতরে কাঁচা তাহা এখন করা অসম্ভব।

*

মাকে সর্ব্বদা স্মরণ কর, মাকে ডাক, তাহলে বাধা চলে যাবে। বাধাকে ভয় করো না, বিচলিত হয়ো না — স্থির হয়ে মাকে ডাক।

*

বাধা অনন্ত appear করে বটে, সে appearance সত্য নয়, রাক্ষসী মায়া মাত্র — ঠিক পথে চলতে চলতে শেষে পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

*

Very good — স্থির ভাবে সাধনা করে চল — ক্রমে ক্রমে পুরাতন প্রকৃতির যা কিছু এখনও আছে আস্তে আস্তে চলে যাবে।

*

এই বাধা সকলেরই আছে। প্রতি মুহূর্ত্তে যুক্ত হওয়া সহজে হয় না। ধীরভাবে সাধনা করতে করতে হয়ে যায়।

*

মনের অনেকরকম গতি হয় যাদের কোন সামঞ্জস্য নাই। সাধকেরও হয়, সাধারণ মানুষেরও হয়, সকলেরই হয় তবে — সাধক দেখে ও জানে, সাধারণ মানুষ নিজের ভিতর কি হচ্ছে তা বোঝে না। ভগবানের দিকে সব ফিরাতে ফিরাতে এক মন হয়ে যায়।

*

মায়ের সঙ্গেই যখন ভিতরে সংযোগ হয়েছে তখন আর ভয় নাই। যা পরিবর্ত্তন করতে হয়, তা মায়ের শক্তিই করে দেবে। ওসব পরিবর্ত্তন করতে সময় লাগে কিন্তু তার জন্য ভাবনা নাই। কেবল মায়ের সঙ্গে সংযুক্ত মায়ের নিকট সমর্পিত হয়ে থাক, আর সব নিশ্চয় হবে।

*

ন: মা, আমি এখন তোমার নীরবতা শান্তি পাচ্ছি, কিন্তু তোমার চেতনা পাচ্ছি না। সব সময় চেষ্টা করি যে কোন অবস্থায় — কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তা সবসময়

তোমার সম্বন্ধে conscious হয়ে থাকতে...।

উ: প্রথম শান্তি আসে — সমস্ত আধার শান্ত না হলে জ্ঞান আসা কঠিন। শান্তি স্থাপিত হলে মায়ের বিশাল অনন্ত চৈতন্য আসে, তার মধ্যে ডুবে আমিত্ব মগ্ন হয়ে যায়, হ্রাস হয় — শেষে আর চিহ্ন থাকে না। থাকে কেবল মা ও মায়ের সনাতন অংশ ভাগবত আনন্ত্যের মধ্যে।

*

বাধা সহজে সম্পূর্ণ যায় না। খুলতে খুলতে, চেতনা বাড়তে বাড়তে শরীর-চেতনা পর্য্যন্ত যখন রূপান্তরিত হয় তখন বাধা সম্পূর্ণ চলে যায়। তার আগে কমে যাবে, বেরিয়ে যাবে, বাহিরে বাহিরে থাকবে, — তুমি বাধায় বিচলিত না হয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখ। বাধাকে নিজের বলে আর স্বীকার করো না — তা হলে তার জোর কমে যাবে।

*

প্রাণকে ধ্বংস করতে নাই, প্রাণ ভিন্ন কোন কাজ করা যায় না, জীবনও থাকে না। প্রাণকে রূপান্তর দিতে হয়। ভগবানের যন্ত্র করতে হয়।

*

নিজের ভিতরে শান্তি, মায়ের শক্তি ও আলো রেখে শান্তভাবে সব কর — তাহলে আর কিছুর দরকার নাই — সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

*

দুরকম শূন্য অবস্থা হয় — একটা physical তামসিক জড় নিশ্চেষ্টতা ভিতরে আর একটা শূন্যতা নিশ্চেষ্টতা হয় ঊর্দ্ধ চেতনার বিরাট শান্তি ও আত্মবোধ নামবার আগে। এই দুটোর মধ্যে কোনটী এসেছে তা দেখতে হবে, কারণ দুটোতেই সব থেমে যায়, ভিতরের চেতনা শূন্য হয়ে পড়ে থাকে।

*

যখন শূন্য অবস্থা হয়, তখন শান্ত হয়ে মাকে ডাক। শূন্য অবস্থা সকলেরই

হয়, তবে শান্ত শূন্য অবস্থা হলে সাধনার উপকারী হয় — অশান্ত হলে তার ফল হয় না।

*

খারাপ শক্তি ছাড়া কি এমন নীচে টানবে ও দুর্ব্বল ব্যতিব্যস্ত করে ফেলতে পারে? Atmosphereএ এইরূপ শক্তি অনেক ঘুরছে সাধকরা আশ্রয় দেয় বলে। যদি আসে তোমার উপর, মাকে ডেকে প্রত্যাখ্যান করে দাও। কিছু করতে পারবে না, টিকতে পারবে না।

*

ইহা ত মানুষ মাত্রই করে — প্রশংসায় হৃষ্ট, নিন্দায় দুঃখিত হয় — কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। তবে সাধকের পক্ষে এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করাই নিতান্ত প্রয়োজন — স্তুতিনিন্দায় মান অপমানে অবিচলিত থাকবে। কিন্তু তাহা সহজে হয় না — সময়ে হবে।

*

এই বিরাট অবস্থা মাথার যখন হয়, ওর অর্থ মন বিশাল হয়ে বিশ্বমনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। গলা ইত্যাদির বিরাট হওয়ার অর্থ — সে সে কেন্দ্রের যে চেতনা তারও সেই অবস্থা আরম্ভ হচ্ছে।

*

যদি বাসনা পোষণ কর, অধীর হয়ে যাও সাধনার ফলের জন্যে, তা হলে শান্ত নীরব কেমন করে থাকবে। মানুষের স্বভাবের রূপান্তরের মত বড় কাজ, তা কি এক মুহূর্ত্তে হয়? স্থির হয়ে মায়ের শক্তিকে কাজ করতে দাও, তা হলে সময়ে সব হয়ে যাবে।

*

আমরা দূরেও যাই নি ত্যাগও করি নি। তোমার মন প্রাণ যখন অশান্ত হয়, তখন এই সব ভুল কল্পনা তোমার মনে ওঠে। বাধাও যদি উঠে, অন্ধকারও যদি আসে, মায়ের উপর ভরসা হারাতে নেই — স্থিরভাবে তাঁকে ডাকতে

ডাকতে অচঞ্চল থাক, বাধা অন্ধকার সরে যাবে।

*

প্রণামে বা দর্শনে মায়ের বাহিরের appearance দেখে তিনি সুখী বা দুঃখিত ইহা অনুমান করা উচিত নয়। লোকে তাই ক'রে কেবলই ভুল করে, মিথ্যা অনুমান করে মা অসন্তুষ্ট, মা কঠোর, মা আমাকে চায় না, দূরে রাখছে ইত্যাদি কত মিথ্যা কল্পনা আর তাতে নিরাশ হয়ে নিজের পথের নিজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সব না করে নিজের ভিতরে মায়ের উপর, মায়ের love ও helpএর উপর অটল বিশ্বাস রেখে প্রফুল্ল শান্ত মনে সাধনায় এগুতে হয়। যারা তাহাই করে, তারা নিরাপদ থাকে — বাধা এলে অন্ধকার এলে সে তাদের স্পর্শ করতে পারে না, তারা বলে "না, মা-ই আছেন, তিনি যা করেন তাই ভাল — তাঁকে আমি এ মুহূর্ত্তে না দেখতে পেলেও আমার কাছে রয়েছেন, আমাকে ঘিরে রয়েছেন, আমার কোন ভয় নাই।" ইহাই করতে হয় — এই ভরসা রেখে সাধনা করতে হয়।

*

তামসিক সমর্পণ সাথে তামসিক অহংকারের কোন সম্বন্ধ নাই। তামসিক অহংকার মানে "আমি পাপী, আমি দুর্ব্বল, আমার কোন উন্নতি হবে না, আমার সাধনা হতে পারে না, আমি দুঃখী, ভগবান আমাকে গ্রহণ করে নি। মরণই আমার একমাত্র আশ্রয়, মা আমাকে ভালবাসেন না, আর সকলকে ভালবাসেন" ইত্যাদি ইত্যাদি ভাব। Vital nature এ রকম নিজেকে হীন দেখিয়ে নিজেকে আঘাত করে। সকলের চেয়ে খারাপ, দুঃখী দুষ্ট নিপীড়িত বলে দেখিয়ে অহং ভাবকে চরিতার্থ করতে চায় — বিপরীত ভাবে। রাজসিক অহংকার ঠিক উলটো, আমি বড় ইত্যাদি বলে নিজেকে ফাঁপিয়ে দেখাতে চায়।

*

সাদা আলো divine consciousnessএর আলো — নীল আলো higher consciousnessএর — রৌপ্যের মত আলো আধ্যাত্মিকতার আলো।

*

ইহা হচ্ছে মনের উপর ঊর্দ্ধ চৈতন্য, যেখানে থেকে আসে শান্তি শক্তি আলো ইত্যাদি — সাদা পদ্ম মায়ের চৈতন্য, লাল পদ্ম আমার চৈতন্য — সেখানে জ্ঞান ও সত্যের আলো সর্ব্বদা আছে।

*

নঃ দুই তিন দিন যাবৎ প্রায় সময়ই feel করি যে তোমার হাত আমার মাথার উপরে, তুমি আশীর্ব্বাদ করছ যেন তোমার গভীরতম শান্তিতে ও চেতনায় ডুবে থাকি। আমি সর্ব্বদাই তোমার মধুময় প্রেমময় আহ্বান শুনছি।

উঃ ইহাই সত্য চেতনার অবস্থা ও দৃষ্টি, গভীরে থাকলে বা বাহিরের চৈতন্যে এলে ইহা যদি থাকে, তা হলে সব ঠিক এগিয়ে যাবে ভাগবত উদ্দেশ্যের দিকে।

*

বহির্জ্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত থাকা চাই, কিন্তু সে সব উপরি-উপরি (on the surface) থাকা উচিত — তুমি নিজে ভিতরে মায়ের নিকট থাকবে আর সেখান থেকে ওই সব দেখবে — ইহাই চাই, ইহাই কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান — তার পর ভিতর থেকে মায়ের শক্তি দ্বারা সব বাহিরের কর্ম্ম ইত্যাদি চালিয়ে দেবে, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থা। ইহা করতে পারলে আর কোন গোলমাল থাকে না।

*

ভিতরের দিক দিয়ে প্রথম মাকে পেতে হয়। পরে বাহিরটা যখন সম্পূর্ণ বশে আসে, বাহিরেও সর্ব্বদা অনুভব করা যায়।

*

এইটী সব সময় মনে রাখতে হয় যে, যেই অবস্থা হৌক, যতই বাধা আসুক, যতই সময় লাগুক কিন্তু মায়ের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে চলতে হয়, তাহলে গন্তব্য স্থানে পঁহুচে যাওয়া অনিবার্য্য — কোনও বাধা, কোনও বিলম্ব, কোনও মন্দ অবস্থা সে শেষ সফলতাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

*

সত্য দেখা। Psychic consciousnessএর রাস্তা উপরের সত্য চেতনায়

— সেই psychicকে কেন্দ্র করে সব স্তর একভাবে ভগবানের দিকে ফিরতে আরম্ভ করেছে। সেই রাস্তা উপরের দিকে উঠছে — ছোট শিশু তোমার psychic being.

*

কমলালেবুর রংয়ের অর্থ Divineএর সঙ্গে মিলন ও অপার্থিব চেতনার স্পর্শ।

*

শান্তভাবে সাধনা করতে করতে অগ্রসর হও — দুঃখ বা নিরাশাকে স্থান দিও না — শেষে সব অন্ধকার সরে যাবে।

*

এই feeling, এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সব সময় রাখতে হয়, সাধকের এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, faith, conviction, মায়ের শক্তির প্রধান সহায়।

*

সাধনা করতে হয় দৃঢ় শান্ত মনে, মায়ের উপর অটুট শ্রদ্ধা ও নির্ভর রেখে। Depressionকে কখনও স্থান দিতে নাই। যদি আসে ত প্রত্যাখ্যান করে দূর করে দিতে হয়। আমি নীচ, অধম, আমার দ্বারা হবে না, মা আমাকে দূর করেছেন, আমি চলে যাব, আমি মরব, এ সব চিন্তা যদি আসে তবে জানতে হবে যে এই সব নিম্ন প্রকৃতির suggestions, সত্যের ও সাধনার বিরোধী। এই সব ভাবকে কখন আশ্রয় দিতে নাই।

*

অর্থ এই — যে ভাল সাধক ভাল সাধনা করে, সে ভাল সাধনার মধ্যেও অহংকার, অজ্ঞান, বাসনার ছাপ অনেকদিন বয়ে থাকে — কিন্তু চেতনা যখন আরও খুলে খুলে খাঁটি হয় — যেমন তোমার হতে আরম্ভ হয়েছে — তখন ওসব অজ্ঞানের মিশ্রণ খসে যেতে আরম্ভ করে।

*

এই সব হচ্ছে প্রাণের নিরর্থক disturbance, শান্ত হয়ে যোগপথে চলতে হয়, ক্ষোভ ও নিরাশাকে স্থান দিতে নাই।

*

অবশ্য এইরূপ কথার মধ্যে প্রাণের অনেক অশুদ্ধ গতি ঢুকতে পারে, ক্ষোভ, মায়ের উপর অসন্তোষ, অপরের উপর হিংসা, বিষাদ, দুঃখ। এই সব নিয়ে না থাকা ভাল।

*

শিশুটী তোমার psychic being। যা বুক থেকে উঠে ও নাবে, তা বহিঃপ্রকৃতির বাধা, ভিতরের সত্যকে স্বীকার করতে চায় না, ঢেকে রাখতে চায়।

*

সে স্থান পিছনে মেরুদণ্ডের মাঝখানে psychic beingএর স্থান। যা বর্ণনা কর্চ্ছ সে সবই psychic beingএর লক্ষণ।

*

হ্যাঁ, মানুষের চেতনার কেন্দ্র বুকে যেখানে psychic beingএর স্থান।

*

মূলাধার থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত physical স্তর বলা যায়, পায়ের নীচে অবচেতনার রাজ্য।

*

অনেক স্তর আছে — উপরে ও নিম্নে, তবে মুখ্যত আছে ওই নীচে চারটী স্তর, মনের স্তর, psychic স্তর, vital স্তর, শরীর স্তর — আর উপরের আছে ঊর্দ্ধ্ব মনের অনেক স্তর, তারপর বিজ্ঞান স্তর ও সচ্চিদানন্দ।

*

যদি নেমেই যাও, সেখানেও শান্ত হয়ে মার আলো শক্তি ডেকে নামিয়ে

দাও। নিম্নে যেমন উপরে নিজের মধ্যে মায়ের রাজ্য সংস্থাপন করে দাও।

*

জল চেতনার প্রতীক — যা ওঠে তাহা চেতনার আকাঙ্ক্ষা বা তপস্যা।

যদি সাদাটে নীল আলো (whitish blue) হয়, সে আমার আলো — যদি সাধারণ নীল আলো হয়, সে উপরের জ্ঞানের আলো।

*

সর্ব্বদা স্থির হয়ে মায়ের ঊর্দ্ধ্বচেতনা নামতে দাও — তাতেই বহিশ্চেতনা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

*

শান্তভাবে সমর্পণ করতে করতে চল, পুরাতন সবের যে রূপান্তর দরকার তা ক্রমে ক্রমে হয়ে যাবে।

*

ভগবানের সন্তান হলেও এমন কোনও সাধক নাই যার মধ্যে প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দোষ নাই। এই সব যখন টের পাওয়া যায়, তখন reject করতে হয়, মায়ের শক্তির আশ্রয় আরও দৃঢ়ভাবে চাইতে হয় যাতে আস্তে আস্তে এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির দোষসকল বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু বিশ্বাস ও মায়ের উপর নির্ভর, সমর্পণ সব সময় অটুট রাখতে হয়। এসব দোষ সম্পূর্ণভাবে বের করা সময়-সাপেক্ষ, আছে বলে বিচলিত হতে নাই।

*

চলে যাবে কারা? যাদের আন্তরিক ভাব নাই, যাদের মায়ের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই, যারা মায়ের ইচ্ছার চেয়ে নিজের কল্পনাকে বড় বলে দেখে, তারা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যকে চায়, যার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস চায়, যে মাকে চায়, তার কোন ভয় নাই, তার যদি হাজার বাধা হয়, সেগুলো সে অতিক্রম করবে, যদি স্বভাবের অনেক দোষ হয় সেগুলো সে শুধরে নেবে, যদি পতনও হয়, সে আবার উঠবে — সে শেষে একদিন সাধনার গন্তব্য স্থানে পঁহুচবেই।

*

ইহা right attitude নয়। তোমার সাধনা ধ্বংস হয়নি, মা তোমাকে ত্যাগ করেন নি, দূরে যান নি, তোমার উপর বিরক্ত হন নি — এই সব হচ্ছে প্রাণের কল্পনা, এই সব কল্পনাকে স্থান দিতে নাই। মায়ের উপর শান্ত সরল ভাবে নির্ভর কর, বাধাকে ভয় না করে মায়ের শক্তিকে তোমার ভিতরে ডাক — যা পেয়েছ সে সব তোমার ভিতরে আছে, নূতন উন্নতিও হবে।

*

চেতনা ঊর্দ্ধের সত্যের দিকে খুলছে। স্বর্ণময়ূর — সত্যের জয়। মায়ের শক্তি physical পর্য্যন্ত নামছে — তার ফলে সত্যের আলো (সোনালী আলো) নামছে আর তুমি মায়ের দিকে শীঘ্র এগিয়ে চলছ।

*

শরীরের পেছনের অংশ সব চেয়ে অচেতন — প্রায়ই সবশেষে আলোকিত হয়। তুমি যা দেখেছ, তা সত্য।

*

মায়ের জয় হবেই এই বিশ্বাস সব সময় রেখে শান্ত ধীর ভয়শূন্য হয়ে সাধনা করতে হয়।

*

মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে, তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়।

*

মায়ের ভাব ত বদলায় না — একই থাকে। তবে সাধক নিজের মনের ভাবের মত দেখে যে বদলে গেছে — কিন্তু তা সত্য নয়।

*

ধ্বংস হলে পরিবর্ত্তন কিসে হবে? প্রাণের শরীরের পুরাতন প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে হবে, প্রাণকে শরীরকে নয়।

*

এ কথা সত্য যে সকলের মধ্যে মা আছেন ও তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ থাকা চাই, তবে সে সম্বন্ধ personal নয় সে লোকের সঙ্গে, কিন্তু মারই সঙ্গে, একটা বিশাল ঐক্যের সম্বন্ধ।

*

এক দিকে শান্তি ও সত্য চেতনার বৃদ্ধি, অপর দিকে সমর্পণ, ইহাই হচ্ছে সত্য পথ।

*

প্রাণকে ধ্বংস করবার ইচ্ছা ভুল ইচ্ছা — প্রাণকে ধ্বংস করলে শরীর বাঁচবে না, শরীর না বাঁচলে সাধনা করা যায় না।

তুমি বোধ হয় বড় বেশী শক্তি টেনেছ — সে জন্য শরীর ঠিক ধারণ করতে পাচ্ছে না। একটু শান্ত হয়ে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

*

হ্যাঁ, তুমি নির্ভুল দেখেছ — মাথার উপর সাতটী পদ্ম বা চক্র আছে — তবে ঊর্দ্ধ্বমন না খুললে এগুলো দেখা যায় না।

*

Psychicএর পিছনে, psychic অবস্থার পিছনে অহংকার থাকতে পারে না। তবে প্রাণ থেকে সে অহংকার এসে তার সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে পারে। যদি ওই রকম কিছু দেখ তা হলে তা গ্রহণ না করে মায়ের কাছে সমর্পণ করবে ত্যাগ করবার জন্যে।

*

সোজা রাস্তা psychicএর পথ যে সমর্পণের বলে ও সত্য দৃষ্টির আলোতে বিনা বাঁকে উপরে চলে যায় — যে একটু সোজা একটু ঘুরোনো, সে হচ্ছে মানসিক তপস্যার পথ। আর একেবারে ঘুরোনো যে সে হচ্ছে প্রাণের পথ, আকাঙ্ক্ষা বাসনায় পূর্ণ, জ্ঞানও নাই, তবে প্রাণের সত্য চাওয়া আছে বলে কোন রকমে যাওয়া যায়।

*

বাধার কথা লোকে যত বেশী ভাবে, বাধা বেশী জোর করে তাদের উপর। ভগবানের কথা বেশী ভাবতে হয় মায়ের কাছে নিজেকে খুলে, — আলো, শান্তি, আনন্দের কথা।

*

এই অসীম শান্তি যতই বাড়ে, ততই ভাল। শান্তিই হয় যোগের প্রতিষ্ঠা।

*

যা দেখেছ, তা সম্পূর্ণ সত্য। এই গলার মধ্যে সত্তার একটা কেন্দ্র আছে। সে হচ্ছে externalising mind or physical mentalএর কেন্দ্র, অর্থাৎ যে মন বুদ্ধির সব খেলাকে বাহিরের আকৃতি দেয়, যে মন speechএর অধিষ্ঠাতা, যে মন physical সব দেখে, তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাথার নিম্নভাগ আর মুখ তার অধিকারে রয়েছে। এই মন যদি উপরের চেতনা বা ভিতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, এগুলোকে ব্যক্ত করে, তবে ভাল। কিন্তু তার আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ — নিম্ন অংশের সঙ্গে, lower vital ও physical consciousness (যার কেন্দ্র মূলাধার) তার সঙ্গে। এই জন্য এ রকম হয়। সেই জন্য বাক্‌কে সংযত করার সাধনায় বড় প্রয়োজন, যাতে সে উপরের ও ভিতরের চেতনাকে ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হয়, নিম্নের বা বাহিরের চেতনাকে নয়।

*

ইহাই চাই — বাহিরের জিনিষ ভিতরে যাওয়া, ভিতরের সঙ্গে এক হওয়া, ভিতরের ভাবকে গ্রহণ করা।

*

দেহকে এইরূপ দেখা ভাল। তবে দেহের মধ্যে চৈতন্য আবদ্ধ না থাকলেও চৈতন্য বিশাল অসীম হয়ে গেলেও দেহকে চৈতন্যের একটী অংশ ও মায়ের যন্ত্র বলে অঙ্গীকার করতে হয়, শারীর চৈতন্য রূপান্তর করতে হয়।

*

ইহা খুব ভাল লক্ষণ। নিম্নচেতনাই উঠে যাচ্ছে ঊর্দ্ধচেতনার সঙ্গে মিলিত

হবার জন্য। উপরের চেতনাও নামছে জাগ্রত চেতনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

*

ইহা তোমার আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ ভিতরের বুদ্ধি চিন্তা দৃষ্টি ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্র — সে এখন pressureএর দরুন এমন খুলে গেছে, জ্যোতির্ম্ময় হয়েছে যে ঊর্দ্ধ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় আর ঊর্দ্ধ্বচেতনার প্রভাব সমস্ত আধারের উপর বিস্তার করে।

*

এই অনুভূতিটী খুব সুন্দর ও সত্য — প্রত্যেক আধার এমনই মন্দির হওয়া চাই। যা শুনেছ যে মা-ই সব করবেন, শুধু তাঁর মধ্যে ডুবে থাকা চাই, ইহাও খুব বড় সত্য।

*

যে বিশালতা অনুভব করছ তার মধ্যে ঊর্দ্ধ্বে বাস করতে হবে, ভিতরে গভীরেই তারই মধ্যে বাস করতে হবে — কিন্তু ইহা ছাড়া সর্ব্বত্র প্রকৃতির মধ্যে এমন কি নিম্নপ্রকৃতির মধ্যেও সে বিশালতা নামা চাই। তখন নিম্নপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তরের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কারণ এই বিশালতা মায়ের চৈতন্যের বিশালতা — সংকীর্ণ নিম্নপ্রকৃতি যখন মায়ের চৈতন্যের মধ্যে বিশাল ও মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে মূলপর্য্যন্ত রূপান্তরিত হতে পারবে।

*

অনুভূতিকে যদি ব্যক্ত করি কথায় বা লেখায়, তখন সে কমে যায় বা থেমে যায়, এই ত অনেকের হয়। যোগীরা প্রায়ই সে জন্য কারুকে নিজের অনুভূতির কথা বলে না, অথবা সব দৃঢ় হয়ে গেলে তার পর বলে। তবে গুরুর কাছে, মায়ের কাছে বল্লে কমবে না, বাড়বে। তোমার এই অভ্যাস সমস্ত জিনিসের [মধ্যে] স্থাপন করা উচিত।

*

বালকটী হৃদয়স্থ ভগবান আর শক্তি ত মা-ই হবে।

*

চক্র ঘুরছে, মানে outer beingএর মধ্যে মায়ের শক্তির কাজ চলেছে — তার রূপান্তর হবে।

*

অনুভূতি যখন হয় তখন অবিশ্বাস না করে গ্রহণ করা ভাল। ইহা ছিল সত্য অনুভূতি — উপযুক্ত অনুপযুক্তের কথা হচ্ছে না, সাধনায় এই সব কথার বিশেষ কোন অর্থ নাই, মায়ের কাছে খুলতে পারলেই সব হয়।

*

মাথায় যা অনুভব কর, তাহা বাহিরের মন (physical mind) আর নাভির নীচ থেকে যা অনুভব কর তা হল (lower vital) নিম্ন প্রাণ।

*

মাথায় এইরূপ হওয়ার অর্থ এই যে মন সম্পূর্ণ খুলেছে ও উপরের চেতনা receive করেছে।

*

হ্যাঁ, যখন ঘুম সচেতন হয়, তখন এইরূপই হয় — যেমন জাগ্রতে তেমনই ঘুমে সাধনা অনবরত চলে।

*

বহিঃপ্রকৃতি ছাড়ছে না বলে বাধা হচ্ছে। বহিঃপ্রকৃতির যখন নব জন্ম হবে তখন আর বাধা থাকবে না।

*

এই দুই বাধা সাধকের প্রায়ই থাকে। প্রথমটী প্রাণের, দ্বিতীয়টী শরীরচেতনার — স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে কমে গিয়ে শেষে আর থাকে না।

*

এই সব বাধা সকলের আসে, তা না হলে যোগসিদ্ধি অল্পদিনেই হয়ে যেত।

*

বাধা সহজে যায় না। খুব বড় সাধকেরও ''আজই'' এক মুহূর্তে সব বাধা সরে যায় না। আমি ইহাও অনেকবার বলেছি যে শান্ত অচঞ্চল হয়ে মায়ের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে আস্তে আস্তে এগুতে হবে — এক মূহূর্তে হয় না। ''আজই'' সব চাই এইরূপ দাবী করলে আরও বাধা হয়। ধীর স্থির হয়ে থাকতে হয়।

*

যখন অবচেতনা থেকে তমোভাব উঠে শরীরকে আক্রমণ করে, তখন এইরূপ অসুখের মতন করে — উপর থেকে মায়ের শক্তিকে শরীরের মধ্যে ডাক — সব চলে যাবে।

*

অবচেতনার বাধা হতে মুক্ত হবার উপায় হচ্ছে প্রথম সেগুলোকে চিনে নেওয়া, তারপর সেগুলোকে reject করা, শেষে মায়ের ভিতরের বা উপরের আলো চেতনা শরীরচেতনার মধ্যে নামান। তা হলে অবচেতনায় ignorant movementsকে তাড়িয়ে তার বদলে সে চেতনার movements স্থাপিত হবে। কিন্তু এ সহজে হয় না — ধৈর্য্যের সহিত করতে হবে — দৃঢ় patience চাই। মায়ের উপর ভরসাই সম্বল। তবে ভিতরে থাকতে পারলে, ভিতরের দৃষ্টি ও চেতনা রাখতে পারলে তত কষ্ট ও পরিশ্রম হয় না — তা সব সময় পারা যায় না, তখন শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন হয়।

*

মানুষের প্রকৃতি ত সব সময় ভিতরে থাকতে পারে না — কিন্তু যখন মাকে ভিতরে বাহিরে সব অবস্থায় feel করতে পারা যায়, তখন এই difficulty আর থাকে না। সেই অবস্থা আসবে।

*

অশুদ্ধ প্রকৃতিই সাধকের বাধার সৃষ্টি করে — কামভোগের ইচ্ছা, অজ্ঞানতা ইত্যাদি মানুষের অশুদ্ধ প্রকৃতিরই অন্তর্গত। এইগুলি সকলেরই আছে — যখন আসে বিচলিত না হয়ে শান্ত ভাবে নিজেকে পৃথক করে প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

যদি বল "আমি পাপী" ইত্যাদি তাতে দুর্ব্বলতাই বাড়ে। বলতে হয় — "এই হচ্ছে মানুষের অশুদ্ধ প্রকৃতি। এইগুলি মানুষের সাধারণ জীবনে থাকে, থাকুক — আমি চাই না, আমি ভগবানকে চাই, ভগবতী মাকেই চাই — এইগুলো আমার সত্য চেতনার জিনিস নয়। যতদিন আসবে ততদিন স্থিরভাবে প্রত্যাখ্যান করব — বিচলিত হব না, সায় দিব না।"

*

আমি এই সম্বন্ধে বার বার তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি — যে বাধা এক মুহূর্ত্তে যায় না — বাধা হচ্ছে যে মানুষের বহিঃপ্রকৃতির স্বভাবের ফল — সে স্বভাব এক দিনে বা অল্প দিনে বদলায় না — শ্রেষ্ঠ সাধকেরও নয়। তবে মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে শান্ত ধীর ভাবে উৎকণ্ঠিত না হয়ে যদি মাকে সর্ব্বদা ডেকে এগিয়ে চল, বাধা এলেও কিছু করতে পারবে না — সময়ে তার জোর কমে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, আর থাকবে না।

*

নঃ যখন ধ্যান করতে বসি তখন আমার পা ঝিন্ ঝিন্ করে আর ভিতরে একটি কি ছটফট করে। এসব কি?

উঃ ইহা হচ্ছে শরীরের (শরীরস্থ প্রাণের) চঞ্চলতা — অনেকের হয় — স্থির হয়ে থাকলে প্রায়ই কেটে যায়।

*

নঃ আমি অন্তরে যা দেখি তা বাহিরে মাঝে মাঝে খোলা চোখে কেন দেখি? তা কি কাল্পনিক জিনিষ?

উঃ না। যা ভিতরে দেখা যায়, তাহাই বাহিরে physical চোখেও দেখা যেতে পারে, তবে ভিতরের দৃষ্টি সহজে আসে — বাহিরে সূক্ষ্ম দৃশ্য দেখা একটু কঠিন।

*

এখন physical consciousness খুব উঠেছিল। সে জন্য অধ্যাত্ম অনুভূতি পর্দ্দার পেছনে সরে গিয়েছে, চলে যায়নি।

*

একেবারে নীরব হওয়া চলে না, ভালও নয়। তবে প্রথম অবস্থায় যতদূর সম্ভব নীরব গম্ভীর হওয়া সাধনার অনুকূল অবস্থা — যখন বাহিরের প্রকৃতি মাতৃময় হয়ে যাবে, তখন কথা বলা হাসি ইত্যাদিতেও সত্য চেতনা থাকবে।

*

হ্যাঁ, ওই রকম কাঁদলে দুর্ব্বলতা আসে। সব সময়, সব অবস্থায় ধীর শান্ত হয়ে মায়ের উপর নির্ভর করে মাকে ডাক। তাহলে ভাল অবস্থা শীঘ্র ফিরে আসে।

‘‘স’’কে লিখিত

সঃ মা, আজ আমি তোমাদের এত কাছে অনুভব করছি — তবুও কেন আমার সমস্ত সত্তায় তোমাদের অভাব বাজছে? আমার এই ভাব থাকবে কেমন করে মা?

উঃ মায়ের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখা — বাধাবিপত্তিতে বিচলিত না হয়ে স্থিরভাবে সম্মুখ হয়ে মায়ের শক্তির বলে অতিক্রম করা — এমন ভাব রাখলে তবেই এই অবস্থা স্থায়ী হয় শেষে।

7.2.34

*

সঃ আমার প্রধান প্রাণভূমিতে দেখি একটি অর্দ্ধচন্দ্র — যেন রাহুগ্রস্ত। তারপর দেখলাম সমস্ত স্তরটা ভরে গেল protectionএর আগুনে। আগে ছিল সবুজ আলো, এখন আগুন জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধচন্দ্রটি কেটে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য উদিত হল। সমস্ত প্রাণভূমিটা সূর্য্যের অরুণ কিরণে ঝকঝক করছিল।

উঃ প্রাণে যে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছিল, সেটাই অর্দ্ধচন্দ্র। চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। সবুজ রঙের অর্থ খাঁটি প্রাণশক্তি। সূর্য্যের উদয় = সত্যচেতনার প্রকাশ প্রাণভূমিতে।

8.2.34

*

চন্দ্র = অধ্যাত্মের আলোক।
হস্তী = বলের প্রতীক।
সোনার হস্তী = সত্যচেতনার বল।

9.2.34

*

সাদা সচ্চিদানন্দের আলো হতেও পারে — কিন্তু হলদে ত মনবুদ্ধির আলো।

10.2.34

*

সঃ মা, ঘুমে জাগরণে আমি লক্ষ্য করছি ''ম''এর নীচ প্রাণশক্তিগুলি এসে আমার প্রাণশক্তির সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে চাচ্ছে। আমাকে দুর্ব্বল করে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে স্নেহপরবশ করে তার দিকে টেনে নিতে চাচ্ছে।

উঃ ''ম''র প্রাণের বাসনা এই শক্তিগুলোর রূপ ধারণ করে তোমার কাছে আসছে। প্রত্যাখ্যান কর — শেষে আর আসবে না।

12.2.34

*

সঃ মা, সিঁড়িতে বসে আমি দেখলাম তুমি তোমার আসনে বসেছ। একটি কালীমূর্ত্তি তোমার পা হতে উৎপন্ন হয়ে সাষ্টাঙ্গে তোমাকে প্রণাম করছে।

এইসব কি দেখি — এইসব অভিজ্ঞতার কোন সত্যতা আছে কি না!

উঃ এই সব অভিজ্ঞতার মূল্য আছে, সত্য আছে — তাতে সাধনার উন্নতি হয়। তবে এগুলো যথেষ্ট নয় — চাই অনুভূতি, ভাগবত শান্তি, সমতা, পবিত্রতা, ঊর্দ্ধের চৈতন্য, জ্ঞান শক্তি আনন্দের অবতরণ, প্রতিষ্ঠা — এটাই আসল।

14.2.34

*

সঃ মা, আমি স্পষ্ট বোধ করছি যে আমাদের প্রাণশক্তি ও প্রাণপ্রকৃতির একটা চেতনা আছে। আমার চালচলন, খাওয়াদাওয়া, পরশ্রীকাতরতা হিংসা লোভ মোহ অলসতা এগুলি সমস্তই প্রাণপ্রকৃতির এক একটি আবরণ। আমরা

অচেতন হয়ে আছি বলে এইগুলি আমাদের প্রকৃত আমিকে ঢেকে রেখেছে। যখন ঊর্দ্ধের জ্ঞানালোকের রশ্মিপাত আমাদের আধারে হয় তখন এই আবরণ-গুলি ক্ষুদ্র হয়ে যায় ও আমরা ওদের ত্যাগ করতে পারি। আজ আমি আমার আধারের ভিতরের সমস্ত খেলাগুলি যেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তেমনি বাহিরের জগতের মধ্যেও সেই খেলাটি দেখতে পাচ্ছি — খোলা চোখেই দেখছি, কোন কিছুই অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থূল নয়। ...সবকিছুর মধ্যেই তোমার স্ব-রূপ সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি।

উঃ হ্যাঁ, এটী সত্য অনুভূতি — যে প্রাণপ্রকৃতির খেলা দেখেছ আবরণরূপে, সেইটী হচ্ছে মিথ্যার অবিদ্যার প্রাণপ্রকৃতির, সে আবরণের পিছনে রয়েছে সত্য প্রাণপ্রকৃতি যে ভাগবত শক্তির যন্ত্র হতে পারে।

17.2.34

*

সঃ মা, এত অল্পদিনে সেই শক্তি নামাতে পারা যায় না লিখেছ। তুমি সেই শক্তিটি নামালে আমাদের অনেক দিক দিয়ে সুবিধে হত, না মা?

উঃ ...শক্তি নামান চিরদিনের কর্ম্ম, অল্পদিনের নয়।

24.2.34

*

[সাধিকার নানারকম সূক্ষ্ম দর্শন ও আঘ্রাণ হচ্ছে। সুন্দর ফুলের গন্ধে মনপ্রাণ শীতল হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন রংয়ের জগৎ ও দেবদেবীর দেখা মিলছে ধ্যানের সময়ে। সাধিকার খেদ যে ওইসব যেন একটা পাতলা আবরণের পিছনে ঢাকা, তাদের পূর্ণ রহস্য ও অর্থ বোঝা যায় না।]

এই সকল vision ও অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের (যেমন গন্ধটী) — ঐ সূক্ষ্ম চৈতন্য হইতে স্থূল চৈতন্যের মধ্যে এলে — ওগুলো থাকে না, মনেও প্রায় সব থাকে না। আর অন্য জগতের হাবভাবগুলো শুধু দৃষ্টির দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় না। আবরণ ত থাকেই — যারা সমাধিস্থ হয়ে সেখানে যেতে পারে, তারাই দেখে, কিন্তু তাদেরও সব মনে থাকে না।

27.2.34

*

[খাওয়া কমানো নিষেধ করাতে সাধিকা লেখে — খাওয়া ত নিম্নপ্রকৃতির জন্য যা মায়ার অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। সুতরাং তাকে এত বেশী খেতে দেবার কি সার্থকতা আছে?]

আহার ত দেহধারণের জন্যে ও দেহের বলপুষ্টির জন্যে। এর মধ্যে অবিদ্যার মায়ার কথা ঢুকে এল কোত্থেকে?

27.2.34

*

সঃ মা, যে সব অভিজ্ঞতাগুলি লিখি, যদি সেগুলো অসত্য হয় বা কোন মূল্যই না থাকে তবু শুধু তোমাকে লিখে কেন কষ্ট দেব?

উঃ অভিজ্ঞতা অসত্য নয়, এগুলোর স্থান আছে — কিন্তু এখন প্রয়োজন বেশী আসল অনুভূতির — যার দ্বারা প্রকৃতির রূপান্তর হয়।

28.2.34

*

সঃ মা, আজ চারিদিকে আকাশে বাতাসে একটী গভীর ব্যথা কেন বিরাজ করছে? শুধু তোমার জন্যই এই ব্যথা। সমস্ত সত্তা সমস্ত প্রকৃতি গভীরভাবে তোমাকে পেতে চাচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্ধতা অজ্ঞানতা ও মলিনতার দরুন তোমাকে পেতে পারছে না এবং ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কোন আশা দেখতে পাচ্ছে না। তাই এই দুর্ব্বিষহ জীবন ধারণ করা বৃথা বলে হা-হুতাশ করছে, কাঁদছে, যেন দাবানলে জ্বলে যাচ্ছে।

উঃ এই সব হয় প্রাণপ্রকৃতির বিলাপ — এতে সাধনার সাহায্য হয় না, বাধাই সৃষ্ট হয়। ভগবানে শান্ত সমাহিত শ্রদ্ধা, দৃঢ় নিশ্চয়, সহিষ্ণুতা সাধকের প্রধান সহায়, দুঃখ ও নিরাশা যোগপথে এগিয়ে দেয় না।

1.3.34

*

অভিজ্ঞতা বাজে নয় — তাদের স্থান আছে, মানে অনুভূতি prepare করে, আধারকে খুলে দেবার সাহায্য করে, অন্য জগতের, নানা স্তরের জ্ঞান দেয়। আসল অনুভূতি হয় ভাগবত শান্তি, সমতা, আলো, জ্ঞান, পবিত্রতা, বিশালতা,

ভাগবত সান্নিধ্য, আত্মার উপলব্ধি, ভাগবত আনন্দ, বিশ্বচৈতন্যের উপলব্ধি (যাতে অহংকার নষ্ট হয়), নির্ম্মল বাসনাশূন্য ভাগবত প্রেম, সর্ব্বত্র ভাগবত দর্শন, ইত্যাদির সম্যক অনুভূতি, প্রতিষ্ঠা। এই সকল অনুভূতির প্রথম সোপান হচ্ছে উপরের শান্তির অবতরণ আর সমস্ত আধারে ও আধারের চারিদিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

1.3.34

*

সঃ মা, অসুখটা আবার কেন আমাকে এমনি করে আক্রমণ করছে। শরীরের মধ্যে হঠাৎ এমন ব্যথা করতে লাগল যে হাড়গুলো যেন চুরমার হয়ে পড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে বসতে কখন যে কোনখানে ব্যথাটি আসবে তার ঠিকানা নেই। কম খেয়ে থাকছি — শরীর পাতলা থাকলে আক্রমণ কম হবে এবং সহ্য করতে পারব এই ভেবে কিন্তু তাতে তেমন কিছু তফাত হয় না।

উঃ এসব ব্যথা স্নায়ুর অসুখ। কম খেলে কমে না। মনের প্রাণের দেহের শান্তিই ইহার শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

2.3.34

*

গাছের প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে — গাছগুলির সঙ্গে ভাবের বিনিময় সহজে হয়।

3.3.34

*

সঃ মা, ঊর্দ্ধের থেকে পাতলা জলের মত কি নামে?

উঃ ঊর্দ্ধ চৈতন্যের স্রোত যখন নামতে আরম্ভ করে, সেইরকম পাতলা জলের মত (current) বোধ হয়।

3.3.34

*

এইরূপ অনুভূতি হয় — শরীরে মায়ের প্রবেশ — কিন্তু তার ফলস্বরূপ

যে চেতনার রূপান্তর সে দীর্ঘ সাধনা সাপেক্ষ — হঠাৎ হয় না।

6.3.34

*

শরীরে মা ত আছেনই — গূঢ় চেতনায় — কিন্তু যতদিন বাহির চেতনায় অবিদ্যার ছাপ থাকে, অবিদ্যার ফলগুলো হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয় না।

6.3.34

*

বাসনা দাবী খেয়াল কল্পনার জোর যত দিন থাকে প্রাণের আধিপত্য ত থাকেই। এই সব হচ্ছে প্রাণের খোরাক, খোরাক দিলে সে প্রকাণ্ড ও বলবান হবে না কেন?

8.3.34

*

যা দেখেছ তা ঠিক। উপরের শক্তি নেমে সত্য চেতনা আস্তে আস্তে সত্য চেতনা স্থাপন করে। মানুষের প্রকৃতি কিন্তু তা চায় না — অন্য চিন্তা নিয়ে থাকে, অবহেলা করে, বিরোধও করে — তা না হলে শীঘ্র হয়ে যেত।

10.3.34

*

স: মা, একটি নূতন অবস্থা আমার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষের সঙ্গে কথা বলছি, মিশছি সে শুধু প্রয়োজনবশতঃ — তাতে প্রাণের কোন টান নেই, মানুষের আমোদপ্রমোদেও নিস্তব্ধতার মধ্যে রয়েছি। সারাদিন একটি নীল আলোর মধ্যে যেন তুমিই বাস করছ, ঊর্দ্ধের চেতনা নেমে সমস্ত সত্তাকে কাঁচের মত স্বচ্ছ ও বিশেষ সচেতন করে রেখেছে।

উ: ইহা যদি হয়, তাহা খুব ভাল — সর্ব্বদা অনাসক্ত হয়ে লোকের সঙ্গে মিশতে হয়।

10.3.34

*

সঃ আজ প্রণামের সময় ঊর্দ্ধজগৎ হতে একটি প্রগাঢ় শান্তিপ্রবাহ নেমে এল — তখন আমার সব অসুখ কোথায় গেল আমি টেরও পেলাম না।

উঃ এইরূপ শান্তির অবতরণেই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অনুভূতি যতদিন সমস্ত আধার শান্ত সমাহিত না হয়।

13.3.34

*

সঃ মা, আজ সকাল হতে প্রচণ্ড পেটব্যথা হচ্ছিল। প্রণাম হলে এক মনে তোমাকে ডাকছিলাম ও সমস্ত চেতনা ও সত্তাকে ঊর্দ্ধের দিকে খুলে রেখেছিলাম। এমন সময় বিরাট বিশ্বব্যাপক একটি ঢেউ নেমে এল ঊর্দ্ধের শান্তির। আমার অনুভব হল যে এই শন্তিপ্রবাহ নাভির নীচে নামতে পারে নি। আমি আবার সেই অংশটুকু ঊর্দ্ধের শান্তির প্রবাহের দিকে খুলে ধরলাম। কিছুক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণা হল — তারপর কিন্তু সে বেশীক্ষণ থাকতে পারল না।

উঃ অসুখ সারাবার শ্রেষ্ঠ উপায় এই, তবে সব সময় দেহের চেতনা খুলতে চায় না আর শীঘ্র পূর্ব্ব অভ্যাসের বশে পড়ে যায়।

15.3.34

*

সঃ মা, তোমার দিব্য চেতনা ও দিব্য দৃষ্টিশক্তি যখন আমার আধারে নেমে আসে তখন আধ্যাত্মিক পবিত্রতার স্রোতে সমস্ত অন্ধকার গ্লানি মলিনতা ব্যাধি দূরীভূত হয়ে স্বচ্ছ পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু অধিকক্ষণ কেন এই অবস্থা থাকে না?

উঃ অল্পক্ষণ হলেও মস্ত লাভ। প্রথম অল্পক্ষণই থাকে — তার পরে আস্তে আস্তে বেড়ে যায়।

20.3.34

*

সঃ মা, আজ আমার মন কারুর সংস্পর্শ পর্য্যন্ত পছন্দ করছে না — মানুষ, জিনিষ যে কোন কিছু আমার কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হচ্ছে। তোমার চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করতে কেমন ঘাড় ব্যথা করছে, মাথা ধরছে। নেহাত প্রয়োজনীয় কথা বলতেও আমি কেমন হাঁপিয়ে উঠছি আর দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি।

উঃ এতদূর sensitive হওয়া ভাল নয়।

20.3.34

*

[সাধিকার বক্তব্য যে এখন আর ঊর্দ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে না, আধারের মধ্যেই নানা অনুভূতি হচ্ছে।]

সব সময়ে ঊর্দ্ধেই ঊর্দ্ধের অভিজ্ঞতা পেয়ে আধারে অভিজ্ঞতা না পেলে আধারের রূপান্তর হবে কেমন করে?

22.3.34

*

সঃ মা, ধ্যানে দেখলাম আমার মাথার উপরে সব সময় একটা উজ্জ্বল সাদা জ্যোতি আছে। স্থূল মন যখন স্থূলের চিন্তা করে, আধারের স্থূল অংশের দ্বার বন্ধ থাকে — তাই ঊর্দ্ধের জ্যোতি ও শান্তি নামতে পারে না। যখনই আমি ঊর্দ্ধের দিকে তাকাই তখনই আমার জড় সত্তার স্থূল অংশে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধের শান্তি শক্তি পবিত্রতা নেমে সমস্ত আবর্জ্জনা কেটে দেয়।

উঃ ইহা তা প্রায়ই হয়। যখন সমস্ত আধার খুলে যায় তখন আর এইরকম হয় না — স্থূল মন স্থূলের চিন্তা কর্ল্লেও সেই সময় ঊর্দ্ধের জ্যোতি ও শান্তি থাকে।

22.3.34

*

সঃ আমি আজ বুঝছি যে আমার একটি জ্যোতির্ম্ময় সত্তা আছে। কিন্তু কোন শক্তি তাকে ঢেকে রেখেছে। আজ দেখলাম তোমার পিয়ানো বাজনার সমস্ত সুরগুলি যেন জ্ঞানজ্যোতির এক একটি শিখা। এই শিখাগুলি জড়স্তরে নেমে এসে সেই অজ্ঞান তামসপূর্ণ আবর্জ্জনা কেটে দিচ্ছে।

উঃ জ্যোতির্ম্ময় আত্মা সকলেরই আছে — সকলেরই অজ্ঞানের বন্ধনও আছে। সত্যের শক্তি সে বন্ধনগুলো খুলে দেয়। মা বাজাবার সময় সত্যকে, সে সত্যের শক্তিকে নামিয়ে আনে।

22.3.34

*

সবুজ ত emotionএর আলোর রং।

22.3.34

*

সঃ মা, সাদা ফ্যাকাসে নীল বর্ণের একটি শক্তিপ্রবাহ নামছে। চেতনার স্বচ্ছ জলের মত একটি স্রোত নেমে আমার বক্র শরীরটাকে সোজা করে দিচ্ছে, দুর্ব্বল স্নায়ুকে সতেজ সবল নীরোগ নিস্তব্ধ করে দিচ্ছে।

উঃ সে ত ঊর্দ্ধ্ব চৈতন্যের প্রবাহ যাতে শেষে সব রূপান্তরিত হতে পারে।

24.3.34

*

দুই বিপরীত প্রভাবের দ্বন্দ্ব — সত্য শক্তির প্রভাব যখন দেহকে স্পর্শ করে তখন সব সুস্থ হয়ে যায় — অবিদ্যার প্রভাবে রোগ ব্যথা স্নায়বিক বিকার ফিরে আসে।

24.3.34

*

এসব কথা খুব স্পষ্ট, বুঝতে পার না কেন? আত্মা অনশ্বর অনন্ত, দুঃখ ব্যথা সব অবিদ্যার ফল, আত্মার এমনকি আধারের প্রকৃত ধর্ম্ম নয়। ঊর্দ্ধ্ব চৈতন্য যাকে বলি, সে আত্মারই ধর্ম্ম — সে উচ্চ ধর্ম্ম শরীরেও নামাতে হয়, নামাতে পারলে রোগ দুঃখ ব্যথা কষ্ট আর থাকিবে না।

26.3.34

*

কোন নিয়ম পালন করে হয় না। স্থির শান্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রত্যাখ্যান করলে অল্পে অল্পে অবিদ্যার প্রভাব চলে যায়। উতলা হলে (বিব্রত হয়ে অন্ধ হয়ে হতাশ হয়ে) অবিদ্যাশক্তি আরও জোর পেয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায়।

27.3.34

*

সঃ মা, ধ্যান করলে আমার সমস্ত চেতনা ঊর্দ্ধে উঠে যায়। আমি এবং আমার বলে তখন কিছু থাকে না। কেবল ক্ষুদ্র একটি চেতনা আধারে বসে বসে ঘরকন্নার, বাহিরের চিন্তা করতে থাকে। ঊর্দ্ধ চেতনাকে নামিয়ে এনে এই ক্ষুদ্র চেতনাটিকে, যা এখনও তোমার কাছ হতে পৃথক রয়ে গেছে, পরিবর্ত্তন করতে না পেরে দুঃখ পাই।

উঃ এই রকম দ্বিধা হওয়া সাধনায় হয়, তার প্রয়োজন আছে — তারপর নিম্নের চেতনায় উপরের ভাব নামান বেশী সহজ হয়ে যায়।

29.3.34

*

সাধনা করতে করতে এমন অবস্থা হয় যে যেন স্বতন্ত্র দুটী সত্তা আছে, এক ভিতরের জিনিষ নিয়ে থাকে, শান্ত বিশুদ্ধ ভাগবত সত্যের দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যে থাকে অথবা তার সঙ্গে সংযুক্ত, আর একটী বাহিরের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত। তার পরে দুটীর একটা ভাগবত ঐক্য স্থাপন করা হয় — ঊর্দ্ধজগৎ ও বহির্জ্জগৎ এক হয়ে যায়।

31.3.34

*

সঃ মা, আমি সমস্ত জগতের মধ্যে তোমার মহান আনন্দপূর্ণ প্রেমকল্লোলিত একটি ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আর তোমার অমৃতময় জ্ঞানোজ্জ্বল হাস্যময় আনন্দ-সমীরণ জগতের সমস্ত দৈন্য, ব্যথা অপসারিত করছে এবং পিপাসিত শুষ্ক জগৎ আজ সতেজ হয়ে উঠছে। — আজ ধ্যান করিনি, খালি এইসব কতগুলো কি দেখতে পাচ্ছি।

উঃ সেই রকম অনুভূতি প্রাণস্তরে ঘটে — মন্দ নয়, তবে একমাত্র তাই নিয়ে থাকা যায় না।

31.3.34

*

এই সব প্রাণের বৃথা বিলাপকে উঠতে দিলে কেমন করে অনুভূতি আসবে, এলেও কি করে টিকবে বা সফল হবে — এই প্রাণের কান্না শুধু অন্তরায় হয়ে

যায়। এই যে খুব ভাল অভিজ্ঞতা এল, আনন্দিত না হয়ে বিলাপ ও কান্না কেন?

5.4.34

*

এই সব বিলাপ ও হাহুতাশের কথা যোগপন্থায় অগ্রসর হবার বাধা আর কিছু নয় — শুধু প্রাণের একরকম তামসিক খেলা। এই সব ছেড়ে দিয়ে শান্তভাবে সাধনা কর্ল্লে শীঘ্র উন্নতি হয়।

5.4.34

*

মানুষ কি করে না করে সে কথা স্বতন্ত্র — সাধকের কি করা উচিত, কি করে সাধনার উন্নতি হয়, ইহাই হচ্ছে আসল কথা।

6.4.34

*

সঃ ভাবাবেগের স্তর সামনের দিকে, চৈত্যপুরুষের স্তর পিছনের দিকে — তার মাঝখানে একটা পার্টিশন দেওয়া আছে। আমি দেখেছিলাম কুণ্ডলিনী চৈত্যের স্তর হতে বারবার ভাবাবেগের স্তরে যাতায়াত করে আর ঊর্দ্ধের সত্যের প্রভাব নামিয়ে আনে। এ দুটি স্তরের মাঝখানের পার্টিশনটাকে কুণ্ডলিনী তুলে দিতে চাচ্ছে।

উঃ Emotional being ও psychicএর মধ্যে যে আবরণ আছে সেইটী উঠিয়ে দেবার জন্য এই আয়োজন — তা হলে vital emotionsএর বদলে psychic emotions হৃদয়ে বিরাজ করবে।

6.4.34

*

সঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম ‘‘ম’’ মরে গেছে।

উঃ প্রাণস্তরের স্বপ্নের ও বাস্তব স্থূল ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ঐরূপ স্বপ্ন কতবার আসে, তার মূল্য নাই।

6.4.34

*

সঃ আমার মাথার উপরে একটি পদ্ম দেখলাম — পদ্মটির উপরের side সূর্য্যরশ্মির ন্যায় আর নীচের side সাদাটে নীল।

উঃ চক্রের উপরের side পায় Overmind ও Intuitionএর আলো, সোনার আলো বা সূর্য্যরশ্মি — নীচের side Higher Mind ও Spiritual Mindএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাদের আলো নীল ও সাদা।

7.4.34

*

Psychic being ভগবানের অংশ, সত্যের দিকে ভগবানের দিকে তার টান, আর সে টান বাসনা শূন্য, দাবী নাই, নীচ কামনা নাই। Psychic emotion পবিত্র নির্ম্মল — emotional vitalএর অংশ, বাসনা, অহংকার, দাবী, অভিমান ইত্যাদি যথেষ্ট আছে, ভগবানকেও চায় নিজের অহংকার বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে — তবে psychicএর স্পর্শে শুদ্ধ পবিত্র হতে পারে।

7.4.34

*

উপরের চেতনা নানা রূপে নামে — বায়ুর মত, বৃষ্টির মত, ঢেউর মত, স্রোত বা সমুদ্রের মত — যেমন শক্তির দরকার বা সুবিধে।

7.4.34

*

আমি বলেছি এ সব কান্নাকাটি সাধারণ মানুষের হতে পারে, — সাধকের যোগ্য নয়, সাধনায় অন্তরায় হয়ে যায়।

7.4.34

*

সঃ আমি প্রাণের একটা গতিবেগ দেখছি, উহাই হচ্ছে ভাবাবেগ — সে সব সময় কতকগুলি প্রাণিক ভাবপ্রবণতা, অহঙ্কারাত্মক খেলা ইত্যাদি টেনে আনে। সে তার স্বীয় অহংকারের মধ্যে তোমাকে ডুবিয়ে রাখতে চায় আর নীচ বাসনার দাবী নিয়ে তোমাকে চায় ও টানে।

উঃ তাই যদি বোঝ, সে অহঙ্কারাত্মক ভাবাবেগকে ত্যাগ কর। যা শুদ্ধ, যা psychic, সেই emotion মাত্র সাধনার সাহায্য করে।

10.4.34

*

সঃ ...তাদের [প্রাণের চাঞ্চল্য, অহংকারের গতি ও জবরদস্তি] ত্যাগ করার ক্ষমতা আমার নেই। একদিকে বাহির করে দিলে নানা অছিলায় বা রূপ ধরে অন্যদিকে আমার ভেতরে ঢোকে। সে যে আমার উপর প্রভুত্ব করে বেড়াচ্ছে।

উঃ তামসিক দেহচৈতন্য, রাজসিক প্রাণের অজুহাত। তারা সম্মতি দেয় বলে এই প্রভুত্ব — নচেৎ তারা সায় না দিলে সে প্রভুত্ব থাকতে পারে?

12.4.34

*

মরে যাওয়ায় কোনও মীমাংসা হয় না। এই জন্মে সে সব বাধাকে নষ্ট না কর্ল্লে, তুমি কি মনে কর আর জন্মে সেগুলো তোমাকে ছেড়ে দেবে? এই জন্মেই পরিষ্কার করতে হয়।

12.4.34

*

[সাধিকার মনে হয়েছে শ্রীমা তাকে ভালবাসেন না। অস্থির হয়ে সে আশ্রম ছেড়ে, মাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়, আবার থাকতেও চায়। সে দিশেহারা।]

এই সব শুধু অশান্ত বাসনাপূর্ণ প্রাণের বিদ্রোহ — তাহাকে সায় দাও কেন? তুমি vitalকে চরিতার্থ করতে এখানে আস নি। দৃঢ়ভাবে vitalকে সংযত করে যোগসাধনাকেই জীবনের এক উদ্দেশ্য করে দাও — তা হলে এই সব অবস্থা আসবে না।

13.4.34

*

নিজেকে সংযত করে রেখে লোকের সঙ্গে মিশলে চেতনা নেমে পড়ে না।

13.4.34

*

উপরের চৈতন্যের স্পর্শ — সেই উপরের চৈতন্যের ভাব, শান্তি, জ্ঞান, গভীরতার অবতরণই যোগসিদ্ধির উপায়। প্রাণকে সংযত করে সেই শক্তিকেই মনপ্রাণদেহকে অধিকার করতে দিতে হবে।

14.4.34

*

সঃ কুণ্ডলিনী জেগে উঠে ঊর্দ্ধের দিকে উঠে যাচ্ছে — কিন্তু মা কুণ্ডলিনীর লেজটি একটি সবুজ রঙের ময়ূরে পরিণত হয়েছে।

উঃ সবুজ রঙ emotional powerএর লক্ষণ। ময়ূর বিজয়ের চিহ্ন।

14.4.34

*

[সাধিকা শ্রীঅরবিন্দের ঘরে কাজ চায়। আগে একবার কাজ চেয়ে পায় নি। এখন শ্রীঅরবিন্দের ঘরে কাজ করত এমন একজন চলে যাওয়াতে, আবার সে তার পুরনো ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।]

আমার কথা ভুল বুঝেছ? আমি বলেছিলাম যারা আছে তাদের সরিয়ে দিব কেন নূতন লোকের জন্য? তারপর যদি একজন চলে যায় তুমি তার কাজ পাবে কেন — অনেক আছে সাধক সাধিকারা যারা সে কাজ চেয়েছিল, মা দেন নাই, তোমার অনেক আগে চেয়েছিল, এমনকি দশ বছর আগে। তাদের সকলকে (কুড়িজনের কম নয়) ছাড়িয়ে তুমি পাবে কেন? এটা যে তোমার অহংকারের দাবী, ইহা কি স্পষ্ট নয়? প্রাণের দাবীকে শোন না। শান্ত অহংকারশূন্য হয়ে নিজেকে তৈয়ারি কর, যোগপথে উন্নতিকে একমাত্র উদ্দেশ্য করে চল, ইহাই হচ্ছে সে উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায়।

14.4.34

*

ঊর্দ্ধের অনুভূতি চাই, নিম্ন প্রকৃতির রূপান্তরও চাই। হর্ষ বিষাদ হতাশা নিরানন্দ সাধারণ প্রাণের খেলা, উন্নতির অন্তরায় — এ সব অতিক্রম করে ঊর্দ্ধের বিশাল ঐক্য ও সমতা প্রাণে ও সর্ব্বত্র নামাতে হয়।

17.4.34

*

সঃ মা, এখনও মাঝে মাঝে আমার পড়া ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় আমি ভগবানের জন্যেই এখানে এসেছি — এতে লেখাপড়া কেন? আবার মনে হয় আমার মনের ভাবটা সোজাসুজি তোমাদের জানবার উপযুক্ত হওয়ারও ত দরকার আছে।

উঃ ইহা মনের ও প্রাণের চঞ্চলতা — যা আরম্ভ করেছ স্থিরভাবে চালাতে হয় যতদিন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়।

17.4.34

*

সঃ শেষরাত্রে দেখলাম, আমি একটা পাতলা সাদাটে নীল আলোর মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, শুধু আনন্দ ও তোমাদের ভালবাসায় আমার এই দেহটি ভরে গিয়েছে, কোথাও আর এতটুকু নিরানন্দ অপবিত্রতা নাই।

উঃ এই অনুভূতিগুলি ভাল — হতাশার মধ্যে বাস না করে, আনন্দে বাস করা সাধনার সত্য অবস্থা।

19.4.34

*

এইরূপ শূন্যতা সাধকের আসে যখন ঊর্দ্ধ্বের চেতনা নেমে মন প্রাণকে অধিকার করবার জন্য তৈয়ারি করছে — আত্মার অনুভূতিও যখন হয়, তার প্রথম স্পর্শে একটী বিশাল শান্ত শূন্যতাই হয়, তারপর সে শূন্যতার মধ্যে একটী বিশাল গাঢ় শান্তি নীরবতা, স্থির নিশ্চল আনন্দ নামে।

21.4.34

*

সঃ আজ দু-তিন দিন দেখছি কতকগুলি বিরোধী সৈন্যের দল আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, কতকগুলি আবর্জ্জনাময় পাহাড় অন্ধকারের মত হইয়া আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া চাপিয়া রাখিতে চাহিতেছে। আমার ভিতর হইতে একটি শক্তি সামনের দিকে আসিয়া এবং মাথার উপরে উঠিয়া গিয়া সমস্ত বিরোধী সৈন্যের পথরোধ করিতেছে, যুদ্ধ করিয়া মিথ্যাশক্তির গতিরোধ করিতেছে।

এই রকম অস্বাভাবিক ধরনের বীরত্ব কেন দেখিতেছি, মা?

উ: যদি এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, প্রাণস্তরে যেখানে বিরোধী শক্তির আক্রমণ সেখানে ভাগবত প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে আপনি সেই আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়।

24.4.34

*

স: ধ্যান করতে আরম্ভ করলে একটি শক্তি এত জোরের সঙ্গে নেমে আসে আর এত চাপ পড়ে যে আমি কোন চিন্তা করতে এবং এদিকওদিক তাকাতে পারি না। শান্তভাবে যথাসাধ্য সেই শক্তির কাছে ধরি, পরে সমস্ত প্রকৃতি নিশ্চল শান্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। একটা নীরব আনন্দে আমাকে ডুবিয়ে রাখে।

উ: এই ভাল ঊর্দ্ধ্ব চেতনার (সে চেতনার শান্তি শক্তির) অবতরণ — নিজেকে আধারের মধ্যে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবার প্রথম আয়োজন।

26.4.34

*

স: মা, আমার মাথা খালি হয়ে গিয়েছে, চিন্তা করবার শক্তিটা কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু আমার মাথাতে আর একটি পুরুষ জেগে উঠেছে যে এই জগতের এবং অন্তর্জ্জগতের ছোটবড় যা কিছুই আমার চেতনার মধ্যে আসছে তাদেরকে বিচার করে বেছে সত্যটাকে নিচ্ছে এবং মিথ্যাটাকে নিঃশেষে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আগে মিথ্যার খেলাকে ত্যাগ করতে আমার অনেক কষ্ট হত। এখন সেই জাগ্রত চৈতন্যময় পুরুষের সাহায্যে ঐ সকল আক্রমণকে প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে।

উ: এই পুরুষ higher mental being — ঊর্দ্ধ্বচেতনার অবতরণে সে জাগ্রত হয়ে যায় — তার জ্ঞান সাধারণ মনের নয়, ঊর্দ্ধ্বমনের জ্ঞান।

26.4.34

*

প্রথম চেতনা শূন্য ও বিশাল চাই — তার মধ্যে উপরের আলো শক্তি ইত্যাদি স্থায়ীভাবে স্থান পেতে পারে — খালি না হলে পুরোনো movementsই খেলে, উপরের জিনিষ সুবিধে মত স্থান পায় না।

5.5.34

*

চিন্তাশূন্য বিশালতার অবস্থাকে প্রাণ ভালবাসে না। সে চায় গতি, যে রকম গতিই হৌক, জ্ঞানের বা অজ্ঞানের। কোনও অচঞ্চল স্থির অবস্থা তার পক্ষে নীরস লাগে।

8.5.34

*

সত্তার কোন অংশ ত্যাগ করা যায় না, রূপান্তরিত করতে হয়। প্রকৃতির কোন বিশেষ গতি ত্যাগ করা যায়, সত্তার অংশগুলো স্থায়ী।

8.5.34

*

স: এখনও আমি সেই শূন্য অবস্থায় বাস করছি। ঊর্দ্ধের উজ্জ্বল প্রভাব নামছে। আধারটি শূন্যের অতল তলে যাচ্ছে — সমস্ত জগৎ স্বচ্ছ নির্ম্মল নিরাকার। এই নিরাকারের মধ্যে ভাগবতী নীরব নিস্তব্ধতা আর অবিচলিত শান্তি আনন্দ অনুভব করছি।

উ: ইহাই উন্নতির প্রতিষ্ঠা — এই নীরবতার মধ্যে সবই নামতে পারে ও প্রকাশ হতে পারে।

10.5.34

*

স: মা, আজ প্রণামের সময় দেখলাম মাথার উপর একটি বড় পদ্ম। পদ্মটির একপাশে একটি ইঞ্জিন ফিট করা হচ্ছে। ইঞ্জিনের গতিতে একটি জলের স্রোতে আমার সমস্ত আধার ধৌত হচ্ছে। ইঞ্জিনের অন্য একটি পাইপ দিয়ে জল জোরে বের হয়ে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং কুয়াশার মত হয়ে নীল আকাশে মিশে যাচ্ছে।

উ: ইহা purificationএর symbol — ঊর্দ্ধচেতনার স্রোতে ধৌত হলে আধার purified হয়ে যায়।

10.5.34

*

স: আমি দেখলাম, আধ্যাত্মিক স্তরে প্রকাণ্ড একটি চক্র অবিরাম ঘুরছে আর তার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে নীল, সাদা, সবুজ, লাল, সোনালী সূর্য্যরশ্মির মত আলো

আমার চৈত্যপুরুষের স্তরে ও অন্যান্য নিম্ন অংশগুলিতে নামছে। একটার পর একটা আলো নেমে এসে চক্রের গতিতে আধারের সমস্ত অন্ধকার ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলছে, পরে ঘূর্ণনের গতির সঙ্গে চেতনাকে এবং সত্তাকে টেনে ঊর্দ্ধ্বের রাজ্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আবার ঘূর্ণনের গতির সঙ্গে নামিয়ে দিচ্ছে।

উ: চক্র ঘোরা শক্তির কর্ম্মপ্রয়োগ। অধ্যাত্ম শক্তি কাজ কচ্ছে আধারকে পরিষ্কার করে চেতনাকে ঊর্দ্ধে তুলে নিতে — তুলে নিয়ে ঊর্দ্ধ্বের চেতনায় সংযুক্ত করে নিজ স্থানে আবার নামিয়ে দেয়।

15.5.34

*

বাহিরের চেতনা ভিতরের [সঙ্গে] সংশ্লিষ্ট থাকে যদি দুইই মায়ের নিকট সম্পূর্ণ সমর্পিত শান্ত পবিত্র হয়ে যায় — তা হলে সব সম্ভব হয়।

17.5.34

*

স: মা, আজ প্রণামের সময় এত গভীর রাজ্যে আমার সমস্ত চেতনা উঠে গিয়েছিল যে দেহটিও উঠে গিয়েছিল বলে বোধ হয়েছিল।

উ: স্থূল দেহ ত উঠতে পারে না এই সকল রাজ্যে — সূক্ষ্ম দেহ উঠতে পারে, তাও সহজে হয় না। তবে যখন vital উঠে যায়, তার সঙ্গে physical consciousnessএর কোন অংশ তার সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

19.5.34

*

স: আমি দেখলাম সমস্ত জগৎ যেন ধূম্রাচ্ছন্ন আর নীচে সব জুড়ে শুধু একটা সাগর আর সেই সাগরের মধ্য দিয়ে খুব বড় একটা স্টীমারে করে তুমি আমাদের ঊর্দ্ধ্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছ।

উ: এই সাগর ও আকাশ physical চেতনা ও প্রকৃতির obscurity বোঝায়। সকলেই তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দিব্য আলোক physicalএও পাবার জন্য।

24.5.34

*

সঃ মা, আমার কেন মনে হচ্ছে আমার উন্নতি হচ্ছে না এবং যোগপথে আর আমি অগ্রসর হতে পারব না এই অপবিত্র দেহ ও প্রকৃতি নিয়ে।

উঃ Physical চেতনার মধ্যে নেমেছ, সে জন্য এই রকম বোধ হচ্ছে, কিন্তু এ সত্য নয় — সেখানে নেমেছ physicalএর রূপান্তরের জন্য।

24.5.34

*

Vital mind হৃদয়ের উপরে, গলার নীচে। উচ্চ প্রাণ হৃদয়ে; নাভিতে central বা ordinary বা middle প্রাণ। নাভির নীচে নিম্ন প্রাণ। মূলাধার physical চেতনার কেন্দ্র।

24.5.34

*

সঃ মা, আজকে ধ্যান করতে গেলেই দেখছি আমার আধারের ভিতরে কতকগুলো পুরুষ শুধু কথাবার্ত্তা বলছে, একজন অন্যকে হুকুম করছে ও নানারকম আদেশ করছে।

উঃ এগুলো হয় অবচেতনার নানা voices নয় general physical mindএর suggestions — সে দিকে attention দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

25.5.34

*

সঃ আমি দেখলাম উপর হতে একটি সূর্য্য আমার মাথার মধ্যে নেমে এল। তারপর দেখলাম একটা সাপ — সাপের মাথাটাই সূর্য্য — ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে নামছে। যখন আমার পায়ের নীচে নামল তা একটা বৃহদাকার অগ্নিতে পরিণত হয়ে গেল আর আমি সেই অগ্নির মধ্যে আছি। এই রকমে নিম্নস্তরে নামলাম। সেখানে একটা বন পার হয়ে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী দেখলাম। সেই বাড়ীর ভিতর হতে কতকগুলি দৈত্য এই অগ্নি দেখে চারিদিক যাদুবলে অন্ধকার করে ফেলল কিন্তু এই অগ্নিটি আমাকে ঘিরে রেখেছিল বলে তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তারপর দেখলাম তুমি সেই জগতে নামলে এবং অন্ধকারটা কেটে গিয়ে সব স্থানটি যেন পাতলা একরকম জলময় হয়ে গেল।

উঃ এ জগৎ অবচেতনার রাজ্য হবে — যেখানে অন্ধকার ও অজ্ঞানের খেলা — সেখানে সত্য আলো নামবার চেষ্টা।

25.5.34

*

গলায় আছে বহির্দ্দর্শী মনের কেন্দ্র — physical mental, সে ঠিক স্থূল মন নয়, সে হচ্ছে বুদ্ধির যে অংশ expression করে, কথার সৃষ্টি করে, মনের ভাব চিন্তাকে কোনরকম ব্যক্ত করে, তাদের প্রভাবকে বহির্জ্জগতের মধ্যে রূপ দিয়ে সফল করবার চেষ্টা করে ইত্যাদি। তবে স্থূল মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বটে।

26.5.34

*

নিম্ন প্রাণের ভাব উঠে মনবুদ্ধিকে আক্রমণ করে প্রাণের প্রেরণায় ভাসিয়ে দেবার জন্য অথবা বুদ্ধির সম্মতি ও সাহায্য পাবার জন্য — তারপর নিজেকে সজোরে কথায় বা কার্য্যে পরিণত করে। তাহা না পারলে নিদান বুদ্ধিকে স্থগিত করে নিজের আধিপত্য স্থাপন করবার চেষ্টা করে। Higher consciousness and will ও psychicকে আধারে বেশী সজাগ ও বলবান করা, সর্ব্বত্র সক্রিয় করে রাখা ত ইহার অপনোদনের আসল উপায়।

26.5.34

*

সঃ কখন মনে হচ্ছে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার পড়া আরম্ভ করেছি, তাই আমি সুন্দর অবস্থা হতে নীচে নেমে গেছি। আবার মনে হয় আমি অত্যন্ত অপবিত্র — আমার দ্বারা এই যোগে আর বেশী উন্নতি সম্ভবপর নয়।

উঃ এই সব চিন্তা outward প্রাণের স্বভাবগত — সহজে নিরাশ হয়ে যায় — বুদ্ধির ধার ধারে না, নিজের কল্পনাকে আশ্রয় করে কত চিন্তার সৃষ্টি করে যার কোনও মূল্য নাই।

26.5.34

*

স: কাল ধ্যানের সময় একটি প্রকাণ্ড জানোয়ারকে দেখলাম আমার সামনে দণ্ডায়মান। তোমার যে শক্তি নামছিল, তা যেন নামতে না পারে সেভাবে সে তার প্রকাণ্ড দেহটিকে বিস্তৃত করে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। যখন চৈত্যপুরুষের অভীপ্সায় এবং আহ্বানে আমার আধারে তোমার শক্তি সজোরে নেমে এল তখন ঐ বিকট জানোয়ারটির দেহ চুরমার হয়ে গেল। পরে মনে হল আমার স্থূল নীচ প্রকৃতিরই কোন মিথ্যা শক্তি হবে — কিন্তু এত বড় কি করে হল, মা?

উ: স্থূল প্রকৃতিরই শক্তি — কিন্তু তোমার স্থূল প্রকৃতির নয়।

2.6.34

*

স: আর আগের মত কারুরই সঙ্গে মিশবার সময় নিজেকে প্রাণের খেলার স্রোতে ভাসিয়ে দিই না, নিজেকে স্বতন্ত্র রাখবার জন্য সচেষ্ট হই। আগে যেমন রাগ, অসন্তুষ্টি, নিরানন্দ ইত্যাদি অতি সহজে আমার মধ্যে আসত — এখন দেখতে পাই তারা আমার মধ্যে আসতে পারে না, ক্বচিৎ এলেও সেই মুহূর্তে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা যেন একটু হয়েছে।

উ: এই উন্নতিই প্রথম চাই — এটা না হলে আর কিছু স্থায়ী হতে পারে না।

2.6.34

*

স: মা, কি হেতু নিম্নশক্তিগুলো জেগে উঠে? ঘুমোলেই বেশী করে আসতে সুযোগ পায় যেমন সাধারণ অবস্থায় পায় না।

উ: ঘুমে উঠলে অবচেতনাই মূল হতে পারে — তবে প্রাণের কোন অংশে প্রকৃতিটা লুকিয়ে থেকে কোনও ক্ষুদ্র স্পর্শে বা অকারণেও উঠতে পারে, তা প্রায়ই হয়।

19.6.34

*

স: মা, সবাই আমাকে নিন্দে করে যে আমি তোমাকে শরীর সম্বন্ধে বিশ্রী অশ্রাব্য কথা সব লিখি বলে। ওরা বলে সাধনার কথা, প্রার্থনার কথা ছাড়া আর কিছুই ওরা তোমাকে লেখে না।

উঃ অসুখ যদি হয় — সে যেই অসুখই হোক — যেমন ডাক্তার কাছে রোগী লুকায় না, বলতে বাধা বোধ করা উচিত নয়, তেমনই মায়ের কাছেও মুক্তভাবে বলা উচিত। লোকের কথা শুনতে নাই, তারা না বুঝে যা-তা বলে।

26.6.34

*

যখন শান্ত হয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে খুলে রাখ, তখন মায়ের শক্তি কাজ করতে পারে। মায়ের একদিন কঠোরতা, একদিন প্রসন্নতা, ইহা সাধকের মনের সৃষ্টি, বাস্তবিক নয়। নিজেকে খুলে রাখ — ইহাই হচ্ছে একমাত্র আসল কথা।

27.6.34

*

এসব চিন্তায় ও বিলাপে সাধনার কোন উপকার হয় না। প্রাণই বাধার সৃষ্টি করে; সে প্রাণও আবার বাধার জন্য বিলাপ ও নিরাশা সৃষ্টি করে। যেমন প্রাণের বাধাকরী বেগে কোন লাভ নাই, তেমন বাধাজনিত নিরাশায়ও লাভ নাই। তার চেয়ে নম্র সরলভাবে শ্রদ্ধা ও সমর্পণ করে প্রাণের সব অশুদ্ধ movementকে ত্যাগ করে প্রাণে true consciousness (সত্য চেতনা)কে নামাবার চেষ্টা ভাল।

28.6.34

*

সঃ মা, আমার শুধু কেন বোধ হচ্ছে তুমি কঠোর নির্দ্দয়? প্রতি মুহূর্ত্তে আমি এত অন্যায় করি তবুও যে তুমি এক বিন্দু বিচলিত না হয়ে আমাকে শান্তি দাও তা আমি ভাল করে জানি — তবু কেন তোমার দৃষ্টির কঠোরতা আমার বুকে বাজছে?

উঃ প্রাণের বাধা। মানুষের প্রাণ বাহিরের জিনিষ চায়, লোকের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় চায়, নিজের বাসনা দাবী প্রভৃতির সন্তোষ চায়, মায়ের অনুগ্রহও চায় কিন্তু অমনি, নিজেকে না দিয়ে, মা আমাকে ভালবাসবেন, আদর করবেন, প্রধান স্থান দেবেন, করুণা আলো শান্তি বড় বড় অনুভূতি বর্ষণ করবেন — ইহা হচ্ছে মায়ের কর্ত্তব্য — আমি দিব্যি ভোগ করব। মা যদি না করেন, তাহলে তিনি

নির্দ্দয় কঠোর নিষ্করুণ। প্রাণের আসল ভাব এই। ওসব একেবারে পরিষ্কার করতে হবে, আসল খাঁটি সমর্পণ করতে হবে — তা হলে বাধাগুলো পালাবে।

29.6.34

*

বিড়াল ত প্রাণের (emotional ইত্যাদি) বাসনার প্রতীক।

30.6.34

*

কাজ বা পড়া ছেড়ে কোন স্থায়ী ফল হয় না। প্রাণকেই পরিষ্কার করতে হবে উপরের ভাব শান্তি সমতা পবিত্রতা তার মধ্যে এনে।

30.6.34

*

সঃ মা, আজকাল আমি যেসব অভিজ্ঞতা পাই এগুলো কি মিথ্যা? তুমি এখন অভিজ্ঞতার উত্তর দাও না বলে আমার সন্দেহ হয়।

উঃ অভিজ্ঞতা মিথ্যা নয়, তবে এই সবের অর্থ আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি যেজন্য আর কিছু লিখি না এগুলোর সম্বন্ধে। এই সব অভিজ্ঞতা উপরের স্তরের, সেখানে সত্য, নীচের স্তরে সত্য হবার চেষ্টা কচ্ছে — কিন্তু তার জন্য দরকার নিম্নস্তরে শান্তি নীরবতা পবিত্রতা বিশালতা ঊর্দ্ধ্ব চৈতন্যের অবতরণ।

2.7.34

*

সঃ প্রাণ ত পূর্ব্বে কখন আমাকে বাধা দেয়নি, কষ্ট দেয়নি। তোমার পথে ছুটে আসতে সমস্ত পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করতে সে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আজ সেই প্রাণের এত অশুদ্ধতা জেগে উঠল কেন?

উঃ প্রাণের অশুদ্ধতা ত ছিলই — এখানে জাগে নি। এখানে তার উপর মায়ের শক্তির চাপ পড়ল বদলাবার জন্য, যেজন্য বাধা প্রকট হল।

3.7.34

*

এ সব প্রাণভূমির স্বপ্ন — কিন্তু তার মধ্যে অবচেতনার কল্পিত রূপগুলো এমন মিশে গেছে যে তাদের আর কোন অর্থ বা মূল্য নেই। অনেক স্বপ্ন এই ধরনেরই হয়। যেগুলো স্পষ্ট অর্থপূর্ণ তাদেরই মূল্য আছে।

13.7.34

*

বুঝতে পারলাম না। যে অবস্থার বর্ণনা কর, সেটী শ্রেষ্ঠ অবস্থা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে — প্রকৃতি শান্ত, চাঞ্চল্য উত্তেজনার অভাব, শান্ত গভীর আনন্দ, নিথর উৎসাহ — আর কি চাও? এই হচ্ছে উন্নতির ভিত্তি।

18.8.34

*

স: মা, আমার মন প্রাণ আত্মা কোথায় অন্তর্ধান করেছে। আমার দেহটি একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মির মত পড়ে আছে — কোন রকম ভার কষ্ট উত্তেজনা কিছুই আমি বোধ করতে পারছি না। ...আমি অনেক রাস্তা দেখতে পাচ্ছি তোমার কাছে যাবার কিন্তু সোজা রাস্তা একটিও নাই। মা, পূর্ব্বে যেমন সোজা ছিল বলে আমি দেখতে পেতাম এখন কেন তা দেখতে পাই না?

উ: তুমি এখন physical চেতনার মধ্যে বসে আছ — সে চেতনা আলোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আর প্রতীক্ষা কচ্ছে।

21.8.34

*

ব্যথায়, হতাশায়, নিরানন্দে, নিরুৎসাহে কেউ কখনও যোগপথে উন্নতি লাভ করেনি। এই সব না থাকা ভাল।

24.8.34

*

এই যোগপথে মিথ্যাই হচ্ছে বড় অন্তরায় — কোন রকম মিথ্যাকে স্থান দিতে নেই — মনেও নয়, কথায়ও নয়, কার্য্যেও নয়।

1.9.34

*

অবিশ্বাস হচ্ছে নিম্নপ্রকৃতির ধর্ম্ম যেন — নিম্ন প্রকৃতির কথা শুনতে নেই। যা উপর থেকে আসে তাহাই সত্য।

1.9.34

*

যখন শরীরচেতনা প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন কাজের দ্বারাও উন্নতি হতে পারবে।

8.9.34

*

মিথ্যা ত নিম্ন প্রকৃতির স্বভাব। সেখানে সত্যকে স্থাপন করতে হবে।

11.9.34

*

শুধু ঊর্দ্ধে যাওয়ায় এ যোগের সিদ্ধি হয় না — ঊর্দ্ধের সত্য শান্তি আলো ইত্যাদি নেমে মন প্রাণ দেহে প্রতিষ্ঠিত হলেই সিদ্ধি হয়।

যদি ঊর্দ্ধ চৈতন্য নামে আর তুমি মনপ্রাণদেহের সব মিথ্যাকে প্রত্যাখান কর, তাহলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

14.9.34

*

যদি মানুষের ভালবাসার দিকে মন ছুটে বা মানুষকে আকর্ষণ কর, তাহলে ভগবানকে পাওয়া কঠিন, এই কথা খুবই সত্য।

19.9.34

*

সঃ আমার ভেতরে জ্ঞান, আলোক ও শক্তি নেমে আসছে এবং তাদেরকে ব্যবহার করবার জ্ঞানও আসছে। কিন্তু তাদেরকে প্রকাশ করবার ভাষা ছন্দ ও পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

উঃ ভাষা ছন্দের দরকার নাই — এই যা নামতে চায়, তাহা জ্ঞান — আগে

জ্ঞান পেতে, জ্ঞানের আলোকে উন্নতি সহজ হয়ে যায় — এখন আর কোনও বাহিরের ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

25.9.34

*

সাধারণ মানুষের সামনের দিকই জাগ্রত — কিন্তু এই সামনের জাগ্রত চৈতন্য সত্যি সত্যি জাগ্রত নয়, তাহা অবিদ্যাপূর্ণ, অজ্ঞ। তার পেছনে রয়েছে inner beingএর ক্ষেত্র — সে ঢাকা রয়েছে যেন ঘুমন্ত। কিন্তু এই আবরণটী খুললে এই পেছনের চৈতন্যই খোলা দেখা যায়, সেইখানেই আলো শক্তি শান্তি ইত্যাদি প্রথম নামে। যা বাহিরের জাগ্রত সত্তা করতে পারে না, তাহা এই পেছনের ভিতরের সত্তা সহজে করতে পারে, ভগবানের দিকে বিশ্বচৈতন্যের দিকে নিজেকে খুলে বিশাল মুক্তচৈতন্য হয়ে যেতে পারে।

25.9.34

*

যখন চেতনা উপরে উঠতে পারে শরীরকে অতিক্রম করে — সে ওঠা যোগের একটী প্রধান অঙ্গ — কুণ্ডলিনীও সেইরূপ উঠতে পারে। কুণ্ডলিনী কেন্দ্রস্থিত গুপ্ত চৈতন্যের শক্তি ছাড়া আর কিছু নাই।

29.9.34

*

স: বাবা, সহজ স্বাভাবিকভাবে কেমন করে লিখতে হয় তা ত আমি জানি না। আমার লেখাপড়ার দৌড় এতটুকু। আমার ভাবাবেগ ঊর্দ্ধ চৈতন্যের এই সমুদয় জিনিষগুলোকে রূপ দিয়ে ভাষার মধ্য দিয়ে এ জগতে প্রকাশ করতে চায়।

উ: জ্ঞান যদি আসে, তাহাই যথেষ্ট। লেখার কি প্রয়োজন।

29.9.34

*

আধার যত পরিষ্কৃত হয়, ততই ভাল — মায়ের সান্নিধ্য ভিতরে ও বাহিরে প্রকাশ হতে পারবে।

6.10.34

*

যদি ভিতরে সব ঠিক হয়ে যায়, তাহলে বাহিরের বাধা কি করতে পারে?

13.10.34

*

নিজেকে সংযত করে রাখা — কারো দিকে আকর্ষণ হতে না দেওয়া, কারও vital টানকে প্রশ্রয় না দেওয়া, নিজেও তার উপর কিছু ফেলবে না vital মোহ বা আকর্ষণ — ইহাকেই বলে নিজের মধ্যে ঠিক থাকা।

16.10.34

*

স: তখন এত অভিজ্ঞতা নামিয়া আসিত তোমার শক্তি শান্তি আলোর সঙ্গে — এখন আর আসিতেছে না কেন? এখন শুধু শান্তি আনন্দ আস্পৃহা নামিয়া থাকে — কিন্তু অনুভূতি ত আসিল না।

উ: যখন চেতনার কোনও স্তর উঠে যার সঙ্গে উপরের সম্বন্ধ এখনও স্থাপিত হয় না অথবা বহিঃপ্রকৃতির একটা ঠেলা আসে মনপ্রাণের উপর আর মন প্রাণ তার বশীভূত হয়, তখন এ রকম অবস্থা আসে — এ দুটী কারণের মধ্যে একটী হবে।

30.10.34

*

অবিদ্যার মধ্যে যা থাকে সে সব এক বিশ্ব চৈতন্যের মধ্যেই থাকে আলো অন্ধকারের মত, তাই বলে আলো অন্ধকার যে সবই সমান তা নয়। অন্ধকারকে বর্জ্জন করতে, আলোকে বরণ করতে হয়।

3.11.34

*

হয় psychic আধারের নিয়ামক (ruler, চালক, পথপ্রদর্শক) হয়ে বুদ্ধি মন প্রাণ শরীর-চেতনাকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করবে, নয় ঊর্দ্ধ্ব চৈতন্য শরীর-চেতনা পর্য্যন্ত নেমে সমস্ত আধারকে দখল করবে, তাহলে স্থূল চেতনায় শক্ত ভিত্তি হয়ে যাবে।

6.11.34

*

যে স্থানটী বলেছ — গলার একটু নীচে সে vital mindএর আরম্ভ — সেখান থেকে vital beingএর will ও চিন্তা বেরোয়।

7.11.34

*

সবই নির্ভর করে psychicএর প্রাধান্যের উপর — বহিঃপ্রকৃতি ক্ষুদ্র অহংকার আর বাসনা কামনাকে চরিতার্থ করবার জন্য ব্যস্ত — মানস পুরুষ আত্মা নিয়ে ব্যস্ত — কিন্তু ক্ষুদ্র অহমের তাতে কোন তৃপ্তি নাই, ক্ষুদ্রত্বকেই চায়। psychic ভগবানকে নিয়ে ব্যস্ত, সমর্পণ তারই কাজ — এক psychicই বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করতে পারে।

13.11.34

*

পুরুষ কিছুই করেন না, প্রকৃতি বা শক্তিই সব করেন। তবে পুরুষের ইচ্ছা না হলে কিছুই হতে পারে না, এ ত জানা কথা তুমি কখন শোন নি?

8.12.34

*

সাধনার পথ ত দেখিয়ে দিয়েছি। সংযত হয়ে শান্তভাবে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে খুলে দাও, সে শক্তির কাজে সম্মতি দাও, নিম্নপ্রকৃতির প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান কর। বাহিরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ো না — ভগবানের জন্যই নিজেকে পবিত্র স্বতন্ত্র রাখ। মায়ের উপর যদি প্রেম থাকে, তবে সে যেন ভিতরের প্রেম হৌক, বাহিরের নয়, প্রাণের অশুদ্ধ প্রেম নয়, বাসনা দাবির নয় — বাধাকে

ভয় করো না — নিরাশাকে স্থান দিয়ো না। স্থির শান্ত ভাবে সাধনাই করে যাও, শেষে যা এখন শক্ত, তা সহজ হয়ে উঠবে।

13.12.34

*

স্নায়বিক কল্পনাও অসুখ সৃষ্টি করতে পারে।

14.12.34

*

শরীরের স্নায়বিক ভাগে (nervous systemএ) শান্তি ও শক্তি নাবান, এই ছাড়া উপায় নাই nervesকে সবল করবার।

15.12.34

*

স: মা, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি সারা দিনরাত নীরব নির্জনে কেবল তোমাকে নিয়ে থাকতে — কিন্তু সব সময় তা পেরে উঠি না। চেতনা আধারে নেমে আসে এবং বাহিরের জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

উ: বাহিরের দিকে আকর্ষণ আছে বলে — সে আকর্ষণ এত সহজে যায় না।

18.12.34

*

খুব শক্তির চাপে মাথা ধরা হতে পারে, তবে অসুখের ভাব হবার কথা নাই।

3.1.35

*

স: মা, এতদিন পরে শক্তিটিকে আমার মাথা এবং দেহ বিনাকষ্টে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। সব সময় প্রথম শক্তিটি আধারে নামবার সময় এইরকম অগ্নির মত হয়ে নামে কেন? যেমন রঙটি আগুনের ন্যায়, তেমনি তেজও আগুনের ন্যায়।

উঃ অশুদ্ধতা যদি থাকে মনে প্রাণে বা শরীরে, resistance যদি থাকে, তাহলে অগ্নির দরকার হয়।

5.1.35

*

ভিতরের nearnessই আসল nearness — যারা বাহিরে মায়ের কাছে কাছে থাকে, তারাই যে near, এই ধারণা মিথ্যা।

15.1.35

*

অসুররা পথের মধ্যে সব সময় আছে, তবে মানুষ প্রায়ই চেনে না — নিম্ন প্রকৃতির বশে রয়ে তাদের দাস হয়ে থাকে।

19.1.35

*

পাপের কথা কেন — পাপ নয়, মানুষের দুর্ব্বলতা। আত্মা সর্ব্বদা শুদ্ধ, psychic being (চৈত্যপুরুষও) শুদ্ধ, সাধনা দ্বারা অন্তরতাও (inner mind, vital, physical) শুদ্ধ হতে পারে অথচ external being বহিঃসত্তা বহিঃ-প্রকৃতিতে সেই চরিত্রের পুরাতন দুর্ব্বলতা অনেক দিন লেগে থাকতে পারে, সম্পূর্ণ শুদ্ধ করা কঠিন। চাই complete sincerity, চাই দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য, চাই সদাজাগ্রত ভাব। Psychic being যদি in frontএ থাকে, সর্ব্বদা জেগে থাকে, প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে ভয় নাই, কিন্তু তা সব সময়ে হয় না। রাক্ষসী মায়া সেই পুরানো weak pointদের ধরে মনকে ভুলিয়ে প্রবেশ করবার পথ পায়। প্রত্যেকবার তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পথ রোধ করতে হয়।

22.1.35

*

সঃ মা, আজ কয়েকদিন ধরে স্বপ্নের মধ্যে দেখছি যে আমি সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পুরাতন সব আত্মীয়েরা সযত্নে আমাকে বিদায়ভোজন করাচ্ছে আর কাঁদছে। আমার মন সেদিকে নাই। সুন্দর সুন্দর নদীতে স্নান করছি আর বন্ধনহীন

একটা আনন্দে যেন বিভোর হয়ে রয়েছি।

উ: এই সব প্রাণজগতের কথা । সেখানে যে আত্মীয়দের টান ও সম্বন্ধ ছিল, সে শিথিল হয়ে গিয়েছে আর একেবারে বন্ধ হবার তৈয়ারী হচ্ছে। তার বদলে সত্য প্রাণের আনন্দ ও সৌন্দর্য্য তোমাকে ডাকছে। স্বপ্নের অর্থ এই।

23.1.35

*

যখন কোনও একটা শক্তি আধারে নামে, তখন receive করবার difficultyর দরুন কম্প ও আলোড়ন হয়। শান্ত হয়ে থাকলে, সত্ত্বগুলি খুলে দিলে আধার absorb ও assimilate করতে আরম্ভ করে।

26.1.35

*

স: মা, এখন ঘুমে, ধ্যানে অথবা সাধারণ অবস্থায় হঠাৎ চিন্তা বা কল্পনার মধ্যে আমার খুব উপকারী বা আত্মীয় মানুষ কেউ আসে। আমি তাকে চিনতে পারি না; অথবা কোন জিনিষ বা একটি দৃশ্য দেখি যার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। কেমন আবার সেই মানুষটিকে মানুষ ও বস্তুটিকে বস্তু বলে মনে হয় না।

উ: অনেকবার ভিতরের কিছু সেইরূপ আকৃতি ধরে দেখা দেয় বটে — স্বপ্নে বা ধ্যানে। কিন্তু সেসব ত বাহিরের জিনিষ নয়, ভিতরের কোনও না কোনও জিনিষের সূচনা দিতে আসে।

26.1.35

*

স: মা, দেখা একটি জিনিষ — অনুভব করা অন্য জিনিষ এবং বুঝা ভিন্ন জিনিষ। আমি ধ্যানে অথবা বাহিরে যা দেখি তা হৃদয়ে বোধ করি, কিন্তু বুঝি না, মা।

উ: তার জন্য জ্ঞানের বিস্তার চাই। সে জ্ঞান ক্রমে ভিতর থেকে বা উপর থেকে আসতে পারে।

26.1.35

*

যখন মনপ্রাণ ছুটোছুটি করে বাহিরে, তখন ভিতরের কোনও পুরুষের কথা শুনবে কেমন করে? হয় বাহিরের কোলাহলে সে কথা থেমে যায়, না [হয়] শোনা যায় না। তবে এমন অবস্থা আনতে হয় যার মধ্যে যখন বাহিরের কোলাহল হয়, তখনও ভিতরের পুরুষ সজাগ হয়ে থাকে, হয় অবিচলিত হয়ে দেখে থাকে, নয় আস্তে আস্তে তার প্রভাব বিস্তার করে ও বাহিরের কোলাহলকে থামিয়ে দেয়।

ভিতরের পুরুষ অনেক থাকে। আছে psychic being চৈত্যপুরুষ, আছে ভিতরের মনোময় পুরুষ, ভিতরের প্রাণপুরুষ, ভিতরের physical পুরুষ। উপরে আছে কেন্দ্রীয় সত্তা — এই সকল তারই নানান আকৃতি। চেতনার বিকাশে এই সকলকে চেনা যায়।

26.1.35

*

Physicalএর কেন্দ্র মেরুদণ্ডের শেষভাগে, যাকে মূলাধার বলে, সেখানে — তবে প্রায়ই দেখা দেয় না, তার presence অনুভব করা যায়।

29.1.35

*

এ ত প্রাণময় পুরুষ, emotional vitalএ অধিষ্ঠিত। প্রাণময় পুরুষের তিনটী স্তর আছে — হৃদয়ে, নাভিতে, নাভির নীচে। হৃদয়ে সে হয় emotional being, নাভিতে বাসনাময়, নাভির নীচে sensational অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের টান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের ভাব নিয়ে ব্যস্ত।

29.1.35

*

তোমার অনুভূতি খুব ভাল — উপরের শক্তির চক্র (কার্য্যকরী-গতি) নামছে নীচ প্রকৃতিকে আলোকিত ও সচেতন করবার জন্য, আর এদিকে মায়ের কার্য্যের জন্য ভিতরের higher vital পুরুষ সামনে এসেছে — আমরা যাকে বলি true vital being।

তোমার কাজ দেখে মা খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। কোন ভয় নেই — অহংকার

ইত্যাদিকে স্থান না দিয়ে সরলভাবে মায়ের কাজ করে যাও, সবদিকে উন্নতি হয়ে যাবে।

18.4.35

*

এই সব difficulties সাধনায় হয়ই — বিশেষ প্রাণে ও শরীরে — সামঞ্জস্য হওয়া পর্য্যন্ত। সে সামঞ্জস্য আসে (১) psychic সত্তার আধিপত্য যখন স্থাপিত হয় মন প্রাণ শরীরের উপর, (২) ঊর্দ্ধ্বচৈতন্যের শান্তি ও পবিত্রতা যখন উপর থেকে নেবে সমস্ত beingএ — নিদান সমস্ত inner beingএ বিশাল অটলভাবে স্থাপিত হয়ে যায়।

10.6.35

*

কাজের জন্য, সাধনার জন্য শরীরের ভাল অবস্থা চাই।

20.6.35

*

ডাক্তার খুঁজছে — কারণ তোমার শরীরে এমন কিছু দোষ পাচ্ছে না যাতে এসব স্বভাবতঃ হয়। ...যাই হৌক এত উতলা হবার কোনও কারণ নাই। যোগের সাধক তুমি, যা হয় তা শান্ত অবিচলিত মনে দেখে ভগবানের উপর নির্ভর করে যোগপথে অগ্রসর হও। ইহাই এই পথের আর প্রায় সব যোগপথের নিয়ম।

21.6.35

*

সঃ মা, গতরাত্রে দেখলাম প্রকাণ্ড বাগানে একটি হ্রদ, হ্রদের মধ্যে অনেক-গুলো সাপ খেলা করছে। সেখানে একটি সর্পাকৃতি বৃহৎ জন্তু মস্তকহীন; মস্তকের পরিবর্ত্তে বড় ভীষণ একখানি মুখ ও দুইপাটি দাঁত। জলাশয়ে লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ উঠে সোজা আমার দিকে একটি বড় হাঁ করে গ্রাস করার জন্য আসছে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি ওর পেটের মধ্যে আরো কত জন্তু আছে। আমার কাছে আসার আগেই একটি অসুরাকৃতি জীব আপনাআপনি যেন ওর মুখে পড়ল

— তখন সে আর এল না, আপনাআপনি পিছিয়ে পড়ল। আমার মনে হল আমার প্রাণের মধ্যে অশুদ্ধ শক্তি লুকায়ে আছে। আজ আমি তোমাকে ডাকছি বলে আমাকে গ্রাস করতে এসেও গ্রাস করতে পারেনি।

উ: তোমার ব্যাখ্যা ঠিক — হৃদ হল নিম্নপ্রাণ — সেখানে অনেকগুলো ছোট ছোট নিম্নপ্রকৃতির শক্তি আছে — কিন্তু তাদের নীচে অবচেতনার সর্ব্বগ্রাসী এক তামস শক্তি আছে যে সব গ্রাস করে, সাধককে ও সাধনাকে গ্রাস করতে আসে। তার মুখে নিজের আসুরিক বৃত্তি যত যদি পড়ে (ধ্বংস হয়ে যায়), তখন আর সে তমঃ সাধককে গ্রাস করতে পারে না।

1.7.35

*

যদি মার দিকে, উপরের দিকে সবসময় মনপ্রাণকে turned করে রাখ, তাহলে নীচের দিকে রাক্ষস বা আর কেহ তোমাকে টেনে নিতে পারবে না।

4.7.35

*

এ সকল প্রাণজগতের স্বপ্ন। সেখানে নিজের বা লোকের প্রেরণা, চিন্তা, বাসনা আর যত ভাল বা খারাপ শক্তির চরিতার্থ হবার চেষ্টা নানারকম আকার গ্রহণ করে — স্বপ্নে সে সব দেখা দেয় যেন সত্যই হচ্ছে।

22.7.35

*

এ সব কান্না চিৎকার ভাবের উত্তেজনা সাধনার পথে ভাল নয়, এ সব ছেড়ে দিতে হয়। নিরহঙ্কার ভাব, ভিতরের শান্তি, শান্ত সমর্পণ, এই হচ্ছে যোগসাধনার ভিত্তি। কাজেও সেই ভাবই চাই।

25.10.35

*

যদি শান্ত মনপ্রাণ চাও ত সব দাবী আবদার অহং ভাবের বৃত্তি অতিক্রম করতে হয়। শান্ত মনপ্রাণই সাধনার উন্নতির মুখ্য সহায়।

26.10.35

*

একমাত্র পথ আছে প্রাণের বশ না হয়ে নিরহঙ্কারভাবে কাজ করা ও psychicএর সাধনা করা।

23.12.35

*

প্রত্যেক পুরুষের স্থায়ী অবস্থান তার নিজের কেন্দ্রে বা ক্ষেত্রে — চৈত্যপুরুষের গভীর হৃদয়ে, প্রাণপুরুষের হৃদয়ে নাভিতে বা তার নীচের যে কেন্দ্র সেখানে। অথবা সমস্ত প্রাণপুরুষকে এই সমস্ত প্রাণক্ষেত্র ব্যাপ্ত করিয়া অনুভব করি। মূলাধারের উপরই প্রাণক্ষেত্রের শেষ, মূলাধার থেকে পা পর্য্যন্ত অন্নময় (physical) পুরুষের ক্ষেত্র, মূলাধারে তার বসবার স্থান। কিন্তু যখন যোগের অভ্যাস হয় তখন নিম্নের চেতনা উপরে উঠতে লাগে — যেমন প্রাণচেতনা — দেখছি হৃদকেন্দ্র ও তার নিকটস্থ অংশ থেকে সমস্ত উপরের প্রাণচেতনা উঠে যাচ্ছে, মাথার উপরে ঊর্দ্ধ্ব চেতনার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এর সঙ্গে প্রাণপুরুষ যেখানে উঠছে, তাও অনুভব করতে পারি। এর উদ্দেশ্য এই যে ওখানে উঠে অধ্যাত্মের সঙ্গে যুক্ত হয়, অধ্যাত্মের স্বভাবের সঙ্গে প্রাণস্বভাবের মিল হয়, শেষে ঊর্দ্ধ্বচেতনা নীচে নেমে সমস্ত প্রাণচেতনা প্রাণপ্রকৃতিকে অধিকার করে, ভাগবত চৈতন্যে পরিণত করে। এই হচ্ছে যোগের নিয়ম।

10.1.36

*

স: মা, সারাদিন সবকিছুর ভিতর দিয়ে দেখছি আমার নাভি হতে একটি জিনিষ বুকে উঠে মানুষের স্নেহের কথা চিন্তা করছে, মানুষের ভালবাসায় আমাকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। মাথা হতে আর একটি জিনিষ নেমে বুকে এসে ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভগবৎ ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত কিছুকে সতেজ করে তুলছে। ...কি হয়েছে, মা?

উ: যা উঠে প্রাণ থেকে, তা তোমার সাধনায় একটী প্রধান বাধা, মানুষের প্রেম ও ভালবাসার আকর্ষণ — উপরের থেকে নামবার চেষ্টা করে তার উল্টো ভাব, ভাগবত ভালবাসা পাওয়ার আস্পৃহা — এ বড় স্পষ্ট অনুভূতি, তাতে এমন কিছু নাই যে বোঝা কঠিন।

11.3.36

*

সঃ আজ বিকালে আমার মাথার সামনে দেখলাম খুব কালো চতুষ্পদ একটি বিরাট জন্তু; সেটি আমার পিছনদিক থেকে এল। তার জিভ নড়ছিল এবং গলা ওঠানামা করছিল খাবারের জন্য। আমি প্রাণপণে তোমাকে ডাকতে লাগলাম, তারপর জন্তুটি অন্তর্হিত হয়ে গেল।

উঃ অর্থাৎ একটী নিম্ন প্রাণশক্তি যাকে তুমি আহার দিতে অভ্যস্ত।

21.4.36

*

[কামের প্রকোপ সম্পর্কে]

শরীর চেতনাকে purify করলে এ সব যাবে, অন্যথা যাওয়া কঠিন।

29.5.36

*

সঃ মা, একদিন দেখলাম আমার এক বৎসর বয়স্ক শিশুটি খুবই পীড়িত। আমি তার চিকিৎসার জন্য পবিত্রর কাছে গেছি এবং সে রোগীর অবস্থা আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল এবং দেখিয়ে দিল। তারপর একদিন দেখলাম শিশুটি ভীষণ পীড়ায় মরে গেল। কোন্ শিশুকে দেখি মা? আমার নিজের যে শিশু ছিল সে তো এখন দশ-এগার বছরের হয়েছে। আর যদি চৈত্যপুরুষ বলে ধরি, তবে সে মরবে কেন — সে ত মরে না।

উঃ এ ত psychic being নয়*, প্রকৃতির উৎপন্ন আর কিছু যা তোমার ভিতরে মরে গেল।

7.7.36

*

সঃ মা, আমার যোগপথের যত বাধা, মিথ্যার আবরণ হতে প্রাণের বাধা হতে নিজেকে মুক্ত করতে চাই — পারি না। তারা আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কেমন করে মন প্রাণ ও দেহ চৈতন্যকে পরিষ্কার ও পবিত্র করতে পারব, দেখিয়ে দাও।

উঃ এই অবস্থা হতে পরিত্রাণের উপায় এই — সরল স্পষ্টভাবে বুদ্ধির সব

* অস্পষ্ট পাঠ।

ভুল, প্রাণের সব দোষ চিনে নেওয়া, নিজের কাছে, মায়ের কাছে না লুকায়ে আলোতে তুলে ধরা, প্রত্যাখ্যান করা মায়ের শক্তিকে ডেকে। একদিনে এটা সফল হয় না, কারণ প্রাণমন resist করবেই, প্রকৃতির পুরাতন অভ্যাস সহজে যায় না। কিন্তু sincere will যদি থাকে আর তার সঙ্গে perseverence, ক্রমে সহজ হয়ে যায় আর শেষে পূর্ণ সফলতা হয়।

10.7.36

*

দেহ প্রাণ অমনই স্বচ্ছ হয় না — সাধনা দ্বারা আত্মসংযম দ্বারা প্রাণকে পবিত্র করতে হয় — প্রাণ স্বচ্ছ হলে, দেহের অনেক রোগকষ্টের উপশম হয়।

11.7.36

*

সঃ মা, বুদ্ধির ভুল সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তা আমি ধরতে পারছি না। মন প্রাণ সাধনপথে বাধা দেয় বলে জানতাম — কিন্তু বুদ্ধির যে দোষ আছে এবং বুদ্ধি যে ভাগবত পথে চলতে বাধা দেয় তা ত জানতাম না।

উঃ বুদ্ধি যখন প্রাণের ভ্রান্তিকে সমর্থন করে, অহঙ্কারকে সমর্থন করে, ভুল অবতরণের জন্য justifying reasons খুঁজে উপস্থিত করে, মিথ্যা কল্পনাকে আশ্রয় দেয়, এ সবই বুদ্ধির ভুল। আরও অনেক আছে। মানুষের বুদ্ধি অনেক রকম অসত্যকে স্থান দেয়।

11.7.36

*

অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ডুবে থাকা খুব ভাল কিন্তু সেখান থেকে কাজকর্ম্মও করিবার সামর্থ্য develop করতে হয়।

15.9.36

*

যখন স্বভাবে দোষ দেখেছ তখন তাতে আর সায় না দিয়ে মায়ের শক্তিকে ডেকে স্বভাব থেকে ফেলে দাও। সাধকদের ভিতরের অনুভূতি থাকলেও বাহিরের

স্বভাব বদলায় না, এই হচ্ছে সব অশুভের মূল কারণ। এই দিকেই লক্ষ্য ও চেষ্টা বিশেষ turn করা এখন উচিত সকলের।

24.9.36

*

মানুষমাত্রেই এই সব শক্তির প্রভাব আছে। এ শক্তিগুলি তোমার ভিতরে নয়, তারা বিশ্বপ্রকৃতির নিম্ন force, কিন্তু তাদের প্রভাব সকলের ভিতরে। যতদিন নিজের ভিতরে যেসব wrong movement আছে, সেসব চিনি না, acknowledge করতে চাই না ততদিন এই প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া কঠিন। যদি চেনা যায়, তাহলে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। তবে বিচলিত না হয়ে দৃঢ়ভাবে দেখে reject করা উচিত। মায়ের শক্তিকে ডেকে সব সরিয়ে দিতে হয়।

13.10.36

*

চৈত্যপুরুষ, অন্তরাত্মা, সূক্ষ্মসত্তা যে মনপ্রাণ ইত্যাদিকে ধারণ করে আছে, এই সব ত একই, psychic being — আত্মার স্থান মেরুদণ্ডের মধ্যে নয় — আত্মা ত সর্ব্বব্যাপী, সকলের আত্মা এক।

17.7.37

*

না খাওয়া যে আধ্যাত্মিকতার একটী অঙ্গ, এ ধারণা ভুল। লোভ থাকবে না, লোভের জন্য খাবে না, প্রয়োজনের বেশী খাবে না এই নিয়মগুলো অবশ্য পালন করতে হয় — কিন্তু শরীরের পক্ষে যা দরকার তা খেতে হয়। গীতায় বলে খুব বেশী খেলে যোগ করা যায় না, না খেয়ে, খুব কম খেয়েও করা যায় না।

22.7.37

*

চায়ের অপকারও আছে, উপকারও আছে। খুব strong করলে বা বেশী চিনি ঢাললে শরীরের অপকার হয়, মাত্রায় বেশী খেলেও তাই হয়। অল্প চিনি নিলে আর light চা করলে (boiling জলে চা ঢেলে তখনই বা শীঘ্রই কাপে pour out করতে হয়) অপকার হয় না।

14.6.38

*

[সাধিকার কন্যার কাছ হতে অনেক চিঠি আসছে নানারকম সমস্যা নিয়ে। শ্রীঅরবিন্দকে সাধিকা সেসব লিখে জানাচ্ছেন।]

বাপের বাড়ী যেতে চায় না, দিদিমার অধীনে ভাল লাগে না ত কি করা যায়? মানুষের জীবনে স্বেচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যের জায়গা খুব কম, কর্ত্তব্যই প্রধান। যে খুব শক্তিমান, তাকেও প্রথম আত্মসংযম বাধ্যতা discipline শিখতে হয় — যে চায় না তার দুঃখভোগ অনিবার্য্য।

6.7.38

*

তোমার অনুভূতি ত সত্য কিন্তু যে সব নাম দিয়েছ, সে সবই ভুল। মানুষের পৃথক পরমাত্মা নাই, পরমাত্মা ভগবান, ভগবানই সকলের পরমাত্মা। যাকে পরমাত্মা বল, সে তোমার জীবাত্মা, মাথার উপরে তার স্থান, ভগবানের সঙ্গে মায়ের সঙ্গে যুক্ত যে। যাকে জীবাত্মা বল, সে জীবাত্মা নয়, সে তোমার প্রাণপুরুষ, এমনকি নিম্ন প্রাণপুরুষ। প্রাণ হৃদয়ের নীচে থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তার মধ্যে নাভির নীচে যা তা নিম্নপ্রাণ। তেমনই আত্মা যাকে বল, তাকে আত্মা বলা যায় না, সে psychic being, হৃদয়ে চৈত্যপুরুষ। Psychic being (অন্তরাত্মা বলতে পার) জীবাত্মা সঙ্গে যুক্ত, মায়ের সঙ্গে যুক্ত হলে সত্যচেতনার ভিত্তি স্থাপিত হয়। কারণ এই psychic অন্তরাত্মাই মানুষের সমস্ত মনপ্রাণদেহকে ধারণ করে পেছন থেকে, তবে সে গুপ্ত, সাধারণ মানুষের মন প্রাণ দেহ তাকে দেখে চেনে না। মানুষ প্রাণপুরুষকে নিজের আত্মা বলে ভুল করে, প্রাণপুরুষের বশ হয়ে দুঃখভোগ করে। যখন প্রাণপুরুষের বশ না হয়ে, অন্তরাত্মার psychic beingএর বশ হয়, তখন সব সুন্দর সুখময়, মায়ের সঙ্গে যুক্ত মা-ময় হয়ে যায়। এই সব তুমি দেখছ, যা দেখেছ তা ঠিক — শুধু নামগুলোকে বদলাতে হবে।

‘‘এ’’কে লিখিত

এমন কিছুর দরকার নাই যে ঘরে বসে না বেরিয়ে মাকে ডাকতে হবে। আর সেই সম্বন্ধে যা করতে চাও তা মা পছন্দ করেন না। কারণ তোমার বয়স ছোট, তুমি পারবে না, শুধু কষ্ট পাবে আর মা তা চান না যে তুমি কষ্ট পাও।

না, তার চেয়ে এই ভাল যে তুমি সব সময় মনে মনে মাকে স্মরণ কর, মাকে ডাক — সুখে দুঃখে, সব অবস্থায় তাঁরই সান্নিধ্য, তাঁরই সাহায্য, তাঁরই আশীষ ও রক্ষা চেয়ে নাও, তাহলে সব হবে।

10.5.35

*

জানি না কবে তুমি আবার আসতে পারবে — বোধহয় তোমার বাবা এত শীঘ্র ফিরে আসতে দেবে না, তাতে দুঃখিত হয়ো না। মাকে সর্ব্বদা মনে রাখ, তিনি তোমার সঙ্গেই থাকবেন। তিনি সঙ্গে আছেন, রক্ষা কর্চ্চেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস যেন সব সময় তোমার মধ্যে জাগ্রত থাকুক। তিন মাস চেষ্টা করবে, তারপর ফল না হলে ছেড়ে দেবে, সে কোন কাজের কথা নয়। আসল কথা, তাঁকে মনে রাখ আর ডাক যত দিনই লাগুক, তাই করতে করতে তুমি সচেতন হয়ে যাবে, মা তোমার সঙ্গে আছেন ইহা অনুভব করবে, দেখাও পাবে।

13.5.35

*

আমি বাঙ্গলায়ই চিঠি লিখলাম। এর পরে তাহাই করব। ভবিষ্যতে কি হবে বলা কঠিন, তবে আশা করি এমন ঘটনার সমাবেশ হবে যাতে বেশী দেরি না করে তুমি ফিরে এসে দর্শনলাভ করতে পার। ততদিন আমাদের মনে রেখে অপেক্ষা কর। আমাদের সম্বন্ধে যতই মনে মনে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবে, ততই শীঘ্র জীবনে চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা থাকবে।

14.5.35

*

যে বাড়ীতে কেহ ভগবানকে ডাকে না, সেখানে তোমার না যাওয়া ভাল। কিন্তু যদি তোমাকে সেখানে পাঠানও হয়, তাহলেও তুমি মাকে ডাক। অন্যভাবে যদি না পার, যেমন এখন কর, তবে নীরবে নিজের মনের ভিতরে ডাক — এমনভাবে যেন কেহ বুঝবে না, জানবে না। তাহলেই তোমার ডাকার ফল তুমি পাবে।

17.5.35

*

কেন তুমি লিখছ যে আমরা তোমার উপর রাগ করেছি? আমরা তোমার উপর কোনও দিন রাগ করি নি, আজও করি নি। রাগ করবার কোনও কারণও ছিল না, তুমি কোনও দোষ কর নি।

তুমি কি কাল সকালে আমার চিঠি পাও নি? আমি ত চিঠি লিখেছিলাম, আমাদের ভালবাসার কথা, তুমি যে নিশ্চয় আমাদের পাবে সে কথা লিখেছিলাম। যাই হৌক আমি আবার সে কথা লিখছি।

আমরা তোমাকে খুবই ভালবাসি আর সে ভালবাসা চিরকাল অটুট হয়ে থাকবে। মন খারাপ বা নিরাশাকে মনে স্থান দিয়ো না। এই দৃঢ় বিশ্বাস সর্ব্বদা মনে পোষণ কর যে আমি মাকে পাবই, শ্রীঅরবিন্দকে পাবই, দূরে থাকলেও একদিন তাদের দেখা পাব। সর্ব্বদা আমাদের মনে রাখ, সর্ব্বদা আমাদের দিকে চেয়ে দেখ। যারা ইহাই করে তারা আমাদের পায়, তুমিও নিশ্চয় পাবে। আর ইহাই যদি কর, তাহলে এমন ঘটনার সমাবেশ হবার কথা যে তুমি এখানে আসতে পারবে, আমাদের দর্শনলাভ করতে পারবে।

কাল নিশ্চয় এস। মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাও।

17.5.35

*

আমি তোমার তিনটা পত্র পেয়েছি, নানাকাজে বিব্রত হয়ে উত্তর দিতে পারিনি — আজ তিনটী পত্রের একসঙ্গে এই উত্তর দিলাম। এইবার দর্শনে আসা অসম্ভব, সে অনেকটা জানা কথা ছিল, এই অল্প মাসের মধ্যে দুইবার আসা সহজে হবার নয়। দুঃখিত হয়ো না, স্থির হয়ে মাকে স্মরণ করে ভিতরে বিশ্বাস ও বল সংগ্রহ করে থাক। তুমি মা ভগবতীর সন্তান, শান্ত ধীর শক্তিময়ী হয়ে যাও। মাকে ডাকার কোন বিশেষ নিয়ম [নাই]। মার নাম করা, মাকে ভিতরে ভিতরে স্মরণ করা, মাকে প্রার্থনা করা এইসবকে মাকে ডাকা বলা যায়। যেমন তোমার ভিতর থেকে ওঠে, তেমনই ডাকতে হবে। ইহাও করতে পারো যে সকালের সময় চোখ বুজে মা তোমার সামনে আছেন এই কল্পনা বা মনের চিত্র করে তাঁকে প্রণাম কর, সে প্রণাম মার কাছে পৌঁচবে। যখন সময় থাকে, মা তোমার সঙ্গে আছেন, সামনে বসে আছেন এই ভাব রেখে তাঁকে ধ্যান করতে পার। এই সব করে লোকে শেষে মার দেখা পায়। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। মার আশীর্ব্বাদও এর সঙ্গে পাঠালাম। জ্যোতির্ম্ময়ী মাঝে মাঝে তোমার

কাছে প্রণামের সময়ে আশীর্ব্বাদী ফুল গ্রহণ করে পাঠিয়ে দিবে।

28.5.35

*

তোমার দুখানা চিঠি পেয়েছি। আমি যাহা তোমাকে লিখেছিলাম যখন এখানেই ছিলে, তা মনে রেখে ধীরচিত্তে মাকে স্মরণ কর, মাকে ডাক। প্রথম চোখ বুঁজে মাকে দেখা হয়, নিজের ভিতরে তাঁর কথা শুনতে পারবে, কিন্তু তাও সহজে হয় না। মানুষ বাহিরের রূপ দেখে, বাহিরের কথা ও শব্দ শোনে — শুধু যা তার স্থূল চোখে পড়ে ও কানে বাজে, তাই দেখে, তাই শোনে। আর কিছু দেখা বা শোনা তার পক্ষে কঠিন, ভিতরের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি খুলতে হবে, তার জন্য চেষ্টার দরকার, সময় লাগে। যদি প্রথমে নাও হয়, দুঃখিত হয়ো না। মা তোমাকে সর্ব্বদা ভালবাসবে ও মনে রাখবে, তুমি একদিন তাঁর দেখা পাবে, তাঁর কথা শুনবে। দুঃখ করো না, মায়ের শান্তি ও শক্তিকে তোমার ভিতরে ডাক, তার মধ্যে মায়ের সান্নিধ্য টের পাবে।

16.6.35

[চিঠির শেষে শ্রীমা যোগ করেন]:

Love and blessings to my dear little 'E'.

।

না, তোমার উপর আমরা রাগ করিব কেন? বড় ব্যস্ত ছিলাম, লিখবার সময় ছিল না। এখনও দর্শনের মাস বলে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। এবার দর্শনের জন্য অনেক লোক আসছে। আশা করি তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এর চেয়ে — এর মধ্যে দুবার খারাপ হয়েছে, লিখেছ — এর পর যেন শরীর ভাল হয়ে থাকে। রাঁচি যাবে লিখেছ, কবে যাবে ও কদিন থাকবে?

এখনকার অবস্থায় চিন্তিত বা দুঃখিত হয়ো না। মায়ের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে শান্ত প্রসন্ন হয়ে থাক, ভাল সময়ের অপেক্ষায় থাক। একদিন ত মায়ের দেখা পাবেই। যাঁরা দৃঢ়ভাবে তাঁর উপর নির্ভর করে ও ডাকে, তারা তাঁর কাছে শেষে পঁহুছে। এই পার্থিব জীবনে অনেক বাধা ও ব্যাঘাত আসতে পারে, সময় লাগতে পারে, তবেও তারা মায়ের কাছে পঁহুচে।

4.8.35

*

অনেকদিন চিঠি লিখতে চেয়েও লিখতে পারিনি। কাজের ভীড় কমছে না, কেবলই বাড়ছে, একদিকে কমলেও অন্য দিকে বাড়ে। এসব কাজ করতে করতে রাত পোহায়, তারপর বাহিরে চিঠি লেখার সময় আর থাকে না। আজও তাই হয়েছে তবেও এবার চিঠি লিখতে বসেছি।

দেখছি তোমার ও তোমার মার খুব অসুখের সময় গেছে। আশা করি এমন আবার হবে না, এবার শেষ হয়ে গেছে। অনেক দিকে এরকম হয়েছে, এখানে ও বাঙ্গলা দেশের অনেক জায়গায় সাধকদের মধ্যে। এই অবস্থা কাটান সহজ হয়নি।

না, তোমার উপর রাগ করি নি। রাগ করব কেন। আমাদের ভালবাসা তোমার উপর অটুট হয়ে রয়েছে, অটুট থাকবে।

আর কিছু লিখবার সময় নেই, পরে লিখব। আমাদের আশীর্ব্বাদ নাও।

26.12.35

[শ্রীমা লিখেছেন]: Love and blessings to my dear 'E'.

।

এতদিন রোজ সমস্ত দিন কাজ ছিল বলে তোমার চিঠিগুলোর উত্তর দিতে পারিনি। এখনও সেই অবস্থা চলছে, তবে আজ রবিবার, কাজ একটু কম পড়েছে, আমি দুলাইন লিখছি।

আমাদের কথা ভাবলে, স্বপ্নে আমাদের দেখলে মন খারাপ হয় কেন? স্বপ্নে মা তোমার কাছে গেছেন, সে আনন্দের কথা হওয়া উচিত। এখন দেখা হবে না বলে মন খারাপ হতে দিয়ো না। মা আমাকে স্মরণ করছেন, ভালবাসছেন, ভিতরে আমার কাছে সর্ব্বক্ষণ রয়েছেন এই বিশ্বাস করে শান্তমনে থাক, সময়ের অপেক্ষায় থাক, — যে সব বাধা এখন আছে, সেগুলো চিরকাল থাকবে না।

মাকে সবসময় স্মরণ কর, তাঁর উপর নির্ভর কর। সবসময় স্মরণ করে রাখলে একদিন দেখা হবে, নিজের ভিতরেও দেখা পাবে।

*

দেখ, আমি যদি তোমার সঙ্গে দেখা করি, আর সকলের হাতে আমি কি নিস্তার পাব? তারা কি বলবে না "তুমি 'এ'র সঙ্গে দেখা করলে আর আমাদের সঙ্গে পারলে না? এ কিরকম অবস্তা? এ কি অবিচার? আমরাও কি মানুষ নই?"

তারপর যখন একশ পঞ্চাশ জন হুড়মুড় করে আমার উপর এসে পড়বে, তখন আমার কি দশা হবে, ভেবে বল দেখি?

বাঙ্গলায় বড় চিঠি লিখতে হবে? আমার কি সে ক্ষমতা আছে না সময় আছে? এই ক্ষুদ্র চিঠির উত্তর লিখতে লিখতে প্রাণও বেরিয়ে গেল, রাত পোহাল। এবার না হয় বাঙ্গলায় লিখলাম, কিন্তু এর পরে আর এমন কসরৎ করতে পারব না, বলে রাখছি।

*

আমি অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি — ইচ্ছা ছিল কিন্তু হয়ে উঠেনি। এবার দর্শনে সাতশ লোকের উপর এসেছে — অনেকে এসেছে 15thএর অনেক আগে, অনেকে রয়েছে 15thএর পরে, আজ পর্য্যন্ত আছে, এখন চলে যাচ্ছে। এর দরুণ কাজ অসম্ভব রকমে বেড়ে গেছিল, আশ্রমের কাজও খুব বেড়েছে। দিনের বেলা আর সমস্ত রাত্রীও খেটে কাজ শেষ করা যায় না। এর জন্য বাহিরে চিঠি লিখতে পারি নি। এখন একটু কমে যাচ্ছে, তাই এই চিঠি লিখতে পারছি। তবে যা কমে গেল তা এতটুকু মাত্র। এখনও আমার অনেক আবশ্যকীয় কাজ পড়ে রয়েছে, করতে পারিনি, এখনও সময় পাচ্ছি না।

জ্যোতির্ম্ময়ীর চিঠি ও ফুল কেন পাও নি, তা ঠিক বুঝি না — তবে এর মধ্যে তার চিঠি বোধহয় পেয়েছ, সে নিশ্চয় নিজে তার কৈফিয়ত দিয়েছে।

আশা করি তুমি ভাল আছ। যদি কখনও মাকে ডাকবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাও পাও, সব সময় তাঁকে ডেকে তোমার সমস্ত জীবন আর সব কাজ তাঁকে সমর্পণ করবার চেষ্টা কর।

[শ্রীমাঃ] Love and blessings to my dear little 'E'.

কাহিনী ও কবিতা

স্বপ্ন

একটী দরিদ্র লোক অন্ধকার কুট্‌রীতে বসিয়া নিজ শোচনীয় অবস্থা এবং ভগবানের রাজ্যে অন্যায় ও অবিচারের কথা ভাবিতেছিল। দরিদ্র অভিমানের বশীভূত হইয়া বলিতে লাগিল, “লোকে কর্ম্মের দোহাই দিয়া ভগবানের সুনাম বাঁচাইতে চায়। গত জন্মের পাপে যদি আমার এই দুর্দ্দশা হইত, আমি যদি এতই পাপী হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় এই জন্মে আমার মনে পাপ চিন্তার স্রোত এখনও বহিত, এত ঘোর পাতকীর মন কি একদিনে নির্ম্মল হয়? আর ওই পাড়ার তিনকড়ি শীল, তাঁহার যে ধনদৌলত স্বর্ণরৌপ্য দাসদাসী, কর্ম্মফল সত্য হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে তিনি জগদ্বিখ্যাত সাধু মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু কই তাহার চিহ্নমাত্রও এই জন্মে দেখি না। এমন নিষ্ঠুর পাজী বদ্‌মায়েশ জগতে নাই। না, কর্ম্মবাদ ভগবানের ফাঁকি, মনভুলান কথা মাত্র। শ্যামসুন্দর বড় চতুর চূড়ামণি, আমার কাছে ধরা দেন না, তাই রক্ষা — নচেৎ উত্তম শিক্ষা দিয়া সব চালাকী বাহির করিতাম।” এই কথা বলিবামাত্র দরিদ্র দেখিল হঠাৎ তাহার অন্ধকার ঘর অতিশয় উজ্জ্বল আলোকতরঙ্গে ভাসিয়া গেল, অল্পক্ষণ পরে আলোকতরঙ্গ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, আর সে দেখিল তাহার সম্মুখে একটী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক প্রদীপ হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে — মৃদু হাসিতেছে, কিন্তু কোনও কথা কহিতেছে না। ময়ূরপুচ্ছ ও পায়ে নূপুর দেখিয়া দরিদ্র বুঝিল স্বয়ং শ্যামসুন্দর আসিয়া তাহাকে ধরা দিয়াছেন। দরিদ্র অপ্রতিভ হইল, একবার ভাবিল প্রণাম করি, কিন্তু বালকের হাসিমুখ দেখিয়া কিছুতেই প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি হইল না, — শেষে মুখ হইতে এই কথাই বাহির হইয়া গেল, “ওরে কেষ্টা, তুই এলি কেন?” বালক হাসিয়া কহিল, “কেন, তুমি আমাকে ডাকিলে না? এইমাত্র আমাকে চাবুক মারিবার প্রবল বাসনা তোমার মনে ছিল। তা, ধরা দিলাম, উঠিয়া চাবকাও না।” দরিদ্র আরও অপ্রতিভ হইল, ভগবানকে চাবুক মারিবার ইচ্ছার জন্য অনুতাপ নহে, কিন্তু স্নেহের পরিবর্ত্তে এমন সুন্দর বালকের গায়ে হাত লাগানটা ঠিক রুচিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। বালক আবার বলিল, “দেখ হরিমোহন, যাহারা আমাকে ভয় না করিয়া সখার মত দেখে, স্নেহভাবে গাল দেয়, আমার সঙ্গে খেলা করিতে চায়, তাহারা আমার বড় প্রিয়। আমি খেলার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সর্ব্বদা খেলার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজিতেছি। কিন্তু, ভাই, পাইতেছি না। সকলে আমার উপর ক্রোধ করে, দাবী করে, দান

চায়, মান চায়, মুক্তি চায়, ভক্তি চায়, কই আমাকে ত কেহ চায় না। যাহা চায়, আমি দিই। কি করিব সন্তুষ্টই করিতে হয়, নহিলে আমাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। তুমিও দেখিতেছি, কিছু চাও। বিরক্ত হইয়া চাবকাইবার লোক চাও, আমাকে সেই সাধ মিটাইবার জন্য ডাকিয়াছ। চাবুকের প্রহার খাইতে আসিয়াছি — যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে। তবে যদি প্রহারের আগে আমার মুখে শুনিতে চাও, আমার প্রণালী বুঝাইয়া দিব। কেমন রাজী আছ?'' হরিমোহন বলিল, ''পারিবি ত? দেখিতেছি বড় বকিতে জানিস, কিন্তু তোর মত কচি ছেলে যে আমাকে কিছু শিখাইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিব কেন?'' বালক আবার হাসিয়া বলিল, ''এস, দেখ, পারি কিনা।''

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হরিমোহনের মাথায় হাত দিলেন। তখনই দরিদ্রের সর্ব্ব শরীরে বিদ্যুতের স্রোত খেলিতে লাগিল, মূলাধারে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি অগ্নিময়ী ভূজঙ্গিনীর আকারে গর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ছুটিয়া আসিল, মস্তিষ্ক প্রাণশক্তির তরঙ্গে ভরিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে হরিমোহনের চারিধারে ঘরের দেওয়াল যেন দূরে পলাইতে লাগিল, নামরূপময় জগৎ যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে লুক্কায়িত হইল। হরিমোহন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। যখন আবার চৈতন্য হইল, সে দেখিল কোন অচেনা বাড়ীতে বালকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে গদীতে বসিয়া গালে হাত দিয়া একজন বৃদ্ধ প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই ঘোর দুশ্চিন্তাবিকৃত হৃদয়বিদারক নিরাশাবিমর্ষ মুখমণ্ডল দেখিয়া হরিমোহন বিশ্বাস করিতে চায় নাই যে এই বৃদ্ধ গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা তিনকড়ি শীল। শেষে অতিশয় ভীত হইয়া বালককে বলিল, ''কি করিলি কেষ্টা, চোরের মত ঘোর রাত্রীতে পরের বাড়ীতে ঢুকিলি? পুলিস আসিয়া ধরিয়া প্রহারের চোটে দুইজনের প্রাণ বাহির করিবে যে! তিনকড়ি শীলের প্রতাপ জানিস না?'' বালক হাসিয়া বলিল, ''খুব জানি। কিন্তু চুরি আমার পুরাতন ব্যবসা, পুলিসের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে, ভয় নাই। এখন তোমাকে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিলাম, বৃদ্ধের মনের ভিতর দেখ। তিনকড়ির প্রতাপ জান, আমার প্রতাপও দেখ।'' তখন হরিমোহন বৃদ্ধ তিনকড়ির মন দেখিতে পাইল। দেখিল, যেন শত্রু-আক্রমণে বিধ্বস্ত ধনাঢ্যানগরী, সেই তীক্ষ্ণ ওজস্বিনী বুদ্ধিতে কত ভীষণমূর্ত্তি পিশাচ ও রাক্ষস প্রবেশ করিয়া শান্তি বিনাশ করিতেছে, ধ্যান ভঙ্গ করিতেছে, সুখ লুণ্ঠন করিতেছে। বৃদ্ধ প্রিয় কনিষ্ঠপুত্রের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন, তাড়াইয়া দিয়াছেন; বৃদ্ধকালের স্নেহের পুত্রকে হারাইয়া শোকে ম্রিয়মাণ, অথচ ক্রোধ, গর্ব্ব, হঠকারিতা হৃদয়দ্বারে অর্গল দিয়া শান্ত্রী

হইয়া বসিয়া আছে। ক্ষমার প্রবেশ নিষেধ করিতেছে। কন্যার নামে দুশ্চরিত্রা বলিয়া কলঙ্ক রটিয়াছে, বৃদ্ধ তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া প্রিয়কন্যার জন্য কাঁদিতেছেন; বৃদ্ধ জানেন সে নির্দ্দোষ, কিন্তু সমাজের ভয়, লোকলজ্জা, অহঙ্কার, স্বার্থ স্নেহকে চাপিয়া ধরিয়াছে। সহস্র পাপের স্মৃতিতে বৃদ্ধ ভীত হইয়া বারবার চমকিয়া উঠিতেছে, তথাপি পাপ প্রবৃত্তির সংস্কারে সাহস বা বল নাই। মাঝে মাঝে মৃত্যু ও পরলোকের চিন্তা বৃদ্ধকে অতি নিদারুণ বিভীষিকা দেখাইতেছে। হরিমোহন দেখিল, মরণ-চিন্তার পশ্চাৎ হইতে বিকট যমদূত কেবলই উঁকি মারিতেছে ও কপাটে ঠক্ ঠক্ করিতেছে। যতবার এইরূপ শব্দ হয় বৃদ্ধের অন্তরাত্মা ভয়ে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া হরিমোহন আতঙ্কে বালকের দিকে চাহিয়া বলিল, ‘‘এ কিরে কেষ্টা, আমি ভাবিতাম বৃদ্ধ পরম সুখী।’’ বালক বলিল, ‘‘ইহাই আমার প্রতাপ। বল দেখি কাহার প্রতাপ বেশী, ও-পাড়ার তিনকড়ি শীলের, না বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীকৃষ্ণের? দেখ, হরিমোহন আমারও পুলিস আছে, পাহারা আছে, গবর্ণমেণ্ট আছে, আইন আছে, বিচার আছে, আমিও রাজা সাজিয়া খেলা করিতে পারি, এই খেলা কি তোমার ভাল লাগে?’’ হরিমোহন বলিল, ‘‘না বাবা। এ ত বড় বদ্ খেলা। তোর বুঝি ভাল লাগে?’’ বালক হাসিয়া বলিল, ‘‘আমার সব খেলা ভাল লাগে, চাবকাইতেও ভালবাসি, চাবুক খাইতেও ভালবাসি!’’ তাহার পর বলিল, ‘‘দেখ হরিমোহন তোমরা কেবল বাহিরটা দেখ, ভিতরটা দেখিবার সূক্ষ্মদৃষ্টি এখনও বিকাশ কর নাই। সেইজন্যই বল, তুমি দুঃখী, আর তিনকড়ি সুখী। এই লোকটীর কোনই পার্থিব অভাব নাই — অথচ তোমার অপেক্ষা এই লক্ষপতি কত অধিক দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কেন, বলিতে পার? মনের অবস্থায় সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ দুঃখ মনের বিকার মাত্র। যাহার কিছু নাই বিপদই যাহার সম্পত্তি, ইচ্ছা করিলে সে বিপদের মধ্যেও পরম সুখী হইতে পারে। আবার দেখ তুমি যেমন নীরস পুণ্যে দিন কাটাইয়া সুখ পাইতেছ না, কেবল দুঃখ চিন্তা করিতেছ, ইনিও সেইরূপ নীরস পাপে দিন কাটাইয়া কেবলই দুঃখ চিন্তা করেন। তাই পুণ্যের ক্ষণিক সুখ বা পাপের ক্ষণিক দুঃখ বা পুণ্যের ক্ষণিক দুঃখ পাপের ক্ষণিক সুখ। এই দ্বন্দ্বে আনন্দ নাই। আনন্দ-আগারের ছবি আমার কাছে; আমার কাছে যে আসে, যে আমার প্রেমে পড়ে, আমাকে সাধে, আমার উপর জোর করে, অত্যাচার করে — সে আমার আনন্দের ছবি আদায় করে।’’ হরিমোহন আগ্রহপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে লাগিল। বালক আবার বলিল, ‘‘আর দেখ হরিমোহন, শুষ্ক পুণ্য তোমার নিকট নীরস হইয়া পড়িয়াছে

অথচ সংস্কারের প্রভাব তুমি ছাড়িতে পার না; সেই তুচ্ছ অহঙ্কার জয় করিতে পার না। বৃদ্ধের নিকট পাপ নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাবে তিনিও তাহা ছাড়িতে না পারিয়া — ইহজীবনে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ইহাকে পুণ্যের বন্ধন, পাপের বন্ধন বলে। অজ্ঞানজাত সংস্কার সেই বন্ধনের রজ্জু। কিন্তু বৃদ্ধের এই নরকযন্ত্রণা বড় শুভ অবস্থা। তাহাতে তাঁহার পরিত্রাণ ও মঙ্গল হইবে।''

হরিমোহন এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিতেছিল, এখন বলিল, ''কেষ্টা, তোর কথা বড় মিঠে, কিন্তু আমার প্রত্যয় হইতেছে না। সুখ দুঃখ মনের বিকার হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা তাহার কারণ। দেখ, ক্ষুধার জ্বালায় যখন মন ছট্‌ফট্‌ করে, কেহ কি পরম সুখী হইতে পারে? অথবা যখন রোগে বা যন্ত্রণায় শরীর কাতর হয়, তখন কি কেহ তোর কথা ভাবিতে পারে?'' বালক বলিল, ''এস, হরিমোহন, তাহাও তোমাকে দেখাইব।'' এই বলিয়া বালক আবার হরিমোহনের মাথায় হাত দিল, স্পর্শ অনুভব করিবামাত্র হরিমোহন দেখিল আর তিনকড়ি শীলের বাড়ী নাই, নির্জ্জন সুরম্য পর্ব্বতের বায়ুসেবিত শিখরে একজন সন্ন্যাসী আসীন, ধ্যানে মগ্ন, চরণ প্রান্তে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রহরীর ন্যায় শায়িত। ব্যাঘ্র দেখিয়া হরিমোহনের চরণদ্বয় অগ্রসর হইতে নারাজ হইল, কিন্তু বালক তাহাকে টানিয়া সন্ন্যাসীর নিকট লইয়া গেল। বালকের সঙ্গে জোরে না পারিয়া হরিমোহন অগত্যা চলিল। বালক বলিল, ''দেখ হরিমোহন।'' হরিমোহন চাহিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর মন তাহার চক্ষের সামনে খোলা খাতার মত রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণনাম সহস্রবার লেখা। সন্ন্যাসী নির্ব্বিকল্প সমাধির সিংহদ্বার পার হইয়া সূর্য্যালোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। আবার দেখিল, সন্ন্যাসী অনেকদিন অনাহারে রহিয়াছে, গত দুই দিন শরীর ক্ষুৎপিপাসায় বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে। হরিমোহন বলিল, ''এ কিরে কেষ্টা? বাবাজী তোকে এত ভালবাসেন, অথচ ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতেছেন। তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই! এই নির্জ্জন ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে কে তাঁহারে আহার দিবে!'' বালক বলিল, ''আমি দিব, কিন্তু আর এক মজা দেখ।'' হরিমোহন দেখিল, ব্যাঘ্র উঠিয়া তাহার থাবার এক প্রহারে নিকটবর্ত্তী বল্মীক ভাঙ্গিয়া দিল। ক্ষুদ্র শত শত পিপীলিকা বাহির হইয়া ক্রোধে সন্ন্যাসীর গায়ে উঠিয়া দংশন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন, নিশ্চল, অটল। তখন বালক সন্ন্যাসীর কর্ণকুহরে অতি মধুর স্বরে একবার ডাকিল, ''সখে!'' সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। প্রথমে মোহ-জ্বালাময় দংশন অনুভব করেন না, তখনও

কর্ণকুহরে সেই বিশ্ববাঞ্ছিত চিত্তহারী বংশীরব বাজিতেছে — যেমন বৃন্দাবনে রাধার কানে বাজিয়াছিল। তাহার পরে শত শত দংশনে বুদ্ধি শরীর দিকে আকৃষ্ট হইল। সন্ন্যাসী নড়িলেন না — সবিস্ময়ে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এ কি? আমার এমন ত কখনও হয় নাই। যাক্ শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাচয়রূপে আমাকে দংশন করিতেছেন।" হরিমোহন দেখিল, দংশনের জ্বালা বুদ্ধিতে আর পৌঁছে না, প্রত্যেক দংশনে তিনি তীব্র শারীরিক আনন্দ অনুভব করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূর্ব্বক অধীর আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পিপীলিকাগুলি মাটিতে পড়িয়া পলাইয়া গেল। হরিমোহন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেষ্টা, এ কি মায়া!" বালক হাততালি দিয়া দুইবার এক পায়ের উপর ঘুরিয়া উচ্চহাস্য করিল, "আমিই জগতের একমাত্র যাদুকর! এ মায়া বুঝিতে পারিবে না, এই আমার পরম রহস্য। দেখিলে? যন্ত্রণার মধ্যেও আমাকে ভাবিতে পারিলেন ত! আবার দেখ।" সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন; শরীর ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিমোহন দেখিল সন্ন্যাসীর বুদ্ধি সেই শারীরিক বিকার অনুভব করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে বিকৃত বা লিপ্ত হইতেছে না। এই সময়ে পাহাড় হইতে কে বংশীবিনিন্দিত স্বরে ডাকিল, "সখে!" হরিমোহন চমকিল। এ যে শ্যামসুন্দরেরই মধুর বংশীবিনিন্দিত স্বর। তাহার পরে দেখিল, শিলাচয়ের পশ্চাৎ হইতে একটী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক থালায় উত্তম আহার ও ফল লইয়া আসিতেছে। হরিমোহন হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল। বালক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ যে বালক আসিতেছে, সেও অবিকল শ্রীকৃষ্ণ। অপর বালক আসিয়া সন্ন্যাসীকে থালা দেখাইয়া বলিল, "দেখ্, কি এনেছি।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এলি? এতদিন না খাওয়াইয়া রাখিলি যে? যাক্, এলি ত বোস্, আমার সঙ্গে খা।" সন্ন্যাসী ও বালক সেই থালার খাদ্য খাইতে বসিল, পরস্পরকে খাওয়াইতে লাগিল, কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে বালক থালা লইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

হরিমোহন কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ দেখিল শ্রীকৃষ্ণ আর নাই, সন্ন্যাসীও নাই, ব্যাঘ্রও নাই, পর্ব্বতও নাই। সে একটী ভদ্র পল্লীতে বাস করিতেছে; বিস্তর ধনদৌলত আছে, স্ত্রী-পরিবার আছে, রোজ ব্রাহ্মণকে দান করিতেছে, ভিক্ষুককে দান করিতেছে, ত্রিসন্ধ্যা করিতেছে, শাস্ত্রোক্ত আচার সযত্নে রক্ষা করিয়া রঘুনন্দন-প্রদর্শিত পথে চলিতেছে, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র হইয়া জীবনযাপন করিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ভীত হইয়া দেখিল যে যাহারা সে ভদ্র-

পল্লীতে বাস করে, তাহাদের মধ্যে লেশমাত্র সদ্ভাব বা আনন্দ নাই, যন্ত্রবৎ বাহিরের আচার রক্ষাকেই পুণ্য জ্ঞান করিতেছে। প্রথমটা হরিমোহনের যেমন আনন্দ হইয়াছিল, এখন তেমনই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার বিষম তৃষ্ণা লাগিয়াছে, কিন্তু জল পাইতেছে না, ধূলি খাইতেছে, কেবলই ধূলি কেবলই ধূলি অনন্ত ধূলি খাইতেছে। সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া সে আর এক পল্লীতে গেল, সেখানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে অপূর্ব্ব জনতা ও আশীর্ব্বাদের রোল উঠিতেছিল। হরিমোহন অগ্রসর হইয়া দেখিল, তিনকড়ি শীল দালানে বসিয়া সেই জনতার মধ্যে অশেষ ধন বিতরণ করিতেছেন, কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে না। হরিমোহন উচ্চহাস্য করিল, সে ভাবিল, ‘‘একি স্বপ্ন! তিনকড়ি শীল আবার দাতা?’’ তাহার পরে সে তিনকড়ির মন দেখিল। বুঝিল, সেই মনে লোভ, ঈর্ষা, কাম, স্বার্থ ইত্যাদি সহস্র অতৃপ্তি ও কুপ্রবৃত্তি দেহি দেহি রব করিতেছে। তিনকড়ি পুণ্যের খাতিরে, যশের খাতিরে, গর্ব্বের বশে সেই ভাবগুলি ছাপাইয়া রাখিয়াছেন, অতৃপ্ত রাখিয়াছেন, চিত্ত হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। এই সময় আবার কে হরিমোহনকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি পরলোক ভ্রমণ করাইয়া আনিল। হরিমোহন হিন্দুর নরক, খৃষ্টানের নরক, মুসলমানের নরক, গ্রীকদের নরক, হিন্দুর স্বর্গ, খৃষ্টানের স্বর্গ, মুসলমানের স্বর্গ, গ্রীকদের স্বর্গ, আর কত নরক, কত স্বর্গ দেখিয়া আসিল। তাহার পরে দেখিল, সে নিজ বাড়ীতে পরিচিত ছেঁড়া মাদুরে ময়লা তোষকে ভর দিয়া বসিয়া আছে সম্মুখে শ্যামসুন্দর। বালক বলিল, ‘‘বড় রাত্রী হইয়াছে, বাড়ীতে না ফিরিলে সকলে আমাকে বকিবে, মারামারি আরম্ভ করিবে। সংক্ষেপে বলি। যে স্বর্গ নরক দেখিলে, সে স্বপ্নজগতের, কল্পনাসৃষ্ট। মানুষ মরিলে স্বর্গ নরকে যায়, গত জন্মের ভাব অন্যত্র ভোগ করে। তুমি পূর্ব্বজন্মে পুণ্যবান ছিলে, কিন্তু প্রেম তোমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, না তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসিয়াছ, না মানুষকে। প্রাণত্যাগের পরে স্বপ্নজগতে সেই ভদ্রপল্লীতে বাস করিয়া পূর্ব্বজীবনের ভাব ভোগ করিতে লাগিলে, ভোগ করিতে করিতে সে ভাব আর ভাল লাগে না, প্রাণ আকুল হইতে লাগিল, সেখান হইতে গিয়া ধূলিময় নরকে বাস করিলে, শেষে জীবনের পুণ্যফল ভোগ করিয়া আবার তোমার জন্ম হইল। সেই জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈমিত্তিক দান ভিন্ন, নীরস বাহ্যিক ব্যবহার ভিন্ন কাহারও অভাব দূর করিবার জন্য কিছু কর নাই বলিয়া এই জন্মে তোমার এত অভাব। আর এখনও যে নীরস পুণ্য করিতেছ, তাহার কারণ এই যে, কেবল স্বপ্নজগতের ভোগে পাপ পুণ্য সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না, পৃথিবীতে কর্ম্মফল ভোগে ক্ষয় হয়। তিনকড়ি গতজন্মে

দাতাকর্ণ ছিলেন, সহস্র ব্যক্তির আশীর্ব্বাদে এই জন্মে লক্ষপতি ও অভাবশূন্য হইয়াছেন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয় নাই বলিয়া অতৃপ্ত কুপ্রবৃত্তি এখন পাপ দ্বারা তৃপ্ত করিতে হইয়াছে। কর্ম্মবাদ বুঝিলে কি? পুরস্কার বা শাস্তি নহে — কিন্তু অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গল সৃষ্টি, এবং মঙ্গল দ্বারা মঙ্গল সৃষ্টি। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পাপ অশুভ, তাহা দ্বারা দুঃখ সৃষ্ট হয়; পুণ্য শুভ, তাহার দ্বারা সুখ সৃষ্ট হয়। এই ব্যবস্থা চিত্তশুদ্ধির জন্য, অশুভ বিনাশের জন্য। দেখ হরিমোহন, পৃথিবী আমার বৈচিত্র্যময় জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু সেখানে কর্ম্ম দ্বারা অশুভ বিনাশ করিবার জন্য তোমরা জন্মগ্রহণ কর। যখন পাপ-পুণ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রেমরাজ্যে পদার্পণ কর, তখন এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাও। পরজন্মে তুমিও অব্যাহতি পাইবে। আমি আমার প্রিয় ভগিনী শক্তি ও তাহার সহচরী বিদ্যাকে তোমার কাছে পাঠাইব, কিন্তু দেখ, এক সর্ত্ত আছে, তুমি আমার খেলার সাথী হইবে, মুক্তি চাইতে পারিবে না। রাজি?'' হরিমোহন বলিল, ''কেষ্টা, তুই আমাকে গুণ করিলি! তোকে কোলে লইয়া আদর করিতে বড় ইচ্ছা করে, যেন এই জীবনে আর কোন বাসনা নাই।''

বালক হাসিয়া বলিল, ''হরিমোহন, কিছু বুঝিলে?'' হরিমোহন বলিল, ''বুঝিলাম বই কি।'' তাহার পরে একটু ভাবিয়া বলিল, ''ওরে কেষ্টা আবার ফাঁকি দিলি। অশুভ সৃজন করিলি কেন, তাহার ত কোন কৈফিয়ৎ দিস্ নি।'' এই বলিয়া সে বালকের হাত ধরিল। বালক হাত কাড়িয়া লইয়া হরিমোহনকে শাসাইয়া বলিল, ''দূর হ! এক ঘণ্টার মধ্যে আমার সব গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইবি?'' বালক হঠাৎ প্রদীপ নিবাইয়া সরিয়া সহাস্যে বলিল, ''কই, হরিমোহন, চাবুক মারিতে একেবারে ভুলিয়া গেলে যে! সেই ভয়ে তোমার কোলে বসিলাম না, কখন বাহ্যিক দুঃখে চটিয়া আমাকে উত্তম শিক্ষা দিবে! তোমার উপর আমার লেশমাত্র বিশ্বাস নাই।'' হরিমোহন অন্ধকারে হাত বাড়াইল, কিন্তু বালক আরও সরিয়া বলিল, ''না, সে সুখ তোমার পরজন্মের জন্য রাখিলাম। আসি।'' এই বলিয়া অন্ধকার রজনীতে বালক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। হরিমোহন নূপুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া ভাবিল, ''এ কি রকম স্বপ্ন দেখিলাম! নরক দেখিলাম, স্বর্গ দেখিলাম, তাহার মধ্যে ভগবানকে তুই বলিলাম, ছোট ছেলে বুঝিয়া কত ধমক দিলাম। কি পাপ! যা হোক, প্রাণে বেশ শান্তি অনুভব করিতেছি।'' হরিমোহন তখন কৃষ্ণবর্ণ বালকের মোহনমূর্ত্তি ভাবিতে বসিল এবং মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, ''কি সুন্দর! কি সুন্দর!''

ক্ষমার আদর্শ

চন্দ্র ধীর গতিতে মেঘের কোলের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নীচে নদী কুল কুল শব্দে বায়ুর সঙ্গে সুর মিশাইয়া নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছিল। আধ জোছনা আধ অন্ধকারে মিশিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। চারিদিকে ঋষির আশ্রম। এক একটী আশ্রম নন্দনবনকে ধিক্কার প্রদান করিতেছিল। এক একখানি ঋষির কুটির তরু, পুষ্প ও বৃক্ষলতা শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। একদিন এইরূপ জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতী দেবীকে বলিতেছিলেন, ‘‘দেবী, ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আন।’’ এই প্রশ্নে অরুন্ধতী দেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘প্রভু, এ কি আজ্ঞা করিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে আমার শতপুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে —’’ এই কথা বলিতে বলিতে দেবীর সুর অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে অপূর্ব্ব শান্তির আলয় গভীর হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন, — ‘‘আমার শতপুত্র এই জোছনাশোভিত রাত্রে বেদগান করিয়া বেড়াইত, শতপুত্রই আমার বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, আমার এইরূপ শতপুত্রই সে বিনষ্ট করিয়াছে; তাহার আশ্রম হইতে আমাকে লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিতেছেন? আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি।’’ ধীরে ধীরে ঋষির মুখ জ্যোতিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সাগরোপম হৃদয় হইতে এই কয়টী বাক্য নিঃসৃত হইল, — ‘‘দেবী, আমি তাহাকে যে ভালবাসি।’’ অরুন্ধতীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, ‘‘আপনি যদি তাহাকে ভালবাসেন ত তাহাকে ‘ব্রহ্মর্ষি’ বলিয়া সম্বোধন করিলেই ত জঞ্জাল মিটিয়া যাইত, আমাকেও শতপুত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।’’ ঋষির মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, বলিলেন, ‘‘তাহাকে ভালবাসি বলিয়াই ত তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই, আমি তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই বলিয়াই তাহার ব্রহ্মর্ষি হইবার আশা আছে।’’

আজ বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। আজ আর তাঁহার তপস্যায় মনোনিবেশ হইতেছে না। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন আজ যদি বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি না বলেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণসংহার করিবেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি তরবারি হস্তে কুটির হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে বশিষ্ঠদেবের কুটির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বশিষ্ঠদেবের সমস্ত কথা শুনিলেন। মুষ্টিবদ্ধ তরবারি হস্তে শিথিল হইয়া পড়িল। ভাবিলেন, ‘‘কি করিয়াছি, না জানিয়া

কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কাহার নির্ব্বিকার চিত্তে ব্যথা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।'' হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভূত হইল। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দৌড়িয়া গিয়া বশিষ্ঠের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না, ক্ষণপরে বলিলেন, — ''ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি ক্ষমাভিক্ষারও অযোগ্য।'' গর্ব্বিত হৃদয় অন্য কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বশিষ্ঠ কি করিলেন? বশিষ্ঠ দুই হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, ''উঠ, ব্রহ্মর্ষি উঠ।'' দ্বিগুণ লজ্জায় বিশ্বামিত্র বলিলেন, ''প্রভু, কেন লজ্জা দেন।'' বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, ''আমি কখনও মিথ্যা বলি না — আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ, আজ তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়াছ। আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি-পদ লাভ করিয়াছ।'' বিশ্বমিত্র বলিলেন, ''আমাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন।'' বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, ''অনন্তদেবের নিকট যাও, তিনিই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।'' অনন্তদেব যেখানে পৃথিবী মস্তকে ধরিয়া আছেন বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তদেব বলিলেন, ''আমি তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি যদি তুমি এই পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিতে পার।'' তপোবলে গর্ব্বিত বিশ্বামিত্র বলিলেন, ''আপনি পৃথিবী ত্যাগ করুন আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।'' অনন্তদেব বলিলেন, ''ধারণ কর, আমি ত্যাগ করিলাম।'' শূন্যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র ডাকিয়া বলিতেছেন, ''আমি সমস্ত তপস্যার ফল অর্পণ করিতেছি পৃথিবী ধৃত হউক'' — তথাপি পৃথিবী স্থির হইল না। উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বলিলেন, ''বিশ্বামিত্র এত তপস্যা কর নাই যে পৃথিবী ধারণ করিবে, কখনও কি সাধুসঙ্গ করিয়াছ? তাহার ফল অর্পণ কর।'' বিশ্বামিত্র বলিলেন, ''এক মুহূর্ত্ত বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছি।'' অনন্তদেব বলিলেন, ''তবে সেই ফল অর্পণ কর।'' বিশ্বামিত্র বলিলেন, ''আমি সেই ফল অর্পণ করিতেছি।'' ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হইল। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, ''এখন আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিন।'' অনন্তদেব বলিলেন, ''মূর্খ বিশ্বামিত্র! যাঁর এক মুহূর্ত্ত সঙ্গফলে পৃথিবী ধৃত হইল তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান চাহিতেছ?'' বিশ্বামিত্রের ক্রোধ হইল, ভাবিলেন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে তবে প্রতারণা করিয়াছেন। দ্রুত তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, ''আপনি আমায় কেন প্রতারণা করিলেন?'' বশিষ্ঠদেব অতি ধীর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, ''আমি যদি তখন তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতাম, তোমার তাহাতে বিশ্বাস হইত না, এখন তোমার বিশ্বাস হইবে।'' বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিলেন। ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, এমন ক্ষমার

আদর্শ ছিল। এমন তপস্যার বল ছিল যাহা দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপ ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন যাঁহাদের প্রভায় পূর্ব্বতন ঋষি-দিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাঁহারা আবার ভারতকে পূর্ব্বগৌরব হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

অস্ফুট

সদাই প্রাণের মাঝে অস্ফুট নিক্কণ বাজে,
গুপ্ত বেণু বাজে তাঁর।
বেণুর অস্ফুট কথা জাগায় মধুর ব্যথা
তীব্র প্রেমবাসনার।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় রাসে ঘোরে যেন সদা পাশে
ছোঁয় এড়ায় নয়ন।
আধ দেখা তনুখানি, অস্ফুট সে পদধ্বনি, —
সদাই আকুল মন।

আঁধারে ঈষদ্ হাস, তনুর কিরণ ভাস,
ঘুরিছে অদৃশ্য কেহ।
প্রেমে তার প্রাণ মম কারায় বন্দিনী সম,
খুঁজি প্রেমখনি দেহ।

অধরে অধর ছুঁয়ে ক্ষণে হাত হাতে থুয়ে
মুহূর্ত্তের বৃথা স্পর্শ।
বিফলি' বাড়ায়ে লোভ, নিরাশি' মধুর ক্ষোভ,
থাকি হরষে বিমর্ষ।

কবে ধরা দিবে আসি' হাসিয়া অপূর্ব্ব হাসি,
ঢালিয়া হৃদয়-ধন,
অল্পস্পর্শে বিশ্বানন্দ, অখিল-সৌন্দর্য্য-বন্ধ
এক দেহে উদ্‌ঘাটন।

মহাকাল

কি এ ব্রহ্মাণ্ড ফুঁড়ি প্রচণ্ড স্ফুরণ।
বহি প্রাণে দিন রাত ঋতু সংবৎসর
বুঝেছি তোমার ভাব, দেখেছি শরীর।
কে আত্মা তোমার? কোন্ অদৃষ্টের বলে
ঘুর মহাচক্রে সদা ঘুরাও জগতী।
বিচিত্র আকাশ যবে কিরণ-প্রপাতে
মায়াপুরী রচয়িত্রী নির্ম্মল সন্ধ্যার,
ভ্রমেছি নদীর তীরে কলকলস্বর
সমাকুল প্রাণগীতি তরঙ্গ-বীণায়
মিলাইতে হৃদিতারে। অনন্ত রজনী
নামিয়া নিঃশব্দ পদে মুকুটের ছায়া
বিস্তারি গগনপটে, উড়ায়ে অঞ্চল
মসৃণ আঁধার পাতি দীর্ঘ ধরাতলে,
টানিয়া গভীর কোলে শান্তিস্তব্ধ প্রাণী
সুষুপ্তির অভিনেত্রী থামাইল আসি
জীবনের কোলাহল অন্তহীন মৌনে।
চিন্তামগ্ন নেত্রতারা বিপুল শয্যায়
আকাশ-ব্রহ্মের ধ্যানে নিলীন ভৈরবী
কৃষ্ণকায়া জগন্মাতা সমাধিস্থ ভবে।
নীরবতা-মধুভোজী তারকার পাল
দীপ্তির মৌমাছি সম উড়ে আসে নভে।
ঢালিতে প্রাণীর মর্ম্মে আনন্দ কিরণ
সুশীতল রভসের সমুজ্জ্বল ভাণ্ড
ভেসে উঠে শশী মণি-খচিত নিশায়।
স্বল্প আলোকিত জ্যোৎস্না-প্লুত অন্ধকারে
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ এ অসীম প্রাণে
ডুবাইয়া শুনিয়াছি নীরবের গান।
বাজিল অন্তরে যবে মাধুর্য্য-স্পন্দন
ভাঙ্গিল সমাধিঘোর স্তব্ধ যোগিনীর।

আলোক-বসন-স্পর্শে জাগিল কাহার।
কার দূর পদধ্বনি পশিল মরমে।
পরিতৃপ্ত শূন্যতার ঘনস্তর বিঁধি
উষা উঠিয়াছে হাসি রঞ্জিত গগনে,
মনোহর স্মিত-আঁখি বালিকা যেমন,
উদ্দাম উল্লাস পদে হাসি ভরা প্রাণ
পিতার ভবনে নাচি মুক্ত আঙিনায়।
জীবনের হর্ষ যে মঞ্জু মিষ্ট ডাকে
জানাইতে পরস্পরে পলকে পলকে
ডাকিতেছে পক্ষীকুল সুমধুর তানে,
সহস্র উন্মত্ত শাখা, সবুজ বসন
নাচিতেছে তরুরাজী আলোক-উৎসবে।
সেই আলোক-উৎসবে অন্তরালে ঢাকা
স্বর্গসোমপানে মত্ত ঋষির
আনন্দের বেদগানে
জানিলাম কি গভীর আনন্দস্ফুরণে
ফুটিয়াছে বিশ্বপদ্ম অনন্তের স্রোতে।
নিদ্রিত মধ্যাহ্ন যবে বিশ্বকক্ষে একা
সুনীল আকাশ পরে হেলাইল শির,
জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণতার শয়ন শিবিরে
বিশ্বমঙ্গলের গীতি গুপ্ত মহিমায়
মন্থর বিশাল ধ্বনি ত্রিকালের কণ্ঠে
মহামন্ত্র বাজিয়াছে জগৎ-আত্মার।

মিলাইয়া তুষ্টপ্রাণে অগণন ভাব
চিরশান্ত উচ্চকর্ম্মী দেখিতেছে কেহ
মহাকাব্যে আনন্দিত সনাতন কবি
পূর্ণছন্দ সৃষ্টি তার। গভীর সন্তোষে
সান্তে বহি সে অসীম অপরূপ রূপে
ঘুরিছে অনন্ত বিশ্ব প্রভু পদপ্রান্তে।
লব্ধতপার কিরণের প্রচণ্ড প্রসারে

গগনের চূড়া হতে মানিতে বিধান
নামিয়াছে সূর্য্য যবে বীর মহিমায়,
অবসানে ভরাশান্তি লভিয়াছি চিত্তে,
জীবনসুধার পান শূন্য করি পাত্র,
তুরীয়ের মহাগীত পরিতুষ্ট কর্ণে।
এইরূপ প্রতিদিন অদম্য কৌতুকে
একদিনে বাঁধি যেন অনন্ত সময়,
অল্পেতে সর্ব্বস্ব ঢালি নিজমূর্ত্তি আঁক,
রূপস্রষ্টা প্রাণশিল্পী। নূতন নূতন
পুরাতন সেই চক্র ভাসে চিত্তপটে।

নিজ আত্মা নানা ভাবে ভোগ কর ঋষি।
সংবৎসর তব আত্মা। হরিৎ বসনা
পৃথিবী নর্ত্তকী তব সূর্য্যে করি কেন্দ্র
ঘুরে প্রেমাবেশে সদা উন্মত্ত ঘুরণে,
কৃষ্ণকরস্পর্শে মত্ত গোপী যেন ঘুরে
অনন্ত উদ্দাম নৃত্যে অফুরন্ত হর্ষ,
প্রেমাবেশে প্রিয়মুখে স্থাপিত নয়ন,
তাঁরে জানে, জানে প্রেম, নাহি কিছু আর।
সেই নৃত্যকলা শিখি ভ্রমিছে জীবন
নৃত্যের মণ্ডলাকৃতি তব চক্রে, প্রভু।
বসন্ত কোকিলরবে একতানা সুরে
অখিল মাধুর্য্য ঢালি কুসুম দোলায়
অনন্ত যৌবনে মত্ত দুলিয়ে শরীর
ডাকিছে উল্লাস ভরে। অপ্সরার হাসি
আধ দেখা ধরাধামে বৃক্ষ-অন্তরালে
রক্তশ্বেত পুষ্পচ্ছলে মৃদু পরিহাসে
টানে যেন প্রাণ সদা তার সঙ্গে যেতে
অচেনা অনন্ত রাজ্যে মনের ওপারে।
গ্রীষ্ম যবে রাজবেশে, মহাসমারোহ,
স্বর্ণদীপ্তি পরিধান, বনে ক্ষেতে মাঠে

ছড়ায়ে উজ্জ্বল সেনা দমিছে পৃথিবী,
বিজিত বন্দিনী তার নত প্রভুপদে
নিঃশ্বসি রুদ্রদমনে উগ্র সুখে ভরা
তপ্ত নভঃস্থলে চাহে শায়িতা পৃথিবী।
বিদ্যুৎ নয়নপাতে খুঁজি বধ্যপ্রাণী
বর্ষা দৈত্যক্রোধ চিত্তে ছুটে বজ্রনাদে।
হাহাকার রব শুনি আক্রান্ত বনের
নৃত্য করে ধমনীতে প্রচণ্ড বিলাস।
বৃষ্টির প্লাবনশব্দে হরষিত কর্ণ।
এই আবেগের মধ্যে জাগিছে বাসনা
মিশিতে প্রবল আত্মা, নৃত্যসহচর
ঝটিকার সমপ্রাণ ঝঞ্ঝাবায়ু সাজি
এ নিষ্ঠুর অত্যাচারে অত্যাচারী হতে,
যুঝি অসীমের দিকে করিতে প্রয়াণ।
অবসন্ন ধরাধামে ধীরে অগ্রসর।
শরৎ শান্তির দূতী দেখা দেয় পরে
পদ্মনেত্রে মঞ্জুহাসি চারু পদক্ষেপ
অলস নাজুক শুভ্র মৃদু গৌর পদে।
ফুটায় শান্তিকুসুম ক্লান্ত প্রাণে পশি
হেমন্তের শীতবক্ষে লুটিয়া প্রকৃতি
জুড়ায় শিথিল গাত্র মহা পরিতোষে।
সরসীর জলে যেন
ক্লিন্নবস্ত্র স্নিগ্ধগাত্র শিশির পরশে
স্নাত ধৌত ধরা উঠে কম্পিত অধর।
হাসে দীপ্ত সূর্য্যকরে এই ছয় সুরে
শেষ করি তব চিন্তা পুনঃ সেই চক্রে,
অশ্রান্ত দেবতা কাল, ঘুরাও জগতী।
অফুরন্ত যুগ গেল, অফুরন্ত যুগ
এসে যাবে, বসি সদা মনের উল্লাসে
যাহা ভাঙ্গ তাহা গড় পুনঃ তুষ্ট মনে।
দীর্ঘ কাল মানুষের কর্ম্মধ্বংসকারী

শতযুগ সমাবেশে মাপা যেই কাল,
সনাতন দেবতার আঁখির নিমেষ।
শ্রান্ত হয় নর দুঃখে, শ্রান্ত হয় সুখে।
শ্রান্ত নহ কভু তুমি। ভেঙ্গে যায় দেহ
অল্প কর্ম্মে, ভেঙ্গে যায় মন অল্প দুঃখে।
মরণ বিশ্রাম তার আসি বন্ধু সম
মহৎ বৈরাগ্য তার চরম শরণ।
কোথায় বৈরাগ্য তব। পুরাতন ভাব
নূতন নূতন সদা আনন্দ-আত্মায়
কর*
কে তব খেলার যোগ্য সহচর ছিল
এই বিশ্বধামে কভু। অনাসক্ত মনে,
সৃষ্টি কর মহোল্লাসে ধ্বংস কর হর্ষে।
হাসি-মেশা দয়া তব, কবি যেন দেখে
কাব্য তব জীবসৃষ্টি সুখ দুঃখ রচে
করুণ রসের প্রীতি ভোগ করে চিত্তে।
সংহারে আনন্দ তব, রুদ্র মহাকাল।
জগৎ লেহন করি জ্বলন্ত বদনে
গ্রাস কর বিশ্ব আত্মা অতৃপ্ত ক্ষুধায়।
মানুষ খেলানা তব নাচি দুইক্ষণ
অচেনা ধরায় এসে
অল্পদিনে অচেনায় কোথা গেল চলে।
হাসিকান্না ডুবে তার অনন্তের রোলে
লুপ্ত তার পদচিহ্ন ধরার ধূলায়।
তুমি কিন্তু, তুমি, ওহে সুন্দর ভীষণ
হাস সদা মহোল্লাসে গড়ি ভাঙ্গি সুখে।
আনন্দের তীব্র স্ফূর্ত্তি অতল হৃদয়ে
পুষিয়া খেলিতে বস, বালক ঈশ্বর।

* পাণ্ডুলিপিতে পঙ্ক্তিটি অসম্পূর্ণ রাখা আছে। — স

জীবন্ত জড়

জানি না কোথায়
এসেছিনু ঘুরে ঘুরে দূর স্বপ্নদেশে।
দেখিলাম দাঁড়ায়েছি দ্রুত-নদী-কূলে।
উপরে বিস্তীর্ণ শূন্য পাণ্ডুর নীলিমা
দৃঢ়, অতি উচ্চ। আমাদের ধরাধামে*
বন্ধুদ্বয় যেন সদা আকাশ মেদিনী
প্রণয়ের খেলা করে মিলিয়া দু'জনে।
হরিৎ পৃথিবী শুধু উপরে নিরখে
প্রণয়ীর মুখকান্তি, কাঁপে তীব্র সুখে
সহস্রতরুস্পন্দনে, শীত তৃণমাঝে।
সুনীল আকাশ তারে আলিঙ্গনে ধরি'
প্রিয়ার অখিল দেহ ঘিরিয়া রভসে
উচ্চ শির তুলি' উচ্চে হাসে প্রেমভরে।
এই খেলা হেথা। আমাদের ধরাধামে
নাই সেই ভীষণ বিচ্ছেদ। কিন্তু সেথা
মরেছে পৃথিবী যেন ক্ষোভে দুঃখে ভয়ে
শূন্য বিশ্বে পড়ি' একা। গ্রস্ত সে অনন্তে,
ভীত সেই উচ্চতায় বিভীষিকাঘেরা
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ। বাধাহীন ভূমি
নীরব বিস্তীর্ণ শূন্য বিবর্ণ পাণ্ডুর
শূন্যের বিশালতার প্রাণহীনতার
মহদায়তন অবিচ্ছিন্ন। নাই তরু,
তৃণ, শিলা, মানবের কোথাও নিবাস
হেরি নাই! চক্ষু চলে সদা, চলে শুধু,
খুঁজিয়া পায় না অন্ত, তবু শ্রান্ত থামি
ফিরিতে অক্ষম! ক্রূর দৃশ্য ক্রূর টানে
হরে লয় তাঁরে বন্দী যেন শত্রুদেশে

* পঙ্‌ক্তিটির প্রথম ছয়টি অক্ষর পাণ্ডুলিপিতে কাটা আছে, কিন্তু পরিবর্তে কিছু লেখা নাই। — স

আরও আরও দূরে অসীম জগতে
নিঃস্পন্দ অনন্তে।
ফিরায়ে সজোরে আঁখি
হেরিনু অপর কূল। কঠিন পাষাণ
ভীমবলে বাঁধা যেন দীর্ঘ শক্ত সম
অসুরের শিল্পকার্য্য। মত্ত বর্ষাকালে
নদীতীরে নভোব্যাপী শরীর এলায়ে
রুক্ষ আনন্দিত মনে খেটেছে অসুর
প্রকৃতির ক্রূরতায় প্রীতমনা। আরো
ক্রূর করিবারে তারে খেয়াল মানসে।
রেখায় রেখায় শিলা কেটেছে হাসিয়া।
বৃহৎ কঙ্কাল যেন আঁকি নদীকূল,
যেন মাংসহীন অস্থি মৃত পৃথিবীর
কতদিন পড়ে আছে অন্ত্যেষ্টি-বঞ্চিত
সে বিজন প্রান্ত মাঝে সেই নদীতীরে।
নাই বাঁক, নাই তৃণফুল। ঋজুদৃপ্ত
নিবিড় নিরেট কোমলতা অবহেলি'
নামে জলে প্রাণহীন কঠিন পাষাণ।
সুদূরে সে মরুভূমি ঘুরেছে অলসে
মিলিতে পাষাণ সাথে। কোমলতাহীন
প্রেমহীন সে মিলন, জড়ের প্রণয়,
পাষাণ-চুম্বন।
চাহিনু নদীর পানে।
বহিছে নীরব বেগে স্বপ্নরাজ্য-নদী,
সুষুপ্ত প্রচণ্ড শান্ত, যেন রুদ্রপ্রাণ
প্রকৃতির বাহুবদ্ধ হিমালয়-শিরে।
দূরে নির্গমের পথ। প্রান্তরে পাষাণে
মিলন যেথায়, অতি সরু স্থল, যেন
বুভুক্ষিত মরণের গলা, যেন সেথা
ভূমির সঙ্কটস্থলে স্বয়ং মরণ
অজগর-রূপে সুপ্ত পাষাণ-আকৃতি

বিশ্ব-মাঝে। ধীর বেগে মহীয়ান-গতি
সুগর্ব্বিত পদক্ষেপে আসে স্বপ্ন-নদী।
বলিতে, অদ্ভুত অশ্ব দধিক্রা বেদের
প্রাণরূপী নারায়ণ বদ্ধ বুকে মুখে
গর্ব্বিত গ্রীবায় ছুটে মানবে লইয়া
সত্যধামে স্বর্গপথে। কিন্তু সেই পথে
এই কি প্রপাত নিম্নে জীবন-নদীর?
এ কি সত্য পরিণাম?
নামে পাতকীর মত জানিনা কি বেগে,
কোন ক্রূরতর দেশে। পশিল করুণ
সহস্র দুঃখীর যেন আর্ত্তধ্বনি কাণে
পতিত নদীর। চাহিয়া নীরস মনে
ভাবিনু "কি মৃত দেশ, কি স্তব্ধ জগৎ,
আরাবে কি নীরবতা, কি জড়তা বেগে।
কভু কি মানুষ বাসি এই জড় দেশে
নিজ প্রাণ সঞ্চারিয়া করিবে সজীব?
নাই কি পুরুষ তবে এই প্রকৃতির?"
প্রত্যাখ্যাত যেন ভয়ে চিন্তা ফিরে আসে
নিজ নীড়ে। স্পন্দহীন ভূমি পূর্ব্ববৎ।

জাগিল হঠাৎ দৃষ্টি চাহিল অন্তরে।*
হেরিনু শিহরি' জীবন্ত সে জড় স্থান,
জীবন্ত সে জলরাশি, জীবন্ত নির্দ্দয়
সে প্রান্তর অন্তহীন, সে উচ্চ আকাশ
সচেতন, জীবন্ত সে মরণের গলা, —
পাষাণ-আকৃতি সুপ্ত অজগর-রূপে।
করুণ নিপাত-ধ্বনি জীবন্ত আত্মার
দূরে সে ক্রন্দন। বুঝিনু কি ভেবে আছে
ঋজু দৃপ্ত সে পাষাণ কোমলতাহীন
দয়াহীন সুখহীন। বুঝিনু কি আশা

* পঙ্‌ক্তিটির শেষ ছয়টি অক্ষর পাণ্ডুলিপিতে কাটা আছে, কিন্তু পরিবর্তে কিছু লেখা নাই। — স

পুষিয়া স্ববক্ষে নদী বহে সুবিশাল
অলক্ষ্য পতনস্থলে, — সমাধিস্থ যেন
মহাপ্রাণ নিজ বেগে। ইহাও বুঝিনু
ভাবে না কাহার কথা কেহ, পরস্পরে
চেনে না, চাহে না। নিজে লয়ে তুষ্ট সবে,
নিজেতে সকলে বদ্ধ একা এই জগে
নিজ কর্ম্ম নিজ ভাব লহি'। কিন্তু যবে
পরস্পর্শ পড়ে গায়ে, শিহরি' অন্তরে,
স্তব্ধ বদ্ধ দেহ ভাবে, "এ কি অন্য আমি
পড়ে মোর গায়ে, অতি সুখ এই স্পর্শে।"
ইহাতেই শেষ। ফুটে না সে গুহ্য স্পৃহা
ভাষায়, স্পন্দনে, জ্ঞানে।
নিরাশ মানসে
হেরি যেন কারাগৃহ সমস্ত জগৎ।
সহসা মধুর ধ্বনি জাগিল ভিতরে।
"চাও ফিরে, বুঝে নাও প্রকৃতির আশা
বুঝে নাও জড়-কারাগৃহে মাতৃপ্রাণ,
গুপ্ত অর্থ বুঝে নাও, এ লীলার মাঝে।"
তুলিয়া সুতপ্ত আঁখি অদূরে হেরিনু
প্রান্তরে মানবমূর্ত্তি। বালক বালিকা
পরস্পর আলিঙ্গনে মত্ত এই জড়ে,
নিস্পন্দ এ স্বপ্নরাজ্যে মুক্ত দুই প্রাণী
অশৃঙ্খল, ধ্যানরত পরস্পর সুখে।
আবার অদৃশ্য তারা। সে জীবন্ত জড়
আশাহীন পূর্ব্ববৎ বদ্ধ নিজ ভাবে।
কিন্তু মুক্তমনা আমি জড়স্পর্শ হতে
ছদ্মবেশী পুরুষের চিনিনু উদ্দেশ,
প্রকৃতির গুপ্ত বাঞ্ছা ধরিনু মানসে।
ভরিয়া নয়ন দৃশ্যে আশ্বস্ত ফিরিনু
ধরাধামে।

সবাই পাগল তোরা ঘুরি’ ধরাতল

সবাই পাগল তোরা ঘুরি’ ধরাতল,
সুন্দর জীবন লভি’, জন্মমৃত্যুদ্বার,
সহস্র খেলানা ঘরে, প্রকৃতি সম্বল,
কৃষ্ণ সাথী, দুঃখ দুঃখ কর অনিবার।

ভগবান আমারই, আমার ব্রহ্মাণ্ড।
মদাবহ প্রকৃতির হাসি নভঃস্থলে,
মোর জন্য হাতে ধরে রবি সুধাভাণ্ড,
আমার আনন্দস্রোতে তটিনী উছলে।

আমার রজনী-রাজ্যে জ্যোৎস্না রাজধানী,
আমার সমুদ্রফেনা হাস্য দেবতার,
আমার প্রণয়চ্ছলে কৃষ্ণ অভিমানী,
শিবের গৃহিণী কালী স্বজনী আমার।

স্বরগ হইতে শুনি’ আসি ধরাতলে,
কি বা অমূল্য নিধি পেয়েছে মানব,
এত কথা, এত নেশা দুঃখ দুঃখ বলে,
আঁকড়ি ধরিয়া বসে টানিলে কেশব।

দুঃখ-অভিমানী জীব জগৎ-সংসারে
বিচরে স্বপন-ঘোরে বিষাদ-নেশায়,
ক্রন্দন-মদিরা যেন পান করিবারে
দুঃখ দুঃখ বলে মত্ত তৃষ্ণার্ত্ত ধরায়।

কাছে প্রেমময় সিন্ধু, ডাকে মৃদুস্বরে —
ছাড় তৃষ্ণা, ছাড় দুঃখ, সখা তোর আমি,
তুলিয়া নিজ অঞ্চলে ফেলে দিতে দূরে
অন্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে আসিয়াছি নামি।

যাই স্বর্গধামে ফিরি। পবনে প্রকাশি
দীপ্ত পক্ষদল, শুনি সনাতন তান।
আনন্দ-বিহগ আমি ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী
আনন্দ-আকাশে গাহি অমৃতের গান।

দৈত্য

মহাযোগী সিদ্ধেশ্বর, আশুতোষ শূলী,
কৈলাসশিখরবাসী! যাঁহার প্রভাবে
কারণনিহিত বিশ্ব নিগূঢ় স্ববীজে,
রক্ষ মোরে, দৈত্যপ্রিয় মহেশ্বর।
দৈত্য আমি অংশ তোর। দারুণ প্রচণ্ড
নিষ্ঠুর অসহনীয় জ্বালাময়ী শক্তি
মম চিত্তে জ্বলে সদা দাবানল সম।
তব শক্তি জানি, তারে রোধি নাই শম্ভু।
এই শক্তি বশে আছি ক্রূর চণ্ডকর্ম্মা
ভীম সিংহনাদে পূরি' দশদিক বিশ্বে
বিচরণ করি সদা, দলি মানবের
ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি, বধি গর্ব্বিত ক্ষত্রিয়ে,
পাষণ্ড ব্রাহ্মণভণ্ডে, এই শক্তিস্রোতে
পুরাতন ভাঙ্গি টুটি নবীন প্রয়াসী।
ব্রাহ্মণের ছলনায় অন্ধ নরজাতি।
ব্রাহ্মণের কুশিক্ষায় পদানত সদা
মনুষ্যত্ব হারাইয়া দাসত্বে ব্যসনী
স্বধর্ম্ম ভুলেছে নর, অনার্য্য দুর্ব্বল
নীচ ক্ষুদ্রকর্ম্মা। মহতী বেদান্ত শিক্ষা
বিকৃত করিয়া নিত্য বিহরিছে ভণ্ড,
ভেদনীতি প্রসারিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি-পটু
''মহান মহান আমি, পড় পদপ্রান্তে
নরগণ,'' এই রবে ধর্ম্ম সত্য সুখ
মজাইয়া মানবের কঠিন নিগড়ে
চিরকাল রাখে বাঁধি'। হে মহাতপস্বী,
হে ভেদবিজয়ী প্রাজ্ঞ, প্রমথ-আশ্রয়,
সমবুদ্ধি! তব রাজ্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল
সমান। অপক্ষপাতী ঈশ্বর সর্ব্বদা।

উচ্চ নীচ ছোট বড় স্বকর্ম্মে স্বগুণে।
ক্ষণস্থায়ী সেই ভেদ, স্থায়ী অন্তঃস্থলে
অভেদ অপাপ শুদ্ধ সমধর্ম্মী-আত্মা
একপ্রাণ একজাতি প্রেম ন্যায়-ডোরে
মানবের শত জাতি সচেষ্ট বাঁধিতে।
যুগে যুগে মহেশ্বর মানব-অন্তরে
হুতাশন সম উঠি অন্যায় অনৃত
অবিচার অত্যাচার ভস্ম করে জ্বলি।
ছাড়ে না তথাপি স্বার্থ, অনৃত-আবার
সত্য-নাম-বেশধারী ভুলায় মানবে।
কপট অধর্ম্ম দিয়া দোহাই ধর্ম্মের
জগতের সিংহাসনে বিরাজে আবার।
ক্রোধে জ্বলি সদা, শম্ভু, চাই উছলিয়া
সিন্ধুসম মহানাদে ভীমশক্তিবলে,
বিনাশ করিতে যত মিথ্যা এই ভবে,
গড়িব নূতন বিশ্ব যেথা না আসিবে
অনৃত কলহ স্বার্থ। একপ্রাণে সদা
গভীরে অনুপ্রাণিত সুখী নরজাতি
হর্ষপূর্ণ প্রেমপূর্ণ বিশাল সমাজে
মসৃণ প্রীতিনিগড়ে বদ্ধ একতায়
আনন্দ বিভোর যেন দেবতা নন্দনে
ভেদ স্বার্থ যুদ্ধ ভুলি ধরাগত স্বর্গ
ভুঞ্জিবে। মহতী আশা বিরাজে সর্ব্বদা
এ হৃদয়ে। বিরোধে ব্রাহ্মণ ধূর্ত্তমনা,
বিরোধে নৃপতি স্বার্থপর, ধনপ্রিয়
বৈশ্য, ঈর্ষাপরায়ণ দেবজাতি দিবে।
আর না সহে এ প্রাণে বিশ্বের যাতনা,
আর না সহে এ প্রাণে এ ক্রন্দনধ্বনি।
উঠিব উঠিব, শম্ভু, মহাক্রোধানলে
দগ্ধ করি শত্রুগণে সাম্য সত্য প্রেম

প্রচার করিব বিশ্বে। ধৌত করি রক্তে
শুদ্ধ করিবারে উঠি মলিন পৃথিবী।
ব্রাহ্মণের রক্তে ডুবি মিথ্যা ও অনৃত,
ক্ষত্রিয়ের রক্তে ডুবি সবল অন্যায়
বৈশ্যরক্তে স্বার্থ মজিবে মজিবে,
আর না উঠিবে মাতি ভারাক্লিষ্ট ধরা
সবলের জয়োল্লাসে দুর্ব্বল-ক্রন্দনে।
সংহারিব সংহারিব দেবতা নন্দনে
ছারখার করি স্বর্গ, শ্মশান হইবে
স্বার্থকলুষিত সুখ। অমরের প্রাণে
প্রবেশ করাতে মৃত্যু দাও মোরে শক্তি।
চায় রক্ত চায় রক্ত সংক্রুদ্ধা করালী।

কতশত ছন্দোবন্ধে...

কতশত ছন্দোবন্ধে নৃত্য কর, নটরাজ,
এই তব বিশ্বমাঝে।
সদা নানা দেহ পর, ধর সদা নানা সাজ,
ঘোর নৃত্য নব কাজে।

ওই উড়লে বিহঙ্গম, এই ব্যাঘ্র মৃত্যু সম
পড় হরিণীর শিরে।
মৎস্য তুমি, জেলে তুমি ফেল জাল
নিত্যানন্দ সিন্ধুনীরে।

পরাজিত রাবণ

সমবেত রক্ষোবৃন্দ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি
ভূমণ্ডলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নময়ী পুরী
সমুদ্র-চুম্বিত দ্বীপে উচ্চ মহাশৈলে
বাঁধিয়া রাখিছে যারা স্বতেজে নিঃশঙ্কে
দেবেশ্বরে উপেক্ষিয়া, বিশ্বে অবহেলি’।
কিন্তু এ কি শব্দ শোন লঙ্কার প্রাচীর
ঘেরে, এ কি কোলাহল অপূর্ব্ব এ দেশে
গর্জ্জে এ কি তুচ্ছ সেনা হর্ষে উপহাসে
বিজয়ে, শ্লাঘায় নাচি’ রক্ষঃ মাতা-শিরে।
কার ভয়ে আছি বদ্ধ বন্দী স্বনগরে?
হেরি নীরবে সে নৃত্য, শুনি সে গর্জ্জন?
বরুণরক্ষিত যোদ্ধা অলংঘ্য সাগরে
বিশ্বভোগী ছিনু মোরা। এক ক্ষুদ্র দ্বীপ
দলিয়া গরবভরে সারা নরজাতি
কোটী কোটী মানবের পৃথু বসুন্ধরা
নিজস্ব করিয়া ভুঞ্জে। দৃপ্ত পুরন্দর
ত্রৈলোক্য-সম্রাট নামে বদ্ধ দাসকর্ম্মে
তোমাদের ভুজবলে লঙ্কাপুরে আজি।
সেই রক্ষ মোরা, সেই লঙ্কা এই পুরী।
পরিণত কি মর্দ্দিবে সেই ভুজবল
ক্ষীণদীপ্তি কি সে দর্প? বল রক্ষগণ,
গিয়েছে কি শক্তি উড়ে অলক্ষিতা রাত্রে
নিদ্রাকরে ছিনু যবে নিশায় নির্ভয়ে?

কে করেছে চুরি তেজঃ, কৃষ্ণ, মহাদেব,
অন্য বা সাহসী কেহ নিস্তব্ধ নিশীথে
কাঁপিতে কাঁপিতে পশি সুপ্ত লঙ্কাপুরে?
হায়, এ কি উপহাস অদৃষ্টের, শেষে
ক্ষুদ্র যুদ্ধে পরাজিত এ অজেয় জাতি,
সামান্য মানব জয়ী রাক্ষসের দেশে।

বুঝিলাম, যদি নামি রুদ্র শূলপাণি
ভরিয়া প্রমথে দৈত্যে বিশ্ববল তার
রাতদিন শত বর্ষ যুঝি বধি বিঁধি
লণ্ডভণ্ড করে শেষে লঙ্কা দৈববলে।
বুঝিলাম, যদি পাতি' কূটনীতি-জাল
রক্ষঃ-বুদ্ধি আঁধারিয়া হরে মহাবিষ্ণু
রক্ষঃ-লক্ষ্মী। রামভুজে বিজিত আমরা,
মানব-দলিত লঙ্কা রাবণের পুরী।
হাস সুখে, পরাজিত দেবগণ স্বর্গে,
নাই দণ্ডভয় আর। হাস সুখে, ইন্দ্র,
দাস্যমুক্ত পুরন্দর। নিন্দি না তোমারে
লজ্জাস্থলে যদি গর্ব্ব কর এ বিজয়ে,
জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গপুরী, সুচির বসন্ত,
নন্দনকানন ভুঞ্জ মর্ত্ত্যের প্রসাদে।
মর্ত্ত্যভুজে পরাজিত রাবণ দেবারি।

পরাজিত! শোন শোন দূর মহাশৈলে
শুনিয়া এ উক্তি হাসে উগ্র প্রতিধ্বনি
লঙ্কাদ্বীপে শৈলসুতা বিকট আরাবে।
পরাজিত! টুটে এই শব্দ-উচ্চারণে
প্রাণ মম, ফুটে না এ কথা রক্ষমুখে।
লৌহবলে দৃপ্ত রক্ষঃ লৌহ অস্ত্রধারী
অতৃপ্ত পার্থিব জয়ে ত্রিদিবে ভ্রমিনু
অতৃপ্ত আক্রমি' চূড়া ত্রৈলোক্য-অদ্রির।
পরাজিত সেই জাতি! অলীক এ সত্য
মিথ্যা এই ইতিহাস। ভ্রাতা, মিত্র, পুত্র
হত মোর, রত্নময় বিশাল প্রাসাদে
ভৃত্যজনপূর্ণ কক্ষে বিচরি একাকী,
বৃথা খুঁজি বন্ধুমুখ। পূর্ণ অন্তঃপুরে
পুত্রহীনা নারীগণে হেরি শুষ্ক প্রাণে
বিচরি একাকী। সভাস্থলে, রণক্ষেত্রে
নিরানন্দ পানভূমে, নীরস ক্রীড়ায়

লঙ্কার গৌরব যত বৃথা খুঁজি চোখে।
নীরস সে সিংহনাদ, এ কর্ণকুহরে
পূরিত আনন্দস্রোতঃ, বিজয়ের তূরী,
যুদ্ধের আয়সীবাণী, দৃপ্ত সিংহনাদ
সোদর কুম্ভকর্ণের। অক্ষ, ইন্দ্রজিৎ,
নীরব কেন তোমরা এ বিপৎ-কালে।
হর্ষায় না কেন কাণ, বৎস চিরজয়ী,
তোদের সে কণ্ঠধ্বনি। এতই কি দৃঢ়,
এতই মধুর মরণের আলিঙ্গন,
বৎস মোর। ক্ষমা কর, রক্ষগণ, আজি
রাবণদলিতা ধরা তিতিল প্রথম
রাবণের অশ্রুজলে।
হোক হত তারা
আছি আমি। লিখিবে কি ইতিহাসপৃষ্ঠে,
লিখিবে কি সত্য তবে আয়াস অক্ষরে,
ভুবনবিজয়ী-রক্ষ পরাজিত শেষে
ক্ষুদ্রতেজে রামহস্তে! এ ঘোর অকীর্ত্তি
দিব না লিখিতে কভু রক্ষ-ইতিহাসে।
শুনিয়া অতীতকথা বিস্মিত জগৎ
বলুক মায়ায় দৈবে ক্ষণকালজয়ী
রক্ষের অবহেলায় ছিল দাশরথী।
বলুক অদ্ভুত বার্ত্তা অতুল্য এ ভবে
বীর-প্রাণ-উন্মাদিনী, — হত-মুখ্যবীর,
হতপুত্র, হতমিত্র রাক্ষস রাবণ
আবার উঠিল গর্জ্জি উন্মত্ত আহবে,
বিনাশী' অযুত শত্রু অল্প লঙ্কাবাসী
অল্পদিনে অল্পায়াসে বিদ্রোহী জগৎ
করিয়াছে পুনঃ পরাধীন। উঠ তবে
মুছে এস শোক-স্মৃতি, মুছ প্রাণপটে
বিষাদের ছায়া যত, আন্ধারিত চোখে
উজ্জ্বল ক্রোধাগ্নি। ভুলে যাও দয়া, ক্লান্তি,
হে স্বর্গবিজেতৃ জাতি। লৌহময় দেহে

লৌহময় প্রাণচিত্ত সাজে রক্ষগণে।
সংহার করিব পুনঃ। মহাসিন্ধু লংঘি
নির্জ্জন করিব বায়ুপুত্র জন্মভূমি,
অগণন বন্দী দাসে শূন্য লঙ্কাদ্বীপ
করিব জনসঙ্কুল, জন্মাব সুরতে
শত্রুদের জায়া গর্ব্ভে নবীন সন্ততি।
যাহা গেল, ছাড়ি তাহা। আবার গড়িব,
আবার ভাঙ্গিব। নহি ক্ষুদ্র নরচেতা,
থামে না রাবণ-তৃষ্ণা অল্প রক্তস্রাবে,
অল্প-পরিহিংসা-পরিতৃপ্ত শোকবহ্নি
নিভে না এ বিশাল হৃদয়ে, অল্পভোগে
ম্লান নহে এ ইন্দ্রিয়তেজঃ। রক্ষঃ আমি।
ভুবনবিজয়ী পুনঃ ভুঞ্জিব অসীমে।

নচেৎ হৃষ্ট হ তোরা, শিবার শৃগাল,
হৃষ্ট হ গৃধিনী যত। সহস্র সহস্র
নর-কপিমুণ্ডে মহাশৈলসম রচি
পাতিব মরণতল্প কিংবা হুতাশনে
ঐশ্বর্য সৌন্দর্য্য শিল্প প্রাচীন লঙ্কার
ইন্ধন কল্পনা করি ফেলিব, ফেলিব
এ অতুল কির্ত্তি। এ অখিল মহাপুরী
সাজাব রাক্ষসী চিতা। ত্রিদিব পৃথিবী
জিনিয়াছি যুদ্ধে, বাঁধিয়াছি দেবগণে,
ভুঞ্জেছি অতুল্য যশঃ, বিশ্বচক্ষু পুড়ি
সূর্য্য যেন জ্বলে নভে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে,
উত্তাপে জগৎ ক্লিষ্ট রুদ্রদীপ্তি পূজে।
জ্বলিয়াছি ভূমণ্ডলে কিরণ প্রকাশি'।
রঞ্জিয়া নিজ রুধিরে গগন-নীলিমা
সূর্য্য যেন অস্তাচলে ডোবে মহাতেজা,
ডুবিব মৃত্যুসাগরে। ছিলাম উদয়ে,
ভোগকালে উচ্চশির মহাতেজা। অস্তে
রহিব, মরণে, নাশে অজেয় তেজস্বী।

একটি কবিতা

বন্ধু! প্রেমদীক্ষালাভে ভ্রান্ত সহৃদয়!
সন্ন্যাস-আলস্যজালে ধৃত উচ্চাশয়!
মহীয়ান সনাতন বিভূতি কৃষ্ণের
পতিত কলিকলিলে ধর্ম্ম-অধর্ম্মের!
বৃথা কর তিরস্কার, নিন্দা কর পথ।
বুঝিবে না তুমি মোর উগ্র মনোরথ।
অজ্ঞানের দাস হলে সত্ত্ব মিশ্র তমে
নচেৎ এ উগ্রকর্ম্মে তব প্রিয়তমে
চিনিতে, চিনিতে কৃষ্ণে। বোঝ তুমি রাধা
তারে বোঝ নাই, পৃথ্বী-অসুর-সম্বাধা
হেরিয়া যে নামে সদা কাঁপায়ে অচল
উল্টাইয়া শূলস্পর্শে গূঢ় সিন্ধুতল।
বোঝ তুমি বাঁশী, বোঝ তুমি বৃন্দাবন,
বোঝ নাই কংস হত্যা, কুরুক্ষেত্র রণ।
পরম বৈষ্ণব তুমি, কর বুদ্ধ-স্তব।
বিষ্ণু রুদ্র এক দেহ, ভিন্ন অবয়ব
ভুলেছ কি? ভুলেছ কি দয়ার ভাণ্ডার,
ক্রূর হত্যাকারী কল্কী এক অবতার।
রুদ্র কল্কীভাব বুকে সম্বরিয়া কানু
রাধার চরণপ্রান্তে পাতিয়াছে জানু।
পূর্ণ দয়া অবরুদ্ধ জননীর প্রাণে,
ভৈরবী রাক্ষসী চণ্ডী মাতে উগ্র রণে।
এই যে বৌদ্ধের ধর্ম্ম মায়ামোহ-সৃষ্ট
অহিংসায় শ্লথচিত্ত, করুণায় ক্লিষ্ট,
করিবে না তীব্র লিপ্সা জগতের হিতে,
ধরিবে না জ্ঞান-অসি অজ্ঞান খণ্ডিতে।
দীনতায় তেজোহীন, আলস্যে নিঃসার,
মাথার মুণ্ডন, ভুঁড়ির বর্দ্ধন সার,

বুদ্ধের নহে এ ভাব। মায়ামুক্ত ধীর
কঠোর তপস্বীশ্রেষ্ঠ সেও মহাবীর।
বন্ধুচিত্ত দলি পায়ে মত্ত মহাব্রতে,
ফিরে না তাকায়ে, গেল একদৃষ্ট পথে।
এই যে বৈষ্ণবতন্ত্র বিগলিতচিত্ত,
শ্লথতায় কারুণিক, দৌর্ব্বল্যে নিবৃত্ত,
সতত অলসগাত্র, কৃপাবিদ্ধ-মর্ম্ম,
আধ্যাত্মিক কামমদে বীর্য্যহারা ধর্ম্ম,
বিশ্ববীর শ্রীকৃষ্ণের আরাধক বলে
তাঁর বাক্য, তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্মে বাক্যে দ'লে,
"দয়া" "প্রেম" বলি সদা, যাথার্থ্য দয়ার, —
প্রেমের প্রখর সত্য করেছে অসার, —
নহে চৈতন্যের দীক্ষা। প্রচণ্ড সুধীর
তীব্র প্রেম, তীব্র ক্ষমা, তমোমুক্ত বীর
গৌরাঙ্গ সে শচীসূত।
দেখনি সাগর?
গুপ্ত মহেশ্বর যেন, — অগণন স্তর,
নিশ্চল নিগূঢ় শান্ত, অলক্ষ্য বিস্তার, —
অগণন নীল নৃত্য উপরে তাহার।
হাসিছে কাঁদিছে ঢেউ, বিশাল তরঙ্গে
পায়ে পড়ে পৃথিবীর, চুম্বে নানা রঙ্গে।
কিন্তু সে আনন্দময় লীলা ক্রীড়া জলধির
হইবে না কভু যদি, প্রতিষ্ঠা গভীর,
অচল অতল গুহ্য করে না ধারণ
গূঢ়চেতা মহাসিন্ধু অমাপ্য যোজন
স্বদীপিত অন্ধকারে নীরবে একেলা।
মহতী সে স্তব্ধতায় এই নৃত্য খেলা।
দেখ নাই পুনঃ যবে বায়ুর তাড়নে
ক্রুদ্ধ উঠে অনিরুদ্ধ, — যোজনে যোজনে
গরজিছে ভীম সিন্ধু নির্দ্দয় অপার,

অনন্ত-ক্রূরতা-মূর্ত্তি, রোষের বিস্তার
হাসিছে আকাশ জুড়ি। আরাবে বধির,
অট্টহাস্যে সিংহনাদে ক্রূর জলধির
ডোবে তরী, ডোবে নর। শোনে কি ক্রন্দন,
নিষ্ঠুর ক্রীড়ায় মত্ত আলিঙ্গি' পবন?
অন্য এই ক্রীড়া, অন্য নৃত্য, অন্য স্বর,
এ চুম্বন অন্য, — অথচ সেই সাগর।
বলিবে কি তুমি, কোন্ সয়তান তবে
হাসে এই ভীম হাস্যে, ডাকে এই রবে?
কোন্ রাক্ষসের হেন দৃপ্ত অত্যাচার
ক্রীড়াচ্ছলে? এ দারুণ আলিঙ্গন কার?
জান সে রাক্ষসে তুমি। নিরখ আবার,
ব্রজবালা চেনে ব্রজে বংশীরব তার।
বৃথা বল, অশুভ সৃজন মানবের;
বৃথা বল ক্রূরতা খেয়াল রাক্ষসের।
এই ভীম রুদ্রক্রীড়া করেছেন তিনি
যাঁরে বলে দয়াময়, প্রেমময় যিনি।
কেন করে, মাতে কেন এ ভীম আহবে,
মায়ামুক্তি এই মূল্যে চিনিয়া কেশবে।
অশুভে যখন দেখি শুভ সৃষ্টি তাঁর,
ক্রূরতায় চিনি দয়া, তখনই নিস্তার।
সর্ব্বরোধ যায় ভেঙ্গে, সর্ব্ব পাপ মরে,
মুক্ত অনন্তনিবাসী জীবাত্মা বিচরে।
আর নাই কেহ কার সবাই তাঁহার,
জন্মমৃত্যুস্রোতে চলে লীলা অনিবার।
লীলাময় তপোময় বিশ্বে নারায়ণ
অনন্ত চৈতন্য-মত্ত আনন্দ-স্পন্দন।

সাবিত্রী

নীরব অরণ্যরাজী, একাকিনী নিশা
বিশাল নিস্তব্ধ প্রাণে শুনিছে নিমগ্ন
অজানা নিভৃত স্বর, অস্ফুট নিঃশ্বাস
অপার্থিব পদধ্বনি, যা বাজে না কভু
সুখলোভী দিবসের ধনান্ধ হৃদয়ে।
বিচরে না ভীমবনে নিশাচর প্রাণী,
জ্বলে না আঁধারে ক্রূর চক্ষু। সুপ্ত তৃণে
নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা শায়িত শার্দ্দুল,
পরিতৃপ্ত হিংস্র প্রাণ ভরা রক্তমাংসে।
গভীর সমাধিমগ্ন রজনীর চিত্ত
স্পন্দহীন চিন্তাহীন অনন্ত তিমিরে।
হঠাৎ চমকি দেখে গভীরনয়না
স্বপ্নে যেন জাগরণ অস্পষ্ট আভাস
সুপ্ত চেতনার জড় অচেতন জটা
লুক্কান নিধির দীপ্তি অন্ধকার ঘরে
জাগিছে বসনপ্রান্তে চির আচ্ছাদিত
সুস্মিতা ভগিনী উষা। শুয়েছিল ঢাকি
কৃষ্ণকায়া ভগিনীর অঞ্চলে নয়ন
অন্ধকারে ভীত যেন বালিকা মায়ের
অঞ্চলে লুকায়ে অঙ্গ ঘুমায় নিঃশঙ্কে।
ঈষৎ তনু হিল্লোলে নড়িল এখন,
পাণ্ডুর কিরণ আভা
কুসুম নিচয় শুভ্র স্কন্ধের সঙ্কেত।
অসিত অবগুণ্ঠন ফেলিল চঞ্চলা
অলস অঙ্গুলি ধীরে জাগি অল্পে অল্পে।
রূপসী চিরযৌবনা আনন্দিনী দেবী
গগন-উদ্ঘাটী দীপ্তি অমর আঁখির
উন্মেষি উঠিল হাসি আহ্লাদিত বিশ্বে।
চিত্তহারী স্বর্ণহাসি ভাসিল গগন

আনন্দলহরী যেন সোনার তরঙ্গে
বুলায়ে আলোকস্পর্শ হৃদয়ে নয়নে
শুভ্র-বক্ষ-আভা সৃজে পবিত্র বিলাসে।
আবরণে অনাবৃত শ্বেত তনুকান্তি
সুসূক্ষ্ম আলোকবস্ত্র বিদরে প্লাবিয়া
নগ্নাঙ্গ রূপচ্ছটায় দেবত্ব প্রকাশি'।
মধুরহাসিনী উষা রাতুল অঙ্গুলি
বুলাইল জগতের পাণ্ডুর কপোলে।
চরণবিক্ষেপ তার পতিতে উদ্যত
ধরাধাম দেখি দেবী চাহিয়া পিছনে
সূর্য্যের আশায় ফিরি, চিন্তাশীল গতি
বাহিরিল অমরের সনাতন কর্ম্মে।
চারিদিকে খুলি আঁখি জীবন-হরষে
শুনিছে সহস্র কর্ণে প্রভাত-নিক্কণ
আনন্দিত বিশ্বপ্রাণ। জাগিল সাবিত্রী
সুখহীন জাগরণে। কাঁপি দিবাস্পর্শে
আতঙ্ক জাগিল সঙ্গে। বুকে হাত থুই
জানে নাই কেন সেথা পুরাতন
চিরসখী যেন দুঃখ যে ক্ষত স্থানের
কি অস্ফুট যন্ত্রণার। স্মৃতি দ্বারপাল
আসিল তখন খুলি নিদ্রাবৃত প্রাণ
সুপ্ত শতদল সম বিমর্ষ প্রভাতে।
হেরিল অন্তরে শ্বেত প্রস্তর মূরতি
রিক্ত দেবালয়ে মৌনী নির্দ্দয় দেবতা
অপেক্ষা করিছে দুঃখ নীরব হৃদয়ে
দৈনিক নিবেদ্য অশ্রু। বিশ্রান্ত সুন্দর
বিশাল নয়ন তুলি সুস্মিত উষার
নয়নে চাহিল। এই আলোকিত বিশ্ব
বোঝা যেন বুকে তার, দুঃখ তার ঘেরি
শত্রু যেন এ আনন্দ। জানিল প্রভাত
প্রাণেশের মৃত্যুদিন এ স্বর্ণ-তরঙ্গে।

জাগিল জননী

রাত্রী দ্বিপ্রহর যবে সুপ্ত জগৎ নীরবে
ঘুমায়ে পড়েছে ধরা অন্ধকার কোলে,
প্রসুপ্ত গগন, ক্রুদ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাস রুদ্ধ,
নিবিড় মেঘতিমিরে তারা নাহি জ্বলে,
ডানা দিয়ে চোখ ঢাকি
বাসায় নিমগ্ন পাখী,
নাই পশু-বিচরণ, নাই পদধ্বনি।
তখন জাগিল জননী।
তখন হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠি জাগিল জননী।
ভীম চক্ষু উন্মীলিয়া জাগিল জননী।
যেন সূর্য্য দুটী

জাগিল যখন মাতা নড়ে না একটী পাতা
নিষ্কম্প দীপের আলো ঘরে ম্রিয়মাণ।
জনহীন পুরপথে ক্ষেত্রে অরণ্যে পর্ব্বতে
গভীর সুষুপ্তিমগ্ন জগতের প্রাণ।
সমুদ্রের জলরাশি
বেলায় টুটে না হাসি',
প্রকাণ্ড নিশ্চল স্তব্ধ জলধি নিঃশব্দ।
তবে কেন জাগিল জননী?
কে বলিবে কিবা শুনে জাগিল জননী?
রাত্রে কাহার নীরব স্তবে জাগিল জননী
হুঙ্কারিয়া

ঘুমাল জননী যবে কার আশা ছিল হবে
সেই অন্ধ তিমিরেও মার জাগরণ?
নিরাশ রাত্রীতে মগ্ন দুঃখে প্রাণ চিরভগ্ন
ঘুমেও চকিত শুনে পাতার পতন।

সুচতুর পরাক্রান্ত
গর্ব্বিত মহাদুর্দ্দান্ত
অসুরের রাজলক্ষ্মী ঘেরেছে ধরণী।
হঠাৎ হুঙ্কারিল জননী।
হঠাৎ শত শত সিন্ধুসম হুঙ্কারিল জননী।
জাগাইতে পুত্রজনে হুঙ্কারিল জননী।
বজ্রসম

ব্যথিত হৃদয়াবেগে ছিল না কি কেহ জেগে
সেই ঘোর রাত্রীকালে জননীর তরে?
দুই চারিজন মাত্র ক্ষৌমেয় আবৃত গাত্র
দেবালয়ে ছিল বসে নগ্ন অসি করে।
করালীর মহাভক্ত
মাখাইতে নিজ রক্ত
জননীর পায়ে তারা জাগিল রজনী।
তাই উঠিল জননী
তাই ভীম পিপাসায় ক্রোধে জাগিল জননী।
সিংহনাদ ছাড়ি বিশ্বে জাগিল জননী।
ভুবনপ্রবোধে

অট্টহাসি মুখে ছুটে বিদ্যুৎ নয়নে ফুটে
মার রুধিরাক্ত ক্রোধকুসুম ভীষণ
দৈত্যমুণ্ডদ্বয় করে দুলাইয়া ক্রোধভরে
করিছে জননী উঠি ভীম আবাহন।

কে তুমি গভীর রাতে দৈত্যমুণ্ড ঝুলে হাতে
দুলাইয়া কর দেশে রক্তবরিষণ
অগ্নিকুণ্ড নেত্রদ্বয় জননী করিছে ভয়
ধরাতল কাঁপাইয়া কর বিচরণ
"উঠ উঠ" উগ্রনাদে
মধুময় অবসাদে

তাড়াইতে কর কণ্ঠধ্বনি।
এই যে মোদের জননী
যমনেত্র জ্বলে ভালে আইল জননী
নৃমুণ্ড ঝন্ঝনে নাচি তালে তালে, আসিছে জননী
উঠ উঠ উগ্র রবে
দেব দৈত্য নর সবে
উঠিছে গরজি কেহ কার ও হর্ষধ্বনি।
এই যে আমার জননী
যমনেত্র জ্বলে ভালে আসিছে জননী
নৃমুণ্ড নাচে তালে তালে আসিছে জননী।

যুদ্ধ ঝটিকার মাঝে অসি অসি কায়ে বাজে
অগ্নিবৃষ্টি ছুটে রণে আকাশ বধির
[...][১] উগ্ররোলে ফাটে কাণ পৃথ্বী দোলে
বহে বহে রক্ত যেন স্রোতস্বতী নীর।
কবে চিনিব চিনিব মাকে
সিন্ধুসম যবে ডাকে
উড়াইয়া ভীমশ্বাসে[২] দৈত্যরাজ্য চণ্ডী হাসে
তখন চিনিব জননী
যখন রক্তনদীস্রোতে নাহি নাচিছে জননী
জানিবে নিশ্চয় তবে জেগেছে জননী।

১। দুষ্পাঠ্য
২। পাণ্ডুলিপিতে "ভীম" শব্দাংশটি কাটিয়া দেওয়া আছে। — স

উষাহরণ কাব্য

(অসম্পূর্ণ)

[উষাহরণ কাব্যের পৌরাণিক কাহিনী: দৈত্যরাজ বাণ শিবের উপাসক ছিলেন। উপাসনার দ্বারা তিনি শিবকে তুষ্ট করেন। শিব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে বাণের বিপৎকালে তিনি বাণকে রক্ষা করবেন।

বাণের কন্যা উষা কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সহচরীর সাহায্যে অনিরুদ্ধকে দৈত্যপুরে নিয়ে আসেন এবং গোপনে গন্ধর্বমতে তাঁকে বিবাহ করেন। বাণরাজা এই বিবাহের কথা শুনে অনিরুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং যুদ্ধে অনিরুদ্ধকে দারুণভাবে পরাস্ত ও বন্দী করেন।

অনিরুদ্ধের মুক্তির জন্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে বাণ সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হলে তিনি কৃষ্ণের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর কৃষ্ণের দয়ায় মহাকাল নামে বিখ্যাত হয়ে শিবের অনুচরবর্গের মধ্যে গণ্য হন। — স]

প্রথম কাণ্ড

কোকিল নাম প্রথম সর্গ

গাও পুনঃ হে কোকিল যে গান গাহিয়া
আসীন পুষ্পিত বৃক্ষে পাখি-রূপে বিধি
ত্রিদিবে বিরোধ-দাহ, মহাযুদ্ধ মর্ত্ত্যে
ঘটাইলে কুহরিয়া ফুলের আড়ালে
করিল যে বেলা স্নান দৈত্যবালা উষা
কুসুম-শয়ন ত্যজি দিব্য বাণপুরে।
উঠিয়া অনূঢ়া বালা হেরিল বাহিরে
প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত কোকনদ সরে,
হেরিল অরুণ শোভা, খেলিছে বিটপী
তরুলীলা, দেখাইছে লুক্কাইছে হাসি'
সূর্য্যের তরুণ আলো। সমীরণ ধীরি
গুঞ্জরিছে পুষ্পদলে শিশির লভিয়া,
মধু কুহরিছে পিক। মধুময় স্বরে
কুহরিলে, দৈত্যবালা, সখীগণে ডাকি।

"উঠ, চারুনেত্রা, প্রিয় সখি, ওই হের
সুন্দর পৃথিবী উঠি নাহিছে শিশিরে।
নীরস পূর্ব্বাহ্ন নিদ্রা। আয় ইচ্ছা করে
যাই নাহি দ্রুত জলে যেথা শৈবলিনী
অযুত-তরঙ্গ-স্বরা
তীর-ফুল-দল বহি নির্ম্মল সলিলে
ছুটে চারু উপবন চুম্বনে শীতলি।"
শুনিয়া সে প্রিয় বাণী নাগরাজবালা
যেন কোকিলের কুহু সুদূর নিকুঞ্জে
আইল অলসগতি। এখনো রহিল
বিশাল নয়নে নিদ্রা যেন পুষ্পে রেণু
কুমারী রুচিরাননা চারুনেত্রা চারু
নাগরাজকন্যা। তারে প্রথম বয়সে
ঊর্দ্ধদুর্গ নাগপুর ভস্মসাৎ করি
যেন জয়ধ্বজা রথে বাণ মহাবাহু
আনিল সদর্পে। পূর্ণ যৌবনে রূপসী
উষার চরণ সেবে দাসী নাগবালা।
বিংশতি কুমারী আসে উষার স্বজনী,
ভগিনী আইল সঙ্গে চন্দ্রলেখা চারু,
মন্দগতি, রাজকন্যা কিন্তু দাসীগর্ব্বে।
ছিল নদীকূলে বন, রচেছে শ্রমিয়া
বিখ্যাত দানব শিল্পী পাণ্ডবের সভা
যার খ্যাতি ইন্দ্রপ্রস্থে।

*

"দারুণ যদিও দুঃখ এস মাতা সহি।
সহিল শঙ্কর দক্ষনন্দিনী বিহনে
প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে ক্ষিপ্ত-মনে বহি।"
কিন্তু রতি পুষ্পমাতা রহিল অভাগী
নীরব নিরশ্রু দীন ভস্ম ধরি কোলে।
আইল মধুর বাণী ছিন্ন বীণা করে।

"এস দীপ্তিময় ভবে, ফিরে এস রতি।
শুষ্ক পদ্ম, মৃত পাখি তোমার বিহনে,
মানব-হৃদয় মরে। প্রাণ কাঁদে, বাছা,
তমঃ-পূর্ণ দ্বেষগীতি দিনরাত শুনি,
মাধুরী-রহিত ভাষা, কামের অসহ্য
ছন্দ। অবিচারে দুঃখ দিয়াছে বিধাতা,
সহি এস, মহাদেবী, বিশ্বহিত ভাব।
নিজদুঃখ বিশ্বসুখে পরিণত করে
কবিগণ, মানব যাহারা। সমুজ্জ্বল
কবিতা বিস্ময়ে হেরি ধন্য বলে লোকে।
জানে না অবোধ প্রজা হৃদয়ের রক্তে
উজ্জ্বল কবিতা। যার নিঃস্বার্থ আয়াসে
বিশ্ব-সুখ-আশা বৃদ্ধি, দুঃখই মহিমা
সে জনের, বাছা। এস, পুষ্পমাতা, এস,
কাব্যপ্রাণ জাগাইয়া নির্ব্বাপ দুঃখাগ্নি।"
কিন্তু রতি পুষ্পমাতা রহিল অভাগী
নীরব নিরশ্রু দীন ভস্ম ধরি কোলে।
আইল নারদমুনি জগতের স্নেহী।
"এস আলোময় ভবে, ফিরে এস, রতি।
শুষ্ক নদী, শুষ্ক তরু। নিরানন্দ এবে
পত্রময় কুহরিত আশ্রম, শীতল
তরুচ্ছায়া, মঞ্জু-সলিলা আশ্রম-নদী।
দিশাহারা ঋষিগণ মরুভূমি ভবে।
অসহ্য বিরহ-জ্বালা এস মাতা সহি।
মহামতি ঋষিগণ তব সুখ-আশে
নব প্রাণ দিবে সৃজি নূতন কন্দর্পে।"
কিন্তু রতি পুষ্পমাতা রহিল অভাগী
নীরব নিরশ্রু দীন ভস্ম ধরি কোলে।
চাহিল বৈকুণ্ঠবাসী ধরাপানে বিষ্ণু।
মুমূর্ষু সুন্দর ধরা টলিছিল শূন্যে

উচ্চরব চারিধারে, যেন ধূম্র ব্যাপি
তমঃ ঘনীভূত ভবে। ভীমছায়া রূপী
মহাতনু প্রকাশিয়া উঠিছে কৃতান্ত
বাড়ি' ভীত খমণ্ডলে নীরব ভীষণ
নামিল অনাদি বিষ্ণু হিমস্তব্ধ দেশে।
ঘোষিল অনন্ত শূন্য দেবের স্মরণে,
হিমাচল পদস্পর্শ টলিল নির্ঘোষি।
যোগমগ্ন ব্যোমকেশে সম্বোধিল হরি।
"শিব একচারী যোগী, নির্জ্জন পর্ব্বতে
আসীন নিঃশ্বাসে সৃজ, নিঃশ্বাসে সংহর
অগণন বিশ্ব ধ্যানে, সৃষ্টিধ্বংসকারী।
মুহূর্ত্তের প্রাণীহিত ভাব না মহত্ত্বে
অন্ধ। হের, মহাদেব, নয়ন উন্মীলি!
যমাধীন প্রাণী যেথা বধিলে মদনে
জগতের মধুপ্রাণ। হবে অবিলম্বে
নিশ্চল এ ব্রহ্মরথ সারথি-বিহনে।
তার তব সৃষ্টি, শম্ভু, বাঁচাও মন্মথে।
নাশে পুনর্জ্জন্ম[১] এই অচল নিয়মে
রহে পুরাতন[২] সৃষ্টি চিরকাল নব
অনন্ত-যৌবনধারী। স্থিরতা নিয়মে।
অস্থির প্রপঞ্চ মধ্যে বিনা লক্ষ্যে ভ্রমি
নিয়ম ধরি ক্ষুদ্র প্রাণীজাতি।"
শিব একচারী যোগী উত্তর করিল।
"জানি আমি, দয়াসিন্ধু, অচল নিয়মে
অনন্ত যৌবনে নব পুরাতন সৃষ্টি।
জানি আমি বদ্ধমূল নশ্বর মানবে
অনন্ত পরব্রহ্মের এ মহতী লীলা।
কামবন্ধ পৃথিবীর মধুলুব্ধ নরে

[১] পাঠান্তর: পুনঃস্থিতি
[২] পাঠান্তর: বিশ্ব

কামে কাম জিনি লভে নিষ্কামতা শেষে।
জানি মধুপ্রাণ এই বিশ্বের কন্দর্প।
নিজদোষে, নারায়ণ, মজিল ফুলেষু
অসময়ে তীর হানি অনুচিত লক্ষ্যে।
তথাপি বাঁচিবে পুনঃ। অসুর, রাক্ষস
নিষ্ঠুর অশাম্য ক্রোধ দীর্ঘকাল পুষে
প্রাণে। বৈর-নির্যাতনে, শত্রু-পরিতাপে
সীমা আর্য্য-অমর্ষের। ক্ষমিনু মদনে,
বিষ্ণু। অবতরি তুমি যশস্বী দ্বাপরে
জন্মাইও লক্ষ্মীগর্ব্ভে আবার ফুলেশে।
ততদিন মুক্ত ভ্রমি অদৃশ্য অনঙ্গ
বিস্তারিবে পুনঃ জগে মধুর মিলন,
বিবাহের মধুকৃতি পুনঃ মর্ত্ত্যধামে।"
কহিল মহাত্মা। বিশ্বে কাঁপাইল উক্তি।
গেল দয়াসিন্ধু জিষ্ণু অনাদি তিমিরে,
কুপিত বসন্ত মাতা ধূলায় আসীনা
যেথা একাকিনী মৌনী অন্ধকার দেশে।
কুন্তলে বুলায়ে হাত উঠাইল বিষ্ণু।
মুক্ত হল অশ্রুরোধ স্পর্শে, কণ্ঠ মুক্ত
করুণ। কাঁদিল রতি পিতার চরণে।
"কেন আসিয়াছ, তাত। বৃথা কি আইলে
সেথা নিতে পুনঃ মোরে, অভাগী অপ্রিয়া
আলোময় ঘৃণ্য ভবে। যাব না এ জন্মে।
মরিছে কি বিশ্বতাপে দেবেরা। মরুক,
কৃতঘ্ন নির্দ্দয় তারা, স্বদোষে, ভুলিয়া
কি উচিত দেবতার। যাইব না কভু
উদ্ধার করিতে। আমারেও কি করিল
উদ্ধার উহারা? যাব কি প্রবোধে? কোথা
শুভকর্ম্ম-প্রতিফল, কোথা ন্যায্য রীতি।
কোথা এবে দৃঢ় বিধি অজেয় অচল?

অবিচার অসম্বাধে সেথায় বিরাজে।
যমাধীন প্রাণী যথা বধিল প্রাণেশে
শিব ধ্বংসকারী। দেব-মন তুষিবারে
মরিল করুণ রূপে। করে না তাহারা
উদ্ধার, হেরে না ফিরে একবার চাহি।
নিজ প্রাণ লয়ে গেল কাপুরুষ যত
করুণ শরীর ফেলি। অকালে মরিল
একাকী অবিলাপিত দূর হায়! হিমে।
আমিও পুরাণ দেবী, কন্যা তব, পিতা,
তথাপি বিধবা।” এই অর্থে পুষ্পমাতা
বিলাপিল মুক্তকণ্ঠে পাদযুগ ধরি।
নারায়ণ দয়াসিন্ধু উত্তর করিল।
“বাছা, অকারণে কষ্ট দিয়াছে বিধাতা।
তুমি সুখপ্রাণা দেবী, দুঃখ দেয় তোরে
কৃতঘ্ন জগৎ। লেগেছে কোমল প্রাণে
কঠিন আঘাত, দেবী। কুপিত বসিলি
জগৎ ঘৃণিয়া দুঃখে, কে নিন্দিবে তোরে।
বৎস, শ্রেষ্ঠ তবে ক্ষমা, দেবচিহ্ন ক্ষমা।
ক্ষমা-কান্তি নয়নে দেখায় বলবান
দেবসম মর্ত্ত্যে ক্ষমি উদ্ধত দুর্ব্বলে।
অভিমানী মন দম, বসন্তের মাতা
দ্বিগুণে মধুর সুখ গত দুঃখ স্মরি,
সে সুখের আশে প্রাণ জুড়াও। হইবে
কন্দর্প-মিলন পুনঃ প্রত্যক্ষ কন্দর্পে।
এস দীপ্তিময় ভবে, ফিরে এস, রতি।
বসন্তে জাগাও পুনঃ নির্ব্বসন্ত জগে।”
ফিরিল জননী ভবে। সফল হইল
যুগসম্পূরণে উক্তি পরযুগ-শেষে
জন্মিল রুক্মিণী গর্ব্ভে সাক্ষাৎ মদন
কৃষ্ণের ঔরসে যোদ্ধা প্রদ্যুম্ন। জন্মিল

অনিরুদ্ধ রতিগর্ব্বে বালক সুধন্বী
মধুর মিলন-সুখে কৃষ্ণপৌত্র যোদ্ধা।

এই অর্থে ভগিনীর সুচারু চরণে
সুপ্তা, মধুময় ধ্যানে সমুজ্জ্বল আঁখি
উর্ব্বশী গাইল। তার হৃদয় জুড়িল।
ভাসাল ভাবের পুরে পুরাণ কাহিনী।
কৃষ্ণ-কেশভার-সেবা করপদ্ম ভুলি
নিষ্কর্ম্মা রহিল ভূমে। হেনকালে অগ্নি
স্বর্গ লিপি-বহ আসে সুগন্ধ প্রসারি।
উঠিল সত্বরে দেবী ক্ষুব্ধা। কেশজাল
বন্ধচ্যুত পড়ে কাঁধে, শিথিল বসন
শুভ্র-কুচযুগে যেন অঙ্গুলি জ্যোৎস্নার
বহুল চম্পকে। সন্তান হঠাৎ যদি ডাকে
স্থান কি আত্ম-চিন্তার জননীর প্রাণে।
"আয় নামি মোরা দৈত্যনগরে, সহজা।
শৈলবালা, প্রিয় হাতের অক্ষর চিনি,
ডাকিতেছে মোরে। প্রাণ অস্থির শঙ্কায়
কি দুঃখে কি ভয়ে মোরে ডাকিল নন্দিনী।
উদ্ধত দৈত্যেরা সদা স্বেচ্ছাপ্রিয় গর্ব্বে,
অত্যাচারী দৈত্যরাজা বাণ মহাবাহু।"
নামিল আকাশ-পথে দেবীদ্বয়। নভে
জ্বলিল রাতুল আভা বিদ্যুৎ-আকৃতি,
অপ্সরার চারু-অঙ্গ ভাসিল অম্বরে।
নবফুল ফুটাইল রাঙা-পদ-স্পর্শে
উল্লাসে ধরণী। রম্য শোণিত-নগরে
অকস্মাৎ আলোকিত সে আঁধার কক্ষ
অপার্থিব রূপে। নিল নন্দিনীরে কোলে
চিত্রলেখা। দিব্য হাসি অমর বদনে
পয়োধরে ফুলগাল চাপিল জননী।

মাতার পবিত্র স্তনে দুগ্ধধারা বহি
তিতিল কপোল। সুরভি কুন্তল চুম্বি
কহিল সমুদ্রকন্যা। “কেন, শৈলবালা,
ডাকিলি আমায়। সুখে তনয়া আমার
প্রতিদিন দেখি দিব্য চক্ষু খুলে। আজি
হঠাৎ কি দুঃখ তোর, কি অভাব প্রাণে,
শৈলবালা? কি ন্যূনতা জননীর স্নেহে
রৈল যে অপূর্ণ আশা কন্যার হৃদয়ে।”
মাতৃকণ্ঠ বাঁধি বালা শ্বেতভুজ-পাশে
মনোহর শির তুলি মাতৃ-স্তন হতে
কহিল সুস্মিতা। “সেই অতীতের কথা
বলি আজি। বস খাটে। বাল্যকালে, মাতঃ,
শুইনু যেমতি কোলে, আজিও শুইব।
‘চাই পারিজাত-পুষ্প, স্বর্গের সলিল
স্নানে, দেহ মোরে, মাতা, জীবন্ত পুত্তলী,’
এইরূপে পীড়ি তোমা শতবার দিনে
চাইনু অদেয় যত। আজিও চাহিব।
বস হেথা। নাহি দিলে দেখিব প্রভাব,
অপ্সরার গর্ব্ব। বিনা লাভে ঈপ্সিতের
দিব না উঠিতে তোরে। তুমিও হেথায়
বসিও, উর্ব্বশী মাতঃ, সোনার পালঙ্কে।”
কহিল সস্নেহে দেবী, “জান, কুহকিনী,
তব আজ্ঞাবহ দাসী মাতা। এক আশা
অপূর্ণ রইলে প্রাণপুত্তলী-হৃদয়ে
নিষিদ্ধ অমরা-ভূমি মাতৃচরণের,
লুপ্ত পারিজাত মালা অভিশপ্ত শিরে।”
    আরম্ভিল শৈলবালা। “বাল্যকালে আমি
তব স্বর্গসম ক্রোড়ে আশ্রিতা পাইনু
চিত্রসিদ্ধি। সহজে পাইনু, শিশু যথা
মাতৃদুগ্ধ স্তনে। আসে আপনি প্রতিভা,

শিশুর নয়ন খুলে, শিশুর অঙ্গুলি
ধরি যত দৃশ্য জগে আঁকায় মোহিনী।
স্বয়ং অল্পই পারে বহুল আয়াসী
মানব, নিস্তেজ গুণ বদ্ধ অন্নকোশে।
বিমুক্ত দেবের স্পর্শে কি না পারে প্রাণী।
অধীন হইল মোর যত রম্য মূর্ত্তি
মাধুরী রচিয়া ব্রহ্মা সৃজিলা সুক্ষণে।
স্মরিলে অঙ্গুলিপথে দাঁড়াত আসিয়া
পূর্ণমূর্ত্ত চিত্রপটে। স্বচ্ছতোয়া নদী,
হংসমালা নাচি স্রোতে, বহিত সম্মুখে।
ক্ষণপ্রভা মেঘকোলে হাসিত সহসা
মোর ক্ষুদ্র গৃহে। মহীয়সী গিরিমালা
দাঁড়াত কল্পনা দ্বারে, নীরব তপস্বী
আসি যেন আশ্রমের দ্বারে — উচ্চশির,
হিমশুক্ল জটাজুট পলিত মস্তকে।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি মন সদা মানবের। উচ্চে
উঠিলে অতৃপ্ত যদিন না উচ্চতমে
আরোহণ। কোলে তব কাঁদিনু পড়িয়া।
'অতৃপ্ত হৃদয়, মাতা, তৃষ্ণাতুর নিতি
পিঞ্জরে যেমতি পাখি বাহিরে হেরিয়া
স্বাধীন সঙ্গীরা ভ্রমে সূর্য্যের আলোকে
কাঁদে ইতস্ততঃ উড়ি। জুড়াও এখনি
প্রাণ মম, মাতা।' সস্নেহে তুলিয়া মোরে
কহিলে ঈষৎ হাসি'। 'চারু শৈলবালা,
চিত্রলেখা নামে ডাকে অবতার ভাবি
লোকে, প্রসারিছে কীর্ত্তি। নহে পরিতৃপ্ত
মানব-হৃদয় তব বুকে। জানি মন,
শৈলবালা। অসীম সিন্ধুর ওই পারে
ছুটি মানবের মন আগুসরে সদা।
পৃথিবীর সীমা ত্যজি অনন্তে উজ্জ্বলি

তারা সম ভ্রমে দিগ্‌মণ্ডল মাপিয়া
উড়ি মহাবল পক্ষে। শেষে বাহিরায়
মূর্ত্ত জগতের ধারে যেথা থামে দৃষ্টি,
যেথা ভীম অন্ধকার বিঁধিয়া বিঁধিয়া
মূর্চ্ছিত মনের চক্ষু অধেয় তিমিরে।
পৃথিবীর অন্ধকার সেথা হয় দীপ্তি, —
পারহীন লক্ষ্যহীন তলহীন সিন্ধু।
তবে নহে ভীত নর। নিজ তেজে জ্বলি
চলিল অজেয় আত্মা অসীম আঁধারে।
স্বর্গ সার-বিদ্যা-দীক্ষা নিষিদ্ধ মানবে,
বাছা। নহে নিষিদ্ধ সাহস নর-প্রাণে।
সিন্ধু-স্বর্গ-ভূমি আছে অগম্য সমুদ্রে,
অদ্ভুত দেবতা নিত্য সে দারুণ স্থলে
নিবাসী মুদিত সদা। মাথার উপর
ঘোষে অবিশ্রান্ত নাদে ধাবমান সিন্ধু,
কোটি তরঙ্গের ভারে চেপেছে জলধি।
সেথা ক্রুদ্ধ মহোর্ম্মির ভীম কোলাহলে
হরষি নিবাসে একা ভীষণ সমুদ্রে।
উগ্রচণ্ডা জলদেবী সিন্ধুতলে* ধরি
কুবের ঐশ্বর্য্য দর্পে গহ্বরে রমিয়া
সেই ভয়ঙ্কর গর্ব্ভে সন্তান কিন্নরে
জন্মাইল পুরাতন যুগে মহাবলী।
ছিল না তখন মাতা শ্যামলা পৃথিবী,
ছিল না নীলিমা নভে। ধাবিত চৌদিকে
অসীম জলধি ঘোষি নিরাকার শূন্যে।
সপ্তসিন্ধু সপ্তদ্বীপে ত্রিদিবে পাতালে
না আছে যাহা না জানে কিন্নর শলভী।
কিন্তু শতবিদ্যা মধ্যে ভালবাসে একা

* পাঠান্তর: মহাবলে

চিত্রবিদ্যা। জগতের যত রম্য মূর্ত্তি
নিসর্গ-মাধুরী জিনি মনের মাধুর্য্যে
কল্পনা আরোপি সত্যে প্রতিভা-ক্রীড়ায়
রঞ্জে। তার বর বিনা নাই চিত্রে সিদ্ধি,
তার বরলাভে হয় মর্ত্ত্য ইন্দ্রপুরী।
উগ্র অনারাধ্য কিন্তু লুক্কায় সে ভূমি,
উচ্ছলে অগম্য নাদে ভয়ঙ্কর সিন্ধু
শত-ফেনা তুলি নভে। গগন সমুদ্রে
ভয়পূর্ণ সেই পথ অস্পৃশ্য দুর্ব্বল
মানব চরণে। স্থলে ধরিয়া, নন্দিনী,
অমরের হস্তসিদ্ধি চাহিবে আলেখ্যে,
ভুলিবে না শত স্তুতি — না অন্য দানে
মুক্তি-মূল্য তার। যখন মধ্যাহ্নে
নীলিমায় মিলাইয়া অবিরাম ঊর্ম্মি
বায়ুহীন নিদ্রা লভে বিশাল সাগরে,
সুন্দর উজ্জ্বল দেবত্বদর্পে উঠিয়া
অতল সমুদ্র হতে আসীন একাকী
মহাসিন্ধু পানে চাহে সুরম্য সিংহলে।
প্রস্তরে তরঙ্গলীলা চড়ে পড়ে, ডাকি
উঠিছে, পড়িবে ডাকি। সুগম্ভীর নাদে
মহৎ সমুদ্র বহে, — দেবতার গতি,
পদধ্বনি ঘোষাইয়া শিলাতে শিলাতে।
সেথা বসি চিত্র রঞ্জে, অন্তে মহাবেগী
সৌন্দর্য্য ছড়ায়ে ডোবে অতল সলিলে।
গাঁথিয়া মৃণাল-রজ্জু গঙ্গাতেজ পূরি —
নাই অন্য সূত্রজালে বাঁধিবার শক্তি
বলবান দেবে — সিন্ধুশিলা-অন্তরালে,
মৃগয়ার যথা রীতি উত্তর পর্ব্বতে
সিন্ধুসিংহ-পথ যবে বসেছে রুধিয়া
শূলধর হিমানীর দেশে; উচ্ছ্বসিয়া

মহারোলে উঠে সিংহ, হঠাৎ সবেগে
শূল ফেলি বিঁধে তারে — লুকাও আড়ালে
পাশপাণি। উঠি যবে কিন্নর শলভী
জলধি ত্যজিয়া দীপ্ত জল-ফোয়ারা যেমতি
শৈলে, পাশ অস্ত্র ফেল, জটিল বন্ধন
স্পৃহনীয় প্রতি-অঙ্গে পাকাও, নন্দিনী,
অভিভূত গঙ্গাতেজে দিবে মহামতি
সর্ব্বস্ব বিদ্যার। দিব্য বলাইয়া শেষে
ছাড়। সাবধান, বালা, বাক্যচ্ছলে ভুলি
বিপদে যেন না পড় কিন্নরের বশে।
দাসী তার রবে হৃতা অতল সমুদ্রে।
অশেষ শঠতা জানে কিন্নর শলভী।' ''
ঘিরিল মহতী আশা হৃদয় উথলি
এ কথায়। মন্ত্রগীতি শুনিনু অম্বরে।
আপনি না বুঝিলাম মধুর গুঞ্জরি
কেন সুখস্বপ্নসম আসিয়াই যায়
অস্পষ্ট কল্পনা ভাসি প্রাণের তিমিরে।
স্বর্গের দুকূলে দেহ আচ্ছাদিয়া মোরে
সনাতন গঙ্গাতীরে আনিলে, জননী।
গাঁথিনু মৃণাল-তন্তু মন্ত্রবল পূরি
মাতৃ-শিষ্যা তীরে। সূক্ষ্ম অতিশয় রজ্জু,
দেবের অদৃশ্য যার অমর নয়নে
ভেদ্য তলহীন সিন্ধু যেন ক্ষুদ্র নদী।
শৈলে এ কৌশল পাতি সমুদ্রের তীরে
আড়ালে লুকায়ে দেহ রহিনু বসিয়া
শিহরি আশায় ভয়ে। যে বেলা পড়িল
অনন্ত সাগরে শ্রান্ত অবিরাম ঊর্ম্মি,
উজ্জ্বল সহসা জল-ফোয়ারা যেমতি
নিদ্রিত জলধি ত্যজি কিন্নর উঠিল
প্রকাশি সৌন্দর্য্যরশ্মি যেন তারা নভে

খসিয়া আলোকটানে আকাশ উজ্জ্বলি।
সৌন্দর্য্য হেরিয়া প্রীতি উথলিল মনে।
প্রজাপতি গ্রীষ্মে অগণন-বর্ণ-কান্তি
উড়ন্ত কুসুম যথা ধাঁধায় নয়ন
বালক আকৃষ্ট লোভে ধরিতে তাহারে
যায় ধেয়ে সেই ভাবে ধাইল হৃদয়
সে কান্তির পানে। লোভ দমিলাম লোভে।
বসেছে কিন্নর সিন্ধুশিলায়। বিলীন
দৃশ্যে সে মহৎ বুদ্ধি, জলধির নাদে
বিলীন। হেরিনু তার বিশাল দীপিত
অপার্থিব আঁখি অসহনীয় মাধুর্য্যে
পূর্ণ। শিহরিনু ভয়ে, শিহরিনু প্রেমে।
হৃদয়ে ভরিল আসি সাহস দেবতা।
হঠাৎ আনন্দে হাসি কৌশল-গর্ব্বিণী
মন্ত্রপূর্ণ গঙ্গাতেজে মহাজাল-রাশি
ফেলিয়া সুচারু অঙ্গে হর্ষে প্রেমে মাতি
পাকাইনু বারবার। ভীত, হাসি' ক্রোধে
টানিল দুর্দ্দম্য হস্তে উদ্ধার-উদ্যোগী
যক্ষ। জোরে যদি টানে বলীয়ান বৃথা,
আরও জড়ানু ভয়ে অলংঘ্য বন্ধনে।
অবশেষে মধুহাসী কিন্নর পরাস্ত
কহিল, "কে তুই ধন্য, মহামতি বালা,
কোথা হতে বা যশস্বী সাহস শিখিলি
অবলা রমণী হয়ে? কোন জন্মভূমি
গর্ব্বিতা বীর্য্যপীড়িতা প্রসবি সুক্ষণে
এই রূপ জন্মাইল, এ উদার বুদ্ধি।
উচ্চলোভী তব মন জানি, আর্য্যবালা।
অদেয় স্বর্গের বিদ্যা, তবে দিনু তোরে।
পালায় সর্ব্ব নিষেধ সাহস-দর্শনে।
শূরত্ব শেখর। যায় স্বর্গে সেই পথে।

সাহসে লভয়ে ভক্ত বাঞ্ছিত চরণ,
সাহসে নির্ব্বাণ জ্ঞানী। বিক্রয়-নিয়মে
চিত্রবিদ্যা দিব তোরে, পণ্য যেইরূপ
তত মূল্যে। তুমি মূল্য, স্পৃহণীয় বালা।
এই সুললিত শির, যৌবনের মদ্যে
ভরা দুই পয়োধর, এই শুভ্র দেহ
যেন বহ্নি বস্ত্রে, এই রাতুল চরণ
চাহি, শৈলবালে। ওহে পূর্ণ কর বাঞ্ছা
মহাসুখ লয়ে তোরে ভুঞ্জি, স্পৃহণীয়া
ললিতা রূপসী বালা, ভুঞ্জি লয়ে তোরে
প্রেমস্বর্গভোগ কোলে প্রেমধন-পতি।
দে তুই দুর্লভ প্রেম, চিত্রবিদ্যা দিব।”
গঙ্গাতেজে অতিশয় যাতনা ভুগিল
কিন্নর, ছাড়ে না তবে শাঠ্য শঠহৃদি।
বাক্যচ্ছলে ভুলি, অন্ধ কামনায় সাধে
অবোধ! খুলিনু রজ্জু আদেশ বিস্মরি।
তৎক্ষণাৎ ধরে উঠি অনিবার্য্য ভুজে
হর্ষে মোরে সিন্ধুবাসী কিন্নর হরিল
অতল সমুদ্রে ডুবি। কম্পমান অঙ্গে...

দ্বিতীয় কাণ্ড

সভানাম অষ্টম সর্গ

কৃষ্ণের উচ্চভবন প্রমোদ উদ্যানে
যেন পূর্ব্বদিক মুখে শ্বেতমেঘরাজী,
ছাইয়া সুনীল নভঃ ভাতে সূর্য্যকরে।
চারিদিকে বৃক্ষ উচ্চ সৌধ চারিদিকে
মহাকায় পুত্রগণ সেই উচ্চ সৌধে,
নিবাসে উল্লাসী পার্শ্বে পিতার, নিবাসে

প্রবল জামাতৃবৃন্দ সদনে সদনে,
অতিরথী ভ্রাতাগণ, আনকদুন্দুভি
পিতা চারিধারে মাধবের। মধ্যভাগে
উন্নত কৃষ্ণভবন। সেথায় প্রবেশি
হেরিল বালক রথী কর্ম্মান্তে মিলিত
মাধবের ভার্য্যাগণ চারুবধূবর্গে
আমোদ করিছে বসি। মাঝারে কথক
প্রাচীন যুদ্ধকাহিনী গাইতেছে সুরে
দ্রুত বাজাইছে বীণা যাদব যুবতী।
ভ্রমি তারে গৌরকর-রাতুল অঙ্গুলি
গোলাপী বিদ্যুৎ যেন ত্বরিত ঝলসি
গোলাপী বিদ্যুৎ যেন যূথীদল মেঘে।
ঝলসিছে দ্বারদেশে বর্ম্মদ্যুতি, অসি
ঝনঝনে পদক্ষেপে। থামিল কথক।
পিতামহী-পাদযুগে প্রণমিল বলী।
"যাব দূরদেশে, পিতামহী, এ আদেশ
করেছে জননী। দাও আশীর্ব্বাদ, শিরে
দাও পূজ্য কর, অম্ব, সাধি বীরকর্ম্ম
আসিব যাদবপুরী — যশস্বী স্যন্দনে।"
সবিস্ময়ে দেবীরা চাহিল পরস্পরে
অবরোধে। সত্যভামা প্রথম কুপিতা
তেজস্বিনী বীরকন্যা আরম্ভিল উক্তি
"অন্ধকার করি বধূ কৃষ্ণের ভবন
কেন পাঠাইবে তোরে। কোন্ দূরদেশে
যাইবি। গৃহের আলো, অনিরুদ্ধ, তুই।
আমারে না বলি কোথা পাঠাইল রতি
কিবা কার্য্যে দূরদেশে। সম্মতি কি লয়ে
কৃষ্ণের পাঠাল তবে, মত কি পিতার।
ধর্ম্মজ্ঞানহীনা বধূ আনিলে রুক্মিণী
গৃহে।" অনিরুদ্ধ তারে উত্তর করিল।

"মাতার পবিত্র আজ্ঞা। পুত্র কি জিজ্ঞাসে
কেন পাঠাইবি মোরে, পাঠাইবি কোথা।
পিত্রালয়ে বাল্যবন্ধু শক্তিধর কেহ
পর্ব্বতে পুরাণ স্নেহী আইল নগরে।
সহায় যাইব তার। কোন্ দূরদেশে
কি বা কার্য্যে নাহি জানি। তবে এই জানি
মহৎ সে কার্য্য, অম্ব। আর কি জিজ্ঞাসে
ক্ষত্রিয়।" বিস্মিতা পুনঃ কহিল উঠিয়া
সত্যভামা। "পিত্রালয় তব জননীর
কে শুনেছে কভু পূর্ব্বে। আজই শুনিনু।
কোন্ গূঢ় অর্থ তবে প্রলাপে ঢাকিয়া
সাধাইব বলি নারীসুলভ পৈশুন্যে
আশ্রয় লইল বধূ।" ভীষ্মসূতা তারে
মৃদুলভাষিণী বামা উত্তর করিল।
"অসম্ভব, সত্যভামা, জ্ঞানহীন কার্য্যে
প্রবৃত্তি বধূর। ক্ষত্রধর্ম্ম-চতুষ্কোণে
আচরে সুন্দরী মম প্রজ্ঞায় অতুলা
অতিক্রমি নরে। হিতমন্ত্রী প্রাণেশের
আলো যেন পথে নিত্য পতিপ্রাণা নারী।
জিজ্ঞাসে স্বয়ং কৃষ্ণ সুমহৎ কর্ম্মে।
আমরা স্নেহের বশে প্রিয় অনিরুদ্ধে
ছাড়িতে না চাহি। কিন্তু জননী যখন
দেয় নিজ পুত্রে, গভীর সে মাতৃপ্রাণে
রুধিয়া বাৎসল্যধারা সৌন্দর্য্যের ডালি
নিধান স্নেহের ফেলে, সর্ব্বস্ব-আহুতি,
দেবযজ্ঞ যুদ্ধানলে, কে তবে, ভগিনী,
লালিয়া সামান্য স্নেহে নিষেধ করিবে
অবিবেকী। যাও তবে, অনিরুদ্ধ যোদ্ধা,
উরুযশঃ এস লভি সুদূর বিদেশে।
আশীর্ব্বাদ দিনু ভ্রষ্ট হবে না কখন

অনিরুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ঋজুপথ হতে।
তার পরে জীবন বা মরণ, বিধাতা
যা লিখেছে ভালে। সাধে না তারে রুক্মিণী
ভীষ্মসূতা কৃষ্ণপত্নী অনুগ্রহ আশে।
মরণ সমরে যদি, ক্ষত্রিয়-বাঞ্ছিত
পরিণাম। গর্ব্বরুদ্ধ-অশ্রুজল নেত্রে
চারু এই দেহ, বাছা, অর্পিব অনলে।
ভিজাব হর্ষসলিলে অক্ষত লভিয়া।
তেজস্বী ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আচর বিদেশে
অনিরুদ্ধ। হবি না পশ্চাৎপদ যুদ্ধে।
এক পদ যদি তোরে হঠায় অরাতি,
দশ পদ আগুসর, নিশ্চিত মরণ,
আজ যদি বাঁচ, কাল মরিবে আবার,
সহস্র মরণতুল্য উরু অপকীর্ত্তি।
সহিবে না অপমান, অনিরুদ্ধ, কভু।
সহ্য করে অপমান ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক, —
ইন্দ্রিয়-দমন ধর্ম্ম — ক্ষত্রিয় না সহে।
ঘুচায় কলঙ্ক রক্তে। ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী
হও সদা। লভে উচ্চ প্রতিষ্ঠা মানব
ধর্ম্মে। অল্পদিন লভি অন্যায় সমরে
রাজ্য বা বৈভব হেথা কাপুরুষ দম্ভী
জঘন্য উল্লসে, সেথা চিরায়ু নরক
গ্রাসে তারে। আর্য্যবীর একেশ্বর যুঝি
পরাক্রান্ত বহুশত্রু বিমুখে সমরে।
আর্য্যবীর তুমি, বৎস, মাধবের কুলে।
দুর্ব্বলের অশ্রুজল মুছাবি সতত*
বধি অত্যাচারী নরে, যাদব কেশরী।
দুর্ব্বলের অশ্রুজলে সিক্ত হলে ভূমি
ক্ষত্রিয়ের পুণ্যরাশি ঘুচায় সে নীরে।

* পাঠান্তর: সর্ব্বদা

কভু না করিবি ব্যর্থ ব্রাহ্মণের আশা,
বৎস। শ্রেষ্ঠ সেই জাতি, পূত স্বার্থত্যাগে।
ধর্ম্ম যে আচরে শুদ্ধ শান্ত ব্রহ্মজ্ঞানী,
পূজ্য সে ব্রাহ্মণ তব, আপন জীবনে
রক্ষণীয়। মূর্খ নহে ব্রাহ্মণ কদাপি।
গর্ব্বিত পরোপকারী — বৃথা তার জাতি।
লুণ্ঠিবি না বৈশ্য ধন — অনস্ত্রী বণিক
ধনজীবী। যে বৈশ্যজ দরিদ্রে না পীড়ি
উপার্জ্জে সম্পদ সদা ত্যজিতে পরার্থে,
মহাজন বটে সেই অস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের
রক্ষণীয়। ব্যথিবি না শূদ্রের হৃদয়
অপমানে গর্ব্ব বাক্যে। যে শূদ্র বিনয়ী
সুমনা, ব্রাহ্মণ যথা পালনীয়, ধন্বী।
পিতাসম দয়াবান পালিবি সবারে।
মৃদুভাষী হয়ে প্রিয় কথায় চেষ্টিবি
বলিতে অপ্রিয় অর্থ। ব্যথিস না হৃদি
ভ্রাতার। আত্মীয় মোরা এ বিশাল ভবে
দেবতা মানব পশু একীভূত ব্রহ্মে।
ক্রোধে না জ্বলিবি কভু, রূক্ষ কথা মুখে
না আনিবি। পশু গর্জ্জে পদে পদে রুষি,
সংযম মানব চিহ্ন দিয়াছেন বিধি।
অনৃত না বলিবি লোভে বা ভয়ে কভু,
কেশরী আর্য্যসন্তান। পরভয়ে কাঁপি
কাপুরুষ মিথ্যা কহে, মিথ্যা কহে লোভে
ম্লেচ্ছ। সত্যবাদী আর্য্য সম্পদে বিপদে।
সিংহসম রণক্ষেত্রে হইবি উদার।
প্রহর না পলায়িতে, হান না পতিতে।
চির অপকারী শত্রু সরল মানসে
চাহে যদি ক্ষমা, বৎস, লক্ষোদ্যত অসি
নিবার মুহূর্ত্তে। ম্লেচ্ছোচিত নিষ্ঠুরতা

আর্য্যজাতি শিরোমণি ক্ষত্রিয়ে না শোভে।
যাচিল প্রণয় যদি অনূঢ়া কুমারী,
নিরাশ কর না তারে। পাল ক্ষত্ররীতি।
একবার ফুল ফুটে অগরুর শিরে,
একবার কথা কহে প্রতিজ্ঞায় রথী,
একবার চিরতরে হৃদয় সমর্পে
সাধ্বী নারী। প্রত্যাখ্যানে বৃথা সমর্পণে
অখিল জীবন ব্যর্থ সাধ্বী রমণীর,
অনিরুদ্ধ। অষ্ট প্রথা বিবাহের মর্ত্ত্যে,
রাক্ষস গান্ধর্ব্ব দুই তেজস্বী ক্ষত্রিয়
ভজে। মধুর কথায় মধুর ঈক্ষণে
ভুলায়ে অন্যোন্যে যবে সুন্দর সুন্দরী
পূর্ব্বজন্মপ্রেম স্মরি সহজে মিশায়
দেহপ্রাণ দেহপ্রাণে, চিত্ত পুরোহিত
কহে মহীয়ান মন্ত্র, মনসিজ সাক্ষী,
গান্ধর্ব্ব বিবাহ তাহা প্রশস্ত ক্ষত্রিয়ে।
অভিশপ্ত অশ্রুজলে ভ্রষ্ট রমণীর
উদ্ধত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক্ষণিক আবেশে
নহে খ্যাত সেই নামে। কুলধর্ম্মহানি,
কলঙ্ক উদার বংশে, দেশে অবনতি
ফলে সেই বিষ বীজে। সতত বর্জ্জিবি
তারে, অনিরুদ্ধ। পূত গান্ধর্ব্ব বিবাহে
সৌন্দর্য্যে বীরত্বে বাড়ে বংশের সন্ততি।
ভয়প্লুতা চেষ্টমানা সভয়ে সপ্রেমে
বীরত্বদ্যোতিত কান্তি হর্ত্তার কুমারী
যবে হেরে, — রথে তুলি উদ্ধত ঔজসে
ক্রুদ্ধ জাতিকুল রুদ্ধ সিংহ পরাক্রমী
নিঃসরে যখন বীর রক্তাক্ত স্যন্দনে,
রাক্ষস বিবাহ তাহা, মহাফলা রীতি
ক্ষত্রে। বীর সূত জন্মে, সুবংশ বিস্তারে।

অবনত-নেত্র সদা নারীর সম্মুখে
পরদারা-কান্তি, বৎস, হেরিবি না কভু।
হের যদি, মাতৃনামে পূজিবি তাহারে।
রমণীপ্রার্থিত কান্ত বিনয়ী উদার
জিতেন্দ্রিয় মহালোভী সিংহসত্ত্ব যুদ্ধে,
কোন্ পথে আক্রমিবে বিপদ তোমায়,
অনিরুদ্ধ। প্রাণাধিক, যাবি ম্লেচ্ছদেশে,
উদ্ধত কপটী জাতি, অমিত্র আর্য্যের।
যাও দূর শত্রুদেশে অনিরুদ্ধ যোদ্ধা।
আশীর্ব্বাদ দিনু তোরে, আস যদি ফিরে
বিজয়ে আসিবি ঘোষি যশস্বী স্যন্দনে।
যাও ধীরে, যাও নির্ভয়ে। কে তবে তোরে
রুধিবে, কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বলী।”
আপ্লুত গভীর আঁখি স্নেহজলে পৌত্রে
আশিসিল কৃষ্ণজায়া। ঈষদ হাসিয়া
সত্যভামা অনিরুদ্ধে কহিল আলিঙ্গি।
“সহজে ছাড়িল তোরে ভগিনী আমার,
অনিরুদ্ধ, অনিশ্চিত ভয়পূর্ণ কার্য্যে
অনির্দ্দিষ্ট দূরদেশে। আয় তবে, বাছা,
প্রাণধন অনিরুদ্ধ, আয় মম কাছে।
আশীর্ব্বাদ দিব তোরে আমিও, মাণিক,
স্নেহনিধি। দূরদেশে যাইবি, যেথায়
হেরিবে সতত তোরে স্নেহহীন আঁখি,
কর্কশ বিদেশী ভাষা সতত শুনিবি
স্নেহহীন স্বরে। আশীর্ব্বাদ দিনু, বাছা,
সকলের ভালবাসা কুড়ায়ে যাইবি
সে অজ্ঞাত দেশে যেন ভ্রমিয়া বালক
সন্ধ্যায় তটিনী কূলে বাতাসে উল্লসি
ফুলগুলি যায় তুলি মার্গস্থ বিটপে।
বীরোচিত মহাবল সুকুমার দেহে

বৃদ্ধগণ হেরিয়া মোহিত পিতৃভাবে
নিকটে ডাকিবে, যাদু। যুবারা মোহিত
'এস আগন্তুক প্রিয়দর্শন' বলিয়া
হাত ধরি বসাইয়া বন্ধুত্ব-প্রণয়ী
হবে তব কাছে। বালাগণ অনায়াসে
সহজে কৌমুদীস্পৃষ্ট কুমুদ যেমতি
দেহ প্রাণ দিবে ঢালি বাঞ্ছিত চরণে।
হাসিয়া তুলিবি, যেন দেবতা কুড়ায়
প্রীতমনাঃ শান্তভাবে ভক্তের আহুতি।
ক্ষতহীন দেহে ফিরি উজ্জ্বলিবি পুনঃ
এ গৃহ, একই আলো দ্বারিকার তুই,
অনিরুদ্ধ।" পিতামহীযুগল বালকে
এইরূপে আশিসিল অশ্রুজল নেত্রে।
নতশির পাদযুগে গ্রহি আশীর্ব্বাদ
বিশাল উদ্যান ত্যজি সিংহদ্বার পথে
যাইল ঝটিতি যোদ্ধা। ঝলঝল বর্ম্ম,
ঝনঝনে অসি কটিদেশে। না থামিল
মার্গস্থ সভায়, নগরদ্বারে থামিয়া
প্রণমিল পিতৃপাদে যাদবকেশরী।
"যাব দূরস্থানে আজি মাতার আদেশে
পিতঃ। অনুমতি-প্রার্থী আসিনু চরণে।"
কহিল প্রদ্যুম্ন ধন্বী। "প্রীত আমি, বৎস,
মাতা তব পুত্রপ্রাণা না সঞ্চিলে কোলে
প্রাণধন, পাঠাইল দূরে মহাকার্য্যে।
মহৎ কাহারো সঙ্গী যাবে, অনুমানি।
সম্মান করিবে তারে, অনুরুদ্ধ যোদ্ধা,
সম্মানার্হ তৎসদৃশ প্রাণী। জান তবে
সম্মানের সীমা, বৎস। সৌরসেন রথী
দাস নহি কারো মোরা অখিল ভুবনে।
মানি না নৃপতি পুরে দেখি বৃথা বংশ

বৃথা সিংহাসন গৌরব। শৃগাল ভীরু
সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত বিরাজে অরণ্যে,
অখিল কানন পূজে নীচাশয় ধূর্ত্তে
কেশরী না পূজে। গুণে অদ্বিতীয়, বংশে
সমান, মন্ত্রণে শৌর্য্যে অগ্রগণ্য হেরি
কার্য্যসিদ্ধি হেতু মানি শ্রেষ্ঠ জনে।
স্বাধীনতা কুলধর্ম্ম যাদবের। নমে
উচ্চশির তার এক গুরুজনপাদে
না নরের, না দেবের। পালি কুলধর্ম্ম
আচর বিদেশে, পুত্র, উচ্চশির নিতি।"
বাহিরিয়া অনিরুদ্ধ সপ্তদ্বার লংঘে
লঘুগতি। রৈবতক প্রকাণ্ড শিখর
উঠিল সম্মুখে উচ্চ গগন আক্রমি
বহুস্বর নদরোলে। ঝরণা নিনাদ
ধ্বনিল রথীর কর্ণে। পর্ব্বত কুসুম
সৌরভ লভিল। গিরিবাসী শুনিল
রহস্যগীতি বিহগের। হৃদয় মুদিত
বাহিরিল যেন গানে। গাহিতে গাহিতে
ধরিল পর্ব্বত মার্গ বালক সুধন্বী।

ইতি — রুক্মিণী-সত্যভামা আশীর্ব্বাদ ও বহির্গমন সমাপ্ত

তৎপরে ইন্দ্রবাসুদেব সংবাদ ও সভাবর্ণন ও সভায় বাদবিবাদ আরম্ভ

সৌরসেন সভাস্থলে সমাসীন আজি
সৌরসেন বৃদ্ধগণ অদৃষ্টের দিনে
বার্দ্ধক্যে মহিমান্বিত, অন্ধক বিপৃথু
দেবভাগ দেবশর্ম্মা বৎসাবান শিনি
উদ্ধব সুতনু অনমিত্র মহাবলী, —
যত বৃদ্ধ ভগ্নবল সর্ব্বহর কালে
আর না আস্ফালে ধনু দারুণ সংগ্রামে,

লৌহবক্ষ হতে না বেরোয় সিংহনাদ
শত্রুহৃদি বিদারিতে, ভীম অসিভার
অল্পক্ষণ বহিতে সমর্থ বাহু — তবে
মানসে সবল যেন চতুষ্কোণা দুর্গে
চারিদিক হেরে তীক্ষ্ণ মৃত্যুঞ্জয় বুদ্ধি,
অতীত প্রদীপ শিখা ঘুরায়ে দর্শায়
পরিণাম আশাভীতি নবযুগ পথে।
প্রাচীন নৃপতি সেথা উগ্রসেন রাজা
পার্শ্বে বসুদেব শৌরি বৃদ্ধ মহাকায়
আনক দুন্দুভি যোদ্ধা বিখ্যাত জগতে।
মহাভাগ পুত্রদ্বয় বসুদেব পাশে
আসীন রেবতীকান্ত হলধর বলী
অরিসেনা-ক্ষেত্রে চাষী, কৃষ্ণ মহাযশা
উরকীর্ত্তি নারায়ণ মানব শরীরে।
    আসিয়া কহিল কৃষ্ণে ধীবল দুয়ারী।
"মহাকায় কেহ দ্বারে, বাসুদেব শৌরি,
কি গুপ্ত বারতা, কৃষ্ণ, কহিবে তোমারে।"
উত্তর করিল তারে কৃষ্ণ মহাযশা
"সভাগৃহ সমাসীন বৃদ্ধেরা যেথায়
কে গুপ্ত বারতা কহে কনীয়ান কর্ণে।
সভাগৃহে দৌবারিক, আন বার্ত্তাবহে।
বৃদ্ধ রাষ্ট্রপালবৃন্দে রাষ্ট্রের বারতা
নিবেদে সুমতি দূত। মহীয়ান বৃদ্ধ,
শান্ত তার বুদ্ধি। ধীর অটল মানসে
গূঢ় রহে মন্ত্রণা।" কহিল দৌবারিক
"নহে দূত এই যোদ্ধা। ধন্বী মহেষ্বাস
দেবাকৃতি। দেবসম মহৎ কপালে
ভাতে কি নিগূঢ় আভা। দেবসম গতি
যেন পর্ব্বতচারী সিংহের।" সভাদ্বারে
উঠিয়া হেরিল শার্ঙ্গী মহাকায় কেহ

দাঁড়ায়েছে বর্ম্মী ভীম শরাসন করে।
প্লাবে দ্বারদেশ জ্যোতিঃ, উচ্চশির ঠেকে
তুঙ্গ তোরণাগ্রে, — অদিতিনন্দন বজ্রী
মানবশরীরে ছন্ন মহৎ দেবতা
যেন বহ্নি অল্প ধূমে। কহিল মাধব।
"কে তুমি যাদবপুরে বার্ত্তাবহ। রথে
উঠিয়া না পদব্রজে লংঘি গিরিমালা
তপ্ত মরুদেশধূলি উড়াইয়া ধাবে
কোন জন্মভূমি ছাড়ি কি বা বার্ত্তা মুখে
বাহিলে সুদূর পন্থা সমুদ্র-উদ্দেশী।"
আখণ্ডল বজ্রী কৃষ্ণে উত্তর করিল।
"প্রথম কি এ আলাপ হইল মোদের,
কৃষ্ণ। বৃথা কেন এ শুধাও গূঢ়জ্ঞানী
বৃন্দাবন কথা ভুলেছ, কি তবে,
তুমি যেথা মনোহারী দুরন্ত বালক
খেলিতে মধুরহাসি গোপবধূ মাঝে।
গোবর্দ্ধন বাল্যকালে হেরিল দুজনে,
নিবিড় খাণ্ডবারণ্যে আলাপ করিনু
রণের গম্ভীর মৌনে ধন্বী সহ ধন্বী।"
বাসুদেব মহাযশা উত্তর করিল।
"আখণ্ডল ধনুর্দ্ধারী, দেবত্ব আবরি*
ছদ্মবেশী যে আইল আত্মগোপনার্থে
চিনেও না চিনে তারে আর্য্যমনা জ্ঞানী।
ছদ্মবেশে পরব্রহ্ম বিরাজে জগতে
বহুভাবে বহুরূপে। সুজ্ঞানী মানব
চিনেও না চিনে তারে। ঈশ্বরের খেলা
ভাঙ্গিতে না চাহে। মৃদু চাপা হাসি মুখে
খেলে, সঙ্গে। ভবনদী পুলিন-বিহারী
রাখে ক্রীড়া নিয়ম অক্ষুণ্ণ

* পাঠান্তর: লুকায়ে

বাজে বংশী ভবনদী পুলিন সৈকতে
নাচে বামাগণ জ্যোৎস্নাপ্লুত মধুরাত্রী
মর্ত্ত্য পৃথিবীতে এলে, আখণ্ডল বজ্রী।”
আখণ্ডল ধনুর্দ্ধারী উত্তর করিল।
“ধর্ম্ম রক্ষা-অর্থে, কৃষ্ণ, মহাত্মা জন্মায়
কর্ম্মক্ষেত্র জগে। পাপভার ক্লিষ্টা যবে
দেবী বসুন্ধরা, বাড়ে অধর্ম্ম সর্ব্বত্র,
ধর্ম্ম-অঙ্গে আসে গ্লানি, নারায়ণ জিষ্ণু
অবতরি নরদেহে দুর্জ্জনে বধিয়া
দূর করে মহেষ্বাস ভারতের ভীতি।
উগ্র দৈত্যগণ মধুর দানবদ্বীপে
বহু পরাভবে ভগ্ন পুনর্ব্বার শক্তি
জমাইছে। রাজধানী সে সুদূর দেশে
কিন্তু প্রাগ্জ্যোতিষ, কিন্তু হুনা চীনভূমি
মানে ভীম শাসন, তুরুষ্ক করাধীন,
টলিছে যবনেশ্বর মহাহ্রদতীরে।
অর্দ্ধভাগ পৃথিবীর ছাইল সে শক্তি।
সহায় শঙ্কর নিত্য দানবপতির,
যোগ দিবে বরবেশে স্কন্দ তারকারি
দানব সম্বন্ধ-লোভে। মহান অনর্থ
আর্য্যের দেবের সে বিবাহে। পাঠাইবে
দৈত্যভূমি প্রদ্যুম্ন-দয়িতা অনিরুদ্ধে
চারুস্মিতা দেবী। সহায় বিরিঞ্চি যবে,
হরিবে দৈত্যকুমারী ভাঙ্গিবে বালক
উগ্রফল এ বিবাহ, নিঃসন্দেহে জানি।
কিন্তু মহাবলী দৈত্য প্রসাদে শম্ভুর
কুমার দানবজিৎ রহে পাশে সদা
পরন্তপ ধনুর্দ্ধারী। সাধি বিশ্বহিত
যেন না বিপদে পড়ে চারু অনিরুদ্ধ
অকাল মরণে। উঠ, মহাবলী যোদ্ধা

বাড়ে হের, সদা যেন কৃষ্ণমেঘরাজী
সন্ধ্যার গগনে দৈত্য। ভীমবাহু তার
উচ্চ হিমাচল মাপে প্রকাণ্ড দুদিকে।
শমিলে পারস্য তেজঃ — কদিন বা টিকে
ধর্ম্মচ্যুত — হিমাদ্রির পশ্চিম তোরণে
ঘিরিবে অক্ষয় শত্রু। শুন আসে কর্ণে
ভীম সিন্ধুনাদ। কাল-সমুদ্র যেমতি
ঘোষিছে ম্লেচ্ছজগৎ আর্য্যাবর্ত্ত পানে।
গর্জ্জিছে পূরবে দৈত্য ঝটিকার ধ্বনি।
ঘূর্ণবায়ু যেন আসি, যাদব কেশরী,
চূর্ণ কর মেঘবল, উড়াও সে ঝড়ে।
আসন্ন ভয়ের রাত্রী দেবপ্রিয় দেশে,
সর্ব্বহর সর্ব্বঘাতী কৃতান্ত আসিছে
ক্ষত্রহীন করিতে ভারত। অখণ্ডিত
রৈলে এ ভীষণ শত্রু আর্য্যের দুয়ারে,
কে রক্ষা করিবে তবে, শূন্য আর্য্যভূমি।”
উত্তর করিল তারে বাসুদেব শৌরি
“কালের করাল গ্রাসে কে বাঁচে, সুরেশ।
তূরীরবে জয়নাদে আরাব করিয়া
সুমহৎ রাষ্ট্রবৃন্দ মত্ত ক্রূরকর্ম্মী
নির্দ্দয় নয়নে অগ্নি গর্ব্বকথা মুখে
অহর্নিশি চলিতেছে ধ্বংসপথে বেগী
অন্ধবৎ। আসে কত, যায় কত ভবে।
প্রাচীন অসুর কোথা, বাঁধি মহাপুরী
প্রস্তরে লিখিল যারা, লিখি মৃৎপাত্রে
নিজ ইতিহাস, মূঢ়! ভাবিল চিরায়ু
মোরা। বসুন্ধরা ঢাকে সে বিপুল কীর্ত্তি।
সত্যযুগ মানবের পশ্চিম সাগরে
ডুবিয়াছে মহাদ্বীপ। নির্দ্দয় তরঙ্গে
মজিল সভার্য্যাপুত্র সুকরুণ রূপে

দেবসম সেই জাতি। লুপ্ত মহাযশ
বিস্মৃতির সর্ব্বগ্রাসী ভীম অন্ধকারে।
কত মহাজাতি উঠে গ্রাসিতে পৃথিবী;
কত মহাজাতি গেল অনন্ত তিমিরে।
শেখে না অল্পায়ু জেতা। ভাবে আমারেই
বরিয়াছে জগদেব, আমিই অমর,
সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে রহিব চিরায়ু।
কাল জিজ্ঞাসিবে সূর্য্য কোথা সেই বলী।
এক সে পবিত্র জাতি যে চিনেছে লীলা,
জানে ঈশ্বরের ক্রীড়া সুখদুঃখ মম,
হইয়াছে চিরজীবী। রৌরব-তিমিরে
যদি ফেলে বিশ্বজেতা, দলি লৌহপদে
যদি ভাঙ্গে, যদি পেষে, নির্ধন করিয়া
মনুষ্যত্ব লয় শুষি নির্ঘৃণ মানসে,
পাপের অগাধ পঙ্কে ডুবায় গোলামে,
মরিবে না তবু। অন্ধতম সে নরকে
যাইব নামিয়া আমি উদ্ধার করিতে,
যুগে যুগে আর্য্যত্রাতা নারায়ণ জিষ্ণু।
নিশ্চিন্ত চালাও রথ শোণিত-নগরে
বাসব। আসিব কৃষ্ণ যদুকুল নেতা,
ঘূর্ণবায়ু যেন ঘোষি দৈত্যবিভীষিকা
চূর্ণ করি উড়াইব পূরব গগনে।"
ফিরিল সভায় শৌরি। দ্বারিকা ত্যজিয়া
ধরিল পর্ব্বতের মার্গ আখণ্ডল বজ্রী,
কুয়াশা মহৎ শৈলে। কুয়াশায় গূঢ়
ধরিল প্রদ্যুম্নপুত্রে মহৎ দেবতা
অর্দ্ধপথে। সুগন্ধিত দেবদারু বনে,
অগাধ কন্দরে ভাসি উঠে দেবরাট
ধাবমান কুয়াশায়, যেন ছায়াশৃঙ্গে,
প্রকাণ্ড, মায়াবী, হেরি পথিক যাহারে

"অনুসরে মোরে" ভাবে রাক্ষস ক্রব্যাশী
কাঁপি নিজছায়াভীত আলেমান-দেশে।

দালানে সভাগৃহের ধরিয়া সে শঙ্খ
ভীমনাদী পাঞ্চজন্য বাসুদেব যোদ্ধা
উরুঘোষী মহানাদে পূরিল নগরী।
শত সিন্ধুধ্বনি যথা ধ্বনিল আহ্বান
পর্ব্বতে প্রান্তরে জ্বলে। চমকি উঠিল
মহতী যাদবপুরী ভবনে দুয়ারে
প্রমোদ-উদ্যানে। উগ্র আয়ুধ সাপটি
অগণন চক্রঘোষে হুঙ্কারিল ভীমা,
লক্ষ পদধ্বনি পথে, লক্ষমহাস্বরা
উরুস্বনা কোটিশিরা, সমুদ্র যেমতি
অযুততরঙ্গস্বর গর্জ্জি যবে আসে
বেলাপানে, — সভাপানে ধাইল নগরী
অসীম আরাবে। উচ্চশৈলে প্রতিধ্বনি
ঘোষিল অরণ্য যথা বায়ু পরিরম্ভে।
অযুত বৃহৎ কায়ে সিংহসম নেত্রে
পূরিল বিস্তৃত দীর্ঘ সভাগৃহ ভূমি।
এক প্রান্তে সমাসীন সভার সম্মুখে
বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ সমরে বা যারা
অগ্রগামী। উগ্রসেন প্রাচীন নৃপতি
সবার মাঝারে শোভে বৃদ্ধ মহাকায়।
নরশস্যক্রম চারি কৃতান্ত বপিল
কর্ম্মক্ষেত্রে। চারিবার উঠিল হিল্লোলি
পবনে ধরার ধন, হাসিল জননী।
তীক্ষ্ণ অসি ঘুরাইয়া ভীষণ কৃষক
চারিবার কাটে। হেরিয়াছে উগ্রসেন।
উঠিছে পঞ্চমশস্য শ্রান্তিহীন ক্ষেত্রে।
যুগসুখদুঃখ নেত্রে দীর্ঘজীবী রাজা

রহে, যেমতি পারস্যে পুরাতন শিলা
শত মহালিপি বক্ষে, নূতন যুগের
বিস্ময়। দেবের হস্তলিপি অনুমানে
মহিমা-স্তম্ভিত প্রজা, পূজে সেই গিরি।
সমাসীন নৃপপাশে বসুদেব শৌরি
আনকদুন্দুভি যোদ্ধা বিখ্যাত জগতে।
পুত্রপৌত্র চারিধারে, পৌত্রের তনয়
ঘেরে মহীয়ান বৃদ্ধে, কৃষ্ণ বলরাম
গদ চারুদেষ্ণ সাম্ব প্রদ্যুম্ন সারণ, —
যেন শৃঙ্গ অভ্রগামী ঘেরা শত শৃঙ্গে।
ভগ্নবল বৃদ্ধদেহ সর্ব্বহর কালে,
অক্ষত বিরাজে তবু মহিমা সে দেহে, —
প্রাচীন প্রাসাদ যথা উচ্চ যুগজয়ী
পূর্ব্ব-সাম্রাজ্যের চিহ্ন জনহীন পুরে
ভগ্নশির কালে ভগ্নপ্রাচীর। তথাপি
বিস্ময়ে এ কাল হেরি ভাবে 'দেবসম
সে কালের মানবেরা এ পাষাণরাশি
তুলিল গগনে যারা কৃতান্ত না মানি।'
পূজিয়া মহৎ বৃদ্ধে ভক্তিপূর্ণ নেত্রে
প্রতীক্ষা করিল সভা বাসুদেব-উক্তি
উঠি সভামাঝে ধীরে কৃষ্ণ মহাযশা
তূরীধ্বনি যেন ঘোষি আয়সের কণ্ঠে
ছাড়িল সিংহবচন সিংহবক্ষ হতে।
"উঠ ওহে সিংহজাতি, সাজ রণবেশে।
আনন্দের বার্ত্তা আজি যাদব-নগরে,
পুনঃ মহাকর্ম্ম এল, দেখায়েছে পুরে
চারুমুখ তার। যদুর সন্ততি মোরা
কত কাল বিনা লক্ষ্যে পচিয়া থাকিব
নিষ্কর্ম্মা আলস্যে। নাহি বাসি' এই অর্থে
রুক্ষোপলা গিরি-ভূমি, পর্ব্বতের কোলে

নাই স্থাপি এই অর্থে তরঙ্গ-রক্ষিতা
দুর্দ্ধর্ষা মহতী পুরী মহোদধি তীরে।
অগম্য গিরিগহ্বরে শাবক শাবিকা
রাখি সিংহ বাহিরায় উরুচারী মৃত্যু
বধার্থে ভ্রমিতে। যদু শাবক শাবিকা,
বৃক্ষাগ্রে মধুর নীড়ে মধুর সন্ততি
নিরাপদে রাখিয়া বিশ্ববিচারী পক্ষে
পরহিতে ভ্রমি মোরা। স্বার্থপর শান্তি
ভজিতে নাহি জন্মিনু, ওহে সিংহজাতি।
পরার্থে দ্বারিকাপুরী, পরার্থে আমরা
যদুকুল, পরার্থে জন্মেছি বাসুদেব
দুঃখপূর্ণ ধরাতলে উচ্চ যদুবংশে।
কি হেতু সিংহ-বিক্রম দিয়াছে বিধাতা,
কি ফলে বা অল্পসংখ্য যাদব প্রতাপে
পৃথিবীর সমকক্ষ যদি না পরার্থে
খাটাই সেই বিক্রম। পরার্থেই সৃষ্ট
বাহুবল বুদ্ধিবল প্রতিভা জগতে।
দুর্ব্বল-উদ্ধার, দমন অত্যাচারীর
জন্মভূমি রক্ষা, এ আমোদ এ বিলাস
নহে গান, নহে নৃত্য, যোগ্য যদুকুলে।
বিশ্রামার্থে গান নৃত্য প্রীতি সৃষ্ট বিশ্রামার্থে
কিন্তু চিরদিন কি বিশ্রাম
করিব যাদব হয়ে নিষ্কর্ম্মা আলস্যে।
কি নীরস সে দিন যেদিন না করিনু
কোন পরহিত মোরা ক্ষত্রোচিত তেজে।
স্বর্গের দেবতা আজি যাদব নগরে
কহিল এ বার্ত্তা নামি। শুন, রথিগণ
মধুর দানবদ্বীপে দানব-ঈশ্বর
বাণ মহাবাহু, বাড়ে নিত্য তার কীর্ত্তি।
শাসিছে প্রতাপে ধরা। যত উগ্র জাতি

হিরণ্যকশিপু ভয়ে মিলিত হইল,
বন্ধচ্যুত পরে, পুণ্য বাণাসুর ভয়ে
পূর্ব্ব বসুন্ধরা ভজে একচ্ছত্রচ্ছায়া।
প্রাগ্‌জ্যোতিষ চীনভূমি আচ্ছাদিল বাণ
মঙ্গল তুরুঙ্ক হূন মানে সে অধিপে।
সহায় শঙ্কর নিত্য দানবপতির,
যোগ দিবে বরবেশে স্কন্দ তারকারি
আসুর সম্বন্ধপ্রার্থী। কহিতে এ বার্ত্তা
স্বর্গের দেবতা আজি নামিল নগরে।
উগ্রফল এ বিবাহ ত্রিদিবে মরতে।
অতএব পাঠাইল দানবের ভূমি
তনয়ে প্রদ্যুম্নজায়া। চারু অনিরুদ্ধ
রূপে ভুলাইয়া আনি দৈত্যকন্যারত্নে
গ্রহিবে বালক; বায়ু-অতিগ স্যন্দনে
উগ্রবলে বা হরিয়া যোদ্ধা মহাবলী।
কিন্তু পরাক্রান্ত দৈত্য, সহায় শঙ্কর
কুমার দানবজিৎ রহে সদা কাছে
পরন্তপ ধনুর্দ্ধারী। যেন না বিপদে
পড়ে অনিরুদ্ধ যোদ্ধা সুদূর বিদেশে।
অতিশয় অপকীর্ত্তি হইবে মোদের
মরিলে যাদব রথী বিদেশীয় ভুজে
হত, যেন অসহায়, যেন হেয় কুলে
তার জন্ম। না সহিব দুর্ব্বল ধর্ষিত,
সবলে কি ডরাইব, কাপুরুষ যথা
বলান্বিত দৈবদোষে অশক্তে আস্ফালে
ঘৃণ্য শক্তি। কে মানিবে আর যদুবংশে
অখিল বসুন্ধরায়। বিশেষতঃ দৈত্য
চিরশত্রু আর্য্যের ঘিরেছে এবে ভূমি
আর্য্যাবর্ত্তপানে যেন কৃষ্ণমেঘরাজী
বাড়ে দৈত্য বিভীষিকা উত্তরে পূরবে।

হিমাচল দুইদিকে মাপে ভীমবাহু।
বাড়ে বহু ম্লেচ্ছজাতি পশ্চিমে। যেদিন
অল্পায়ু পারস্য তেজঃ নিবারে যবনে,
নিরাপদ এ দেশের। পরে চারিদিকে
আক্রমণ, চারিদিকে সমুদ্র যেমতি
ঘোষিবে ম্লেচ্ছ জগৎ বিপন্ন ভারতে।
অতএব উঠ সাজ, ওহে সিংহজাতি।
সন্নাহে আবরি দেহ তূরীরব ছাড়ি
বাহিরি যাদব মোরা যুদ্ধ-অগ্নি নেত্রে
চক্রঘোষে সিংহনাদে পূরব-উদ্দেশী।
স্বদেশ-রক্ষার্থে ধর্ম্মরক্ষার্থে বিধাতা
সৃজিয়াছে যুদ্ধ মর্ত্ত্যে। পুনঃ ধর্ম্মযুদ্ধে
মাতি, ওহে যদুগণ। খুল্ল স্বর্গদ্বার,
ডাকিছে অপ্সরাকণ্ঠ বৈজয়ন্ত-ধামে।''
কহিল মহাত্মা। উরুচারী সিংহনাদে
উত্তর করিল জাতি। এই দিকে কিন্তু
উচ্চস্তম্ভ যেন উঠি ভ্রূকুটি ললাটে
কহিল নিন্দিয়া কৃষ্ণে হার্দ্দিক সুধন্বী
কৃতবর্ম্মা। ''কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহত্ত্ব পিপাসু
কতদিন ভীমশ্রমে খাটাবি মোদের
নির্ম্মম সমরে ফেলি। আয়সের পুত্র
নির্ম্মম আয়স তুমি। পুরাকালে সুখী
সুপ্রিয় মথুরাপুরী ভজিতাম মোরা
নদীতীরে। ঝিল্লিকা-নাদিত বনরাজি
মধুর জীবন ঘেরে, বৃন্দাবন-বায়ু
বিতরি মৃদু সৌরভ ভ্রমে মথুরায়, —
যমুনার কলস্বর বিলাসী শ্রবণে
সৌরসেন বহুগ্রামে বাসিতাম সুখী।
কে সম্রাট কে বিক্রান্ত বিশাল ভারতে
নাই রাখিনু সে বার্ত্তা, সন্তুষ্ট রহিনু

ক্ষুদ্র সুরক্ষিত জাতি স্বাধীন স্ববলে।[১]

*

উত্তর না করে জ্ঞানী উদ্ধত শৈনেয়ে
কৃতবর্ম্মা। কিন্তু ক্রোধে সভায় উঠিল
উরুজিৎ রূক্ষভাষী, প্রসেন-তনয়,
উরুজিৎ ধনুর্দ্ধর, দুঃসাহসী যুবা
জ্ঞানহীন, অগ্রগামী সমরে কলহে।
সিংহসম গর্জ্জি যুবা ভর্ৎসিল শৈনেয়ে।
"বীরজাতি যদুগণ অথবা কি বীর
তারা সহ্য যারা করে ততদিন মৌনী
শৃগাল-চিৎকার সদা সাত্যকির মুখে।
গুণ্ডারূপে কি নিযুক্ত করেছ, মাধব,
এ গর্জ্জন-সার জন্তু যাদব-সভাতে
বিভীষিকা দেখাতে মোদের। যে বলিলে
কেহ কিছু সভামাঝে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে,
অমনি কৃষ্ণের এই কুকুর, সাত্যকি,
ঘেউ ঘেউ করি ছুটে দংশিতে[২] তাহারে।
যাহা নাই করে কভু এই আর্য্যদেশে
নীচ হতে নীচ, তাহাও করিল আজি
মহিলার অপমান সভার সম্মুখে
ম্লেচ্ছ। কি হে থামিবি না তবে, যুযুধান,
যদিন না ধ'রে কাটি তীক্ষ্ণ অসিধারে
অপবিত্র জিহ্বা তোর টাঙ্গাই, শৃগাল,
সভাদ্বারে।" না থামিতে উরুজিৎ বাণী
উঠিল ভীষণ ক্রোধে বার্ষ্ণেয় সাত্যকি,
তীক্ষ্ণ অসি উল্লঙ্গিয়া উরুজিৎ পানে
গেল ধাবি বধিতে। ঘোষিল যদুসভা
ক্ষুব্ধ মহার্ণব যথা উত্তাল তরঙ্গে

[১] পরবর্তী কিছু অংশ পাওয়া যায়নি।

[২] পাঠান্তরঃ কামড়াতে তারে

বিলোড়িত। কিন্তু সাম্ব ধরিল শৈনেয়ে
ধরিল প্রদ্যুম্ন বসাইতে। কোশে পুনঃ
আবরিয়া ভীম অসি কহিল সাত্যকি
আবেগ দমিয়া কষ্টে। “নিবারিল মোরে
কৃষ্ণপুত্রগণ। ন্যায্য সে বারণ মানি।
মাতাল, উন্মত্ত, শিশু, তাদের বচন
নাহি গণে লোকে। যদি দুরন্ত বালক
ভর্ৎসে গুরুজনে ধৃষ্ট এক চড় গালে
বসাইয়া শাসি থামে। উন্মাদ-প্রলাপে
গঞ্জিত করুণাপূর্ণ মৌনে যায় চলি।
মাতাল অশ্লীলভাষী ধাক্কা দিয়া গলে
গৃহপথে ফিরায় হাসিয়া। ক্ষিপ্তমনা
শিশু তুমি, উরুজিৎ, ক্ষমিনু তোমারে।
সভার গৌরব ভঙ্গ করিয়াছ, শাস্তি
যদুগুরুজন তার বিধান করিবে,
বিশেষতঃ বাসুদেব নেতা এ পুরীর।”
হাসিয়া কহিল পুনঃ উরুজিৎ বলী
“অতি মনোহর ক্ষমা এ তোর, সাত্যকি।
শরীর-রক্ষক ক্ষমা ভয়পূর্ণ ভবে।
মহারথী যদুগণ, স্বাধীন আমরা
ছিলাম যেদিন হতে মহাকায় যদু
অভিশপ্ত বহিষ্কৃত যযাতির ক্রোধে
স্থাপিল মথুরাপুরী সৌরসেন দেশে।
অভিমানে প্রচারিল আদেশ সেথায়
মহাত্মা অন্তিম কালে পুত্রপৌত্রগণে
ডাকি আছে। ‘শুন মোরে, যদুর সন্ততি,
যদিন এ জাতি থাকে, যদিন এ পুরী,
মানিবি না নৃপে কভু যাদব নগরে।
জ্যেষ্ঠ মম বংশধর কেন্দ্র নৃপনামে
হবে এ বংশের কিন্তু না পিতারে যেন

পূজিবি, ভারতে যথা নিয়ম আর্য্যের।
নিজের অধিপ নিজে সমুদায় জাতি।
কুলধর্ম্ম ইহা জান যদুর সন্তানে।'
মহাত্মাবচন পূজি সে অবধি মোরা
স্বাধীন রহিনু। শেষে কি দাসত্ব প্রিয়
যাদবের মনে। পুষি বসুদেব বংশে
ঐশ্বর্য্যে নেতৃত্বে যশে হীনবল জাতি
এক গৃহ বলবান যাদব-নগরে।
ছায়াসম সিংহাসনে বসে উগ্রসেন
ক্ষীণ হল ভোজ বৃষ্ণি, নিস্তেজ অন্ধক।
পুত্তলির মত নাচে সমুদায় জাতি
এক সূত্রধর-হস্তে। কৃষ্ণের বচনে
যুদ্ধ সন্ধি, শুই উঠি কৃষ্ণের বচনে
করিতে যুবতী-চুরি কৃষ্ণপৌত্র যোদ্ধা
গেল দৈত্যদেশে। না হয় বসন্ত প্রাণে
জাগিল, না হয় শুনি কোকিলের কুহু
অধীর কৃষ্ণের রেতঃ গোপীনাথ পৌত্রে।
তাই বলি কি রে বধ্য সংগ্রামে* দানব,
তাই বলি রণক্ষেত্রে নামিবে এ জাতি।
পিতামহ পিতা ভ্রাতা পিতৃব্য রয়েছে
অসংখ্য অনিরুদ্ধের। রাতদিন শুনি
তাহাদেরি মন্ত্রণায় তাদেরই শৌর্য্যে
রক্ষিতা দ্বারিকাপুরী। যাক তবে তারা
উদ্ধার করুক রত্নে মন্ত্রণায় শৌর্য্যে।
বৃথা কেন বলক্ষয় সমস্ত জাতির।
তবে কি দাসত্ব স্থির যাদবের ভাগ্যে।
কে এই অদ্ভুত কৃষ্ণ যে তাহারি পদে
প্রণত যুবক বৃদ্ধ পুরুষ রমণী।
বলবান যদি, মহেষ্বাস, আরো আছে

* পাঠান্তর: সমরে

বীর এই পুরে। যদি মন্ত্রণা-কুশল,
উদ্ধব বিপৃথু কঙ্ক মূর্খ কি তাহারা।
কে এই অদ্ভুত কৃষ্ণ আরাধ্য বিশ্বের?
উরেছে কি নারায়ণ আর্য্যত্রাতা জিষ্ণু
মানব শরীরে তবে। গূঢ় কি বাসব
এই দেহে, আর যত দেবতা ত্রিদিবে।
নীচ গোপগৃহে জন্ম। বাসুদেব শৌরি
বলি তারে, কিন্তু সত্য কে ভাবে নগরে
জন্মিয়াছে হেন মূর্ত্তি দেবকীর গর্ভে।
গৌরবর্ণা অগ্রগণ্যা রূপসী-সমাজে
দেবকী, গৌরবদন বসুদেব যোদ্ধা,
গৌরবর্ণ বলরাম সারণ, শ্বেতাভ
গদ। নীলমেঘ যেন শ্যাম কৃষ্ণমূর্ত্তি।
কে বা হেরিয়াছে জন্ম বিখ্যাত শার্ঙ্গীর।
বৃন্দাবন-লীলা জানে ভূমণ্ডল। শিশু
দুরন্ত অবাধ্য ধূর্ত্ত, বালক মায়াবী,
পরদারা সহ ক্রীড়া করিল মাধব
মধুরাত্রে — জিতেন্দ্রিয় অদ্ভুত-বিলাসী।
রমণী বসন-চোর নগ্ন চারু অঙ্গ
শত ললনার বশী হেরিল বলিয়া
সর্ব্বপূজ্য কৃষ্ণ। কংশে অপূর্ব্ব উপায়ে
বধিল নিজ-আলয়ে নহে রণক্ষেত্রে।
অধীশ্বর জরাসন্ধে ভীমসেন-ভুজে
রাজগৃহে ছদ্মবেশী পশিয়া বধিল
চক্রী। ব্যূহবিদ্যাপটু অগ্রগামী রণে
মানি বাসুদেব। মোরা কি সহজে হঠি।
নাই কোন অন্তর আমাতে বাসুদেবে।
যাহা কৃষ্ণে তাহা আমি। দেহে সকলের
বিরাজে একই আত্মা নিগূঢ় হৃদয়ে।
তবে কেন প্রণমিব অসংখ্য তেজস্বী

একের চরণে, যদুগণ।'' বহিতেছে
তেজস্বী ধাবিতবাণী উরুজিৎ মুখে
যেন বন্যা গঙ্গা-পানে। কিন্তু ক্রমে উঠে
উগ্র কোলাহল যদুসভায়। মাতিল
ভীম ক্রোধে কৃষ্ণ-বন্ধুগণ, হুঙ্কারিল
বিপক্ষ ঈর্ষায় হর্ষে। গঞ্জি উরুজিতে
হুঙ্কারিল যদুজাতি ভীষণ আরাবে
কৃষ্ণ-নিন্দা অমর্ষণ, লক্ষ উগ্রকণ্ঠে
নিনাদিল। ভীমশব্দে শিহরে নগরী।
শোভে কোলাহল মধ্যে উরুজিৎ বলী
বধির সমুদ্রনাদে উপল যেমতি
অটল, অচল। শত সিংহকণ্ঠনাদে,
কোশ নিঃসরণপ্রার্থী-অসি-ঝঞ্ঝনাটে,
ধ্বনিল মহতী সভা সমুদ্র যেমতি।
মিলে যবে বায়ুকুল উন্মত্ত আহবে।
উঠিল উদ্ধব জ্ঞানী। থামিল হঠাৎ
কোলাহল সে গম্ভীর বদন-দর্শনে।
কহিল উদ্ধব। ''ঘনাইছে, বুঝিলাম,
যদুবংশনাশকাল যখন সভায়
উঠিয়া উদ্ধত যুবা নিন্দে গুরুজনে।
উরুজিৎ পাদযুগে শিখিতে বসিব
রাজনীতি? এস উঠ ত্যজি বাসুদেবে
লভিব শোভন নেতা, — প্রসেন তনয়।
অবিবেকী যুবগণ, যৌবন-উন্মাদে
সর্ব্বজ্ঞ আমরা ভাব। অবহেলি বৃদ্ধে,
প্রাচীন রাজ্যশৃঙ্খলা ভাঙ্গি ছিঁড় তোরা
উল্লাসে নব্যতা প্রার্থী। বানরও বৃক্ষে
তত পারে, মূর্খ। যদি পরাক্রম দেহে,
যদি গূঢ়জ্ঞান মনে, গভীর হইবি।
নহে দেবতেজঃ এই আসুর-প্রবৃত্তি,

এই চঞ্চলতা, এই প্রীতি কোলাহলে।
উরুজিৎ দুঃসাহসী, জিজ্ঞাস মোদের
নত কেন কৃষ্ণপাদে সমুদায় জাতি।
বিরাজে একই আত্মা দেহে সকলের,
জানি। কিন্তু গূঢ়বাসে সে তেজস। মোহ
আবরে, আবরে রজঃ। নাহি সকলেতে
অভেদে সমপ্রকাশ, নাহি সকলেতে
পূর্ণমাত্রা পঞ্চকোশ প্লাবে দেবজ্যোতি।
আছে আরো বীর পুরে, জানি উরুজিৎ।
আছে নীতিবিদ। নাহি উষর জমিতে
জন্মে উচ্চশির বৃক্ষ শোভা পৃথিবীর।
যেথা মালতী যূথী, মল্লিকা যেথায়
চম্পক কিংশুক ফোটে সেথায় গোলাপ —
তাহারি সৌরভে কিন্তু উপবন রুচি।
কৃষ্ণ ভিন্ন কোথা কেহ নর ইতিহাসে
সর্ব্বগুণ মানবের একদেহে মিলি
পূর্ণ বিকসিত। মধুর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে
কে তুল্য কৃষ্ণের। রমণীরমণ স্বামী
পিতা পিতামহ ভ্রাতা তনয় শ্বশুর
আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অদ্বিতীয় শৌরি।
রাজকার্য্য প্রতিভায় কে বা অতিক্রমে
বৃষ্ণি গোপ্তা বাসুদেবে। কে আঁটিবে তারে
ভীম রণে। শুই উঠি কৃষ্ণের বচনে?
সমস্ত পৃথিবী, মূর্খ, তাঁহারি ইচ্ছায়
চালিত, চক্র যেমতি কুলালের হাতে।
ধর্ম্মগুরু ভারতের বাসুদেব শৌরি।
মহারথী যদুগণ কি ফল বিবাদে।
যুদ্ধার্থে আদেশে শার্ঙ্গী। যাহা বলে কৃষ্ণ,
তাহা ধর্ম্ম তাহা নীতি। উঠ তবে সাজ
ভীমধনু সাপটিয়া সিংহনাদ করি মুখে

নিঃসর স্যন্দন-রোলে পূরব-উদ্দেশী।’’
উত্তর করিল বৃদ্ধ হৃদীক উদ্ধবে।
‘‘নাহি প্রশংসিব কভু যুবা উরুজিতে,
উদ্ধব। নিন্দিল কৃষ্ণে মূর্খ রূক্ষভাষী।
জাতির রক্ষার্থে কিন্তু মন্ত্রণা সভায়।
নাই মঙ্গল সে রাজ্যে মন্ত্রণা-অভ্যাসে
বিরত যেথায় প্রজা, এক মহাস্কন্ধে
অর্পে রাজ্যভার। স্বতোজাত গুণ দেহে
বাড়ায় অভ্যাস-জাল, মরে অনভ্যাসে।
সরিলে সে স্কন্ধ আর নাই তুলিবার
ধৈর্য্য দেশে। অতএব দূরদর্শী রাজা
সতত সুগুণ খুঁজে প্রজার শরীরে।
লভিয়া বাড়ায় যত্নে মহাকার্য্য সদা
পুষে যেন পটু মালী নবজাত তরু।
অর্পিয়া ঢাকে আপন কর্ত্তৃত্ব নীতিজ্ঞ নৃপতি। সতত
পুরস্কারে সিঞ্চে, কাটে অপগুণ।*
মহাসৃষ্টি অন্তরালে লুক্কায়েছে সম্ভু।
ভাবে জীব, আমি কর্ত্তা, সে ভ্রমে তেজস্বী
অগ্রসরে কর্ম্মপথে, — সোপান মুক্তির।
‘কোথায় ঈশ্বর তব?’ জিজ্ঞাসে নাস্তিক
বিমূঢ়। ‘‘নরকর্ত্তৃত্ব মানব জীবনে,
নিয়মের কর্ত্তৃত্ব চেষ্টায় প্রকৃতির,
কোথা স্থান সে স্থাণুর?’’ চিত্তে নাস্তিকের
নিগূঢ় হাসিছে ব্রহ্ম প্রত্যাখ্যানি ব্রহ্মে।
নহে জাতিহিত, কৃষ্ণ, দানব সমরে।
অতিদূরে সেই ভূমি। বৎসরের পন্থা

* [পাণ্ডুলিপিতে এই পঙ্‌ক্তিগুলি মার্জিনে লেখা আছে:]
সেইরূপে যে শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ
লোকদ্বেষ লোকঈর্ষ্যা নিবারে সযত্নে
সর্ব্বোত্তম সে নীতিজ্ঞ যে গোপনে বলী।

যাইতে, ফিরিতে তত। তারপরে মাঝে
বিশাল সে চীনভূমি বিস্তৃত, অধীন
দানবপতির। রোধে যদি সেথা গতি
অগণন চীন প্রজা, কে বলিবে শৌরি
পহুঁছিব কবে মধুর দানবভূমি।
পহুঁছিব কি কভু। নির্দ্দয় উরুনাদী
উত্তাল তরঙ্গে মাতি ফেনাময় সিন্ধু
ঘিরে দৈত্যদেশ, মধুবনের চৌদিকে
ভ্রমে শত সিংহ যথা। কোথায় তরণী
পর্ব্বত গুহার পথে উগ্রচণ্ডা দেবী।
কোথায় নাবিক যাতে দানব দ্বীপের
মলয় চুম্বিত তীরে নামে অনীকিনী।
মরিবে বালক কিন্তু সুদূর বিদেশে।
বহুদিন দূরদেশে বদ্ধ হবে সেনা।
ক্ষমিবে কি শত্রু অন্তহীন এই পুরী।
সহনীয় একজনের মরণ, শৌরি
নহে ধ্বংস জাতির। সুভগ অনিরুদ্ধ,
সাধি লোকহিত, সাধি জন্মভূমি-রক্ষা
মরিবি দৈত্যাস্ত্রে, ক্ষত্রিয়ের স্পৃহনীয়
মুক্তিসম পরিণাম। খুল্ল স্বর্গদ্বার
পাবি, ধাইবে অপ্সরা অনিন্দ্য রূপসী
শত শত তোর পানে হাসিয়া কহিবে
"মোরে মোরে। বর মোরে স্বার্থত্যাগী যোদ্ধা
জন্মভূমি গর্ব্ব এস, আমারি উরসে
রাখ রণক্লান্ত শির।" মধুর অধরে
চুম্বিবে টানিয়া বুকে মনোহরা চমূ
দিব্য করে আলিঙ্গিয়া দেবরাট নিজে
বসাবেন সিংহাসনে অনিরুদ্ধ বলী।
কহিল হৃদীক। শব্দ মহতী সভায়
হৈল, যেন অরণ্যের মর্ম্মর প্রভাতে

ভীমপক্ষ বিস্তারিয়া ধেয়ে যবে বায়ু
উড়ানের বাতাসে কাঁপায় বনস্থলী।
উগ্রসেন সভামাঝে উঠিল নৃপতি।
কালভগ্ন মহাকায় কনীয়ান স্কন্ধে
ভর দিয়া উঠিল সে বৃদ্ধ। কষ্টে বাণী
শুনিল মহতী জাতি উরু সভাস্থলে।
হা লজ্জা হা অপকীর্ত্তি। যাদব সভায়
কৃষ্ণনিন্দা হা ধিক্! শুনিনু এ কুদিনে।
হায় কৃতঘ্নতা মানবের। যে মাধব
ত্রাতা এ জাতির যে মাধবে সুখারূঢ়
যাদব-মহিমা যেন পৃথিবী অনন্তে,
তারি নিন্দা করে যাদব। রে লজ্জা কোথা
প্রভাত রাতুল কান্তি লুকাও ত্রিদিবে।
ভুমণ্ডলে লুপ্ত মনোহারী তব পূজা,
দেবী। ওহে স্বাধীন স্বাধীন ছিনু মোরা
যে গর্জ্জ কালে অকালে, বল তবে মোরে
হে স্বাধীন ভোজ জাতি, কি ছিলে তোমরা
বহুগত পুরাকালে। বহুগত সদা
মর্ত্ত্যে পুরাকাল। স্তুতিপাঠক স্বভাবে
বৃদ্ধগণ প্রাচীনের, স্মৃতিরাগে তারা
রঞ্জে চিত্র। পড়ে মনে যৌবন ওজস্বী
মধুর সে বাল্যকাল, ঘৃণায় সন্তাপে
হেরে পরে পলিত মূর্ধজ ভগ্নতনু
জীর্ণ হৃদি অসমর্থ রভস-আস্বাদে।
সর্ব্বদোষ অতি স্নেহে আর্দ্রচিত্ত মুছে
সেকালের। যারা নাহি হেরে প্রাচীনের
আরো পক্ষপাতী তারা। জানে দুঃখরাশি
একালে, সেকালে ভাবে ছিলই না, দুঃখ।
সোণার সময় ছিল পুরাতন যুগে
স্বাধীনতা আছে মনে, সদা দলাদলি,

মনের অমিল সদা যাদব নগরে,
তাহা কি ভুলেছ। শূরতায় বুদ্ধিতেজে
যদুকুলে কে আঁটিল বসুধায় কভু।
বৃথা কিন্তু মহাগুণ খ্যাতিহীন পাত্রে
সেই মহারথী মোরা, সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি
কি নগণ্য ছিনু হায় বিশাল জীবনে
ভারতের। সুখী কিন্তু স্বাধীন স্ববলে
সদা ছিনু কৃতবর্ম্মা। হায় মন্দবুদ্ধি!
মহাবল বংশ যবে ভীষণ ওজসে
দমিল যাদব তেজঃ, ভীত মথুরায়
ভীম রুদ্রতেজে দিন দিন মথুরায়
পড়িল জল্লাদ হস্তে উচ্চশির যত,
পড়ে যেন ধান্য ক্ষেত্রে কাটে যবে চাষী,
ভাসিল নগর রক্তে, স্বাধীন তোমরা
নিবারিল কি তাহারে। কৃষ্ণ নিবারিল
যারে নিন্দ আজি লঘুবক্তা সভাধামে।
যেই জাতি নেতৃভক্ত সম্পদে বিপদে
অটল গভীর দৃঢ় স্বাধীনতা তারে
আপনি আসিয়া ভজে, নমি রাজলক্ষ্মী
পৃথিবীর রাজদণ্ড সমর্পে চরণে।
বিজয় করিবে তারা অখিল পৃথিবী।
ভীমবলী সিন্ধু-উর্ম্মি আদেশে ইন্দুর,
আগুসরে, হঠে পিছে ইন্দুর আদেশে।
সিন্ধুগুণে সিন্ধুসম বিস্তার জাতির।
নিন্দাপ্রিয় স্বার্থপ্রিয় অবাধ্য উদ্ধত
কিন্তু মোরা। অসহ্য হৃদয়ে পরযশ,
আদেশ বহন শিরে অসহ্য। সকলি
নেতা, উচ্চস্থান প্রার্থী সকলি যাদবে।
উঠিতে যে অক্ষম পাড়িবে কিন্তু অন্যে।
কদিন রহিবে হায় দেবী স্বাধীনতা

হেন দেশে। ঘৃণা করে অস্থিরে ভৈরবী।
ঘৃণা করে নীচাশয়ে। সর্ব্বোচ্চ গগনে
বিস্তারিতে মহাপক্ষ ভালবাসে দেবী।
বরং এই প্রার্থনা দেবতা-চরণে
করি সদা, যেন ধরে দৃঢ় করে জাতি
কৃষ্ণসম নিত্য কোন নৃরূপী দেবতা,
জাতি-দোষ রাখে ছাপি, পুষে জাতিগুণ,
চিরস্থায়ী হব মোরা মহান্ ভূতলে।
প্রশংস্য নহে কখন হৃদীকের উক্তি
তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের কর্ণে অশ্রাব্য। মরিবে
একাকী যাদব শত্রুপুরে? আশাসিত
হাসিয়া বাঁচিবে হন্তা? ধিক সে বদন
যাহা হতে ঘৃণ্য হেন বেরুল মন্ত্রণা।
হৃদীক! উন্মত্ত হলে বৃদ্ধকালে তুমি
ধ্বংসই জাতির শ্রেয়ঃ, নহে অপকীর্ত্তি।
পৌঁছিব না কিন্তু। কিন্তু উত্তাল তরঙ্গ
কিন্তু অগণন প্রজা পৃথু চীনদেশে
রুধিবে যাদবগতি। বাপধন, মোরা
নহি মূর্খ সকলই নিয়ন্তা পুরীর।
মুরারির গুপ্তদূত ফেরে দেশে দেশে
অতন্দ্রিত, যেন সূর্য্য, — সর্ব্বসাক্ষী-অগ্নি, —
হেরে' কর্ম্ম অপকর্ম্ম নরের ভূতলে।
পৃথিবীর দূর কোণে আসীন মাধব,
কিন্তু নাই সে রহস্য, নাই সে মন্ত্রণা
গুপ্তদূতে কৃষ্ণ চক্ষু যাহা নাই হেরে,
গুপ্তদূতে কৃষ্ণ কর্ণ যাহা নাই শুনে —
অতন্দ্রিত গোপ্তা শৌরি। জানিয়াছি, প্রজা
অসন্তুষ্ট চীনদেশে, ঘোরে সদা মনে
বিদ্রোহ বাসনা, গুপ্ত সমিতি সহস্র
জাগে অন্ধকারে যেন হিংস্র পশু বনে।

ছাড়িবে চীনেরা পন্থা, খাদ্য বাসভূমি
দিবে পুরে পুরে। মহোদধি-তীরবাসী
মঙ্গল তরণী দিবে তরিতে জলধি,
যাইবে নাবিক তারা দানববিদ্বেষে।
তাহা ছাড়া জানিয়াছি দৃপ্ত চিরজয়ে
দানব। অতি বৈভবে, অতল বিলাসে
ডুবিয়াছে বুদ্ধি। লুটে রাজ্যধন মন্ত্রী।
স্বার্থে অর্থলোভে পচে হৃদয় জাতির,
আত্ম-অভিমান ফেলেছে চিতায়। সৈন্যে
নাই যোগ্য সেনাপতি। জীর্ণ-দেহ-বুদ্ধি
অক্ষম পলিতকেশা বহুরণে যারা
দৈত্য, প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্যা করিল ধরারে।
নবীন সেনানী যত কেনে বেচে তারা
দানব-গৌরব, পটু উৎকোচ-বিদ্যায়,
নহে ব্যূহরচনায়, নহে সৈন্যযানে।
অতএব উঠি মোরা ভীম অভিযানে
ভাঙ্গি দৈত্যবল। তিন ভাগে বিরাজিবে
বিভক্ত যাদব শক্তি। তিন লক্ষ সৈন্য
মোরা। এক-লক্ষ-নেতা বিক্রান্ত সারণ
রক্ষিবে এ পুরী নিত্য। এক লক্ষ সেনা
আস্ফালিবে বলরাম যেন নগ্ন অসি
শত্রুমুখে আর্য্যাবর্ত্তে, সঙ্গে মহারথী
সমীক, সুধন্বা, সাম্ব, কঙ্ক, মহেষ্বাস,
অনাধৃষ্টি। দৈত্যভূমি যাবে এক লক্ষ
কৃষ্ণনীতা মহাচমূ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি,
অন্ধক, সমিতিঞ্জয়, চারুদেষ্ণ যোদ্ধা
কৃতবর্ম্মা উরুজিৎ সারণ সুমনা
অক্রুর, সুসেন, গদ। অর্দ্ধ-মাস-খাদ্য
নিবে সৈন্য তূর্ণচক্রে পথবাহী। আছে
মিত্ররাজ্য পথে, আছে ইন্দ্রপ্রস্থ, আছে

পাঞ্চাল। তিব্বত-রাজা খোরাক ও অশ্ব
দিবে যথা সাধ্যে। পরে পৃথু চীনদেশে
স্বচ্ছন্দে স্বগৃহে যথা এক কক্ষ হতে
যায় আর এক কক্ষে ধনবান গৃহী।
মধুর দানবদ্বীপে উতরিবে শেষে
বাহি অবিপন্ন পোতে শান্ত মহোদধি।"
উত্তর করিল বৃদ্ধ হৃদীক ভূপালে।
"উগ্রসেন সর্ব্বপূজ্য, নহে অসাধ্যেতে
মহারম্ভ শ্রেয়ঃ, ভাবি হিতার্থে জাতির
যুদ্ধ নিষেধিনু। তবে যদি জানে শৌরি
গূঢ় কথা অলক্ষ্যে বৃদ্ধজনের, সাধ্য
যদি এ দুষ্কর লক্ষ্য, রুধিব না তারে।
গোপ্তা যদু সন্ততির এক বাসুদেব শৌরি।"
উত্তর করিল উঠি কৃষ্ণ মহাযশা।
"মহাজ্ঞানী কৃতবর্ম্মা, মনীষী হৃদীক
হেরি চারিদিক জ্ঞানী সাহস আচরে।
প্রার্থনীয় মানবের শান্তি, কৃতবর্ম্মা,
মানি, কিন্তু নাই শান্তি মানবের ভাগ্যে।
ইচ্ছা করে কি কঙ্ক ভজিল অশান্তি
হৃদয়ে মানব? একান্ত সে ভজে শান্তি।
প্রবলা নিয়তি কিন্তু, কিন্তু হৃদি মাঝে
কি নিগূঢ়া মহাশক্তি ঠেলে মহাবলে
কর্ম্মে। প্রাণী মাত্র যে অলস ভীরু
অবহেলে, সে প্রেরণা নাই মুক্তি তার
ইহলোকে পরলোকে দুর্ব্বলের শ্রেয়ঃ
কোথা জগে। ঘৃণে জড় সৃষ্টি, দলে জীব
ইহকালে, পরকালে প্রত্যাখ্যানে সম্ভূ।
নাই আরোহণ যোগ সোপানে ভীরুর,
বিনা যোগে অবিধেয় সন্ন্যাস মানবে,
মিথ্যাচার মাত্র। দুই মার্গ মানবের

প্রচারে ব্রাহ্মণ ভ্রান্তলক্ষ্য করি লোকে।
শান্তি শান্তি বলে কেহ, শান্তি ভূমণ্ডলে,
একই আশ্রয় কর্ম্ম ঘোষায় অপরে।
কিন্তু যে প্রশংসে শান্তি শুনিবে না তারে,
মিথ্যা উক্তি, বলহীন করে প্রজাগণে।
কোথা শান্তি এই ভবে? ঈশ্বরেই শান্তি।
যতদিন ভবক্ষেত্রে বিচর, মানব,
কর্ম্ম কর সদা, খাট অতন্দ্রিত মনে
নিষ্কাম উদ্যোগে। সূর্য্য গগনে উদিয়া
কর্ম্ম করি অতন্দ্রিত ভুবন আলোকে, —
কর্ম্মবলে অহোরাত্রী বিধান করিয়া
চরাচর বন্ধু দিনকর মহাতেজী।
অতন্দ্রিত উদে চন্দ্র শীতল কিরণে,
অতন্দ্রিত ভাতে তারা অন্ধ নভস্তলে।
অতন্দ্রিত ছুটে বায়ু স্বেচ্ছায় ভ্রমিয়া
ঘোষমাণ মাতরিশ্বা অসীম আকাশে।
কর্ম্মবলে ভাতে স্বর্গে অসংখ্য দেবতা
কর্ম্মবলে সপ্ত ঋষি ভাতে অন্তরীক্ষে।
কর্ম্মবলে বহে পূতা তুষিতে মানবে
স্বাদু সুশীতল নীরে তরঙ্গিনী নদী।
ঘুরিয়া পৃথিবী দেবী অনাশ্রয় শূন্যে
কর্ম্মবলে নহে ক্লিষ্ট এ মহৎ ভারে।
কর্ম্মবলে সর্ব্বসুখ ত্যজিয়া বাসব
সমতা তিতিক্ষা ধর্ম্ম আচরিয়া তেজে
সুরেশ্বর আখণ্ডল দম্ভোলী নিক্ষেপী
দিগ্মণ্ডল নাদাইয়া গগন আলোকে,
বর্ষায় মেদিনীবক্ষে শস্যার্থে হিতৈষী।
কর্ম্মবলে ক্ষত্রধর্ম্ম ক্ষত্রিয় আচরে।
নিষ্কর্ম্মা বসিয়া গৃহে যে মানব ভাবে
শান্ত রব কোণে পড়ি, ক্ষমিবে অরাতি,

অতিভ্রান্ত সেই। বাঁচে যে বিঁধিল আগে
অরিবক্ষঃ। না আক্রমি মজিবে আক্রান্ত
প্রকৃতি নিয়ম জান তারে কে লংঘে।
কিন্তু কোথা স্থায়িত্ব মর্ত্ত্য ভূমণ্ডলে।
বাড়ে কেহ, কমে কেহ, নাহি রহে স্থায়ী।
অতএব যে না বাড়ে, কমিবে নিশ্চয়,
কৃতবর্ম্মা। ক্রূর শত্রু দাস তারে করি
খাটাবে বধিয়া শক্তি, ডুবাবে নিষ্ঠুর
সর্ব্বসুখ ক্রমে। প্রিয় ভার্য্যাপুত্র সঙ্গে
তুলিবে সলিল কুণ্ডে পরের সুখার্থে
বহিবে অভাগা ভাররাশি প্রভু অর্থে
চষিবে প্রিয় স্বক্ষেত্র। এর চেয়ে কহ
কি অসহ্য কি নিষ্ঠুর ভাগ্য ভূমণ্ডলে।
হত হবে পুত্রগণ রাজমার্গে, খড়্গ
না তুলিলে দাস। ভোগ্যা হবে ভগিনী ভার্য্যা
জেতার। হেরিবে সে স্বচক্ষে, না আক্রমিবে গোলাম ধর্ষকে।
কিন্তু বলে কেহ যার দয়াপূর্ণ উক্তি
পূজে অর্দ্ধ এই নরজাতি "পাপী অরিহন্তা অধীরে
পাপী যার হাত রক্তে কলুষিত রণে,
মারে যদি শত্রু, হেঁট মাথা কহ তারে
পুনঃ মার মোরে, বন্ধু। ইহা ধর্ম্ম ইহা
প্রিয় ঈশ্বরের।" হায় দয়াবান মনু,
মুখে বলে ইহা সত্য, কে আচরে কার্য্যে।
হে বিমূঢ় নরগণ, অভীপ্সিত যদি
নিরীহতা ঈশ্বরের, সর্ব্বজ্ঞ নিয়ন্তা
দাস হতে যদি সৃজে তেজস্বী মানবে
বাড়িত সুগুণ দাস্যে। বিপরীত ফল
ভবে কিন্তু হেরি। একদিনের দাসত্বে
মনুষ্যত্ব যায় চলি নিশ্চেষ্ট দাসের।
নিন্দাপ্রিয় মিথ্যাবাদী কাপুরুষ ধূর্ত্ত

সর্ব্বদোষ জন্মে ক্রমে। বিষ্ঠার কৃমি
বিষ্ঠা ভালবাসে। ইষ্টদেব করি দেহে
সুখস্বার্থ খুঁজে সদা। একতা, সর্ব্বোচ্চ
মনুষ্যত্ব যাহা মর্ত্ত্যে, মজে সেই পঙ্কে।
বিরল প্রতিভা জন্মে দাসীভূত দেশে
নিরীহ না ভুঞ্জে কভু মহত্ত্ব। সুপ্রিয়
নহে ঈশ্বরের কভু দাসত্বে নির্বৃতি।
কর্ম্মলোভী উচ্চমনা মহত্ত্ব প্রয়াসী
সৃজিল নিয়ন্তা নরে। উঠ, কৃতবর্ম্মা,
আর একবার যুদ্ধে পশি দোঁহে, রণসখা,
সহায় বিজয়ে তীব্র তেজস্বিতা যুদ্ধে
দর্শাও, সাহসী যোদ্ধা কে নেতা জাতির
বৃথা কেন সে বিবাদে। মহাযশ নেতা
যাদবের, ধর্ম্ম নেতা মন্ত্রণে আহবে।
বহুদিন শান্তি পুরে বিরাজিল। পুনঃ
সুমহৎ দেবকর্ম্ম ডাকিল সমরে
বহুল-আয়াসী জাতি। নিরস আলস্যে
নিষ্কর্ম্মা পচিতে আর্য্য জনমে না কভু
যতক্ষণ আলো নেত্রে, কর্ম্ম করি মোরা।
রজনী আসিছে শীঘ্র, প্রগাঢ় নিদ্রায়
বিশ্রাম লভিব পড়ি জননীর কোলে।”
কহিল মাধব। পৃথুচারী মহানাদে
বাখানিল কৃষ্ণ উক্তি সৌরসেন সভা
সমর উল্লাসে। উঠে আনকদুন্দুভি
শূরপুত্র মহারথী যদুসভাগৃহে।
“উগ্রসেন যদুরাজা, গ্রহিয়াছে উক্তি
সৌরসেন রথীগণ সম্পূর্ণ সভায়।
দাও অনুমতি, নৃপ, যুদ্ধার্থে রথীরা
প্রণমি বিদায় নিবে পিতৃগণপাদে।
যাও, যুবা; উচ্চশির মাতার চরণে

কহ রাখি আশিস, জননী যাব যুদ্ধে
হাসি মুখে অনুজ্ঞাপ, স্বদেশ কল্যাণ
সাধিতে স্বরক্তে। যাও প্রৌঢ় মহারথী,
বাল্যের সঙ্গিনী, যৌবনের সখী গৃহে
অমাত্য প্রৌঢ়াবস্থায়, কহ হাত ধরি
'যাইব, জীবিত মম, দূরদেশ যুদ্ধে।
লভ যদি রণে গতি; প্রশান্ত মানসে
রহ গৃহে, পুত্রগণে পাল, আমাদের
সে প্রণয় অনশ্বর, সান্ত্বন বৃদ্ধ মাতারে;
পিতৃমুখ স্মরি সদা; পিতৃপদ চিহ্ন
শিখাও অনুসরিতে যাদব সন্ততি।
ইন্দ্রসিংহাসন রশ্মি-দ্যোতিত নন্দনে
হইবে সাক্ষাৎ পুনঃ, বীরজায়া দেবী।'
আনন্দের দিন আজি দ্বারিকা নগরে
ধর্ম্মযুদ্ধে যাইবে রথীরা। উঠ, নৃপ
প্রতীক্ষা করিছে আজ্ঞা সৌরসেন-জাতি।''
উঠিল স্থবির যেন পর্ব্বত সভাতে
উগ্রসেন মহাকায়। শত-যুদ্ধ-সঙ্গী
ভীম অসি উলঙ্গিয়া ফেলিল ভূতলে।
ঝন্ঝনিল বিখ্যাত অস্ত্র যেন হর্ষে। ঘোষি
উঠিল যাদব সভা উরু সিংহনাদে
যুদ্ধ যুদ্ধ হুংকারিল যাদব মাতিয়া,
বাজাইয়া অসি কোশে। অস্ত্র ঝঞ্চনাটে
হর ববম্বম-রোলে পূরিল নগরী,
শিহরিল আকাশ আর্য্যের সিংহনাদে।
উঠিছে উদ্ধব মন্ত্রী, উঠিছে হৃদীক,
কৃষ্ণ বলরাম গদ, উঠিছে সাত্যকি।
ভাঙ্গিল মহতী সভা দ্বারিকা নগরে।

ইতি উষাহরণকাব্যে সভানাম অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

ছিন্নাংশ

ভগবান সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়, সচ্চিদানন্দই সনাতন সত্তার সনাতন সত্য, সচ্চিদানন্দই জগতের উৎস, জগতের কারণ, জগতের প্রকৃত স্বভাব, গুপ্ত অর্থ...।

*

নিখিল অধ্যাত্ম সত্যের সূর্য্যকিরণস্বরূপ মহীয়সী শ্রুতি উপনিষদই আদি পরিপূর্ণ প্রকৃত বেদান্ত। যে প্রসিদ্ধ দর্শন সেই নামে জ্ঞাত, সেটা এই মহীয়ান বেদান্তের একদিক মাত্র লইয়া রচিত, মনুষ্য বুদ্ধির নির্ম্মিত, বুদ্ধির অন্ধকারে রত্নস্বরূপ[১] বেদান্তদর্শন দর্শন হিসেবে একটী মহামূল্য সৃষ্টি, তথাপি দর্শনই আদি আসল বেদান্ত নয়। সূর্য্য যদি উদয় হয়, প্রদীপের আর প্রয়োজন নাই, উপকারিতাও নাই।

*

মায়া প্রকৃতি শক্তি লীলা

মায়া, মায়া অনবরত বল। এই মায়া কি — তাহা একবার তলাইয়া অবধারণ করিবার চেষ্টা করিবে কি? কথার দাস আমরা অধ্যাত্মবাদের বুলি শেখা টিয়াপাখী, একবার মনুষ্যের স্বাধীন বুদ্ধিতে শেখা শব্দের পিছনে আসল বস্তুটী কি, দর্শনের কথার কাটাকাটি ত্যাগ করিয়া প্রকৃত অনুভূতি কি তাহা একবার তলাইয়া দেখা ভাল।

তোমরা বল, জগৎ মায়া, যাহা মায়াপ্রসূত তাহা অলীক, তাহার সত্য বাস্তবিকতা নাই। জগৎ যদুকরের ভেল্কী, জগৎ বিকৃত মস্তিষ্কের দুঃস্বপ্ন।

*

মনুষ্য জন্মের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি, মনুষ্যের চরম উন্নতি কিসেতে সিদ্ধ হয়, কেন ভগবান এইরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া অনন্তকাল ব্যাপিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন এই হইল প্রশ্ন। উত্তর — জগৎ ভগবানের নানারূপ আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র, সেই আনন্দই জগতের হেতু। এই আত্মবিকাশ জগতে পৃথিবীতে ক্রমবিকাশ রূপ ধারণ করে, মনুষ্যজীবন সেই ক্রমবিকাশের কেন্দ্র ও যন্ত্র, ইহাই মনুষ্য

[১] অনিশ্চিত পাঠ

জন্মের অর্থ ও উদ্দেশ্য। আত্মবান হওয়া, ভগবানকে পাওয়া ও নিজের ভিতরের লুক্কায়িত দেবত্ব প্রকাশ, মনুষ্যের চরম সিদ্ধির পন্থা। আবার এই তিনটী এক সূত্রে গ্রথিত, মনুষ্যের মন-প্রাণ-শরীরে ভগবানের আত্মবিকাশের ত্রিবিধ তথ্য। যে মানুষ আত্মবান হয়নি, সে ভগবানকে পায়না, যে ভগবানকে পায়নি তার পক্ষে নিজের ভিতরের দেবত্ব প্রকাশ করার দুরাকাঙ্ক্ষা আকাশকুসুম ফোটানোর কল্পনা মাত্র।

*

অশ্ব আহত, স্বয়ং আহত, শরীর অবসন্ন, স্বেদসিক্ত লাগাম রক্তাক্ত কলেবর — গারিবাল্ডীয় সৈনিক লুচিয়ো কল মন্তে চেল্‌সোর বৃক্ষরাজী সঙ্কুল বায়ুসেবিত শিখরে দ্রুতগতি থামাইয়া একবার পশ্চাদ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যে অস্ত্রিয় অশ্বারোহীগণ সকাল হইতে তাহার পশ্চাৎ ধরিয়াছিল, উপত্যকার পর-পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের গায়ে তাহাদের সবুজ পোষাক সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল করিতেছে, তাহারা উপত্যকায় নামিতেছে মাত্র। সেই ঘৃণিত সবুজ সাজের দর্শনে কলন্নার অবসন্ন নেত্রদ্বয়ে বিদ্বেষের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সজোরে সরোষে জিনে তাহার বদ্ধমুষ্টি মারিল, যেন নিপাতিত শত্রুর গায়ে খড়্গ হানিতেছে। তাহার পরে চক্ষু তুলিয়া যে পর্ব্বতশিখরে সুদূরে স্বাধীন সানমারীনোর শ্বেত হর্ম্ম্যগুলি দেখা দেয় -— যেন ইতালীর স্বাধীনতাধ্বজা ইতালীর সুনীল আকাশে উড্ডীয়মান, যেন জন্মভূমির শেষ স্বাধীনতাচিহ্ন প্রজাতন্ত্রী সানমারীনো মাৎঝিনির শিষ্য গারিবাল্ডির সৈনিক পরাজিত স্বাধীনতা প্রয়াসীকে ডাকিতে চায়, কোলে টানিতে চায়, — সেই পবিত্র পর্ব্বতের দিকে চাহিল, দীর্ঘকাল সতৃষ্ণ দৃষ্টি সেই শ্বেত হর্ম্ম্যগুলির উপর আবদ্ধ রহিল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কলন্না মুখ ফিরাইয়া সানমারীনোর কাছে জীবনের আশার কাছে চিরবিদায় লইল। ঘোড়া আবার চলিতে লাগিল। ক্ষতস্থানের রক্তস্রোতে শেষ প্রাণবায়ু নির্গত হইতেছে, অথচ প্রভুর ঋণ শোধ করিতে লুচিয়ো কলন্নার প্রিয় ভগিনীর আদর ও সকালবেলা ও সন্ধ্যাবেলায় চিরপ্রদত্ত চিনির গোলাকে স্মরণ করিয়া তেজস্বী আবার সবেগে চলিল। সেই ভগিনী আজ রোম নগরীতে একটী উচ্চ প্রাসাদের... জানালায় বসিয়া রোমান্যার দিকে চাহিতেছে। রোমে শরীর, মন কিন্তু বিপন্ন ভায়ের সঙ্গী হইয়া পর্ব্বতে জঙ্গলে ঘোরে, আর দিনে দুইবেলা ভগবানের সিংহাসনতলে করুণস্বরে ভায়ের প্রাণভিক্ষা চায়। হায় প্রভুভক্ত, তার দ্রুতগতি হইতে অদৃষ্টের গতি দ্রুততর।

পনর মিনিট পর ঘোড়া পর্ব্বত তলে পহুঁচে কিন্তু তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন নিঃশ্বাস, মন্দীভূতগতি ও অদৃঢ় পদনিক্ষেপে কলন্না বুঝিতে পারিল তাহার বিশ্বাসী ভৃত্যের আয়ু এই মুহূর্ত্তে শেষ হইল, ইহার মধ্যে শত্রু মন্তে চেল্‌সোর ওই পারে উঠিতেছে, আর পালাইবার উপায় নাই, তিনি চারিদিকে চাহিলেন। পথের দুইধারে শিলাখণ্ড ...

[একটি বিক্ষিপ্ত অংশ]

"জয় জননী ইতালিয়া!" ইতালীর স্বাধীনতার সিংহনাদ স্বরূপ মন্তে চেল্‌সোর শৈলপ্রস্থতা প্রতিধ্বনি ভীমকণ্ঠে উত্তর করিল, "জয় জননী ইতালিয়া!"

*

করোতোয়ার বর্ণনা

বঙ্গদেশের পশ্চিমপ্রান্তস্থ পর্ব্বতপ্রদেশে দুইটি নিবিড়বনাবৃত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থানীয় উপত্যকায় ক্ষিপ্রগামিনী বহুকলকলস্বরমুখরিতা করোতোয়া নদী ক্ষুদ্র চঞ্চলগতি বালিকার ন্যায় হেলিতে দুলিতে হাসিতে খেলিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। এই উপলে উঠিয়া বসিল, এই এক লম্ফে নামিল, এই তটস্থ বৃক্ষের শ্যামচরণে চড় মারিয়া পালাইল, এইরূপ অশেষ বাল্যসুলভ ক্রীড়া কৌতুকের পরে শেষে যেন দূরে জননীর মধুর আবাহন শুনিল। হঠাৎ উপত্যকা হইতে নিঃসরণ করিয়া মা গঙ্গার পবিত্র স্নেহময় ক্রোড়ের উদ্দেশ্যে গাইতে গাইতে ছুটিয়া যায়।

করোতোয়ার উপত্যকা অনেক পরিমাণে নিকটবর্ত্তী সমান ভূমি হইতে স্বতন্ত্র জগৎ বলা যায়। উচ্চ পর্ব্বতপ্রাচীরে আবদ্ধ প্রকৃতির নির্ঝর সংযুক্ত[১] রমণীয় ক্রীড়াস্থল, পবনপূত স্বচ্ছসলিলসিক্ত পূজা গৃহ। বিলম্বে সূর্য্যোদয়, অকালে অস্ত। অতিদীর্ঘ প্রভাতকালে জগতের যুগব্যাপী আবির্ভাব, অতিদীর্ঘ গোধূলিসময় সেই বৃদ্ধ যোগমগ্ন জগতের যুগব্যাপী শান্ত অবসান যেন প্রতিদিন উপলব্ধি হয়। অহোরাত্রী বনের উচ্ছ্বাসমর্ম্মরপূর্ণ হরিতপত্রনিবিড় অন্তঃস্থলে পবনের গম্ভীর মহৎ-শান্তভাবাত্মক অবিরাম ব্রহ্মগাথা, অহোরাত্রী নিম্নভূমির স্বচ্ছ উপলে নির্ঝরিণীর

[১] অনিশ্চিত পাঠ

মর্ম্মব্যাপী অথচ স্নিগ্ধ সুখকর নিনাদ, অহোরাত্র উপত্যকার মধ্যভাগে করোতোয়ার মৃদুতরঙ্গসঙ্কুল বিশ্রামহীন হাসিখেলা। উপত্যকার জীবন শব্দময় অথচ কোলাহল নাই। সেই উচ্চ অচল পর্ব্বতশ্রেণী ও নিবিড় রহস্যধ্যানমগ্ন বনরাজীর গাম্ভীর্য্য চঞ্চল সলিল ও মুখর পবনকেও মহৎ শান্তিতে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে। এই স্থানের রমণীয়তায় জীবনমুক্ত চরিত্রের সুন্দর আদর্শ প্রতিফলিত। বাহিরে সংসারের চঞ্চলতা হাসিকান্না খেলা প্রেম কলহ পুনর্ম্মিলন ভিতরে শুদ্ধ গম্ভীর ঈশ্বরধ্যান নিরপেক্ষ প্রাণীহিতকামনা চিত্তপ্রসাদ সমতা ও অচল অদ্বৈতভাব।

*

অরুণকুমারীর হরণ

রাজকন্যার হাতী মন্দির হইতে বাহির হইতে লাগিল। চারিদিকে অশ্বারোহী সৈন্যের তেজস্বী অশ্ববৃন্দ বিলম্বে অধীর হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিল। গর্ব্বসার[১] লৌহকঠিন অশ্বক্ষুরধ্বনি মন্দির প্রাঙ্গণের পাষাণময় ভূমির উপর নিনাদিত হইল। তূরীরব নির্গমন ঘোষণা করিল।

রাজমার্গে মুখর জনতার অযুতস্বরঘন বিরামহীন সীমাহীন কোলাহল কর্ণ বধির করে। চক্ষুর অমাপ্য লোকসাগর, — মহাসাগরের ন্যায় সহস্রতরঙ্গজাত অসীম কল্লোল, মহাসাগরের ন্যায় সহস্রতরঙ্গ-চূড়া-ধবল উরুচারী হিল্লোল। ভীড় অভেদ্য, হস্তী চলিতে পারে না। অশ্বারোহীগণ জনতাকে সরাইতে সরাইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, যাহারা হাতীর কাছে রহিল, তাহাদেরও মাহুত ইঙ্গিত করিয়া এইদিকে ওইদিকে পাঠায়। রাজকন্যার হস্তী...

*

আলাপন

রাজা: কি ভীষণ বন্য স্থলে, কি বিজন দেশে
করেছি নিবাস! আছি কঠোর বিধানে
স্বদেশের মায়া ত্যজি, প্রিয়জন মুখ
হেরিতে নিষিদ্ধ। সত্য তবে এ জগৎ

[১] অনিশ্চিত পাঠ

কার খেলা, চক্ষে যার নিয়ম-বন্ধন
খেয়ালের প্রতিকৃতি মাত্র তার। সত্য
কাহার ইঙ্গিতে মোরা মায়াবৃতি দৃষ্টি
ঘুরি মায়াবদ্ধ ক্ষেত্রে কৃত্রিম ধরায়
ঝলসে মায়ার পুরী, তিমিরের রশ্মি
আলোক জ্ঞানীর জ্ঞান স্বপ্নের শৃঙ্খলা,
নিবিড় অরণ্যভূমি পার্থিব জীবন
চিন্তারাজী উড়ে যেথা জোনাকীর মতো
অন্ধকারে। তবে চেয়েছিনু বৃথা মোরা
তব যুদ্ধ বিজিতের নিরাশ জল্পনা —
এই উক্তি, দুর্ব্বলের বিলাপ কেবল।
দেখি সত্য সে বিলাপ, চরম দর্শন।
যাও তবে সুখ স্বপ্ন, এস তবে দুঃখ,
অজেয় শিক্ষক তুমি, জ্ঞানের সোদর।
তুমি মহামায়া গর্ব্ভে অগ্রজ তাহার।
এস, আলিঙ্গন করি মোরে, অল্পদিন
মোর সঙ্গে করি খেলা এ বিজন বনে
সমুচিত ক্রীড়াভূমি তব দুঃখ। ব্যর্থ
নৃত্য করে জীব লয়ে অল্পায়ু দম্পতি
দুঃখ, সুখ। নৃত্য থামাইবে মৃত্যু আসি।

পুরোহিতঃ ভব যুদ্ধে পরাজিত এ মুহূর্ত্তে তুমি,
হে রাজন। তপ্ত বুকে নিরাশার বাণী,
দুঃখের ক্রন্দন কণ্ঠে নহে ব্রহ্মজ্ঞান।
অন্য সেই বিদ্যা, দুর্ব্বলের আশাতীত
বীরলভ্য মহাবস্তু — নিহিত গুহায়।
সত্য এই কথা, নৃত্য পার্থিব জীবন।
কার নৃত্য? জনার্দ্দন সেই নটরাজ।
দুঃখ নহে, তারে আলিঙ্গন কর, রাজা,
তারে লয়ে রণে রণে তাণ্ডবে মাতাও
আনন্দী আত্মায় দেহে। জয় পরাজয়

অরণ্য নগর ক্ষেত্র নাচের বিচিত্র
চরণ বিক্ষেপ মাত্র নানা দৃশ্যপট,
নৃত্যের শোভায় রাখা, রাজ নাট্যাঙ্গনে।
রাজা: মুখের কথায় কর সান্ত্বনা আমায়,
জানে প্রাণ নিজ দুঃখ। নারায়ণ নৃত্য?
রাক্ষসী প্রকৃতি নৃত্য মায়া-অন্তঃপুরে,
রাক্ষস-বালার খেলায় গড়ে ভাঙ্গে নিত্য
জীবন্ত পুতুল, ফেটেছে হৃদয় দেখি
হাসে হৃষ্ট কুতূহলে। মায়া সত্য,
সত্য এ বিজন স্থান, সত্য পরাজয়,
সত্য দুঃখ। নহে সুখ সত্য এ ধরায়,
নহে সত্য রাজ্য? সত্য শাস্তি অজ্ঞানের,
নহে প্রেম সত্য ক্রন্দন ভরা জগতে।
পুরোহিত: তোর তরে দুঃখ হৃদে, লোটাও কাদায়
খোঁজ বিষে দুঃখকর্ম্ম দুঃখসার। শেষে
চিনিবে আনন্দময় প্রেমময় কৃষ্ণ।
মহাপ্রেমিকের খেলা জীবন ধরায়।
রাজা: যে প্রেম চুম্বন করে অশনির মুখে,
যে প্রেম রোগ যন্ত্রণায় দহে সর্ব্বকাল,
যে প্রেমের ছদ্মবেশ দুঃখ, দ্বেষ, মৃত্যু,
ঘৃণাসম[১] সে প্রেম। আছে দয়া নরচিত্তে,
নহে কৃপাময় সৃষ্টি, প্রকৃতি, ঈশ্বর।
নিজ দয়া প্রতিমূর্ত্তি, অলীক প্রতিমা,
গড়িয়া মানব নিজচিত্তে। সেই ছায়া
ভগবান বলে পূজা করে।
আছে ব্রহ্ম। ভগবান কল্পনা স্বপ্নে অন্য স্বপ্ন
দুঃখীর সৃষ্ট মিথ্যা প্রতিকার।
পুরোহিত: তোমার, রাজা, কৃষ্ণলীলা দেখি'

[১] অনিশ্চিত পাঠ

রোমাঞ্চিত হয় দেহ শুনি' রাধা মুখে
প্রণয়িনী তিরস্কার, তব কথাচ্ছলে।
দেখিব না মুখ তার, শুনিব না নাম
আছে বলে জানিব না তারে আর। হেন
উক্তি জননীর মুখে নাস্তিক-জল্পনা
বুঝি আমি। বলি তবে, নহে এ সান্ত্বনা
বৃথা, নৃপ। দেখিবে দেখিবে কৃষ্ণ মোর
প্রকাশিত হবে পুনঃ কানু বেশে।
...
খেলানা আমার। কেড়েছি দিয়েছি পুনঃ
শেখাবারে শুধু তোরে প্রভু আমি তোর।

রাজা: আস্থা নাই মম প্রাণে শূন্য এ কথায়।
বৃথা বাক্যচ্ছটা সৃজে মানবের বুদ্ধি
ধাঁধাতে নিজ নয়ন। ছাড় এই কথা।

পুরোহিত: ছাড়িলাম, তবে রেখো মান, মহারাজ
বৈষ্ণবের উক্তি।

রাজা: বৃথা এই সম্বোধন।
... রাজা এ অটবীর, নহি আমি, রাজা
ভিক্ষুকে বনদেবতা অল্প ফলমূল
ছাড়ে ক্ষুধানিবারণ। ভ্রমি প্রাণভয়ে
সৈন্যহীন পরিজনত্যক্ত। পরিহাস
বাজে কানে নৃপ নাই। কে রাজা বিপদে
ত্যাজ্য সুহৃদের, কেবা প্রজা এ বিজনে।

পুরোহিত: আছে প্রজা, আছি মোরা। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র
রাজা তুমি পিতা মোর অন্য সম্বোধন
শুনিবে না মোর মুখে বনে বা নগরে।

[পূর্ব্ববর্তী অংশটির দ্বিতীয় রূপায়ণ]

রাজা: এই ভীম রম্যস্থলে এই বন্য দেশে
স্বদেশ-মমতা ত্যজি, প্রিয়জন-মুখ

হেরিতে নিষিদ্ধ, ব্যাঘ্র সিংহ সেব্য ক্রূর
প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ে নিবাস এখন।
লীলাপ্রিয় লীলাময়, বিধান তোমার।
বিভব মুকুট রাজ্য ক্রীড়নক তব।
রত্নময় যে মুকুট বিভবের ছায়া,
অল্পস্থলে সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ছটী যার,
ক্রীড়াপ্রিয় করে রাখি মানুষের শিরে
হাসিয়া নিরখ মুখে, কাল অকস্মাৎ
অলক্ষিত পদে এসে কেড়ে নিবে তুমি।
হাসিয়া তাড়াও বনে পেয়ে অন্তরালে,
যাও অন্তরালে, কেহ দেখে না বালকে।
যেই দিন বুঝি শেষে খেলাধূলো সব,
খেলার সামগ্রী রাজ্য মুকুট বিভব
জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ নিয়ম ক্রীড়ার,
ফুটে চোখ সেই দিনে, কাণে শুনি স্বর,
দেখা দাও, সুদর্শন, বিশ্বক্রীড়া গৃহে।

পুরোহিতঃ কিন্তু এই ক্রীড়াচ্ছলে ভুলিয়ো না কভু,
মহারাজ, অনন্ত জ্ঞানীর লুক্কায়িত
গভীর অনন্ত প্রেম। সান্ত-জ্ঞানী মোরা
ধরিতে না পারি তাহা। নহে অন্ধ খেলা
নহে অর্থশূন্য বালকের মত্ত পরিহাস
এই বিশ্ব। গূঢ় কিছু নিহিত সর্ব্বত্র,
ক্রীড়ার মহৎ তত্ত্ব। খুঁজ পন্থা সদা,
মহারাজ, না বুঝিলে জান আছে গূঢ়
অন্ধ মোরা।

রাজাঃ 'মহারাজ', এই সম্বোধন
সাজে না শত্রুলাঞ্ছিত পরিজনহীন
নির্ব্বাসিত জনে। পরিহাস মত লাগে
পশি কাণে।

কুমারঃ মহারাজ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা

তুমি পিতা, রাজ্যে বনে। বধ্য মোর সেই,
তোমারে যে অবহেলে। পুরাতন রাজ্যে
চিরসম্মানিত বংশে অভিষিক্ত তুমি।
নহে বাহ্য রাজলক্ষ্মী, নহে পরিজন
সে রাজার রাজ্য-সার। ভিতরে যে লক্ষ্মী,
ভিতরে অজেয় প্রাণ পরিজন তার।

পুরোহিতঃ সত্য কথা বলেছ রাজকুমার তুমি,
অভিমন্যু।

রাজাঃ সত্যকথা! এই বিজন বনে
পাঠাইয়া নারায়ণ ফুটায়েছে চোখ।
ভুলাও না মোরে। পুণ্যনদী তীর্থস্থলে
নেবেছে শার্দ্দুলরাজ নিদাঘ-তৃষ্ণায়।
শুনিয়া গর্জ্জন তার, বলেছি, হে নৃপ
শুন চাটুকার স্তব নহে এই ধ্বনি
নাব, সম্বোধন কর এরে, যদি দেখে
উচিত সম্মান করে। ঝঞ্ঝাবায়ুক্লিষ্ট
যবে এ রাজশরীর, ভাবি, জ্ঞানস্পর্শ
ইহা নৃপ। শুন, নীরব এ উপদেশ।
যবে নৃত্য করে চুপে মৃত্যুর নর্ত্তকী
সমুজ্জ্বল নগ্নকান্তি ভৈরবী আকাশে,
বাহিরিছে ঈশ্বরের অরণ্য-প্রাসাদে
ঈশ্বরের প্রতিহারী, ভীমা সৌদামিনী,
আগন্তুক দর্শনার্থে, বুঝি বৃষ ঘোষ
সামগায়ী বজ্রের। মায়া ত্যজ,
বুঝ মহৎবাসী সব, খেলাধূলো কর্ম্ম
প্রফুল্ল বালক তিনি, বালক সকলে।
মল্লযুদ্ধ প্রেমক্রীড়া কর অনিবার,
পণ্যখেলা, — পীত শ্বেত মাটি উপার্জ্জন
যুবা কর[১] বালকমতি, জিতি হাস সুখে,

[১] অনিশ্চিত পাঠ

ক্রোধ কর হারি[১]। বাহ্যবস্তু স্বপ্নতুল্য
নহে ভিতরের ধন রাজ্য, অভিমন্যু,
বৃথা মায়া পক্ষপাতে ভুলাও না কভু।

পুরোহিত: ক্রীড়া যদি, সে অনন্ত প্রেমিকের সনে
ক্রীড়া কর তবে।

রাজা: প্রেমিকের পুরোহিত,
যে প্রেম চুম্বন করে অশনির মুখে,
যে প্রেম রোগ যন্ত্রণায় পোড়ায় এ দেহ,
যে প্রেমের মৃত্যুরূপে তীব্র দুঃখ বাজে
ছদ্মবেশপ্রিয়, দুর্ব্বোধ্য সে মানবের।
রুদ্ররূপ এ খেলায় বুঝেছে ক'জনে?

পুরোহিত: তবে খেলা করে। ছাড়ে না, ধরিয়া জোরে
শিথিল করে না মুষ্টি।

রাজা: জ্বালাতন করে
প্রেমিকা প্রেমিকে, তবে শেষে দেয় সুখ
অর্দ্ধবক্র গ্রীবা নুয়ে, পরাঙ্মুখ ছলে,
যেন বলে নিরুপায়, যেন শ্রান্ত যুদ্ধে,
স্বর্গতুল্য আনন্দের কণা মধু স্বপ্নে।

পুরোহিত: সত্য মহারাজ। ছাড় কেন আশা তুমি।

রাজা: হায় পুরোহিত, দুষ্ট ক্রীড়া রসে দেবী
নিজের বদলে দেয় সখীর অধর,
সাজাইয়া নিজ বস্ত্রে মুখে বস্ত্র টানি'।
জানিয়া অধর পানে তাহার মত্ত হতে পারি?

পুরোহিত: সখী দেবী একই, ক্রীড়া তাঁহার ইচ্ছায়
ক্রীড়ায় সম্মতি দেবী[১] যাহা ভালবাসে।

রাজা: করি তাহা। দিল রাজ্য, বসাইল উচ্চে,
বসিনু সম্রাট হয়ে। তাড়ায়েছে বনে,
বনচর সাজি সুখে।

কুমার: পুতুলের ক্রীড়া

[১] অনিশ্চিত পাঠ

ভালবাসে কি ঈশ্বর, নহে পুরুষার্থ।
কুরুক্ষেত্রে জনার্দ্দন। বিকল্পে সারথি।
বীরের ক্রীড়ার সাথী, নৃত্য রণস্থলে।
পুরোহিতঃ ক্রীড়া যদি, মহারাজ, ভালমন্দ খেলি
পরিণাম জেতা হারা। মধ্যস্থ মাধব,
যোগ্যের সারথি কিম্বা, ফলদায়ী ভবে।
রাজাঃ বৃথা কথা কহি মোরা। ধন নাই, নাই
সৈন্য, নাই মিত্রবল, কোথায় সে আশা।
পুরোহিতঃ দৃঢ় বুকে, শান্ত মনে, সুযোগ দর্শনে
রহ হয়ে তৎপর। লীলায় মুহূর্ত্তে
রাজ্যচ্যুত করিয়াছে আশাতীত ধ্বংসে,
লীলায় মুহূর্ত্তে পুনঃ আশাতীত ভাগ্য
বসাইতে পারে রাজ্যে বৃহৎ প্রকাশে।
খেলিতে খেলিতে যেন সুতুচ্ছ উপায়ে।
কুমারঃ শোন বৃক্ষরাজ মহাকায় বন্যসখা
আশ্রিত-বৎসল। উন্নত শাখা সহস্রে
অসংখ্য খেচরবাসী, মধু কোলাহলে
যায় দুই সন্ধ্যা তব বাৎসল্য আনন্দে।
কীটগণ তার ছালে ছিঁড়ে করে বাসা
সহস্রে সহস্রে। সেই অত্যাচার তুমি
সহ্য কর প্রীত হাস্যে। বিস্তৃত ছায়ায়
আবরি বিশ্রান্ত প্রাণী স্নেহ আলিঙ্গনে
বসাও শীতল ক্রোড়ে। ছদ্মবেশে বুঝি
ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি তুমি বৃক্ষরাজ।
ঐশী এ প্রকৃতি তব। আমিও আসিয়া
একাকী ধরায় ঘুরি আশ্রয়ে তোমার
লভি শান্তি। অবশে প্রাণ ক্ষুণ্ণ হেথা
বিশ্বস্ত বন্ধুর কানে গুপ্ত ভাব বলি।
নাই মিত্র বন্ধু সখা। পিতা মোর সদা
কর্ম্মে পরাঙ্মুখ, ভাবপ্রিয় মায়াজ্ঞানী।

চিন্তাশীল পুরোহিত, মস্তিষ্ক উর্ব্বর
অনুর্ব্বর প্রাণভাবে, কর্ম্মে শুষ্ক কথা[১]
যেই অল্প অনুর্ব্বর স্বার্থ ত্যজি আসে
এ বিজন বনে অল্পবুদ্ধি শুদ্ধ প্রাণ
জানে সেবা, যুদ্ধ, অন্য কিছু নাহি জানে।
আসিয়া এ স্থানে লভি প্রকৃতির সঙ্গ
অসংখ্য অরূপ সাথী খেলে মম চিত্তে।
নদী বলে গুহ্য কথা, বায়ুর নির্ঘোষ
তব অগণন পত্রে খেলে যেন ছন্দ
মম অন্তরের সঙ্গে। বিশাল স্বভাব
এ বিশ্বর, কে যেন একাকী মম তুল্য
অনিরুদ্ধ বীরপ্রাণ চায় কর্ম্ম যুদ্ধ
তিনি সৃজেছেন এ বিশ্ব যেই আনন্দ আশায়
যুদ্ধের নিয়ম সেথা করেছে বিধান
চেতনে ও অচেতনে। নাই দ্বেষ হিংসা
সে বিশাল প্রাণে। পবিত্র এ যুদ্ধস্পৃহা
করে যেন মল্লযুদ্ধ বন্ধুরা সপ্রেমে।
শোন বৃক্ষ তার সঙ্গে করিয়াছি আজি
কি নীরব পরামর্শ। বসিব না আর
এই বনে, এই আলস্যে, গুহায়, কুটীরে।
বসিবা না আর তব ছায়ায় হে সখা।
অদৃশ্য সারথি চিত্তে চালায় সজোরে
জগতের পানে, যেথা মনুষ্য সংঘর্ষ
এ বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে। রাজ্য কীর্ত্তি মৃত্যু
জানি না কি লুক্কায়িত রেখেছে হাসিয়া
নীল গগন প্রান্তের ওই পাশে। যাব
খুঁজিবারে। বৃক্ষ! বন্ধুবৃন্দ, সৈন্যবল
দৈবাৎ নীরবে বসে অপেক্ষায় মম
সে অসীম সুনীল জগতে। হয় একা

[১] অনিশ্চিত পাঠ

শত্রু অন্তঃপুরে পশি — কেন বলি একা
আছে অসি করে, আছে হৃদয়ে মুরারী
জননীর দাস্য ঘুচাইব, তেজ ধ্বংসী
অপূর্ব্ব কলঙ্ক মোর। নয় মৃত্যু পান
শত্রুর অসি প্রমাদে, লুক্কান কৃষ্ণের
হাসিয়া প্রস্থান। বিদায় লইনু বৃক্ষ।
জননীরে লয়ে যদি আসি প্রীত পাদে
তবে দেখা, নচেৎ বিদায় চিরতরে।

সুবল্যু-পুলস্ত্য

[এই নাটকটির কতকগুলি বিক্ষিপ্ত অংশ মাত্র পাওয়া যায়।]

প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

পু — রবিপুত্র জ্যোতিষ্মান, সুবল্যু অসুর,
ত্রিলোক-সম্রাট আজি। ইচ্ছা কি রহিতে
সেই পদে, রাজা — কিম্বা ব্রহ্ম-অভিশাপে
নেহারিতে অন্ধকার গভীর পাতাল
বৈতরণী-তপ্তশ্বাস বহিতে কপালে
বাসনা তোমার।
সু — ঋষি, কেন এই ক্রোধ?
কিসেতে সন্তোষ তব হইবে, ব্রাহ্মণ?
পু — ধর্ম্মপ্রার্থী আমি তব সিংহাসন তলে, —
রাজধর্ম্মে রাজ্যরক্ষা, ধর্ম্মবল সার
কর রাজধর্ম্ম, রাজা।
সু — ধর্ম্মবল সার
জানি আমি — ধর্ম্মবলে ত্রিলোকসম্রাট
হইনু হে বিপ্র, নহি আমি ক্ষুদ্র দেব,
আনন্দের দাস, অবিচারে বিশ্বভোগ
করি না — জানাও বাঞ্ছা, পুরাইব, ঋষি

যত তব অভিলাষ।

*

যবে প্রজাপতি উড়ে, উড়ে মম প্রাণ
তার সাথী। পুষ্প দেখি পুষ্প হই বৃন্তে —
ঝুলি বৃক্ষে সূর্য্য স্পর্শ লভি মুদি আঁখি,
বিপন্ন বর্ষার ক্লেদে হাসি ধৌতশির।

*

দেবের নন্দন মোরা আনন্দ বিহ্বল,
নন্দনবিহারী মোরা পুষ্পসহচর —
লীলা জানি, আনন্দেই জানি দৈত্যরাজ;
জানি না কঠিন এ তপস্যা তব।

*

নারদ

অনুচিত গুরুদণ্ড অল্প অপরাধে।

সুবল্যু

অনুচিত! দেখ নাই অল্প বীজ হতে
উচ্চ বৃক্ষ অধিষ্ঠান? একই স্ফুলিঙ্গ,
যারে নিবায়নি বিধি পুড়াতে প্রাসাদ
দেখ নাই, ঋষি? বিশ্বহিত করি তেজে,
অল্প গুরু নির্ব্বিচারে প্রচণ্ড শাসন।

নারদের উত্থানপূর্ব্বক প্রস্থান-উদ্যোগ

নারদ

কর অভিলাষ তব, ত্রিলোক-সম্রাট।
ত্রৈলোক্য মঙ্গল হেতু জাগ অনিবার।

প্রস্থান

*

ওহে ধরা, ধাত্রী মম,...

ওহে ধরা, ধাত্রী মম, বুকে মোরে ধর
কি সুন্দর কি বিশাল মূর্ত্তি আজি তোর
হাস্যময়ী প্রকৃতির সুচঞ্চলা আভা
নৃত্য করে জলে স্থলে। সূর্য্যের সে হাসি
লুক্কাইছে দেখাইছে চপল ক্রীড়ায়
স্নিগ্ধ তরুশাখা। মাঝে বায়ুর হিল্লোল
আলোড়ি সমুদ্রে যেন অরণ্যের ক্রোড়
গরজে তীব্র উল্লাসে। সূক্ষ্ম চক্ষে দেখি
চিন্তাশূন্য জীবনের মধুমত্ত দল
হেসে হেসে নেচেকুদে হেথা সেথা ধেয়ে
তাড়াইছে পরস্পর বনে উপবনে
পবন বালক যত। ক্ষুদ্রপদ ভরে
শিহরে উঠেছে দেখ পুষ্করিণী জল
কম্পমান মাতৃভাবে। পর্ব্বত চূড়ায়
পবনের অত্যাচারে নতশির রাজী
সহ্য করে......... জনতা.........
..........ইহার। এই সূর্য্য বায়ু
জল, বৃক্ষাচ্ছন্ন ধরা বিস্তীর্ণ আকাশ,
এই বিশ্বময় রৌদ্র সুবর্ণদেবের,
ঈশ্বর, সুব্যক্ত আজি তোমার মহিমা
এ বিশালতায় যেন। শুধু নহে ইহা
তোমার মহতী সৃষ্টি, ইহা যে তুমিই
কৃষ্ণ, বিশ্ববৃন্দাবন-বিহারী। অস্তিত্ব,
চৈতন্য আনন্দ প্রকাশিত এই জড়ে
(বৃথা কেন জড় বলি সচেতন ব্রহ্মে)
অনন্ত এ সান্ত ছলে, অরূপ এ রূপে
স্পষ্ট অনুভব করি। আকাশ পৃথিবী
তীক্ষ্ণ (?) তেজ বিশ্বদীপ্তি, অজেয় পবন

মহৎ জগতীছন্দে গাইতেছে আজি
বেদ-বেদান্তের উক্তি মম বিশ্বপ্রাণে।
বেড়ায় যে শূন্যে সূর্য্যে প্রদক্ষিণ করি
এ বিস্তৃত নীলিমায় শান্তমুখে নুয়ে
অনন্ত চুম্বন করে, মুক্তি লীলা মধ্যে।

‘ধর্ম্ম’ পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীর পৃষ্ঠাসংখ্যা

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন ১৪৭
অশোক নন্দীর পরলোকপ্রাপ্তি ১৪৭
হেয়ার ষ্ট্রীটে সরলতা ১৪৮
বিলাত-যাত্রায় লাভ ১৪৮
লণ্ডনে জাতীয় মহাসভা ১৪৯
জাতীয় মহাসভা ১৫০
হিন্দু ও মুসলমান ১৫২
পুলিস বিল ১৫৩
জাতীয় রিসলী সারকুলার ১৫৪
গুপ্ত চেষ্টা ১৫৪
মরলীর ভেদনীতি ১৫৫
বিষবৃক্ষের অপর শাখা ১৫৬
রিজের বিষোদ্গার ১৫৭
শাসন সংস্কার ১৫৮
হুগলী প্রাদেশিক সমিতি ১৫৯
দৈনিক পত্রিকার অভাব ১৬০
মেহতা মজলিসের সভাপতি ১৬১
অসম্ভবের অনুসন্ধান ১৬১
যোগ্যতা বিচার ১৬২
চাঞ্চল্য-চিহ্ন ১৬৩
হুগলীর পরিণাম ১৬৪
শ্রীহট্ট জেলা সমিতি ১৬৭
প্রজাশক্তি ও হিন্দুসমাজ ১৬৮
বিদেশযাত্রা ১৭০
লালমোহন ঘোষ ১৭১
শ্রীহট্টের প্রস্তাবাবলী ১৭১
জাতীয় ধনভাণ্ডার ১৭৩
সার ফেরোজশাহ মেহতার বয়কট-অনুরাগ ১৭৫
কন্‌ভেন্সন সভাপতির নির্ব্বাচন ১৭৬
গীতার দোহাই ১৭৭
লণ্ডন অধিবেশন ও যুক্তমহাসভা ১৭৮
সার জর্জ্জ ক্লার্কের সারগর্ভ উক্তি ১৭৯
বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন ১৮০
বিলাতের দূত ১৮১
জাতীয় ঘোষণাপত্র ১৮৩
গুরু গোবিন্দসিংহ ১৮৪
জাতীয় ঘোষণাপত্র ১৮৫
৩০শে আশ্বিন ১৮৬
গবর্ণমেণ্টের গোখলে না গোখলের গবর্ণমেণ্ট? ১৮৭
বজেট যুদ্ধ ১৮৮
কি হইবে? ১৮৯
রিফর্‌ম ১৯১
ইংলিশম্যানের ক্রোধ ১৯১
দেওঘরে জীবন্ত সমাধি ১৯২
যুক্ত মহাসভা ১৯৩
হিন্দু সম্প্রদায় ও শাসন সংস্কার ১৯৪
মুসলমানদের অসন্তোষ ১৯৫
মূল ও গৌণ ১৯৬
একটী খাঁটী কথা ১৯৭
র‍্যামসী ম্যাকডনাল্ড ১৯৮
রিফর্ম ও মধ্যপন্থীগণ ১৯৯
গোখলের মানহানি ২০০
নূতন কৌন্সিলর ২০০
ট্রান্সভালে ভারতবাসী ২০১
টাউনহলের সভা ২০২
নির্ব্বাসিত বঙ্গসন্তান ২০৩

যুক্ত মহাসভা	২০৩
রমেশচন্দ্র দত্ত	২০৫
বুদ্ধগয়া	২০৫
ফেরোজশাহের চাল	২০৬
পূর্ব্ববঙ্গে নির্ব্বাচন	২০৭
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা	২০৮
মরলীনীতির ফল	২০৯
মিণ্টোর উপদেশ	২০৯
লাহোর কন্‌ভেন্সন	২১০
বেঙ্গলীর উক্তি	২১১
মজলিসের সভাপতি	২১১
বিলাতে রাষ্ট্রবিপ্লব	২১২
গোখলের মুখদর্শন	২১৩
গোখলের স্বসন্তান সমর্থন	২১৩
যুক্ত মহাসভা	২১৪
প্রস্থান	২১৭
হরকিসনলালের অপমান	২১৮
আবার জাগ	২১৯
নাসিকে খুন	২২০
মুমূর্ষু কন্‌ভেন্সন	২২১
সখ্যস্থাপনের প্রমাণ	২২১
নেতা দেখি, সৈন্য কোথায়?	২২২
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত	২২৩
কন্‌ভেন্সনের দুর্দ্দশা	২২৪
দলাদলি ও একতার মিথ্যা ভান	২২৪
নির্ব্বাসনের বিভীষিকা	২২৬
নির্ব্বাসন অসম্ভব	২২৭
নবযুগের প্রথম শুভলক্ষণ	২২৭
আইন ও হত্যাকারী	২২৮
আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব?	২২৯
চেষ্টার উপায়	২৩০
আর্য্যসমাজ	২৩১
ইংলণ্ডের নির্ব্বাচনী	২৩২
বিচার	২৩৩
লোকমতের প্রয়োজনীয়তা	২৩৩
আমাদের দেশে	২৩৪
ভগবদ্দর্শন	২৩৪
জেলে দর্শন	২৩৫
বেদে পুনর্জ্জন্ম	২৩৬
আর্য্যসমাজের অবনতি	২৩৭
পরিশিষ্ট	২৩৭

তথ্যপঞ্জী

''শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী'' শ্রীঅররিন্দ সোসাইটি কর্তৃক কলিকাতা হতে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ''শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা'' নামে ওই পুস্তক পুনর্বিন্যস্ত হয়ে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় (*SABCL*, Vol. 4)। এর পরে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় এই পুস্তকেরই পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপ তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হয় ১৯৯১ ও ১৯৯৪ সালে।

প্রথম সংস্করণে পাওয়া যায় যে ভূমিকাটি শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখিত, অথচ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ভূমিকায় লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি। বর্তমানে প্রথম সংস্করণের ভিত্তিতে ওই নাম পুনর্যুক্ত হল।

এই তথ্যপঞ্জীতে তিনটি সংস্করণই হ্রস্বতার খাতিরে শুধুমাত্র ''বাংলা রচনা'' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

পৃঃ ১ দুর্গা-স্তোত্র

প্রথম প্রকাশঃ 'ধর্ম্ম' ১ কার্তিক ১৩১৬; 'জগন্নাথের রথ' গ্রন্থে ২য় সংস্করণ (১৩৩৯) হতে যুক্ত হয়।

পুস্তিকাকারে স্বতন্ত্র প্রকাশঃ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরীঃ ১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৮৫, ১৯৯২, ১৯৯৬

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, অল ইণ্ডিয়া প্রেস, পণ্ডিচেরীঃ ১৯৭৯; এই সংস্করণটিতে বাংলা রচনাটি ছাড়াও আরও কয়েকটি ভাষায় 'দুর্গা-স্তোত্র'-এর অনুবাদ একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। ভাষাগুলি হল সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাতি, তামিল, তেলুগু, কানাড়া ও ইংরাজী।

এছাড়া বিভিন্ন শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র ও শাখা হতে বিভিন্ন সময়ে পত্রাকারে 'দুর্গা-স্তোত্র' প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে লক্ষ্মীহাউস, (কলিকাতা) পুঁথির আকারে একটি সংস্করণ (১৯৯২) প্রকাশ করেন।

পৃঃ ৩ শ্রীমায়ের একটি প্রার্থনা

শ্রীঅরবিন্দের হস্তলেখা প্রতিলিপিসমেত নিম্নোক্ত প্রকাশনাগুলিতে মুদ্রিত হয়ঃ

'শ্রীমায়ের রচনাসংগ্রহ', ১ম খণ্ড (১৯৭৬), জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলিকাতা

'বর্ত্তিকা', ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮২, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

'হে চিরদিনের: শ্রীঅরবিন্দের নির্বাচিত রচনা-সংকলন' (১৯৯৭), শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলিকাতা

'বাংলা রচনা'র চতুর্থ সংস্করণে নতুন সংযোজিত

কারাকাহিনী

প্রকাশপঞ্জী:

১ম সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর। 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধটিও এই গ্রন্থে স্থানলাভ করে।

২য় সংস্করণ: অলভ্য

৩য় সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, শ্রীবারিদকান্তি বসু, আর্য্য সাহিত্য ভবন, কলিকাতা। উল্লেখ্য যে 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটি এই সংস্করণে মুদ্রিত হয়নি।

৪র্থ সংস্করণ: ১৯৬৬, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, পণ্ডিচেরী; কলিকাতায় মুদ্রিত। ইমপ্রিন্ট পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে চিহ্নিত আছে, কিন্তু তা যথার্থ নয়।

৫ম সংস্করণ: ১৯৭৭, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃক অল ইণ্ডিয়া প্রেস, পণ্ডিচেরীতে মুদ্রিত। এখানে ইমপ্রিন্ট পৃষ্ঠা অসম্পূর্ণ; কোন সংস্করণের উল্লেখ নাই। তৃতীয় সংস্করণে 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধটির অমুদ্রিত শেষ অনুচ্ছেদটি এই সংস্করণে পুনর্যুক্ত হয়েছে।

৬ষ্ঠ সংস্করণ: আশ্বিন ১৩৮৮ (১৯৮১), শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, অল ইণ্ডিয়া প্রেস, পণ্ডিচেরী। এই সংস্করণে আরও দুটি নতুন প্রবন্ধ — 'আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়' এবং 'নবজন্ম' — যুক্ত হয়েছে।

পুনর্মুদ্রণ: ১৯৮৫, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

৭ম সংস্করণ: ১৯৯২, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী। এই সংস্করণে শ্রীঅরবিন্দ প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতা (৩০ মে, ১৯০৯) 'Uttarpara Speech'-এর বঙ্গানুবাদ 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' যুক্ত হয়। বলাবাহুল্য, 'বাংলা রচনা'য় অভিভাষণটি গৃহীত হয়নি।

পুনর্মুদ্রণ: ১৯৯৬

পৃঃ ৭ কারাকাহিনী:

১৩১৪ সালে প্রবর্তিত কুমুদিনী বসুর সম্পাদনায় মাসিক 'সুপ্রভাত' পত্রিকা হতে সংগৃহীত। এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নয়টি সংখ্যায় প্রকাশিত (১৯০৯-১০)। শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশ থেকে চলে আসায় রচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এই অসম্পূর্ণ রচনাই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পৃঃ ৫৪ কারাগৃহ ও স্বাধীনতাঃ

প্রথম প্রকাশ: 'ভারতী' আষাঢ় ১৩১৬; এই প্রবন্ধটি 'কারাকাহিনী' গ্রন্থে প্রথম হইতে যুক্ত হয়।

পৃঃ ৬২ আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়ঃ

প্রথম প্রকাশ: 'ভারতী' ভাদ্র ১৩১৬; প্রবন্ধটি 'জগন্নাথের রথ' সংকলন-গ্রন্থটির (১ম সংস্করণঃ ১৯২১) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু 'বাংলা রচনা'র বিষয়গুলি পুনর্বিন্যাস কালে এই প্রবন্ধটি 'কারাকাহিনী'র সঙ্গে যুক্ত হয়। তারপরে মুদ্রিত 'কারাকাহিনী'র পৃথক সংস্করণগুলিতেও প্রবন্ধটির নবলব্ধ স্থান বজায় থাকে। এখন প্রবন্ধটি 'জগন্নাথের রথ' ও 'কারাকাহিনী' দুটি গ্রন্থেই পাওয়া যাবে।

পৃঃ ৭১ নবজন্মঃ

প্রথম প্রকাশ: 'ধর্ম্ম' ১৪ ভাদ্র ১৩১৬; প্রবন্ধটি 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় 'অশোক নন্দী' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল। অতঃপর বর্তমান শিরোনামে 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' (১ম সংস্করণ: ভাদ্র ১৩২৭) সংকলন-গ্রন্থে স্থান লাভ করে। পূর্ব প্রবন্ধটির মত এটিও 'বাংলা রচনা'য় 'কারাকাহিনী'র সঙ্গে যুক্ত হয় ও তারপরে মুদ্রিত পৃথক 'কারাকাহিনী'র সংস্করণগুলিতেও এই সংযুক্তি অটুট রাখা হয়। কাজেই এই প্রবন্ধটিও দুইটি পৃথক গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা

১৩১৬ সালে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধর্ম্ম' পত্রিকা হতে সংকলিত।

প্রকাশপঞ্জী:

১ম সংস্করণ: ভাদ্র ১৩২৭, রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর
২য় সংস্করণ: আষাঢ় ১৩২৯, রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর
৩য় সংস্করণ: আশ্বিন ১৩৩৮, রামেশ্বর দে, রামেশ্বর এ্যাণ্ড কোং, চন্দননগর
৪র্থ সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরীতে মুদ্রিত।
৫ম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৩৬৪, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃক আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।
৬ষ্ঠ সংস্করণ: ১৯৭৭, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, অল ইণ্ডিয়া প্রেস, পণ্ডিচেরী। এই

সংস্করণের ইমপ্রিন্ট পৃষ্ঠা ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ। মুদ্রিত **১**ম সংস্করণের তারিখ ভুল (১৩২৭-এর স্থলে ১৯২৭) ও বর্তমান সংস্করণের ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ নাই।

১৯৬৯ সালের 'মূল বাঙ্গলা রচনাবলী' হতেই 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' অংশ পূর্বপ্রকাশিত পৃথক গ্রন্থের থেকে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। 'ধর্ম্ম' এবং 'জাতীয়তা' পৃথক অংশ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। তারপর বিষয়-সাদৃশ্যের জন্য 'গীতার ধর্ম্ম', 'সন্ন্যাস ও ত্যাগ' এবং 'বিশ্বরূপ দর্শন' স্থানান্তরিত করে গীতা শীর্ষক অংশে নিয়ে যাওয়া হয়; 'উপনিষদ' ও 'পুরাণ'ও পৃথক করা হয়। 'নবজন্ম' প্রবন্ধটি 'কারাকাহিনী'র শেষে যুক্ত হয়। এই ছয়টি প্রবন্ধ বিযুক্ত হয় বটে, আবার অন্যপক্ষে নতুন ছয়টি প্রবন্ধ যুক্ত হয় — চারটি 'বিবিধ রচনা' পুস্তক হতে ও দুটি 'জগন্নাথের রথ' হতে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, 'বিবিধ রচনা' গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধও ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দেওয়ার ফলে 'বাংলা রচনা'র মধ্যে এই গ্রন্থটির পৃথক অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল।

চতুর্থ সংস্করণের এই অংশে আরও সাতটি নতুন প্রবন্ধ যুক্ত ক'রে কালক্রমানুসারে সমস্ত রচনাগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হলঃ প্রাক্ পণ্ডিচেরী পর্ব ও পণ্ডিচেরী পর্ব। প্রাক্ পণ্ডিচেরী পর্বের রচনাগুলি 'জাতীয়তা' অংশে সন্নিবেশিত করা হল এবং অন্য রচনাগুলির জন্য শিরোনাম 'বিবিধ রচনা' রইল।

বর্তমান সংস্করণের 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা'য় মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশ ও আনুষঙ্গিক তথ্য নিচে দেওয়া হল। প্রায় সমস্ত প্রবন্ধ 'ধর্ম্ম' পত্রিকা হতে গৃহীত হয়েছে, ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে পত্রিকার নাম (যুগান্তর) উল্লেখ আছে।

পৃঃ ৭৭ আমাদের ধর্ম্মঃ ৭ ভাদ্র **১৩১৬**

পৃঃ ৮০ মায়াঃ ২১ ভাদ্র **১৩১৬**

পৃঃ ৮৪ অহঙ্কারঃ ৪ আশ্বিন **১৩১৬**

পৃঃ ৮৬ নিবৃত্তিঃ ৬ অগ্রহায়ণ **১৩১৬**

পৃঃ ৮৮ প্রাকাম্যঃ ১২, ১৯ পৌষ **১৩১৬**

'ধর্ম্ম' পত্রিকায় 'প্রাকাম্য'র উপরে আরও একটি শিরোনাম 'অষ্টসিদ্ধি' মুদ্রিত আছে।

পৃঃ ৯২ স্তবস্তোত্রঃ ২ ফাল্গুন **১৩১৬**

পৃঃ ৯৫ আমাদের রাজনীতিক আদর্শঃ 'যুগান্তর' ২৫ চৈত্র ১৩১২ (নতুন সংযোজন); সাপ্তাহিক 'যুগান্তর'-এর ৩য় সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধটি উমা মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত ''ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ'' হতে গৃহীত।

পৃঃ ১০১ মিথ্যার পূজাঃ 'যুগান্তর', শ্রাবণ ১৩১৪ (নতুন সংযোজন)
এই প্রবন্ধটিও পূর্ব প্রবন্ধের মতো উল্লিখিত গ্রন্থ হতে গৃহীত।

পৃঃ ১০৩ আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থাঃ ৭ ভাদ্র ১৩১৬ (নতুন সংযোজন)

পৃঃ ১০৬ জাতীয় উত্থানঃ ৪ আশ্বিন ১৩১৬
এই প্রবন্ধটি 'ধর্ম্ম'তে 'জাতীয় উত্থান ও জাতিগত বিদ্বেষ' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল।

পৃঃ ১১০ অতীতের সমস্যাঃ ১১ আশ্বিন ১৩১৬
এই প্রবন্ধটি 'ধর্ম্ম'তে 'অতীতের সমস্যা ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল।

পৃঃ ১১৬ স্বাধীনতার অর্থঃ ২৫ আশ্বিন ১৩১৬

পৃঃ ১১৮ হিরোবূমি ইতোঃ ২২ কার্তিক ১৩১৬
প্রবন্ধটি 'জগন্নাথের রথ' গ্রন্থে ২য় সংস্করণ হতে অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

পৃঃ ১২০ কোরিয়া ও জাপানঃ ২২ কার্তিক ১৩১৬ (নতুন সংযোজন); SABCL Vol. 27, Supplement-এ প্রকাশিত

পৃঃ ১২৪ দেশ ও জাতীয়তাঃ ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬

পৃঃ ১২৭ আমাদের আশাঃ ৪ মাঘ ১৩১৬

পৃঃ ১৩০ আমাদের নিরাশাঃ ১৮ মাঘ ১৩১৬ (নতুন সংযোজন)

পৃঃ ১৩২ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যঃ ১৮ মাঘ ১৩১৬

পৃঃ ১৩৬ ভ্রাতৃত্বঃ ২৫ মাঘ ১৩১৬

পৃঃ ১৪০ ভারতীয় চিত্রবিদ্যাঃ ৯ ফাল্গুন ১৩১৬

'ধর্ম্ম' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত রচনাগুলি শ্রীঅরবিন্দ লিখিত কিনা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা গেল না এবং সেই কারণে গৃহীত হয়নি:

আবার রাজদ্রোহ (১৮ আশ্বিন ১২১৬); রাজদ্রোহ আইন (১ কার্তিক ১৩১৬); হিন্দুসভা (২২ কার্তিক ১৩১৬); মহাদেবের তমোভাব (২৯ কার্তিক ১৩১৬); মায়াবীর মায়া (৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৬); ভারতের নিদ্রা (২৬ পৌষ ১৩১৬)।

'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীর শিরোনাম দিয়ে একটি নতুন সূচীপত্র ৬৬৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। লক্ষণীয় যে 'জাতীয় ঘোষণাপত্র' শিরোনামে দুটি এবং 'যুক্ত মহাসভা' শিরোনামে তিনটি রচনা আছে। '৩০শে আশ্বিন' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় রচনা আছে এবং পরিশিষ্ট ভাগেও ওই শিরোনামে অপর একটি রচনা যুক্ত হয়েছে।

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি "ধর্ম্ম" শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে এবং পরে ১৯৮৮ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়।

প্রকাশক: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট; মুদ্রক: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বেই এইগুলি 'বাংলা রচনা'য় ১ম সংস্করণ হতে স্থানলাভ করেছিল।

চতুর্থ সংস্করণে নতুন সংযোজিত হল:

পৃঃ ১৫৭ রিজের বিষোদ্গার (১৪ ভাদ্র ১৩১৬)

পৃঃ ২১৪ যুক্ত মহাসভা (৫ পৌষ ১৩১৬)

পঞ্চম সংস্করণে নতুন সংযোজন:

পৃঃ ২০৫ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৪ ভাদ্র ১৩১৬)

নিম্নলিখিত রচনাগুলি চতুর্থ সংস্করণে বর্জিত হয়েছে; পাশে তৃতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল:

তারাপুরে চিনির কল (পৃঃ ১৯৫); বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল (পৃঃ ২০৪); কৃষ্ণমিলের মিথ্যা অপবাদ (পৃঃ ২০৭); প্রহারকের পরিচয় (পৃঃ ২৪৬)।

'তারাপুরে চিনির কল' ও 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল'-এর প্রসঙ্গ 'ধর্ম্ম'তে অন্যত্রও আছে। সেইগুলি বর্জন করে মাত্র এই দুটি মুদ্রিত করা অযৌক্তিক বলে মনে হয়। তাছাড়া এইগুলি সমসাময়িক সংবাদ-প্রধান রচনা এবং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন। এই একই কারণে 'কৃষ্ণমিলের মিথ্যা অপবাদ' গৃহীত হয়নি। 'প্রহারকের পরিচয়' বর্জন করার আরো একটি কারণ আছে। এই প্রহারের কাহিনী একটি পূর্ববর্তী রচনা 'একটি সত্য ঘটনা' শিরোনামে 'ধর্ম্ম'তে প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই, প্রহারের কথা বাদ দিয়ে

শুধুমাত্র প্রহারকের বিষয় মুদ্রিত না করাই বিধেয় মনে হল।

'গুরু গোবিন্দ সিংহ' রচনাটির জন্য 'বাংলা রচনা'র সংস্করণগুলিতে একটা পৃথক অংশ নির্ধারিত ছিল। প্রবন্ধটি পৃথক অংশে মুদ্রিত হলেও ১ম সংস্করণের সূচীপত্রে তার যথাযথ নির্দেশ নেই; 'জাতীয়তা' অংশের সঙ্গে এটি যুক্ত করা ছিল। চতুর্থ সংস্করণে রচনাটি 'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনাগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হল। বস্তুত এই প্রবন্ধটি 'ধর্ম্ম'তে সম্পাদকীয় রচনা হিসাবেই প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সম্পাদকীয় অংশের পরিশিষ্টে দুটি নতুন রচনা সংযোজিত হয়েছে — এই দুটিই 'ধর্ম্ম' পত্রিকা বহির্ভুত।

প্রথম: ঐক্য ও স্বাধীনতা (পৃঃ ২৩৭) SABCL, Vol. 27 হতে গৃহীত। সেখানে প্রবন্ধটি বরোদায় থাকাকালীন রচিত বলা আছে। পাঠ্যতে আছে মাদ্রাজে জাতীয় সভার ঊনবিংশ অধিবেশনের কথা। এই অধিবেশন যেহেতু ১৯০৩ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আমরা ধরে নিতে পারি ১৯০৪ সালের প্রথম দিকে এটি রচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়: ৩০শে আশ্বিন (পৃঃ ২৩৯) একটি জীর্ণ পাণ্ডুলিপি হতে উদ্ধার করা হয়েছে। রচনাটি পাঠে অনুমিত হয় যে এটা ১৯০৮ সালে রচিত হয়েছিল। এই রচনাটি সম্পাদকীয় '৩০শে আশ্বিন' (পৃঃ ১৮৬) প্রবন্ধটি হতে পৃথক।

বিবিধ রচনা

এই গ্রন্থের 'প্রকাশকের কথা'য় প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "শ্রীঅরবিন্দের এই বাংলা লেখাগুলি তাঁর খসড়া খাতা থেকে গৃহীত। এগুলি তিনি আদৌ দ্বিতীয়বার দেখে দিতে পারেননি — যেমন আনকোরা অবস্থায় ছিল তেমনি ছাপান হল।"

এই গ্রন্থাংশে অনেক পরিবর্তন করা হল। বেদ ও উপনিষদ সংক্রান্ত শেষ ছয়টি প্রবন্ধ স্থানান্তরিত করে নতুন বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটি নতুন রচনাও 'মানব সমাজের তিন ক্রম'-এর শেষাংশের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি এখানে সন্নিবেশিত হল। এছাড়াও, 'জগন্নাথের রথ' প্রবন্ধটি এখানে যুক্ত হয়েছে।

'বিবিধ রচনা'র শেষাংশে প্রদত্ত কবিতাগুলি চতুর্থ সংস্করণে 'কবিতা' অংশে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

১ম সংস্করণ: ১৯৫৫, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।

২য় সংস্করণ: ১৯৭৫, ঐ। গ্রন্থের শেষে আট পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি কবিতার অংশ যুক্ত হয়।

চতুর্থ সংস্করণে প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলির তথ্যাদি নিচে দেওয়া হল:

পৃঃ ২৪৩ পুরাতন ও নূতনঃ রচনাকাল আনুমানিক ১৯১৮

পৃঃ ২৪৪ পূর্ণতাঃ রচনাকাল আনুমানিক ১৯১৮, শিরোনামটি সম্পাদক প্রদত্ত, পাণ্ডুলিপিতে নাই।

পৃঃ ২৪৫ পূর্ণযোগের মুখ্য লক্ষণঃ রচনাকাল আনুমানিক ১৯১৮ (নতুন সংযোজন)।

পৃঃ ২৪৮ মানব সমাজের তিন ক্রমঃ রচনাকাল আনুমানিক ১৯১৮

পাণ্ডুলিপিতে কোন শিরোনাম নাই, 'বিবিধ রচনা' প্রকাশকালে সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত। পাণ্ডুলিপির শেষ তিনটি বাক্য তখন মুদ্রিত হয়নি। 'বাংলা রচনা'র তৃতীয় সংস্করণে সেগুলি যুক্ত হয়েছে। চতুর্থ সংস্করণে আরও চারিটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হল।

পৃঃ ২৫১ সমাজের কথাঃ রচনাকাল আনুমানিক ১৯১৮

এস্থলেও শেষের বাক্যটি 'বাংলা রচনা'র তৃতীয় সংস্করণে যুক্ত হয়েছে। এর পূর্বে মুদ্রিত হয়নি।

পৃঃ ২৫২ জগন্নাথের রথঃ প্রবর্ত্তক, ৩০ চৈত্র ১৩২৫

এই প্রবন্ধটির সঙ্গে আরো দুটি রচনা 'আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়' ও 'স্বপ্ন' যুক্ত করে 'জগন্নাথের রথ' শিরোনামের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটির প্রকাশপঞ্জী:

১ম সংস্করণ: ১৩২৮ (১৯২১), রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর

২য় সংস্করণ: ১৩৩৯ (১৯৩২), রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর; এই সংস্করণে আরও দুটি বিষয় যুক্ত হয় — 'দুর্গা-স্তোত্র' ও 'হিরোবুমি ইতো'।

৩য় সংস্করণ: ১৩৫৭ (১৯৫২), শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।

৪র্থ সংস্করণ: ১৩৭২ (১৯৬৫), শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।

৫ম সংস্করণ: ১৩৮৪ (১৯৭৭), ঐ

পুনর্মুদ্রণ: ১৯৯০, ঐ

বাংলা রচনাতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণ হতেই 'জগন্নাথের রথ' গ্রন্থের পৃথক অস্তিত্ব থাকছে না। চতুর্থ সংস্করণেও প্রবন্ধগুলি 'কারাকাহিনী', 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' ও 'বিবিধ

রচনা'র মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। 'দুর্গা-স্তোত্র' 'বাংলা রচনা'র প্রথমেই পূর্ব সংস্করণের মত স্বাধীনভাবে সন্নিবেশিত হচ্ছে।

গীতা

পৃঃ ২৫৯ গীতার ধর্ম্মঃ 'ধর্ম্ম' (১৪ ভাদ্র ১৩১৬); পরে 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৩২৭)।

পৃঃ ২৬২ সন্ন্যাস ও ত্যাগঃ 'ধর্ম্ম' (১৪ ভাদ্র ১৩১৬), পরে 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৩২৭)।

উপরের প্রবন্ধ দুটি ১৩৮৯ সালে 'গীতার ভূমিকা' গ্রন্থেও পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজিত হয়।

পৃঃ ২৬৬ বিশ্বরূপ দর্শনঃ 'ধর্ম্ম' (২৫ মাঘ ১৩১৬); পরে 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৩২৭)। ১৩৪৮ সালে 'গীতার ভূমিকা' গ্রন্থেও পরিশিষ্ট হিসাবে যুক্ত হয়।

পৃঃ ২৭০ গীতার ভূমিকাঃ 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় ১৮ আশ্বিন হতে ২ ফাল্গুন, ১৩১৬ 'গীতা' শিরোনামে মুদ্রিত। পরে গ্রন্থাকারে বর্তমান শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রকাশপঞ্জী নিচে দেওয়া হল।

১ম সংস্করণ: আশ্বিন ১৩২৭, রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর

২য় সংস্করণ: ফাল্গুন ১৩২৭, অলভ্য

৩য় সংস্করণ: ফাল্গুন ১৩৩৪, বারিদকান্তি বসু, আর্য্য সাহিত্য ভবন, কলিকাতা

৪র্থ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৪৮, রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর

উল্লেখযোগ্য যে ২য় ও ৩য় সংস্করণে ১ম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ বলে মুদ্রিত হয়েছিল এবং বর্তমানে যেটিকে ৪র্থ সংস্করণ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, সেটি ২য় সংস্করণ হিসাবে মুদ্রিত ছিল। বর্তমানে এই সংশোধনের কারণ পরবর্তী সংস্করণটি ৫ম সংস্করণ হিসাবে চিহ্নিত ছিল।

এই ৪র্থ সংস্করণেই পূর্বোল্লিখিত 'বিশ্বরূপ দর্শন' প্রবন্ধটি পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজিত হয়।

৫ম সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৫৮, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।

৬ষ্ঠ সংস্করণ: ভাদ্র ১৩৭৬, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।

৭ম সংস্করণ: আগস্ট **১৯৭২**, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলিকাতা। উল্লেখ্য, এই সংস্করণটি ৩য় সংস্করণ হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। পরের সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে।

৮ম সংস্করণ: শ্রাবণ **১৩৮৯**, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, অল ইণ্ডিয়া প্রেস, পণ্ডিচেরীতে মুদ্রিত। এই সংস্করণে নতুন দুটি প্রবন্ধ 'গীতার ধর্ম্ম' এবং 'সন্ন্যাস ও ত্যাগ' যুক্ত হয়েছে, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পুনর্মুদ্রণ: **১৯৮৫**, **১৯৯৪**, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।

এই 'গীতার ভূমিকা' গ্রন্থে পরিশিষ্টের প্রবন্ধগুলি সংযোজনের ফলে গীতাসংক্রান্ত শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত রচনাই এখন একত্র পাওয়া যায়। 'বাংলা রচনা'র চতুর্থ সংস্করণে 'গীতা' বিভাগে এই প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমে পরিবেশিত হয়েছে।

বেদ ও উপনিষদ

চতুর্থ সংস্করণে 'বেদ', 'উপনিষদ', 'পুরাণ' পৃথক পৃথক বিভাগ না রেখে 'বেদ ও উপনিষদ' নামে একটি বিভাগ রাখা হয়।

পৃঃ ৩২৭ উপনিষদঃ 'ধর্ম্ম', ২৭ অগ্রহায়ণ **১৩১৬**

'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' গ্রন্থের সমস্ত সংস্করণেই প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলা রচনা'র **১**ম সংস্করণে 'উপনিষদ' অংশে স্থানান্তরিত করা হয়।

পৃঃ ৩২৯ পুরাণঃ 'ধর্ম্ম', **১২** পৌষ **১৩১৬**

এই প্রবন্ধটিও পূর্ব প্রবন্ধের মত 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা'র অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেখান হতে 'বাংলা রচনা'র পূর্ব সংস্করণগুলিতে এই একটি মাত্র প্রবন্ধের জন্য নতুন অংশ রাখা হয়।

পৃঃ ৩৩১ ঈশা উপনিষদঃ 'ধর্ম্ম', ৯ ফাল্গুন **১৩১৬** (নতুন সংযোজন)

পৃঃ ৩৩৪ উপনিষদে পূর্ণযোগঃ 'বিবিধ রচনা', **১৯৫৫**; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত। রচনাকাল: আনুমানিক **১৯১২-১৮**

পৃঃ ৩৩৬ ঈশ উপনিষদঃ 'বিবিধ রচনা' **১৯৫৫**; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

চতুর্থ সংস্করণে প্রবন্ধটির ৩য় অংশটি নতুন সংযোজন এবং তিনটি

অংশই যুক্তভাবে একটি শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্ব পূর্ব সংস্করণে প্রথম দুই অংশ দুটি পৃথক পৃথক প্রবন্ধ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটি 'ঈশা উপনিষদ' শিরোনামে 'বিবিধ রচনা'য় মুদ্রিত হয়েছিল; আরো দেখা যায় 'বাংলা রচনা'র ৩য় সংস্করণে প্রবন্ধটিতে অনুচ্ছেদগুলির পূর্বাপর ক্রম সংশোধন করা হয়েছে। রচনাকাল: আনুমানিক ১৯১৮

পৃঃ ৩৪১ বেদরহস্য; 'বিবিধ রচনা' ১৯৫৫; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী।

পরে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির এক ভিন্ন বয়ান হতে প্রবন্ধটি নতুন করে চতুর্থ সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে। রচনাকাল: আনুমানিক ১৯১৬

পৃঃ ৩৪৭ ঋগ্বেদ: 'বিবিধ রচনা' ১৯৫৫; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী।

চতুর্থ সংস্করণে এই প্রবন্ধটি নতুন করে সাজানো হয়। পরিবর্তন ও সংযোজনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'তপোদেব অগ্নি' আর পৃথক প্রবন্ধ না রেখে এই রচনাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; তৃতীয় সংস্করণের 'বাংলা রচনা'র প্রথমদিকে যে 'উষাস্তোত্র' সন্নিবেশিত হয়েছিল, সেটিও এখানে স্থানান্তরিত করা হয় — কেননা সেটি মূল বাংলা নয়, ঋগ্বেদ হতে অনুবাদ মাত্র। নতুন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পরবর্তী ঋগার্থগুলি সংযোজিত হয় — প্রথম মণ্ডল, সূক্ত ২, ৩, ৪, ৫, ১১৩; চতুর্থ মণ্ডল, সূক্ত ১; সপ্তম মণ্ডল, সূক্ত ৭০, ৭৭; নবম মণ্ডল, সূক্ত ১, ২, ১১৩; দশম মণ্ডল, সূক্ত ১০৮।

রচনাকাল: আনুমানিক ১৯১৬

পত্রাবলী

এই অংশে শ্রীঅরবিন্দ লিখিত যাবতীয় প্রাপ্ত পত্র পরিবেশিত হয়েছে। এর পূর্বে নানা শিরোনামায় নানাজনকে লিখিত পত্রসংকলন প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রসঙ্গ আনুযায়ী দেওয়া হল।

পৃঃ ৩৭৯ মৃণালিনীদেবীকে লিখিত:

'অরবিন্দের পত্র' নামে একটি সংকলন ছিল।

১ম সংস্করণ: অলভ্য

২য় সংস্করণ: ভাদ্র ১৩২৬, রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর

৩য় সংস্করণ: অলভ্য

৪র্থ সংস্করণ: অলভ্য

৫ম সংস্করণ: ভাদ্র ১৩৩২, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।
এই সংস্করণগুলিতে মাত্র তিনটি পত্র পাওয়া যায়: ৩০. ৮. ১৯০৫. ১৭. ২. ১৯০৭ এবং ৬. ১২. ১৯০৭-এ লিখিত। এই পত্র তিনখানি ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দের গ্রে স্ট্রীট বাসভবনে খালাতল্লাসী করে পুলিশ নিয়ে যায় ও আলিপুর বোমার মামলায় আদালতে উপস্থিত করে।

৬ষ্ঠ সংস্করণ: ফাল্গুন ১৩৫২, প্রকাশক: আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরীতে মুদ্রিত। এই সংস্করণে শিরোনাম পরিবর্তিত হয় — 'অরবিন্দের পত্র' স্থানে 'শ্রীঅরবিন্দের পত্র' করা হয়।

বারিন ঘোষকে লেখা 'পণ্ডিচেরী পত্র'ও এর শেষার্ধে যুক্ত হয়।

৭ম সংস্করণ: চৈত্র ১৩৫৯, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

৮ম সংস্করণ: বৈশাখ ১৩৮৪, ঐ

এই সংস্করণে আরও ৭টি বাংলা চিঠি ও একটি বাংলা অনুবাদসমেত ইংরাজী চিঠি যুক্ত হয়। এছাড়া ভূপালচন্দ্র বসুকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের চিঠি এবং ভূপালচন্দ্র বসু লিখিত মৃণালিনীদেবী সম্পর্কে জীবনের ছোট ছোট ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের এই চিঠি ও ভূপালচন্দ্র বসুর লেখাটি ইংরাজীতে লিখিত। এখানে ইংরাজী ও তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে।

এই সংস্করণে ইমপ্রিন্ট পৃষ্ঠায় 'প্রথম পরিবর্ধিত সংস্করণ' চিহ্নিত আছে। কিন্তু পরবর্তী পুনর্মুদ্রণে তা সংশোধিত করে 'অষ্টম সংস্করণ পরিবর্ধিত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ১৯৮৩

'বাংলা রচনা'র পূর্ববর্তী প্রথম দুই সংস্করণে ৩টি করে পত্র, ৩য় সংস্করণে ১০টি পত্র এবং চতুর্থ সংস্করণে আরও একটি পত্র সংযোজিত হয়েছে। তারিখ না দেওয়া চিঠি দুটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় এবং ডাকে দেওয়া হয়নি বলে অনুমান করা হয়। পত্রগুলি সব কালানুক্রমে নতুন করে বিন্যস্ত হল। তারিখহীন পত্রগুলি সবশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ইংরাজীতে লেখা পত্রটি 'বাংলা রচনা'য় গৃহীত হয়নি।

পৃঃ ৩৯২ বারিনকে লিখিত: 'নারায়ণ' ও 'প্রবর্ত্তক' দুইটি পত্রিকাতেই সমকালে প্রথম প্রকাশিত হয় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭)।

'অরবিন্দের পণ্ডিচেরী পত্র' শিরোনামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ ১৩২৮ সালে। প্রকাশক: শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে: "আমি দ্বীপান্তর থেকে ফেরবার পরই শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে এই পত্র পাই। ...জ্যৈষ্ঠের (১৩২৭) 'নারায়ণ' থেকে নিয়ে পরিবর্ধিত আকারে পত্রখানি প্রকাশ করলাম।"

পরে এই পত্র 'পণ্ডিচেরীর পত্র' শিরোনাম নিয়ে 'শ্রীঅরবিন্দের পত্র' (৬ষ্ঠ সংস্করণ)-এর শেষার্ধে যুক্ত হয় (১৩৫২) ও ঐ গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের সঙ্গে মুদ্রিত হতে থাকে।

'বাংলা রচনা'র পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে 'পণ্ডিচেরী পত্র' নামেই মুদ্রিত হয়। উল্লেখ্য তৃতীয় সংস্করণেই কোনরকম কাটছাঁট না করে প্রথম সম্পূর্ণ পত্রটি মুদ্রিত হয়। চতুর্থ সংস্করণে 'পত্রাবলী'র অংশ হিসাবে পত্রটি প্রকাশ করা হল।

পৃঃ ৪০৪ 'প্রবর্ত্তক' উদ্দেশ্যে লিখিতঃ

নতুন সংযোজন; রচনাকাল আনুমানিক ১৯১৮; সম্ভবত পত্রগুলি কখনই ডাকে দেওয়া হয়নি। এই পত্রগুচ্ছের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশটি প্রবর্ত্তক উদ্দেশ্যে রচিত কিনা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়নি।

পৃঃ ৪১৮ সাধনাবিষয়ক পত্রাবলীঃ

এইগুলি কয়েকজন শিষ্যার প্রশ্নের উত্তরে লিখিত। এই পত্রগুলির কিছু অংশ এর পূর্বে 'পত্রাবলী' শিরোনামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১ম খণ্ড: ১ম সংস্করণ: ১৫ আগস্ট ১৯৫১
২য় সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৬৬
২য় খণ্ড: ১ম সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৫৯
২য় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।

এই পত্রগুলির অধিকাংশই নিয়মমাফিক পত্র নয়। 'ন', 'স'-এর লিখিত পত্রের (সময় সময় অতি দীর্ঘ পত্র) উত্তরে মার্জিনে বা অন্যত্র মন্তব্য কিংবা নোটের আকারে লিখিত। 'ন' ও 'স' সাধারণত বাঁধানো খাতায় পত্র লিখে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠাতেন। এই খাতাগুলি হতে শ্রীঅরবিন্দের উত্তরগুলি সংকলিত হয়েছে। অবশ্য খাতা ছাড়াও পৃথক কাগজ থেকেও বেশ কিছু পত্র সংগৃহীত হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণে 'ন' ও 'স'কে লিখিত অনেক পত্র যুক্ত হয়েছে।

চিঠিগুলি বিষয়নিরপেক্ষে তারিখ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। যেগুলিতে তারিখ নেই সেগুলি শেষে দেওয়া হয়েছে।

এই 'পত্রাবলী' হতে চয়ন করে একটি পুস্তিকা 'শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি পত্র' শিরোনামে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক: শ্রীঅরবিন্দ ভবন, হুগলীচুঁচুড়া, হুগলী

দশম বর্ষীয়া বালিকা 'এ'কে লিখিত পত্রগুলি নতুন সংযোজিত হল।

'এ'কে লিখিত পত্রগুলি 'শৃণ্বন্তু' পত্রিকায় ১৩৮১ ফাল্গুন ও পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল।

শৃণ্বন্তু: সম্পাদক অমলেশ ভট্টাচার্য, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কলিকাতা

'শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী' শিরোনামে আর একটি সংকলন আছে। এটির প্রকাশকাল: ২৪শে নভেম্বর ১৯৭০, প্রকাশক: শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, কলিকাতা/পণ্ডিচেরী, মুদ্রক: নালন্দা প্রেস, কলিকাতা। এই সংকলনে মৃণালিনীদেবীকে লিখিত তিনটি পত্র, বারিনকে লেখা পত্র এবং 'ন' ও 'স'কে লেখা পত্রাবলী পরিবেশিত হয়েছে।

কাহিনী ও কবিতা

পৃঃ ৫৫৯ স্বপ্ন: ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৬

এই কাহিনীটি 'জগন্নাথের রথ' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। পুস্তকটির প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩২৮, রামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর।

পৃঃ ৫৬৬ ক্ষমার আদর্শ: 'ধর্ম্ম', ১৬ ফাল্গুন ১৩১৬

'শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী' (১ম সংস্করণ, ১৯৬৯) গ্রন্থে এই কাহিনীটির প্রথম পুনঃপ্রকাশ হয়। উল্লেখ্য যে 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় কাহিনীটির শিরোনাম ছিল: 'ক্ষমার আদর্শ ও সাধুসঙ্গের ফল'।

'বাংলা রচনা'র ১ম সংস্করণে কোন কবিতা ছিল না। ২য় সংস্করণে মাত্র একটি কবিতা "সবাই পাগল তোরা ঘুরি' ধরাতল" দেওয়া হয়। তৃতীয় সংস্করণ হতেই কবিতার অংশটি যুক্ত হয়।

'উষাহরণ কাব্য' দীর্ঘ হওয়াতে সর্বশেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে — কালানুক্রমের ব্যত্যয় ঘটা সত্ত্বেও। ওই সঙ্গে সমকালীন রচিত 'জাগিল জননী'ও শেষের দিকে দেওয়া হল। ফলে শ্রীঅরবিন্দের বরোদা থাকাকালীন প্রথমদিকের বাংলা কবিতাদুটি একসঙ্গে রইল।

উল্লেখযোগ্য যে 'একটি অসমাপ্ত কবিতার টুকরো' (প্রথম পঙ্ক্তি: কে বলে মা কাঙালিনী বিশ্বচরণা) *Sri Aurobindo: Archives and Research*-এর ১৯৮১ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাখণ্ডটির প্রতিলিপি *Hindustan Standard*-এ (১২ জুন ১৯৫৪) শ্রীঅরবিন্দ রচিত বলে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে নির্ণীত হয়েছে কবিতাটি বারিন ঘোষের রচিত, শ্রীঅরবিন্দের নয়।

পৃঃ ৫৬৯ অস্ফুটঃ রচনাকাল আনুমানিক ১৯১৮

পৃঃ ৫৭০ মহাকালঃ একই বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটিই সম্পূর্ণাকারে 'মহাকাল' শিরোনামে আছে। চতুর্থ সংস্করণে প্রধানত এই বয়ানটিই অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু পঙ্ক্তি অন্য একটি অসম্পূর্ণ বয়ান 'কাল' হতে এনে বদলানো হয়েছে, যেহেতু এই পঙ্ক্তিগুলি উৎকৃষ্টতর। পঙ্ক্তিগুলি হচ্ছে ৬-২৭, ৪৭-৫২ এবং ৬৯-৭৯।

পূর্ববর্তী সংস্করণে 'মহাকাল' কবিতার প্রথম অংশটিতে 'কাল'-এর পাণ্ডুলিপিটি অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয় (৩য় সং: পৃপৃ: ৪১৬, ৪১৭ এবং ৪১৮-এর প্রথম পাঁচ পঙ্ক্তি), তারপর 'মহাকাল' পাণ্ডুলিপি হতে অনুরূপ অংশটুকু বর্জন করে 'কাল'-এর শেষে যুক্ত হয়েছিল। 'বর্ত্তিকা' ১৯৭৮-এর ১৫ আগস্ট সংখ্যায় কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে।

Sri Aurobindo: Archives and Research পত্রিকায় ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'বুঝেছি তোমার আত্মা' কবিতাটি এই বিষয়বস্তুর উপর লেখা একটী অসম্পূর্ণ খসড়া মাত্র। রচনাকাল: আনুমানিক ১৯১৬

পৃঃ ৫৭৫ জীবন্ত জড়ঃ *Sri Aurobindo: Archives and Research,* ডিসেম্বর ১৯৭৯, রচনাকাল: ১৯১২-১৮

পৃঃ ৫৭৯ সবাই পাগল তোরা ঘুরি' ধরাতলঃ

'বাংলা রচনা'র ২য় সংস্করণে 'উষাহরণ কাব্য'-এর একটি বিক্ষিপ্ত অংশ হিসাবে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি একটি পৃথক কবিতা বলে নির্ণীত হয় এবং 'বিবিধ রচনা'র ২য় সংস্করণে (১৯৭৫) স্থান পায়। রচনাকাল: আনুমানিক ১৯১২-১৩

পৃঃ ৫৮০ দৈত্যঃ রচনাকাল: আনুমানিক ১৯১২

পৃঃ ৫৮২ কতশত ছন্দোবন্ধেঃ নতুন সংযোজন। রচনাকাল: আনুমানিক ১৯১৩

পৃঃ ৫৮৩ পরাজিত রাবণঃ *Sri Aurobindo: Archives and Research,* এপ্রিল ১৯৭৯, রচনাকাল: **১৯১২-১৮**

পৃঃ ৫৮৭ একটি কবিতাঃ রচনাকাল: **১৯১২-১৮**

পৃঃ ৫৯০ সাবিত্রীঃ রচনাকাল: আনুমানিক **১৯১৬-১৭**

এই কবিতাটি মনে হয় ইংরাজী 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের প্রথম কাণ্ডের প্রথম সর্গের কোন একটি খসড়ার বাংলা সংস্করণ।

পৃঃ ৫৯২ জাগিল জননীঃ এই কবিতাটি **১৯০৩** সালে কিংবা তার কিছু পরে ভারতজননীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়।

পৃঃ ৫৯৫ উষাহরণ কাব্যঃ শ্রীঅরবিন্দের বরোদা থাকাকালীন (**১৮৯৩-১৯০৬**) এইটি রচিত হয়। কাব্যটির কিয়দংশ মাত্র পাওয়া গেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে "সবাই পাগল তোরা ঘুরি' ধরাতল" কবিতাটি এই কাব্যের অংশ হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল। আবার 'বিবিধ রচনা'য় (২য় সং **১৯৭৫**) 'উষাহরণ কাব্য' শিরোনামায় দুই পৃষ্ঠার অধিক কবিতা ছাপানো হয়েছে — তার মধ্যে মাত্র প্রথম একাদশ পঙ্‌ক্তি আমাদের হস্তগত বর্তমান পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মেলে। বাকি অংশ মনে হয় অন্য কোন স্বতন্ত্র কবিতার অংশ।

ছিন্নাংশ

এই অংশের সমস্ত রচনাই চতুর্থ সংস্করণে নতুন সংযোজন।

পৃঃ ৬৪৯-৫০ 'করোতোয়ার বর্ণনা' ও 'অরুণকুমারীর হরণ'ঃ SABCL, Vol. 27, Supplement হতে গৃহীত। এই দুটিই বরোদা হতে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মধ্যে পাওয়া যায়। রচনাকাল: **১৯০৩-০৬**

পৃঃ ৬৫০ আলাপনঃ দুইটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। একটি *Sri Aurobindo: Archives and Research*, ডিসেম্বর **১৯৮০**, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেইটি এখন পুনঃসংশোধন করা হল এবং অন্যটিও নতুন প্রকাশিত হল। রচনাকাল: আনুমানিক **১৯১৩**।

পৃঃ ৬৫৯ সুবল্যু-পুলস্ত্যঃ প্রথম প্রকাশ: 'বর্ত্তিকা' ২১ ফেব্রুয়ারি **১৯৮১**

'বর্ত্তিকা'য় শিরোনাম ছিল 'আলাপন'। পাণ্ডুলিপিতে কোন শিরোনাম

না থাকায় এবং অন্য একটি নাট্যাংশ বর্তমান সংস্করণে 'আলাপন' শিরোনামে মুদ্রিত হওয়ার জন্য এই রচনাটির শিরোনাম পরিবর্তিত হল। বর্তমানে মূল পাণ্ডুলিপি হতে পুনঃসংশোধিত। রচনাকাল: আনুমানিক ১৯০১-০৬

পৃঃ ৬৬০ ওহে ধরা, ধাত্রী মম... : 'বিবিধ রচনা' (২য় সংস্করণ, ১৯৭৫) হতে গৃহীত। সেখানে 'উষাহরণ কাব্য'-এর অংশ হিসাবে মুদ্রিত হলেও, বর্তমানে তার কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। রচনাকাল: অজ্ঞাত

অন্যান্য রচনাগুলি সরাসরি পাণ্ডুলিপি হতে গৃহীত। রচনাকাল: ১৯১০ হতে ১৯২০

পত্রপত্রিকা

বর্তমান তথ্যপঞ্জীতে নিম্নলিখিত পত্রপত্রিকাগুলি উল্লিখিত হয়েছে। তাদের যথাপ্রাপ্ত অসম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হল।

ধর্ম্ম: সাপ্তাহিক; প্রথম প্রকাশ ৭ই ভাদ্র ১৩১৬; সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

ভারতী: মাসিক; প্রথম প্রকাশ ১২৮৪; সম্পাদক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; আলোচ্য রচনা প্রকাশকালে সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রবর্ত্তক: পাক্ষিক; প্রথম প্রকাশ ১৩২২; সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক

নারায়ণ: মাসিক; প্রথম প্রকাশ ১৩২১; সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ; আলোচ্য রচনা প্রকাশকালে সম্পাদক শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সুপ্রভাত: প্রথম প্রকাশ ১৩১৪; সম্পাদক শ্রীমতী কুমুদিনী বসু

বর্ত্তিকা: ত্রৈমাসিক; প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৪১; সম্পাদক অনুল্লিখিত; আলোচ্য রচনা প্রকাশকালে সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শৃণ্বন্তু: মাসিক; প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৩৫৯; সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়; আলোচ্য রচনা প্রকাশকালে সম্পাদক শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য

যুগান্তর: সাপ্তাহিক; প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯০৬; সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

Sri Aurobindo: Archives and Research: প্রকাশকাল: এপ্রিল ১৯৭৭ হতে ডিসেম্বর ১৯৯৪

Hindustan Standard: কলিকাতার একটি দৈনিক সংবাদপত্র

संस्कृतरचनाः

विविधाः श्लोकाः

न वाचो मे सार्था इति मनुजसमाख्या हि सफला
न वृत्तैर्बुद्ध्यर्हैर्नर इति उपपद्येत पशुषु।
प्रलापो यस्यार्थो न हि फलति विशिष्टं पशुषु किं
कृतैर्यो देवत्वं व्रजति नृषु स सिद्धो नृचरितैः॥

*

पतति सहसा वर्माच्छन्नो यमस्य शरैर्गृहे
समरशिरसि क्राम्यन्नग्नो विहन्ति न हन्यते।
गहनतिमिरे देवो मृत्युर्नृभिर्न विलक्ष्यते
विहरति चरन्हन्त्येतान्तान्जहाति च कर्मजः॥

*

क्षुद्रो हि पक्षी महतां वसन्ते
गायन्नभूद्भाग्यकेलिं सुराणाम्।
पुंस्कोकिलो सद्मनि दैत्यनेतुः
बाणस्य कूजन्मधुरं प्रभाते॥

आसाद्य चाग्र्यं कुसुमार्तवृक्षं
तीरेषु सव्यः स कलं चुकूज।
ओजस्विनां कदनं नृपाणाम्
उत्पादयामास पिको दुरन्तः॥

प्राण इदं सर्वं

देव उवाच

प्राण इदं सर्वं व्याप्य तिष्ठति। प्राणो हि इदं सर्वं।

कः स प्राणः। महती काचिदास्था महत् किंचिद्बलं नामरूपे कल्पयति चेतनाचेतनानि सृजति दृश्यादृश्यानि मूर्च्छयति, तद्बलं प्राणः।

प्राण एवैतस्य मूर्तस्य कल्पयिता, मूर्तं सर्वं प्राण एव। प्राणो हि गृहस्य इष्टकाः, स एव प्राणो गृहनिर्माता।

गृहस्येष्टका विचिन्त्य रयिरूपं प्राणं साक्षी पश्यति। गृहनिर्मातारन्तु विचिन्त्य पुरुषरूपं प्राणं पश्यति।

का सा रयिः। प्रधानप्रकृतिरेव रयिः। सा तु प्रकृतिर्न सत्यमस्ति किन्तु मानसादर्शे पुरुषस्य इच्छायै प्रकृतिः कथ्यते। अतएव प्रधानप्रकृतिं विचिन्त्य तनूकृत्य तनूकृत्य महत्किञ्चिद्बलमेव साक्षी पश्यति।

बलं दृष्ट्वा किन्तद्बलमिति विमृश्य वासनारूपं प्राणं पश्यति।

महतीं काञ्चित् सर्वव्यापिनीं वासनां महतीं काञ्चिदाद्यन्तरहितां चेष्टां दृष्ट्वा म्लेच्छर्षयो जीवितेच्छेति ब्रुवन्ति।

तां जीवितेच्छामवरं ब्रह्मेति ब्रुवन्ति। परं ब्रह्म किन्तु जीवितेच्छारहित-मकथ्यं यन्न मनसः गोचरं न बुद्ध्या ग्राहितव्यं तज्जीवितेच्छाशान्त्या वशिनः प्राप्नुवन्ति।

न त्वेतेन तर्केण सन्तोषः। कस्य वासना किमर्थं कस्य चेष्टेति संशय उपपद्यते वासना हि न स्वयंभूता कस्मिंश्चिदाधारे विद्यते। मनसो वासना मनसः चेष्टा विभिन्नबोधेन कल्पिता मनो वासना मनो वासिता मनो वासनार्थं वस्तु इदं सर्वं मन एव। एतदेव योगवासिष्ठ उच्यते।

भवानी भारती

सुखे निमग्नः शयने यदासं मधोश्च रथ्यासु मनश्चचार।
स चिन्तयामास कुलानि काव्यं दारांश्च भोगांश्च सुखं धनानि॥ १॥

कान्तैश्च शृङ्गारयुतैश्च हृष्टो गानैः स छन्दो ललितं बबन्ध।
जगौ च कान्तावदनं सहास्यं पूज्ये च मातुश्चरणे गरिष्ठे॥ २॥

चक्रन्द भूमिः परितो मदीया खलो हि पुत्रानसुरो ममर्द।
स्वार्थेन नीतोऽहमनर्च पादौ दुरात्मनो भ्रातृवधेन लिप्तौ॥ ३॥

सुखं मृदावास्तरणे शयानं सुखानि भोगान्वसु चिन्तयन्तम्।
पस्पर्श भीमेन करेण वक्षः प्रत्यक्षमक्ष्णोश्च बभूव काली॥ ४॥

नरास्थिमालां नृकपालकाञ्चीं वृकोदराक्षीं क्षुधितां दरिद्राम्।
पृष्ठे व्रणाङ्कामसुरप्रतोदैः सिंहीं नदन्तीमिव हन्तुकामाम्॥ ५॥

क्रूरैः क्षुधार्तैर्नयनैर्ज्वलद्भि- र्विद्योतयन्तीं भुवनानि विश्वा।
हुङ्काररूपेण कटुस्वरेण विदारयन्तीं हृदयं सुराणाम्॥ ६॥

आपूर्य विश्वं पशुवद्विरावै- र्लेलिह्यमानाञ्च हनू कराले।
क्रूराञ्च नग्नां तमसीव चक्षु- र्हिंस्रस्य जन्तोर्जननीं ददर्श॥ ७॥

आलोलकेशैः शिखरान्निगृह्य करालदंष्ट्रैश्च विसार्य सिन्धून्।
श्वासेन दुद्राव नभो विदीर्णं न्यासेन पादस्य च भूश्चकम्पे॥ ८॥

उत्तिष्ठ देहीति पिपासुरम्बा दध्वान रात्रौ नगरे वितारे।
सेयं स्तनन्ती रजनीं तमिस्रां बभौ समापूर्य मनांसि चार्या॥ ९॥

भीतः समुद्विग्नमनाश्च तल्पा- दुत्थाय पप्रच्छ तमो नमस्यम्।
का भासि नक्तं हृदये करालि कुर्वीय किं ब्रूहि नमोऽस्तु भीमे॥ १०॥

सिंहस्य सारावमुदीरयन्ती क्रूरस्य कुञ्जे भ्रमतो वधार्थम्।
ससर्ज वाक्यानि करालमूर्ति- र्यथा समुद्रस्तनितं शिलायाम्॥ ११॥

मातास्मि भोः पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदशप्रियाणाम्।
शक्तो न यान्पुत्र विधिर्विपक्षः कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा॥ १२॥

ते ब्रह्मचर्य्येण विशुद्धवीर्या ज्ञानेन ते भीमतपोभिरार्याः।
सहस्रसूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्यां शुशुभुर्धरित्र्याम्॥ १३॥

शूराः प्रगल्भाश्च हि शात्रवाणां स्पर्धालवं सोढुममर्षणास्ते।
पूजां जनन्या रिपुभिः समाप्य रेजू रणान्ते रुधिराक्तदेहाः॥ १४॥

दीनाः क एते घृणिनो दरिद्राः शान्तिं जघन्यां गणिकामिवान्धाः।
भजन्ति भोः कापुरुषाः कुबुद्ध्या आलिङ्ग्य ये मोदथ मृत्युमेव॥ १५॥

क्लीवाः कियन्त्येवमसून्दिनानि धरिष्यथार्ताः प्रहृता वृथैव।
हसन्त्यमित्रा अपमानराशिं क्रीणीथ शान्त्या धनशोषणञ्च॥ १६॥

म्लेच्छस्य पूतश्चरणामृतेन गर्वं द्विजोऽस्मीति करोति कोऽयम्।
शूद्रादथानार्यतरोऽसि शूद्रो व्रतैः किमेतैर्नरकस्य पान्थे॥ १७॥

उत्तिष्ठ भो जागृहि सर्जयाग्नीन् साक्षाद्धि तेजोऽसि परस्य शौरेः।
वक्षःस्थितेनैव सनातनेन शत्रून्हुताशेन दहन्नटस्व॥ १८॥

कः क्षत्रबन्धुर्भवनेषु गूढो मद्येन कटाक्षैश्च विलासिनीनाम्।
धर्मान्यशो दुर्बल विस्मृतोऽसि युध्यस्व भो वञ्चक रक्ष धर्मान्॥ १९॥

अस्त्येव लोहं निशितश्च खड्गः क्रूरा शतघ्नी नदतीह मत्ता।
कथं निरस्त्रोऽसि मृतोऽसि शेषे रक्ष स्वजातिं परहा भवार्यः॥ २०॥

वैश्योऽसि कश्चेह विशः समृद्ध्यै धनं किमेतद्विपणीषु सज्जम्।
म्लेच्छर्द्धिरेषा कुरुषे दरिद्रां मामेव कालीं खल मातृद्रोहिन्॥ २१॥

म्लेच्छर्द्धिमेतां ज्वलनाय देहि रोषाग्निना किं न बिभेषि काल्याः।
देवीं भवानीं हृदि पूजयित्वा यतस्व लक्ष्म्यै भव जन्मभूम्याः॥ २२॥

भो भो अवन्त्यो मगधाश्च वङ्गा अङ्गाः कलिङ्गाः कुरवश्च सिन्धो।
भो दाक्षिणात्याः शृणुतान्ध्रचोला वसन्ति ये पञ्चनदेषु शूराः॥ २३॥

ये के त्रिमूर्तिं भजथैकमीशं ये चैकमूर्तिं यवना मदीयाः।
माताह्वये वस्तनयान्हि सर्वान् निद्रां विमुञ्चध्वमये शृणुध्वम्॥ २४॥

कालस्य भेरीं शृणुताद्रिशृङ्गे रौद्रं कृतान्तं मम दूतरूपम्।
दुर्भिक्षमेतानथ भूमिकम्पान् निबोधताधीशतमागतास्मि॥ २५॥

देहि क्रतून्देहि पिपासुरस्मि जानीहि दृष्ट्वा भज शक्तिमाद्याम्।
शिरांसि राज्ञां महतां तनूश्च भोक्तुं नदन्ती चरतीह काली॥ २६॥

रक्तप्रवाहैरपि नास्मि तृप्ता शतैः सहस्रैरयुतैरजानाम्।
प्रदत्त भित्वा हृदयानि रक्तं सम्पूजयन्त्येवमजां करालीम्॥ २७॥

येषां सदैवात्मबलिप्रवृत्ताः शूरा महान्तः प्रमुखाः कुलार्थे।
सौम्या कराली भवति प्रजानां रक्तेन पुष्टा विनिहन्ति शत्रून्॥ २८॥

कं बिभ्यथार्या रुधिरस्य सिन्धौ निमज्जतास्मिन्भवतार्यसत्त्वाः।
त्रिशूलि भोः पश्यत तत्र पारे ज्योतिर्ह्युदेतीदमभिन्नतेजः॥ २९॥

कवे विलासिञ्शृणु मातृवाक्यं कालीं करालीं भज पुत्र चण्डीम्।
द्रष्टासि वै भारतमातरं तां घ्नतीमरातीन्भृशमाजिमध्ये॥ ३०॥

सनातनान्याह्वय भारतानां कुलानि युद्धाय जयोऽस्तु मा भैः।
भो जागृतास्मि क्व धनुः क्व खड्ग उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत सुप्तसिंहाः॥ ३१॥

इमानि वाक्यानि निशम्य रात्रौ तेजश्च भीमं तिमिरे विलोक्य।
चित्तं ननर्ताशु विहाय सद्म भोगान्विनिर्धूय च निर्जगाम॥ ३२॥

सान्द्रं तमिस्रावृतमार्तमन्धं ददर्श तद्भारतमार्यखण्डम्।
गूढा रजन्यामरिभिर्विनष्टा माता भृशं क्रन्दति भारतानाम्॥ ३३॥

स भ्रामयामास दृशं रजन्यां भ्रातॄन्स तप्तस्तिमिरे विचिन्वन्।
कङ्कालसाराणि ददर्श तानि शवानि तेषां करुणानि भूमौ॥ ३४॥

तदा ददर्शासुरमेकमीशं किरीटिनं वज्रधरं महान्तम्।
अश्रूणि रक्तौघशतानि मातुः संगृह्य पुष्णन्तमपत्यसंघान्॥ ३५॥

पदा तुषाराद्रिमदीनसत्त्वं मृद्नन्तमन्ध्रानितरेण पौण्ड्रान्।
प्रसारयन्तं करवालमुग्रं चीनावनौ पह्लवभूमिखण्डे॥ ३६॥

खलं विशालं बलगर्वितं तं विकत्थमानं धर्ममधर्मबुद्धिम्।
दृष्ट्वा त्वभूच्चित्तमिवाग्निकुण्डं क्रोधेन जज्वाल हि शाश्वतेन॥ ३७॥

कुलानि सुप्तानि सनातनानि ह्वातुं जगौ जागरणाय भीमा।
क्रूरं विरावौघमुदीरयन्ती पार्श्वे ममायाद्रजनीव घोरा॥ ३८॥

भीमैः करालैर्धरणी वचोभि- श्चचाल सिन्धुश्च नभो जगर्ज।
भीमैः सरोषैश्च विलोकनैस्तै- र्ब्रह्माण्डमुत्तप्तमिवाग्निवृष्ट्या॥ ३९॥

त्रैलोक्यमुन्मादकरैः कराल्या आवाहनैः पूर्णमभूच्च सर्वम्।
ज्वालामुखी दारुणवह्निगर्भा कण्ठादुदक्रामदजस्रशब्दा॥ ४०॥

क्षोभेण तीव्रेण चराचरस्य क्षुब्धान्यपश्यं पृतनानि तत्र।
स्वप्नोत्थितानीव वचः सुरौद्रं भो हन्यतां दुष्ट इतीरयन्ति॥ ४१॥

ज्ञात्वा हि मातू रुदितं क्षतानि विद्युद्धराणीक्षणशतान्यभूवन्।
क्रोधैः सहस्राणि ततो मुखानि भीमानि भीमं दनुजेशमायन्॥ ४२॥

सुप्तेषु पुत्रेषु रणोत्सुकेषु निशाचरः शोणितमार्यमातुः।
पिबन्विनर्दस्यबलान्बली को विहंसि चाण्डाल कृतान्तभक्ष्य॥ ४३॥

इतीरयन्ती वचनानि रुष्टा शस्त्रं गृहीत्वा धनुरग्निगर्भम्।
अभ्यद्रवद्भीमरातिमुग्रा पश्चात्पुरस्ताच्च जगर्ज काली॥ ४४॥

ज्वालाकराला धरणी बभूव क्रोधैर्ज्वलद्भिर्गगनञ्च तूर्णैः।
ह्रेषारवैर्दुन्दुभिनाञ्च नादै- र्जगद्वित्रस्तं दनुजस्य युद्धे॥ ४५॥

रक्ताक्तमेघा नभसीव तेपुः पपात चोर्व्यां रुधिरोग्रवृष्टिः।
रक्तोदधौ रेजिर अद्रिसंघा वसुन्धरा रक्तमयी बभासे॥ ४६॥

भीमो रजन्यामसुरो बलीयान् ममर्द सैन्यानि सुरप्रियाणाम्।
जगर्ज चोन्मत्तमनाः सुरारिः को मे समः पुंस्विति रूढगर्वः॥ ४७॥

तदा तमिस्रामपसारयन्तं रक्तप्रकाशं दिवि बालसूर्यम्।
शरोपमैर्घ्नन्तमिवांशुभिस्तं प्रीतो ददर्शाहमुदग्ररश्मिम्॥ ४८॥

समाकुलं भाविभिरास्यवर्यै- र्ब्रह्माणमपश्यमथाभ्ररूपम्।
सहस्रनेत्राणि ददर्श तस्मिन् प्रतीक्षमाणान्यभयं जनन्याः॥ ४९॥

द्विकोटिभास्वद्वरसूर्यभासं ज्योतिस्तदा सौम्यमरातिनाशि।
नारीशरीरं रमणीयकान्ति दूरादुदीच्यामुदियाय शुभ्रम्॥ ५०॥

तां ह्लादिता दीप्तजगत्सु देवा- स्तामन्तरीक्षे मधुरं वयांसि।
जगुर्मनुष्याः प्रणिपत्य चोर्व्यां विश्वं विनष्टाधि यदाविवेश॥ ५१॥

समाधिधीरा हिमभूतदेहा युगान्यनेकानि हिमाद्रिकूटे।
ये योगिनो भारतगोप्तृरूपा- स्ते तुष्टुवुस्तां मुदिता महान्तः॥ ५२॥

ज्ञानाकरेभ्यो हि विलोचनेभ्यो हिमानि मन्दं युगसञ्चितानि।
उत्सार्य देवीमथ भीमकान्तिं महाप्रतापा बलिनीमगायन्॥ ५३॥

तुभ्यं नमो देवि विशालशक्त्यै नमामि भीमां बलिनीं कृपालुम्।
त्वमेव वै तारयसीह जाती- रूर्जस्वलायै नम आदिदेव्यै॥ ५४॥

कस्ते बलं वर्णयितुं समर्थो देवि प्रचण्डे करपल्लवेन।
एकेन हि भ्रामयसे रुणत्सि विश्वं सतारार्कमनन्तवीर्ये॥ ५५॥

आजौ यदा नृत्यसि चण्डि घोरे शृगालघुष्टे दधती त्रिशूलम्।
स्पर्शेन कम्पन्त इवायुधस्य महान्ति तारानियुतानि नाके॥ ५६॥

दयार्द्रचित्ता रुदितेन पुंसां हंसि प्रजापीडकमस्तकेषु।
यो मृत्युरत्ता भुवनस्य रौद्रः स किंकरस्ते वसति त्रिशूले॥ ५७॥

शक्तिः परा कोटिषु मानवानां समन्युनां त्वं भवसि प्रबुद्धा।
आर्यान्विपन्नानवतीर्य पासि युगे युगे युध्यस आर्यमातः॥ ५८॥

सद्योऽपि पश्यामि गिरावुदीच्यां देदीप्यमानं धवलं वपुस्ते।
त्वं भ्राजसे ज्योतिरुदेषि सौम्ये प्रकाशयन्ती भुवनानि कान्त्या॥ ५९॥

धेनौ समारूढमनोज्ञकान्ती रणोन्मदायां चरसीयमार्या।
शैला इवोत्तुङ्गशिखाः समूलाः पतन्ति संघाः परितोऽसुराणाम्॥ ६०॥

सा शुभ्रवर्णासितवृत्तशृङ्गा हिमस्य राशिश्चलतीव तूर्णम्।
देवप्रिया भारतभूमिरार्या धेनुस्वरूपेण विहन्ति शत्रून्॥ ६१॥

व्यूहास्त्वकस्माज्जितदैवतानां भयेन ते पाण्डुरवक्त्रकान्त्यः।
वारिप्रपाता इव पर्वतेभ्यो धावन्त्यधो वेगपराः सशब्दाः॥ ६२॥

शृणोमि ते पाञ्चनदेषु भीमे स्वरानुदाराञ्जयनादमुग्रम्।
निहन्यमानस्य रवं बलस्य भयङ्करे तारतरं शृणोमि॥ ६३॥

कृष्णस्य सैषा यमुना स्रवन्ती रक्तेन नीलं विससर्ज वर्णम्।
वङ्गेष्वसृक्कर्दममेव पश्य दिग्दक्षिणा भाति सुलोहितेव॥ ६४॥

स्पृष्टास्त्रिशूलेन विहायसीमाः सुलोहिता भान्ति दिशः समन्तात्।
अभ्राणि ते रक्तमयानि भीमे विभान्ति युद्धेन सुदारुणेन॥ ६५॥

सिन्धोस्तटेषूपलकर्कशेषु देवीमपश्यं युधि शेषितारीन्।
निःशेषयन्तीमदयां सकोपां शिवां त्रिशूलेन शिवस्य शत्रून्॥ ६६॥

खुरैः सुनिष्पिष्टमिदं सुरभ्या घोरं किमेवापि सुकृष्णवर्णम्।
मांसस्य पिण्डं ह्यवनौ निरीक्षे शेषोऽयमस्त्येव तवाहितानाम्॥ ६७॥

भग्नानि तस्मिन्निचये विरूपे प्रनिःसरन्तीव शिरांसि कानि।
पादाः कराश्चापि हि तत्र तत्र क्रूरासि रुद्राणि करालकृत्या॥ ६८॥

क्रूरासि रुद्राण्यथवा जघन्ये क्रूरे प्रजापीडनरूढगर्वे।
दयेव भूतेयमलं यदार्यं स्वर्गप्रदं मृत्युमवाप युद्धे॥ ६९॥

एको गतासोरपि रुद्रशत्रो- र्धत्ते करः पावकगर्भमस्त्रम्।
लुष्टश्च चीर्णश्च तथापि दग्धा- नसून्भवान्यां क्षिपतीव दैत्यः॥ ७०॥

स्रोतांसि पश्यामि महायुधास्या- दुर्न्निर्यमाणानि हुताशनस्य।
धृष्टोऽप्यसौ नालभते तु चण्डीं तिष्ठत्प्रभामण्डलमूर्तिमग्रे॥ ७१॥

खड्गः प्रक्षिप्तस्तु विषाणमध्ये विष्टम्भयत्यन्तिमचेष्टितन्तत्।
समाप्तमेतत्तव तर्कयामि महाव्रतं देवि विशालवीर्ये॥ ७२॥

तुभ्यं नमो देवि विशालशक्त्यै भीमव्रते तारिणि कष्टसाध्ये।
त्वं भारती राजसि भारतानां त्वमीश्वरी भासि चराचरस्य॥ ७३॥

त्वमीश्वरी त्वं जननी प्रजानां कोऽन्यः प्रभुर्दानमिदं तवाद्ये।
स्वामित्वमैश्वर्यमनिन्द्यतेजो ददासि या सापि निहंसि रुष्टा॥ ७४॥

नमो नमो वाहनमेतदार्ये हिमाभकान्तं मधुरायताक्षि।
तल्लाङ्गुलाग्रेण सुकृष्णभासा ध्वजं करोतीव तवोच्छ्रितेन॥ ७५॥

नमो नमो देवि तवालकाली रणश्रमेण प्रसभं विमुक्ता।
उड्डीयमाना नभसीव मेघो वेणिच्युता भाति सुदीर्घवक्रा॥ ७६॥

श्वेतानने विद्युदिवासि भूमौ रुषा प्रदीप्ते हि विलोचने ते।
क्रीडन्त्यपाङ्गेषु करालहासाः शतह्रदेव स्तनयित्नुमध्ये॥ ७७॥

द्रष्टुं रिपूंस्तान्पतितान्गतासून् ग्रीवेयमीषन्नमिता च शुक्ला।
सजानुवर्यं चरणं भवान्याः स्तम्भो हिमस्येव विभाति शुभ्रः॥ ७८॥

शुक्लं प्रवातैरनिलोपमं ते संक्षोभितं भासुरतोयदाभम्।
वातीव वासो रुचिराणि मध्ये भ्राजन्त अङ्गानि शशिप्रभेव॥ ७९॥

उदीर्णफेनः पयसस्तरङ्गः क्षीराब्धिमध्ये स्तन एक एषः।
त्वं दुर्निरीक्ष्यासि यदङ्गकान्ते- स्त्विषाक्षिरम्ब प्रतिहन्यते मे॥ ८०॥

सनातनी देवि शिवस्य पूर्वं वपुस्त्विदं धारयसे युवत्याः।
तुभ्यं नमस्तुभ्यमनादिमातः सौम्या भवाम्ब प्रणतेषु भीमे॥ ८१॥

उद्दिश्य भूमिं द्रुमराजिनीलां शैलान्तरालेषु महत्सु दृश्याम्।
कारुण्यमय्याः प्रसृतः करस्ते ददासि रुद्राण्यभयं प्रजानाम्॥ ८२॥

तत्संज्ञया ते करपल्लवस्य तमो विधूतं भुवि भारतानाम्।
रक्तस्य मेघा नभसोऽपधूता अचिन्त्यवीर्यासि शुभासि सौम्या॥ ८३॥

सौम्यं वपुस्ते हिमवर्णमार्यं सौम्यं भवान्या वदनं ह्युदारम्।
शुक्लाम्बरां यौवनशुभ्रकान्तिं स्नेहार्द्रनेत्रां बलिनीं नमामि॥ ८४॥

नरास्थिमाला नृकपालकाञ्ची क्व सा कराली [क्षुधिता च काली]।
नग्ना च घोरा विवृतास्यभीमा यस्या विरावैः सहसोत्थितोऽस्मि॥ ८५॥

रक्तस्य योऽयं वहतीह सिन्धु- श्छाया शुभाया हसतीव तस्मिन्।
खड्गं परिभ्रामयति स्तनन्ती नग्ना सुघोरा च नमामि कालीम्॥ ८६॥

काली त्वमेवासि सुनिष्ठुरासि त्वमन्नपूर्णा सदया च सौम्या।
नमामि रौद्रां भुवनान्तकर्त्रि प्रेमाकुलामेव नमामि राधे॥ ८७॥

अनन्तशक्त्यृद्धिमशेषमूर्तिं को वक्ष्यतीमां तव सर्वशक्ते।
तेजस्त्वमेतद्बलिनां बलञ्च त्वं कोमलानामपि कोमलासि॥ ८८॥

सौम्यामहं त्वां द्विभुजां नमामि त्रिशूलिनीं त्वामभयं वहन्तीम्।
त्वामम्ब सावित्रि शुभे त्रिनेत्रे शुक्लाङ्गवस्त्रां वृषरूढकान्तिम्॥ ८९॥

दशायुधाढ्या दशदिक्ष्वगम्या पातासि मातर्दशबाहुरार्यान्।
सहस्रहस्तैरुपगुह्य पुत्रा- नास्से जगद्योनिरचिन्त्यवीर्या॥ ९०॥

प्रकाशयन्तीं गहनानि भासै- र्भीमां ज्वलत्पर्वतमूर्तिमग्र्याम्।
पश्यामि देवीं नगरेषु सौम्यां द्वारि स्थितामार्यभुवः सखड्गाम्॥ ९१॥

कलिं दमित्वा जननी प्रजानां सत्त्वाधिका[पत्यकुलैर्विभाति]।
स्वाधीनवृत्तीनि पुनश्चरन्ति पश्यामि तान्यागममार्गगाणि॥ ९२॥

पुनः शृणोमीममरण्यभूमौ वेदस्य घोषं हृदयामृतोत्सम्।
सुज्ञानिनामाश्रमगा मुनीनां कुल्येव पुंसां वहति प्रपूर्णा॥ ९३॥

सनातनान्रक्षति धर्ममार्गान् पुनः सहस्रांशुकुलार्यजन्मा।
लक्ष्मीः पुनः साप्यचला स्मितास्या समुज्ज्वला राजति भारतेषु॥ ९४॥

पुरातनीं मातरमागमाना- मागच्छताञ्च स्तुवताञ्च भूमिम्।
प्राच्यां प्रतीच्यां जगतोऽखिलस्य कोलाहलं वेगरवाञ्शृणोमि॥ ९५॥

सद्धर्मगर्भेति महाव्रतेति स्तुवन्ति सौम्याञ्च भयङ्करीञ्च।
देव्याः प्रियां भूमिमनादिशक्त्या- स्तीर्थस्वरूपेण च पूजयन्ति॥ ९६॥

शिवस्य काश्यां निवसन्ति ये के मुक्ताः शिवस्पर्शेन भवन्ति देव्याः।
पादार्पणेनैव तु पावनेन सर्वार्यभूमिर्जगतोऽपि काशी॥ ९७॥

प्रीतिर्दया धैर्यमदम्यशौर्यं श्रद्धा तितिक्षा विविधाश्च विद्याः।
अनन्तरूपे त्वमसि प्रसीद चिरं वसार्ये हृदि भारतानाम्॥ ९८॥

सिन्धून्हिमाद्रिञ्च सुसौम्यभासा प्रकाशयन्ती सुदृढप्रतिष्ठा।
तिष्ठ प्रसन्ना चिरमार्यभूमौ महाप्रतापे जगतो हिताय॥ ९९॥

तान्त्रिकसिद्धिप्रकरणम्

तस्मिंश्च शक्तिप्रकरणम्

शक्त्युपासना तान्त्रिकसिद्धिः।

द्विविधोपासना साहमिति सा प्रकृतिरहं पुरुष इति। एते द्वे पूर्णे खण्डोपासनाप्यस्ति भेदप्रधाना द्वैतमयी साऽविद्योपासना न प्रवरा।

साध्यन्तु कालीभावो वा विभूतिभावो वा।

साहमितिसाधनस्य कालीभावो विभूतिभावस्तु प्रकृतिसाधनस्य।

द्वयोरपि साधनमात्मसमर्पणम्।

न मे साधनं तवैव साधनं न मे भारस्तवैव भारस्त्वमेहि त्वं कर्त्री शक्तिर्नाहं कर्ता नाहं शक्तस्त्वमेव साधनं कुरु कालीत्यात्मसमर्पणम्।

तस्य धर्माधर्मपापपुण्यमंगलामंगलप्रियाप्रियविचारं परित्यज्य निश्चेष्टस्य सुखासीनस्य काली शरीरं प्रविशति।

हुङ्काराट्टहाससिंहनाददर्शनशक्तिबोधैर्ज्ञातं भवति प्रवेशनम्।

योगक्रियाप्रवर्तनेन वा॥

सा प्रविष्टाहङ्कारमपनुदति।

तामसं निकृष्टमहङ्कारमपनुदति।

राजसं तदनन्तरमहङ्कारमपनुदति।

परस्ताद्राजसतामसमिति मिश्रमपनुदति।

सात्त्विकमहङ्कारमपनुदति।

गुणत्रयातीतं करोति।

सर्वानशुद्धान् संस्कारानपनुदति।

एतदेव चित्तशोधनम्।

न साधुभावश्चित्तशुद्धिरहङ्कारवर्जनन्तु संस्कारशोधनञ्च लक्षणम्।

साधुर्ह्यहङ्कारं सात्त्विकं रक्षति न तदर्पयति भगवते।

एतत्पुण्यमेतत्पापमेतत्करिष्यामि नैतत्करिष्यामीति पापपुण्यबोधः सि-द्धिविघ्नकरः।

अज्ञानजो हि नास्ति पापं नास्ति पुण्यमीश्वरेच्छा वर्तते त्वाश्रित्य स्वभावम्।

न पापचित्तस्तान्त्रिकः सिद्धो भवति न पुण्यचित्तस्तच्चित्तस्तु सिद्धो भवति स एव तान्त्रिकः।

कष्टा तु चित्तशोधनक्रियानन्दमयी चित्तशुद्धिर्धैर्यं कर्तव्यं श्रद्धा कर्तव्या न व्याकुलता न साधनफलाकाङ्क्षा कथं न भवतीति कष्टमद्य भवेदिति।

सा प्रविष्टा ज्ञानं ददाति शक्तिं ददाति प्रेम ददाति ददात्यानन्दं।

अपूर्णानि त्वेतानि चास्थिराणि चित्तशोधने शुद्ध्यान्तु पूर्णानि भवन्ति।

न सा पूर्णता सिद्धिः सिद्धिप्रतिष्ठा तु सिद्धिप्रवर्तनञ्च कालीसंगमः सिद्धिः।

साधर्म्यमेव तत् प्रतिष्ठा साधर्म्यं सिद्धेः।

तत्साधर्म्यस्य चतुष्टयचतुष्कं लक्षणम्।

तद्यथा शुद्धिचतुष्टयं शक्तिचतुष्टयं ज्ञानचतुष्टयं सौन्दर्यचतुष्टयञ्च।

समता शान्तिः सुखं हास्यं शुद्धिचतुष्टयम्।

फलत्यागः कर्मत्यागः कामनात्याग इति समता।

न त्वप्रवृत्तिस्त्यागः सा हि तामसी भगवति तु सन्न्यासो बुद्धौ निर्लिप्तबुद्धिरेव समो न त्यक्तप्रवृत्तिः स जडो न समः।

तद्यथा त्वं यत्प्रवृत्तिं दास्यसि तत्कर्म करिष्यति शक्तिर्यत्फलं दास्यसि तद्भोक्ष्यति यं कामं प्राणे दास्यसि तत्कामयिष्यति नाहं कर्ता नाहं कामविद्धो ज्ञाताहं भोक्ताहं पुरुषोत्तमोऽनुमन्ता तस्यानुमतं काली करोति तस्याः कर्म कामं फलमहं ज्ञास्यामि भोक्ष्यामि च समभावेन सुखमानन्द इति।

स्थैर्यमनुद्वेगो धैर्यमिति शान्तिः।

तदपि चित्ते। उग्रभावोऽपि रुद्रकर्मा शान्तिसंपन्नो भवेत्।

सप्तचतुष्टयम्

शक्तिचतुष्टयम्

वीर्यं — अभयं, साहसं, यशोलिप्सात्मश्लाघा क्षत्रियस्य, दानं व्ययशीलता कौशलं भोगलिप्सा वैश्यस्य, ज्ञानप्रकाशो ज्ञानलिप्सा ब्रह्मवर्चस्यं स्थैर्यं ब्राह्मणस्य, प्रेम कामो दास्यलिप्सात्मसमर्पणं शूद्रस्य, सर्वेषां तेजो बलं प्रवृत्तिर्महत्त्वमिति वीर्यं।

शक्तिः — देहस्य महत्त्वबोधो बलश्लाघा लघुत्वं धारणसामर्थ्यञ्च, प्राणस्य पूर्णता प्रसन्नता समता भोगसामर्थ्यञ्च, चित्तस्य स्निग्धता तेजःश्लाघा कल्याणश्रद्धा, प्रेमसामर्थ्यञ्च, बुद्धेर्विशुद्धता [प्रकाशो] विचित्रबोधः सर्वज्ञान-कार्यसामर्थ्यञ्च, सर्वेषां तु क्षिप्रता स्थैर्यमदीनता चेश्वरभाव इति शक्तिः।

चण्डीभावः — शौर्यमुग्रता युद्धलिप्साट्टहास्यं दया [चेश्वर]भावश्च सर्वसाम-र्थ्यमिति चण्डीभावस्य सप्तकं।

श्रद्धा तु निहतसंशयाप्रतिहता निष्ठा भगवति च स्वशक्त्याञ्च।

देवीभावः

महालक्ष्मीभावः — सौन्दर्यदृष्टिः लालित्यं कल्याणलिप्सा प्रेमहास्यं दया चे-श्वरभावः सर्वकर्मसामर्थ्यं

महेश्वरीभावः — सत्यदृष्टिः ऋजुतामहिमा बृहल्लिप्सा ज्ञानहास्यं दया चे-श्वरभावः सर्वकर्मसामर्थ्यं

महासरस्वतीभावः — कर्मपाटवं विद्या उद्योगलिप्सा सुखहास्यं दया चेश्वर-भावः सर्वकर्मसामर्थ्यं

दास्यम्

गुरुशिष्यभावः
- अधमः — दासभावात्मकः
- मध्यमः — सख्यभावात्मकः
- उत्तमः — मधुरभावात्मकः

दास्यभावः
- अधमः किङ्करभावात्मकः
- मध्यमः सख्यभावात्मकः
- उत्तमः मधुरबद्धभावात्मकः

सख्यभावः
- अधमः गुरुशिष्यभावात्मकः
- मध्यमः सहचरभावात्मकः
- उत्तमः मधुरबद्धभावात्मकः

वात्सल्यभावः
- अधमः पाल्यपालकभावात्मकः
- मध्यमः स्नेहभावात्मकः
- उत्तमः मधुरभावात्मकः

मधुरभावः
- अधमः स्त्रीपुरुषभावात्मकः
- मध्यमः स्वैरभावात्मकः
- उत्तमः दासभावात्मकः

विज्ञानचतुष्टयम्

त्रिकालदृष्टिः—प्राकाम्यं व्याप्तिः साक्षाद्ज्ञानं प्रेरणा सहजदृष्टिर्विवेकः शकुनिदृष्टिर्ज्योतिषदृष्टिः सामुद्रिकदृष्टिः सूक्ष्मदृष्टिर्विज्ञानदृष्टिर्दिव्यदृष्टिश्चित्रदृष्टिः स्थापत्यदृष्टी रूपदृष्टिरिति त्रिकालदर्शनस्य विविधा उपायाः। ते तु द्विविधविषया यथा परकालविषया इहकालविषयाश्च। तस्मिन्नपि द्विविधविषये शब्ददृष्टिः स्पर्शदृष्टिर्देहदृष्टी रसदृष्टिर्गन्धदृष्टिरिति भागाः देहक्रियाविषयाः चिन्तादृष्टिश्च भावदृष्टिः बोधदृष्टिश्चान्तःकरणसंश्लिष्टाः। अन्या अपि सन्त्यप्रकाशिताः।

सर्वज्ञानं—सर्वविषये अप्रतिहतो ज्ञानप्रकाश इति सर्वज्ञानं तस्मिंश्च साक्षाद्ज्ञानं प्रेरणा सहजदृष्टिर्विवेकश्च प्रमुखाः बोधः स्मृतिः विचारो वितर्कः

साक्षाद्ज्ञाने बोधः सर्वविधः अप्रतिहतः, प्रेरणायां वाक् च स्मृतिश्च सहजदृष्ट्यां वितर्कोऽप्रतिहतोऽभ्रान्तश्च विवेके तु विश्लेषः प्रज्ञा चेति विचारः

सिद्ध्यष्टकं ज्ञातमेव।

सर्वत्रगतिः। व्याप्त्यां वा चिन्तायां भावे बोधे सर्वभूतानां सर्वत्रगतिः शारीरिकी तु सप्तदेहेषु स्वप्ने सुषुप्त्यां वा जाग्रत्यां वा। अन्नमयस्त्वाकाशगत्या निःसृत्य सर्वत्र गच्छति जाग्रत्यां, प्राणमयस्तु यश्छायामयः कल्पनामयः त्रिषु तद्वत् तेजोमयः सूक्ष्मश्च यौ द्विविधौ मनोमयौ विज्ञानमयश्च बुद्धिमयश्च यौ द्विविधौ महति प्रतिष्ठितौ।

एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म

श्रीअरविन्दोपज्ञा उपनिषद्

ॐ। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म सदसद्रूपं सदसदतीतं नान्यत्किञ्चिदस्ति त्रिकालधृतं त्रिकालातीतं वा सर्वन्तु खलु ब्रह्मैकं यत्किञ्च जगत्यामणु वा महद्वोदारं वानुदारं वा ब्रह्मैव तद् ब्रह्मैव जगदपि ब्रह्म सत्यं न मिथ्या।

स एव परात्परः पुरुषस्त्रिकालातीतः सकलभुवनातीतः सकलभुवनप्रविष्टः सदतीतोऽसदतीतः सन्मयश्चिन्मय आनन्दमयोऽनाद्यन्तः सनातनो भगवान्।

स निर्गुणो गुणान्धत्ते सगुणोऽनन्तगुणो निर्गुणत्वं भुङ्क्ते स्वयञ्चातिवर्तते निर्गुणत्वञ्च सगुणत्वञ्च न निर्गुणो न गुणी केवल एव यः।

स भुवनातीतो भुवनानि धारयति भुवनभूतो भुवनानि प्रविशति कालातीतः कालो भवत्यनन्तः सान्तः प्रकाशत एको बहवोऽरूपो रूपी विद्याविद्यामय्या चिच्छक्त्या।

स्वयन्तु न धर्ता न धार्यो नानन्तः न सान्तो नैको न बहुर्नारूपो न रूपी केवल एव यः।

सर्वाणि त्वेतानि नामानि यदेकत्वञ्च बहुत्वञ्चानन्तञ्च सान्तञ्च प्रकाशन्त एव चिदात्मनि चिन्मये जगति।

ॐ तत्सत् यच्च सच्चिदेव तच्चिन्मयं जगद् भासते चिदात्मनि सत्यप्रकाशः सत्यस्य भगवतः।

यथा सूर्यस्य प्रतिबिम्ब एकः शान्ते जले बहवश्चले सत्यः सूर्यः सत्यः प्रतिबिम्बः सत्यप्रकाशः सतः सूर्यस्य न स स्वप्नः सतः प्रकाशस्तु सः। यथा वा सूर्यस्य ज्योतिः सौरं जगत्स्वशक्त्या धावदिव पूरयत्प्रकाशते सत्यं ज्योतिः सत्यप्रकाशः सतः सूर्यस्य न सोऽलीका भातिः सतः सत्यप्रकाशस्तु सः। यथा वा सूर्यस्य ज्वालामयं बिम्बं न स्वयं सूर्यः सूर्यस्य तु सूर्यत्वं प्रकाशयत्येतदन्नमयं रूपमन्नाश्रिते ज्ञाने तद्रूपातीतस्तु सूर्यः सत्यः सूर्यः सत्यं रूपं बिम्बाकृति सत्यप्रकाशः सतः सूर्यस्य न स मायाचित्रं सतः सत्यप्रकाशस्तु सः।

तथेदं जगद्ब्रह्म सत्यप्रकाशो भगवतो न स्वप्नो न मायाचित्रं नालीका भातिः सतः सत्यप्रकाशस्तु तद् न स्वयं भगवान् तथापि स्वयमेव सः। एषा परा मायैषा योगमाहात्म्यं रहस्यमयस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्यैषा चिच्छक्त्या आनन्दमयी लीला परस्यातर्क्या गतिः।

सर्वमिदमर्थतः सत्यं परार्थतः असत्यमिति मनस्तुष्ट्यर्थं विज्ञानार्थमुच्यतां न हि किञ्चिदप्यसत्यं सत्ये ब्रह्मणि।

एवं यत्प्रकाशते जगदानन्द एव तत्।

ॐ तत्सत् यच्च सच्चिदेव तद्यच्च चित्स आनन्दः। यत्तु निरानन्दमिति भासते दुःखमिति दुर्बलमित्यज्ञानमिति तदानन्दस्य विकार आनन्दस्य क्रीडा।

यो हि जीवः स आनन्दमयः प्रच्छन्नो भगवान् स्वप्रकाशमयं जगद्ब्रह्म भोक्तुमवतीर्णः। य एष दुःखभोगः स भोग एवानन्दमयस्तस्यानन्दमेवानन्दमयो भुङ्क्ते।

को हि निरानन्दं भोक्तुमुत्सहेत यः सर्वानन्दमयः स एवोत्सहेत निरानन्दमयस्तु निरानन्दं भुञ्जानो न भुञ्जीतानन्दं विना प्रणश्येत्। को दुर्बलो भवितुं शक्नुयाद्यः सर्वशक्तिमान्स एव शक्नुयाद् दुर्बलो ह्याक्रान्तो दुर्बलत्वेन न तिष्ठेच्छक्तिं विना प्रणश्येत्। कोऽज्ञानं प्रवेष्टुं समर्थो यः सर्वज्ञानमयः स एव समर्थोऽज्ञस्तु तस्मिंस्तिमिरे न ध्रियेतासत्त्वसदेव भवेद् ज्ञानं विना प्रणश्येत्। ज्ञानस्य क्रीडाज्ञानं स्वस्मिन्नात्मगोपनं शक्तेः क्रीडा दौर्बल्यं निरानन्दमानन्दस्य क्रीडात्मगोपनं स्वात्मनि।

सानन्दं हसति जीवः सानन्दं क्रन्दत्यश्रूणि मुञ्चति तमोमय आनन्दे भासमान इव यातनाभिश्चेष्टमानः सानन्दं स्फुरति सानन्दं स्फुरति चेष्टमानः प्रचण्डाभी रतिभिः। पूर्णभोगार्थं तस्यानन्दस्य तामसस्यांशस्य तामसो भूत्वानन्दं गोपयति।

अज्ञानं मूलमेतस्य भावस्य सान्त एवाहमहमशक्तो दुर्बलो दुःखी मया कर्तव्यं ज्ञातव्यं लब्धव्यं प्रयासेन तपःक्षयेण मृत्युना स त्वमेषोऽहं यत्त्वं न तदहं यत्तव शुभं तन्ममाशुभं येन तव लाभस्तेन मम हानिः त्वामेव हन्यां सुखी भविष्यामि नैव सात्त्विकोऽहं त्वामेव सुखिनं करोमि स्वदुःखेन स्वहान्या स्वमृत्युनेत्याद्यज्ञानस्य स्वरूपं मनसि।

अहङ्कार एव बीजमहङ्कारमोक्षादज्ञानमोक्षः अज्ञानमोक्षाद् दुःखान्मुच्यत आनन्दमयोऽहं सोऽहमेकोऽहमनन्तोऽहं सर्वोऽहमिति विज्ञायानन्दमयो भवत्यानन्दो भवति।

एष एव मोक्षः। स मुक्तः सर्वेषां भोगान्भुङ्क्ते सर्वानानन्दाननन्तं भुञ्जानो न सान्तैर्वियुज्यते सान्तानि भुञ्जानो नानन्तेन हीयते स एको भवति बहुर्भवति स ह्यजो जायत इव जायमानोऽपि न जायते न बध्यते न जन्म तस्य विद्यते आत्मन्यात्मात्मना प्रकाशयाम्यात्मानमिति ज्ञानाद् विमुक्तः क्रीडते।

लीलार्थं हि जगदानन्दार्थं लीलामय इति लीलां कुरुतानन्दस्य पुत्राः मुक्ताः क्रीडतानन्दं भुङ्क्तैकं भोग्यं भगवन्तं प्राप्य भुङ्क्त सर्ववस्तुषु।

आनन्दं हि प्रवक्ष्यामि भगवतादिष्टः। तामसमपावृत्यानन्दः प्रकाशतां तस्य पुत्राः।

कैवल्योपनिषद्

ॐ अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच।
अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम्।
यथाचिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्॥ १॥

अन्वयः।

ओं अथ आश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच भगवन् वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां ब्रह्मविद्याम् अधीहि यथा विद्वान् अचिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति।

व्याख्या।

अथ ततः ब्रह्मविद्याप्राप्त्याकांक्षासंभवादनन्तरं आश्वलायनस्तन्नामाभिहितोऽश्वलगोत्रजो वैदिको ब्रह्मर्षिर्भगवन्तं वर्चस्विनं देवं परमेष्ठिनं परमेष्ठस्य (परमस्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य च) हिरण्यगर्भरूपिणः सर्जनरतस्य स्वप्नावस्थास्थितस्य पुरुषोत्तमस्याधारं ब्रह्माणं ज्येष्ठदेवमुपसमेत्य विधिना ज्ञानाप्त्यर्थमागत्योवाचोक्तवान् भगवन् देव वरिष्ठां श्रेष्ठां सदा पुराकालात् सद्भिर्जितकामैर्विद्वद्भिः सेव्यमानां यत्नेनाधीतां निगूढां परमरहस्यमित्यतीव गूढां ब्रह्मविद्यामधीहि मनसा ध्यायस्व मद्ज्ञापनार्थमिति किंरूपां यथा यदुपायेनाचिरादतिसत्वरं विद्वांस्तां ब्रह्मविद्यां ज्ञात्वा सर्वपापं दुःखपापरूपं सर्वमशुभं व्यपोह्य ज्ञानेन मनसो बहिः कृत्वा पूर्णानन्दलाभात्परात्परं परमात्तुरीयादपि परमुत्तमं पुरुषं सर्वव्यापिनं वासुदेवं पुरुषोत्तमं याति प्राप्नोति तद्द्योतिनीं ब्रह्मविद्यां।

द्योतिनी।

परमेष्ठी ब्रह्मा न तु स ब्रह्मा हिरण्यगर्भनामा सर्जनकर्माध्यक्षरूपी सूक्ष्मभुक् तैजसो वासुदेवः। स परमेष्ठी परात्परो हिरण्यगर्भः। इष्ठशब्दस्तु प्राचीनः श्रेष्ठत्वव्यञ्जकश्च पश्चादागम इति प्रयुक्तो यथा बलिष्ठगरिष्ठादिषु। स हिरण्यगर्भस्तेजोरूपी न रूपमाश्रयति न व्यक्तिमेति नावतरति न किञ्चित्करोति परतेजसि कल्पयत्येव तस्माद्धिरण्यगर्भनामा तैजसनामा च। एवंविधस्य हिरण्यगर्भस्य समक्षमाश्वलायनस्य विधिनोपगम्याधीहीति कथाप्रसङ्गो न युज्यते। ब्रह्मा तु नरदेवता योगबलेन त्रैगुण्यमयीं मायामतिक्रम्य गुणातीतोऽभवत्स राजसं गुणमुदासीनवदाश्रित्य परमं तेजः प्रविशति परे तेजसि परमेष्ठं हिरण्यगर्भरूपिणं वासुदेवमाश्रयति कल्पारम्भे च ब्रह्मनाम्नि ख्यातः सन्निर्गच्छति स दशकल्पान्तपर्यंतकालं सहस्रयुगं जीवति सृजति च

हिरण्यगर्भाभिभूतोऽहं ब्रह्मेति राजसज्ञानमाश्रित्य स्वप्नजगद् व्याकरोति स्थूलञ्च व्याकरोति। स ब्रह्मा शतदिनं जागर्ति दिनन्तु चतुर्युगं चतुर्युगशतं हि कल्पः। कल्पान्ते तु पुनः परमं तेजः प्रविश्य परे तेजसि स्वपिति कल्पारम्भे प्रबुध्यते पुनश्च दशकल्पान्ते पुनः स्वपिति न प्रबुध्यते॥

हिरण्यगर्भस्तु न स्वपिति न प्रबुध्यते स्वप्नावस्थाध्यक्षो न स्वप्नाभिभूतो विविक्तभुक् स्थूलकृत्। उक्तञ्च पुराणेषु यत्कमलासनस्थं ब्रह्माणं मधुकैटभौ महादैत्यौ वधार्थमुपचक्रमतुः स च भयमाविवेश न तु मरणं हिरण्यगर्भस्य कुतो भयमकुतोभयो हि सः। उक्तञ्च मुण्डके ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूवेति। तस्माज्ज्येष्ठो देवानां ब्रह्मा परात्तेजसः संबभूवेति सिद्धं न तु हिरण्यगर्भः संभवति। शिवस्तु वासुदेवो विष्णुर्वासुदेवः कथं न ब्रह्मापि वासुदेव इत्याक्षेपे नैवं प्राज्ञो हि शिवो विराट् विष्णुः व्यक्तिमेति प्राज्ञो व्यक्तिमेति विराड् न व्यक्तिमेति हिरण्यगर्भः स्थूले स्वप्नमयो हि सः। न च कुत्राप्युक्तं यन्नरः शिवो भवितुं समर्थो विष्णुर्वा भवितुं समर्थो ब्रह्मा तु भवत्येवेत्युक्तम्। यस्मान्न व्यक्तिमेति स्वप्नमयो हिरण्यगर्भस्तस्माद्ब्रह्माणमभिभूय सर्जनकर्मणि नियोजयति स च राजसाऽहङ्कारमाश्रित्याहं हिरण्यगर्भ इति सृजति लोकाश्च हिरण्यगर्भ इति संपूजयन्ति। स ब्रह्मा परमेष्ठेनाभिभूतः परमेष्ठस्य वासुदेवस्य श्रेष्ठ आधार इति परमेष्ठी। स भगवान्वर्चस्वी श्लाघ्यश्च देवतेश्वरः। तं परात्परपुरुषस्याधार इत्यस्मात्परात्परस्य पुरुषोत्तमस्य ज्ञानं लभ्यमिति समुपेत्याश्वलायनः प्राचीनो ब्रह्मर्षिः पृच्छति भगवन्नधीहीति।

वरिष्ठा सा ब्रह्मविद्या यामाश्वलायनः पृच्छति। कस्माद्वरिष्ठेति प्रश्ने वरिष्ठं ब्रह्म प्रापयतीति प्रपञ्चो ह्यपरं ब्रह्म त्रिविधात्मकं प्राज्ञहिरण्यगर्भविराडधिष्ठितं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थितं तुरीयं तु परं परात्परं यद्ब्रह्म तुरीयादपि तद्वरिष्ठं। सा वरिष्ठा विद्या निगूढा परमरहस्यं नाकृतात्मभिर्नासम्पूर्णदर्शिभिर्लभ्यमिति निगूढाम्। सद्भिस्तु सदा सेव्यमाना सा। पापरहितास्तु सन्तः कामस्तु पापकारणं काम एष क्रोध एष इति गीतोक्तेः। कामजयिनस्त्यक्तकामाः सन्तः। न तु विना ज्ञानेन कामत्यागस्तस्माल्लब्धज्ञानाः सन्तः। ये कामजयिनो लब्धतत्त्वज्ञानास्ते वरिष्ठां विद्यां लब्धुं समर्था न चेतरे। तैः सदा कल्पकल्पान्तरे सेव्यते सनातनी सा ब्रह्मविद्या सेतरेषां निगूढा न प्रकाशिता परे व्योम्नि तु गुहाशया शरीरे।

पुनश्च किमर्थं विद्यां किंरूपं ज्ञानं प्रार्थयति कस्तद्दर्शयत्याश्वलायनो यथेति। परात्परपुरुषप्राप्त्युपायं दर्शयति सा विद्या। ज्ञानं कारणं पापवर्जनमुपायो वासुदेवः पुरुषोत्तमो लक्ष्यं। यो विद्वान् ज्ञानी स वासुदेवं प्राप्नोति तस्मादेव भगवान् गीतायां कर्ममार्गं दर्शयित्वा तत्त्वज्ञानं संक्षेपेणोपदिश्य पापमोक्षं प्रदर्शयति। खण्डज्ञानादेष देव एष देव इति द्वैतमित्यद्वैतमिति बहुवादाः सम्भवन्ति। अखण्डज्ञानात्तु सर्ववादार्थबोधेन वादासक्तिर्विलीयते परे ब्रह्मणि मनः सज्जते। लब्धे ज्ञान अचिरादतिसत्वरं पापमपि विलीयते न स्वप्रयासेन वासुदेवप्रसादादतः सत्वरं प्रयासाद्धि कालापेक्षा बहुना

प्रयासेन हि दीर्घकालादल्पैव सिद्धिः क्षिप्रकारी तु वासुदेवप्रसादः सुखं बन्धात्प्रमुच्यत इति। उक्तञ्च श्रुतौ यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वां। तथा च गीतायामहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वपापं व्यपोहति विद्वान् सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति। दुःखं तु पापं दुःखात्प्रमुच्यत अनृतं पापमनृतात्प्रमुच्यते दुःखं ह्यनृतं कामप्रसूतं कामस्त्वज्ञानप्रसूतोऽहंकाराश्रितश्च। तस्मादहंकारं मनसो विधूय व्यपोह्य तदहंकारविगमादहं कर्ता पापी पुण्यकृत् फलभोक्तेत्यज्ञानं मनसो विधूय तदज्ञानविगमात्कामं मनसो विधूय तत्कामविगमाद् दुःखमनृतमिति मनसो विधूय तद्दुःखविगमात्सुखमपि मनसो विधूय पूर्णज्ञानी पूर्णानन्दभुक् केवलो निरञ्जनो भवति सर्वपापमुक्तः। पूर्णज्ञानात्पूर्णानन्दात् शुद्धसत्त्वात् परात्परं पुरुषमुपेतुं समर्थो भवति। कः स पुरुषः पुरुषोत्तमो वासुदेव इति। यो हि पुरु महदधिकृत्य शेते स पुरुषः। पुरु हि महदव्यक्तं विज्ञानरूपं तस्मिन्नानन्दभुगात्मा शेते। पुनश्च जगद्व्यापी यः स पुरुषस्तं सर्ववस्तुनिहित इति वासुदेवं वदन्ति। प्रपञ्चस्तु वसु या रयिरुच्यते प्रश्नोपनिषदि रयिर्हि वसु विज्ञानोपकरणं प्रधानं वसु तस्मिन् प्रधाने यः शेते स पुरुषः। पुनश्च या भूतयोनिर्यस्यांशो जीवो यस्य शरीरं जगत्स पुरुषस्तत्परं ब्रह्म स उत्तमः पुरुषः वासुदेवनामा कृष्णः। स पुरुषः परात्परः। तुरीयं तु परं सर्वं हि तस्मिँल्लीनं भवति न कश्चित्तमतिक्रामति अतएव परम्। अतिक्रामति हि वैश्वानरं जाग्रदवस्थमतिक्रामति तैजसं स्वप्नदर्शिनमतिक्रामति प्राज्ञं सुषुप्तिशायिनं तुरीयं तु प्राप्य न कश्चिदतिक्रामति विलीनो भवति जीव-स्तदद्वैतं परमं सच्चिदानन्दं ब्रह्म। सगुणे वा ब्रह्मणि निवसति निर्गुणे वानिर्देश्ये। तस्मात्तुरीयादपि परः पुरुषोत्तमः। उक्तं हि माण्डूक्ये प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते। परात्परस्तु न शिवं नाशिवं शिवाशिवे तस्मिन् श्रिते न शान्तं न कलिलं शान्तकलिले तस्मिन् श्रिते नाद्वैतं न द्वैतं द्वैताद्वैते तस्मिन् श्रिते न प्रथमं न द्वितीयं न तृतीयं न चतुर्थं विराड्हिरण्यगर्भप्राज्ञतुरीयास्तस्मिन् श्रिताः। स पुरुषोत्तमस्तत्परात्परं ब्रह्म। न निर्गुणो न सगुणः पुरुषोत्तमो गुणातीतः निर्गुणसगुणौ तस्मिन् श्रितौ। न पुमान् न स्त्री नालिङ्गं पुरुषोत्तमो लिङ्गातीतः पुमान्स्त्री चालिङ्गञ्च तस्मिन् श्रितं। न सन्न चिन्नानन्दं पुरुषोत्तमः सच्चिदानन्दं तस्मिन् श्रितमिति। तुरीयं नातिवर्तते कश्चित्कथं तुरीयादपि परं यातीति सन्देहे नैवं। यो हि तुरीयं याति स लीनो भवति नातिवर्तते यस्तु वासुदेवं याति प्रधानपुरुषं सगुणब्रह्मनिर्गुणब्रह्मरूपं न स लीनो भवति न जायते न म्रियते स ह्यावृत्तिमनावृत्तिञ्चातिवर्तते केवलो भवति जीवन्मुक्तो भवति मोक्षमतिवर्तते बन्धमतिवर्तते शाश्वतो भवति सनातनो भवति लीलामयो भवति ब्रह्मीभूतो भवत्यनन्तगुणे रमति निवसति कृष्णे। तस्मात्सगुणादुत्थाय स परब्रह्मणि लीनो भवति तस्मिन्निवसति तदतर्क्यमज्ञेयं धाम॥

ऋग्वेदः

[१]

Hymns of Vasishtha
to
Agni

VII.1.

1. Men have brought the Flame to birth by their thinkings from the tinders by the movement of the two hands, expressed by the word, the far-seer, the master of the house, the traveller.

अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युती जनयंत प्रशस्तं ।
दूरेदृशं गृहपतिमथर्युं ॥

अरण्योः

Heaven and Earth = mind and physical being, are the two tinders

हस्तच्युती

The two hands are the two hands of the Sun, सवितेव बाहू

दीधितिभिः

दीधिति = thought, light, finger. All mean the same thing, for the fingers are those of the two hands of the Sun, दश धियः

प्रशस्तं

Well-expressed (शस्) by the word: external sense = praised.

अथर्युं

अथ् to move, cf अत् or अथर् — Greek αἰθήρ — the plane of flaming light

नरः पुरुषा मनुष्या देवा वाग्निं जनयंताजनयन् जनितवंतः। कुतः। अरण्यो-र्दीधितिभिर्बुद्धिभिरंगुलिभिर्वा हस्तच्युती हस्तद्वयचालनेन। कीदृशमग्निं प्र-शस्तं प्रशंसितमृचा प्रत्यक्षीकृतं वा मंत्रेण शंसितमिति। दूरेदृशं दूरादेव पश्यति यः दूराद्दृश्यते वा तादृशं। गृहपतिं गृहस्य पतिमथर्युं पथगामिनं च॥ तपसो देवतामग्निं नित्यमपि संतं मर्त्या मनुष्याः मर्त्ये मनुष्ये अमरा देवा वा शरीरे हृदि सर्वदा जनयंति यथा नूनमपि जनितवंतः। अरण्योरेव जनयंति मनसः शरीराच्च देहाद्धि हृदि मनोघर्षणेन तपोऽग्निर्जायते। दीधितिभिर्हस्तच्युत्या जायते। हस्तौ तु विज्ञानदेवस्य सूर्यस्य दशांगुलयश्च सूर्यप्रचोदिता दश धियः। दश धियो अग्निमप्युत्पादयंति सोममपि सुन्वंति तपश्च यावदानंदं च। ता च दश यथान्नमयी दैहिकी मस्तिष्कं गता बुद्धिरेका द्वितीया प्राणमयी तृतीया चेंद्रियमयी संज्ञानमयी च चतुर्थी पंचमी तु प्रज्ञानमयी या चाज्ञानमयी सा षष्ठी सप्तमी विज्ञानमयी सा चाष्टमी यानन्दघनमयी नवमी च चिन्मयी दशमी च सन्मयीति। एता च सर्वा चिद्घने विज्ञाने पूर्णचेतनाप्राप्ता पूर्णीभूता विज्ञानसूर्यस्य दश रश्मयो दशांगुलयो मनुष्यचैतन्ये तु मानसीभूता मनोमयो हि मनुष्यः। सूर्यस्य च द्वौ हस्तौ ययोर्दक्षिणो ज्ञानमयो वामश्च शक्तिमयः। तौ च पुरुषप्रकृतिप्रधानौ हृदि तपो जनयंति मनुष्यस्य परमार्थचिंताभिः दशविधाभिश्च ताभिः संयुक्ताभिरेकीभूतविज्ञानमयीभिश्च पूर्णं तपो जायते। तं च तपोऽग्निं प्रशस्तमिति वर्णयति यावद्वाङ्मयेन विज्ञानवता मंत्रेण स तपोमयः पुरुषः प्रकटीकृतगुणरूपः प्रकाशमय्या स्तुत्या च स्थिरीकृतश्चेतसि विकाशते। यतश्च विज्ञानमयः स तपोऽग्निः ततः स दूरेऽपि पश्यति सर्ववस्तूनि सर्वसत्यानि यानि परमाणि यानि चावमानि विश्वे। स तपोमयः पुरुषश्च मनोबुद्धिप्राणयुक्तस्य त्रिवृतो मनुष्यशरीररूपस्य गृहस्य पतिः गृहस्वामी ह्येष पुरुषः सृजति रक्षति भुङ्क्ते च शरीरगृहेषु योऽयमग्निः। तत्र स चासीनोऽपि पथेषु व्रजति तस्मादथर्युः स हि दूतो नेता च पथि युद्धे यज्ञे यतो सर्वाः शक्तीः सर्वाश्च चेष्टा नयति पुरोगामी तपोदेवताग्निः॥

[२]

म° १०॥ १२४॥

इमं नो अग्न उप यज्ञमेहि पंचयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुं।
असो हव्यवाळुत नः पुरोगाः ज्योगेव दीर्घं तम आशयिष्ठाः॥ १॥

हे अग्निनामक तपोरूप ईश्वरविभूते अस्माकमिदं कर्म प्रत्यागच्छ। कीदृशं। पंचयामं यस्मिन् पंच यामा गतयो देहिनो यात्राया गंतव्यस्थानरूपाणि पृथिव्यंतरिक्षं द्यौः स्वर्मय इति पंच धामानि। त्रिवृतं यस्मिंस्त्रयो वृत्तयः शरीरप्राणमनोरूपाः। पुनश्च सप्ततन्तुं यस्मिन्देहप्राणमनोविज्ञानानन्दतपो-

सद्रूपाः सप्त यज्ञतन्तवः॥ देहिनो देवोद्देशी कर्ममयः प्रयास एव यज्ञः। भगवान्स देवो यस्याग्निवरुणप्रभृतयो नामरूपाणि संति। कर्म तु देहमयः प्राणमयो मनोमय इति त्रिवृत्। तस्य च सप्त तत्त्वानि सप्त तन्तवः। स प्रयासः पर्वतारोहणरूपा महती यात्रेव। तस्या यात्रायाः पंचधामानि पृथिवीत्यन्नमयमेतन्मर्त्यं जगदंतरिक्षमिति प्राणमयमन्नमयस्योत्स एव। तस्य च प्राणमयस्य द्यौरिति मनोमयं। तस्य च मनोमयस्य स्वरिति मूर्धा। स्वर्लोकस्तु विज्ञानमयस्य सूर्यप्रतिष्ठितस्य महर्लोकस्य मनोमयी प्रतिकृतिः। तद्विज्ञानमयं स्वर्वा बृहद्द्यौर्वा सत्यमृतं बृहदिति देवानां स्वो दम इति ख्यातः।

सा सर्वा

ॐ तत्सद्या सः। सनातनमनंतमनादिमध्यं सर्वं सर्वातीतं परात्परं ब्रह्म। तद्यत्परात्परं तदेव सत्सर्वं। तत्रापि सर्वं यथात्रैव। तद्धि तत्र सर्वस्य सत्यं। तद्ध्यत्र सर्वत्र सर्वस्य भावः। सैव परात्परा यैकाद्वितीयाकथ्यचैतन्यमयी निर्गुणानंतगुणमय्यजानादिमध्यांता। सा सर्वा सा सर्वमयी। तस्यां हि सर्वं तया सर्वं।

मन्त्राः

ॐ आनन्दमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमे

*

ॐ तत् सत् ज्योतिररविन्द

*

ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिररविन्द

*

तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि।
यन्नः सत्येन दीपयेत्॥

Note on the Texts

Note on the Texts

Although born in Calcutta of Bengali parents, Sri Aurobindo grew up fluent in English, but unable to speak his mother tongue. Taken to England when he was seven, he received there a European education and had almost no contact with Indian culture. While studying at Cambridge in his last two years in England, however, he began to learn Bengali and Sanskrit as a candidate for the Indian Civil Service. After his return to India, he continued his study of these languages on his own until he could not only read, but write in them. In the present volume, his writings in Bengali and those in Sanskrit are being published together for the first time. Both are reproduced in the original languages.

Writings in Bengali and Sanskrit is divided into two parts according to language: *Bāṅglā Racanā* (*Bengali Writings*) and *Saṁskṛta-racanāḥ* (*Sanskrit Writings*).

Bāṅglā Racanā

Sri Aurobindo wrote poems, essays, translations and letters in Bengali from his years as an administrative officer and professor in Baroda (1893–1906), through the period of his political activism in Calcutta, where he edited the Bengali weekly *Dharma* in 1909–10, to the 1930s when he corresponded in Bengali with a few members of his Ashram in Pondicherry. Many of these writings, especially those belonging to the middle period, were published during his lifetime. Others have been transcribed from his manuscripts and published subsequently. They are arranged here in several sections according to subject, form and publication history. Details about the items in these sections are provided in the *Tathyapañjī* at the end of *Bāṅglā Racanā* (pages 665–82).

Saṁskṛtaracanāḥ

Sri Aurobindo's writings in Sanskrit are much less extensive than those in Bengali, but likewise include poetry and prose on a significant range of topics. They have been arranged here in chronological order as far as possible. They show in a brief compass Sri Aurobindo's development from the period when he was assimilating India's cultural heritage after his return from England, through his days as a nationalist leader, to his flowering as a Yogi, scholar and thinker contributing to the recovery of the ancient wisdom of the Veda and Upanishads. These writings were not published during his lifetime, but were discovered in his manuscripts after his passing. Several of them are appearing here for the first time.

Vividhāḥ ślokāḥ. These verses are found on three pages of a notebook used by Sri Aurobindo at various times between 1900 and 1903 for writing in English, Bengali and Sanskrit. The first two Shlokas are reminiscent of the style of Bhartrihari and may have been written around the time when he translated Bhartrihari's *Nīti Śataka* into English (see *Translations*, volume 5 of THE COMPLETE WORKS OF SRI AUROBINDO). The last two verses, mentioning Bana and a cuckoo, seem related to his Bengali poem *Ushaharan Kavya* (published on pages 595–643 of this volume).

Prāṇa idaṁ sarvam. This prose passage, untitled in the manuscript, was apparently intended to form part of a philosophical dialogue of which only one speech was written. It claims to be a restatement of ideas found in the *Yogavāsiṣṭha*, but also alludes to Western philosophers. It is found in the same notebook as the preceding Shlokas and evidently belongs to the same period (1900–1903).

Bhavānī Bhāratī. Sri Aurobindo wrote this Sanskrit poem sometime between 1904 and 1908, quite possibly around the time when he wrote in English the text of the pamphlet *Bhawani Mandir*, issued in 1905. He did not give the poem a title, nor did he get a chance to revise and polish it; the notebook in which it was written was confiscated by the Calcutta police in May 1908 and he never saw it again. It was first published with an English translation in *Sri Aurobindo: Archives*

and Research in December 1985 under the title *Bhavānī Bhāratī*. This title was suggested by references in the poem to *Bhavānī* (verses 22, 70, 78, 84), *Bhāratī* (verse 73), *Bhāratamātaram* (verse 30) and *Mātā Bhāratānām* (verses 12, 33). Sri Aurobindo used the name "Bhawani Bharati" in *Bhawani Mandir*, where the following "message of the Mother" sums up the central idea developed in the Sanskrit poem:

> When, therefore, you ask who is Bhawani the mother, She herself answers you, "I am the Infinite Energy which streams forth from the Eternal in the world and Eternal in yourselves. I am the Mother of the Universe, the Mother of the Worlds, and for you who are children of the Sacred land, *aryabhumi*, made of her clay and reared by her sun and winds, I am Bhawani Bharati, Mother of India."[1]

A number of trivial slips or irregularities in spelling and *sandhi* occur in the unrevised manuscript of this poem, as in other Sanskrit writings by Sri Aurobindo. In *Sri Aurobindo: Archives and Research*, most of these were corrected — where this could be done without disturbing the metre — and more significant emendations were listed in a table. These corrections have been reproduced in the present edition along with a few further emendations. Some of these emendations were first made in 1987, when *Bhavānī Bhāratī* was published by the Sanskrit Karyalaya of the Sri Aurobindo Ashram with a verse-by-verse commentary in Sanskrit. At that time the editors reworded some phrases in the poem for the sake of metrical or grammatical regularity, mentioning the original readings in footnotes. In the interest of textual authenticity, only the more minor emendations made by the Sanskrit Karyalaya have been incorporated in the present edition. Those that have not been adopted here are listed in a table in the Reference Volume, along with other textually relevant information. Two lines left incomplete in the manuscript (in verses 85 and 92) have been completed in square brackets using the words supplied in the 1987 edition.

Tāntrikasiddhiprakaraṇam. This incomplete exposition of a system of spiritual practice similar to the one outlined in the *sapta catuṣṭaya* (see

[1] *Bande Mataram: Political Writings 1890–1908*, volume 6 of THE COMPLETE WORKS OF SRI AUROBINDO, p. 89.

the next item) was probably written within a year or two after Sri Aurobindo's arrival in Pondicherry in April 1910. The Sanskrit text was first published in *Mother India* in January 2008 with transliteration and an English translation entitled "A Chapter on Tantric Perfection".

Saptacatuṣṭayam. These formulas related to parts of the *sapta catuṣṭaya* — the system of seven sets of four elements which Sri Aurobindo adopted as a programme for his sadhana early in his stay in Pondicherry — evidently date to the period between 1910 and around 1912. They are also reproduced as part of the *Record of Yoga* (volume 11 of THE COMPLETE WORKS OF SRI AUROBINDO, pages 1278–80). The complete Sanskrit text of the *sapta catuṣṭaya* itself can be found, interspersed with explanations in English, in the Introduction to the *Record of Yoga* (volume 10 of THE COMPLETE WORKS, pages 3–23).

Ekamevādvitīyaṁ Brahma. This composition inspired by a well-known phrase from the Chhandogya Upanishad, with which it begins, is found in a large notebook used by Sri Aurobindo around 1912–13 for Vedic and philological studies, commentaries on the Upanishads and other writings. Untitled in the manuscript, it was first published with an English translation in *Sri Aurobindo: Archives and Research* in December 1978 under the title *Ekamevādvitīyaṁ Brahma* ("Brahman, one without a second", the first words of the text), with the subtitle *Śrīaravindopajñā Upaniṣad.* As the editorial subtitle suggests, it may be considered a new Upanishad with Sri Aurobindo as its Rishi — *upajñā* indicating a text received by individual inspiration, not handed down by tradition.

Kaivalyopaniṣad. This Sanskrit commentary on the first verse of the Kaivalya Upanishad was written around 1912. In the manuscript, it follows an English translation and commentary under the heading "The Kaivalya Upanishad". The English translation with commentary is published in *Kena and Other Upanishads*, volume 18 of THE COMPLETE WORKS OF SRI AUROBINDO, pages 288–89; it appeared previously in *The Upanishads*, volume 12 of the Sri Aurobindo Birth Centenary Library. The Sanskrit commentary is published here for the first time. In both cases the original Sanskrit text of the Upanishad,

which was not quoted in the manuscript, has been supplied by the editors.

Ṛgvedaḥ. [1] Sri Aurobindo's commentary on the first verse of Rig Veda VII.1 is reproduced here as in the manuscript, including an English translation and notes on selected words followed by a commentary in Sanskrit. Only the translation and notes are reproduced in *Hymns to the Mystic Fire* (volume 16 of THE COMPLETE WORKS), omitting the Sanskrit commentary. This commentary was written probably around 1920. [2] Sri Aurobindo wrote out the first verse of Rig Veda X.124 (with accents) followed by a commentary in Sanskrit in a notebook he used in 1916 for various writings mainly in English and Bengali.

Sā sarvā. This short, untitled and unfinished paragraph (ending in the manuscript with a cancelled word and no punctuation) is found on the first page of a notebook used by Sri Aurobindo in or around 1927 mainly for essays and an incomplete draft of the last chapter of *The Mother*. The first two words of the penultimate sentence have been used as the title.

Mantrāḥ. Sri Aurobindo wrote the first three of these four mantras around 1927 and the last in 1933. They are reproduced with facsimiles of the manuscripts on pages 829–31 of *Letters on Himself and the Ashram*, volume 35 of THE COMPLETE WORKS OF SRI AUROBINDO. Only the Sanskrit texts in Devanagari are duplicated here.